পঞ্চম সংস্করণ
মুহাররম, ১৪৪২ হিজরী
সেপ্টেম্বর, ২০২০ ঈসায়ী

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর পরিকল্পনা মোতাবেক রচিত
ও তৎকর্তৃক অনুমোদিত

ইসলামী আকীদা
ও
ভ্রান্ত মতবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
গ্রন্থকার– আহকামে যিন্দেগী, ফাযায়েলে যিন্দেগী,
বয়ান ও খুতবা, ইসলামী মনোবিজ্ঞান,
ইসলামী ভূগোল, আহকামে হজ্জ
ও ফিক্‌হুন নিসা
প্রভৃতি

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আবরার
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
মোবাইল: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪

ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ

মূল্য: ৫২০/=

ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ

গ্রন্থকার
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
maolana.hemayet@gmail.com

প্রথম প্রকাশ
রবিউল আউয়াল, ১৪২৫ হিজরী, মে, ২০০৪ ঈসায়ী

দ্বিতীয় সংস্করণ
যিলকদ, ১৪২৮ হিজরী, নভেম্বর, ২০০৭ ঈসায়ী

তৃতীয় সংস্করণ
রমযান, ১৪৩১ হিজরী, সেপ্টেম্বর, ২০১০ ঈসায়ী

চতুর্থ সংস্করণ
শাবান, ১৪৩৫ হিজরী, জুন, ২০১৪ ঈসায়ী

পঞ্চম সংস্করণ
মুহাররম, ১৪৪২ হিজরী, সেপ্টেম্বর ২০২০ ঈসায়ী

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আবরার

Islami Akida o vranto matobad
(Islamic belife & wrong conceptions)
Written by : maolana Md. Hemayet uddin in bengli
Published by : Maktabatul Abrar
Islami Tower, 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100
Mobile : 01712-306364

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ, উস্তাযুল আসাতিযা হযরত মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ সাহেব, মুহতামিম ও শাইখুল হাদীছ-জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ-এর

অভিমত

আমি মাওলানা হাফেজ মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন রচিত “ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ” নামক গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পড়েছি। লেখকের জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতি দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। اللهم زد فزد। এরূপ দুরূহ বিষয়কে সুন্দর বাংলায় ফুটিয়ে তোলার কৃতিত্বের জন্য লেখককে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। গ্রন্থখানি আশু প্রকাশের দাবী রাখে। গ্রন্থখানি (দ্বিতীয় খণ্ড) কওমী মাদ্রাসার ফযীলত বা তাখাস্‌সুস পর্যায়ে পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। এ গ্রন্থখানি পাঠ করা দ্বারা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত, উলামা ও তালাবা সর্বশ্রেণীর পাঠক অত্যন্ত উপকৃত হবেন বলে মনে করি।

তাং ১৭. ১২. ০৩ ইং

আরজ গোযার

মুহতামিম, জামিয়া শারইয়্যাহ
মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ, দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ-এর আমীর, মুহিউস সুন্নাহ
হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব,
মুহতামিম ও শাইখুল হাদীছ, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া,
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-এর

অভিমত

এই বিশাল পৃথিবীর অগণিত সৃষ্টির মধ্যে মানুষ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষ যাতে করে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুন্ন রেখে সুশৃংখল আদর্শ জীবন গড়ার মাধ্যমে সৃষ্টিগত উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হয়, সে উদ্দেশ্যে স্থান, কাল ও পাত্র নির্বিশেষে নিখুঁত বিধি-বিধান প্রদত্ত হয়েছে। আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এই বিধি-বিধানকেই ইসলাম নামে অভিহিত করা হয়েছে।

একটি পরিপূর্ণ বিধি-বিধান হিসাবে ইসলামের করণীয় বর্জনীয় বিস্তারিত বিধি-বিধানকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১. আকায়েদ, ২. ইবাদাত, ৩. মুআমালাত, ৪. মুআশারাত ও ৫. আখ্‌লাক। এর মধ্যে প্রথমোক্ত বিষয়টি (আকায়েদ) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, আকায়েদের ভিত্তিতেই অবশিষ্ট বিষয়াদির মূল্যায়ন অবমূল্যায়ন হয়ে থাকে। আকায়েদের ঐক্য এবং অনৈক্যের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম-অমুসলিম, হকপন্থী ও বাতিল পরিচয় নির্ধারিত হয়। ইসলামের প্রথম যুগে মানুষ আকীদা এবং আমলের ক্ষেত্রে ঐক্যগত অবস্থানে থাকলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে তারা আকীদা ও আমলগতভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম-অমুসলিম বিভক্তি তো বটেই, স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যেও দেখা দেয় চরম বিভক্তি, সৃষ্টি হয় বহু ধরনের দল-উপদল। তাদের পারস্পরিক যুক্তি-প্রমাণ ও তর্ক-বিতর্ক কেবল সরলপ্রাণ মুসলমানদের জন্যই নয় অনেক জ্ঞানীগুণীর জন্যও সঠিক পথ অনুধাবনে ব্যাঘাত ও বিচ্যুতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইত্যবসরে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী সুযোগ সন্ধানী মহল স্বীয় ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে সক্ষম হয়। তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মুসলমান গোমরাহীতে বরং ধর্মহীনতার ছোবলে আক্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। হচ্ছে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত এবং চরম অপদস্ত। কিন্তু ইসলাম তার স্বীয় অস্তিত্ব নিয়ে সুদৃঢ়ভাবেই এগিয়ে চলেছে এবং চলতে থাকবে। এর মূল কারণ হল আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং ইসলামকে হেফাজতের প্রতিশ্রুতি। এই ইচ্ছা ও প্রতিশ্রুতির প্রতিফলনে ইসলাম সম্পর্কে বিজ্ঞ মনীষীগণ সর্বযুগেই তাজদীদ তথা পরিশুদ্ধি অভিযানের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত বিষয়াদিকে সুসংরক্ষণ ও সুসম্প্রসারণের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। কেবল বয়ান, বিবৃতি ও প্রতিবাদের মাধ্যমেই নয় বরং রচনা, লেখা এবং যুক্তি-তর্ক ও অকাট্য প্রমাণাদি পেশ করার মাধ্যমেও তারা সর্বযুগে অব্যাহত অবদান রেখে আসছেন।

আমি আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন ইসলামী গবেষক, আহ্‌কামে যিন্দেগীর মুসান্নেফ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন রচিত "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" শীর্ষক আলোচ্য গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছি। এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি ইসলামের সহীহ আকীদার বিবরণ প্রদান ও এসব আকীদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত বিভিন্ন ফিরকা ও মতবাদ সম্পর্কে সুবিন্যস্ত ও প্রমাণভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের সুসংরক্ষণ ও সুসম্প্রসারণের সেই দায়িত্ব পালনের অব্যাহত ধারায় নিজেকে যুক্ত করেছেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় যথেষ্ট কিতাবাদি রয়েছে এমনকি খণ্ড খণ্ডভাবে বাংলা ভাষায়ও অনেক পুস্তক-পুস্তিকা রয়েছে। তবে আমার জানামতে এ গ্রন্থখানি এ বিষয়ে ব্যাপকতম ও অন্যতম হিসাবে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আমি লেখকের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করি।

১৫/৪/২০০৪

ইতি

(মাহমূদুল হাসান)

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ, উস্তাযুল আসাতিযা হযরত মাওলানা নূর হোছাইন কাছেমী সাহেব, মুহতামিম ও শাইখুল হাদীছ-জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা-এর

অভিমত

আমি মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন রচিত "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" শীর্ষক গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছি। লেখক দুই খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে যুগ চাহিদার আলোকে ইসলামের সহীহ আকায়েদ এবং আকায়েদ শাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক শাস্ত্র– ইল্‌মে কালাম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে বিভিন্ন বাতিল ফির্‌কা ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের শেষভাগে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা সন্নিবেশিত করেছেন। আলোচনা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের বরাত সহকারে অত্যন্ত তথ্যভিত্তিক হয়েছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ মতবাদসহ সমাজের অতীত ও বর্তমানের বহুবিধ মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা সম্বলিত এরূপ ব্যাপক কোন গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিতে পড়েনি। গ্রন্থখানি আশু প্রকাশের দাবী রাখে। গ্রন্থখানি পাঠ করা দ্বারা উলামা, তালাবাসহ সমাজের সর্বশ্রেণীর পাঠক প্রভৃত উপকৃত হবেন বলে আশা রাখি।

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ বহু বৎসর যাবত এরূপ একখানি গ্রন্থ তৈরি করা ও তা নেছাবভুক্ত করার পরিকল্পনা লালন করে আসছিল। অবশেষে মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন সাহেবকে এর রচনার দায়িত্ব অর্পন করা হয়। সে মোতাবেক তিনি এ গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। এ গ্রন্থ পাঠ করা দ্বারা সমাজ নানান রকম ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে সজাগ হতে পেরে তাদের ঈমান-আকীদাকে সংরক্ষণ করতে পারবে এবং হক্ক ও হক্কানিয়াতের উপর অটল থাকতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

ইতিপূর্বে লেখক কর্তৃক রচিত "আহ্‌কামে যিন্দেগী", "ইসলামী মনোবিজ্ঞান" এবং "বয়ান ও খুতবা" প্রভৃতি গ্রন্থ উলামা ও শিক্ষিত শ্রেণী নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা, স্বীকৃতি এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আশা করি এ গ্রন্থখানিও অনুরূপ মর্যাদা লাভ করবে। আমি গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

তাং ২৬. ০৩. ২০০৪ ইং

আরজ গোযার

মুহতামিম
জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর মহাসচিব হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল জব্বার সাহেব-এর

অভিমত

نحمده ونصلي على رسوله الكريم . أما بعد

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর নেছাবভুক্ত আকাইদের কিতাব-শরহে আকাইদে নাসাফী (شرح العقائد النسفية)- এর সঙ্গে বর্তমান যুগের ফেরাকে বাতেলার একটা অধ্যায় যোগ করার নিমিত্তে সহায়ক একখানি পুস্তক রচনার সিদ্ধান্ত হয়েছিল অনেকদিন পূর্বে অর্থাৎ, ১২/০৬/৯৫ ঈঃ তারিখে। কিন্তু লেখকের অভাবে সিদ্ধান্তটি দীর্ঘদিন যাবত কার্যকর করা যাচ্ছিল না। অবশেষে নবীন ও গবেষক লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন-এর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হয় এবং ০৮/০৬/২০০০ ঈঃ তারিখে তাঁর সঙ্গে উক্ত পুস্তক লেখার একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

এ ব্যাপারে মাওলানা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং অনেক বই কিতাব ঘাটাঘাটি করে সহায়ক গ্রন্থটির প্রণয়ন কাজ শেষ করে বেফাকুল মাদারিসে কপি জমা দেন। চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনার দায়িত্ব বোর্ডের উপর ন্যাস্ত থাকায় সম্পাদনা করার জন্য দেশের প্রখ্যাত প্রবীণ বিজ্ঞ আলেম হযরত মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ ও বিজ্ঞ আলেম মাওলানা নূর হোছাইন কাসেমীকে পাণ্ডুলিপি প্রদান করা হয়। কাজী সাহেব পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত দেখেছেন। সংশোধন ও সংযোজনের কিছু সুপারিশ করেছেন। সুফারিশের আঙ্গিকে পাণ্ডুলিপিটি পুনঃবিন্যস্ত করা হয়েছে। কাজী সাহেব গ্রন্থখানির পক্ষে উৎসাহব্যাঞ্জক বাণী দিয়েছেন এবং গ্রন্থখানিকে মাদরাসার নেছাবভুক্ত করা বাঞ্ছনীয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মাওলানা নূর হোছাইন কাসেমী সাহেবও পাণ্ডুলিপিটি দেখেছেন। তিনিও ইতিবাচক মতামত ব্যক্ত করেছেন।

অতঃপর লেখক বইটি বাজারজাত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আল্লাহ পাকের অসংখ্য শোকরিয়া যে, তিনি দীর্ঘ দিনের একটি অভাব পূরণ করার তাওফীক দান করেছেন। আর লেখককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁর দীর্ঘ হায়াত ও ক্ষুরধার লেখনীর দক্ষতা একান্তভাবে কামনা করছি।

আমার ধারণামতে গ্রন্থখানি ফেরাকে বাতেলা সংক্রান্ত এক বিরাট ভাণ্ডার হিসেবে সমাজের নিকট, বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের নিকট সমাদৃত হবে। তবে শিক্ষার্থীদের জন্য বেফাক থেকে উপযোগী পরিমাণ নেছাব নির্ধারণ করে দেয়া যাবে।

তাং ২৯/০৩/০৪ ঈঃ

(মুহাম্মাদ আবদুল জব্বার)
মহাসচিব : বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ

তৃতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গ

আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" বইটির তৃতীয় সংস্করণ পাঠকদের সামনে পেশ করার তাওফীক দান করেছেন। হক ও হক্কানিয়াতের উপর থাকার জন্য সহীহ ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের উপর অবিচল থাকা যেমন অনিবার্য, তেমনি সহীহ ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত বাতিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদ থেকে পরহেয করাও অত্যাবশ্যকীয়। এই প্রয়োজনকে সামনে রেখেই রচিত হয়েছিল "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" বইটি। বইটি এ প্রয়োজন পূরণে অনেকটা সহায়ক হয়েছে বলে উলামায়ে কেরাম ও শিক্ষিত শ্রেণীর মহল থেকে স্বীকৃতি লাভ হয়েছে। এ সবকিছুই হয়েছে আল্লাহ তা'আলার খাস মেহেরবানীতে। সবকিছুর জন্য আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করছি। আলহামদু লিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদু লিল্লাহ!!

বইটির বিষয়বস্তুর তালিকায় আরও বেশ কিছু বাতিল ফিরকা ও ভণ্ড পীরদের আকীদা-বিশ্বাস সম্বন্ধে সংযোজন ঘটানোর জন্য অনেক পাঠকের পক্ষ থেকে প্রস্তাব এসেছে। তবে সংশ্লিষ্ট ফিরকা বা সংশ্লিষ্ট পীরদের নিজস্ব রচনা বা বক্তব্য থেকে পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে তা সংযোজন করা সম্ভব হল না। কারণ, এ বইটিতে যেকোনো বাতিল ফিরকা বা ভ্রান্ত দল কিংবা ব্যক্তির চিন্তাধারা ও মতবাদ বর্ণনা করতে যেয়ে যথাসম্ভব সরাসরি সংশ্লিষ্টদের রচনা বা বক্তব্য থেকে প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা গৃহীত হয়েছে। সেমতে প্রস্তাবিত যে কোন ব্যক্তি বা দলের মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা-পর্যালোচনা সংযোজন করতে গেলে তার বা তাদের নিজস্ব রচনা বা বক্তব্য থেকে দলীল-প্রমাণ সংগ্রহ করা আবশ্যক। কোন সহযোগী এ অভাব পূরণ করে দিলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে তার প্রস্তাবিত বিষয় সংযোজন করার বিষয়ে সক্রীয় বিবেচনা রাখতে কার্পণ্য করব না। তদুপরি আরও একটা বিষয় আমাদের সামনে থাকা চাই। তাহল– যেসব বাতিল ফিরকা তেমন একটা ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেনি বা যেসব ভণ্ড পীর-ফকীরের ভ্রান্ত চিন্তাধারা স্থানীয় একটি বিশেষ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রয়েছে, এ বইটিতে তাদের বিষয় সংযোজিত হওয়া তাদের ব্যাপক পরিচিতির কারণ ঘটে হীতে বিপরীত হয় কি না, তাও বিশেষভাবে বিবেচনার বিষয়।

এই তৃতীয় সংস্করণে ভাষাগত পরিশুদ্ধি সাধনের পাশাপাশি বেশ কিছু বিষয়ে কিছু কিছু নতুন দলীল-প্রমাণ সংযোজন করা হয়েছে। বেশ কিছু স্থানে আলোচনা আরও নাতিদীর্ঘ করা হয়েছে। বহু সংখ্যক বরাত সরাসরি করে দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় স্থানে দলীল হিসাবে পেশকৃত হাদীছসমূহের গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে তাহকীক পেশ করে দেয়া হয়েছে। এই তাহকীক পেশ করতে যেয়ে গ্রহণযোগ্যতার বিচারে বেশ কিছু

হাদীছ পরিবর্তন বা হাদীছের শব্দে পরিশুদ্ধি আনতে হয়েছে। পাঠক মহল থেকে নির্দেশিত কিছু কিছু বিষয়ে সামান্য সংশোধনীও আনা হয়েছে। সর্বোপরি বইটির অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব সার্বিক দিক থেকে এ সংস্করণটিই গ্রহণযোগ্যতার বিচারে অধিকতর উন্নীত হয়েছে। যারা পূর্বের সংস্করণ সংগ্রহ করেছেন, তাদেরকে এ সংস্করণের কপিও সংগ্রহে রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আল্লাহ তা'আলা বইটিকে আরও বেশি কবুলিয়াত দান করুন। উম্মতে মুসলিমার জন্য এটিকে হক ও বাতিল চেনার এবং বাতিল থেকে পরহেয করার উপাত্ত হিসাবে মনোনীত করে নেন। সর্বোপরি আমাদের জন্য এটিকে নাজাতের ওছীলা বানান। আমীন!

তারিখ: ১২/০৮/২০১০ ইং

বিনীত

মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

চতুর্থ সংস্করণ প্রসঙ্গ

আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" বইটির চতুর্থ সংস্করণ পাঠকদের সামনে পেশ করার তাওফীক দান করেছেন। এই চতুর্থ সংস্করণে বিশেষভাবে আকায়েদ সংক্রান্ত বিষয়াদির পুনঃতাহকীক পূর্বক কিছু বিষয়ের বর্ণনায় পরিবর্তন ও সংযোজন আনা হয়েছে। গোটা বইয়ে সীমিত পরিসরে আধুনিক লেখন-পদ্ধতি ও বানানরীতি অনুসারে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বহু স্থানে ছোটখাট সম্পাদনাও করা হয়েছে। কিছু বরাতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বইটিকে আরও বেশি কবূলিয়াত দান করুন। এর উপকারিতা আরও বৃদ্ধি করে দিন। আমীন!

তারিখ: ১৪/০৫/২০১৪ ইং

বিনীত

মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

পঞ্চম সংস্করণ প্রসঙ্গ

১ম খণ্ড

(ইল্‌মে কালাম ও আকাইদ বিষয়ক)

প্রথম অধ্যায়

(ইল্‌মে কালাম বিষয়ক)

দ্বিতীয় অধ্যায়

(ঈমান ও আকাইদ বিষয়ক)

২য় খণ্ড

(বাতিল ফির্‌কা ও ভ্রান্ত মতবাদ বিষয়ক)

প্রথম অধ্যায়

(হক ও বাতিল সংক্রান্ত কিছু বিষয়)

দ্বিতীয় অধ্যায়

(এ'তেকাদী ফিরকা বিষয়ক)

তৃতীয় অধ্যায়

(দেশীয় বাতিল ফিরকাসমূহ)

চতুর্থ অধ্যায়

(আধ্যাত্মিক মতবাদ ও বিদআত সংক্রান্ত বিষয়ক)

পঞ্চম অধ্যায়

(রাজনৈতিক মতবাদ বিষয়ক)

ষষ্ঠ অধ্যায়

(অর্থনৈতিক মতবাদ বিষয়ক)

সপ্তম অধ্যায়

(দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ বিষয়ক)

অষ্টম অধ্যায়

(ভ্রান্ত ধর্ম ও তার গ্রন্থসমূহ)

সূচী সমাপ্ত

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামে আকীদা-বিশ্বাস সহীহ করা ও সহীহ রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। যাদের আকীদা-বিশ্বাস সহীহ, তাঁরাই হকপন্থী। পক্ষান্তরে যাদের আকীদা-বিশ্বাস সহীহ নয়, তারা বাতিল বা ভ্রান্ত সম্প্রদায়। আর যারা হকপন্থী, তাঁরা জান্নাতী। পক্ষান্তরে যারা হকপন্থী নয়, তারা জাহান্নামী। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্নোক্ত হাদীছে হক্বপন্থী ও বাতিলপন্থীদের সম্পর্কে এরূপ তথ্য প্রদান করে বলা হয়েছে,

تفرقت اليهود على إحدى و سبعين فرقة أو اثنتين و سبعين فرقة والنصارى مثل ذلك و بفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وفي رواية كلهم فى النار إلا واحدة. قالوا : من هى يا رسول الله؟ قال ك ما أنا عليه وأصحابي. (رواه الترمذي)

অর্থাৎ, ইয়াহুদীরা একাত্তর/বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। এমনিভাবে নাসারাগণও। আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তার মধ্যে একদল ব্যতীত আর সকলে জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন (জাহান্নামে না যাওয়া অর্থাৎ, জান্নাতী) সেই দলটি কারা? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জওয়াবে বললেন, তারা হল ঐ দল, যারা আমার ও আমার সাহাবীদের মত ও পথের অনুসারী। (তিরমিযী)

এ হাদীছে হক্বপন্থী তথা মুক্তিপ্রাপ্ত ও জান্নাতী দলের পরিচয়ে বলা হয়েছে, ما أنا عليه وأصحابي অর্থাৎ, "যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের মত ও পথে থাকবে"। পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় "আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত"। এই "আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত" বহির্ভূত যাবতীয় দল হল বাতিল সম্প্রদায়-ভুক্ত।

সূতরাং হকপন্থী ও জান্নাতী দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ও থাকার জন্য যেমন ইসলামের সহীহ আকীদা-বিশ্বাস তথা "আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত"- এর আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অবগতি লাভ করা ও তার অনুসারী হওয়া প্রয়োজন, তেমনি বাতিল সম্প্রদা-য়র আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অবগতি লাভপূর্বক তা থেকে বিরত থাকাও প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনকে সামনে রেখেই "সহীহ আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" নামক বক্ষমান গ্রন্থ রচনার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে কুরআন- হাদীছের দলীল-প্রমাণসহ "আহ্-লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত"-এর সহীহ আকীদা-বিশ্বাস বর্ণনা করার পাশাপাশি

বিভিন্ন প্রসিদ্ধ বাতিল সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাস এবং বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ভ্রান্ত মতবাদের চিন্তাধারাগুলো তুলে ধরে কুরআন-হাদীছের আলোকে সেগুলোর খণ্ডনও পেশ করা হয়েছে।

এ গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু কথা

"ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" নামক বক্ষমান গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে আকাইদ ও তার আনুষঙ্গিক শাস্ত্র– ইল্‌মে কালাম সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বাতিল ফিরকা বা ভ্রান্ত দল ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা-পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে।

এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

১. ইসলামের যাবতীয় সহীহ আকীদা-বিশ্বাস সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

২. আধুনিক যুগে সৃষ্ট যে সব বিষয়ের আকীদা সম্বন্ধে প্রাচীন আকাইদের কিতাবে বিবরণ পাওয়া যায় না, এ গ্রন্থে সেসব বিষয়ের আকীদার বিবরণ সন্নিবেশিত করা রয়েছে।

৩. আকাইদ বিষয়ক আলোচনা ইল্‌মে কালামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইল্‌মে কালাম সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে।

৩. দেশী-বিদেশী ও নতুন-পুরাতন সব ধরনের প্রসিদ্ধ বাতিল ফিরকার আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা পূর্বক কুরআন-হাদীছের আলোকে তার খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।

৪. রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক সব ধরনের বাতিল মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৫. দেশীয় বিভিন্ন বাতিল এবং ভণ্ড পীরের ভ্রান্ত মতবাদ ও ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

৬. ইয়াহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম ও তার ধর্মীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে পর্যালোচনা ও তুলনামূলক আলোচনা-পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে।

এ গ্রন্থের বর্ণনাভঙ্গি নিম্নরূপ:

১. বর্ণনাভঙ্গি ভাষার সমাহার ও সাহিত্যের চাণক্য থেকে মুক্ত সহজ এবং সাবলীল রাখা হয়েছে। যাতে পাঠকদের মেধা ভাষা ও সাহিত্যের বেড়াজালে পড়ে মূল তথ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে না পড়ে।

২. গ্রন্থখানি ছাত্র ও সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণী নির্বিশেষে সকলেরই উপযোগী করে তোলার স্বার্থে ক্লাসিক্যাল বর্ণনার ধাচও কিছুটা রক্ষা করা হয়েছে। এ জন্য আলোচনাকে রাখা হয়েছে আবেগমুক্ত ও বর্ণনামূলক।

৩. গ্রন্থের কলেবর যেন খুব বেশি বৃদ্ধি না পায় সেজন্য ১ম খণ্ডে বর্ণিত কোন আকীদার বিষয়ে কোন বাতিল ফিরকার ভিন্ন মত থাকলে প্রায়শই তা উল্লেখ করা হয়নি। ২য় খণ্ডে সংশ্লিষ্ট বাতিল ফিরকার আলোচনা প্রসঙ্গে তা বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ

স্থানে ১ম খণ্ডে ইবারতে বা টীকায় সেদিকে ইংগিত করে দেয়া হয়েছে।
গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেশের বেশ কয়েকজন প্রসিদ্ধ আলেম ও মুহাদ্দিছকে দেখিয়ে যাচাই-বাছাই করানো হয়েছে এবং তাঁদের মাশওয়ারা মোতাবেক বহু স্থানে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনা হয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন হযরত মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ সাহেব, হযরত মাওলানা নূর হোছাইন কাছেমী সাহেব, হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাছান সাহেব ও হযরত মাওলানা আবূ সাবের আব্দুল্লাহ সাহেব। বন্ধুবর মাওলানা আবূ সাবের গভীর মনোযোগ সহকারে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠপূর্বক বহুস্থানে আমাকে খুটিনাটি অনেক সংশোধনী আনার পরামর্শ দিয়েছেন এবং সেমতে তা করা হয়েছে। এসত্ত্বেও যদি কোন মুহাক্কিক আলেমের দৃষ্টিতে কোন বিষয়ে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে আমাদেরকে তা অবহিত করার অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধনী পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থখানিকে আমাদের সকলের সঠিক পথ প্রাপ্তির ও নাজাতের ওছীলা করুন। আমীন!

বিনীত
মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

১ম খণ্ড

ইসলামী আকীদা

(ইল্‌মে কালাম ও আকাইদ বিষয়ক)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله الذي هدانا إلى صراط النبيين والصديقين و المشهداء و الصالحين، وأوضح لنا سُبُلَ الضآلّين و المُضِلّين، والصلاة والسلام على رسوله الذي تركنا على الملة البيضاء و بشّر مُتَّبِعِيها بأن يكونوا منصورين، وهم الذين لا يخافون في الله لومةَ لآئمين، وعلى اٰله و أصحابه المُتَمَسِّكِين بسنة النبي الأ مين، وهم مِعْيَارُ الحق والدين. أما بعد!

প্রথম অধ্যায়
(ইল্‌মে কালাম বিষয়ক)

"ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" গ্রন্থখানি আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা-বিশ্বাস ও এসব আকীদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত বাতিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য রচিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে আকীদা-বিশ্বাস এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বাতিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

ইল্‌মে কালামে ঈমান-আকাইদ বিষয়ক কথা দলীল সহকারে বর্ণিত হয়ে থাকে। এ হিসাবে ইলমে কালামের সঙ্গে ঈমান-আকাইদ বিষয়ক কথার সম্পর্ক রয়েছে। তাই ঈমান ও আকাইদ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে ইল্‌মে কালাম ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি প্রসঙ্গে আলোচনা করা আবশ্যক। সেমতে প্রথম অধ্যায়ে ইল্‌মে কালাম ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

ইল্‌মুল কালাম-এর সংজ্ঞা (تعريف علم الكلام)

* ইল্‌মুল কালাম ঐ বিদ্যাকে বলে, যার দ্বারা দ্বীনের আকীদাসমূহকে যুক্তি ও দলীল-প্রমাণ দ্বারা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিতকরণ এবং আকীদা সংক্রান্ত বিরোধী মতবাদের প্রতিবাদ ও খণ্ডন করা যায়।[১]

* আল-ফারাবীর বর্ণনামতে ইল্‌মুল কালাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐ শাখাকে বলে, যা মানুষের মধ্যে শরীআতে বর্ণিত আকীদাসমূহকে সত্য বলে প্রমাণ করা এবং তার বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারার মত যোগ্যতা প্রদান করে।[২]

---
১. المواقف ২. إحصاء العلوم

* আবদুন্নবী এর সংজ্ঞায় বলেছেন, ইল্‌মে কালাম এমন এক ইল্‌ম, যাতে মাবদা(مبدأ/প্রারম্ভ) ও মাআদ (معاد/প্রত্যাবর্তন) সম্পর্কে ইসলামী বিধানের আলোকে আলোচনা করা হয়।[১]

* "শরহে আকাইদ" গ্রন্থে বর্ণিত আল্লামা তাফ্‌তাযানীর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় ইল্‌মে কালাম এমন এক ইল্‌ম, যা দলীল-প্রমাণ দ্বারা আকাইদ-এর পরিচয় প্রদান করে থাকে। তিনি বলেন, আহকামে শরইয়্যা দুই প্রকার:–

১. যার সম্পর্ক আমলের সাথে। এটাকে ফরইয়্যা (فرعيه) এবং আমালিয়্যা (عمليه) বলা হয় এবং এ সংক্রান্ত ইল্‌মকে "ইল্‌মুশ্‌ শারাইয়ে ওয়াল আহকাম" (علم الشرائع والأ حكام) বলা হয়।

২. যার সম্পর্ক আকাইদের সাথে, এটাকে ইল্‌মুত তাওহীদ ওয়াস্‌সিফাত (علم التوحيد والصفات) বলা হয়। অতঃপর বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ প্রথমোক্ত ইল্‌মের আলোচনা যাতে আছে, তাকে বলা হয় ফিক্‌হ এবং বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ আকাইদ-এর আলোচনা যাতে আছে, তাকে বলা হয় ইল্‌মে কালাম।

এ বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যে, ইল্‌মে কালাম এ'তেকাদ সম্পর্কিত বিষয়সমূহের সংরক্ষণের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে, অন্যদিকে ইল্‌মে ফিক্‌হ আ'মল সংক্রান্ত বিষয়সমূহ এবং বাহ্যিক আহকামের জন্য রচিত হয়েছে।[২]

নামকরণের রহস্য (وجه التسمية)

ইল্‌মুল-কালামকে "কালাম" নামকরণের অনেক কারণ বা রহস্য বর্ণনা করা হয়। যথা:

১. আল্লামা শাহরাসতানী লিখেছেন, এই ইল্‌মকে 'কালাম' বলার উদ্দেশ্য হয়তো এটা ছিল যে, আকীদার বিষয়সমূহের মধ্যে যে বিষয়ে অধিক আলোচনা ও বাকবিতণ্ডা হতে থাকে তা ছিল আল্লাহ্‌র কালাম। অথবা

২. এ কারণে যে, এই ইল্‌ম দর্শনের মুকাবিলায় সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং দর্শনের একটা শাখা মানতিক (منطق/যুক্তিবিদ্যা)–এর যে নাম ছিল, এটারও সেই নাম রাখা হয়েছে (মান্‌তিক ও কালাম হল সমার্থক শব্দ)।[৩] এ ছাড়াও উলামায়ে কেরাম "কালাম" নামকরণের আরও বহুবিধ রহস্য বর্ণনা করেছেন।[৪]

---

১. دستور العلماء

২. منطق دستور العلماء، عبد النبي

৩. الملل و النحل/١٨

৪. যেমন:

১. ইব্‌নে খাল্লিকান মুহাম্মাদ আল-হুসাইন মু'তাযিলীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, যেহেতু সর্বপ্রথম আকাইদ সম্পর্কিত মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল আল্লাহ্‌র কালামকে নিয়ে, সেহেতু ইল্‌মে আকাইদের নাম "আল-কালাম" হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

২. অন্য একমতে এই ইল্‌ম শরীআত সম্পর্কে কালাম বা আলোচনা করার ক্ষমতা প্রদান করে থাকেবলে এটাকে ইল্‌মে কালাম বলা হয়। কালাম শব্দের অর্থ হল কথা বলা। অথবা (পরবর্তি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

"ইল্‌মুল-কালাম" পরিভাষাটির সর্বপ্রথম ব্যবহার

আহমাদ আমীন[১]-এর মতে এ নাম সর্বপ্রথম আব্বাসী যুগে, সম্ভবত আল-মামূনের শাসনামলে প্রবর্তিত হয় এবং এ নাম মুতাযিলীদের সৃষ্ট। এর পূর্বে এ'তেকাদ সংক্রান্ত বিষয়সমূহের কানূনের জন্য আল-ফিক্‌হ ফিদ্‌দীন (الفقه فى الدين) শব্দ ব্যবহার করা হত। যেমন কানূনের জন্য "আল-ফিক্‌হ ফিল-ইল্‌ম" (الفقه فى العلم) প্রচিলত ছিল। আল্লামা শাহরাস্তানী[২] এ বর্ণনার সমর্থন করেছেন। শিবলী নূ'মানী লিখেছেন, "অবশ্য তখন পর্যন্ত (আব্বাসী খলীফা মাহ্‌দীর যুগে) এটা ইল্‌মুল কালাম নামে অভিহিত হয়নি। মামূনুর রশীদের যুগে যখন মু'তাযিলীগণ দর্শনে দক্ষতা লাভ করেন এবং দার্শনিক মনোবৃত্তি নিয়ে এই শাস্ত্রের গ্রন্থাদি রচনা করেন, তখন তারা এর নাম রাখেন ইল্‌মুল-কালাম।"[৩]

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা)

৩. এ নামকরণের রহস্য হল প্রথম প্রথম এই ইল্‌মের রচনাবলীতে অধ্যায়সমূহের শিরোনাম "আল-কালাম ফী কাযা ওয়া কাযা"(اللام فى كذا وكذا) লিখিত হত বলে পরবর্তীকালে গোটা ইল্‌মকে ইল্‌মুল-কালাম নামে অভিহিত করা হয়। (كشاف اصطلاحات الفنون)

৪. ইব্‌নে খাল্‌দূনের মতে এই ইল্‌মের নাম ইল্‌মুল-কালাম এ কারণে রাখা হয়েছে যে, এতে বিদআত-পন্থীদের সাথে আকাইদ বিষয়ে মুনাজারা (তর্ক–বিতর্ক) স্থান পেয়েছে। এখানে "কালাম" কথাটি মুনাজারা বা তর্ক-বিতর্ক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্‌ এ নামকরণের রহস্য এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ইল্‌মে কালামের ভিত্তি হল যুক্তিনির্ভর প্রমাণ। ফলে মুতাকাল্লিম (বক্তা)-এর কথা বলার সময় এটার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং তাঁর বক্তব্যে তার প্রকাশ ঘটে। বক্তব্যের পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল পেশ করার সুযোগ তেমন মিলে না, বরং যুক্তিনির্ভর প্রমাণাদির মাধ্যমে দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো ইল্‌মুল-কালামে বর্ণিত হয় বলে মানতিক বা যুক্তিবিদ্যা (علم المنطق/علم النطق)-এর সাথে এর সাদৃশ্য বিদ্যমান। সুতরাং এখানে মানতিক-এর পরিবর্তে কালাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যেন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বজায় থাকে। (رسالت التوحيد)

৬. উপরোক্ত কারণসমূহ ছাড়া শরহে আকাইদ গ্রন্থে আল্লামা তাফ্‌তাযানী বর্ণিত কারণসমূহের মধ্যে আরও রয়েছে– এই ইল্‌মকে কালাম বলার কারণ হল কালাম বা কথার মাধ্যমে যে ইল্‌ম প্রথমেই শিক্ষা প্রদান ও গ্রহণ করা ওয়াজিব তা হল ইল্‌মে কালাম।

৭. এই ইল্‌মের দলীলসমূহ শক্তিশালী হওয়ার কারণে এই ইল্‌মই যেন কালাম বা কথা, অন্যটা যেন কালাম বা কথাই নয়। যেমন দুটো কথার মধ্যে দলীল-প্রমাণে অধিক শক্তিশালী কথা সম্বন্ধে বলা হয় কালাম বা কথা তো এটাই।

৮. এই ইল্‌ম কুরআন-হাদীছের দলীলাদি সমর্থিত নিশ্চিত দলীলসমূহের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় মনের উপর এর প্রভাব বেশি হয় বলে এর নামকরণ করা হয়েছে ইল্‌মে কালাম। কারণ "কালাম/کلام" শব্দে প্রভাব থাকার ভাবার্থ রয়েছে। কালাম শব্দের মূল অর্থ হল জখম বা আহত করা। (شرح العقائد النسفيه)

(চলমান পৃষ্ঠার টীকা)

১. দুহাল-ইসলাম, ৩খ, ৯

২. الملل و النحل صفحه/١٨

৩. علم الكلام صفحه/٣٥

ইল্‌মুল-কালামের আরও বিভিন্ন নাম

১. ইল্‌মু উসূলিদ্দীন (علم أصول الدين) ।
২. 'ইল্‌মুন-নাজর ওয়াল-ইস্তিদ্‌লাল (علم النظر والاستدلال)।
৩. ইল্‌মুত-তাওহীদ ওয়াস্-সিফাত (علم التوحيد و الصفات)।

ইল্‌মুল-কালামের বিষয়বস্তু (موضوع علم الكلام)

* কাজী আরমাবী (ارموى) বলেন, ইল্‌মুল-কালামের বিষয়বস্তু হল আল্লাহ্ তাআল-ার সত্তা (ذات), তাঁর সত্তা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ, তাঁর গুণাবলী (صفات) এবং তাঁর কার্যাব-লী (افعال) যার সম্পর্ক এই জগতের সাথে হোক বা ইহকাল ও পরকালে তাঁর আহ্‌কা-মর সাথে (যেমন রসূল প্রেরণ এবং পরকালের পুরস্কার ও শাস্তি)।

* ইল্‌মুল-কালামের বিষয়বস্তুর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, দ্বীনী আকীদাসমূহের প্রমাণ এর সাথে সম্পৃক্ত।[১]

* এও বলা হয়েছে যে, ইল্‌মে কালামের বিষয়বস্তু হল الموجود من حيث هو موجود (আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের বিদ্যমানতা)। দস্তুরুল-উলামা গ্রন্থের বর্ণনামতে সৃষ্টির অনিত্যতার প্রমাণ, পুনরুত্থানের সত্যতা, স্রষ্টার একত্ব অথবা এমন সব বিষয় যার উপর আকাইদ নির্ভরশীল, যেমন جواہر مفردہ বা মৌলিক পদার্থসমূহ দ্বারা দেহের গঠন, মহাশূন্য (خلاء)-এর বিদ্যমানতা ইত্যাদি– এগুলো সবই ইল্‌মুল কালামের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

ইল্‌মে কালামের উদ্দেশ্য (غرض علم الكلام)

* চিন্তাবিদগণ বলেন যে, ইল্‌মুল কালামের একমাত্র উদ্দেশ্য হল অস্বীকারকারীদেরকে দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে নিরুত্তর করা এবং বিরুদ্ধবাদীদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা। বাস্তব সত্য হল– মুতাকাল্লিমদের আকাইদ ও চিন্তার উৎস হল নবুওয়াত অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রাপ্ত ইল্‌ম, অন্য কিছু নয়।[২]

* কেউ কেউ এভাবে বলেছেন যে, ইল্‌মুল-কালামের উদ্দেশ্য হল বিদআতপন্থীদের বিদআতের বিরুদ্ধে আহ্‌লুস্-সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার অকৃত্রিমতা রক্ষা করা। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, ইল্‌মে কালামের আলোচনাধীন আকাইদ দ্বারা সেই আকাইদকে বোঝানো হয়েছে যার সম্পর্ক দ্বীনের সাথে। এতে দ্বীন সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাও আলোচিত হয়। সেমতে ইল্‌মে কালামে বাতিল ফিরকাসমূহের আকাইদ সংক্রান্ত আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ইল্‌মে কালামে দ্বীনের সঠিক আকীদাসমূহ প্রমাণ করার সাথে সাথে বাতিল আকীদাসমূহের উল্লেখ এবং তার খণ্ডনও করা হয়ে থাকে।

---

১. شرح المواقف
২. دستور العلماء لعبد النبى

* কেউ কেউ এভাবে বলেছেন, "এই ইল্‌মের উদ্দেশ্য হল উভয় জগতের কল্যাণ অর্জন করা।" এই ইবারত দ্বারা সম্ভবত বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, এই ইল্‌মের মাধ্যমে সহীহ আকাইদের সংরক্ষণ হবে এবং সহীহ দ্বীনের উপর টিকে থাকা সম্ভব হবে, আর এভাবে উভয় জগতের কল্যাণ অর্জন হবে।

এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাধারণত মনে করা হয় মুতাকাল্লিম-গণের সকলেই আক্‌ল (বুদ্ধি)-এর প্রাধান্যের প্রবক্তা ছিলেন। এটা ঠিক নয়। তাঁদের মধ্যে কতক ব্যক্তি নিঃসন্দেহে এরূপ ছিলেন, যেমন মুতাযিলীদের কোন কোন দল, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ইল্‌মে কালামের উলামায়ে কেরাম কুরআন এবং হাদীছকে প্রথম স্থান প্রদান করে আকাইদকে যুক্তিনির্ভর দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণ করতেন।

ইল্‌মে কালামে ব্যবহৃত কতিপয় পরিভাষা

- عین/جوہر : (essence, matter) মূল উপাদান। অর্থাৎ, অনিত্য যা কিছু স্থান অধিকার করে থাকে এবং যা ইন্দ্রীয়ের সাহায্যে অনুভূত হয়ে থাকে। جوہر আপনা আপনি পাওয়া যায়। যেমন: গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, বিভিন্ন প্রাণী, আসমান-যমীন প্রভৃতি। جوهر কে عین ও বলা হয়। جوہر-এর বহুবচন جواہر এবং عین-এর বহুবচন اعیان।
- عرض: (accident) جوہر -এর বিপরীত। অর্থ আপতন অর্থাৎ, অপ্রধান বিষয়, যা আপনা আপনি স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায় না বরং অন্য কিছুর আশ্রয়ে পাওয়া যায়। যেমন সাদা কাল ইত্যাদি রং শরীর বা কাপড়ের আশ্রয়ে পাওয়া যায়।
- مادة/هيولى : (primordial) matter আদি পদার্থ, মূল পদার্থ, মূল জড়বস্তু ।
- جوہر فرد/الجزء الذي لا يتجزى (atom) অবিভাজ্য অণু, পরমাণু ।
- قدیم : (everlasting) অনাদি, নিত্য ।
- حادث : قدیم -এর বিপরীত, অনিত্য, পরবর্তীতে সৃষ্ট।
- ازلى : (everlasting) অনাদি।
- ابدى : (never-ending) অনন্ত।
- متكلم : কালাম শাস্ত্রবিদ। এর বহুবচন متكلمين/متكلمون।
- عین ذات : হুবহু সত্তা।
- غیر ذات: সত্তা-ভিন্ন।
- مخلوق : সৃষ্ট। আর যা সৃষ্ট তা-ই অনিত্য।
- غیر مخلوق: অসৃষ্ট। আর যা অসৃষ্ট তা-ই নিত্য।
- اشاعرہ/اشعریہ : "আশাইরা" মতবাদটি ইমাম আবুল হাসান আলী ইব্‌নে ইসমাঈল আল-আশআরী-এর দিকে সম্পৃক্ত। তাঁর মতবাদ আশআরিয়্যা (اشعریہ) মতবাদ নামে আখ্যায়িত। আকাইদের ক্ষেত্রে যারা ইমাম আবুল হাসান আশ্‌আরীর অনুসারী তাদেরকে বলা হয় আশ্‌আরী/আশআরিয়্যা/আশাইরা।

• ماتريدية : মাতুরীদিয়্যা মতবাদটি ইমাম আবূ মানসূর মুহাম্মাদ ইব্নে আহমাদ আল-মাতুরীদী-এর দিকে সম্পৃক্ত। তাঁর মতবাদ মাতুরীদিয়্যা (ماتريدية) মতবাদ নামে আখ্যায়িত। যারা আকীদাগত বিষয়ে ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী-র অনুসারী, তাদেরকে বলা হয় মাতুরীদী।

• أهل السنة والجماعة : ইল্মে কালামের পরিভাষায় "আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত" বলতে আশাইরা ও মাতুরীদিয়্যাদেরকে বোঝানো হয়।

ইল্মে কালামের প্রয়োজন ও গুরুত্ব (ضرورة علم الكلام وأهميته)

ইল্মে কালামের গুরুত্ব থাকা না থাকার ব্যাপারে মধ্যপন্থা ছাড়াও দুটো প্রান্তিক মত দেখা যায়। কেউ কেউ অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করে এটাকে হারাম এবং বিদআত বলেছেন, আবার কেউ কেউ এটাকে ফরযে কিফায়া অথবা ফরযে আইন এবং সর্বোত্তম ইবাদত বলে অভিহিত করেছেন। কেননা, এটা হল তাওহীদের প্রমাণ এবং আল্লাহর দ্বীনকে রক্ষা করার নাম।[১] এই দুই ধরনের প্রান্তিকতার মাঝামাঝি হল ইমাম গাযালীর মত। তার মতে এই ইল্মে ক্ষতির দিকও রয়েছে এবং উপকারের দিকও রয়েছে।

মুল্লা আলী ক্বারী (রহ.) ইল্মে কালামের গুরুত্ব এভাবে বর্ণনা করেছেন, জানা দরকার যে, ইল্মুত্-তাওহীদ হল সর্বশ্রেষ্ঠ ইল্ম এই শর্তে যে, এটা কিতাব, সুন্নাত এবং ইজ্মা বহির্ভূত হবে না এবং তাতে কেবল যুক্তিনির্ভর দলীলসমূহের সমাবেশ ঘটবে না, যেমন বিদআতপন্থীগণ করে থাকেন এবং তারা সে পথ পরিহার করেছেন যার উপর আহ্লুস-সুন্নাত ওয়াল জামাআত প্রতিষ্ঠিত আছেন। মুল্লা আলী ক্বারী (রহ.) ইল্মে কালামকে দ্বীনের মৌলিক বিষয় (اصول دين) গণ্য করে লেখেন যে, এ সেই ইল্ম, যাতে এমন বিষয়ের আলোচনা করা হয় যেগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক।[২]

ইল্মে কালাম দ্বীনের আকীদাসমূহের পক্ষে প্রমাণাদি সংগ্রহ করে থাকে এবং এভাবে ঈমানের ভিত্তির হেফাজত করে থাকে। অনুরূপভাবে এ শাস্ত্র সর্বপ্রথম দ্বীনী আকীদা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী এবং তার অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

আল্লামা তাফতাযানী কালাম নামে অভিহিত ইল্মুত-তাওহীদ ওয়াস-সিফাতকে ইল্মুশ-শারাইয়ে ওয়াল-আহকাম (علم الشرائع والأحكام) এবং কাওয়াইদু আকাইদিল-ইসলাম (قواعد عقائد الإسلام)-এর ভিত্তি বলে আখ্যায়িত করে বলেন যে, ইল্মুল-কালাম হল সন্দেহ-সংশয় এবং বাতিল আকীদাসমূহের সমস্যা থেকে পরিত্রাণ দানকারী। মোটকথা ইল্মে কালাম হল যাবতীয় ইল্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দ্বীনী ইল্মসমূহের অন্যতম। এ শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক

১. এই উভয় পক্ষ তাদের মতের স্বপক্ষে দলীলাদিও উপস্থাপন করেছেন। তাদের দলীলসমূহের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. شرح الفقه الأكبر

২. شرح الفقه الأكبر

ইল্মে কালামের সমালোচনা প্রসঙ্গ ও তার নিরসন

এখানে একটা প্রশ্ন দেখা দেয় যে, যদি প্রকৃতপক্ষে ইল্মে-কালাম এতই উচ্চ স্তরের ইল্ম হয়ে থাকবে, তাহলে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের মধ্যে অনেকে এটার বিরোধিতা করেছেন কেন? যেমন: সালাফে সালিহীন (অতীতের জ্ঞানী পুণ্যবান ব্যক্তিগণ)-এর মধ্যে বিশেষ করে ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমদ ইব্নে হাম্বল, কাজী আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম সুফয়ান ছাওরী (রহ.) প্রমুখ থেকে ইল্মে কালামের সমালোচনামূলক উক্তিও পাওয়া যায়। ইব্নে তাইমিয়্যাও ইল্মে কালাম-এর কিছু বিষয়কে ভ্রান্ত বলে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাঁর মতে সেগুলো দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর। মুহাদ্দিছীনে কেরাম থেকে সাধারণভাবে বর্ণিত আছে, যখন তোমরা কাউকে জাওহার, (جوہر) আরদ, (عرض) মাদ্দা (مادة) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে শুনবে তখন তাকে পথভ্রষ্ট জ্ঞান করবে।

ইল্মে কালাম সম্পর্কে উপরোক্ত মতামতের উত্তর হল– যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইল্মে কালামের উদ্ভব হয়েছিল এবং তাতে যেসব বিষয় ও পরিভাষা সংযোজিত হয়েছিল তাতে ইল্মে কালামের এরূপ কিছু সমালোচনা হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তদুপরি প্রথম শতাব্দীর দিকে আলেমগণ এক এক বিষয়ে অভিজ্ঞ হতেন। ব্যাকরণ বিষয়ের ইমামগণ ফিকহ্‌শাস্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতেন না। ফাকীহগণের হাদীছের সাথে সম্পর্ক ছিল কম। ইল্মে কালামের উদ্ভব হলে তাতে দর্শনের অসংখ্য পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। মুহাদ্দিছীনে কেরাম উক্ত পরিভাষাসমূহ শ্রবণ করে দর্শন ও কালামের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেননি এবং যেহেতু তাঁরা প্রথম থেকেই গ্রীক দর্শন (فلسفۂ یونانی) কে খারাপ জানতেন, তাই ইল্মে কালামকেও তারা অনুরূপ মনে করে বসেন। তাছাড়া শেষ দিকে ইল্মে কালামের মধ্যে দর্শন শাস্ত্রের তাবইয়্যাত (طبعيات/প্রকৃতি বিজ্ঞান), ইলাহিয়্যাত (الہیات/খোদাতত্ত্ব বিজ্ঞান) ইত্যাদি বিষয় এত বেশি পরিমাণ ঢোকানো হয় যে, দর্শন আর ইল্মে কালামকে পৃথক করা কঠিন হয়ে পড়ে। দর্শনের রিয়াযিয়্যাত (رياضيات/গণিত শাস্ত্র) নিয়েই খুব বেশি চর্চা করা হতে থাকে। এরূপ বিবিধ কারণেই ইল্মে কালাম সম্পর্কে অনেকের বিরূপ মন্তব্য এসে গিয়েছে।

ইল্মে কালাম ও ইলাহিয়্যাতের মধ্যে পার্থক্য

যেহেতু বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ইল্মে ইলাহিয়্যাত (علم الہیات) ও ইল্মে কালাম (علم کلام)-এর মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। তাই ইল্মে কালাম ও ইল্মে ইলাহিয়্যাত-এর মধ্যকার পার্থক্য সম্বন্ধে কিছু অবগতি থাকা প্রয়োজন।

ইল্মে কালাম ইল্মে ইলাহী থেকে অনেকাংশে পৃথক ও ভিন্ন এভাবে যে, ইল্মে কালামে মাসাইল ও আকাইদ সম্পর্কে ইসলামী পদ্ধতিতে অর্থাৎ, কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে বুদ্ধিগত জ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করা হয় এবং কেবলমাত্র উপায় অথবা মাধ্যম হিসাবে ইল্মে কালামকে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে ইলাহিয়্যাত-এর ক্ষেত্রে আলোচ-

না মূলত হয়ে থাকে বুদ্ধিগত ও জ্ঞানলব্ধ নিয়ম-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে, সেটা ইসলাম সম্মত কিংবা ইসলাম বিরোধী হতে পারে।[১]

উপরোক্ত মত সাধারণ ইলাহিয়্যাত–এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইসলামী ইলাহিয়্যাত–এর ক্ষেত্রে কালামের ন্যায় এর প্রতিও লক্ষ করা হয় যেন কোন সিদ্ধান্ত ইসলামের চূড়ান্ত আকীদা (যা কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত)-এর পরিপন্থী না হয়, অবশ্য তাবীল (ব্যাখ্যা)-এর অবকাশ থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ইলাহিয়্যাতের ক্ষেত্র কালামের আলোচনা থেকে অধিক প্রশস্ত। কালাম হল ঈমানী আকীদাসমূহ প্রমাণের নাম এবং ইলাহিয়্যাত সাধারণ রহস্যাবলী অনুধাবনের নাম। এও এক পার্থক্য যে, কালামের প্রাথমিক ভিত্তি হল কুরআন-হাদীছ এবং ইলাহিয়্যাত–এর ভিত্তি হল জ্ঞান-বুদ্ধি।

ইল্‌মে কালামের প্রকার (أقسام علم الكلام)

ইল্‌মে কালামকে মাসাইল এবং আকাইদের বর্ণনা হিসাবে স্পষ্ট দুটো ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা:–

১. সে ইল্‌মে কালাম, যা বিশেষভাবে ইসলামী দলসমূহের পারস্পরিক রাজনৈতিক অথবা ই'তিকাদগত বিবাদের দরুন সৃষ্টি হয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই মতপার্থক্যের করণেই পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত এবং বিরাট বিরাট বিপর্যয় সংঘটিত হয়; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন কোন এক দলের পক্ষ অবলম্বন করায় অন্য দলের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন পর্যন্ত বৈধ রাখা হয় (যেমন: মামূনুর রশীদের আমলে মুতাযিলীদের পক্ষ অবলম্বন।)।

২. সেই ইল্‌মে কালাম যা দর্শনের মোকাবিলায় সৃষ্টি হয়েছে।

মুতাকাদ্দিমীন (প্রাচীন আলিমগণ)-এর নিকট এ ছিল দুটো পৃথক ইল্‌ম। কিন্তু ইমাম গাযালী (রহ.) ফালসাফা এবং কালামের মধ্যে পারস্পরিক মিশ্রণ ও মিলনের ভিত্তি রচনা করেন। ইমাম রাযী (রহ.) সেটার উন্নতি সাধন করেন এবং পরবর্তীকালের আলেমগণ (মুতাআখ্‌খিরীন) সেটাকে এতদূর মিশ্রিতরূপে আলোচনা করেন যে, শিবলী নু'মানীর ভাষায় ফালসাফা, কালাম, উসূলে আকাইদ সবকিছু একাকার হয়ে একটা মিশ্রিত রূপ পরিগ্রহ করে।[২]

এ সম্পর্কে ইব্‌নে খালদূন বর্ণনা করেন যে, প্রথম প্রথম ইল্‌মে কালামকে দার্শনিক রূপ প্রদান করা হয়নি। কেননা একদিকে মানুষের মধ্যে ফালসাফা বা দর্শনের চর্চা খুবই কম ছিল এবং যতটুকু চর্চা বিরাজমান ছিল তা থেকেও মুতাকাল্লিমীন (কালাম শাস্ত্রবিদগণ) এজন্য দূরে থাকতেন যে, তাঁরা সেটাকে শরীআতের আকীদার পরিপন্থী বলে মনে করতেন। অতঃপর যুক্তিনির্ভর প্রমাণ প্রয়োগ করা হতে থাকে এবং নতুন নতুন দলীল উপস্থাপন করা হতে থাকে। এটাই ছিল নতুন পদ্ধতি, যাকে মুতাআ-খ্‌খিরীন-এর পদ্ধতি বলা হত এবং যাতে নব নব পদ্ধতি ও প্রমাণের

---
১. شرح المواقف ২. علم الكلام

অবতারণা করা হয়েছে। যদিও তাতে স্থান বিশেষে দার্শনিকদের চিন্তাধারায় প্রত্যাখ্যান বিদ্যমান ছিল, তবুও মূতাআখ্‌খিরীন ইল্‌মে কালামকে এমন রূপ প্রদান করেছিলেন যে, কালাম এবং ফালসাফা (দর্শন)-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ উভয়টা পরস্পর মিলিত হয়ে যেন এক জিনিসে পরিণত হয়।[১]

আহমাদ আমীন[২] ইল্‌মে কালামের ব্যাপকতার দরুন তাকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং বলেছেন, এ ইল্‌ম কেবল দ্বীনী আকীদাসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে অন্তর্ভুক্ত করে না বরং তাতে আরও অনেক জিনিস ক্রমশ অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। যথা:–

১. ইলমে কালামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ইলাহিয়্যাত সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা। যেমন আল্লাহ, তাঁর সত্তা (ذات), তাঁর গুণাবলী (صفات) এবং কার্যাবলী (افعال) আম্বিয়া এবং রসূল ইত্যাদি। এই বিভাগকে আমরা সঠিক অর্থে ইল্‌মে কালাম বলতে পারি।

২. ইল্‌মে কালামের হিক্‌মিয়া বিভাগ, যার সম্পর্ক অধিকতর তাবাইয়্যাত (طبعيات/পদার্থ বিজ্ঞান) এবং কীমিয়া (کیمیا/রসায়ন)-এর সাথে, যেমন জাওহার (جوہر/মূল উপাদান), আরূদ (عرض/আপতন), অবিভাজ্য অণু (الجزء الذي لا يتجزى), গতি এবং স্থিতি (حرکت و سکون), বস্তুর বর্ণ, ঘ্রাণ, স্বাদ ইত্যাদি।

৩. ইল্‌মে কালামের রাজনৈতিক বিভাগ, যাকে দ্বীনীরূপ প্রদান করা হয়েছে। যেমন ইমাম কে হতে পারে, ইমামতের শর্তাবলী কী, আব্বাসী এবং উমাবী ইমাম হিসাবে কেমন ছিলেন এবং এ ধরনের নানা প্রশ্ন।

৪. ইল্‌মে কালামের আক্‌লী (যুক্তিগত) বিভাগ, ভাল ও মন্দ সম্পর্কে আলোচনা, মানবিক ইচ্ছা ও আকাংখার বিষয়, জ্ঞানগত উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা, ই'জাযুল কুরআন, ইজ্‌মা এবং কিয়াস ইত্যাদি।

ইল্‌মে কালামের সূচনা

ইল্‌মে কালামের সূচনা সম্পর্কে আবুল হাছান আশআরী (দ্রঃ المقالات الإسلاميين) থেকে শুরু করে আল্লামা তাফতাযানী পর্যন্ত এই বলেছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণের যুগ পর্যন্ত লোকেরা আকাইদ সংক্রান্ত ব্যাপারে সরাসরি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট থেকে জেনে নেয়ার কিংবা প্রত্যক্ষভাবে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ পাওয়ার দরুন নিশ্চিন্ত হতেন এবং খুব কমই মতানৈক্য প্রকাশ পেত। কিন্তু পরবর্তীকালে ফিত্‌না এবং অরাজকতা দেখা দিলে সন্দেহ ও আপত্তির সৃষ্টি হয়। এর কিছু রাজনৈ-তিক কারণ ছিল, কিন্তু অধিকাংশ মতানৈক্য ও মতভেদ এমন ছিল যা ভিন্ন ধর্মের লোক কিংবা তাদের মধ্য থেকে ইসলাম গ্রহণকারী লোক অথবা গ্রীক জ্ঞানসমূহের প্রচার এবং তার প্রভাবাধীন যুক্তিগত পদ্ধতির প্রাধান্যের কারণে সৃষ্টি হয়।

---
১. مقدمہ ابن خلدون ২. ظهور الإسلام ج/٤

তবে এটা মনে করা ঠিক নয় যে, মতানৈক্যের সৃষ্টি কোন অসাধারণ বা অস্বাভাবিক অবস্থা ছিল অথবা এটা কেবল মুসলমানদের ব্যাপারেই ঘটেছিল। প্রথমত এটা একটা স্বভাবজাত ব্যাপার যে, মানুষ সময়ে সময়ে তার ব্যক্তিগত চিন্তা প্রয়োগ করে থাকে এবং প্রতিটি বস্তুর ব্যাপারে তার নিজস্ব দৃষ্টিভংগীও ধার্য করে থাকে। সে এক চিন্তার উপর বিদ্যমান থাকতে পারে না। রাজনৈতিক অবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থান এবং বিভিন্ন জাতির আদর্শিক দ্বন্দ্বের শিকার হওয়ার পর চিন্তাধারায় আলোড়নের সৃষ্টি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়ত ইসলাম হল সমগ্র মানব জাতির দ্বীন, এটা পৃথিবীর সকল মত ও পথের মোকাবিলায় নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও কর্মপদ্ধতি পেশ করে। যার দরুন একটা সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। তখন সকল মাযহাব এবং দ্বীনের অনুসারীরা এর মোকাবি-লায় সংঘবদ্ধ হয় এবং নিজেদের চিন্তাধারার অনুকূলে ও তার প্রতিরোধ কল্পে সব রকমের অস্ত্র প্রয়োগ করে, যার ফলে অনেক সময় ইসলাম গ্রহণকারীগণও প্রভাবিত হয়ে পড়ে। মতবিরোধ প্রতিটি ধর্মে এবং প্রতিটি দর্শনে বিদ্যমান। তদ্রূপ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে মুসলমানদের মধ্যেও মতপার্থক্য দেখা যায়।

ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ ধরনের মতবিরোধ এবং বিতর্কের মোকাবিলা কীভাবে করেছেন এবং এত দ্বন্দ্ব ও কলহের মধ্যেও কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তির উপর উম্মতের ঐক্য কীরূপে সুদৃঢ় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, এ ব্যাপারে মূল বিষয় হল– আলেমগণ প্রকৃত পক্ষে মৌলিক বিষয়গুলোতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে মূল লক্ষ্যে স্থির রয়েছেন ও উম্মতকে সঠিক নেতৃত্ব প্রদান করেছেন।

এই একতাবদ্ধ রাখার কাজ ইলমে কালাম সম্পন্ন করেছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে, এই মোকাবিলার তিনটা ক্ষেত্র ছিল। যথা:–

১. অভ্যন্তরীণ, যাতে মুসলমানদের ভিতরে উদ্ভূত সন্দেহের অবসান করা হয়েছে। এটা ছিল বিভিন্ন মতবাদের ভিতরগত ব্যাপার।
২. ভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের অনুপ্রবেশের ফলে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে। এটা ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের তুলনাসমূলক বিচারের ক্ষেত্র।
৩. গ্রীক চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের মোকাবিলা। এটাকে যুক্তিগত ক্ষেত্র বলা যেতে পারে। যদিও অনেকের ক্ষেত্রে ইল্‌মে কালাম নতুন বিপর্যয়ের কারণও হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ইল্‌মে কালাম সত্য দ্বীনের বাস্তবতা প্রমাণ করার এবং তার বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছে।

ইল্‌মে কালাম কেবল মুসলমানগণই সৃষ্টি করেছেন। কার্যত ইল্‌মে কালামে সেই সকল উপকরণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে যা দ্বীনী এ'তেকাদ (বিশ্বাস)সমূহ প্রমাণের জন্য আবশ্যক ছিল। যেমন: সৃষ্টির শুরু এবং বিশ্ব জগতের সৃষ্টি সংক্রান্ত ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় যুক্তিনির্ভর প্রমাণসমূহকে যথারীতি একটি পদ্ধতিতে এই শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয় এবং পরবর্তী আলেমগণ দর্শন ও তাসাওউ-ফের সাথে ইল্‌মে কালামের আলোচ্য বিষয়গুলোর সমন্বয় সাধন করতে প্রয়াস পান।

তবে দর্শন ও তাসাওউফের স্বকীয়তা বজায় থাকে এবং মৌলিক দ্বীনী দৃষ্টিভংগীর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে।[১]

ইল্‌মে কালামের বহুল আলোচিত বিষয়সমূহ

ইল্‌মে কালামে যে সব বিষয়ে আলোচনা বেশি দেখা যায় তা হল:

১. আল্লাহ্র যাত (সত্তা) সিফাত (গুণাবলী), আদ্‌ল (ন্যায় বিচার) এবং তাওহীদ (একত্ববাদ)-এর প্রসঙ্গ।
২. আল্লাহ্র দর্শন প্রসঙ্গ।
৩. কুরআন মাখ্‌লূক (সৃষ্ট) না গায়রে মাখ্‌লূক (অসৃষ্ট)– এ প্রসঙ্গ।
৪. জাব্‌র (অদৃষ্টবাদ) এবং ইখ্‌তিয়ার (ইচ্ছার স্বাধীনতা) প্রসঙ্গ।
৫. কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির অবস্থা এবং কুফ্‌র-এর সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ (এবং মানযিলাতুন বায়নাল মানযিলাতায়ন [المنزلة بين المنز لمنز لتين] প্রসঙ্গ)।
৬. আম্‌র বিল মা'রূফ (ভাল কাজের কথা বলা) এবং নাহী আনিল মুনকার (মন্দ কাজ থেকে বারণ) প্রসঙ্গ।
৭. নবুওয়াতের উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব প্রসঙ্গ।
৮. ইমামত এবং খিলাফতের মাসআলা।

ইল্‌মে কালামের বহুল আলোচিত এ বিষয়সমূহের কিছু তো রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের দরুন সৃষ্টি হয়েছিল এবং কিছু কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ (আয়াতে মুতাশাবিহাত) থেকে এবং কিছু গ্রীক দর্শনের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণ পাঠকদের নিকট এ সকল আলোচনা গৌণ এবং গুরুত্বহীন বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার অনেক কুফল অবশেষে দ্বীনের বিধানের উপর আপতিত হয়। এ কারণে মুহাদ্দিছীনে কেরাম, ফুকাহায়ে কেরাম এবং পরবর্তীকালে আশআরীদেককে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। অন্যথায় দ্বীনের আকীদাসমূহ, আল্লাহ্র যাত, নবুওয়াত ও রিসালাত, কুরআন আল্লাহ্র কালাম হওয়া এবং আমল ও প্রতিদানের বিষয় এবং অনুরূপ মৌলিক বিষয়সমূহে বিশৃংখলা দেখা দেয়ার আশংকা ছিল। তার প্রভাবে সামাজিক ও নৈতিক নিয়ম-কানূন এবং ইবাদত ও এ'তেকাদ ব্যবস্থাপনায়ও ত্রুতি-বিচ্যুতি দেখা দিত। এছাড়া উক্ত আলোচনাসমূহের মধ্য থেকে এমন অনেক বিষয়ও বের হয়ে পড়ে যা ইসলামী চিন্তার অন্তর্ভুক্ত। যেমন: আশআরীদের মাসআলায়ে জাওয়াহির, যার গুরুত্ব বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশ পায়। সূচনাতে এটা একটা সাধারণ প্রশ্ন ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সেটার শাখা-প্রশাখার উদ্ভব হয়, যার ফলে নিয়মতান্ত্রিক দল ও মতের সৃষ্টি হতে থাকে, অতঃপর প্রত্যেক দল ও মত থেকে অসংখ্য শাখা-প্রশাখার উদ্ভব হতে থাকে।

---

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রকাশনায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা থেকে গৃহীত।

ইমাম আবুল হাছান আশআরী مقالات الإسلاميين গ্রন্থে উক্ত দল ও মত এবং শাখাসমূহের উল্লেখ করেছেন। আব্দুল কাহের আল-বাগদাদী "আল-ফার্কু বাইনাল ফিরাক" গ্রন্থে ঐসকল লোকদেরও চিহ্নিত করেছেন যারা সত্য পথে আছেন এবং তিনি বাতিলপন্থীদের আকীদাসমূহও বর্ণনা করেছেন। (আরও দ্র. الملل والنحل للشهر ستاني كتاب الفصل لابن حزم)

এ স্থানে উক্ত মতবাদসমূহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এখানে শুধু কিছু মৌলিক দল এবং তাদের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তাদের আলোচনা করা যুক্তিসংগত হবে।

ইল্মে কালামের প্রসিদ্ধ দলসমূহ

খিলাফতে রাশিদা যুগের পর যখন মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করে (বিশেষ করে খাওয়ারিজ, বানু উমায়্যা এবং শীআদের দ্বন্দ্ব) তখন স্বভাবত চিন্তা ও বিশ্বাসগত বাক-বিতণ্ডাও চরমে ওঠে। যেসব বিষয়কে কেন্দ্র করে উক্ত বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল তা নিম্নরূপ:

(১) জাব্র ও ইখ্তিয়ার সংক্রান্ত মাসআলা।

(২) কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া ব্যক্তি এবং শরীআতে তার স্থান।

(৩) খাল্কে কুরআনের মাসআলা।

এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে যেসব দল সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হল:

১. জাব্রিয়া
২. কাদ্রিয়া
৩. মুর্জিয়া
৪. জাহ্মিয়া
৫. মুতাযিলা

প্রভৃতি। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে মৌলিকভাবে আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্যকার দুটো দল অর্থাৎ, আশাইরা /আশআরিয়্যা ও মাতুরীদিয়্যাদের সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হল।

আশাইরা ও মাতুরীদিয়্যা

(الأشاعرة والماتريدية)

ইল্মে কালামের ক্ষেত্রে বা বলা যায় আকাইদের ক্ষেত্রে আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্যে দুটি ধারা। তা হল আশাইরা ও মাতুরীদিয়্যা। আশাইরা মতবাদটি ইমাম আবুল-হাসান আলী ইব্নে ইসমাঈল আল-আশআরী-র দিকে সম্পৃক্ত। তাঁর মতবাদ আশআরিয়্যা (أشعرية) মতবাদ নামে আখ্যায়িত। আকাইদের ক্ষেত্রে যারা হযরত ইমাম আবুল হাসান আশ্আরীর অনুসারী তাদেরকে বলা হয় আশ্আরী বা আশ্আরিয়্যা বা আশাইরা। আর মাতুরীদিয়্যা মতবাদটি হযরত ইমাম আবূ মানসূর মুহাম্মাদ ইব্নে আহমদ আল-মাতুরীদী-এর দিকে সম্পৃক্ত। তাঁর মতবাদ মাতুরীদিয়্যা

(ماتريدية) মতবাদ নামে আখ্যায়িত। যারা আকীদাগত বিষয়ে ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী-র অনুসারী, তাদেরকে বলা হয় মাতুরীদী। আশাইরা মতবাদটি ৪র্থ হিজরী শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত ইল্মে কালামের সর্ববৃহৎ এবং প্রসিদ্ধতম মতবাদ হিসাবে চলে আসছে। পক্ষান্তরে আহ্লে ইল্ম-এর উপর মাতুরীদিয়্যা মতবাদটির প্রভাব অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। আজও দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসাসমূহে মাতুরীদিয়্যা মতবাদটিকে ইসলামী আকাইদের প্রসিদ্ধতম উৎসসমূহের মধ্যে গণ্য হয়। মাতুরীদীর মতবাদ বেশীরভাগ মাওয়ারাউন্-নাহ্র[1]-এর এলাকাসমূহে, হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের দেশসমূহে এবং তুর্কিস্তানী এলাকায় বিস্তার লাভ করে আছে।

ইমাম আবুল হাসান আশ্আরী এবং ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী উভয়েই সুন্নী ছিলেন এবং সম্মিলিত প্রতিদ্বন্দ্বী (মুতাযিলাগণ)-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন।

কিছু কিছু ব্যাপারে ইমাম আশ্আরী ও ইমাম মাতুরীদির মধ্যে মতবিরোধও পাওয়া যায়, তবে অধিকাংশ মৌলিক বিষয়সমূহে তাঁরা এক মত ছিলেন কিংবা কাছাকাছি মত পোষণ করতেন।

ইমাম আবুল হাসান আল-আশ্আরী-এর জীবনী

(الإمام أبو الحسن الأشعري)

ইমাম আবুল হাসান আল-আশ্আরীর বংশ তালিকা নিম্নরূপ: আবুল হাসান আলী ইব্নে ইসমাঈল ইব্নে আবী বিশ্র ইস্হাক ইব্নে সালিম ইব্নে ইসমাঈল ইব্নে আব্দুল্লাহ ইব্নে মুসা ইব্নে বিলাল ইব্নে আবী বুরদাহ ইব্নে আবূ মুসা আশআরী (রা.)। তার নবম উর্দ্ধতন পুরুষ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.)।[2]

তিনি প্রসিদ্ধ মতানুসারে ২৬০ মতান্তরে ২৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী[3] ৩২৪ মতান্তরে ৩৩০ হিজরী মোতাবিক ৯৪২ সনে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

তিনি প্রখ্যাত মুতাযিলী আবূ আলী আব্দুল-ওয়াহ্হাব আল-জুব্বায়ী[4]-এর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ তাঁর তত্ত্বধানে হয়েছিল। আল-জুবাঈ থেকেই তিনি ইল্মে কালাম এবং ই'তিযাল মতবাদের শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু হিজরী ২৯৫ সনে একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি মুতাযিলী মতবাদ বর্জন করেন।[5] তিনি বসরার জামে

১. জায়হান/আমুদরিয়া নদীর উত্তর পূর্ব অঞ্চলীয় এলাকাকে মাওয়ারাউন্নাহার এলাকা বলা হয়। বর্তমানে এখানে রয়েছে উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান। এর মধ্যে রয়েছে বোখারা, সমরকন্দ, তাশখন্দ, তিরমিয প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ। ২. الإتحاف للزبيدي ج/٢

বলেছেন। إتحاف السادة المتقين للزبيدي ج/٢

সুন্নিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং আদর্শের ক্ষেত্রে এই আকস্মিক বিপ্লবের কারণ কেউ কেউ এরূপ মনে করেন যে, তিনি বাগদাদ যাতায়াত করতেন এবং সেখানে জামিউল-মানসূরের প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ্ আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্নে আহমদ আল-মাওয়াযীর মজলিসে উপবেশন করতেন। সম্ভবত এই শিক্ষা-বৈঠকে তাঁর অন্তরে ই'তিযাল–এর প্রতি ঘৃণা এবং মুহাদ্দিছ ও ফকীহগণের তরীকার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং তিনি ধীরে ধীরে ই'তিযাল থেকে দূরে এবং সুন্নিয়াতের নিকটবর্তী হতে থাকেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ই: ফা:।

মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করে জোর আওয়াজে বলেন, যে আমাকে চেনে সে আমাকে চেনে। আর যে আমাকে না চেনে সে শুনে রাখুক আমি অমুকের পুত্র অমুক। এতদিন যাবত আমি বলতাম কুরআন সৃষ্ট, পরকালে আল্লাহ্‌র দর্শন হবে না, মানুষ তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি। আজ আমি মুতাযিলাদের এসব মতবাদ থেকে তওবা করছি। এভাবে তিনি ই'তিযাল তথা মুতাযিলী মতবাদ থেকে পৃথক হওয়ার ঘোষণা দেন। ই'তিযাল বা মুতাযিলী মতবাদ পরিত্যাগ করার পর ইমাম আশ্‌আরী বস্‌রা থেকে বাগদাদে চলে আসেন এবং এখানে থেকে হাদীছ ও ফিক্‌হ বিষয়েও জ্ঞান লাভ করেন।

ই'তিযাল থেকে পৃথক হওয়ার ঘোষণা দেয়ার পর তিনি মতাযিলাদের বিরুদ্ধে লেখা ও সর্বাত্মক অভিযান শুরু করেন। তিনি তার প্রতিপক্ষ মুতাযিলাদের মতাদর্শকে তাদেরই দলীল-প্রমাণ দ্বারা খণ্ডনের পদ্ধতি গ্রহণ করেন। যদিও সে যুগে আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রখ্যাত ফকীহ ইমাম তাহাবী এবং ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদীও আকীদা ও চিন্তার জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং তিনিও মুতাযিলাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছিলেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইমাম আবুল হাসান আশআরী মুখ্য ভূমিকা পালন করেন এবং তাঁর প্রভাব অধিক ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে যখন মুতাযিলাদের প্রতাপ কমে যায়, তখন ইমাম আবুল হাসান আশআরী আরও সম্মুখে অগ্রসর হন। সে যুগে তাঁকে আহলুস সুন্নাতের আকাইদের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ও শক্তিধর ইমাম মনে করা হত। তিনি মুতাযিলাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্রতার সাথে কলম ধরেন এবং খাঁটি সুন্নী দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বীনী আকাইদের সমর্থন ও প্রচারের সূচনা করেন এবং এ কারণেই ইল্‌মুল কালামের ইতিহাসে তাঁর বিরাট মর্যাদা ও স্থান রয়েছে। তাঁর এই বিরাট খেদমতের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে "ইমামু আহ্‌লিস-সুন্নাত ওয়াল-জামাআত" বলা হয়।

হযরত ইমাম আবুল হাসান আশ্‌আরী (রহ.) একজন উচ্চ পর্যায়ের লেখক ছিলেন। মুতাযিলা ও জাহ্‌মিয়াদের বিরুদ্ধে الموجز নামক তিন খণ্ডে সমাপ্ত একখানি দীর্ঘ কিতাব তিনি রচনা করেছিলেন। তিনি ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত একখানি তাফসীরও লেখেন। তাঁর রচনার মধ্যে আরও রয়েছে كتاب الإبانة ও مقالات الإسلاميين। এ ছাড়াও তাঁর অনেক রচনার কথা জানা যায়। কোন কোন বর্ণনা মোতাবিক তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা এক হাজার পর্যন্ত পৌঁছে।[১]

ইল্‌মে কালামের ইতিহাসে এক দিকে মুতাযিলা দল এবং অন্য দিকে মুজাস্‌সিমা ও মুশাব্বিহা দলের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুতাযিলাগণ আল্লাহ্‌র সিফাত অস্বীকার করতেন এবং মুজাস্‌সিমা ও মুশাব্বিহা ফিরকাদ্বয় আল্লাহ্‌র সিফাত তথা আল্লাহর গুণাবলীকে সৃষ্টির সিফাতের (সৃষ্টির গুণাবলীর) অনুরূপ গণ্য করতেন। ইমাম আশ্‌আরীর পদ্ধতি উল্লেখিত চরম পন্থাদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। তিনি আল্লাহ্‌র

১. ইসলামী বিশ্বকোষ. ই: ফা: ও الإتحاف للزبيدي ج/ ٢

সিফাতের আকীদা গ্রহণপূর্বক বলেছেন যে, উক্ত সিফাত হাওয়াদিছ (ক্ষণস্থায়ী) মাখ্‌লূক সদৃশ নয় বরং আল্লাহ্‌র যাতের উপযোগী, যেমন তাঁর যাতের মর্যাদা দাবী করে।[১]

ইমাম আশ্‌আরী মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও মুতাযিলাদের মতবিরোধগত বিষয়সমূহে মুহাদ্দিছদের মত পোষণ করেন এবং বিদআতপন্থীদের থেকে দূরে থাকেন। তাঁরা আকীদাসমূহের ক্ষেত্রে আক্‌ল (বুদ্ধি-বিবেক) নাক্‌ল (কিতাব-সুন্নাহ) উভয়ের সাহায্য গ্রহণ করেছেন, তবুও আক্‌লকে চিন্তা এবং দর্শনের জগতে শাসক এবং বিচারকের স্থান প্রদান করেননি, বরং তাকে শরয়ী নাস্‌ (نص) সমূহের জন্য খাদেমরূপে ব্যবহার করেছেন।

ইমাম আশ্‌আরীর পূর্বে দুটো দল ছিল। আরবাবে নাক্‌ল (ارباب نقل/কুরআন-হাদীছের ভাষ্যনির্ভর) এবং আরবাবে আক্‌ল (ارباب عقل/নিছক বুদ্ধি ও যুক্তিনির্ভর)। ইমাম আশ্‌আরী মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার প্রয়াস পান এবং এ কারণে এমন আকীদাসমূহ গ্রহণ করেন যা তাঁর আক্‌ল (জ্ঞান) এবং নাক্‌ল (বর্ণনাজাত ভাষ্য) উভয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[২]

যদিও ইমাম আশ্‌আরী নিজেকে ইমাম আহমাদ ইব্‌নে হাম্বাল (রহ.)-এর পথের অনুসারী বলে ঘোষণা করেন (كتاب الإبانة-র মুকাদ্দামা দ্রঃ), কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা হাম্বলী মাযহাবে তেমন একটা প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেনি; বরং হাম্বলী মাযহাবে তাঁর বিরোধীর সংখ্যা প্রচুর। অবশ্য শাফিয়ী মাযহাবে তাঁর চিন্তাধারা ব্যাপক মর্যাদা লাভ করে এবং হানাফী মাযহাবেও তাঁর অনুসারী পাওয়া যায়। যেমন সায়্যিদ শরীফ আল-জুরজানী।[৩]

ইমাম আবুল হাসান আশ্‌আরীর অনুসারীদের অধিকাংশ ছিল শাফিয়ী মতাবলম্বী। শাফিয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আশ্‌আরী উলামার মধ্যে রয়েছেন: আবূ সাহ্‌ল আস-সালূকী, আবূ বাক্‌র ক্বাফ্‌ফাল, আবূ যায়দ আল-মাওয়াযী, হাফিজ আবূ বাক্‌র আল-জুরজানী, আবূ মুহাম্মাদ আত-তাবারী, আবূ আবদিল্লাহ আত-তায়ী, আবুল-হাসান আল-বাহিলী, আবূ বক্‌র ইব্‌নে ফুরাক, ইমাম গাযালী (রহ.)-এর শিক্ষক ইমামুল-হারামাইন এবং আল্লামা বায়যাবী। এ ছাড়া ইমাম বায়হাকী, শাহরাস্‌তানী, ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন রাযী এবং পরবর্তী আলেমদের মধ্যে আস্‌-সানূসী প্রমুখও আশআরী ছিলেন।[৪]

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদীর জীবনী

(الإمام أبومنصور الماتريدي)

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী-র বংশ তালিকা নিম্নরূপ: আবূ মানসূর মুহাম্মাদ ইব্‌নে মুহাম্মাদ ইব্‌নে মাহ্‌মূদ আস্‌সামারকন্দী। সমরকন্দের অন্তর্গত মাতুরীদ নামক গ্রামে/ মহল্লায় তার জন্ম বিধায় তাঁকে মাতুরীদী বলা হয়। তাঁর উপাধি ছিল ইমামুল

১. প্রথম দিকে ইমাম আবুল হাসান আশ্‌আরী ساق/قدم، يد، وجه , ইত্যাদি সিফাতের ক্ষেত্রে রূপক অর্থ গ্রহণ করতেন, তবে পরবর্তীতে তিনি সালাফে সালেহীনের ন্যায় কোনো কাইফিয়াত বর্ণনা ছাড়াই বিশ্বাসের পন্থা গ্রহণ করেন। .الإتحاف للزبيدي ج/٢ ইসলামী বিশ্বকোষ. ই: ফা:, ইল্‌মুল কালাম, পৃ. ৫৭) ৩. মৃ. ৮১৬ হি. ৪. ইসলামী বিশ্বকোষ. ই: ফা:

হুদা (امام الهدي) অর্থাৎ, হেদায়েতের ইমাম। মাতুরীদ (ماتريد) শব্দটি মূলতঃ মাতুরীত (ماتريت)। শেষের তা (ت) কে দাল (د) দ্বারা পরিবর্তন করে মাতুরীদ (ماتريد) বানানো হয়েছে এবং তার দিকে সম্পৃক্ত করে তাঁকে মাতুরীদী বলা হয়।[১]

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী ফেকাহ, উসূলে ফেকাহ এবং উসূলে-দ্বীনের সর্বস্বীকৃত আলেম ছিলেন। তিনি তাঁর যুগের বড় বড় আলেমের নিকট থেকে ইল্‌ম হাসিল করেন। তন্মধ্যে আবূ নাস্‌র আহমাদ ইব্‌নে আব্বাস আল-ইয়াদী (العياضي), আবূ বক্‌র আহ্‌মদ ইব্‌নে ইস্‌হাক আল-জুরজানী, মুহাম্মাদ ইব্‌নে মুকাতিল আর-রাযী এবং নাসীর ইব্‌নে ইয়াহ্‌য়া আল-বালাখী হলেন প্রসিদ্ধ। ইমাম মুহাম্মাদের বরাতে উল্লেখিত মনীষীদের নিকট থেকে ইমাম মাতুরীদী (রহ.) ইমাম আবূ হানীফার গ্রন্থসমূহের রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী তিন সিড়ির মাধ্যমে ইমাম আবূ হানীফার বিশেষ শাগরেদ ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌নে হাসান শায়বানীর শাগরিদ।

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী বহুসংখ্যক গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য মূল্যবান গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে:

১. كتاب التوحيد
২. كتاب المقالات
৩. كتاب رد أوائل الأدلة للكعبي
৪. كتاب رد وعد الفساق للكعبي
৫. كتاب رد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي
৬. كتاب بيان وهم التعتزلة
৭. كتاب تأويلات القرآن
৮. كتاب الجدل
৯. كتاب الأصول في أصول الدين
১০. الرد على القرامطة

প্রভৃতি।

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী একজন প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ, আহলুস-সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের একজন প্রসিদ্ধ মুতাকাল্লিম এবং মু'তাযিলাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর অনুসারীদের অধিকাংশ হল হানাফী মতাবলম্বী। অপর পক্ষে ইমাম আশআরীর অনুসারীদের অধিকাংশ ছিল শাফিঈ মতাবলম্বী। সম্ভবত এ কারণেই কারও কারও মত হল আশআরী ও মাতুরীদীর মধ্যে যে সামান্য মতপার্থক্য দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে ইমাম শাফিয়ী এবং ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-র নীতির ফল। মাতুরীদী মতবাদের যথেষ্ট প্রচার ও প্রসার না হওয়া সত্ত্বেও আহ্‌লে ইল্‌মের উপর আবূ মানসূর মাতুরীদীর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। আজও দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ও মাদ্‌রাসাসমূহে মাতুরীদী

১. الإتحاف للزبيدي. ج/٢

ইল্‌মে কালাম ইসলামী আকাইদের প্রসিদ্ধতম উৎসসমূহের মধ্যে গণ্য হয়। বর্তমান যুগে মাতুরীদী দর্শনের ছাপ মিসরের শায়খ আব্দুহ-র রিসালাতুত-তাওহীদ এবং শারহুল আকাইদ আল আদ্‌দিয়াতে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।[১]

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদির চিন্তা ও মতবাদ পর্যালোচনা করলে অনুমিত হয় যে, তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-র চিন্তাধারা ও মতবাদের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন এবং তার সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। কেননা উভয়ের চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য এবং সম্পর্ক পাওয়া যায়। ইমাম আবূ হানীফার প্রতি আরোপিত অনেক পুস্তিকা ও গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, যার মধ্যে আল-ফিক্‌হুল-আকবার, আল-ফিকহুল-আবসাত, মাকতূব আবী হানীফা, ইলা আবী উছমান আল-বাত্তী, ওয়াসিয়্যাতু আবী হানীফা, ইলা ইউসুফ ইব্‌নে খালিদ ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ খুবই প্রসিদ্ধ। অনুমিত হয় যে, ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী ইমাম আবূ হানীফার এ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়েছিলেন।[২]

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী-এর চিন্তাধারার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল:

১. তিনি নাক্‌ল (কুরআন ও হাদীছ)-এর সংগে সংগে আক্‌ল (যুক্তি)-এর উপরও নির্ভর করতেন এই শর্তে যে, তা শরীআতের অনুকূলে হবে এবং তাঁর নিকট কেবল সেই সকল আক্‌লী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বৈধ যা শরীআত বিরোধী হবে না।

২. কুরআনের তাফ্‌সীর করার ক্ষেত্রে তিনি এই নীতি অবলম্বন করেছেন যে, মুতাশাবিহাত (متشابهات/যার উদ্দিষ্ট অর্থ অস্পষ্ট)-কে মুহকামাত (محكمات/যার উদ্দিষ্ট অর্থ স্পষ্ট)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং মুতাশাবিহাতের তাবীল ও বিশ্লেষণ মুহ্‌কামাতের আলোকে করতে হবে।

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদির মতবাদ বেশীরভাগ মাওয়ারাউন্‌-নাহারও (ماوراء النهر)-এর এলাকাসমূহে, হিন্দুস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দেশসমূহে এবং তুর্কিস্তানী এলাকায় বিস্তার লাভ করে। তাঁর চিন্তা ও মতবাদ এবং এ'তেকাদ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ফাখ্‌রুল-ইসলাম আল-বাইযাবী, আত-তাফ্‌তাযানী, আন-নাসাফী এবং ইব্‌নুল-হুমাম-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ হানাফী আলিমদের যথেষ্ট অবদান আছে।

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী ৩৩৩ হিজরীতে ইমাম আবুল হাসান আশ্‌আরীর ওফাতের কিছুকাল পর ইন্তেকাল করেন। সমরকন্দে তাঁর কবর বিদ্যমান।

ইল্‌মে কালামের কিছু বিষয়ে আশআরী ও মাতুরীদীদের মধ্যকার মতবিরোধ প্রসঙ্গ

ইমাম আবুল হাসান আশআরী এবং আবূ মানসূর মাতুরীদী উভয়ই সুন্নী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু ব্যাপারে মতবিরোধও পাওয়া যায়, তবে অধিকাংশ মৌলিক

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ই: ফা:, ইল্‌মুল কালাম, শিবলী নু'মানী ২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ই: ফা: ৩. দেখুন ৩৭ পৃষ্ঠার ১ নং টীকা।

বিষয়সমূহে তাঁরা ঐক্যমত্য কিংবা কাছাকাছি মত পোষণ করতেন। যে সব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, তা তেমন কোন মৌলিক বিষয় নয়। তাঁদের মধ্যে যেসব বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, তার সংখ্যা প্রায় ৪০ বলে বর্ণনা করা হয়। কেউ কেউ তার সংখ্যা ৫০ পর্যন্ত বলেছেন। তন্মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হল।

১. বস্তুসমূহের ভাল (حسن) এবং মন্দ (قبح) হল জ্ঞানগত (عقلى);
২. আল্লাহ কাউকে শক্তির বাইরে কষ্ট দেন না।
৩. আল্লাহ্‌র সকল কাজ কল্যাণের উপর ভিত্তিশীল (معللة بالمصالح)।
৪. মানুষের স্বীয় কার্যাবলীর উপর ক্ষমতা ও ইখ্‌তিয়ার রয়েছে এবং এই ক্ষমতা উক্ত কার্যাবলীর অস্তিত্বের উপর প্রভাব রাখে।
৫. জ্ঞান (عقل) -এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ।
৬. আল্লাহ জুল্‌ম করেন না এবং তাঁর জালেম বা অত্যাচারী হওয়া জ্ঞানগতভাবে (عقلا) অসম্ভব।
৭. ঈমান হ্রাস পায় না এবং বৃদ্ধিও হয় না।
৮. আল্লাহ্‌কে যথাযথভাবে চেনা সম্ভব।
৯. জীবন সম্পর্কে হতাশ হওয়া অবস্থায়ও তওবা কবূল হয়।
১০. পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন বস্তু অনুভব করা ইল্‌ম নয়, বরং ইল্‌ম-এর মাধ্যম। ইত্যাদি।

আশাইরা উল্লেখিত আকীদাসমূহের ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করে। আশ্‌আরীগণ মালিকী ও শাফিয়ী মাযহাবের মাসায়েলের উপর ভিত্তি করে এসব বিষয়ে মতবাদ দাঁড় করেছেন। পক্ষান্তরে মাতুরীদীগণ এ ক্ষেত্রে ইমাম আজম আবূ হানীফার ভাষ্যসমূহকে গ্রহণ করেছেন। তবে এই মতবিরোধ তেমন কোন মৌলিক মতবিরোধ নয়। যেমন নিম্নে উপরোক্ত মতবাদসমূহের কয়েকটার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করে বিষয়টা স্পষ্ট করার প্রয়াস নেয়া গেল।[১]

(১) বস্তুসমূহের ভাল ও মন্দ-প্রসঙ্গ

আশ্‌আরীদের নিকট বস্তুসমূহের মধ্যে মূলত কোন ভাল কিংবা মন্দ নিহিত নেই, বরং উক্ত ভাল ও মন্দ শরীআতের উপর নির্ভরশীল। কোন কাজ বা কোন বস্তু এজন্য উৎকৃষ্ট যে, শরীআত তার নির্দেশ দিয়েছে এবং নিকৃষ্ট এজন্য যে, শরীআত তা করতে নিষেধ করেছে। মাতুরীদির মতে বস্তুসমূহ মূলত হয় উৎকৃষ্ট না হয় নিকৃষ্ট এবং তার উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হওয়া জ্ঞানের সাহায্যে অনুভব করা যেতে পারে। মুতাযিলাগণও জ্ঞানগত ভাল ও মন্দের কথা বলেন, তবে তাদের এবং মাতুরীদিয়াদের চিন্তা ও মতের মধ্যে পার্থক্য হল- মুতাযিলাদের নিকট যে জিনিস জ্ঞানগতভাবে উৎকৃষ্ট তা সম্পাদন করা ওয়াজিব এবং যে জিনিস নিকৃষ্ট তা হারাম। মাতুরীদীগণ যদিও স্বীকার করেন যে,

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ই: ফা: ও الإتحاف للزبيدي ج/٢ থেকে গৃহীত।

বস্তুসমূহের উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হওয়ার অনুভব জ্ঞান দ্বারা সম্ভব, তবে তাদের মতে মানুষ কেবল এই কারণে মুকাল্লাফ এবং আদিষ্ট হয় না, বরং মুকাল্লাফ ও আদিষ্ট হওয়ার (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কাজ সম্পাদন ও নিকৃষ্ট কাজ পরিহার বিষয়ে আদিষ্ট হওয়ার) জন্য শরী'আতের নির্দেশ অপরিহার্য এবং আদেশ-নিষেধ (امر و نهى) তারই উপর নির্ভরশীল।

(২) আল্লাহ্ কাউকে তার ক্ষমতার বাইরে কষ্ট দেন কি না-এ প্রসঙ্গ

আশআরীদের নিকট আল্লাহর জন্য এটা বৈধ যে, তিনি বান্দাদের জন্য এমন সকল কাজ নির্ধারণ করে দিবেন যা সম্পাদন তাদের ক্ষমতার বাইরে। মাতুরীদীগণের মতে আল্লাহ্ ক্ষমতার বাইরে কোন কাজ করতে কাউকে বাধ্য করেন না। প্রকৃতপক্ষে এই মাসআলাটির উদ্ভব হয়েছে আল্লাহ্‌র কার্যাবলী মুআল্লাল অথবা গায়রে মুআল্লাল হওয়ার মাসআলা থেকে। আশআরীদের নিকট এটা যুক্তিগ্রাহ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন এবং পাপীকে পুরস্কৃত করতে পারেন। কেননা ভাল কাজের প্রতিদান কেবল আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ এবং পাপের শাস্তি প্রদান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হয়। আশআরীদের নিকট আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদার খেলাফও করতে পারেন, কিন্তু মাতুরীদিদের নিকট আল্লাহ তাঁর হিকমত পরিবর্তন করেন না এবং তাঁর ওয়াদায় কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না।

إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৯)

(৩) আল্লাহ্‌র সকল কাজ কল্যাণের উপর ভিত্তিশীল হওয়া প্রসঙ্গ

এ বিষয়টা এভাবেও পেশ করা যায় যে, আল্লাহ্‌র কার্যাবলী মুআল্লাল বিল ইল্লাত (معلل بالعلة) অর্থাৎ, হেতুর সঙ্গে সম্পর্কিত কি না? মুতাযিলাদের মতে আল্লাহ্‌র সকল কাজ মুআল্লাল বিল ইল্লাত বা হেতুনির্ভর। কল্যাণ তার ভিত্তিমূল এবং তার কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। অতএব তাঁদের মতে আল্লাহ্ কোন অকল্যাণকর কাজের নির্দেশ প্রদান করতে পারেন না; বরং কল্যাণকর কাজের আদেশ করা তাঁর জন্য ওয়াজিব। আশআরীদের মতে আল্লাহ্‌র কার্যাবলী গায়রে মুআল্লাল (হেতুনির্ভর নয়)। তিনি তাঁর বান্দাদের বিষয়ে যা খুশী করতে পারেন। এ কারণে বান্দার কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা তাঁর উপর অপরিহার্য নয়। কেননা তাঁকে কারও সম্মুখে জওয়াবদিহী করতে হয় না। মাতুরীদীগণের বক্তব্য হল- আল্লাহ্‌র সকল কাজ হিকমত এবং কল্যাণের উপর ভিত্তি করেই সংঘটিত হয়। কেননা তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ, তবে তিনি হিকমত এবং কল্যাণের ইচ্ছা ও কামনা করতে বাধ্য নন। অতএব এটা বলা ভুল যে, কল্যাণ সাধন করা তাঁর জন্য অপরিহার্য। কেননা এতে তাঁর সীমাহীন ইচ্ছা ও কামনা এবং পূর্ণ স্বাধীনতা রহিত হয়। তাঁর জন্য কোন কাজ অপরিহার্য করা বৈধ নয়।

(৪) মানুষের স্বীয় কার্যাবলীর উপর ক্ষমতা ও ইখতিয়ার রয়েছে কি না এবং এই ক্ষমতা উক্ত কার্যাবলীর অস্তিত্বের উপর প্রভাব রাখে কি না-এ প্রসঙ্গ

এ প্রসঙ্গে ভূমিকা স্বরূপ কয়েকটা কথা জানা আবশ্যক। তা হল জাবৃরিয়্যা ফিরকা বলে যে, মানুষের মাঝে কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ইচ্ছা শক্তিরই অস্তিত্ব নেই বরং কার্য সম্পাদনের জন্য মানুষ সম্পূর্ণ বাধ্য (مجبور محض)। কাদরিয়্যা ফিরকা বলে, মানুষ সকল কাজ নিজ ইচ্ছায় সম্পাদন করে থাকে এবং তার কাজের সাথে আল্লাহ্‌র কোনো সম্পর্ক নেই বরং মানুষ নিজেই তার কার্যাবলীর সৃষ্টিকর্তা। এ কারণে তারা আল্লাহ্‌র তাক্‌দীরকে অস্বীকার করতেন। মুতাযিলাগণও এই আকীদা পোষণ করতেন যে, মানুষ স্বয়ং তার কার্যাবলীর সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ তার কার্যাবলীর সৃষ্টিকর্তা নন। আশাইরা এই আকীদায় বিশ্বাসী যে, আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। অতএব তিনি মানুষের সকল কার্যেরও সৃষ্টিকর্তা। মানুষ কার্যাবলীর সৃষ্টিকর্তা নয়, বরং তা অর্জনকারী (مکتسب)। মাতুরীদিয়ার নিকট মানুষের কার্য সম্পাদন সেই শক্তির বলেই হয়ে থাকে যা আল্লাহ মানুষের কার্য সম্পাদন অথবা অসম্পাদন উভয়ের ব্যাপারে তাকে দিয়ে রাখেন। অর্থাৎ সে কোন্ কাজ করবে বা কোন্ কাজ করবে না সে ব্যাপারে তার ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। কার্যলাভের জন্য উক্ত সৃষ্ট শক্তির নাম হল কর্মশক্তি (استطاعت) এবং এটা মানুষের মধ্যে কর্ম সম্পাদনের সময় সৃষ্টি হয়ে থাকে। আশাইরা এবং মাতুরীদিয়া-র মতবাদের মধ্যে পার্থক্য হল, আশাইরা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানুষকে স্বয়ং ক্ষমতাবান মনে করে না এবং এ কারণে উলামায়ে কেরাম আশ্‌আরীদের এই ধারণাকে অদৃষ্টবাদের দিকে ধাবিতকারী (مؤدي إلى الجبر) বলে আখ্যায়িত করেছেন। অপর দিকে মাতুরীদিয়া কার্যলাভের ক্ষেত্রে মানুষকে ক্ষমতাবান মনে করে। তাদের নিকট মানুষের সকল কার্যাবলী আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এবং তাঁর নির্দেশে সম্পাদিত হয়, অবশ্য মানুষের স্বীয় কার্য সম্পর্কে স্বাধীনতা আছে। কেননা তাকে কার্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

(৫) জ্ঞান (عقل)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ হওয়া প্রসঙ্গ

এ বিষয়টা প্রকৃতপক্ষে ঈমানের মূল বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত। মুতাযিলাদের মতে জ্ঞানের সাহায্যে আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ অপরিহার্য। আশ্‌আরীদের মতে নবী প্রেরণের পূর্বে ঈমান ওয়াজিব নয় (অর্থাৎ তাঁর পরিচয় লাভ করা শরীআতের মাধ্যমে ওয়াজিব, জ্ঞানের মাধ্যমে নয়)। মাতুরীদীদের নিকট আক্‌ল বা জ্ঞান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের পরিচয় লাভ করতে পারে কিন্তু তা দ্বারা স্থায়ীভাবে শরীআতের আহ্‌কামের পরিচয় লাভ সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(ঈমান ও আকাইদ বিষয়ক)

ঈমান ও আকাইদ সংক্রান্ত কয়েকটি পরিভাষার ব্যাখ্যা

❑ ঈমান/ايمان

"ঈমান" শব্দের আভিধানিক অর্থ অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, স্বীকার করা, ভরসা করা, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করা ইত্যাদি। শরীআতের পরিভাষায় ঈমান বলা হয় রসূল (সা.) কর্তৃক আনীত ঐ সকল বিষয় যা স্পষ্টভাবে এবং অবধারিতরূপে প্রমাণিত, সে সমুদয়কে রসূল (সা.)-এর প্রতি আস্থাশীল হয়ে বিশ্বাস করা এবং মুখে তা স্বীকার করা (যদি স্বীকার করতে বলা হয়) ও মেনে নেয়া। আর কুরআন-হাদীছ এবং সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মতের সর্বসম্মত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্মের অবধারিত বিষয়গুলো (بدیہیات)-এর ব্যাখ্যা প্রদান করা। সংক্ষেপে ও সাধারণ কথায় ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়।

❑ আকীদা (عقيدة)

শব্দটি عقد থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করা। ইসলামের পরিভাষায় "আকীদা" অর্থ দৃঢ় ও মজবুত ঈমান, অকাট্য প্রমাণ ভিত্তিক খবরাখবর ও বিষয়া- বলীর প্রতি মনের অটল বিশ্বাস। "আকীদা" শব্দের বহুবচন আকাইদ। এ'তে-কাদ (اعتقاد) শব্দটিও আকীদা অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এ'তেকাদ (اعتقاد) শব্দের বহুবচন এ'তেকাদাত (اعتقادات)।

❑ মু'মিন/مؤمن

যার মধ্যে ঈমান আছে তাকে মু'মিন বলা হয়।

❑ ইসলাম/اسلام

"ইসলাম"ঃ শব্দের আভিধানিক অর্থ মেনে নেয়া, আনুগত্য করা। শরীআতের পরিভাষায় ইসলাম বলা হয় (ঈমানসহ) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যকে মেনে নেয়া। সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনীত ধর্মকে ইসলাম বলা হয় বা ধর্মীয় কর্মকে ইসলাম বলা হয়।

বি: দ্র: 'ঈমান' ও 'ইসলাম' শব্দ দুটো সমার্থবোধকভাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

❑ মুসলমান/মুসলিম

'ইসলাম' ধর্ম অনুসারীকে মুসলমান বা মুসলিম বলা হয়।

❑ কুফ্‌র/کفر

যেসব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখাকে ঈমান বলা হয়, প্রকাশ্যে তার কোনো কিছুকে মুখে অস্বীকার করা বা তার প্রতি অন্তরে বিশ্বাস না রাখা হল কুফ্‌র।

❑ কাফের/کافر

দ্বীনের অকাট্য বিষয় অস্বীকারকারী হল 'কাফের'।

❑ শির্‌ক/شرک

আল্লাহর যাত (ذات/সত্তা) তাঁর ছিফাত (صفات/গুণাবলী) এবং তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক বা অংশীদার বানানো হল শির্‌ক।

❑ মুশ্‌রিক/مشرک

যে শির্‌ক করে তাকে বলা হয় মুশ্‌রিক।

❑ নিফাক/মুনাফিকী

মুখে ঈমান প্রকাশ করা, প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করা অথচ অন্তরে কুফর প্রচ্ছন্ন রাখা- এরূপ কপটতাকে বলা হয় নিফাক বা মুনাফিকী।

❑ মুনাফিক/منافق

যে মুনাফিকী করে তাকে বলা হয় মুনাফিক।

❑ মুলহিদ/যিন্দীক-ملحد / زندیق

যে ব্যক্তি মৌলিকভাবে ও প্রকাশ্যে ইসলাম এবং ঈমান-এর অনুসারী, কিন্তু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বদীহী তথা অবধারিত বিষয়গুলোর এমন ব্যাখ্যা দেয়, যা কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য-বিরুদ্ধ, এরূপ লোক প্রকৃত মু'মিন মুসলমান নয়। কুরআনের পরিভাষায় এরূপ লোককে বলা হয় "মুল্‌হিদ" আর হাদীছের পরিভাষায় বলা হয় "যিন্‌দীক"। কারও কারও ব্যাখ্যামতে সব ধরনের ধর্মবিরোধী বা মুশ্‌রিকদেরকেও যিন্‌দীক বলা হয়। যারা দাহ্‌রী বা নাস্তিক, তাদেরকেও যিন্‌দীক বলা হয়ে থাকে।

❑ মুরতাদ/مرتد

ইসলাম ধর্মের অনুসারী কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করলে কিংবা ঈমান পরিপন্থী কোন কথা বললে বা কাজ করলে তাকে মুরতাদ বলে। সংক্ষেপে মুরতাদ অর্থ ধর্মত্যাগী।

❑ ফাসেক/فاسق

প্রকাশ্যে যে ব্যক্তি গোনাহে কবীরা করে বেড়ায় তাকে বলা হয় ফাসেক। আবার ব্যাপক অর্থে সব ধরনের অবাধ্যকে ফাসেক বলা হয়। এ হিসাবে একজন কাফেরকেও ফাসেক বলা যেতে পারে, যেহেতু সেও অবাধ্য।

❑ আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত (أهل السنة و الجماعة)

এ সম্পর্কে দেখুন "আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সম্বন্ধে আকীদা" শীর্ষক আলোচনা।

আকাইদের প্রকার ও স্তরগত পার্থক্য

আকাইদের কিতাবসমূহে উল্লেখিত ইসলামী আকীদাসমূহ মূলত তিন প্রকার।[১] যথা:

১. যেসব আকীদা নিশ্চিত ও অকাট্য (یقینی و قطعی)ভাবে প্রমাণিত। এগুলো আবার তিন ধরনের। যথা:–

(এক) যা কুরআনের জাহেরী ইবারত দ্বারা প্রমাণিত।

(দুই) যার মূল বিষয়টা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির বর্ণনায় (চাই হাদীছের লফজ মুতাওয়াতির হোক বা না হোক) প্রমাণিত।

(তিন) যে ব্যাপারে উম্মতের এজমা (اجماع) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চাই তার দলীল নিশ্চিত (قطعی) হোক বা না হোক। আমাদের জানা থাকুক বা না থাকুক।[২]

এই প্রথম প্রকারের তিন ধরনের যে কোন ধরনের কোন আকীদা অস্বীকারকারী ইসলামের গণ্ডি-বহির্ভূত।

২. যেসব আকীদা যুক্তিগত দলীল-প্রমাণ (دلائل عقلیہ) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং যার উপর শরীআতের বুনিয়াদ বা শরীআতের অধিকাংশ বিষয় যার উপর নির্ভরশীল। চাই তার সমর্থনে বিশদ শরয়ী দলীল থাকুক বা না থাকুক। যেমন: আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, আল্লাহ্‌র গুণাবলী, নবুওয়াতের প্রমাণ, জগতের অনিত্বতা ইত্যাদি।

এই প্রকারের আকীদার হুকুম প্রথম প্রকারের আকীদার ন্যায়। তবে এসব ক্ষেত্রে আরও কিছু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রয়েছে। যেমন: আত্মার নিত্বতা বা অনিত্বতার বিষয়, আল্লাহ্‌র গুণাবলী কি তাঁর সত্তার হুবহু (عین ذات) না সত্তা থেকে ভিন্ন (غیر ذات)-এর বিষয়। এছাড়া এই দ্বিতীয় প্রকারের আকীদাসমূহের প্রারম্ভিক কিছু আলোচনা রয়েছে। যেমন পরমাণু (جوہر فرد বা الجزء الذی لایتجزی)-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা, শরীরের

---

১. عقائل الاسلام عبد ال حق حقانی থেকে গৃহীত। ২. কেননা, উম্মত বিশেষভাবে সাহাবা ও তাবিয়ীন কর্তৃক শরীয়ত বিরুদ্ধ কোন বিষয়ের উপর ঐকমত্য পোষণ অসম্ভব।

উপাদান নিত্ব কি না ইত্যাদি। এসব তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (تحقیقات علمیہ) ও প্রারম্ভিক বিষয়াদি (مسائل مبادیہ) যা ইল্‌মে কালামে বা আকাইদের কিতাবে প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। এগুলোর ক্ষেত্রে জমহুরের বিরোধিতাকারীদেরকে আমরা ইসলামের গণ্ডি-বহির্ভূত বলতে পারি না। তবে তারা জমহুর মুসলিমের বিরোধী।

৩. যেসব বিষয় খবরে ওয়াহেদ (خبر واحد) দ্বারা প্রমাণিত বা উলামায়ে কেরাম যা কুরআন হাদীছ থেকে গবেষণা (استنباط) সূত্রে বের করেছেন। যেমন: কুরআন নিত্ব না সৃষ্ট-এই বিষয়। ফেরেশতাদের চেয়ে নবীদের শ্রেষ্ঠ হওয়ার বিষয়। সাহাবীদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়। নেক আমল ঈমানের অংশ (جز) কি না এ বিষয় প্রভৃতি। এসব বিষয়েই প্রধানত ইসলামী ফিরকাগুলার মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ। এক্ষেত্রে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা সাহাবা, তাবিয়ীন ও সালাফে সালেহীনের অনুসরণ করে থাকেন।[১]

যেসব বিষয়ে ঈমান রাখতে হয়

মৌলিকভাবে যেসব বিষয়ে ঈমান রাখতে হয় তা হল ৬ টি। যথা:–

১. আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান।
২. ফেরেশ্‌তাদের প্রতি ঈমান।
৩. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান।
৪. নবী রসূলগণের প্রতি ঈমান।
৫. পরকালের প্রতি ঈমান।
৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান।

এ ৬টি বিষয় একত্রে এক আয়াতে না হলেও বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন:–

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّه وَ الْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللهِ وَ مَلٰٓئِكَتِه وَ كُتُبِه وَ رُسُلِه.

অর্থাৎ, রসূলের প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, রসূল ও মু'মিনগণ তার প্রতি ঈমান এনেছে। সকলেই ঈমান আনয়ন করেছে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর (প্রেরিত) কিতাব ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ...। (সূরা: ২-বাকারা: ২৮৫)

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ.

অর্থাৎ, তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে নেকী শুধু এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং নেকী হল তাদের, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি...। (সূরা: ২-বাকারা: ১৭৭)

১. عقائد الاسلام عبد الحق حقانی থেকে গৃহীত।

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ.

অর্থাৎ, আমি সব কিছুকে সৃষ্টি করেছি তাক্‌দীর মোতাবেক। (সূরা: ৫৪-কামার: ৪৯)

وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَه بِمِقْدَارٍ.

অর্থাৎ, তাঁর নিকট সবকিছুর একটা নিদৃষ্ট পরিমাণ রয়েছে। (সূরা: ১৩-রা'দ: ৮)

এবং হাদীছে জিব্রীল নামক হাদীছে একত্রে এ ৬টি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

مَا الْاِيْمَانُ؟ قَالَ : اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلٰئِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلِه وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِه وَشَرِّه. (متفق عليه)

১. "আল্লাহ"-এর উপর ঈমান

বিশুদ্ধতম মতানুসারে "আল্লাহ" (الله) শব্দটি সৃষ্টিকর্তার ইস্‌মে যাত বা সত্তাবাচক নাম। আরবীতে বলা হয়,

الله عَلَمٌ على الأ صح للذات الواجب الوجود المستجمع بجميع صفات الكمال.

অর্থাৎ, "আল্লাহ" ঐ চিরন্তন সত্তার নাম, যাঁর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী, যিনি সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী।

"আল্লাহ্‌" তা'আলার উপর ঈমান আনয়ন করা বলতে (ক) আল্লাহ্‌র যাত বা সত্তা ও (খ) তাঁর সিফাত বা গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস করা এবং মেনে নেয়াকে বোঝায়।

(ক) আল্লাহ্‌র সত্তা (যাত/ذات) ও তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের যুক্তিগত প্রমাণ

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের যুক্তিগত প্রমাণ দিয়ে বলা হয়, আমরা জানি যে, জগতের সবকিছু (আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাত ব্যতীত আসমান জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছু) অনিত্ব (حادث) বা সৃষ্ট।[১] আর সব অনিত্ব বা সৃষ্টবস্তুর জন্য সৃষ্টিকর্তা (محدث) আবশ্যক। অতএব জগতের জন্যেও একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যক।[২]

১. জগতের সবকিছু অনিত্ব (حادث) হওয়ার প্রমাণ হল জগতের যেকোনো বস্তু হয় মূল উপাদান (جوہر) হবে নতুবা অপ্রধান বিষয় (عرض)। যদি অপ্রধান বিষয় হয় তাহলে সেটা অনিত্বই। তন্মধ্যে কোন কোন কোনটার অনিত্ব হওয়া ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বিষয়, যেমনঃ অন্ধকার চলে যাওয়ার পর আলো আসা, গরমের পর ঠান্ডা আসা ইত্যাদি। আর কোন কোনটার অনিত্ব হওয়া এভাবে প্রমাণিত যে, অপ্রধান বিষয় (عرض) অস্তিত্বহীনতা (عدم) কে গ্রহণ করে অর্থাৎ, তা বিলীন (فانی) হয়ে যায়, অথচ নিত্ব (قدیم) জিনিস কখনও বিলীন (فانی) হয় না। অতএব প্রমাণিত হল যে, অপ্রধান বিষয় (عرض) নিত্ব (قدیم) নয় বরং অনিত্ব (حادث)। আর যদি মূল উপাদান (جوہر) হয়, তাহলে মূল উপাদানসমূহও অনিত্ব। কেননা মূল উপাদান (جوہر) হয় শরীর (جسم) হবে নতুবা পরমাণু (الجزء الذی لایتجزی বা جوہر فرد), যা-ই হোক তা গতি/স্থিতি (حرکت و سکون) কে গ্রহণ করে থাকে বিধায় তা অনিত্ব (حادث)। কারণ গতি/স্থিতি (حرکت و سکون) হল অপ্রধান বিষয় (عرض) আর যার মধ্যে অপ্রধান বিষয় (عرض) বনাম অনিত্বতা (حدوث) পাওয়া যায় তা অনিত্বই হয়ে থাকে। নতুবা অনিত্বকে নিত্ব বলা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। এখন রয়ে গেল (পরবর্তি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

আল্লাহ্র অস্তিত্বের দলীল সম্পর্কে মনীষীদের কয়েকটি উক্তি

* কতিপয় যিন্দীক (নাস্তিক গোছের লোক) হযরত ইমাম আজম আবূ হানীফা (রহ.) কে আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তোমরা আমাকে একটা বিষয় একটু ভাবতে দাও। কতিপয় লোক আমাকে এই মর্মে একটা সংবাদ দিল যে, একটা সমুদ্রে ব্যবসার মালামাল বোঝাই একটা নৌকা কোনো মাঝি ছাড়াই আপনা আপনি চলছে, সমুদ্রের ঢেউ চিরে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। কারও কোনে-রূপ পরিচালনা ছাড়াই ইচ্ছেমত সেটা তার গন্তব্যে পৌঁছে যাচ্ছে। একথা শুনে তারা ইমাম সাহেবকে বলল, কোন বদ্ধ পাগল ছাড়া এমন কথা কেউ বলতে পারে না। তখন ইমামে আজম হযরত আবূ হানীফা (রহ.) বললেন, তাহলে এই মহা উর্ধ্বজগত ও অধঃজগত এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী এই ব্যাপক সৃষ্টিরাজির কোন সৃষ্টিকর্তা থাকবে না তা কী করে হয়? তখন লোকগুলো লা-জওয়াব হয়ে যায়।[১]

(পূর্ববর্তি পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা) প্রত্যেকটা শরীর (جسم) বা পরমাণু (الجزء الذى لايتجزى বা جوہر فرد)-এর জন্য গতি/স্থিতি (حرکت و سکون) অপরিহার্য হওয়ার বিষয়টা। তা এভাবে যে, শরীর (جسم) বা পরমাণু (جوہر فرد)-এর জন্য একটা স্থান (حیز) থাকা আবশ্যক। এখন এই মুহূর্তের পূর্ব থেকেই যদি সেই স্থানে তার অবস্থান চলে আসতে থাকে, তাহলে বলতে হবে সেটা স্থিতিশীল (ساکن) অর্থাৎ, তার মধ্যে স্থিতি (سکون) বিদ্যমান, নতুবা সেটা গতিসম্পন্ন (متحرک) অর্থাৎ, তার মধ্যে গতি (حرکت) বিদ্যমান ॥

২. এই যুক্তির মধ্যে জগতের সবকিছুকে অনিত্ব প্রমাণিত করে তার জন্য একজন সৃষ্টিকর্তার আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়েছে। এখন যদি জগতের কোন বস্তুর বাস্তব প্রকৃতিকেই কেউ অস্বীকার করে এবং বলে, জগতের কোনো কিছুর বাস্তব প্রকৃতি বা حقیقۃ الشئ আছে বলে আমাদের জানা নেই, তাহলে তার সামনে এই যুক্তি অচল। যেমন: এক শ্রেণীর গ্রীক দার্শনিক (حکماء یونان) বলেছিল, জগতে কোনো বস্তুর حقیقۃ الشئ বা বাস্তব প্রকৃতি আছে বলে আমাদের জানা নেই। এই শ্রেণীর দার্শনিকদেরকে বলা হয় সফিষ্ট سوفسطائیہ। এদের মধ্যে আবার ৩টা উপদল ছিল। যথা:–

(১) যারা জিদ ও হটকারিতাপূর্বক বস্তুর বাস্তব প্রকৃতি (حقیقۃ الشئ)কেই অস্বীকার করত তারা বলত, কোনো বস্তুর বাস্তব প্রকৃতি বলতে কিছু নেই, এগুলো সব কল্পনা। এদেরকে বলা হত হটকারী عنادیہ।

(২) যারা বস্তুর বাস্তব প্রকৃতিকে সমূলে অস্বীকার না করলেও তারা বলত, বস্তুর প্রকৃতি কোন প্রতিষ্ঠিত বিষয় নয় বরং তা আমাদের বিশ্বাসনির্ভর। অর্থাৎ, তারা মনে করত প্রত্যেক বস্তু তা-ই, আমরা সেটাকে যা মনে করি। যেমন: বৃক্ষকে আমরা মানুষ মনে করলে সেটাই মানুষ, ইত্যাদি। এদেরকে বলা হয় আত্মবিশ্বাসবাদী (عندیہ)।

(৩) যারা বলত কোন্টার বাস্তব প্রকৃতি কি তা আমরা নিশ্চিত জানি না। বরং সবকিছুর মধ্যে আমাদের সন্দেহ রয়েছে। এমনকি তারা বলত, আমাদের সন্দেহের ব্যাপারেও আমাদের নিশ্চিত জানা নেই, বরং সন্দেহের ব্যাপারেও আমরা সন্দিহান। এদেরকে বলা হত সংশয়বাদী (لا ادریہ) ।(شرح عقائد) এদের সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন "গ্রীক দর্শন" শিরোনামের আলোচনা।

১. فتح الملہم ج/١ থেকে গৃহীত।

* হযরত ইমাম শাফিয়ী (রহ.) কে আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "এই দেখ তুঁত গাছের পাতা। প্রত্যেক পাতার স্বাদ ও গুণ অভিন্ন। কিন্তু এই তুঁত গাছের পাতা রেশম পোকায় আহার করলে সে পাতা রেশম হয়ে বের হয়, মধু পোকায় আহার করলে তা মধু হয়ে বের হয়ে আসে, গরু ছাগলে আহার করলে গোবর হয়ে বের হয় আর হরিণে আহার করলে মৃগনাভী কস্তুরী হয়ে বের হয়। অথচ বস্তু এক।" হযরত ইমাম শাফিয়ী (রহ.) এই বক্তব্য দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই সুক্ষ কারিগরি কার? নিশ্চয়ই এর পেছনে একজন কারিগর রয়েছেন। সেই কারিগর হলে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা।[১]

* হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) কে স্রষ্টার অস্তিত্বের দলীল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি একটি ক্ষুদ্র আকারের মসৃণ দূর্গ দেখতে পাই, যাতে আসা-যাওয়ার কোনো পথ এমনকি কোনো ছিদ্র পর্যন্ত ছিল না। তার উপরটা দেখতে রূপার ন্যায় শুভ্র আর ভিতরটা স্বর্ণের ন্যায়। তারপর এক সময় সে দূর্গটি বিদীর্ণ হয় এবং তার দেয়াল ফেটে ফুটফুটে একটি বাচ্চা বের হয়ে আসে। অর্থাৎ, ডিমের ভিতর থেকে বাচ্চা বের হয়ে আসে।[২] হযরত ইমাম আহমদ ইব্নে হাম্বল (রহ.) বোঝাতে চেয়েছেন যে, এমন একটি দূর্গ সদৃশ ডিম থেকে বের হয়ে সে তার শত্রু মিত্রকে চিনতে সক্ষম হয়। তাই সে চিল কাকের উপদ্রবকালে মায়ের ডানায় আশ্রয় নেয়। যে বাচ্চা ডিমের ভিতর কোনো দানাপানি দেখেনি, সে বের হয়ে এসেই নিজের খাদ্য চিনতে পারে। ডিমের ছিদ্রহীন বদ্ধ ঘরে এই বাচ্চাটিকে এতসব কে শেখালো? যিনি শিখিয়েছেন তিনিই আল্লাহ, তিনিই সৃষ্টিকর্তা।

* এক চরকাওয়ালী বুড়িকে জিজ্ঞাসা করা হয়, জীবন তো শেষ হল চরকা কেটে কেটে, স্রষ্টার পরিচয় পেয়েছো কি? সে উত্তরে বলে, হ্যাঁ, এই চরকাই তো তার জ্বলন্ত প্রমাণ। যতক্ষণ ঘোরাই, কেবল ততক্ষণই ঘোরে। নয়তো স্থির হয়ে যায়। তাই বুঝতে বাকি নেই যে, এই ক্ষুদ্র চরকার জন্য যদি চালকের আবশ্যক হয়, তাহলে এই বিরাট বিশ্ব-ভূবনের জন্য কি চালকের দরকার নেই?[৩]

আল্লাহ্র অস্তিত্বের দলীল সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কয়েকটি উক্তি

* গাণিতিক ও রাসায়নিক ডঃ. জন ক্লীভল্যান্ড কথর‍্যান বলেন, "বিশ্বের অন্যতম প্রধান পদার্থবিজ্ঞানবিদ লর্ড কেলভীন নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন, "আপনি যদি খুব গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে বিজ্ঞান আপনাকে আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করবে।" এই উক্তি উদ্ধৃত করার পর ড. জন ক্লীভল্যান্ড কথর‍্যান বলেন, আমাকে অবশ্য স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আমিও তার এই উক্তির সাথে সম্পূর্ণ একমত।

ড. জন ক্লীভল্যান্ড কথর‍্যান আরও বলেন, "রসায়ন শাস্ত্র এই তথ্য প্রকাশ করে যে, জড় পদার্থ ক্রমশ বিলুপ্ত হচ্ছে। কতক খুব ধীরে ধীরে আবার কতক অত্যন্ত

---

১. فتح الملہم ج/١ ২. أيضا ৩. হক ও বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব, আহমদ শফী।

তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কাজেই বলা চলে, জড় পদার্থের অস্তিত্ব শাশ্বত নয়। অতএব, নিশ্চয়ই জড় পদার্থের একটা আরম্ভও রয়েছে।"

ড. জন ক্লীভল্যান্ড কথর‍্যান আরও বলেছেন, এই জড়জগত যখন নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারেনি, পারেনি তাকে পরিচালনাকারী আইনাবলী সৃষ্টি করতে, তখন সৃষ্টির এই কাজ নিশ্চয় অজড় কোন প্রতিনিধি দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে ... এবং এই প্রতিনিধি নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার অধিকারী।

* গাণিতিক ও পদার্থ বিজ্ঞানবিদ ডোনাল্ড হেনরী পোটার বলেন, "আমার বক্তব্য হল, যদি এই ধারাবাহিক সৃষ্টি সম্পর্কিত থিউরী সমর্থন করতে হয়, তাহলে আমি অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে স্বীকার করব।"

ডোনাল্ড হেনরী পোটার আরও বলেন, "প্রকৃতির উৎপত্তি সম্পর্কে যেকোনো কিছুই বিবেচনা করা হোক না কেন, একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে সকল বিষয়ে সক্রিয় বিবেচনা করা হোক না কেন, একজন বিজ্ঞানী হিসাবে সকল বিষয়ের প্রধান ভূমিকায় আল্লাহ্‌কে বসিয়ে আমি পরম সন্তুষ্টি লাভ করি। প্রতিটি ছবিতে (ক্ষেত্রে) আল্লাহ্ হচ্ছেন মূল চরিত্র। আর যেসব প্রশ্নের আজও জবাব দেয়া হয়নি, একমাত্র তিনিই তার জবাব।"

* প্রাণপদার্থ বিজ্ঞানবিদ পলক্ল্যারেন্স ইবারসোল্ড বলেন, "ইংরেজ দার্শনিক ও রাজনীতিক ফ্যান্সিস বেকন তিন শতাব্দীরও আগে বলেছিলেন, সামান্য দর্শনজ্ঞান মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায় আর গভীর দর্শনজ্ঞান তাকে ধর্মের পথে টেনে আনে।"

পলক্ল্যারেন্স আরও বলেন, "মানব জাতির অভ্যুদয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষকে লক্ষ দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যা দাঁড়ায়, তার চেয়েও বেশিসংখ্যক চিন্তাশীল অনুসন্ধিৎসু প্রতিটি ব্যক্তিস্বতন্ত্র এইসব রহস্যময় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন, কোন্ সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষা, কোন্ অনন্ত শক্তিশালী মানুষ এই অন্তহীন মহাবিশ্বকে পরিচালনা করেন? জীবন ও মানুষের অভিজ্ঞতার মূলে অথবা বাইরে কী আছে?

পলক্ল্যারেন্স আরও বলেন, আল্লাহ কোনো অর্থেই শরীর নন। তাই শারীরিক উপলব্ধি দিয়ে তাঁকে বোঝানো মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এই সঙ্গে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক প্রমাণ বিদ্যমান। এবং তিনি যে বুদ্ধি, জ্ঞান ও শক্তিতে বর্ণনাতীত তাঁর সৃষ্টি সে কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

পলক্ল্যারেন্স আরও বলেন, "আমরা একটি বিষয় অবশ্যই উপলব্ধি করি যে, মানুষ ও এই মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ শূন্যতা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়নি। নিশ্চয় এসবের আরম্ভ আছে এবং সেহেতু একজন আরম্ভকর্তাও রয়েছেন"।

* শরীরবৃত্তবিদ মারলিন বুকস ক্রীডার বলেন, "সাধারণ মানুষ হিসেবে এবং বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও গবেষণায় জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তি হিসাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার মনে আদৌ সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ আছেন। তবে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। গবেষণাগারের নিয়মমাফিক পারা যায় না তাঁকে

কোনো প্রকার বিশ্লেষণ বা পুংখানুপুংখরূপে বিচার করে দেখা। তিনি হচ্ছেন অপ্রাকৃতিক, আত্মিক, প্রজ্ঞাবান, সৃজনশীল, সর্বশক্তির আধার।

মারলিন বুক্স ক্রীডার আরও বলেন, "তাঁর (আল্লাহ্‌র) অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যদিও আমরা সাধারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি না, তবুও আমরা মানুষ ও প্রকৃতিতে তাঁর অস্তিত্বের অগণিত প্রমাণ ছড়িয়ে আছে, তা নিয়ে গবেষণা করতে পারি। আমার মনে হয়, ঐ সব প্রমাণ যেমন সুস্পষ্ট তেমনি বিশ্বাসজনক।"

* পদার্থবিদ জর্জ আর্ল ডেভিস বলেন, "একজন পদার্থ বিজ্ঞানী হিসাবে এই মহাবিশ্বের অবিশ্বাস্য জটিল কাঠামোর যৎকিঞ্চিৎ দেখার সুযোগ হয়েছে আমার, যার ক্ষুদ্রতম পরমাণুর অভ্যন্তরীণ প্রাণস্পন্দন বৃহত্তম নক্ষত্রের বিশাল কর্মতৎপরতার তুলনায় কোনো অংশেই কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। যেখানে প্রতিটি আলোকরশ্মি, প্রতিটি প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক বিক্রিয়া, প্রতিটি প্রাণীর প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য একই অপরিবর্তনীয় আইনাবলীর নির্দেশ মোতাবেক আত্মপ্রকাশ ও নিজস্ব পথে পরিচালিত হয়ে থাকে।"

তিনি আরও বলেন, (প্রতিপক্ষের ধারণামতে) "যদি একটা মহাবিশ্ব নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে বাধ্য হয়েই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে, এই বিশ্বই খোদা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে। তবে এখানে এক অদ্ভুতরূপে আল্লাহ্‌কে কল্পনা করা হচ্ছে- আল্লাহ্‌র আধ্যাত্মিক ও জড় উভয়রূপে। আমি কিন্তু এমন এক আল্লাহ্‌র কথা চিন্তা করতে পছন্দ করি, যিনি নিজের সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য রেখে একটা জড় জগতকে সৃজন করেননি। কিন্তু তাঁরই সৃষ্টি সেই বিশ্বের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে আছেন।"

* পদার্থ বিজ্ঞানবিদ ও রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ ড. অস্কার লিও ব্রউয়ার বলেন, "মহাবিশ্বের বিশাল আকার এবং নক্ষত্রমণ্ডলী ও অগণন সংখ্যা ও কল্পনাতীত জড়পিণ্ডের ওজন সম্পর্কিত আমাদের আলোচনায় ফিরে এসে এবং এই সকল নক্ষত্র গ্রহ পরিচালনাকারী আইনাবলীর বিধিতত্ত্বের কথা চিন্তা করে যখন দেখি, আমাদের কমিউনিষ্ট বন্ধুরা –যাদের নিয়ে গোটা মানব জাতির একটা বিরাট অংশ গড়ে উঠেছে, তারা– "আল্লাহ্ যে আছেন" এ চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন, তখন সত্যিই অ দ্ভুত লাগে না কি? অকমিউনিষ্ট বিশ্বেরও শিক্ষিত সমাজের একটা বিরাট অংশ আল্লাহ্‌কে অবজ্ঞা করে প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকেই অস্বীকার করছেন দেখলে তাও তেমনি অদ্ভুত লাগে না কি?"

ড. অস্কার লিও ব্রউয়ার আরও বলেন, "নাস্তিকতার অর্থ হচ্ছে দ্বন্দ্ব আর যুদ্ধ। বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি এর কোনটিই চাই না। থিউরী হিসাবে আমি নাস্তিকতাকে অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত বলে মনে করি। বাস্তব দিক থেকে আমার মনে হয় এটা মারাত্মক ক্ষতিকর।"

* প্রকৃতি বিজ্ঞানী ড. ইরভিং উইলিয়াম নবলচ বলেন, "আমি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী। যে জন্য বিশ্বাস করি তার কারণ হচ্ছে, আমি মনে করি না সর্বপ্রথম ইলেকট্রোন অথবা প্রথম প্রোটোন অথবা প্রথম পরমাণু বা প্রথম এনিমো-এসিড অথবা প্রথম প্রোটো-প্লাজম অথবা প্রথম বীজ অথবা সর্বপ্রথম মস্তিস্কটির জন্মের জন্য কেবল দৈব দায়ী। আমার কাছে এ সবকিছুর মূলে আল্লাহর পবিত্র অস্তিত্বই একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা হতে পারে।" তিনি আরও বলেন, "বিখ্যাত মার্কিন চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ অলিবার ওয়েনডেল এক সময় বলেছিলেন যে, "জ্ঞান যতই বাড়তে থাকে, বিজ্ঞান ততই ধর্মকে ভ্রুকুটি করা থেকে বিরত হয়। বিজ্ঞানকে উপযুক্ততার সঙ্গে বুঝতে পারলে দেখা যাবে, সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপার বিজ্ঞানই অধিক থেকে অধিকতর সম্ভাবনাময় করে তোলে।"

* গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যাবিদ ডঃ মার্লিন গ্র্যান্ট স্মীথ বলেন, "আমার কথা হচ্ছে এ আল্লাহ্ কোন এক অনির্বচনীয়, চঞ্চলমতি স্বর্গীয় বা ইথারীয় সত্তা নয়। অনেক যুগে আর অনেক স্থানে অতি উৎসাহী সব মন থেকে উদ্ভূত কাল্পনিক সাজানো গল্পের চেয়ে অনেক সুসমঞ্জস সত্তা। অধিকন্তু এক আল্লাহ্ হচ্ছেন বাইবেলে বর্ণিত আল্লাহ্, যাঁকে সকল পয়গম্বর ও তাঁদের বাণীর প্রচারকগণ বিশ্বাস এবং বর্ণনা করেছেন।"

ড. মার্লিন গ্র্যান্ট স্মীথ আরও বলেন, "মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে সকল যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ অশিক্ষিত সরল অথবা জ্ঞানী আর বৈজ্ঞানিকগণ এ সাক্ষ্য দিয়ে এসেছেন যে, তারা যথার্থই তাদের অন্তরাত্মায় আল্লাহর উপস্থিতি উপলব্ধি করেছেন। আমরা তাদের সে সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে কী করব? বর্জন করব? অবজ্ঞা করব? অগণিত মানুষ যে "অবর্ণনীয় আনন্দ ও গৌরব" লাভ করেছেন, আমরা কি তাকে দৃষ্টির আড়াল করে চাপা দিয়ে রাখব? শহীদ আর ধর্মপ্রাণ ও ধর্মের বাণী প্রচারের জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছে, তাঁদের যে ঈমান নিঃসঙ্গতার মধ্যে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে, অহরহ কষ্ট স্বীকার করিয়েছে, সকল নির্যাতন সহ্য করিয়েছে, মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করতে দিয়েছে, আমরা কি সে সম্পর্কে নির্লজ্জের মত উদাসীন থাকতে পারি? পারি আপন মনে এ কথা বলতে, সে সবই ভুল? আমার কথা হচ্ছে, আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ্ আছেন এবং যারা তাঁকে অধ্যবসায় সহকারে পাওয়ার চেষ্টা করেন তিনি তাদের জন্য মহা পুরস্কারদাতা।" (হিব্রু ১১ : ৬)

* কনসাল্টিং কেমিষ্ট জন অ্যাডল্‌ফ বুয়েহ্‌লার বলেন, "আজকের দিনের বিজ্ঞানের বিশ্বাস- যে প্রাকৃতিক আইন আমাদের গ্রহকে পরিচালনা করে, মহাশূন্যের অন্যান্য গ্রহগুলোও সেই একই আইনানুসারে পরিচালিত। যেদিকে আমরা তাকাই, সর্বত্র আমাদের নজরে পড়ে সুকল্পিত পরিকল্পনা, ক্রম এবং সমন্বয়। তাই আমার মনে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, সর্বশ্রেষ্ঠ এক মনীষা এসব কিছুর পরিকল্পনা করেছেন, সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই এ মহাবিশ্বকে এর নির্দিষ্ট গন্তব্য পথে পরিচালনা করেছেন।"

* জীববিদ্যাবিদ ড. আলবার্ট ম্যাক্‌কম্‌রস উইনচেষ্টার বলেন, "অনেকের কাছেই বিজ্ঞান ও ধর্ম হচ্ছে দুটো বিরুদ্ধ শক্তি। কেউ যদি একটিকে আঁকড়ে ধরে, এদের মতে তাহলে অন্যটিকে বর্জন করতে হয়। আজ আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে একথাই বলছি যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে অধ্যয়ন আর গবেষণার পর আল্লাহ্‌তে আমার বিশ্বাস শিথিল না হয়ে আরও জোরদার হয়েছে এবং পূর্বের চেয়ে আরও মজবুত বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি বৈজ্ঞানিক নয়া আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র মর্যাদা আর শক্তিমত্তা সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টি দান করে, তা আরও জোরদার হয়।"

* ভূ রাসায়নিক ডোনাল্ড রবার্টকার বলেন, "আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার পক্ষে খোলা মন নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ অসম্ভব। এটা অপর পক্ষে অবৈজ্ঞানিক শোনাবে। আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন। তার পর আমি খাঁটি বিজ্ঞানসম্মত ধরনের কতিপয় মন্তব্য পেশ করব। তিনি বলেন, ভূ-রসায়ন সম্পর্কিত গবেষণা ব্যাপক আকারে সমুদয় বস্তুর প্রতি নজর দিতে শিক্ষা দিয়ে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসের কোটি কোটি বছরের প্রতি একবার চিন্তা নিবদ্ধ করতে, যে মহাশূন্য মহাবিশ্বকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে, আরেক বার তার দিকে এবং সর্বশেষ বিশ্বব্যাপী আবর্তনের যে প্রক্রিয়া বিদ্যমান, তাকেও অবলোকন করতে শিক্ষা দেয়। সবকিছুর বিশালত্বই মানুষকে আল্লাহ্‌র মহত্ব নতুনভাবে উপলব্ধি করতে, হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে।"

* কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার (নিউইয়র্ক) ড. ক্লাড, এম, হ্যাথাওয়ে বলেন, "আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস সম্পর্কিত আমার যুক্তিসঙ্গত কারণসমূহ সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে আমি বলতে চাই যে, আল্লাহ্‌তে আমার যে বিশ্বাস-তার অধিকাংশই জীবনের এ বয়সে, যাকে অভিজ্ঞতা বলে উল্লেখ করা যায়, তার উপর প্রতিষ্ঠিত।"

ড. ক্লাড, এম, হ্যাথাওয়ে আরও বলেন, "পরিকল্পনার জন্যে একজন পরিকল্পকের প্রয়োজন। আল্লাহ্‌তে আমার বিশ্বাসের এ মৌলিক যুক্তিযুক্ত কারণটি আমার ইঞ্জিনিয়ারিং অভিজ্ঞতা দ্বারা অনেকখানি সমর্থিত হয়েছে। ... অতএব, এমনি অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের চারিদিকে দুনিয়ায় যে কল্পনাতীত পরিকল্পনা ছড়িয়ে আছে, তা দেখে এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং অসীম মনীষার অধিকারী পরিকল্পকের কাজ ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তাই আসতে পারে না। নিঃসন্দেহে এ একটি পুরানো যুক্তি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ এমন এক যুক্তি, যাকে আধুনিক বিজ্ঞান পূর্বাপেক্ষা আরও অধিকতর অখণ্ডনীয় করে তুলেছে।"

* জীববিদ সিসিল বয়েস হ্যাম্যান বলেন, "বিজ্ঞান জগতের যেদিকেই আমি দৃষ্টি ফিরাই না কেন, সর্বত্র পরিকল্পনা, আইন ও শৃংখলার- সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য দেখতে পাই। সূর্যোকরোজ্জ্বল রাস্তা দিয়ে হেঁটে এগিয়ে যান এবং সেই সঙ্গে ফুলের অত্যন্ত খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্যগুলো একবার লক্ষ করুন, মন দিয়ে রবিন পাখীর মিষ্ট গান শুনুন (আর চিন্তা করুন) পতঙ্গকে আকর্ষণকারী ফুলের যে মধু, তা কি

আকস্মিকভাবে ফুলের মধ্যে পৌছেছে? পতঙ্গ যে আগামী বছর আরও ফুল জন্মানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল তা কি আকস্মিকভাবে হলো? অতি ক্ষুদ্র পুষ্পরেণু ফুলের গর্ভকোষের মধ্যে ক্রমশ অঙ্কুরিত হয়ে যে বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে, এটাকে কি মামুলি দৈব ব্যাপার বলে উল্লেখ করা চলে?”

সিসিল বয়েস হ্যাম্যান আরও বলেন, “একবার নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালে সেখানকার সুশৃংখল দৃশ্য দেখে আমাদেরকে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। রাতের পর রাত, ঋতুর পর ঋতু, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহিঃশূন্যের সকল জগত আকাশ পথে নিজ নিজ কক্ষে এগিয়ে চলেছে। তারা নিজ কক্ষ পথে নির্দিষ্ট স্থানে এমন নির্ভুলভাবে ফিরে আসে যে, বহু শতাব্দী আগেও সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারতো। এরপরেও কি এমন কোন ব্যক্তি থাকতে পারেন, যিনি এগুলোকে দৈবক্রমে একীভূত জ্যোতিষ্ক জাতীয় পদার্থ বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, উদ্দেশ্যহীনভাবেই এগুলো আকাশ মার্গে বিচরণ করছে? যদি তাদেরকে পরিচালনের কোনো আইন না থেকে থাকে, তাহলে মানুষ কি তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের নির্দেশ মোতাবেক সেগুলোকে আকাশের অচিহ্নিত পথে পরিচালিত করতে পারবে?[১]

আল্লাহ্‌র যাত বা সত্তার প্রতি ঈমান/বিশ্বাস রাখার পর্যায়ে কয়েকটি মৌলিক বা বুনিয়াদী বিষয়

আল্লাহ্‌র যাত বা সত্তার প্রতি ঈমান/বিশ্বাস রাখার পর্যায়ে কয়েকটি মৌলিক বা বুনিয়াদী বিষয় রয়েছে। যথা:–

১. তাঁর সত্তা সমস্ত গুণাবলীসহ আপনা আপনি অস্তিত্বশীল।

২. তাঁর সত্তা এমন, যিনি নিজ সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি স্থান ও কালের গণ্ডি থেকে মুক্ত। কারণ স্থান হয়ে থাকে মাখলূকের ন্যায় দেহ বিশিষ্ট বস্তুর জন্য, আর আল্লাহ তাআলা সেরূপ দেহ থেকে পবিত্র। তদুপরি সমগ্র জগত তাঁর সামনে একটা অণু পরিমাণ বস্তু সমতুল্য, তিনি কীভাবে তার মধ্যে সমাহিত হতে পারেন? তিনি সর্বত্র বিদ্যমান। কোন স্থানের কোন কিছু তাঁর অগোচর নয়। তবে উল্লেখ্য যে, “তিনি সর্বত্র বিদ্যমান” এর অর্থ হল তিনি ইলমগতভাবে এবং কুদরতগতভাবে সর্বত্র বিদ্যমান। রাজী, সুয়ূতী, বায়জাবী, ইবনে কাইয়্যেম, আবুস সুউদ, আশরাফ আলী থানবী প্রমুখ অনেক মুফাসসির সূরা হাদীদের ৪ নং আয়াত (তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন)–এর ব্যাখ্যায় স্পষ্টত বলেছেন, এ কথার অর্থ হল তিনি ইলমগতভাবে এবং কুদরতগতভাবে তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তোমাদের সবকিছু তাঁর পর্যবেক্ষণে রয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, “আল্লাহ সর্বত্র বিদ্যমান” একথা বলাতে

১. বৈজ্ঞানিকদের এ উক্তিসমূহ ‘চল্লিশজন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব’ গ্রন্থ থেকে সংকলিত। উক্ত গ্রন্থে উল্লেখিত প্রত্যেক বিজ্ঞানীর বিস্তারিত পরিচয় রয়েছে।

কোনো অসুবিধে নেই, যদি কথাটির উদ্দেশ্য সহীহ থাকে। তাফসীরে কাবীরে বলা হয়েছে,

والمسلمون يقولون : "إنه تعالى بكل مكان" ويريدون به التدبير والحفظ والحراسة. (التفسير الكبير تحت قوله تعالى : ﴿وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ.﴾

অর্থাৎ, মুসলমানরা যে বলেন, “আল্লাহ সব স্থানে আছেন” এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল তিনি সবকিছুর ব্যবস্থাপনা করেন, সংরক্ষণ করেন, তত্ত্বাবধান করেন।[১]

৩. তিনি عرش অর্থাৎ, কোন দেহের সাথে সংযুক্ত বিষয় নন। কেননা عرض বলা হলে তাঁর সত্তার সূচিত বিষয় বা অনিত্য (حادث) হওয়া অবধারিত হয়ে যায়, অথচ আল্লাহ্‌র সত্তা নিত্য বা قديم। অর্থাৎ যা অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান। তদুপরি عرض বললে যার সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট, তাঁকে তার মুখাপেক্ষী বলতে হয়, অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন।

৪. তিনি কোন উপাদান (جوہر) গঠিত দেহ বিশিষ্ট নন। কেননা দেহ (جسم) একাধিক অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্‌র দেহ স্বীকার করলে তাঁর একাধিক অংশ স্বীকার করতে হয়। আর একাধিক অংশের ক্ষেত্রে এক অংশ অপর অংশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ তাআলা মুখাপেক্ষিতা থেকে পবিত্র।

৫. তাঁর সত্তা ডান-বাম, উপর-নিচ, সম্মুখ-পশ্চাত ইত্যাদি দিক থেকে মুক্ত। কেননা, এতে করে আল্লাহ্‌র নিদৃষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ হওয়া অবধারিত হয়ে যায়। তদুপরি এতে করে আল্লাহ্‌র অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও দেহ সাব্যস্ত হয়ে যায়। যেমন: আল্লাহ্‌র উপর আছে বলতে গেলে তাঁর মাথা আছে বলতে হয়, কেননা উপর বলা হয় মাথার দিককে। এমনিভাবে তাঁর নিচ আছে বলতে গেলে তাঁর পা আছে বলতে হয়, কেননা, নিচ বলা হয় পায়ের দিককে। ইত্যাদি। সারকথা, তিনি নিরাকার তথা মাখলূকের ন্যায় আকার বিশিষ্ট নন। ডান-বাম, উপর-নিচ, সম্মুখ-পশ্চাত ইত্যাদি দিক থেকে মুক্ত। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন এ গ্রন্থের “মুজাসসিমা, মুশাব্বিহা ও মুআত্তিলা ফিরকা” শীর্ষক আলোচনা।

৬. আল্লাহ্‌ তাআলা সূরত-আকৃতি, দিক ও প্রান্ত থেকে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও পরকালে দৃষ্টিগোচর হবেন। দুনিয়াতে তাঁর সত্তার দর্শন সম্ভব, তবে সংঘটিত হয়নি। পরকালে দৃষ্টিগোচর হওয়ার দলীল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত–

﴿وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.﴾

অর্থাৎ, সেদিন (কেয়ামতের দিন) কতক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের

১. তাফসীরে কাবীরে وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ (সূরা হাদীদ: ৪) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, قال المتكلمون : هذه المعية إما بالعلم وإما بالحفظ والحراسة، وعلى التقديرين فقد انعقد الإجماع على أنه سبحانه ليس معنا بالمكان والجهة والحيز، فإذن قوله : وَهُوَ مَعَكُمْ) لا بد فيه من التأويل.

প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। (সূরা: ৭৫-কিয়ামাহ: ২২-২৩)
এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য "আল্লাহ্র দীদার প্রসঙ্গ" শীর্ষক আলোচনা দেখুন।

৭. আল্লাহ্র সত্তা কারও সত্তার মধ্যে মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হয় না বা প্রবেশ (حلول) হয় না এবং তাঁর সত্তার মধ্যেও কেউ মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হয় না। খৃষ্টানদের ধারণামতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-এর মধ্যে প্রবেশ حلول করেছিলেন অর্থাৎ, অবতারিত হয়েছিলেন। হিন্দুদের বিশ্বাসমতে ঈশ্বর মানুষ, প্রাণী, বৃক্ষ পাথর সবকিছুর মধ্যে প্রবেশ (حلول) করেন অর্থাৎ, অবতারিত হন। এরূপ বিশ্বাস পোষণকারীদেরকে হুলুলিয়া (حلوليه) বলা হয়। এরূপ বিশ্বাস কুফ্রী। মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী عقائد الاسلام কিতাবে বলেছেন, "যেসব মূর্খ লোকেরা বলে, আল্লাহ্র খাস ওলীগণ আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে এমনভাবে লীন হয়ে যান, যেমন বরফ পানির মধ্যে এবং বিন্দু দরিয়ার মধ্যে লীন হয়ে যায়, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং স্পষ্ট কুফ্র।" কাযী ইয়ায (রহ.) الشفا بمعرفة حقوق المصطفى কিতাবে বলেছেন, "সকল মুসলমানের ইজমা যে, যারা হুলূলের প্রবক্তা তারা কাফের।"

(খ) পূর্বে "আল্লাহর উপর ঈমান" বলতে কী বোঝায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহর উপর ঈমান বলতে বোঝায় আল্লাহর যাত তথা আল্লাহর সত্তার প্রতি বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ্র সিফাত অর্থাৎ, গুণাবলীতে বিশ্বাস করা। এতক্ষণ আল্লাহর যাতের প্রতি ঈমানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এখন আল্লাহর সিফাত তথা আল্লাহর গুণাবলী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হচ্ছে।

আল্লাহ্র গুণাবলী তাঁর গুণবাচক নামসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। নিম্নে আল্লাহ্র সিফাত (আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহ) এবং তৎসঞ্জাত ও তৎসংশ্লিষ্ট আকীদাসমূহ উল্লেখ করা হল। তবে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তাআলার সিফাত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত (اجمالى) ঈমানই যথেষ্ট। বিস্তারিত জানা সকলের জন্য আবশ্যকীয় নয়, কেবলমাত্র উলামায়ে কেরামের জন্য (যথাসাধ্য) তা জানা আবশ্যকীয়।

আল্লাহ্র সিফাত বা গুণ প্রকাশক নাম এবং তৎসঞ্জাত ও তৎসংশ্লিষ্ট আকীদাসমূহ

আল্লাহ্র সিফাত বা গুণ প্রকাশক ৯৯টি নাম রয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহ তাআলার বিস্তারিত গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে। এরূপ ৯৯টি নাম এবং তৎসংশ্লিষ্ট ও তৎসঞ্জাত আকীদাসমূহ নিম্নরূপ।

১. الحى (আল-হায়্যু)- চিরঞ্জীব;
২. القيوم (আল-কায়্যুম)-স্বপ্রতিষ্ঠ, সংরক্ষণকারী;

* আল্লাহ্ তাআলা চিরঞ্জীব (الحى)। চিরঞ্জীব না হলে পরবর্তীতে সৃষ্টি হওয়ায় তিনি মাখলূকে পরিণত হয়ে যান।

* আল্লাহ্ তাআলা চিরকাল থেকে আছেন, তাঁকে কেউ প্রতিষ্ঠিত করেননি। বরং তিনি নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত। তিনি সমস্ত সৃষ্টির সত্তা ও গুণাবলীর অস্তিত্ব দানকারী ও তার সংরক্ষণকারী (القيوم)। সারকথা- সবকিছুর অস্তিত্ব তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁর অস্তিত্ব কারও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُه سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, স্ব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বধাতা। তাঁকে স্পর্শ করে না তন্দ্রা, আর না নিদ্রা। (সূরা: ২-বাকারা: ২৫৫)

৩. الحق (আল-হাক্কু)- সত্য

* তিনি প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং হক মা'বূদ। তাঁর খোদায়ী এবং শাহানশাহী সত্য ও যথার্থ। তিনি ব্যতীত আর সব মিথ্যা ও বাতিল।

৪. الأول (আল-আওয়ালু)-প্রথম অর্থাৎ, অনাদি;
৫. الآخر (আল-আখিরু)-শেষ অর্থাৎ, অনন্ত,
৬. الباقى (আল-বাকীউ)-চিরস্থায়ী

* তিনি অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান (الأول) অর্থাৎ, তাঁর অস্তিত্ব অনাদিকাল থেকে বিরাজমান। তাঁর অস্তিত্বে কখনও অনস্তিত্ব ছিল না। তাঁর সত্তা অনাদি (قديم)। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ.﴾

অর্থাৎ, তিনিই আদি এবং তিনিই অনন্ত। (সূরা: ৫৭-হাদীদ: ৩)

* আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত অন্য কোন কিছু অনাদি (قديم) নয়। যারা মৌলিক উপাদান (مادة/ہیولی), সূরত (صورت), বুদ্ধি (عقول) ও আসমান সমূহকে অনাদি (قديم) বলে থাকে, ইমাম গাযালীর মতে তারা কাফের।

* তাঁর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী (واجب الوجود) হওয়ার কারণেই তাঁর অস্তিত্ব সদা সর্বদা টিকে থাকবে। অর্থাৎ, তিনি চির বাকী (الباقى) অনন্ত। তিনি যেমন অনাদি (الأول), তেমনি অনন্ত (الآخر)। তাঁর অস্তিত্বে যেমন কখনও অনস্তিত্ব ছিল না, কখনও অনস্তিত্ব আসবেও না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿كُلُّ شَيْئٍ هَلِكٌ اِلَّا وَجْهَه.﴾

অর্থাৎ, তাঁর (আল্লাহ্র) সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল। (সূরা: ২৯-আনকাবূত: ৮৮)

﴿وَّ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ.﴾

অর্থাৎ, অবশিষ্ট থাকবে কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব। (সূরা: ৫৫-রহ্মান: ২৭)

৭. الظاهر (আয্ যাহিরু)-প্রকাশ্য;

৮. الباطن (আল-বাতিনু)-গুপ্ত;

* আল্লাহ্র অস্তিত্ব দেখা যায় না, তাঁর অস্তিত্ব গোপন। অর্থাৎ, তিনি গুপ্ত (الباطن)।

* তাঁর অস্তিত্ব সুক্ষ্ম ও গুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টির অণু-পরমাণু পর্যন্ত তাঁর অস্তিত্বের ও তাঁর কুদরতের নিদর্শন বহন করে চলেছে। এ হিসাবে তিনি প্রকাশ্য (الظاهر)। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْأٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ.﴾

অর্থাৎ, তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গুপ্ত। (সূরা: ৫৭-হাদীদ: ৩)

৯. العليم (আল-আলীমু)-মহাজ্ঞানী;

১০. الخبير (আল-খবীরু)-সর্বজ্ঞ;

১১. اللطيف (আল-লাতীফু)-সুক্ষ্ম;

* আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলের সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত ও জ্ঞানী। কোনো কিছু তাঁর থেকে গোপন নয়। ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনো কিছু তাঁর জানার আওতা থেকে বাইরে নয়।[১]

* সমগ্র মাখ্লূকের ক্ষুদ্র-বৃহৎ, জাহের-বাতেন সর্ব বিষয়ে তিনি অবগত। অর্থাৎ, তিনি মহাজ্ঞানী (العليم)। কেউ কেউ বলেছেন, যিনি বাতিনী বিষয় (امور باطنہ) জানেন, তাকে خبیر বলে এবং সাধারভাবে জাননেওয়ালাকে علیم বলে।[২] কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿اِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.﴾

অর্থাৎ, অবশ্যই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (সূরা: ৮-আনফাল: ৭৫)

﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ وَ لَا أَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَا أَكْبَرُ.﴾

অর্থাৎ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ কোনো কিছু তাঁর অগোচর নয়। (সূরা: ৩৪-সাবা: ৩)

﴿عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ.﴾

অর্থাৎ, তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সর্ব বিষয়ের পরিজ্ঞাতা। তিনি অত্যন্ত মেহেরবান, অতি দয়ালু। (সূরা: ৫৯-হাশর: ২২)

১. কোন কোন গ্রীক দার্শনিকের ধারণা ছিল আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ব্যক্তি যেমন যায়েদ, ওমর, বকর প্রমুখের সামগ্রিক অবস্থা সম্বন্ধে অবগত, তবে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় (جزئیات) সম্বন্ধে বিশেষ সময়ে অবগত নন। ইয়াহুদী, খৃষ্টান প্রমুখ ধর্মাবলম্বীদের আকীদা থেকেও অনুরূপ মনে হয় যে, তাদের ধারণায় খোদা কোন কোন বিষয়ে জ্ঞান রাখেন না। عقائد الإسلام . عبد الحق حقاني

২. علم الکلام. ادریس کاندھلوی .

﴿وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْأَرْضِ وَ لَا رَطْبٍ وَّ لَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.﴾

অর্থাৎ, তিনি পানি ও স্থলভাগে যা আছে সে সম্বন্ধে অবগত। বৃক্ষের একটা পাতা পতিত হলেও, মাটির অন্ধকারে কোন দানা (গজাতে) থাকলেও এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ যা কিছুই আছে সব সম্বন্ধে তিনি অবগত। সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফূজে) রয়েছে। (সূরা: ৬-আনআম: ৫৯)

* আল্লাহ তাআলা যখন সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তখন সবকিছুর যাবতীয় জ্ঞান অবশ্যই তাঁর থাকবে। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির বিষয়ে অনবগত থাকবেন তা অসম্ভব। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ.﴾

অর্থাৎ, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি অবগত নন? তিনি সুক্ষ্ম, সর্বজ্ঞ। (সূরা: ৬৭-মুল্ক: ১৪)

* আল্লাহ্র জ্ঞান অনাদি (قدیم)। তিনি অনাদিকাল থেকে সর্ববিষয়ে অবগত। ভবিষ্যতে তাঁর মাখ্লূকের মধ্যে যা সৃষ্টি হবে বা যেসব অনিত্য বিষয় (امر حادث) ঘটবে, সেসব বিষয়ে তাঁর অনাদি জ্ঞান (علم ازلی) রয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর জ্ঞানে অনিত্য কোন বিষয়ের জ্ঞান সংযোজিত হয় না। বরং যেকোনো ঘটিত অনিত্য বিষয় সম্বন্ধে অনাদিকাল থেকেই তিনি অবগত।

* গায়েব সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহ্র খাস সিফাত বা গুণ। অতীত ও ভবিষ্যতের যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, যা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন।[১]

* তিনি সবকিছুর জাহের বাতেন সম্বন্ধে যেমন অবগত, তেমনিভাবে সবকিছুর হাকীকত ও স্বরূপ সম্বন্ধেও অবগত। অর্থাৎ, তিনি সর্বজ্ঞ (الخبير)।

* আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে হাজির-নাজির জানা স্পষ্ট গোমরাহী ও বাতিল পন্থা। যারা বলে নবী কারীম (সা.) সর্বত্র হাজির-নাজির কিংবা তিনি গায়েব সম্পর্কে অবগত, (عالم الغيب) তারা কুরআন বুঝতে অপারগ সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব মীলাদের মজলিসে রসূল (সা.)-এর হাজির হওয়া এবং এ ধারণার ভিত্তিতে কিয়াম করা (দণ্ডায়মান হওয়া) নিছক কল্পনা এবং বিভ্রান্তি।[২]

* তিনি সুক্ষ্মদর্শী (اللطيف) অর্থাৎ, এমন গোপন ও সুক্ষ্ম বিষয়ও তিনি অনুভব করেন যেখানে দৃষ্টি পৌঁছতে সক্ষম নয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ.﴾

অর্থাৎ, তিনি সুক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ। (সূরা: ৬৭-মুল্ক: ১৪)

১. بدائع الكلام . مولانا المفتي يوسف التاؤلوي

২. প্রাগুক্ত।

১২. الحكيم (আল-হাকীমু) প্রজ্ঞাময়;

* আল্লাহ তাআলার জ্ঞান পূর্ণত্বের স্তরে উপনীত। যেহেতু তিনি সবকিছুর জাহের বাতেন এবং সবকিছুর প্রকৃত স্বরূপ ও মূল রহস্য সম্বন্ধে অবগত, এ হিসাবে তাঁর জ্ঞান পূর্ণত্বের স্তরে উপনীত। তাঁর এই পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতেই তাঁর সব কাজ-কর্ম ও কথা হয়ে থাকে প্রজ্ঞাময়। অতএব তিনি হেকমতওয়ালা (الحكيم) বা প্রজ্ঞাময়। হেকমত (حكمت) বলা হয় পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে কাজ-কর্ম এবং কথা যথাযথ ও পাকাপোক্ত হওয়া।[১] কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ.﴾

অর্থাৎ, তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সর্ব বিষয়ের পরিজ্ঞাতা। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা: ৬-আনআম: ৭৩)

১৩. الواسع (আল-ওয়াছিউ)-সর্বব্যাপী;

* তাঁর জ্ঞান ও দান সবটাই ব্যাপক। তাঁর জ্ঞান ও দানের আওতা থেকে কোনো কিছু বাইরে নয়। তিনি তাঁর জ্ঞান ও নেয়ামত দিয়ে সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন– এ অর্থে তিনি সর্বব্যাপী (الواسع)।

১৪. الملك (আল-মালিকু)-অধিপতি, সম্রাট,

১৫. مالك الملك (মালিকুল মুল্‌ক)-সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক;

* তিনি সকলের সম্রাট বা অধিপতি এবং সবকিছুর প্রকৃত মালিক। অতএব তিনি যা যেভাবে ইচ্ছা তৈরি করেন। সবকিছুর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও সবকিছু পরিচালনার ব্যাপারে তিনি একচ্ছত্র ইচ্ছার অধিকারী (مختار مطلق)। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُ.﴾

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। (সূরা: ২৮-কাসাস: ৬৮)

﴿إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ.﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ যা চান করেন। (সূরাঃ ২২-হজ্জঃ ১৮)

* তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী (مالك الملك)। অতএব তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন হুকুম করবেন, যেমন ইচ্ছা তেমন হস্তক্ষেপ করবেন, কেউ তাঁর হুকুম ও হস্তক্ষেপে বাধ সাধতে পারবে না। তিনি রাজাধিরাজ, তাই যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন, যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ.﴾

---

১. علم الكلام، ادريس كاندهلوى

অর্থাৎ, পবিত্র ও মহান ঐই সত্তা, যার হাতে সর্ব বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা। (সূরা: ৩৬-ইয়াসীন: ৮৩)

﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ.﴾

অর্থাৎ, তুমি বল হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও ...। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ২৬)

* তিনি সকলের মালিক আর সকলে তার গোলাম। তাই মালিক হিসাবে গোলামকে তিনি যে হুকুম করেন এবং তাদের ব্যাপারে যে হস্তক্ষেপ করেন তাতে জুলুমের প্রশ্ন উঠতে পারে না। বিনা অপরাধেও যদি তিনি কাউকে শাস্তি দেন তাতেও কোনো জুলুমের প্রশ্ন উঠতে পারবে না।[১] কারণ জুলুম বলা হয় অন্যের মালিকানায় তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করাকে।[২] আর সবকিছুই আল্লাহ্‌র মালিকানা। তবে হ্যাঁ, নেক কাজের উপর তিনি পুরস্কার দেয়ার ওয়াদা করেছেন। আর সে ওয়াদা অবশ্যই তিনি পূরণ করবেন। আল্লাহ্ কোনো ওয়াদা খেলাপ করেন না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না। (সূরা: ১৩-রা'দ: ৩১)

﴿وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا.﴾

অর্থাৎ, কথায় আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে আছে? (সূরা: ৪-নিছা: ১২২)

* আল্লাহ্ তাআলা মহা সম্রাট, রাজাধিরাজ। তিনি যা ইচ্ছা, যাকে যেমন ইচ্ছা হুকুম করেন, যেমন ইচ্ছা রাজ্য পরিচালনা করেন। এই হুকুম প্রদান ও রাজ্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বাকশক্তি (কালাম সিফাত) তাঁর রয়েছে। তাই আল্লাহ তাআলার কালাম (كلام) সিফাত (গুণ) প্রমাণিত। তদুপরি বাকশক্তি না থাকা একটা দোষ। আর আল্লাহ তাআলা যেহেতু সব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত, তাই তাঁর বাকশক্তি থাকা অপরিহার্য। কুরআনে কারীমের বর্ণনা দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার কালাম (كلام) সিফাত প্রমাণিত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ্ মূসা-র সাথে কথা বলেছেন। (সূরা: ৪-নিছা: ১৬৪)

* কালাম বা বাকশক্তি তাঁর সত্তাগত একটি গুণ। এবং এটি তাঁর সত্তার ন্যায় অনাদি। তবে তাঁর কথার কোনো আওয়াজ নেই, কোনো অক্ষর নেই। কালাম দুই ধরনের:

---

১. এ ব্যাপারে মুতাযিলাদের ভিন্ন মত রয়েছে। দেখুন "মুতাযিলা" শিরোনাম-এর আলোচনা।

২. علم الكلام، ادريس كاندهلوى

(এক) কালামে নফ্সী বা সত্তাগত কালাম। এটি অনাদি।

(দুই) কালামে লফ্জী বা উচ্চারণগত কালাম। এটি অনাদি নয়।

আল্লাহ্র যে কালামকে অনাদি কালাম (كلام قديم) বলা হয় তা দ্বারা উদ্দেশ্য কালামে নফ্সী। কালামে নফ্সী ও কালামে লফ্জী-র মধ্যে পার্থক্য হল- কালামে নফ্সীর কোন অক্ষর বা শব্দ নেই। পক্ষান্তরে কালামে লফ্জী হল অক্ষর ও শব্দ সমন্বিত।[১] তাঁর কথা অন্য কারও কথার মত নয়, যেমন তাঁর অস্তিত্ব অন্য কারও অস্তিত্বের মত নয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.﴾

অর্থাৎ, তাঁর সদৃশ কিছুই নেই। (সূরা: ৪২-শূরা: ১১)

* আল্লাহ্র কালাম্-সিফাত সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ তাআলার সত্তাস্থিত কালাম (كلام نفسى) অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান (قديم)। এমনিভাবে তাঁর সমস্ত গুণাবলীই অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান। অন্যথায় আল্লাহকে অনিত্য বিষয়ের আধার (محل حوادث) বলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর তা অসম্ভব।

১৬. المعز (আল-মুইয্যু) সম্মানদাতা;

১৭. المذل (আল-মুযিল্লু)-অপমানদাতা বা সম্মানহরণকারী ;

* তাঁর একচ্ছত্র অধিকার স্বীকৃত। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দিবেন, কারণ সম্মান প্রদান তাঁর এখতিয়ারে। তিনি সম্মানদাতা (المعز)। আবার যাকে ইচ্ছা তার থেকে সম্মান ছিনিয়ে নিবেন, কারণ অপমান প্রদান বা সম্মানহরণও তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি অপমানদাতা (المذل)। তবে আল্লাহ্ তাআলা কারও অকল্যাণ করেন না, তাঁর কাছে কল্যাণই কাম্য। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ.﴾

অর্থাৎ, তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, যার থেকে ইচ্ছা সম্মান হরণ করে নাও। তোমারই হাতে কল্যাণ। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ২৬)

১৮. الخافض (আল-খাফিযু)-অবনতকারী;

১৯. الرافع (আর্-রাফিউ)-উন্নয়নকারী;

* যার যতটুকু সম্মান ও স্তর রয়েছে তার সেই সম্মান ও স্তরকে তিনি নতও করেন। তিনি الخافض (আল-খাফিযু)।

---

১. কোন কোন মুহাক্কিকের মতে আল্লাহ্র কালামের শব্দ এবং উচ্চারণ আছে, শ্রোতা যা শুনতে পায়। তবে এটা তাঁর কালামের নিত্বতা (قدامت) কে ক্ষুন্ন করে না। এসত্ত্বেও নিত্ব এভাবে যে, নিত্ব হল তাঁর কালামের সত্তাগত ধরন (نوع كلام)। বিশেষ আকৃতি এবং বিশেষ শব্দকে নিত্ব বলা হয় না। তবে তাঁর কালামের শব্দ ও উচ্চারণ থাকায় এ কথা আদৌ বোঝায় না যে, তাঁর কথা বলার জন্য আমাদের মত মাংসখণ্ড বিশিষ্ট জিহ্বা থাকা অপরিহার্য। কেননা তাঁর শব্দ ও উচ্চারণ অন্য কারও মত নয়। মুল্লা আলী ক্বারী شرح فقه اكبر গ্রন্থে আইম্মায়ে হাদীছ ও আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে এই মত বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। – عقائد الاسلام . عبد الحق حقانى

* আবার যার যতটুকু সম্মান ও স্তর রয়েছে তার সেই সম্মান ও স্তরকে তিনি উন্নতও করেন। তিনি الرافع (আর্-রাফিউ)।

এই নত ও উন্নত করার মধ্যে রিযিকের হ্রাস-বৃদ্ধিও অন্তর্ভুক্ত। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ. (متفق عليه)

২০. القادر (আল-ক্বাদিরু)-শক্তিশালী;

* তিনি তাঁর কোন কাজে উপকরণের মুখাপেক্ষী নন। কোন আসবাব ছাড়াই তাঁর সবকিছু করার ক্ষমতা রয়েছে। সর্ববিষয়ে তিনি ক্ষমতাবান। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ.

অর্থাৎ, বলে দাও তিনিই ক্ষমতাবান। (সূরা: ৬-আনআম: ৬৫)

ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে খোদাকে সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান মনে করা হয় না। যেমন খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা (আ.)কে খোদা বলে জানে, অথচ তাদের ধারণা হল ঈসাকে ফাঁসীতে চড়ানো হয় এবং তিনি তখন বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে থাকেন। তাহলে দেখা গেল ঈসা খোদা বা খোদার অংশ হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না বরং ইয়াহুদীদের হাতে নিহত হলেন। তাদের খোদা নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখেন না। ইয়াহুদীরা বলে আল্লাহ তাআলা সারারাত্র ইয়াকূবের সাথে কুস্তি লড়তে থাকেন কিন্তু ইয়াকূব খোদাকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেননি। হিন্দুদের ধারণায় খোদা অবতারদের মধ্যে প্রবেশ (حلول) করেন অর্থাৎ, অবতারিত হন। অথচ লংকার রাজা রাবন অবতার রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাকে হরণ করে নিয়ে যায় আর রামচন্দ্র দীর্ঘদিন তার প্রেমে দিশেহারা হয়ে থাকেন, তার সন্ধান লাভ করতে পারেন না। অবশেষে সন্ধান পাওয়ার পর হনুমান প্রমুখের সাহায্য ব্যতীত তাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হননি।[১]

২১. المقتدر (আল-মুকতাদিরু)-পূর্ণ ও স্বয়ংক্রীয় শক্তির অধিকারী;

* তাঁর ক্ষমতা স্বয়ংক্রীয় ক্ষমতা এবং ত্রুটিমুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা।

২২. القوي (আল-কাবিয়্যু)-অসীম ও অটুট ক্ষমতার অধিকারী;

* তিনি সীমাহীন ও অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর ক্ষমতা কখনও শেষ হবে না এবং কখনও তাতে কোন দূর্বলতা দেখা দেয় না।

২৩. المتين (আল-মাতীনু)-সুস্থিত এবং অসম ক্ষমতার অধিকারী;

* তাঁর ক্ষমতা সুস্থিত ও দৃঢ়, যাতে চিড় ধরার বা দুর্বলতা আসার কোনো অবকাশ নেই। এবং কেউ তাঁর ক্ষমতার সমকক্ষ নেই।

---

১. عقائد الاسلام . عبد الحق حقانى

২৪. العزيز (আল-আযীযু)-পরাক্রমশালী;

* তাঁর ক্ষমতা ও শক্তিবলে তিনি পরাক্রমশালী। সকলকে তিনি পরাভূত করতে সক্ষম, কেউ তাকে পরাভূত করতে বা কেউ তাঁর মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়।

২৫. المانع (আল-মানিউ)-প্রতিরোধকারী;

* আল্লাহ যা কিছুই করতে চান তা কেউ প্রতিহত করতে পারে না। তিনি কারও কল্যাণ করতে চাইলে তা কেউ ঠেকাতে পারে না, এমনিভাবে কারও ক্ষতি করলে তাও কেউ প্রতিহত করতে পারে না। তিনি প্রতিরোধকারী (المانع)। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ وَ اِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত সেটা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। (সূরা: ১০-ইউনুস: ১০৭)

২৬. القهار (আল-কাহ্হারু)-মহাপরাক্রান্ত;

* তাঁর ক্ষমতা ও বিক্রমের সামনে সকলে অক্ষম ও পরাভূত। তিনি মহাপরাক্রান্ত।

২৭. الجبار (আল-জাব্বারু)-প্রবলবিক্রমশালী;

* আল্লাহ্ তাআলা প্রবল বিক্রমশালী, কেউ তাঁকে অক্ষম করতে সক্ষম নয়।

২৮. السميع (আস্ সামীউ)-সর্বশ্রোতা;

২৯. البصير (আল-বাছীরু)-সম্যক দ্রষ্টা;

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى.

অর্থাৎ, মানুষ কি জানে না যে, অবশ্যই আল্লাহ দেখেন। (সূরা: ৯৬-আলাক: ১৪)

اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ের সম্যকদ্রষ্টা। (সূরা: ২-বাকারা: ২৩৭)

وَ سَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ.

অর্থাৎ, অচিরেই আল্লাহ দেখবেন তোমাদের আমল। (সূরা: ৯-তাওবা: ৯৪)

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

অর্থাৎ, তিনি সর্বশ্রোতা ও সম্যকদ্রষ্টা। (সূরা: ৫৭-হাদীদ: ৪)

قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَ اَرٰى.

অর্থাৎ, তিনি বললেন, (হে মূসা ও হারুন!) তোমরা ভয় কর না; আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি; আমি শ্রবণ করি ও দেখি। (সূরা: ২০-তাহা: ৪৬)

* আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা (السميع)। তিনি সবকিছু শুনতে পান। একই সঙ্গে আল্লাহ্ পাক সমস্ত আওয়াজ শুনতে পান; এক আওয়াজ অন্য আওয়াজ শোনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না।

* তিনি সর্বদ্রষ্টা (البصير)। সবকিছু তিনি দেখতে পান। এমনকি মনের চিন্তা বা কল্পনার গোপনীয় বিষয়ও তার অগোচর বা অদেখা নয়। একই সঙ্গে তিনি সবকিছু দেখতে পান, এক দৃশ্য অন্য দৃশ্য দেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيْرٌ.

অর্থাৎ, তিনি সর্ব বিষয়ের সম্যকদ্রষ্টা। (সূরা: ৬৭-মুল্ক: ১৯)

৩০. الخالق (আল-খালিকু)- স্রষ্টা;

৩১. المبدي (আল-মুবদিউ)- আদি স্রষ্টা;

৩২. الباري (আল-বারিউ)- উদ্ভাবনকর্তা;

৩৩. المصور (আল-মুসাওবিরু)- আকৃতিদাতা;

৩৪. البديع (আল-বাদীউ)-নমুনা বিহীন সৃষ্টিকারী;

* আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা, অর্থাৎ, তিনি خالق।

* তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং আদি সৃষ্টিকর্তা (المبدي)।

* সবকিছুর নমুনাও আল্লাহ্ তাআলা উদ্ভাবন করেছেন। অর্থাৎ, তিনি الباري।

* সবকিছুর আকৃতিও আল্লাহ্ তাআলা দান করেছেন। অর্থাৎ, তিনি المصور। বিভিন্ন রকম আকৃতি আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টি করা এসব আকৃতি একটা অন্যটা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ.

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ। তিনি সৃষ্টিকারী, উদ্ভাবনকারী, আকৃতি দানকারী। (সূরা: ৫৯-হাশর: ২৪)

* জগত সৃষ্টি করার সময় তাঁর সামনে কোন আসল বা নমুনা ছিল না। কোনো আসল ও নমুনা ছাড়াই তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ, তিনি البديع (নমুনাবিহীন সৃষ্টিকারী)। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

অর্থাৎ, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (নমুনাবিহীন) সৃষ্টিকর্তা। যখন তিনি কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত করেন শুধু বলেন, 'হও', ব্যস তা হয়ে যায়। (সূরা: ২-বাকারা: ১১৭)

* আল্লাহ্ তাআলা সবকিছুর সত্তা, সবকিছুর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সমুদয়ের সৃষ্টিকর্তা। এমন নয় যে, তিনি শুধু একটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন অতপর তার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে।

* আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তাদের কর্ম (افعال)-এরও সৃষ্টিকর্তা। মানুষ তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা নয়।[১] কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

১. এ ব্যাপারে জাবরিয়া ও কাদরিয়াদের মতবিরোধ রয়েছে। দেখুন জাবরিয়া ও কাদরিয়া শিরোনাম-এর আলোচনা।

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি একক, পরাক্রমশালী। (সূরা: ১৩-রা'দ: ১৬)

* আল্লাহ্ তাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, যা কিছু করেছেন সবকিছুর সঙ্গে তাঁর ইরাদা সংশ্লিষ্ট। তাঁর ইরাদা ব্যতীত কোনো কিছু অস্তিত্বে আসতে পারে না। তিনি ইরাদা করেন অতঃপর সেটাকে সৃষ্টি করেন। এমন নয় যে, তিনি ইরাদা করেন আর সেটা হয় না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ.

অর্থাৎ, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। (সূরা: ৮৫-বুরূজ: ১৬)

এমনকি হেদায়েত এবং গোমরাহীও আল্লাহ্র সৃষ্টি। আল্লাহ্র সিফাত হল:

৩৫. النور (আন্ নূরু)- জ্যোতির্ময়;

৩৬. الهادي (আল-হাদীউ)-পথ প্রদর্শক;

* আল্লাহ তা'আলা জ্যোতির্ময় (النور) অর্থাৎ, হেদায়েত দানকারী ও পথ প্রদর্শক (الهادي)। তিনি যাকে ইচ্ছা পথ দেখান অর্থাৎ, হেদায়েত দান করেন যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন। মুতাযিলাদের মতো বক্তব্য নয় যে, বান্দার জন্য যা কল্যাণকর আল্লাহ্র উপর তা করা ওয়াজিব। অতএব হেদায়েত মানুষের জন্য কল্যাণকর বিধায় সকলকে হেদায়েত করা আল্লাহ্র উপর ওয়াজিব। কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা হেদায়েত, ঈমান ইত্যাদি বিষয়কে তাঁর ইচ্ছা (اراده)-এর সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। যেমন:−

فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থাৎ, তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে হেদায়েত করতেন। (সূরা: ৬-আনআম: ১৪৯)

مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত তারা ঈমান আনয়ন করার নয়। (সূরা: ৬-আনআম: ১১১)

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَه يَشْرَحْ صَدْرَه لِلْاِسْلَامِ وَ مَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّه يَجْعَلْ صَدْرَه ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ. الآية.

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে হেদায়েত করতে চাইলে ইসলামের জন্য তার বক্ষ প্রশস্ত করে দেন। আর কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন, তার কাছে ইসলামের অনুসরণ আকাশে আরোহণের ন্যায় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। (সূরা: ৬-আনআম: ১২৫)

* আল্লাহ্র ইরাদা (اراده) অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান (قديم)। যা কিছু তিনি ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি করবেন বা যা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যথাসময়ে ঘটবে তার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা (اراده) অনাদিকাল থেকেই বিজড়িত রয়েছে।

৩৭. الرشيد (আর-রাশীদু)- পথ প্রদর্শনকারী, সত্যদর্শী;

* তিনি শুধু পরকালের বিষয়ে পথ প্রদর্শনকারী নন বরং তিনি আর-রাশীদ বা জগতের পথ প্রদর্শনকারী অর্থাৎ, দ্বীনী ও দুনিয়াবী যাবতীয় বিষয়ে পথ প্রদর্শনকারী। তাঁর যাবতীয় পদক্ষেপ সত্য ও সঠিক। তিনি সত্যদর্শী (الرشيد)।

৩৮. المحيي (আল-মুহ্য়ী)-জীবনদাতা;

* সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যে জীবন সঞ্চারকারীও তিনি। তিনিই জীবনদাতা المحيي (আল-মুহ্য়ী)। অন্য কেউ জীবনদাতা নয়। তিনি ব্যতীত কোনো প্রাণীর মধ্যে আপনা আপনি কোনো বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে জীবন সঞ্চারিত হয়নি। যারা বিবর্তন প্রক্রিয়ায় জীবন সৃষ্টি হওয়ার প্রবক্তা, তারা আল্লাহ্র এই সিফাতকে অস্বীকারকারী কাফের।

৩৯. الواحد (আল-ওয়াহিদু)-একক;

৪০. الأحد (আল-আহাদু)-এক অদ্বিতীয়;

* তিনি একক। তাঁর কোন দ্বিতীয় অর্থাৎ, শরীক বা সমকক্ষ নেই।[১] কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ.

অর্থাৎ, আর তোমাদের ইলাহ একক ইলাহ। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান। (সূরা: ২-বাকারা: ১৬৩)

وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَّه شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَّه وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا.

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর রাজত্বে কোনো অংশী নেই। আর দূর্বলতা হেতু তাঁর কোনো অভিভাবকের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম ঘোষণা কর। (সূরা: ১৭-বানী ইসরাঈল: ১১১)

---

১. অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে واحد ও احد সমার্থবোধক। কেউ কেউ এতদুভয়ের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে পার্থক্য করেছেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। যথা:

(১) واحد বা একক হল সত্তার ক্ষেত্রে আর احد হল গুণাবলীর ক্ষেত্রে।

(২) واحد অনাদিত্ব ও অনন্ততা বোঝায় আর احد গুণাবলীর ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়তার ইংগিত বহন করে।

(৩) واحد সৃষ্টির ও কর্মের ক্ষেত্রে শরীক না থাকা বোঝায়। যেমন কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِه فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

অর্থাৎ, তবে কি তারা আল্লাহ্র জন্য এমন শরীক সাব্যস্ত করেছে যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের মাঝে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? তুমি বলে দাও আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি একক, মহাপরাক্রান্ত। (সূরা: ১৩-রা'দ: ১৬)এখানে সৃষ্টিকর্মে শরীক না থাকার কথা বর্ণনার ক্ষেত্রে واحد গুণটি ব্যবহার করা হয়েছে। আর احد অনাদিত্ব ও অনন্ততা জ্ঞাপন করে। যেমন:

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ.

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও তিনিই আল্লাহ, অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তার মুখাপেক্ষী। (সূরা: ১১২-ইখলাস: ১-২)

এখানে আল্লাহ্র সত্তার অনাদিত্ব ও সমকক্ষতা না থাকার বর্ণনা প্রদানের বেলায় احد গুণটি ব্যবহার করা হয়েছে। ইত্যাদি আরও বিভিন্ন উক্তি রয়েছে, বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য الإتحاف للزبيدي ج/٢

* তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস করতে হবে। এই তাওহীদ বা একত্ব আল্লাহ্র সত্তার ক্ষেত্রে যেমন, তাঁর গুণাবলী ও ইবাদতের ক্ষেত্রেও তেমন। অর্থাৎ,

১. আল্লাহ্র সত্তায় যেমন কেউ শরীক নেই, (এটাকে বলা হয় توحيد فى الذات।)

২. তেমনিভাবে তাঁর গুণাবলীতেও কেউ শরীক নেই। (এটাকে বলা হয় توحيد فى الصفات) এবং

৩. একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে, ইবাদতেও তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করা যাবে না। এটাকে বলা হয় توحيد فى العبادة।

আল্লাহ্র সত্তায় কোনো শরীক না থাকার পক্ষে (نقلى) দলীল হল কুরআনে কারীমের আয়াত:

وَ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ.

অর্থাৎ, একক ইলাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। (সূরা: ৫-মায়িদা: ৭৩)

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ.

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও আমার নিকট এ মর্মে ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ তো একক ইলাহ। (সূরা: ১৮-কাহফ: ১১০)

আল্লাহ্র সত্তায় কোনো শরীক না থাকার পক্ষে عقلى বা যুক্তিগত দলীল হল:

(১) শরীক থাকা দোষ। কেননা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আপনা আপনি যথেষ্ট না হলেই তার শরীকের প্রয়োজন হয়। আর স্বয়ংসম্পূর্ণ ও যথেষ্ট না হতে পারা ত্রুটি ও দোষ। আর আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। তাই তাঁর কোনো শরীক নেই। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

سُبْحٰنَه وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

অর্থাৎ, তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র ও উর্দ্ধে। (সূরা: ৩৯-যুমার: ৬৭) আর যখন তাঁর শরীক না থাকা প্রমাণিত, তখন তাঁর সন্তানাদি না থাকাও প্রমাণিত। কেননা পুত্র পিতার শ্রেণীভুক্ত এবং তার শরীকই হয়ে থাকে। সেমতে আল্লাহ্র পুত্র থাকলে সেও খোদায়ীতে শরীক থাকবে। অথচ আল্লাহ্ তাআলা শরীক থেকে পবিত্র। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

سُبْحٰنَه اَنْ يَّكُوْنَ لَه وَلَدٌ.

অর্থাৎ, তাঁর কোন সন্তান থাকবে এ থেকে তিনি পবিত্র। (সূরা: ৪-নিসা: ১৭১)

(২) একাধিক খোদা থাকলে একজন কোন একটা বিষয় করার সিদ্ধান্ত নিলে অপরজন সেটাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হতেন বা অক্ষম হতেন। সক্ষম হলে প্রথম জনকে দুর্বল বলতে হয়, আর দুর্বলকে খোদা মানা যায় না। পক্ষান্তরে অক্ষম হলে দ্বিতীয়জনকে খোদা বলা যায় না, কেননা অক্ষমকে খোদা বলা যায় না। আর কেউ অক্ষম না হলে দুজনের মধ্যে সংঘর্ষ লেগে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا.

অর্থাৎ, যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। (সূরা: ২১-আম্বিয়া: ২২)

(৩) একাধিক খোদা থাকলে প্রত্যেক খোদা তার মাখলুককে নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপর থেকে বেনিয়ায হয়ে যেত। তাহলে কেউ আর খোদা থাকল না। কারণ, যার থেকে অন্য কেউ বেনিয়ায হয়ে যেতে পারে সে আর খোদা আখ্যায়িত হওয়ার নয়। তাছাড়া তখন এক খোদা আরেক খোদার উপর চড়াও হত, কেননা খোদায়ীর দাবী হল উপরে থাকা। অথচ এমনটা দেখা যায় না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَا كَانَ مَعَه مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ.

অর্থাৎ, তাঁর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ নেই। যদি থাকত, তাহলে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর চড়াও হত। (সূরা: ২৩-মু'মিনূন: ৯১)

তাওহীদের বিপরীত হল শিরক। অতএব একাধিক মাবূদে বিশ্বাস করা শিরক। যেমন: অগ্নিপূজক সম্প্রদায় কল্যাণের মাবূদ হিসাবে 'ইয়াযদান' (يزدان) এবং অকল্যাণের মাবূদ হিসাবে 'আহরমান' (اہرمن) কে বিশ্বাস করে। এটা শিরক। এমনিভাবে খৃষ্টানরা ত্রিত্ববাদ (تثليث) তথা তিন খোদা থাকা–এর প্রবক্তা। তাদের ধারণায় উক্ত তিন খোদা হল: পিতা অর্থাৎ, আল্লাহ্, পুত্র অর্থাৎ, ঈসা (যীশু) [আ.] এবং পবিত্রাত্মা অর্থাৎ, হযরত জিব্রাঈল (আ.) বা মতান্তরে মরিয়াম (মেরি) [আ.]। এর খণ্ডনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ وَ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ.

অর্থাৎ, যারা বলে, আল্লাহ তিনের তৃতীয়, তারা কুফ্‌রী করল। একক ইলাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। (সূরা: ৫-মায়িদা: ৭৩)

হিন্দুরা ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণুকে পালনকর্তা এবং মহাদেবকে সংহারকর্তা বলে মানে; এভাবে তারা একাধিক ভগবানে বিশ্বাসী। এছাড়াও তারা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করে। তারা প্রায় ৩৩ কোটি দেবতায় বিশ্বাস করে। এটা শিরক।

এমনিভাবে আল্লাহ্র গুণাবলীতে কোন সৃষ্টিকে শরীক করা, যেমন: মানুষের কোন কল্যাণ সাধন কিংবা বিপদ মোচন ইত্যাদি বিষয়ে কোন সৃষ্টিকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মনে করা, এটা শিরক।

এমনিভাবে আল্লাহ্র সঙ্গে ইবাদতে কাউকে শরীক করাও শিরক। যেমন: জলের (অর্থাৎ, গঙ্গার), সূর্যের, রামের, যীশুর, দেবতার ইত্যাদির পূজা করা শিরক।

৪১. المقيت (আল-মুকীতু)-আহার্যদাতা;

৪২. الرزاق (আল-আর্‌রায্‌যাকু)- রিযিক্‌দাতা;

* আল্লাহ্ তাআলা মাখলূকের আহার্য দানকারী (المقيت)। শারীরিক (جسمانى) ও আত্মিক (روحانى) উভয় ধরনের আহার্য এর অন্তর্ভুক্ত।

* আল্লাহ্ তাআলা রায্‌যাক (الرزاق) অর্থাৎ, রিযিক সৃষ্টিকারী ও রিযিক দানকারী। ইন্দ্রীয়গাহ্য (حسی) ও অতিরিন্দ্রীয় (معنوی) সব ধরনের রিযিক এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তাআলা যত মাখলূক সৃষ্টি করেছেন ও করবেন সকলের রিযিকের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا.

অর্থাৎ, পৃথিবীতে বিচরণকারী সকলের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই। (সূরা: ১১-হূদ: ৬)

* প্রত্যেকে তার জন্য বরাদ্দকৃত রিযিক পুরোপুরি অর্জন করবে। কেউ তার রিযিক গ্রহণ করবে না বা অন্য কেউ তার রিযিক গ্রহণ করবে তা সম্ভব নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা যার জন্য যে রিযিক বরাদ্দ করেছেন অবশ্যই সে সেটা গ্রহণ করবে, অন্য কারও পক্ষে সেটা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। "রিযিক" বলতে হালাল হারাম উভয়টাকে বোঝায়। কেননা, রিযিক বলা হয় যা আল্লাহ কোন প্রাণীর জন্য প্রেরণ করেন ও তার কাছে পৌছান। তবে সেটা হারাম হলে আল্লাহ তা পছন্দ করেন না।[১]

৪৩. الباسط (আল-বাসিতু)-সম্প্রসারণকারী;

৪৪. القابض (আল-ক্বাবিযু)- সংকোচনকারী;

* রিযিকের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করে দেন। তিনি সম্প্রসারণকারী (الباسط)।

* যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করে দেন। তিনি সংকোচনকারী (القابض)। তবে এই সম্প্রসারণ বা সংকোচন তাঁর হেকমতের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, স্বেচ্ছাচারিতার ভিত্তিতে নয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ اِنَّه كَانَ بِعِبَادِه خَبِيْرًا بَصِيْرًا.

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সীমিত করেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা: ১৭-বানী ইসরাঈল: ৩০)

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا.

অর্থাৎ, আমি পার্থিব জীবনে তাদের মাঝে রিযিক বণ্টন করি এবং একজনের উপর অন্যজনের মর্যাদা উন্নিত করি, যাতে একে অপরকে অনুগত রেখে তার দ্বারা কাজ নিতে পারে। (সূরা: ৪৩-যুখরুফ: ৩২)

৪৫. الفتاح (আল-ফাত্তাহু)- উমুক্তকারী;

* যাদের রিযিক বন্ধ আছে তাদের রিযিকের দুয়ার আল্লাহ্ তাআলা খুলে দেন। এমনিভাবে কোন বিপদ-আপদ থাকলে বিপদের গিরা আল্লাহ্ তাআলা খুলে দেন। তিনি উন্মুক্তকারী (الفتاح)।

---

১. نبراس، شرح عقائد

৪৬. الحفيظ (আল-হাফীযু)-সংরক্ষণকারী;

* বিপদ আসার পর তা থেকে তিনি উদ্ধার করেন, আবার বিপদ-মুসীবত আসার পূর্বেও তা থেকে তিনি বান্দাকে হেফাজত ও রক্ষা করেন। তিনি সংরক্ষণকারী (الحفيظ)।

৪৭. المؤمن (আল-মু'মিনু)-নিরাপত্তা বিধায়ক;

* তিনি শুধু বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করা নয় বরং যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার এবং মাখলূকের জন্য নিরাপত্তা প্রদান ও নিরাপত্তার সরঞ্জাম যোগান দানকারী। এ অর্থে তিনি নিরাপত্তা বিধায়ক (المؤمن)।

৪৮. السلام (আস্-সালামু) নিরাপদ, শান্তিময়;

* তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার প্রয়োজন হয় না। বরং তিনি নিজে বিপদ-আপদ ও দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও নিরাপদ এবং শান্তি দানকারী। তিনি নিরাপদ ও শান্তিময় (السلام)।

৪৯. المهيمن (আল-মুহাইমিনু)-নেগাহবান, রক্ষক;

* আল্লাহ্ তাআলা সব জিনিসের নেগাহবান ও পাহারাদার (المهيمن)। তিনি সকলের সব অবস্থার প্রতি স্বযত্ন লক্ষ রাখেন।

৫০. الوالي (আল-ওয়ালী)-অধিপতি; অভিভাবক;

* শুধু রিযিক প্রদান, বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার ও রক্ষা নয়, তিনি সবকিছুর অধিপতি ও অভিভাবক, সবকিছুর ব্যবস্থাপক, সবকিছু সম্পাদনকারী (الوالي)।

৫১. الوكيل (আল-ওয়াকীলু)- কর্মবিধায়ক;

* আল্লাহ্ তাআলা কর্মবিধায়ক অর্থাৎ, তাঁর নিকট যা কিছু সোপর্দ করা হয় তিনি তা সম্পাদনকারী। সে মর্মে আল্লাহ্‌র উপর কেউ ভরসা করলে তিনি তার কর্ম সম্পাদন করে দেন।

৫২. الوهاب (আল-ওয়াহ্হাবু)-মহানুভবদাতা;

* আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মাখলূককে যা কিছু দেন এক্ষেত্রে তাঁর কোনো উদ্দেশ্য বা স্বার্থ নেই, দুনিয়াতে একজন আরেকজনকে দেয়ার পশ্চাতে যেমন কোন উদ্দেশ্য বা স্বার্থ থাকে। আল্লাহ্ তাআলা কোনো উদ্দেশ্য বা স্বার্থ কিংবা বিনিময় ছাড়াই দিয়ে থাকেন। তিনি হলেন মহানুভবদাতা (الوهاب)।

৫৩. الكريم (আল-কারীমু)-উদারদাতা;

* আল্লাহ্ তাআলার দানের জন্য সওয়াল করারও প্রয়োজন হয় না। তিনি সওয়াল ছাড়াই নিজ উদারতায় দান ও অনুগ্রহ করে থাকেন। তিনি উদারদাতা (الكريم)।

৫৪. الغني (আল-গানিয়্যু)-অভাবমুক্ত; মুখাপেক্ষিতাহীন;

* মাখলূকের রিযিক পৌছাতে গিয়ে এবং অন্য কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে তাঁর কখনও অভাব দেখা দেয় না, তিনি অভাব মুক্ত (الغني)। এমনিভাবে কোন কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে তিনি কারও মুখাপেক্ষীও হন না। তিনি মুখাপেক্ষিতাহীন

(الغني)। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللهِ وَ اللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ.

অর্থাৎ, হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন, প্রশংসিত। (সূরা: ৩৫-ফাতির: ১৫)

আসমান ও জমিনের সবকিছুর যিনি মালিক তাঁর অভাব হতে পারার ধারণা অমূলক। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

هُوَ الْغَنِيُّ لَه مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ. الآية.

অর্থাৎ, তিনি অভাবমুক্ত, আসমান জমিনে যা কিছু আছে, তার মালিকানা তাঁরই। (সূরা: ১০- ইউনুছ: ৬৮)

* মাখলূক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে তাদের নিজস্য প্রয়োজনে, এর জন্যে আল্লাহ্‌র কোনো ঠেকা নেই। এর থেকেও আল্লাহ পাক অভাবমুক্ত। আল্লাহ্ তাআলা মানুষের ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎ, কেউ কুফরী করলে (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ জগৎবাসীর মুখাপেক্ষী নন। (সূরা: ৩- আলে ইমরান: ৯৭)

৫৫. المغني (আল-মুগনীয়ু)-অভাব মোচনকারী;

* আল্লাহ্ পাকের অভাব হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না বরং তিনি সকলের অভাব মোচনক-ারী। অর্থাৎ, তিনি المغني (আল-মুগনী)।

৫৬. الواجد (আল-ওয়াজিদু)-প্রাপক;

* আল্লাহ্ তাআলা যা চান তাই পান অর্থাৎ, তাই হয়। এ অর্থে তিনি প্রাপক (الواجد)। কোনো কিছু তাঁর থেকে অব্যাহতি পায় না, কোনো কিছু তাঁর পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম নয়। অথবা এর ব্যাখ্যা হল তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

৫৭. النافع (আন্‌নাফিউ')-কল্যাণকারী;

৫৮. الضار (আয্‌যাররু)-অকল্যাণের মালিক;

* তিনি কল্যাণ অ-কল্যাণ সবটার মালিক। তিনি যেমন কল্যাণকারী (النافع) তেমনি অকল্যাণের মালিক (الضار)ও। মুতাযিলাগণ মনে করেন বান্দার জন্য যা উত্তম ও কল্যাণকর, আল্লাহ্‌র উপর তা করা জরূরী। অথচ আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا.

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীর সকলে ঈমান আনয়ন করত। (সূরা: ১০-ইউনুছ: ৯৯)

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, হেদায়েত প্রত্যেকের জন্য কল্যাণকর, তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা হেদায়েতকে তার ইচ্ছার উপর মওকূফ বলেছেন এবং সকলকে তিনি হেদায়েত করেননি। অতএব বোঝা গেল (আমাদের দৃষ্টিতে) কল্যাণকর (বিবেচিত)

হলেই তা আল্লাহ্‌র জন্য করা জরূরী নয়।

৫৯. البر (আল-বার্‌রু)-নেকময়;

* কল্যাণ অ-কল্যাণ সবই আল্লাহ্‌র হাতে, তবে তিনি কারও অকল্যাণ করেন না বরং তিনি সকলের সঙ্গে কল্যাণের আচরণ এবং নেকীর মুআমালা করেন। তিনি নেকময় (البر)। অতএব যার ব্যাপারে আল্লাহ যা করেন তার মধ্যেই তার জন্য কল্যাণ নিহিত।

৬০. المميت (আল-মুমীতু)-মৃত্যুদাতা;

* আল্লাহ্ তাআলা যেমন জীবনদাতা (المحي), তেমনি মৃত্যুদাতা (المميت)ও তিনি। নির্ধারিত সময়ে প্রত্যেকের মৃত্যু ঘটবে। কিয়ামতের সময় শিঙ্গায় ফুৎকারের মাধ্যমে সকলের মৃত্যু ঘটবে।

৬১. الوارث (আল-ওয়ারিসু)-স্বত্বাধিকারী;

* সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার পর যখন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন বাহ্যিকভাবেও একমাত্র তিনিই থাকবেন সবকিছুর স্বত্বাধিকারী এবং মালিক (الوارث)। বাহ্যিকভাবে যারা দুনিয়ার অনেক কিছুর মালিক বলে মনে হত, তাদের কারও তখন কোন অস্তিত্বও থাকবে না। তখন আল্লাহ্ তাআলা বলবেন,

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.

অর্থাৎ, আজ রাজত্ব কার? এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র। (সূরা: ৪০-মু'মিন: ১৬)

৬২. المعيد (আল-মুঈদু)-পুনঃসৃষ্টিকারী;

৬৩. الباعث (আল-বা'ইছু)- পুনরুত্থানকারী;

৬৪. الجامع (আল-জামিউ)-একত্রকরণকারী;

* তার পর তিনি সকলকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। তিনি পুনঃসৃষ্টিকারী (المعيد)। শিংগায় দ্বিতীয় ফুৎকার দেয়ার পর সকলে পুনরায় জীবন লাভ করবে।

* তারপর তিনি সকলের পুনরুত্থান ঘটাবেন। তিনি পুনরুত্থানকারী (الباعث)।

* পুনরুত্থান পূর্বক তিনি সকলকে হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্য একত্র করবেন। তিনি একত্রকরণকারী (الجامع)।

৬৫. الحسيب (আল-হাসীবু)-হিসাব গ্রহণকারী;

৬৬. المحصي (আল-মুহ্‌সী)-পুংখানুপুংখ হিসাব গ্রহণকারী;

* কিয়ামতের ময়দানে সকলকে একত্র করে তিনি সকলের হিসাব গ্রহণ করবেন। তিনি হিসাব গ্রহণকারী (الحسيب)।

* এই হিসাব হবে পুংখানুপুংখ রূপে। সে হিসাবে থাকবে না বিন্দুমাত্র ত্রুটি। কেননা তিনি পুংখানুপুংখ হিসাব গ্রহণকারী (المحصي)। المحصي-এর আর এক অর্থ হল জগতের সৃষ্টিসমূহের যাবতীয় গণনা ও পরিমিতির ব্যাপারে তিনি সম্যক জ্ঞানী। ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতা থেকে বহির্ভূত নয়।

৬৭. الشهيد (আশ-শাহীদু)- প্রত্যক্ষভাবে অবগত;

* সবকিছুর পুংখানুপুংখ হিসাব নেয়ার জন্য সবকিছুর জাহের বাতেন প্রত্যক্ষভাবে অবগত হওয়া আবশ্যক এবং এজন্য তার সর্বত্র হাজির-নাযির থাকা আবশ্যক। মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, তিনি সর্বত্র হাজির এর অর্থ হল তিনি ইলমগত এবং কুদরতগতভাবে সর্বত্র হাজির। (৫৮ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কিত বিশদ ব্যাখ্যা দেখুন।) যাহোক আল্লাহ্ তাআলা সর্বত্র হাজির-নাযির এবং তিনি সবকিছু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে অবগত (الشهيد)। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ اللهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার প্রত্যক্ষকারী তথা অবগত। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৯৮)

কেউ কেউ বলেছেন, জাহেরী বিষয় (امور ظاهره) জাননেওয়ালাকে الشهيد বলে এবং বাতিনী বিষয় (امور باطنه) জাননেওয়ালাকে خبير বলে।

৬৮. الرقيب (আর্ রাকীবু)-পর্যবেক্ষণকারী;

* তিনি শুধু প্রত্যক্ষ করেন না বরং ভালভাবে পুংখানুপুংখরূপে প্রত্যক্ষ করেন অর্থাৎ, পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি পর্যবেক্ষণকারী (الرقيب)।

৬৯. الحكم (আল-হাকামু)-মীমাংসাকারী;

৭০. العدل (আল-আদ্‌লু)-ন্যায়নিষ্ঠ;

৭১. المقسط (আল-মুকসিতু)- ন্যায়পরায়ণ;

* হিসাব গ্রহণপূর্বক তিনি ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সবকিছুর মীমাংসা করবেন। তিনি হলেন মীমাংসাকারী (الحكم)।

* আল্লাহ্‌র মীমাংসা অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠতার সঙ্গে হবে। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ (العدل) ও ন্যায়পরায়ণ (المقسط)।

৭২. الشكور (আশ্ শাকূরু)-গুণগ্রাহী;

* তাঁর ন্যায্য বিচারে যে নেককার ও ভাল সাব্যস্ত হবে, তিনি তাকে পুরস্কৃত করবেন। তিনি গুণগ্রাহী (الشكور)। তিনি গুণের মূল্যায়ন করবেন। দুনিয়াতেও তিনি নেক কাজের কিছু পুরস্কার ও বদকাজের কিছু শাস্তি দিয়ে থাকেন। তবে পূর্ণ পুরস্কার ও পূর্ণাঙ্গ শাস্তি দিবেন পরকালে।

৭৩. الولى (আল-ওয়ালিয়্যু)-সাহায্যকারী, বন্ধু, অভিভাবক;

* আখেরাতে আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদেরকে শান্তি দান করবেন এবং সাহায্য করবেন। তিনি সাহায্যকারী অভিভাবক অর্থাৎ, মুমিনদের সাহায্যকারী ও মুমিনদের অভিভাবক। দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের অভিভাবক। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اَللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ. الآية.

অর্থাৎ, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে (কুফ্‌র শির্‌কের) অন্ধকারপুঞ্জ থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। (সূরা: ২-বাকারা: ২৫৭)

৭৪. ذو الجلال و الإكرام (যুল জালালি ওয়াল ইক্‌রাম)

আযমত ও জালালের অধিকারী, একরাম করনেওয়ালা ;

* তিনি আযমত ও জালালের অধিকারী অর্থাৎ, তিনি মহিমময়। তাঁর আযমত ও জালালের সামনে যারা আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তাঁর এতায়াত করে, তিনি তাদের সম্মানিত ও পুরস্কৃত করবেন কারণ তিনি মহানুভব, একরাম করনেওয়ালা।

৭৫. الودود (আল-ওয়াদূদু)-প্রেমময়;

* নেককার লোক এবং নেক কাজকে তিনি ভালবাসেন। এ অর্থে তিনি প্রেমময় (الودود)।

৭৬. المقدم (আল-মুকাদ্দিমু)-অগ্রবর্তীকারী;

৭৭. المؤخر (আল-মুআখ্‌খিরু)-পশ্চাদবর্তীকারী;

* যারা আল্লাহ্‌র দোস্ত তাদেরকে তিনি অগ্রবর্তী করে দেন, তিনি অগ্রবর্তীকারী (المقدم), আর যারা তাঁর দুশমন, তাদেরকে তিনি পশ্চাদবর্তী করে দেন। তিনি পশ্চাদবর্তীকারী (المؤخر)।

৭৮. المنتقم (আল-মুনতাকিমু)-শাস্তিদাতা;

* নেককার, দোস্ত ও আপন লোকদেরকে তিনি পুরস্কার দান করবেন। পক্ষান্তরে যে বদকার সাব্যস্ত হবে, তাকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি হলেন শাস্তিদাতা (المنتقم)।

৭৯. الصبور (আস্ সাবূরু)- ধৈর্যশীল;

৮০. الحليم (আল-হালীমু)-সহিষ্ণু;

* আল্লাহ্ তাআলা পাপের কারণে শাস্তিদাতা। তবে দুনিয়াতে তিনি সব পাপের কারণে শাস্তি দেন না। কারণ, তিনি ধৈর্যশীল (الصبور) ও সহিষ্ণু (الحليم)। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মধ্যে পার্থক্য হল- ধৈর্যগুণ যখন নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন সেটাকে সহিষ্ণুতা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

৮১. العفو (আল-'আফুউ)- ক্ষমাকারী;

৮২. الغفار (আল-গাফ্‌ফারু)- পরম ক্ষমাশীল;

৮৩. الغفور (আল-গাফূরু)- পরম ক্ষমাকারী;

* আখেরাতে যারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, তাদের অনেককে আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমাশীল (الغفور)। ক্ষমার গুণ আল্লাহ্ তাআলার অত্যন্ত বেশি। তিনি পরম ক্ষমাশীল (الغفار)। শির্‌ক ব্যতীত আর সব ধরনের পাপ ইচ্ছা হলে তিনি ক্ষমা করবেন বলে কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাঁর শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এ ব্যতীত সবকিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (সূরা: ৪-নিসা: ১১৬)

৮৪. التواب (আত্-তাওয়াবু)-তওবা কবূলকারী;

৮৫. المجيب (আল-মুজীবু)- কবূলকারী;

* ক্ষমা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তাআলা তওবার নিয়ম করে রেখেছেন। কেউ তওবা করলে আল্লাহ্ তাআলা তার তওবা কবূল করেন। তিনি তওবা কবূলকারী (التواب)।

* শুধু তওবা নয় যে কোন বিষয়ে কেউ দুআ করলে আল্লাহ্ তাআলা তার দুআ কবূল করেন। তিনি কবূলকারী (المجيب)। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ. الآية

অর্থাৎ, আমি আহ্বানকারী-র আহ্বানে সাড়া দেই, যখন সে আমার কাছে আহ্বান জানায়। (সূরা: ২-বাকারা: ১৮৬)

৮৬. الرحيم (আর রাহীমু)- অতি দয়ালু;

৮৭. الرحمن (আর রাহ্মানু)-অত্যন্ত দয়াময়;

* সবকিছু আল্লাহ তাআলার দয়ায় সংঘটিত হয়, কোনো কিছু আল্লাহ্ তাআলার উপর করা জরূরী নয়। আল্লাহ্ তাআলার উপর কোন কিছু করা ওয়াজিব বা অবশ্যকর-ণীয় বলা হলে আল্লাহ্ তাআলার এখতিয়ার (اختيار) রহিত হওয়া অবধারিত হয়ে যায়। যা অসংগতিপূর্ণ।[১]

৮৮. الرؤف (আর-রাউফু) সীমাহীন দয়ালু ;

* রহমত ও দয়াগুণ তাঁর মধ্যে সীমাহীন। তিনি সীমাহীন দয়ালু (الرؤف)। الرؤف শব্দটি رأفة থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ প্রচণ্ড দয়া (شدة الرحمة)।

৮৯. القدوس (আল-কুদ্দূসু) পবিত্র;

* আল্লাহ্ তাআলার সত্তা, তাঁর গুণাবলী ও যাবতীয় কর্ম দোষ-ত্রুটি মুক্ত। তিনি সব ধরনের দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র (القدوس)।

৯০. الجليل (আল-জালীলু)- পূর্ণাঙ্গ মহিমাময় ;

* তিনি দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্রতা ও অনপেক্ষ হওয়ার পরম স্তরে উন্নীত। তিনি পূর্ণাঙ্গ মহিমময় (الجليل)।

৯১. المجيد (আল-মাজীদু)- গৌরবময়;

* আল্লাহ্ তাআলার সত্তা, তাঁর গুণাবলী ও কর্ম দোষ-ত্রুটিযুক্ত তো নয়ই বরং আল্লাহ্র সত্তা, তাঁর গুণাবলী ও যাবতীয় কর্মে তিনি বুযুর্গির অধিকারী অর্থাৎ, গৌরবময় (المجيد)।

৯২. المتكبر (আল-মুতাকাব্বিরু)- সুউচ্চ, সমুচ্চ গৌরবময়তার অধিকারী;

১. এ ব্যাপারে মুতাযিলাদের ভিন্ন মত রয়েছে। এ ব্যাপারে কোন কোন মুতাযিলী বাড়াবাড়ি করে এ পর্যন্ত বলেছে যে, নেককার লোককে ছাওয়াব দেয়া এবং কবীরা গুনাহকারীদেরকে শাস্তি দেয়া আল্লাহ্র উপর ওয়াজিব। ভাল কাজের ছওয়াব প্রদান এবং পাপ কাজের শাস্তি প্রদান এক প্রকার আইনগত বিষয় যা পালন করা আল্লাহ্র জন্য ওয়াজিব বা অপরিহার্য। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ২য় খণ্ড "মুতাযিলা" শিরোনাম।

৯৫. الصمد (আস্ সামাদু)-অনপেক্ষ;

* আল্লাহ্ তাঁর সত্তা, কর্ম ও গুণাবলী কোন ক্ষেত্রেই কারও মুখাপেক্ষী নন বরং তিনি অনপেক্ষ (الصمد)। কোন ব্যাপারেই তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। বরং অন্য সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী।[১]

৯৬. الحميد (আল-হামীদু)-প্রশংসিত;

* আল্লাহ তাআলা তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও কর্মের প্রেক্ষিতে প্রশংসার্হ্য (الحميد)। অর্থাৎ, তিনি তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও কর্মে এমন বুযুর্গী বা গৌরবময়তার অধিকারী, যার প্রেক্ষিতে তিনি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

৯৭. الكبير (আল-কাবীরু)-সর্বাধিক বড়ত্বের অধিকারী;

* আল্লাহ্ সর্বাধিক বড়ত্বের অধিকারী; যার চেয়ে বড় কারও কল্পনা করা যায় না।

৯৮. العلي (আল-আলিয়্যু)- সর্বোচ্চ মর্যাদাবান;

* আল্লাহ্ সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। যার উপর আর কারও মর্যাদা হতে পারে না।

৯৯. العظيم (আল-আযীমু)-সর্বোচ্চ মাহাত্ত্বের অধিকারী;

* আল্লাহ্ সর্বোচ্চ মাহাত্ত্বের অধিকারী; যার মাহাত্ত্বের স্তরে কারও পক্ষে পৌঁছা সম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআন ও হাদীছে এ ছাড়াও আল্লাহ্ তাআলার আরও কিছু গুণবাচক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন:—

১. الرب (আর রাব্বু)- প্রতিপালক; ২. المنعم (আল মুন্ইমু)- নিয়ামত দানকারী ; ৩. المعطي (আল্ মু'তী) দাতা ; ৪. الصادق (আস্ সাদিকু)- সত্যবাদী ; ৫. الستار (আস্ সাত্তারু)- গোপনকারী।

* আল্লাহ্ তাআলার আসমায়ে হুসনা-র যথাযথ বাংলা অনুবাদ হয় না। এখানে যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা ইংগিত মাত্র। আল-আসমাউল হুসনা-র মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক গুণাবলী আল্লাহ্র জন্য সত্তাগত, অনাদি-অনন্ত, ব্যাপক ও অসীম। আর মানুষের জন্য এগুলো আল্লাহ্ প্রদত্ত অস্থায়ী ও সীমিত।

* কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্র কতক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। যেমন- وجه মুখমণ্ডল, عين চক্ষু। এগুলোর তাৎপর্য সম্বন্ধে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অভিমত এই যে, আল্লাহ তাআলার যাত ও সিফাত সম্পর্কে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সা.) যা বলেছেন, তার উপর ঈমান রাখতে হবে। আল্লাহ্র এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত নয়। আল্লাহ্ যেমন তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তাঁর শান উপযে-াগী। এর চেয়ে বিস্তারিত আমাদের জানা নেই। "মুজাস্সিমা, মুশাব্বিহা ও

১. শায়খ আকবার حقائق الاسماء নামক গ্রন্থে বলেন,

الصمد هو الذي يلجأ ويقصد إليه فى الحوائج والنوائب. (الإتحاف ج/٢)

অর্থাৎ, صمد বলা হয় ঐ সত্তাকে প্রয়োজন ও বিপদাপদে যার স্মরণাপন্ন হওয়া এবং যার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

মুআত্তিলা ফিরকা প্রসঙ্গ” শিরোনামে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পরবর্তী পৃষ্ঠা।

আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে আরও বিশেষ কিছু আকীদা

১. আল্লাহ্‌র সমস্ত গুণাবলী অনাদি (قديم)। অর্থাৎ, তাঁর সমস্ত গুণাবলী অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান, যেমন তাঁর সত্তা অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান। অনাদি (قديم) সত্তার গুণ অনাদি (قديم)ই হয়ে থাকে। আল্লাহর গুণাবলীকে অনিত্য (حادث) বললে অসুবিধা হল:

(এক) আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে অনিত্য বললে তার মধ্যে পরিবর্তন (تغير) আসতে পারে বলতে হয়। কেননা অনিত্য বিষয়ের মধ্যে পরিবর্তন এসে থাকে। কিংবা বলতে হয় এক সময় এমন অতিবাহিত হয়েছে যখন আল্লাহ্‌র মধ্যে এসব গুণাবলী ছিল না। কারণ অনিত্য বিষয়গুলো এমনই, যা এক সময় অস্তিত্বহীন ছিল। অথচ আল্লাহ্ তাআলা অনাদিকাল থেকেই তাঁর সমস্ত গুণাবলীর সঙ্গে গুণান্বিত।

(দুই) আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে অনিত্য (حادث) বললে আল্লাহ্‌কে অনিত্য বিষয়ের আধার (محل حوادث) বলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর তা অসম্ভব।

অতএব আল্লাহ্ তাআলার প্রত্যেকটি সিফাতী নাম অনাদি। যেমন সৃষ্টি করা তাঁর একটি গুণ। মাখলূক না থাকলেও তাঁর মধ্যে সৃষ্টি করার গুণ অবশ্যই ছিল। অতএব তাঁর খালেক (خالق) নাম অনাদি। এমনিভাবে তাঁর সমস্ত গুণের ব্যাপারে এরূপ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য।

২. আল্লাহ্‌র সিফাত তাঁর হুবহু সত্তা (عين ذات)ও নয়, কেননা গুণ তার অধিকারী-র হুবহু সত্তা হয় না। আবার তাঁর সত্তাবহির্ভূত (غير ذات)ও নয়। বরং তাঁর সিফাত তাঁর সত্তার অপরিহার্য বিষয় (لازم ذات)। যেমন: জ্ঞান আর জ্ঞানী হুবহু এক জিনিস নয়, আবার জ্ঞান জ্ঞানী থেকে পৃথকও নয়।[১]

৩. আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী যেমন অনাদি, তেমনি অনন্ত। কারণ যেটা অনাদি হয় সেটা অনন্তও হয়।[২]

৪. আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর মধ্যে কোন তারতীব বা পর্যায়ক্রমিকতা নেই। এরূপ বলা দোরস্ত নয় যে, তাঁর অমুক গুণ আগের আর অমুক গুণ পরের। কেননা তাঁর সমস্ত গুণ অনাদি ও নিত্য। আর পর্যায়ক্রমিকতা সাব্যস্ত করলে পরবর্তীটা অনাদি ও নিত্য থাকে না বরং পূর্বেরটার তুলনায় পরবর্তীটা حادث বা অনিত্য হয়ে যায়।

৫. আল্লাহ্ তাআলার সিফাত সবগুলো এক ধরনের এবং এক পর্যায়ের নয়। তাঁর সিফাতগুলো প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত:

(এক). ইতিবাচক (ثبوتيه)।

(দুই). নেতিবাচক (سلبيه)।

১. এ ব্যাপারে মুতাযিলাদের ভিন্ন মত রয়েছে। দেখুন দ্বিতীয় খণ্ড "মুতাযিলা" শিরোনাম।

২. عقائد الاسلام. عبد الحق حقانى

ইতিবাচক (ثبوتيه)। সিফাতগুলো আবার দু'ভাগে বিভক্ত:

(এক) সত্তাবাচক গুণাবলী (ذاتيه)।

(দুই) কর্মবাচক গুণাবলী (افعاليه)।

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী-র মতে আল্লাহ্‌র সত্তাবাচক গুণাবলী ৮টি। যথা:– (১) হায়াত, (২) ইরাদা বা ইচ্ছা, (৩) ইল্‌ম বা জ্ঞান (৪) কুদরত বা শক্তি, (৫) শ্রবণ, (৬) দর্শন, (৭) কালাম, ও (৮) তাক্‌বীন। তাক্‌বীন অর্থ সৃষ্টি করা, গঠন করা, রচনা করা ইত্যাদি। তাক্‌বীন স্বতন্ত্র কোন গুণ নয়। তাক্‌বীন গুণটি মৌলিক ও ব্যাপক একটি গুণ যা যাবতীয় কর্মবাচক গুণের সমষ্টিকে বোঝায়।

সত্তাবাচক ও কর্মবাচক গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য হল সত্তাবাচক গুণাবলীর বিপরীত গুণে আল্লাহ্ গুণান্বিত হন না। যেমন “জ্ঞান” হল আল্লাহ্‌র একটি সত্তাবাচক গুণ। তাই এর বিপরীত- মূর্খতার সাথে আল্লাহ গুণান্বিত তথা মণ্ডিত হন না। আল্লাহ জ্ঞানী, তিনি কখনও নিঃজ্ঞান হন না। পক্ষান্তরে কর্মবাচক গুণের বিপরীত গুণেও তিনি গুণান্বিত হন, যদি সেটার সম্পর্ক অন্যের সঙ্গে হয়। যেমন মৃত্যু দেয়া, রিযিক দেয়া ইত্যাদি। তিনি এক সময় কাউকে মৃত্যু দেন আবার কাউকে মৃত্যু দেন না। তবে একথা বলা যাবে না যে, আল্লাহ নিজেকে মৃত্যু দিতে পারেন। কেননা, কর্মবাচক গুণের বিপরীত গুণের সঙ্গে গুণান্বিত হওয়ার প্রশ্ন তাঁর নিজের বেলায় নয় বরং অন্যের বেলায়।

৬. আল্লাহ্‌র সত্তা অন্য কারও সত্তার মত নয়। তাঁর গুণাবলীও অন্য কারও গুণাবলীর মত নয়। তাই তাঁর জীবন আমাদের জীবনের মত নয়, তাঁর শক্তি আমাদের শক্তির মত নয়, তাঁর জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের মত নয়, তাঁর শ্রবণ আমাদের শ্রবণের মত নয়। যেমন: বলা যায় আমাদের শ্রবণের জন্য আমরা কান ব্যবহার করি অর্থাৎ, শ্রবণের জন্য কানের মুখাপেক্ষী, কিন্তু শ্রবণের জন্য কানের মুখাপেক্ষী নয়, এমনিভাবে তিনি বলার জন্য জবানের মুখাপেক্ষী নন, দেখার জন্য চোখের মুখাপেক্ষী নন। এভাবে তিনি কোন অঙ্গের মুখাপেক্ষী নন। তাঁর বিষয় আমাদের মত নয়। মোটকথা তাঁর কোন কিছুই আমাদের মত নয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর মত নয়। (সূরা: ৪২-শুরা: ১১)

মুজাস্‌সিমা, মুশাব্বিহা ও মুআত্তিলা ফিরকা প্রসঙ্গ

এ বিষয়টি বোঝার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ কিছু কথা বলার প্রয়োজন। তা হল– কুরআন মাজীদে এমন অনেক আয়াত আছে যার দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীর কোন কিছুর মত নন। যেমন:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ

অর্থাৎ, কোনো কিছুই তাঁর মত নয়। (সূরা: ৪২-শুরা: ১১) অতএব মানুষ বা কোনো কিছুর সঙ্গে আল্লাহ্‌র সাদৃশ্য নেই, মানুষ বা কোনো কিছুর মত আল্লাহ্‌র কোন আকৃতি নেই।

এর বিপরীত এমন কিছু আয়াতও আছে যা স্পষ্টত আল্লাহ্র দৈহিক গঠনের প্রতি ইঙ্গিত করে বা আল্লাহ্র নির্দিষ্ট কোন দিক আছে বা আল্লাহ্ নির্দিষ্ট কোন স্থানে আছেন বোঝায়, যা দ্বারা মানুষ বা পৃথিবীর কোন বস্তুর সঙ্গে আল্লাহ্র সাদৃশ্য আছে বলে অনুমিত হয়। যেমন:

يَدُ اللهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর। (সূরা: ৪৮-ফাত্হ: ১০)

وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ .

অর্থাৎ, পূর্ব ও পশ্চিম দিক আল্লাহ্র (অর্থাৎ, সবদিকই আল্লাহ্র)। অতএব যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন সেদিকেই আল্লাহ্র মুখ রয়েছে। (সূরা: ২-বাকারা: ১১৫)

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ.

অর্থাৎ, অনন্তর তিনি আরশে সমাসীন/কায়েম হলেন। (সূরা: ৩২-সাজদা: ৪)

أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَآءِ.

অর্থাৎ, আকাশে যিনি আছেন তাঁর থেকে কি তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছ? (সূরা: ৬৭-মুল্ক: ১৬)

হাদীছেও কিয়ামতের দিন ফেরেশ্তাদের সমভিব্যাহারে আল্লাহ্র আগমন ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা দ্বারা বাহ্যত মানুষ বা পৃথিবীর কোন বস্তুর সঙ্গে আল্লাহ্র সাদৃশ্য আছে বলে অনুমিত হয়।

এই দুই ধরনের আয়াত ও হাদীছ নিয়ে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বিরোধী দুটো ভিন্ন মতাবলম্বী দলের জন্ম হয়। একদিকে মুজাস্সিমা/مجسمہ (নরাত্মারোপবাদী) এবং মুশাব্বিহা/مشبہ (সাদৃশ্য প্রতিপাদনকারী) ফিরকা-এর উৎপত্তি হয়, যারা আমাদেরই মত আল্লাহ্র হাত-পা আছে বলে স্বীকার করত এবং বলত, আল্লাহ তাআলা আরশের উপর ওরকমই বসেন যেমন দুনিয়াতে কোন বাদশাহ তার সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়। এভাবে তারা দ্বিতীয় প্রকারের আয়াত ও হাদীছগুলো মেনে নিলেও প্রথমোক্ত আয়াতকে অস্বীকার করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অপর দিকে মুতাযিলা ও কাদরিয়াগণ আল্লাহ্র সিফাত বা গুণাবলীকেই অস্বীকার করে বসে। তাই তাদের অপর নাম হল মুনকিরীনে সিফাত বা আল্লাহ্র গুণাবলী অস্বীকারকারী। এই শ্রেণীর লোকদেরকে মুআত্তিলা (معطلہ)ও বলা হয়। معطلہ (মুআত্তিলা) শব্দটি تعطیل থেকে উদগত, যার অর্থ বেকার করা। পরিভাষায় মুআত্তিলা বলা হয় যারা আল্লাহ্ পাকের গুণাবলী –যেগুলো কুরআন ও হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত– সেগুলোকে অস্বীকার করে।

আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উলামায়ে কেরাম সাদৃশজ্ঞাপক উপরোক্ত আয়াতগুলোকে মুতাশাবিহাত (متشابہات)-এর পর্যায়ভুক্ত মনে করে মুতাশাবিহাত-এর ক্ষেত্রে গৃহীত নীতি অনুসারে আল্লাহর পবিত্র যাতের বিস্তারিত আলোচনা ব্যতীত এর

প্রতি ঈমান রাখেন এবং যে সকল আয়াত দ্বারা সাদৃশ্য (تشبیہ و تمثیل)-এর প্রকাশ ঘটে থাকে তার আলোচনা ও পর্যালোচনা থেকে বিরত থাকেন। তাদের বক্তব্য হল, আল্লাহ্র হাত, মুখ, আরশে সমাসীন/কায়েম হওয়া, আকাশে থাকা ইত্যাদিতে আমরা বিশ্বাস রাখি, তবে তার হাকীকত বা প্রকৃত স্বরূপ কিংবা বিশদ বিবরণ আমাদের জানা নেই।[১] আল্লাহ্র হাত, মুখ ইত্যাদি আছে তবে এগুলো আমাদের কারও মত নয়। এরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা উভয় প্রকার আয়াতসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয় এবং কোন প্রকার আয়াতকে বর্জন করতে হয় না। চার ইমাম ও জমহুরের মত এটাই। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ফেক্হে আক্বার গ্রন্থে বলেন,

فما ذكر الله فى القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس والعين فهو له صفات ولايقال : إن يده قدرة أو نعمة لأن فيه إبطالَ الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفة بلاكيف انتهى. (عقائد الاسلام . عبد الحق حقانى)

অর্থাৎ, কুরআনে আল্লাহ তা'আলা চেহারা, হাত, মন, চোখ ইত্যাদির যে উল্লেখ করেছেন, এগুলো তাঁর গুণাবলী। "হাত" দ্বারা শক্তি বা নেয়ামত উদ্দেশ্য–এরূপ ব্যাখ্যা দেয়া হবে না। কেননা, এতে তাঁর সিফাতকে অস্বীকার করা হয় যা কাদরিয়া ও মুতাযিলাদের মতবাদ। বরং হাত তাঁর একটি সিফাত, তবে সেই হাতের কাইফিয়াত বা অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের জানা নেই।

২. ফেরেশতা সম্বন্ধে ঈমান

দ্বিতীয় মৌলিক যে বিষয়ে ঈমান রাখতে হয় তা হল ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান। ফেরেশতা শব্দের আরবী হল মালায়িকা (ملائكة)। এ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হল مالك/مِلاك/مَلَك। এর আভিধানিক অর্থ হল বার্তাবাহক। পরিভাষায় ফেরেশতা বলা হয়,

جسم نوراني متشكل بأشكال مختلفة لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

অর্থাৎ, এমন নূরানী মাখলূক, যারা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে থাকেন এবং আল্লাহ্র নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেন না। বরং সর্বদা আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে রত থাকেন।[২]

ফেরেশতা সম্বন্ধে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে,

১. ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ তাআলার এক সম্মানিত সৃষ্টি। তারা নূরের সৃষ্টি।[৩]

২. তারা পুরুষও নন নারীও নন। তারা কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপু থেকে মুক্ত।[৪]

ফেরেশতাদেরকে নারী বা পুরুষ আখ্যায়িত করা যায় না। কেননা এ ব্যাপারে

---

১. উল্লেখ্য, মুতাআখ্খিরীন উলামায়ে কেরাম পূর্বসূরীদের ব্যাখ্যাকেই যথার্থ আখ্যায়িত করে দুর্বল বুদ্ধি লোকদের মনের খটকা নিরসন ও বিষয়টিকে তাদের ধারণ ক্ষমতার আওতায় আনার জন্য আল্লাহ্র আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টিকে রূপক অর্থেও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ॥

২. قواعد الفقه

৩. المرقاة ج/١

৪. المصدر السابق

কুরআন হাদীছে কোন ভাষ্য কিংবা কোন যুক্তি বর্তমান নেই।

৩. তারা বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) বিভিন্ন আকৃতিতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাজির হতেন। অধিকাংশ সময় তিনি হযরত দেহ্ইয়ায়ে কাল্বী (রা.)-এর আকৃতিতে আসতেন। হাদীছে জিব্রীল নামক প্রসিদ্ধ হাদীছে তার এক বেদুঈনের বেশে আসার কথা উল্লেখিত আছে।

৪. তাদের কোন সন্তান-সন্ততি নেই।

৫. তারা সংখ্যায় অনেক। হাদীছে বর্ণিত আছে সাত আসমানের সর্বত্র এত ফেরেশ্তা ইবাদতে রত আছেন যে, সামান্য অর্ধহাত জায়গাও খালি নেই। তাদের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও জানা নেই। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ.

অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত তোমার প্রতিপালকের সৈন্যবাহিনী (ফেরেশতা) সম্বন্ধে কেউ অবগত নয়। (সূরা: ৭৪-মুদ্দাছ্ছির: ৩১)

৬. আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে বিপুল শক্তির অধিকারী বানিয়েছেন।

৭. আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সৃষ্টি করে বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন- কতিপয় আযাবের কাজে, কতিপয় রহ্মতের কাজে নিযুক্ত আছেন, কতিপয় আমলনামা লেখার কাজে নিযুক্ত, তাঁদেরকে "কিরামান কাতিবীন" বলা হয়। কতিপয় আল্লাহ্র আরশ বহনের দায়িত্বে নিয়োজিত। এমনিভাবে সৃষ্টির বিভিন্ন কাজে আল্লাহ্ পাক ফেরেশ্তাদেরকে নিয়োজিত করে রেখেছেন।

৮. ফেরেশ্তাগণ মাসূম বা নিষ্পাপ। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক কার্য সম্পাদন করে থাকেন, তার ব্যতিক্রম করেন না। আল্লাহ্র আদেশের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম তাঁরা করেন না। তারা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেন না। বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। এ ব্যাপারে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

لَا يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ.

অর্থাৎ, তারা আগে বেড়ে কথা বলে না। তারা তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। (সূরা: ২১-আম্বিয়া: ২৭)

لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ لَا يَسْتَحْسِرُوْنَ.

অর্থাৎ, তারা ইবাদত করা থেকে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। (সূরা: ২১-আম্বিয়া: ১৯)

ইবলীস আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অমান্য করেছিল- এ থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, ফেরেশতা থেকে নাফরমানী হতে পারে। কেননা, মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের মতে ইবলীস ফেরেশতা নয়, বরং সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে,

كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ.

অর্থাৎ, সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত। অতপর সে তার প্রতিপালকের নির্দেশের অবাধ্য হয়ে যায়। (সূরা: ১৮-কাহ্ফ: ৫০)

তদুপরি ইবলীসের আওলাদ আছে বলে কুরআনে উল্লেখ হয়েছে। এটাও তার ফেরেশতা না হওয়ার দলীল। কেননা, ফেরেশতাদের আওলাদ হয় না। উপরোক্ত আয়াতেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَ ذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِيْ وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ.

অর্থাৎ, তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। (সূরা: ১৮-কাহ্ফ: ৫০)

এছাড়া ইবলীস কর্তৃক নাফরমানী ঘটে যাওয়াও তার ফেরেশতা না হওয়ার দলীল। কেননা, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র নাফরমানী করেন না। যেমন পূর্বে এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত হারূত ও মারূত সহীহ মতানুসারে দু'জন ফেরেশতা ছিলেন। তাঁদের থেকে কোন কুফ্র বা গোনাহে কাবীরা সংঘটিত হয়নি।[১] তাঁদের সঙ্গে জোহরা নাম্নী নারীর প্ররোচনা সংক্রান্ত রেওয়ায়াতটা বায়যাবী, রাযী, কাজী ইয়াজ প্রমুখ মওজূ' (জাল) বলে মন্তব্য করেছেন।

ফেরেশ্তাদের মধ্যে চারজন সর্বপ্রধান

(এক) হযরত জিব্রাঈল (আ.): তিনি ওহী ও আল্লাহ্র আদেশ বহন করে নবীদের নিকট আসতেন। এছাড়া আল্লাহ্ যখন যে নির্দেশ প্রদান করেন তা কর্তব্যরত ফেরেশত-ার নিকট পৌঁছান।

(দুই) হযরত মীকাঈল (আ.): তিনি মেঘ প্রস্তুত করা, বৃষ্টি বর্ষাণো এবং আল্লাহ্র নির্দেশে মাখ্লূকের জীবিকা সরবরাহের দায়িত্বে নিযুক্ত।

(তিন) হযরত ইসরাফীল (আ.): তিনি রূহ সংরক্ষণ ও সিঙ্গায় ফুৎকার দিয়ে দুনিয়াকে ভাঙ্গা ও গড়ার দায়িত্বে নিযুক্ত।

(চার) হযরত আযরাঈল (আ.): তিনি জীবের প্রাণ হরণের কাজে নিযুক্ত। হাদীছে তাকে 'মালাকুল মঊত' বলা হয়েছে। আছারে সাহাবার মধ্যে আযরাঈল নামটি পাওয়া যায়। মুজাহিদ (রহ.)-এর বর্ণনামতে রূহ কব্য করার জন্য হযরত আযরাঈল (আ.)-এর কারও কাছে গমনাগমনের প্রয়োজন হয় না, বরং সারা পৃথিবী একটি গামলার মত (مثل الطست) তাঁর সামনে অবস্থিত, যার আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যায় তিনি তার রূহ কব্য করে নেন। (তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে কাবীর, আদ্দুররুল মানছূর প্রভৃতি) আযরাঈলের সঙ্গে সহযোগী ফেরেশতাগণ থাকেন। মৃত ব্যক্তি

১. شرح العقائد النسفيه

নেককার হলে রহ্‌মতের ফেরেশ্‌তা আর বদকার হলে আযাবের ফেরেশতা মৃতের নিকট এসে থাকেন এবং মৃত ব্যক্তির রূহ নিয়ে যান।

অন্যান্য ধর্মে ফেরেশতা সম্পর্কিত ধারণা

দুনিয়ার প্রতিটি ধর্ম মতেই বিশেষ করে গ্রীক দর্শনেও এ জাতীয় সত্তাসমূহের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। সাবিয়ী ধর্মমতে এ শ্রেণীর মাখলূককে তারকাপুঞ্জ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। তারা ফেরেশ্‌তাদের উদ্দেশে কুরবানী দিত। তাদের প্রতিকৃতি তৈরি করত এবং তাদেরকে দৃশ্যমান প্রভু (مظہر خدا) বা "খোদার প্রকাশ" মনে করত। ইউনানী মিশরী (ইসকান্দারী) দর্শনে তাদের নাম রাখা হয়েছে "উকূলে আশারা" (عقول عشرہ) বা দশ বুদ্ধি-আকল। পার্শিয়ানরা ফেরেশ্‌তাদেরকে "ইমশাস পান্দ" নামে অভিহিত করত এবং তাদের ধারণামতে ফেরেশ্‌তাদের সংখ্যা অসংখ্য ও অগণিত। পার্শিয়ানরা ফেরেশ্‌তাদেরকে পূজা-অর্চনার যোগ্য বলে মনে করত। তাদের ধর্মমতে সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতা হলেন ছয়জন। তাদের প্রত্যেকের অধীনে রয়েছে তেত্রিশজন করে ফেরেশ্‌তা। পার্শিয়ানদের ধর্ম মতে ভাল-মন্দের প্রভু একজন নয় বরং দুইজন এবং তাদের প্রত্যেকের অধীনে রয়েছে অসংখ্য ফেরেশ্‌তা। এই উভয় শ্রেণীর প্রভু নিজ নিজ সৈন্য-সামন্তসহ সর্বদাই একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাকে। এমনিভাবে তারা নর ও মাদী ফেরেশ্‌তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে এবং তারা বলে, মাদী ফেরেশ্‌তা নর ফেরেশ্‌তার স্ত্রী। ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা ফেরেশ্‌ত-াদেরকে করবীম বলে এবং বিশিষ্ট ফেরেশ্‌তাদেরকে জিব্‌রাঈল, মীকাঈল ইত্যাদি নামে অভিহিত করে। তারা মর্যাদা ও সম্মানের মস্তক অবনত করে তাদেরকে এমনভাবে আহবান করে যেমনটা আল্লাহ্‌র শানে করা হয়ে থাকে। খৃষ্টান সম্প্রদায়ও ফেরেশ্‌তাদের অস্তিত্বকে স্বীকার করে এবং বিশেষ বিশেষ ফেরেশ্‌তাকে জিব্‌রাঈল রূহুল কুদ্‌স ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে থাকে। হিন্দু ধর্মে ফেরেশ্‌তাদের সম্পর্কে নানান ধরনের উদ্ভট কল্পনা করা হয়ে থাকে। জাহিলী যুগের পূর্বে আরবরা ফেরেশ্‌ত-াদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে অভিহিত করত। তাদের পূজা-অর্চনা করত এবং এমন আকীদাও পোষণ করত যে, তারা আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের জন্য সুপারিশকারীর ভূমিকা পালন করবে।

ইসলাম ফেরেশ্‌তাদের সম্বন্ধে এ সকল মতাদর্শকে ভ্রান্ত ধারণা এবং অসার বলে ঘোষণা করেছে। এ সকল ভ্রান্ত ধারণার মূলোচ্ছেদ কল্পে কুরআনে কারীমের বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। প্রমাণ করা হয়েছে যে, প্রভুত্ব ও খোদায়ীত্বের কোন গুণ ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে নেই। তাঁরা আল্লাহ্‌র বান্দা। তাঁদের একমাত্র কাজ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করা। আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতিরেকে পৃথিবীতে কোনো রূপ হস্তক্ষেপ করার অধিকার তাদের নেই। সুতরাং তাদের উদ্দেশে ইবাদত-বন্দেগী করা এবং পূজা-অর্চনা করা সম্পূর্ণরূপে হারাম ও না-জায়েয।[১]

১. ইসলামী আকীদা থেকে গৃহীত।

৩. নবী ও রসূল সম্বন্ধে ঈমান

তৃতীয় মৌলিক যে বিষয়ের উপর ঈমান রাখতে হয়, তা হল নবী রসূলদের প্রতি ঈমান। জিন ও ইনসানের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তাআলা যাদের প্রেরণ করেন তাঁরাই নবী ও রসূল। তাঁরা আসমানী কিতাবের ধারক বাহক হন। তাঁরা সেই কিতাব বোঝানো ও ব্যাখ্যা দেয়ার তথা আল্লাহ্‌র বাণী হুবহু পৌঁছে দেয়ার এবং আমল করে আদর্শ দেখানোর যিম্মাদারী পালন করেন।

মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের মতে নবীদের মধ্যে যারা বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদেরকে বলা হয় রসূল (رسول), যেমন নতুন কিতাব প্রাপ্ত হয়েছেন বা নতুন উম্মতের নিকট প্রেরিত হয়েছেন বা বিশেষভাবে বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে মোকাবালার নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছেন, তাদেরকে রসূল বলা হয়। আর যাদের কাছে ওহী আগমন করে তাদেরকে নবী (نبی) বলা হয়।[১] এ হিসাবে নবী ব্যাপক (عام) আর রসূল বিশিষ্ট (خاص)। অর্থাৎ, সব রসূল নবী তবে সব নবী রসূল নন। রসূল হওয়ার জন্য নতুন কিতাব প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক নয়। কেননা হযরত ইসমাঈল (আ.) সর্বসম্মতিক্রমে রসূল ছিলেন কিন্তু তাঁর নিকট কোন নতুন কিতাব আসেনি। তাছাড়া এক হাদীছ থেকে জানা যায় রসূলদের সংখ্যা ৩১৩ জন। আর কিতাব ও সহীফার সংখ্যা সর্বমোট ১০৪।[২]

নবী ও রসূল পরিভাষাদ্বয়ের মাঝে এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে নবী, রসূল, পয়গম্বর শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বিশুদ্ধ মতানুযায়ী নবীদের চেয়ে রসূলদের মর্যাদা অধিক।

সাধারণভাবে সব নবী ও রসূলদের প্রতি যা ঈমান রাখতে হবে তা হল:

১. নবুওয়াত ও রেসালাত আল্লাহ্‌র দান (وہبی)। আল্লাহ যাকে চান তাকেই তিনি নবী রসূল হিসাবে মনোনীত করেন। নবুওয়াত সাধনাবলে অর্জিতব্য (کسبی) বিষয় নয়। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষদের মধ্য থেকে রসূল মনোনীত করেন। (সূরা: ২২-হজ্জ: ৭৫)

وَ اللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ.

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে চান তাঁর রহমতের[৩] জন্য একান্ত (মনোনীত) করেন। (সূরা: ২-বাকারা: ১০৫)

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর রিসালাতের ভার কার উপর অর্পন করবেন, তা তিনিই ভাল জানেন। (সূরা: ৬-আনআম: ১২৪)

১. علم الكلام، ادريس كاندهلوى ايضا

দার্শনিকগণ (فلاسفہ) মনে করেন যে, কোন মানুষ যখন আত্মিক সাধনা বলে জড় জগতের আবিলতা থেকে মুক্তি লাভ করে এবং আত্মিক পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হওয়ার ফলে অদৃশ্য বিষয় তার হৃদয়পটে উদ্ভাসিত হতে শুরু করে এবং সে জাগতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হয়, তখনই সে নবী হয়ে যায়। এটা কুফ্রী মতবাদ।[১]

২. নবী রসূলগণ থেকে কখনও নবুওয়াত ও রেসালাত কেড়ে নেয়া হয় না। নবীগণ নবুওয়াত লাভ করার পর নবুওয়াতের পদে চির বহাল হয়ে থাকেন।

৩. তাঁরা মানুষ, তাঁরা খোদা নন বা খোদার পুত্র নন বা খোদার রূপান্তর (অবতার) নন বরং তাঁরা খোদার প্রতিনিধি ও নায়েব। আল্লাহর বাণী অনুসারে জিন ও মানুষ জাতিকে হেদায়েতের জন্য তাঁরা দুনিয়াতে প্রেরিত হন। যারা নবী হযরত ঈসা (আ.)কে খোদা বা নবী হযরত ঈসা ও উযায়ের (আ.)কে খোদার পুত্র বলেছে, তাদের খণ্ডনে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ .

অর্থাৎ, যারা বলে মারয়াম তনয় মসীহই আল্লাহ, তারাতো কুফ্রী করেছে। (সূরা: ৫-মায়িদা: ১৭)

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُنِ ابْنُ اللهِ وَ قَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ.

অর্থাৎ, ইয়াহুদীরা বলে, উযায়ের আল্লাহ্র পুত্র এবং নাসারারা বলে মসীহ আল্লাহ্র পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা। (সূরা: ৯-তাওবা: ৩০)

৪. নবী রসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন ব্যতীত আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَ رُسُلِه وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللهِ وَ رُسُلِه وَ يَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا.

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের সাথে কুফ্রী করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের মাঝে তারতম্য করতে চায় ও বলে, আমরা কতকের প্রতি ঈমান রাখি এবং কতকের প্রতি ঈমান রাখি না, আর (এভাবে) এর মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, তারা প্রকৃতপক্ষে কাফের। (সূরা: ৪-নিসা: ১৫০-১৫১)

৫. নবী রসূলগণ আল্লাহ্র বাণী হুবহু পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ্র বাণী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাঁদের থেকে কোন ত্রুটি সংঘটিত হয়নি।[২] কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللهِ وَ يَخْشَوْنَه وَ لَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللهَ.

অর্থাৎ, তাঁরা (নবী রসূলগণ) আল্লাহ্র বাণী প্রচার করত এবং তাঁকে ভয় করত, আর আল্লাহ্কে ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করত না। (সূরা: ৩৩-আহযাব: ৩৯)

১. علم الكلام، ادريس كاندهلوى   المرقاة ج/١

আরও ইরশাদ হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه. الآية.

অর্থাৎ, হে রসূল, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর; যদি তা না কর, তাহলে তো তুমি তাঁর রেসালাত (বার্তা) পৌঁছে দিলে না। (সূরা: ৫-মায়িদা: ৬৭)

৬. সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আ.) এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নবীগণের ছিলছিলা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম--এর উপর সমাপ্ত হয়েছে।

নবীগণের সংখ্যা কত তা সীমাবদ্ধ করে উল্লেখ না করাই শ্রেয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ.

অর্থাৎ, তাঁদের কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি আর কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি। (সূরা: ৪০-মু'মিন: ৭৮)

অতএব নবীগণের সংখ্যা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করলে হতে পারে নবী নন তাদের সংখ্যাও এসে গেল কিংবা নবী অথচ তার সংখ্যা বাদ পড়ে গেল।[১]

৭. আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী নবীগণ কবরে জীবিত। শহীদদের জীবনের চেয়েও তাঁদের জীবন অধিক অনুভূতি সম্পন্ন। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কবরে জীবিত আছেন। তাঁর কাছে উম্মতের আমল ও দুরূদ সালাম পৌঁছানো হয়। মুসনাদে আবী ইয়া'লা গ্রন্থে হযরত আনাস (রা.) কতৃক বর্ণিত হাদীছে[২] রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

اَلْأَنْبِيَآءُ أَحْيَآؤٌ فِيْ قُبُوْرِ هِمْ يُصَلُّوْنَ . (رواه أبو يعلى المَوصلى والبزار فى مسنده والبيهقى فى حياة الأنبياء. قال البهثي فى "مجمع الزوائد" : رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى ثقات. اه و في تسكين الصدور عن شفاء السقام و حياة الأنباء للبيهقي : وهذا حديث صححه المحدثون مثل اليهثمي والبيهقي والشوكاني والعلي القاري والمنذري وغير هم.)

অর্থাৎ, নবীগণ কবরে জীবিত, তাঁরা তাঁদের কবরে নামায পড়েন।[৩] মুসলিম শরীফ ও মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন,

১. شرح العقائد النسفيه   خبر واحد হলেও এজমা ও উম্মতের কবূল করা (تلقى الأمة بالقبول)-এর কারণে এ দ্বারা আকীদা প্রমাণিত হতে পারে। ৩. মুনাবী "ফাতহুল কাদীর" গ্রন্থে বলেছেন, বলা হয় এখানে يُصَلُّوْنَ শব্দটির অর্থ তাসবীহ পাঠ করেন, যিকির করেন।

أَتَـيْتُ وفِي رواية مَرَرْتُ عَلٰى موسٰى لَيْلَةَ أُسْرِيْ بِيْ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ

فِيْ قَبْرِه. (مسلم ج/٢وأحمد ج/٣)

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মে'রাজের রাতে আমি মূসা (আ.)-এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করি লাল টীলার নিকটে, তখন তিনি স্বীয় কবরে নামায পাঠ করছিলেন।

নবীগণ মৃত্যুর পরও জীবিত হওয়ার কারণে তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের সম্পদের মীরাছ বণ্টন হয় না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরে জীবিত বিধায় তাঁর রওজায় সালাম দেয়া হলে তিনি শুনতে পান এবং উত্তর প্রদান করে থাকেন। অন্য কোন স্থানে থেকে নবীর প্রতি দুরূদ সালাম পাঠ করা হলে নির্ধারিত ফেরেশতারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নিকট তা পৌঁছে দেন।

৮. হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যত পয়গম্বর এসেছেন, তাঁদের সকলেই হক ও সত্য পয়গম্বর ছিলেন, সকলের প্রতিই ঈমান রাখতে হবে। কারও প্রতি ঈমান আনা হবে আর কারও প্রতি ঈমান আনা হবে না, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِه.

অর্থাৎ, আমরা তাঁর রসূলদের মাঝে (ঈমার আনয়নের ক্ষেত্রে) কোন তারতম্য করি না। (সূরা: ২-বাকারা: ২৮৫) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সকল নবীকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ.

অর্থাৎ, সে হক সহকারে আগমন করেছে এবং প্রেরিত রসূলদের সত্যায়ন করেছে। (সূরা: ৩৭-সাফ্‌ফাত: ৩৭)

সকল নবী রসূলের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক বলে আল্লাহ্ তাআলা রসূলদের প্রতি ঈমান আনার বর্ণনার ক্ষেত্রে রসূল শব্দের বহুবচন ব্যবহার করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِه وَ كُتُبِه وَ رُسُلِه.

অর্থাৎ, তারা সকলে ঈমান এনেছে আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রসূলদের প্রতি। (সূরা: ২-বাকারা: ২৮৫)

তদুপরি কোন একজন নবীর প্রতি ঈমান না আনা সকলের প্রতি ঈমান না আনার শামিল। কেননা সকলের শিক্ষার মূলনীতিমালা অভিন্ন ছিল। নূহ, আদ, ছামূদ প্রভৃতি সম্প্রদায় তাদের স্ব স্ব নবী/রসূলকে অস্বীকার করেছিল অর্থাৎ, তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় এক একজন নবী/রসূলকে অস্বীকার করেছিল, তবুও সেটা বয়ান করতে গিয়ে কুরআনে কারীমে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে, একজন নবী/রসূলকে অস্বীকার করা সমস্ত নবী/রসূলকে অস্বীকার করার নামান্তর। ইরশাদ হয়েছে,

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ۨالْمُرْسَلِيْنَ.

অর্থাৎ, নূহের সম্প্রদায় প্রেরিত রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। (সূরা: ২৬-শু'আরা: ১০৫)

كَذَّبَتْ عَادُ ۨالْمُرْسَلِيْنَ.

অর্থাৎ, আদ সম্প্রদায় প্রেরিত রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। (সূরা: ২৬-শু'আরা: ১২৩)

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ.

অর্থাৎ, ছামূদ সম্প্রদায় প্রেরিত রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। (সূরা: ২৬-শু'আরা: ১৪১)

সকল নবী রসূলের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হল প্রত্যেক নবী রসূল তাঁদের স্ব স্ব যুগে সত্য ছিলেন, তাঁদের যুগে তাঁদের আনিত দ্বীনের আনুগত্য অপরিহার্য ছিল। তবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের পর অন্য সব নবী রসূলের শরীআত রহিত হয়ে গিয়েছে, এখন শুধু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরীআত ও তাঁর আনুগত্যই চলবে।

৯. নবী রসূলদের সত্যতা প্রমাণিত করার জন্য তাঁদের দ্বারা অনেক সময় অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। এসব অলৌকিক ঘটনাকে 'মু'জিযা' বলে। মু'জিযায় বিশ্বাস করাও ঈমানের অঙ্গীভূত। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জন্য আগুন ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া, হযরত ঈসা (আ.)-এর দুআয় মৃতদের জীবিত হয়ে যাওয়া, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর হাত মুবারকের আঙ্গুল থেকে পানি ফুটে বের হওয়া –যার দ্বারা সমস্ত সৈন্যবাহিনী তৃপ্তি সহকারে পান করে নেয়– ইত্যাদি।

মু'জিযা (معجزه) শব্দটি আরবী। এর শাব্দিক অর্থ পরাভূতকারী। আল্লামা তাফ্‌তাযানী এর পারিভাষিক অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন,

وهي أمرٌ يَظْهَرُ بخلاف العادة على يد مُدَّعِي النبوة عند تحَدِّي المنكرين على وجه يُعْجِزُ المُنْكِرَ عن الإتيان بمثله.

অর্থাৎ, প্রচলিত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বিষয় যা নবুওয়াতের দাবীদারদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় মহান আল্লাহ পাক নবীদের দ্বারা এ কাজ সংঘটিত করেন। বিষয়টির প্রকৃতি এমন যে, এর মোকাবিলা করা অবিশ্বাসী এবং অস্বীকারকারী লোকদের পক্ষে অসম্ভব।[১]

মু'জিযার সংখ্যা কত? এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেছেন, ১ হাজার। কেউ কেউ বলেছেন, ১ হাজার ২ শত। কেউ কেউ বলেছেন, ৩ হাজার। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) "আল-খাসায়িসুল কুব্‌রা" গ্রন্থে ১ হাজার মু'জিযার বিবরণ পেশ

১. شرح العقائد النسفيه

করেছেন। কাযী ইয়ায বলেন, "কুরআনের ছোট্ট একটি সূরার সমান সূরা রচনা করার

চ্যালেঞ্জ পেশ করা হয়েছে। অতএব এ পরিমাণ হল একটি মু'জিযা।"

উল্লেখ্য কুরআনে কারীমের সবচেয়ে ছোট্ট সূরা অর্থাৎ, সূরা কাউছারে রয়েছে ১০টি শব্দ। অতএব দশ দশ শব্দে এক একটি মু'জিযা হিসাব করলে এক কুরআনে কারীমেই হাজার হাজার মু'জিযা।

মু'জিযা ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য

দার্শনিক আলেমদের মতে যাদু ও মু'জিযার মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য বিদ্যমান। যথা:–[১]

১. কোন ওয়াসিতা বা মাধ্যম প্রয়োগ করে যাদু প্রদর্শন করা হয়। অর্থাৎ, যাদু কোন উপকরণ (اسباب)-এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়, যদিও সে উপকরণ জাহের নয়। পক্ষান্তরে মু'যিজার পেছনে কোন উপকরণ (اسباب) থাকে না। কোন উপকরণের মাধ্যমে মু'জিযা প্রদর্শন করা যায় না। বরং আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন তখনই তিনি নবী বা রসূলগণের মাধ্যমে মু'জিযার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। এটাই হচ্ছে যাদু ও মু'যিজার মধ্যকার মূল তাৎপর্যগত পার্থক্য।
২. যাদুবিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। পক্ষান্তরে মু'জিযা শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। বরং আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবী-রসূলগণের মাধ্যমে নিজ ইচ্ছায়ই মু'জিযার প্রকাশ ঘটান।
৩. যাদুর মোকাবিলা করা সম্ভব। তাই এক যাদুকর অন্য যাদুকরের যাদুকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দিতে পারে। পক্ষান্তরে মু'জিযার মুকাবিলা করা কোন মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তাই হযরত মূসা (আ.)–এর মু'জিযার সামনে ফিরাউনের আনীত দেড় লক্ষ যাদুকর ব্যর্থ হতে বাধ্য হয়।
৪. যাদুর কোন বাস্তবতা বা প্রকৃত স্বরূপ নেই। বরং যাদু হচ্ছে একটি অবাস্তব বিষয়। পক্ষান্তরে মু'জিযা হচ্ছে বাস্তব সত্য এক কুদরতী বিষয়। এর বাস্তবতার কথা অমুসলিম ব্যক্তিরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।
৫. যাদু স্থান ও কালের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ। মু'জিযা এরূপ নয়। যেমন: আল্ কুরআন সর্বকালের ও সর্বস্থানের মানুষের জন্যই এক মু'জিযানা কিতাব।
৬. যাদু প্রদর্শন করা হয় পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। আর মু'জিযার প্রকাশ ঘটানো হয়েছিল ধর্মীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য।
৭. সাধারণত মূর্খ ও নির্বোধ ধরনের লোকদের মধ্যেই যাদু প্রদর্শিত হয়ে থাকে এবং তারাই তা গ্রহণ করে থাকে। পক্ষান্তরে মু'জিযা প্রদর্শিত হয়েছিল সর্বস্তরের মানুষের সামনে। তারপর বুদ্ধিমান লোকেরাই এর থেকে হেদায়েত গ্রহণ করেছে।
৮. যারা যাদুকর তারা প্রায়শই নাপাক থাকে এবং এভাবে শয়তানকে রাজি-খুশি করে তাদের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। যাদু প্রদর্শিত হয় নাপাক লোকদের দ্বারা। পক্ষান্তরে

১. তথ্যসূত্র: ইসলামী আকীদা, মাও. ইসহাক ফরীদী, ادریس کاندہلوی, علم الکلام প্রভৃতি।

নবী-রসূলগণ পূত-পবিত্র থাকেন। তাঁদের দ্বারা শয়তানের মনোরঞ্জন হয় না।

এখানে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে মু'জিযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পরবর্তিতে তা উল্লেখ করা হবে।

৯. সাধারণভাবে সব নবী-রসূলগণের ব্যাপারে যেসব আকীদা রাখতে হয়, তার মধ্যে ৯ (নয়) নং হল নবী-রসূলগণের মধ্যে পারস্পরিক মর্যাদার পার্থক্য রয়েছে। এটা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত ইয়াকীনী বিষয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلٰى بَعْضٍ. الآية.

অর্থাৎ, আমি কতক নবীকে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (সূরা: ১৭-বানী ইসরাঈল: ৫৫)

তবে খাস করে কোন্ নবী কোন্ নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তা সবার ক্ষেত্রে ইয়াকীনী নয় বরং ظنی।[১]

১০. নবী-রসূলগণ মা'সূম বা নিষ্পাপ, তাঁদের দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত হয় না। নবুওয়াতের আগে ও পরে সগীরা ও কবীরা সব ধরনের গোনাহ থেকে তাঁরা পবিত্র ও নিষ্পাপ। শরহে ফেকহে আকবার ও মেরকাত গ্রন্থে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে,

والأنبياء عليهم الصلوة والسلام مُنَزَّهُوْنَ عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح يعني قبل النبوة وبعدها. (شرح الفقه الأكبر صفحہ/١٦) وكذا في المرقاة عصمة الأنبياء قبل النبرة و بعدها. (جـ/١)

নবীগণের ইস্‌মত বা নিষ্পাপ হওয়ার আকীদা ঈমানের অংশ। এ সম্পর্কে ২য় খণ্ডে "ইসমতে আম্বিয়া প্রসঙ্গ" শীর্ষক আলোচনায় ইস্‌মত সম্পর্কে বিভিন্ন মত, দলীল-প্রমাণ ও ইস্‌মত অস্বীকারকারীদের বক্তব্যের খণ্ডনসহ একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ পেশ করা হয়েছে।

মু'জিযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য

মু'জিযা ও কারামতের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য বিদ্যমান। যথা:–

(১) মু'জিযার উদ্দেশ্য হল, নবুওয়াত অস্বীকারকারী লোকদের নিকট নবীর সত্যতা প্রমাণ করা। আর কারামতের উদ্দেশ্য হল, ওলী ও বুযুর্গ ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধি করা।

(২) মু'জিযা নবী-রসূলদের সাথে খাস। অর্থাৎ, নবী-রসূল ব্যতীত অন্য কারো থেকে ঘটিত অলৌকিক বিষয়কে মু'জিযা বলা হয় না। পক্ষান্তরে ওলী-দরবেশ সকলের থেকেই কারামত প্রকাশ পেতে পারে।

(৩) ওলী তার অলৌকিক বিষয় গোপন রাখবেন। কিন্তু পয়গম্বরের দায়িত্ব হল, তার অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ করে দেয়া।

১. عقائد الاسلام. از شرح فقہ اکبر

(৪) ওলী নিজ কারামত সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল নাও হতে পারেন। কিন্তু নবী-রসূল তাঁর

মু'জিযা সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল থাকেন।

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে আরও বিশেষ যে সব আকীদা রাখতে হবে তা হল:

১. আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নবুওয়াত বিশেষ কোন দেশ বা গোষ্ঠির জন্য নয় বরং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র জাহানের সকল জাতির জন্য নবী। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ.

অর্থাৎ, আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করেছি। (সূরা: ৩৪-সাবা: ২৮)

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا.

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ্‌র রসূল। (সূরা: ৭-আ'রাফ: ১৫৮)

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا.

অর্থাৎ, মহান ঐ সত্তা যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে। (সূরা: ২৫-ফুরকান: ১)

হাদীছে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ اِلٰى قَوْمِه خَاصَّةً وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً. (رواه الشيخان)

অর্থাৎ, পূর্বে (কোন কোন) নবী বিশেষভাবে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হতেন আর আমি সমগ্র মানব জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছি। (বোখারী ও মুসলিম) মুসলিম শরীফের এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لَا يَسْمَعُ بِيْ اَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِه اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ. (رواه مسلم)

অর্থাৎ, ঐ সত্তার কছম যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, এই উম্মতের ইয়াহুদী নাসারা যে কেউ আমার কথা জানার পরও আমার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করলে সে জাহান্নামী হবে।

২. আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল নবীর চেয়ে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। তিনি নবী রসূলদের সর্দার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। কুরআন, হাদীছ, ইজ্‌মা ও কেয়াস দ্বারা এটা প্রমাণিত।[১]

নিম্নে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর শ্রেষ্ঠ হওয়ার চারটি দিক তুলে ধরা হল।

---

১. عقائد الاسلام للحق حقانی نقلا عن الشفاء

(এক) এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলা সব নবী-রসূল থেকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর যুগ পাওয়ার শর্তে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন ও তাঁর নুসরত করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে,

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ.

(দুই) তাঁর উম্মতকে সকল উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। আর উম্মত শ্রেষ্ঠ হয় দ্বীনী কামালিয়াতের ভিত্তিতে। আর দ্বীনী কামালিয়াত রসূলের কামালিয়াতের অধীন। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৮১) অতএব রসূলের উম্মতের শ্রেষ্ঠ হওয়া তাঁরই শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ.

অর্থাৎ, তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ১১০)

(তিন) হাদীছে এসেছে,

فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ. الحديث. (رواه الشيخان)

অর্থাৎ, অন্যান্য নবীদের উপর ছয়টি বিষয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। (তার মধ্যে একটি হল আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি।) [বোখারী ও মুসলিম]

(চার) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরীআত সকল শরীআতের চেয়ে কামেল ও পূর্ণাঙ্গ। আর শরীআত পূর্ণাঙ্গ ও কামেল হওয়া নবুওয়াত কামেল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম। (সূরা: ৫-মায়িদা: ৩)

৪. তিনি খাতামুন্নাবীয়্যীন অর্থাৎ, শেষ নবী। তাঁর পর আর কোনো নবী আসবেন না। অন্য কেউ নবী হওয়ার দাবী করলে সে ভণ্ড ও কাফের। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ.

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয় বরং সে আল্লাহ্‌র রসূল এবং শেষ নবী। (সূরা: ৩৩-আহযাব: ৪০)

হাদীছে এসেছে, নবী কারীম কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ. (مسند أحمد و الطبراني)

অর্থাৎ, আমি শেষ নবী; আমার পর আর কোনো নবী নেই। (মুসনাদে আহমদ ও তাবারানী)

খতমে নবুওয়াত প্রসঙ্গে বিস্তারিত দলীল প্রমাণ দ্বিতীয় খণ্ডে "খতমে নবুওয়াত প্রসঙ্গ" শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে।

রসূল (সা.) সত্য নবী ছিলেন তার প্রমাণ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্য নবী ছিলেন উলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীছ থেকে, বাস্তব ঘটনা থেকে তার প্রমাণ তিন হাজারের মত সংগ্রহ করেছেন। এ বিষয়ের উপর অনেক কিতাবও লেখা হয়েছে।

এ প্রমাণগুলোর মধ্যে রয়েছে–

১. নবী কারীমে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্য নবী ছিলেন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে কুরআন। একজন উম্মী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর মুখ থেকে কুরআনের ন্যায় এরূপ মহা জ্ঞানভাণ্ডারের গ্রন্থ প্রকাশ পাওয়াই প্রমাণ করে যে, তিনি মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এসব জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন। কুরআনে পাকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন চ্যালেঞ্জও পেশ করেছেন। ইরশাদ করেছেন,

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا.

অর্থাৎ, আমি আমার বান্দার উপরে যে কিতাব নাযিল করেছি, এ ব্যাপারে তোমাদের যদি সামান্যতম সন্দেহ থাকে (যে, এটা তাঁর রচনা করা কি না) তাহলে (এই কুরআনের বড় কোন সূরা নয়, বরং) এর ছোট্ট সূরার মত একটি সূরা রচনা করে দেখাও। (তোমরা নিজেরা যদি না পার, তাহলে) তোমাদের সব সহযোগীদের ডেকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এরকম একটি সূরা রচনা করে দেখাও। (আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন,) তবুও তোমরা এর সমকক্ষ রচনা পেশ করতে পারবে না। (বাস্তবেও কোন দিন কেউ কুরআনের সমকক্ষ রচনা পেশ করতে পারেনি)। (সূরা: ২-বাকারা: ২৩)

২. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দ্বারা বহু সংখ্যক মু'জিযা প্রকাশ পাওয়া।

৩. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর সত্য হওয়ার আর একটি প্রমাণ হল তাঁর মহরে নবুওয়াত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর পিঠে মহরে নবুওয়াত বা নবুওয়াতের সীলমহর ছিল। অর্থাৎ, তাঁর পিঠে বিশেষ একটি চিহ্ন ছিল। এটি ছিল একটু উঁচু কাল একটি মাংসখণ্ড। সাহাবায়ে কেরামও এটি দেখেছেন। আগের যুগের কিতাবেও এ সম্বন্ধে বর্ণনা ছিল।

৪. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর সত্য হওয়ার আরও একটা বড় প্রমাণ হল সেই যুগের কাফেররাও, সেই যুগের ঘোর শত্রুরাও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যুক বলতে পারেনি। মুসলমান-অমুসলমান, শত্রু-বন্ধু নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে "আল-আমীন" বলে ডাকত। অর্থাৎ, সে আমাদের মধ্যে

সবচেয়ে বড় সত্যবাদী। তিনি যখন নবুওয়াতের দাবী করেছেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বাণী প্রাপ্ত হওয়ার দাবী করেছেন, তখনও তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে পারেনি। বরং তাঁকে সত্যবাদীই মনে করেছে।

তখনকার কাফেরদের একজন বড় নেতা ছিলেন নজর ইবনে হারেছ। তিনি একদিন গোত্রের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট লোকদেরকে ডেকে বললেন, এত বৎসর যাবত মুহাম্মাদের পুরো জীবন আমাদের মধ্যে কেটেছে। এতদিন তোমরা সবাই তাঁকে আল- আমীন বলে ডেকে আসছ। আর এখন যখন তাঁর চুল পাকা শুরু হয়েছে, যখন সে নবুওয়াত পাওয়ার দাবী করছে, এখন তোমরা তাঁকে মিথ্যা বলবে কীভাবে? মিথ্যা বলার বয়স তো পার হয়ে গেছে। সে তো পরীক্ষিত সত্যবাদী। এখন সে নবুওয়াতের দাবী করার পর তোমরা তাঁকে মিথ্যুক বলতে পার না। এটা তোমাদের জন্য একটা পরীক্ষার মুহূর্ত। এখন তোমাদের কী উপায় আছে তা ভেবে দেখ।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তারা সকলে সত্যই জানত। এসত্ত্বেও তারা যতটুকু বিরোধিতা করত, তা শুধু ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যই করত। একটা ঘটনা- একবার হজ্জের মৌসুমের আগে মক্কার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ পরামর্শের জন্য এক জায়গায় সমবেত হল যে, এখন হজ্জের মৌসুম আসছে। দেশ-বিদেশ থেকে বহু লোক আসবে। মুহাম্মাদ তাঁর ধর্মের কথা প্রচার করবে। এভাবে তাঁর ধর্ম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে। বহু লোক মুসলমান হয়ে যাবে। এটাকে ঠেকানোর উপায় কী? তখনকার সময় মুশরিকদের মধ্যকার সবচেয়ে প্রবীন নেতা ওলীদ ইব্‌নে মুগীরা। সে একে একে সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করা শুরু করল।

একজন বলল, আমরা প্রচার করে দিব যে, সে পাগল। সে পাগলের মত আবোল-তাবল বকে চলেছে, তার কথার কোনো আগাগোড়া নেই, কোনো দিক-দিশা নেই। ওলীদ ইব্‌নে মুগীরা বলল, যদি এটা বল, তাহলে মানুষ যখন তার কথা শুনবে, শুনেই বুঝবে যে, এটা পাগলের কথা নয়। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকেই মানুষে মিথ্যুক জানবে।

আর একজন বলল, তাহলে আমরা তাকে কবি বলে দিব। আমরা বলব, সে খুব ভাল ভাষা জানে। কাব্য রচনা করে কথার যাদু দিয়ে সে মানুষকে মুগ্ধ করে ফেলে। ওলীদ ইব্‌নে মুগীরা বলল, এ যুক্তিও চলবে না। আরব দেশের সবাই কবিতা সম্পর্কে ধারণা রাখে। কবিতা কি, কবিতার কথা কি হয়, আর মুহাম্মাদের কথা কি– এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য সবাই বুঝতে পারবে। তখন শেষ পর্যন্ত লোকেরা বলবে, তোমরাই মিথ্যুক, তোমরাই মিথ্যা প্রচার করছ। এতে করে তার প্রতি মানুষের ভক্তি আরও বেড়ে যাবে। অতএব এ যুক্তিও চলবে না।

আরেকজন বলল, তাহলে আমরা তাকে যাদুকর বলে দিব। ওলীদ ইব্‌নে মুগীরা বলল, যাদুতো আমরাও জানি। যাদুর কথা আর মুহাম্মাদের কথা এক নয়। আরবের বহু লোক যাদু জানে। তারা তার বাণী শুনবে। শুনে বুঝবে যে, এ তো যাদু নয়, এ তো আদর্শের কথা। যাদুর ভিতর তো কোন আদর্শের কথা থাকে না। যাদুর ভিতর

কেবল নির্দিষ্ট কিছু শব্দ মন্ত্র পাঠ করা হয়। অতএব মানুষ বুঝবে যে, মুহাম্মাদের কথা যাদু নয়, তোমরাই মিথ্যা প্রচার করছ। তোমাদেরকেই মিথ্যুক বলা হবে। এভাবে তাদের অনেকে অনেক রকম প্রস্তাব দিল। কিন্তু তাকে মিথ্যুক বলে দেয়া হবে– এ প্রস্তাব কেউ দিতে পারল না। কারণ, এতদিন তারা তাঁকে আল-আমীন বলে আসছে, এখন তাঁকে মিথ্যুক কীভাবে বলবে? এভাবে কোন দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্তে তারা উপনীত হতে পারল না। শেষ পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে সহজ মনে করে তারা তাঁকে যাদুকর বলেই অপপ্রচার চালানোর সিদ্ধান্ত নিল।

তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি নেতাকে লক্ষ্য করে বলেছিল, যদি মুহাম্মাদের কোন দোষই না থাকে, তাহলে তাঁকে মানতে আমাদের বাধা কোথায়? ওলীদ ইবনে মুগীরা বলেছিল, তোমরা জানো আমরা হলাম আব্দে মানাফ গোত্রের লোক, আর মুহাম্মাদ হল বনু হাশেম গোত্রের লোক। এই দুই গোত্রের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরে একটা প্রতিযোগিতা চলে আসছে। তারা কোন ভাল কাজ করলে আমরাও অনুরূপ একটা ভাল কাজ করে দেখাই। কখনও কোন ব্যাপারে আমরা তাদের থেকে পিছে থাকি না। এখন ঐ বংশের লোকেরা বলছে, তাদের মধ্যে একজন নবী হয়েছেন। আমরা কোন নবী পেশ করতে পারছি না। এ অবস্থায় যদি আমরাও তাঁকে মেনে নেই, তাহলে আমাদের গোত্র ছোট হয়ে যাবে। তাই আমরা তাঁকে মানতে পারছি না। দেখা গেল– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্য নবী, তা তারা সকলেই বিশ্বাস করত। কিন্তু একটা ক্ষুদ্র স্বার্থের কারণে তারা তাঁকে মানত না।

তখনকার কাফেরদের এক বড় নেতা ছিলেন আবু সুফিয়ান। আর এক বড় নেতা আখনাছ ইবনে শুরায়ক। একদিন আখনাছ ইবনে শুরায়ক চিন্তা করল যে, আমরা সবাই যখন মুহাম্মাদকে সত্য বলে বিশ্বাস করি, তাহলে তাকে মানি না কেন? এর একটা সুষ্ঠু ফয়সালা হওয়া চাই। সে আবু সুফিয়ানের বাড়িতে গেল। আবু সুফিয়ানকে বলল, মুহাম্মাদের মধ্যে যদি কোন দোষ না থাকে, তাহলে আমাদের মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? আবু সুফিয়ান আমতা আমতা করে শেষ পর্যন্ত বলল, আমরা তাঁর কোন দোষ দেখাতে পারব না। তারপর সে আর এক নেতা আবু জেহেলের কাছে যেয়ে বলল, মুহাম্মাদের কোন দোষ না থাকলে আমরা তাঁকে মেনে নেই? আবু জেহেল বলল, মুহাম্মাদের মধ্যে কোন দোষ নেই, তবে অসুবিধা একটাই। তা হল মুহাম্মাদ বনু হাশেম গোত্রের লোক। এখন আমরা যদি তাঁকে নবী মেনে নেই, তাহলে আমাদের গোত্র ছোট হয়ে যায়। তাই আমরা তাঁকে মেনে নিতে পারছি না। (معارف القرآن)

৫. আরও একটা বড় প্রমাণ হল আগের যুগের আসমানী কিতাব সমূহের বর্ণনা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর যুগে আসমানী কিতাবের অধিকারী ছিল বিশেষভাবে দুটো দল। একটা হল ইয়াহুদী, আরেকটা হল নাসারা বা খৃষ্টান। ইয়াহুদীদের কিতাব হল তাওরাত, আর নাসারা বা খৃষ্টানদের কিতাব হল ইঞ্জীল। এই তাওরাত এবং ইঞ্জীলে পরিষ্কার ভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–-

এর আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ ছিল। এমনকি তাঁর দেহের গঠন কেমন হবে, তাঁর চোখ কেমন হবে, তাঁর চুল কেমন হবে, কোন্ অবস্থায় তিনি আবির্ভূত হবেন, কোন্ এলাকায় তিনি আবির্ভূত হবেন, কখন কখন তিনি সফরে যাবেন, এসব বিষয়েরও বিস্তারিত বিবরণ তাতে ছিল। আগের যুগের ঐতিহাসিকরা তাওরাত এবং ইঞ্জীল থেকে এরকম বহু উদ্ধৃতি উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, শেষ নবীর আগমন এবং তাঁর গুণাগুণ ইত্যাদি সম্পর্কে কত পরিষ্কার বর্ণনা এসব কিতাবে ছিল। নিম্নে এরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হল।

বাইবেল (ইঞ্জীল) থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর আবির্ভাব সম্বন্ধে ইঞ্জীলে (বাইবেলে) যেসব প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে তার কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হল।[১]

যীশুখ্রীষ্টের সমসময়ে সাধু যোহন (St.John) আবির্ভূত হয়েছিলেন। জেরুজালেম থেকে ইয়াহুদীরা কতিপয় পাদ্রীকে তাঁর পরিচয় নেয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। তাঁরা এসে যোহনকে যেকয়টি প্রশ্ন করেন এবং যোহন তার যে উত্তর দেন, তাতেই হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর আবির্ভাবের খবর পাওয়া যায়।

বাইবেলে এরূপ উল্লেখিত হয়েছে– ...[২] অর্থাৎ, "যোহন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হয়েছে যে, যখন জেরুজালেম থেকে ইয়াহুদীদের দ্বারা প্রেরিত কতিপয় পাদ্রী এসে যোহনকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কে? তখন যোহন স্বীকার করলেন, আমি যীশুখ্রীষ্ট নই। তখন তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, তবে আপনি কে? আপনি কি ইলিয়াস? তিনি বললেন, আমি ইলিয়াস নই। আপনি তবে কি সেই নবী? যোহন উত্তর দিলেন, না। তখন তারা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, যদি আপনি যীশুখ্রীষ্ট, ইলিয়াস অথবা সেই নবী

১. উদ্ধৃতিগুলো কবি গোলাম মোস্তফা রচিত বিশ্বনবী গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

২. এর ইংরেজি ইবারত নিম্নরূপ:

"And this is the record of John, when Jews sent priests and Laits from Jerosalem to ask him, who art thou ?

And he confessed and denied not-I am not the christ.

And they asked him, what then ? Art thou Elias ? And he saith, I am not Art thou THAT PROPHET ? And he answered, No- And they asked him and said unto him, why baptizest thou them, if thou be not the Christ, not Elias, neither that prophet ?

Johin answered them, saying baptize with water, but there standeth one amongst you whom ye know not.

He it is who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose."

-(John. chap, 1 : 19-27) \

না হন, তবে কেন বাপ্তাইজ[১] করছেন? যোহন উত্তর দিলেন, আমি পানি দ্বারা বাপ্তাইজ

করি, কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন একজন আছে, যাঁকে তোমরা জান না।

তিনিই সেই জন যিনি আমার পরে এসেও আমা অপেক্ষা সম্মানের অধিকারী হবেন এবং আমি যাঁর জুতার ফিতা খুলবারও যোগ্য নই।"

এখানে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, যীশুখ্রীষ্ট এবং ইলিয়াস ছাড়া তৃতীয় আর একজন নবী যে আসবেন, সে কথা ইয়াহুদীরা জানত।

এই 'সেই নবী' যে একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ-ই, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই; কারণ যীশুখ্রীষ্টের পরবর্তী পয়গম্বর (এবং সর্বশেষ পয়গম্বর)-ই হচ্ছেন 'হযরত মুহম্মাদ')।

যীশুখ্রীষ্ট নিজেও বলেছেন,

"যদি তোমরা আমাকে ভালবাস, তবে আমার উপদেশমত কার্য কর, আমি স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করব, যাতে তিনি তোমাদেরকে আর একজন শান্তিদাতা প্রেরণ করেন, যিনি চিরদিন তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন।"[২]

তিনি আরও বলেছেন, যা হোক, আমার উচিত যে তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি চলে যাই, কারণ আমি না গেলে সেই শান্তিদাতা আসবেন না, কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাঁকে পাঠিয়ে দিব।[৩]

অন্যত্র আছে, "যা হোক, যখন সেই সত্য-আত্মা, আসবেন, তখন তিনি তোমাদেরকে সর্বপ্রকার সত্যপথে চালিত করবেন। কারণ, তিনি নিজের কথা কিছু বলবেন না কিন্তু যা তিনি (ঈশ্বরের নিকট হতে) শুনবেন, তাই বলবেন এবং তিনি ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা দেখাবেন।"[৪]

১. "বাপ্তাইজ" (baptism) অর্থ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা; খ্রীষ্টধর্মমতে জলে অবগাহন বা জল সিঞ্চন ও নামকরণ।

২. এর ইংরেজি ইবারত নিম্নরূপ:

"If you love me, keep my commandments. And I will pray the Father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever."
-(John. 14 : 15-16)

৩. এর ইংরেজি ইবারত নিম্নরূপ:

"Nevertheless I tell you the truth. It is expedient for you that I go away ; for if I go not away, the comforter will not come unto you : but if I depart I will send him unto you," -(John. 17 : 7-8)

৪. এর ইংরেজি ইবারত নিম্নরূপ:

"How be it, when he the spirit of truth is come, he will guide you unto all truth, for he shall not speak of himself but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come."
-(John : 13-16)

এই 'শান্তিদাতা' (paraclete) কে? হযরত মুহাম্মাদকেই কি স্পষ্টাক্ষরে এখানে

ইঙ্গিত করা হচ্ছে না? যীশুখ্রীষ্টের পরে একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ ছাড়া অন্য কোন পয়গম্বর আবির্ভূত হননি। তা ছাড়া ঢ়ধৎধপষবঃব শব্দের অর্থও হচ্ছে 'শান্তিদাতা', অথবা 'চরম প্রশংসিত'। এই দুটি বিশেষণই হযরত মুহাম্মাদের জন্য নির্দিষ্ট। কাজেই এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

তাওরাত থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি

ইয়াহুদীদের ধর্মশাস্ত্র 'তওরাত'-এ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আছে। কবি গোলাম মোস্তফা রচিত বিশ্বনবী থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করছি।[১]

"তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হতে আমার (মূসার) মতই একজন পয়গম্বর উত্থিত করবেন, তাঁর কথা তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে।"[২]

অন্যত্র আছে:

"(ঈশ্বর বলছেন,) আমি তাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হতে তোমার (মূসার) মতই একজন পয়গম্বর উত্থিত করব এবং তাঁর মুখে আমার বাণী প্রকাশ করব। তিনি তোমাদেরকে আমি যা আদেশ করব তা-ই শোনাবেন। এবং এটা অবশ্য ঘটবে যে, তাঁর মুখ-নিঃসৃত আমার সেই বাণী যারা শুনবে না, তাদেরকে আমি শুনতে বাধ্য করব।"[৩]

আরও একটি দৃষ্টান্ত দেখুন:

"এবং ঈশ্বরের মনোনীত পুরুষ মূসা মৃত্যুর পূর্বে এই বলে বনী-ইসরাঈলদেরকে আশীর্বাদ করলেন এবং তিনি বললেন, প্রভু (মূসা) সিনাই পর্বত হতে আসলেন এবং সিয়ের (Seir) পর্বত হতে উঠলেন, কিন্তু তাঁর (অর্থাৎ, যিনি আসবেন) জ্যোতি ফারাণ পর্বত হতে বিকীর্ণ হল; তিনি দশ হাজার ভক্ত সঙ্গে আনলেন এবং তাঁর দক্ষিণ হস্ত হতে এক জীবন্ত আইনগ্রন্থ বের হল।"[৪]

১. উদ্ধৃতিগুলো কবি গোলাম মোস্তফা রচিত বিশ্বনবী গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

২. এর ইংরেজি ইবারত নিম্নরূপ:

"The Lord thy God will raise up unto thee a prophet frm the midst of thy brethren, like unto me. Unto him ye shall hearken."
-(Duet. 15 : 18)

৩. এর ইংরেজি ইবারত নিম্নরূপ:

"I will raise them upaa prophet from among ther brithren, like unto thee, and willl put my words in his mouth and he shall speak unto them all that I shall command him. And it shall come to pass hat whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name, I will require it of him." -(Duet, 18 ; 18-19)\

(পরবর্তি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এই সমস্ত উক্তি যে একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই তা স্বীকার করবেন।

উল্লেখ্য এখন যে তাওরাত-ইঞ্জীল অর্থাৎ, এখন যে বাইবেল পাওয়া যায়, তাতে সে সব বর্ণনা পাওয়া যায় না। কারণ বর্তমান তাওরাত-ইঞ্জীল বিকৃত তাওরাত-ইঞ্জীল। প্রকৃত তাওরাত এবং ইঞ্জীলের বহুস্থানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের সুসংবাদ ছিল এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইয়াহুদী-খৃষ্টান পণ্ডিতরা সে সম্বন্ধে ভালভাবে অবগত ছিল- এর বহু প্রমাণও রয়েছে। যথা:

১. তখন মদীনায় বনূ কুরাইজা এবং বনূ নাজীর নামক দুটো ইয়াহুদী গোত্র বাস করত। ঐ এলাকার অন্যান্য অধিবাসীদের সংগে তাদের সব সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। সেসব যুদ্ধে ইয়াহুদীরা পরাজিত হলে তারা বলত, শেষ জমানার নবী এই এলাকায় হিজরত করতে আসবেন, আমরা তাঁকে চিনতে পারব, তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে না। কারণ, তাঁর অবস্থা সম্পর্কে আমাদের কিতাবে বর্ণনা আছে। যার ফলে তাঁকে আমরা চিনতে পারব, তাঁকে চিনে আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে যাব এবং তাঁর সংগে মিলে তোমাদের সংগে যুদ্ধ করে তোমাদেরকে পরাজিত করব। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন কুরআন শরীফে এটা বর্ণনা করে বলেছেন,

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِه.

অর্থাৎ, তারপর যখন সেই নবী ঠিকই এসে গেল (এবং সেই কিতাব কুরআন ঠিকই এসে গেল) যা তারা চিনত, তখন তারা অস্বীকার করে বসল। (সূরা: ২-বাকারা: ৮৯)

নিজেদের হীনস্বার্থ রক্ষার জন্যই তাদের মধ্যে অস্বীকার করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়েছিল। তারা ভেবেছিল এখন আমরা এ নবীর অনুসারী হলে আমাদের নেতৃত্ব বহাল থাকবে না, আমাদের অনুসারীদের থেকে যেসব অর্থ-কড়ি পাই, তাও বন্ধ হয়ে যাবে। এসব ভেবেই তারা নবীকে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু তারা চিনতে পেরেছিল যে, ইনি-ই সেই নবী। চিনতে তাদের মোটেই ভুল হয়নি। আল্লাহ্ পাক বলেছেন,

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَه كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ.

অর্থাৎ, এই কিতাবীরা অর্থাৎ, ইয়াহুদী-নাসারারা নবীকে চেনে, যেমন নিজেদের পুত্রকে তারা চেনে। (সূরা: ৬-আনআম: ২০)

নিজের পুত্রকে যেমন তারা চেনে, এই নবীকেও তারা সেভাবেই চেনে। তারা জেনে শুনেই স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে সত্যকে অস্বীকার করত এবং সত্যকে গোপন করত।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা)

৪. এর ইংরেজি ইবারত নিম্নরূপ:

"And this is the blessing wherewith Moses, the man of God, blessed the children of Israel before hie death :

And he said, The Lord came from Sinai and rose uo from Seir unto them; he shined from mount paran and he came with thousands of Saints; from his right hand went a fiey law them." -(Duet. 33 :1-2)

২. তখনকার যুগে ইয়াহুদীদের মধ্যে একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্

ইব্‌নে সালাম। তিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন। মুসলমান হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনারা নবীকে নিজেদের পুত্রের মতই চিনতে পেরেছেন? তিনি জওয়াব দিয়েছিলেন, নিজের পুত্রকে নিয়েও অনেক সময় সন্দেহ হয়, কিন্তু এই নবীকে চেনার ব্যাপারে তার এতটুকুও সন্দেহ ছিল না। নবীকে এরূপ চিনতে পারার কারণ হল তাদের কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলে এই নবীর গুণাগুণ ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত ছিল।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়স যখন ১২ বছর, তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম দেশে যাচ্ছিলেন। বর্তমান সিরিয়ার অন্তর্গত বুছরা নামক শহরের কাছে যখন তারা পৌছেন, তখন আবু তালিবের বাণিজ্যিক কাফেলা সেখানে বিরতি নিচ্ছিল। পাশে ছিল একজন খৃষ্টান পণ্ডিতের আস্তানা। তার নাম ছিল জরজীস। 'বুহায়রা রাহেব' নামে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। যখন কাফেলা ওখানে অবস্থান নিল, তখন বুহায়রা রাহেব তার আস্তানা থেকে বের হয়ে আসল। খুঁজতে খুঁজতে মুহাম্মাদের কাছে এসে বলল, আমি একেই খুঁজছি। কারণ, যখনই কাফেলা এখানে আসে, আমি লক্ষ্য করেছি সমস্ত গাছপালা, পাহাড়-পর্বত কার উদ্দেশে যেন সাজদা করছে। আমি জানি, আমাদের কিতাবে আছে– নবী ছাড়া আর কারও জন্য এরকম সবকিছুতে সাজদা করে না। হযরত ঈসা (আ.)-এর পরে আখেরী জমানার নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাড়া আর কোন নবী আসবেন না। তাই আমি বুঝলাম অবশ্যই শেষ জমানার নবী এই কাফেলায় আছেন এবং এ-ই হল সেই নবী। প্রমাণ হল তাঁর পিঠে মহরে নবুওয়াত আছে। পণ্ডিতজী সকলকে দেখালেন যে, এই দেখুন তাঁর পিঠে মহরে নবুওয়াত রয়েছে।

তারপর সেই খৃষ্টান পণ্ডিত লোকটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আবু তালিবকে ডেকে বলল, একে দেশে পাঠিয়ে দিন। এটা ইয়াহুদীদের এলাকা, এখানে তাঁর অনেক শত্রু রয়েছে এবং এই সময়ে এ অঞ্চলে তাঁর আগমন ঘটবে কিতাবের মাধ্যমে সে সম্বন্ধে তারা সবাই অবগত রয়েছে। অতএব এখানে অবস্থান তাঁর জীবন নাশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সত্বর তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দিন। ইতিমধ্যেই সাতজন লোক সেখানে আসল। তারা এসেছিল রূম দেশ থেকে। তারা ঐ পণ্ডিতের কাছে জিজ্ঞাসা করল, এদিকে আরবদের কোন কাফেলা এসেছে কি? তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমরা কেন আরবদের কাফেলা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ? তারা বলল, আমাদের এলাকার পণ্ডিতগণ আমাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন যে, এই সময়ে এ এলাকায় শেষ নবীর আগমন ঘটবে, এই সময় তিনি এই এলাকায় সফরে আসবেন। আমরা তার সন্ধানে এসেছি। আমরা তাকে হত্যা করার জন্য এসেছি। বুহায়রা রাহেব তাদেরকে বললেন, যদি তিনি আল্লাহ্‌র নবীই হয়ে থাকবেন, তাহলে তো আল্লাহ্‌ই তাঁকে রক্ষা করবেন, তোমরা তাঁকে হত্যা করতে পারবে না। অতএব তোমরা ফিরে যাও। তারা বলল, হ্যাঁ কথা ঠিক। এই বলে তারা ফিরে গেল। এ ঘটনা

থেকে বোঝা যায়- সে যুগের খৃষ্টান পণ্ডিতরা ভালভাবে জানত যে, আখেরী নবীর অবস্থা কী হবে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়স যখন ২৫ বছর, তখন তিনি খাদীজা (রা.)-এর মাল নিয়ে ব্যবসা করার জন্য আরেকবার শাম দেশে সফরে গিয়েছিলেন। তখন ঐ আস্তানার খৃষ্টান পণ্ডিত ছিলেন নাছতূরা। তাকে নাছতূরা রাহেব বলা হত। সেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে চিনে ফেলেছিলেন যে, ইনি-ই শেষ জমানার নবী এবং সে স্বীকার করেছিল যে, আমাদের কিতাবে আছে, এই সময় তিনি এই এলাকায় সফরে আসবেন। এ থেকে বোঝা যায়- তখন এসব বর্ণনা তাদের কিতাবে ছিল। তবে বর্তমানে ইঞ্জীলে এসব বর্ণনা পাওয়া যায় না। কারণ, প্রকৃত ইঞ্জীলকে বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। আল্লাহ্র প্রেরিত আসল ইঞ্জীল দুনিয়ার কোথাও নেই। যা এখন আছে, তা মানুষের রচিত বিকৃত ইঞ্জীল মাত্র।

আর একটি ঘটনা - রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমের সম্রাট হেরাক্ল-কে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে পত্র দিয়েছিলেন। ইংরেজিতে হেরাক্ল-কে বলা হয় হেরাক্লিয়াস। হেরাক্লিয়াস সেই পত্র পাঠ করে নবীর সত্যতা যাচাই করার জন্য তখনকার যুগের সবচেয়ে বড় খৃষ্টান পণ্ডিত লাটপাদ্রী জগাতির-এর কাছে সেই চিঠি পাঠিয়ে দেন। জগাতির সংবাদ পাঠান যে, আমাদের জানা মতে শেষ নবীর আগমনের সময় হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, এই হলেন সে-ই নবী। তাবুকের যুদ্ধের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার হযরত দেহ্ইয়ায়ে কালবী (রা.)-কে দূত বানিয়ে হেরাক্লিয়াসের নিকট পত্র দিয়েছিলেন। হেরাক্লিয়াস বলেছিলেন, আমি কী করব? আমার লোকজন তো মানবে না! তিনি হযরত দেহ্ইয়ায়ে কালবী (রা.)কে তখনকার লাটপাদ্রীর কাছে সত্যতা যাচাই করার জন্য পাঠালেন। লাটপাদ্রী বিস্তারিত জেনে লোকদেরকে ডেকে সকলের সামনে বললেন, শেষ নবীর আগমন ঘটেছে, তোমরা সকলে তার উপর ঈমান আন। আমিও ঈমান আনলাম। সকলের সামনে কালেমায়ে শাহাদাৎ পাঠ করে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। কিন্তু লোকেরা তাকে সেই মজলিসেই শহীদ করে দিল। হযরত দেহ্ইয়ায়ে কাল্‌বীর মুখে ঘটনা শুনে হেরাক্লিয়াস বললেন, বড় লাটপাদ্রীর যখন এই অবস্থা, তখন আমি যদি মুসলমান হয়ে যাই, তাহলে আমার লোকজন এবং আমার প্রজারাও আমাকে হত্যা করে দিবে।

অনেক ইয়াহুদী খৃষ্টান পণ্ডিত সম্পর্কে জানা যায় যে, তারা বোঝা সত্ত্বেও মানত না। একবার নাজরান থেকে খৃষ্টানদের একটা প্রতিনিধি দল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসেছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো-ভাবেই তাদেরকে ইসলামের কথা মানাতে পারলেন না, তখন আল্লাহ্র নির্দেশে তাদেরকে "মুবাহালা" করার জন্য আহবান জানালেন। "মুবাহালা" অর্থ প্রত্যেক পক্ষ আল্লাহ্র কাছে এই প্রার্থনা করবে যে, হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে যে পক্ষ মিথ্যা,

তাদেরকে ধ্বংস করে দাও। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ দুআ করার জন্য প্রস্তুত হলেন, কিন্তু তারা প্রস্তুত হল না বরং তারা একে অপরের সঙ্গে পরামর্শ করে জিয়্য়া কর দিতে রাজী হয়ে ফিরে গেল। তারা মুবাহালা করতে সাহস পেল না।

এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্য নবী, ইয়াহুদী খৃষ্টানরা তা ভাল করেই জানত। কারণ, তাদের কিতাব তাওরাত-ইঞ্জীলে এ জাতীয় বর্ণনা ছিল। যদিও বর্তমানে ইঞ্জীলে এসব বর্ণনা পাওয়া যায় না। তার কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত ইঞ্জীলকে বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। আল্লাহ্র প্রেরিত আসল ইঞ্জীল দুনিয়ার কোথাও নেই। যা এখন আছে, তা মানুষের রচিত বিকৃত ইঞ্জীল মাত্র।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে রসূল (সা.) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ বেদ উপনিষদ ও পুরাণে

হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ বেদ উপনিষদ, পুরাণে তো আল্লাহ্, রসূল, মুহাম্মাদ এই সমস্ত নামও পরিষ্কারভাবে ছিল। নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল।[১]

'অথর্ববেদীয় উপনিষদ'-এ আছে:

অস্য ইল্ললে মিত্রাবরুণো রাজা
তস্মাৎ তানি দিব্যানি পুনস্পং দুধ্যু
হবয়ামি মিলং কবর ইল্ললাং
অল্লো রসুল মহমদকং
বরস্য অল্লো অল্লাম ইল্লোল্লেতি ইল্লাল্লা ॥৯॥

'ভবিষ্য পুরাণে' আছে:

এতস্মিন্নন্তরে ম্লেচ্ছ আচার্যেন সমন্বিত
মহামদ ইতি খ্যাতঃ শিষ্যশাখা সমন্বিত। ॥৫॥
নৃপশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থল নিবাসিনম্
গঙ্গাজলৈশ্চ সংস্নাপ্য পঞ্চগব্য সমন্বিতৈ।
চন্দনাদিভিরভ্যর্চ তুষ্টাব মনসা হরম ॥৬॥
নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থল নিবাসিনে
ত্রিপুরাসুরনাশায় বহুমায়া প্রবর্তিনে ॥৭॥

ভোজরাজ উবাচ-

ম্লেচ্ছৈর্গুপ্তায় শুদ্ধায় সচ্ছিদানন্দরূপিণে।
ত্বং মাং হি কিঙ্করং বিদ্ধি শরনার্থ মুপাগতম্ ॥৮॥

ভাবার্থ: ঠিক সেই সময় 'মহামদ' নামক এক ব্যক্তি- যাঁর বাস 'মরুস্থলে' (আরব দেশে) আপন সাঙ্গোপাঙ্গসহ আবির্ভূত হবেন। হে আরবের প্রভু, হে জগতগুরু,

১. উদ্ধৃতিগুলো কবি গোলাম মোস্তফা রচিত "বিশ্বনবী" গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

তোমার প্রতি আমার স্তুতিবাদ। তুমি জগতের সমুদয় কলুষ নাশ করার বহু উপায় জান, তোমাকে নমস্কার। হে পবিত্র পুরুষ! আমি তোমার দাস। আমাকে তোমার চরণতলে স্থান দাও।

'অল্লোপনিষদ'-এর একটি স্থানে দেখতে পাওয়া যায়:

হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্রো মহাসুরিন্দ্রা।
অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মাণ অল্লাম।
অল্লোরসুল মহমদকং বরস্য অল্লো অল্লাম।
আদল্লাহ্বুকমে ককম অল্লাবুক নিখাতকম। ॥৩॥

ভাবার্থ: আল্লাহ্ সকল গুণের অধিকারী। তিনি পূর্ণ ও সর্বজ্ঞানী। মুহম্মদ আল্লাহ্র রসূল। আল্লাহ্ আলোকময়, অক্ষয়, এক, চির পরিপূর্ণ এবং স্বয়ম্ভু।

'অথর্ববেদ'-এ উল্লেখিত আছে:

ইদং জনা উপশ্রংত নরাশংসস্তবিষ্যতে ॥
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং চ কৌরম আরুশমেষু দঘহে ॥১॥

ভাবার্থ: হে লোকসকল, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর। 'প্রশংসিত জন' লোকদের মধ্য থেকে উত্থিত হবেন। আমরা পলাতককে ৬০,০০০ জন শত্রুর মধ্যে পেলাম।

বলা বাহুল্য, এখানে যে হযরত মুহাম্মাদের কথাই বলা হয়েছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই, কারণ মুহাম্মাদের অর্থই হচ্ছে 'প্রশংসিত জন' আর মক্কার অধিবাসীদের তৎকালীন সংখ্যাও ছিল প্রায় ৬০,০০০।

এই কিছুদিন পূর্বে ভারতের ইলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বেদ প্রকাশ এক গবেষণায় বলেছেন যে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদে "কলির অবতার" বলে যার উল্লেখ রয়েছে, যিনি শেষ যুগে আবির্ভূত হবেন এবং হিন্দুরা যাকে পূজা দেবে বলে প্রতিক্ষায় রয়েছে, তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ। অধ্যাপক বেদ প্রকাশের এই গবেষণা সঠিক এবং বিশ্বাসযোগ্য এ মর্মে ভারতের স্বনামধন্য আটজন গবেষক পণ্ডিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। পণ্ডিত বেদ প্রকাশ তার গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতার পেছনে হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ বেদ থেকে ৯টি যুক্তি তুলে ধরেছেন।[১] যেমন হিন্দু ধর্মের বাণী অনুযায়ী "কলির অবতার" জন্মগ্রহণ করবেন একটা দ্বীপদেশে। এটা হল সেই আরব ভূখণ্ড যা "জাযীরাতুল আরব" বলে পরিচিত। অতএব এটা মুহাম্মাদ-এর ব্যাপারেই প্রযোজ্য। এমনিভাবে হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থে 'কলির অবতার'-এর পিতার নাম 'বিষ্ণু ভাগত' এবং মায়ের নাম 'সোমানির' উল্লেখ রয়েছে। সংস্কৃতিতে 'বিষ্ণু'-এর অর্থ আল্লাহ এবং 'ভাগত'-এর অর্থ দাস। সুতরাং আরবীতে এর অর্থ দাঁড়ায় আব্দুল্লাহ বা আল্লাহ্র দাস। আর 'সোমানির' অর্থ শান্তি; আরবীতে আমীনা অর্থ শান্তি। অতএব এসবের প্রেক্ষিতে কলির অবতার মুহাম্মাদই হবেন, কারণ তার পিতার নাম আব্দুল্লাহ

১. নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "বাংলা পত্রিকা"-র ১৬-১-১৯৯৮ সংখ্যা।

আর মায়ের নাম আমীনা। পণ্ডিত বেদ প্রকাশ এভাবে নয়টি প্রমাণ পেশ করেছেন যে, হিন্দু ধর্মে যে কলির অবতার-এর কথা উল্লেখ আছে, তিনি নিঃসন্দেহে মুসলমানদের নবী মুহাম্মাদ।

উল্লেখ্য, বেদ, উপনিষদ পুরাণের এই অংশগুলো ছাপা হয় না এবং প্রচারও করা হয় না। এমনিতেই হিন্দু ধর্মমতে একমাত্র ব্রাহ্মণরা ব্যতীত অন্য কারও ধর্মগ্রন্থ পড়ার অধিকার নেই। যে ব্রাহ্মণরা ধর্মগ্রন্থ পড়ার অধিকার রাখে, তারাও বেদ, উপনিষদ, পুরাণের ঐ অংশগুলো হাতের নাগালে পায় না, যে অংশগুলোর মধ্যে আল্লাহ, রসূল ও মুহাম্মাদ সম্পর্কে এসব কথা লেখা আছে।

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য্য[১] "আমি কেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম" গ্রন্থে লিখেছেন যে, আমি ব্রাহ্মণ হিসাবে দীক্ষা নেয়ার পর বেদ, উপনিষদ, পুরাণের এই অংশগুলো না পাওয়ায় আমার মধ্যে জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হল এ অংশগুলো পড়ি না কেন? এবং এ অংশগুলো পাই না কেন? ঠাকুর দাদাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কিছু গোলমেলে উত্তর দেন, যার ফলে আমার মধ্যে ঐ অংশগুলো সম্বন্ধে জানার ঔৎসুক্য আরও বৃদ্ধি পায়। যা হোক পরে তিনি অনুসন্ধান করে জানতে পারেন যে, ঐ অংশগুলোর মধ্যে ইসলাম ধর্মের কথা বলা হয়েছে, শেষ নবীর আগমনের কথা বলা হয়েছে, শেষ নবীর কথা মানতে বলা হয়েছে, একত্ববাদের কথা বলা হয়েছে, ইত্যাদি। তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, ঐসব অংশ গোপন রেখে তাদের ধর্মকে চালানো হচ্ছে। ঐসব অংশ সাধারণ্যে জানাজানি হলে তাদের ধর্মের জারীজুরী ফাঁস হয়ে যাবে। তিনি বুঝলেন ধর্মের নামে এভাবে লুকোচুরি খেলা হচ্ছে। এরপর তিনি মুসলমান হয়ে যান।

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম ভ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এসব ধর্মে শেষ নবী সম্বন্ধে এসব ভবিষ্যদ্বাণী এল কীভাবে? এ প্রশ্নের জবাব হল- এসব ধর্ম এখন সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। হতে পারে, এসব ধর্মের পূর্বসূরী কোন মনীষী আল্লাহ্র বাণী প্রাপ্ত ছিলেন বা অন্তত তারা সত্যপন্থী ছিলেন। তারা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে জেনে একথাগুলো বলেছেন, আর তাদের মূল্যবান বাণী হিসাবে এসব কথা তাদের ধর্মগ্রন্থে এসে গেছে। কিংবা বলা যায় আর্য ঋষিগণ ধ্যানবলে হাজার হাজার বৎসর পূর্বেই মুহাম্মাদের স্বরূপ ও আবির্ভাব সম্বন্ধে এসব তথ্য অবগত ছিলেন। কিন্তু আস্তে আস্তে এই পূর্বসূরীদের সত্য খাঁটি আদর্শগুলো বিকৃত হতে হতে এখন এই পর্যায়ে চলে এসেছে যে, এখন আর এসব ধর্মকে কোনোভাবেই খাঁটি ধর্ম বলার উপায় থাকেনি।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে

বৌদ্ধদিগের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'দিঘা নিকায়া'-য় উল্লেখিত হয়েছে:[২]

"মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ভুলে যাবে, তখন আর একজন বুদ্ধ আসবেন, তাঁর নাম 'মৈত্তেয়' (সংস্কৃত মৈত্রেয়) অর্থাৎ শান্তি ও করুণার বুদ্ধ।"

১. তিনি ফরিদপুরের একজন বড় ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে মুসলমান হন। ইসলাম গ্রহণের পর নাম রাখেন আবুল হোসেন। আবুল হোসেন ভট্টাচার্য্য নামেই তিনি পরিচিত।
২. কবি গোলাম মোস্তফা রচিত "বিশ্বনবী" গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

আমরা নিম্নে সিংহল থেকে প্রাপ্ত[১] একটি প্রমাণের উল্লেখ করছি। তাতেও উপরোক্ত কথার সমর্থন আছে।

আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার মৃত্যুর পর কে আমাদিগকে উপদেশ দিবে?

বুদ্ধ বললেন, আমিই একমাত্র বুদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ নই। যথাসময়ে আর একজন বুদ্ধ আসবেন, আমার চেয়েও তিনি পবিত্র ও অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত ... তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত প্রচার করবেন।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে আমরা চিনব কী করে ?

বুদ্ধ বললেন, তাঁর নাম হবে মৈত্রেয়।

এই 'শান্তি ও করুণার বুদ্ধ' (মৈত্রেয়) যে মুহাম্মাদ (সা.), তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কুরআন শরীফে মুহাম্মাদ (সা.)-এর বিশেষণও অবিকল এরূপই আছে। মুহাম্মাদ (সা.) সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তিনি 'রহমাতুল্লিল্ আলামীন' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের জন্য মূর্ত করুণা ও আশীর্বাদ।[২]

পার্শী ধর্মশাস্ত্রে

পার্শীজাতির ধর্মগ্রন্থের নাম 'জিন্দাবেস্তা' ও 'দসাতির'। জিন্দাবেস্তায় হযরত মুহাম্মাদের আবির্ভাবের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এমনকি 'আহমদ' নামটি পর্যন্ত উল্লেখিত হয়েছে। আমরা ইংরেজি শ্লোকের অনুবাদ পেশ করলাম।[৩]

"আমি ঘোষণা করছি, হে স্পিতাম জরথুষ্ট্র, পবিত্র আহমদ (ন্যায়বানদিগের আশীর্বাদ) নিশ্চয়ই আসবেন, যাঁর নিকট থেকে তোমরা সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ কার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করবে।[৪]

১. from Ceylonese sources.

২. এর ইংরেজি ইবারত নিম্নরূপ:

"Ananda said to the Blessed One, 'Who shall teach us when thou art gone ?'

And the Blessed One replied:

'I am not first Buddha who came on the earth, nor shall I be the last. In one time another Buddha will arise in the world, a holy one, a supremely enlightened one, endowed with wisdom in conduct... He will proclaim a religious life, wholly perfect and pure such as I now proclaim .....

Anada. said, How shall we know him ?

The Blessed One said He will be known as 'Maitreya

-(The Gospel of Ruddha by Carus, pp. 117-18)

৩. কবি গোলাম মোস্তফা রচিত "বিশ্বনবী" গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

৪. মূল ইংরেজি শ্লোকটি নিম্নরূপ:

" Noid te Ahmad dragoyeitim fram-raomi

Spetame Zarathustra yam dahmam vangnim afritim.

Yunad hake hahi humananghad hvakanghad

Hushyanthnad hudaenad."

-(Zend-Avesta. Part I. Translatid by Max Muller, p. 260) \

'দসাতির' গ্রন্থেও অনুরূপ আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। তার সারমর্ম এরূপ–

"যখন পার্শীরা নিজেদের ধর্ম ভুলে গিয়ে নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হবে, তখন আরব দেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন, যাঁর শিষ্যেরা পারস্যদেশ এবং দুর্ধর্ষ পারশিক জাতিকে পরাজিত করবে। নিজেদের মন্দিরে অগ্নিপূজা না করে তারা ইব্রাহীমের কাবাঘরের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করবে; সেই কাবা প্রতিমা-মুক্ত হবে। সেই মহাপুরুষের শিষ্যেরা বিশ্ববাসীর পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ হবে।"

"তারা পারস্য, মাদায়েন, তুস, বল্‌খ প্রভৃতি পারস্যবাসীদের যাবতীয় পবিত্র স্থান অধিকার করবে। তাদের পয়গম্বর একজন বাগ্মীপুরুষ হবেন এবং তিনি অনেক অদ্ভুত কথা বলবেন।"[১]

৪. আল্লাহ্‌র কিতাব সম্বন্ধে ঈমান

চতুর্থ যে মৌলিক বিষয়ে ঈমান রাখতে হবে তা হল আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি ঈমান। আল্লাহ তাআলা মানব ও জ্বিন জাতির হেদায়েত এবং দিক নির্দেশনার জন্য নবীদের মাধ্যমে তাঁর বাণীসমূহ পৌঁছে দিয়ে থাকেন। এই বাণী ও আদেশ-নিষেধের সমষ্টি হল কিতাব। আল্লাহ তাআলা যত কিতাব দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তার মধ্যে অনেকগুলো ছিল সহীফা অর্থাৎ, পুস্তিকা বা কয়েক পাতার কিতাব। এক বর্ণনামতে সর্বমোট ১০৪টি কিতাব ও সহীফা প্রেরণ করা হয়। তন্মধ্যে চারটি হল বড় কিতাব, আর ১০০টি সহীফা বা পুস্তিকা। যার মধ্যে হযরত শীছ (আ.)-এর উপর ৫০টি, হযরত ইদ্রীস (আ.)-এর উপর ৩০টি, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর উপর ১০টি এবং হযরত আদম (আ.)-এর উপর ১০টি সহীফা অবতীর্ণ হয়।[২] বড় চারটি কিতাব হল– (এক) তাওরাত বা তৌরীত: যা হযরত মূছা (আ.)-এর উপর নাযিল হয়। (দুই) যবূর: যা হযরত দাউদ (আ.)-এর উপর নাযিল হয়। (তিন) ইঞ্জীল: যা হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর নাযিল হয়। (চার) কুরআন: যা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর নাযিল হয়। কুরআনকে আল-কুরআন, আল-কিতাব, ফুরকান এবং আল-ফুরকানও বলা হয়।

কুরআনের সংজ্ঞা হল–

هو المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، المكتوب فى المصاحف، المنقول عنه نقلا متواترا شبهة . وهو الاسم والمعنى جميعا . (قواعد الفقه)

অর্থাৎ, কুরআন বলা হয় যা রসূল (সা.)-এর উপর নাযিল হয়েছে, গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে এবং রসূল (সা.) থেকে "তাওয়াতুর পর্যায়ের বর্ণনা"[৩] সূত্রে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণিত আছে। শব্দ এবং অর্থ উভয়ের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়।

১. Muhammad in World Scriptures. by A. Haq Vidyarthi. p. 47 ।

২. المرقاة جـ/١

২. "তাওয়াতুর পর্যায়ের বর্ণনা" বলে বোঝানো হয় কোন বিষয়ে সর্বযুগে এত অধিক লোকের বর্ণনা যে, পরিকল্পিতভাবে হলেও এত অধিক লোকের মিথ্যার ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য যে, কুরআন ব্যতীত বর্তমানে ইয়াহূদী খৃষ্টানদের নিকট যে তাওরাত ইঞ্জীল রয়েছে তার উপর ঈমান আনা জরুরী নয়। আমরা শুধু এতটুকু বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা যে তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাবূর সংশ্লিষ্ট পয়গম্বরদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন, তা সত্য ছিল এবং সংশ্লিষ্ট সময়ে তার প্রতি ঈমান আনয়ন ও তদনুসারে আমল করা ফরয ছিল।

বর্তমানে আল্লাহর প্রেরিত আসল তাওরাত ইঞ্জীল দুনিয়ার কোথাও নেই। বর্তমানে ইঞ্জীল বা বাইবেল নামে যে গ্রন্থ পাওয়া যায় তা মূলত হযরত ঈসা (আ.)কে আল্লাহ তাআলা উর্ধ্ব আকাশে উঠিয়ে নেয়ার বহু বৎসর পর কিছু লোক রচনা ও সংকলন করেছিল। তারপর যুগে যুগে বিভিন্ন পাদ্রী ও খৃষ্টান পণ্ডিতগণ তাতে বহু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করেছেন। ফলে এটিকে কোনোক্রমেই আর আসমানী ইঞ্জীল বলে মেনে নেয়া যায় না বরং এ হল মানুষের মনগড়া, বিকৃত এবং মানব রচিত ইঞ্জীল, আসমানী ইঞ্জীল নয়। তাওরাতের অবস্থাও অনুরূপ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এ সম্বন্ধে একটি বিশদ প্রবন্ধ পেশ করা হল।

তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাবূরের ভূত বর্তমান অবস্থা

বাইবেল

বাইবেল (Bible) শব্দের অর্থ গ্রন্থসমূহের সংকলন। এটি মধ্যযুগীয় ল্যাটিন ভাষা থেকে গৃহীত। বাইবেল সমগ্র ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সমাজের ধর্মীয় গ্রন্থ। দুটো অংশের সমষ্টিকে বাইবেল বলা হয়। অর্থাৎ, বাইবেলের দুটো গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে। যথা:–

১. পুরাতন নিয়ম (Old Ttestament)। এ অংশটি মূলত তাওরাত। যা ইয়াহুদীদের বিভিন্ন সহীফার সংকলন।

২. নতুন নিয়ম (New Ttestament)। এ অংশটি মূলত ইঞ্জীল ও অন্যান্য সহীফা সম্বলিত।

নূতন নিয়ম-এর তুলনায় পুরাতন নিয়ম বৃহদাকারের। গোটা বাইবেল সমগ্র ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সমাজের ধর্মীয় গ্রন্থ। কিন্তু ইয়াহূদীদের মৌলিক ধর্মীয় গ্রন্থ হল পুরাতন নিয়ম। ইয়াহূদীগণ নূতন নিয়ম মান্য করে না। খৃস্টানগণ প্রথম থেকেই পুরাতন নিয়মকে তাদের পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে মেনে নিয়েছে, বরং খৃস্টীয় প্রথম/দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাধারণভাবে তাদের পবিত্র গ্রন্থ পুরাতন নিয়মই ছিল। তবে খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দিতে বর্তমান আকারে রক্ষিত নূতন নিয়মকে তারা মেনে নেয়।[১]

তাওরাত

তাওরাত (توراة) বর্তমান বাইবেল এর একটি অংশ। এটা বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Ttestament) বলে পরিচিত। পুরাতন নিয়মের এ গ্রন্থটি ইয়াহূদীদের বিভিন্ন পবিত্র সহীফার সংকলন। ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ পুরাতন নিয়মকে নিম্নোক্ত তিন অংশে বিভক্ত করেছেন।

১. ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র Chambers End Bible শিরো.

১. তাওরাত (বিধি-বিধান- Law)।

২. আম্বিয়ায়ে কেরাম–এর সহীফাসমূহ (Prophets) ও

৩. পবিত্র সহীফাসমূহ (Hagiographa অথবা কেবল Writings)।

উপরোক্ত বিভক্তি থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়ে থাকবে যে, সমগ্র পুরাতন নিয়ম তাওরাত নয়। কেননা, তাওরাত ব্যতীত আরও সহীফা রয়েছে যেগুলো ইয়াহূদীদের পবিত্র গ্রন্থের অপরিহার্য অংশ। তবে ঐ সমস্ত সহীফার মধ্যে তাওরাত–এর একটি বিশেষ গুরুত্ব ও পবিত্র আসন রয়েছে।

মূল তাওরাত পাঁচটি সহীফা (পুস্তিকা) সম্বলিত, যেগুলোকে সাহাইফে মূসা (صحائف موسى) বা মূসা (আ.)–এর সহীফা বলা হয়ে থাকে। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।

(১) আদি পুস্তক (Genesis-تکوین): এতে হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্ববর্তীকাল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হযরত ইয়া'কূব (আ.)-এর বংশের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং ধর্মে নৈতিক চরিত্র ও আচার–ব্যবহারের যে মর্যাদা রয়েছে তার সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করা।

(২) যাত্রা পুস্তক (Exodus-خروج): এই সহীফা হযরত মূসা (আ.)–এর জন্ম থেকে শুরু হয়। এতে বর্ণনা করা হয়েছে- কিভাবে তিনি বনী ইসরাঈলকে মিসর থেকে বের করে সিনাই পর্বত (طور سينين) পর্যন্ত নিয়ে যান, যেখানে তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয় এবং তাদের জন্য বিধিসমূহ প্রদত্ত হয়।

(৩) লেবীর পুস্তক (Leviticus): এতে বিশেষভাবে বনী ইসরাঈল-এর ইবাদত সম্পর্কিত বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে।

(৪) গণনা পুস্তক (Numbers-اعداد): এতে বনী ইসরাঈলের সিনাই প্রান্তর থেকে বের হয়ে জর্দান ও ট্রান্স-জর্দান (اردن اور ماوراے اردن)-এর এলাকা জয় করার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা রয়েছে। অধিকন্তু এতে বিক্ষিপ্তভাবে বিধি-বিধানের উল্লেখও রয়েছে।

(৫) দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronomy-تثنیہ): এতে ঐতিহাসিক পটভূমির উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং সমষ্টিগত বিধিসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। এই সহীফা হযরত মূসা (আ.)-এর ওফাতের আলোচনার উপর সমাপ্ত হয়েছে।

পুরাতন নিয়ম-এর অবশিষ্ট সহীফাসমূহ

পুরাতন নিয়ম-এর তিন অংশের মধ্য থেকে দ্বিতীয় অংশ হল صحائف انبياء বা নবীদের পুস্তক (Prophets)। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।

ক. প্রথম যুগের নবীগণ:

(১) য়ূশা' (যিহোশূয়- Joshua)

(২) বিচারককর্তৃগণ (Judges-قضاة)

(৩) শামূয়েল (شموئیل - Samuel) ও

(৪) রাজাবলী (করহমং-□□□□)

খ. শেষ যুগের নবীগণ:

(৫) যিশাইয় (اشعياء-Isaiah)

(৬) যিরমিয় (ارميا-Ieremiah)

(৭) হিযিক্কেল (حزقيل- Ezekiel) ও

(৮) انبياء اصاغر বা অপ্রধান নবীগণ (Minor prophets)। অপ্রধান নবীদের বারটি সহীফা (পুস্তিকা)। কিন্তু সবগুলি মিলিয়ে মোট ১১টি সহীফা গণ্য করা হয়।

পূরাতন নিয়ম-এর তৃতীয় অংশ হল পবিত্র গ্রন্থসমূহ বা صحف مقدسه (Hagiog-rapha)। এতে মোট ১১টি সহীফা রয়েছে, যেগুলো তিন অংশে সম্বলিত। যথা:–

ক. صحف اشعار বা কাব্য পুস্তক: (১) مزامير গীত সংহিতা বা প্রার্থনা সঙ্গীত (Psalms) মাওলানা রহ্‌মাতুল্লাহ কিরানবী বলেন, ঐতিহাসিকগণ বলেন, বাইবেলের গীত-সংগীত অংশটি যবূর কিতাবেরই বিকৃত রূপ মাত্র। (২) امثال হিতোপদেশ বা নীতিবাক্যমূলক গ্রন্থ (Proverbs) ও (৩) আয়্যুব বা ইয়োব (Job)।

খ. مجلات خمسه বা পঞ্চ পুস্তিকা (Megilloth) (৪) পরম গীত (Song of Songs), (৫) راعوت বা রূতের বিবরণ (Ruth), (৬) বিলাপ (Lamentation), (৭) كتاب جامعة سليمان (Ecclesiastes) ও (৮) ইস্টের (আস্তীর- Esther)।

গ. অবশিষ্ট সহীফা বা পুস্তক: (৯) দানিয়েল (دانيال-Daniel) আযরা (عزرا-عزر -Ezra) ও নহিমিয়া (نحميا- Nehemia) [এই তিনটি মিলে একটি সহীফা গণ্য করা হয়। ও (১০-১১) কালক্রমিক ইতিবৃত্ত (Chronicles-ايام)

এই সবগুলো মিলিয়ে ২৪টি সহীফা হল। এগুলোর ভাষা হিব্রু (عبرانی)। দানিয়াল ও আযরা পুস্তক কতিপয় বাক্য ব্যতিরেকে আরামায়িক ভাষায় লিখিত। ইয়াহূদীদের মধ্যে আসল হিব্রু পুরাতন নিয়মই প্রচলিত। ইংরেজি বাইবেলে এই সমস্ত সহীফাকে আরও বিভক্ত করত ৩৯টি সহীফা গণ্য করা হয়ে থাকে। এতে انبياء اصاغر বা অপ্রধান নবীদেরকে পৃথক সহীফা হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। আযরা (ইয্রা)-কে নহিমিয়া (Nehemia) থেকে পৃথক গণ্য করা হয়েছে এবং শামূয়েল, রাজাবলী ও বংশাবলী আরও পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে।

কুরআনের বর্ণনামতে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত, হযরত দাউদ (আ.)-এর উপর যাবূর, হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর ইঞ্জীল এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর উপর কুরআন নাযিল করেন। কুরআনে কারীমে দুটি সহীফার উল্লেখ রয়েছে। যথা– صحف ابراهيم و موسى ইবরাহীম ও মূসা (আ.)-এর সহীফাসমূহ। এখানে তাওরাতকেও সুহূফ (صحف শব্দটি সহীফা-র বহুবচন) বলা হয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, (بما فى صحف موسى

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফা অধুনা বিলুপ্ত। আর তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাবূর কোন না কোন আকারে বিদ্যমান আছে।

কুরআনে কারীমের বর্ণনামতে তাওরাত হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তূর পর্বতে চল্লিশ দিনে নাযিল হয় এবং তিনি তা কাষ্ঠ-ফলকসমূহ/পাতার উপর লিখে রাখেন। অধিকন্তু এই সমস্ত কাষ্ঠ-ফলক/পাতার উপর আল্লাহ তাআলা সমস্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে উপদেশ এবং প্রতিটি ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশ লিখে দেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ كَتَبْنَا لَه فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّ تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ.

অর্থাৎ, আমি তাঁর জন্য ফলকসমূহে সবকিছুর উপদেশ এবং সবকিছুর বিশদ বিবরণ লিখে দিয়েছিলাম। (সূরা: ৭-আরাফ: ১৪৫)

কুরআনে কারীম সংক্ষেপে এও বর্ণনা করেছে যে, ইয়াহূদীরা কিভাবে তাওরাতে রদবদল করত। কোন কোন সময় তারা শব্দের পরিবর্তন করত। যেমন: এক আয়াতে বলা হয়েছে,

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِه.

অর্থাৎ, তারা (আল্লাহ্‌র) কথাগুলোকে তার স্থান থেকে বিকৃত করে। (সূরা: ৪-নিসা: ৪৬)

এই বিকৃতি ও পরিবর্তন তারা সঠিক মর্ম অনুধাবনের পর জেনে বুঝেই করত। ইরশাদ হয়েছে,

ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَه مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ.

অর্থাৎ, তারা সেটা বোঝার পরও সেটাকে বিকৃত করে। (সূরা: ২-বাকারা: ৭৫)

ইয়াহূদীরা তাওরাতের মর্মের মধ্যেও পরিবর্তন সাধন করত। কখনও কখনও তারা নিজেরাই সহীফা লিখে বলত যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতারিত। ইরশাদ হয়েছে,

يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, তারা নিজ হাতে কিতাব লিখে বলে যে, এটা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে (প্রেরিত)। (সূরা: ২-বাকারা: ৭৯)

এখন ইয়াহূদী ও খৃস্টান বিশেষজ্ঞগণ তাদের গবেষণার ভিত্তিতে এই কুরআনী দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তারা তাওরাতকে শব্দগত ও তাৎপর্যগতভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতারিত ওহী হিসাবে স্বীকৃতি দান তো দূরের কথা, উল্টো তাদের অনেকেই আজ সুদৃঢ়ভাবে এর ওহী হওয়াকেই অস্বীকার করছেন।

তাওরাতে বিকৃতির সূচনা কখন থেকে হয়?

পুরাতন নিয়ম-এর বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিকৃতির সূচনা খৃষ্টপূর্ব যুগ থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বনী ইসরাঈলের কতিপয় নবীও এর সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং ইয়াহূদীদের এই অপকর্মকে অপরাধ বলে অভিহিত করে বলেছেন, "আর পৃথিবী আপন নিবাসীদের পদতলে অপবিত্র হল, কারণ তারা বিধানসমূহ লংঘন করেছে, বিধির অন্যথা করেছে, চিরন্তন নিয়ম ভঙ্গ করেছে।" (যিশাইয় ২৪: ৫)। "তোমরা চিরঞ্জীব ঈশ্বরের, আমাদের ঈশ্বর বাহিনীগণের সদা প্রভুর বাক্য বিকৃত করেছ।" (যিরমিয় ২৩: ৩৬) প্রভৃতি।

সম্ভবত Origen (১৮৫-২৫৪ খৃ.)-ই ছিলেন প্রথম খৃস্টান পণ্ডিত যিনি পরিষ্কার-ভাবে ধরতে পেরেছিলেন যে, বাইবেল, বিশেষত পূরাতন নিয়ম-এর ভিতর কতকগুলো বাক্য এমন যা হয়ত অর্থগত দিক থেকে বিশুদ্ধ নয় অথবা নৈতিকতার মানদণ্ডে নিম্নমানের ও নিন্দার্হ।[১] কিন্তু তিনি রূপক বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করত নিজেকে এভাবে প্রবোধ দেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে বাহ্যিক শব্দ দ্বারা উচ্চতর অর্থ অনুসন্ধান করতে হবে। অগাষ্টিন (৩৫৪- ৪৩০ খৃ .) ও টমাস একুইনাস (১২২৫-৭৪ খৃ.) একই মত গ্রহণ করেন। (প্রাগুক্ত)

ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ ১৬ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলন (Reformation movement) অবধি কোনরূপ বিশেষ সন্দেহ ও সংশয় পোষণ করেনি। কেবল চড়ৎঢ়যুৎ (২৩৩-৩০৪ খৃ.) এর বিপরীতে তার ধারণা ব্যক্ত করেন যে, দানিয়েলের পুস্তক ব্যবিলনের নির্বাসনের যুগে লিখিত হয়নি বরং চার শতাব্দী পর লিখিত হয়েছে। অনুরূপ স্পেনের ইয়াহূদী পণ্ডিত ইবনে আযরা (১০৯২-১১৬৭ খৃ.) গবেষণান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, صحائف خمسه বা পঞ্চ পুস্তক (চবহঃধঃবঁপয) হযরত মূসা (আ.) পরবর্তী যুগের রচনা।

ফরাসী দার্শনিক ও পণ্ডিত ঈধঢ়বষষঁ (আনু. ১৬২৪ খৃ.) প্রমাণ করেন যে, তাওরাতের যে মূল হিব্রু পাঠ (متن) বর্তমান, তা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয়। জবরসধৎঁং নামক একজন জার্মান পণ্ডিত ১৭৪৭ খৃস্টাব্দে এক বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যাতে তিনি বাইবেলকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত (revelation/وحی) হওয়া অস্বীকার করেন। আরও একজন জার্মান পণ্ডিত Lessing (আনু. ১৭২৯-৮১ খৃ.)-ও দাবী করেন যে, বাইবেলে উল্লেখিত ঘটনাবলীর উপর ইতিহাসের বুনিয়াদ রাখা যেতে পারে না। বাইবেলের সমালোচনামূলক গবেষণার দিক দিয়ে খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা উল্লেখিত পণ্ডিতবর্গ ছাড়াও কতিপয় বিখ্যাত দার্শনিকও এই জাতীয় মতামত পেশ করেন। যাদের মধ্যে দার্শনিক স্পিনোযা (Spinozg) ও হব্‌স (Hobbes)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

কুরআনী সাক্ষ্যের আলোকে এর ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত আসল সহীফাসমূহ বিনষ্ট হওয়ার পর ইয়াহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিতগণ এগুলো আবার নূতনভাবে রচনা ও বিন্যস্ত করেন। ইতিহাস থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তাওরাত আকস্মিক ঘটনাচক্রে কয়েকবার ধ্বংস হয়।

খৃষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে বাবেল সম্রাট বুখত নাস্সার (নেবু চাদ নাযার) বনী ইসরাঈলের উপর আক্রমণ করে হাজার হাজার নারী, পুরুষকে নির্বিচারে হত্যা করে এবং বন্দী করে নিয়ে যায় তাদের অসংখ্য লোকদেরকে। এসব বন্দিকৃত ইয়াহূদীদেরকে ব্যবিলন রাজ্যে নির্বাসন দেয়া হয়। এ সময় তারা আল্লাহর ঘর মসজিদুল আকসায় হামলা করে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি নাযিলকৃত তাওরাতসহ যাবতীয় গ্রন্থাদি জ্বালিয়ে মেছাখার করে দেয়। জেরুজালেম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

১. Ency. Brit. Bible শিরো.

জনশ্রুতি রয়েছে যে, এ ঘটনার দীর্ঘ দিন পর তাওরাতের একটি কপি তাদের হস্তগত হয়। এরপর পুনঃপুনঃ তারা রোমী এবং গ্রীকদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং এতে তাওরাতের শেষ কপিটিও জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

৭০ খৃষ্টাব্দে তাইতাস (Titus) রূমী Temple বা Synagoguemn জেরুজালেম ধ্বংস করেন। ৯৩২-৩৫ সালে Hadrian ইয়াহূদীদের বিদ্রোহ দমনপূর্বক ফিলিস্তীনে তাদের পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত করেন।

এসব ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে পরিষ্কার হয় যে, ইয়াহূদীদের আসল পবিত্র সহীফাসমূহ কালচক্রে বিলীন হয়ে গিয়েছে এবং বর্তমান তাওরাত পরবর্তীকালে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। তাই ৩৮ খণ্ডে সংকলিত বাইবেলের ওলড্ টেষ্টামেন্ট (পুরাতন নিয়ম)-এর অন্তর্ভুক্ত তাওরাত সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনা শেষাবধি এটাই প্রমাণ করেছে যে, বর্তমান তাওরাত ও পুরাতন নিয়ম-এর অপরাপর সহীফাসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত ওহী (وحی منزل من الله) নয়, বরং উল্লেখিত বিভিন্ন সহীফা মানুষ বিভিন্ন যুগে রচনা ও সংকলন করেছেন। এভাবে বাইবেলের প্রতিটি পুস্তক কিংবা সহীফা নির্বিচার ও নির্বিশেষে মানবীয় রচনা, যা সংশ্লিষ্ট নবীদের বহু পরবর্তীকালে প্রণীত হয়।

তাওরাতের সহীফাসমূহ কখন প্রণীত ও সংকলিত হয়?

এমন কোন অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, বর্তমান তাওরাতের সহীফাসমূহ কখন প্রণীত ও সংকলিত হয় এবং কিভাবে তা নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত হয়। সাধারণ ধারণা এই যে, আযরা (عزیر-Ezra) নবী পূনর্বার এর অস্তিত্ব দান করেন, নতুনভাবে বিন্যস্ত করেন এবং নির্ভরযোগ্য অভিহিত করেন। এক প্রচলিত বর্ণনা মোতাবেক লেখক দ্বারা পূনর্বার লিপিবদ্ধ করান। তিনি পুরাতন নিয়ম-এর আসল সহীফাসমূহ বিনষ্ট হওয়ার পর সেগুলোকে জনশ্রুতিমতে সংকলন করান, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত আসল সহীফারূপে নয়। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, আযরার পর ফিলিস্তীনের উপর কমপক্ষে আরও তিনবার ধ্বংসযজ্ঞ নেমে এসেছিল। এমতাবস্থায় তার সংকলিত পুরাতন নিয়ম-এর সহীফাসমূহ বিলুপ্ত ও বিনষ্ট হয়ে যাওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার নয়।

পুরাতন নিয়ম (Old Testament)-এর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যও উপরোল্লেখিত অভিমতকে প্রমাণিত করে। উল্লেখিত পবিত্র গ্রন্থের হিব্রু মূল পাঠ –যা বর্তমানে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত আকারে বিদ্যমান, যাকে মাসূরী পাঠ (Massoretic Text) বলা হয়, এই হিব্রু পাঠ– সম্ভবত ৬ষ্ট ও ৮ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সংকলিত। কিন্তু এই সময়কাল স্বীকার করে নিলেও উল্লেখিত মূল পাঠ সুবিন্যস্ত হওয়া ও আসল সহীফাসমূহের লিপিবদ্ধ করবার কালের মধ্যে এক দীর্ঘ বিরতি প্রতিবন্ধক হিসাবে বিদ্যমান রয়েছে। হিব্রু মূল পাঠ সুসংবদ্ধ করবার প্রয়োজন অনুভূত হয় এজন্য যে, মূল হিব্রু লিপিতে (script)-হরকত (স্বরচিহ্ন) থাকত না। যার অনিবার্য ফল এই

দাঁড়িয়েছিল যে, এক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর শব্দ ও বাক্যের মধ্যে অর্থের বিকৃতি দেখা দিতে থাকে। কেননা হরকত না থাকায় ইবারত বিভিন্নরূপে পাঠ করা যেত। এ কারণে ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ খৃস্টীয় ৫ম ও ৯ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে আলামত (বিরতি চিহ্ন), হরকত (স্বরচিহ্ন, vowel signs) ও স্বরভঙ্গির চিহ্নাদি (accents) প্রভৃতি উদ্ভাবন করেন। বস্তুত যখন হিব্রু মূল পাঠ এভাবে স্বরচিহ্ন সহযোগে সুসংবদ্ধ করা হয়, তখন স্বভাবতই তাতে অর্থ নির্ধারণ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গরমিল পরিলক্ষিত হয়। স্বয়ং ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন যে, তাওরাতে এমন ১৮টি স্থান রয়েছে যেখানে প্রাথমিক যুগের লেখকগণ ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তন করেছেন। এটাও সত্য যে, এই মাসূরী পাঠ (Massoretic Text) ছাড়াও প্রাচীনকালে আরও কিছু সংকলন ও অনুলিপি (vetzions, recensions) ছিল, যা অধুনা বিলুপ্ত এবং এ সমস্ত কপিতে একে অন্যের সাথে গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্য ছিল।[১]

তাওরাতের বিভিন্ন সহীফার রচনার ইতিহাস

যখন আধুনিক গবেষণা ও অনুসন্ধান প্রয়াস এটা মেনে নিয়েছে যে, প্রচলিত তাওরাত (সহীফাসমূহ) আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত নয়, তখন বিভিন্ন সহীফার রচনার ইতিহাস এবং সেগুলোর প্রকৃত রচয়িতাদের নাম জানবার চেষ্টা করা হয়েছে। বাইরের সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকায় অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তার সংকলনের তারিখসমূহ নিম্নরূপ হতে পারে।

(১) তাওরাত বর্তমান আকারে খৃ. পূ. ৪৪৪।

(২) আম্বিয়া বর্তমান আকারে খৃ. পূ. ২০০-২৫০-এর মধ্যে।

(৩) পবিত্র সহীফাসমূহ আকারে ১০০-১৫০-এর মধ্যে।

এই সমস্ত সহীফা বিশেষত যেগুলো দীর্ঘ, একজন রচয়িতার রচিত ও সংকলিত নয়, বরং ক্রমান্বয়ে তাতে বৃদ্ধি ঘটেছে এবং পর্যায়ক্রমে তা বর্তমান আকারে পৌঁছেছে।[২]

যাবূর

যাবূর (زبور আরবী) শব্দের বহুবচন যুবুর (الزبر) ; الزبور অর্থ লিখা;- زبور এর অর্থ مزبور অর্থাৎ লিখিত বিষয় বা বস্তু; এমন গ্রন্থ যা স্পষ্ট লিপিতে লিখিত হয়ে থাকে। কিন্তু পরিভাষায় যাবূর শব্দ দ্বারা ঐ আসমানী কিতাবকে বোঝানো হয় যা হযরত দাউদ (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

যাবূর হযরত দাউদ (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। এ মর্মে কুরআনে কারীমে হয়েছে,

وَآتَيْنَا دَاودَ زَبُوْرًا.

অর্থাৎ, আমি দাউদকে যাবূর দান করেছিলাম। (সূরা: ৪-নিসা: ১৬৩)

১ .Ency. Brit. Bible শিরো. "diffterially"

২. Ency. Brit. Bible শিরো.; Rowley, Growth of the O. T, ইসলামী বি: কো: ১২ খণ্ড, বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান এবং ইসলামী আকীদা প্রভৃতি থেকে গৃহীত।

এ আয়াতে যে زبرو -এর উল্লেখ করা হয়েছে, মুফাস্‌সিরীনে কেরামের মতে এ দ্বারা হযরত দাউদ (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাবকেই বোঝানো হয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ.

অর্থাৎ, আমি যাবূরে উপদেশ-এর পর লিখে দিয়েছি ...। (সূরা: ২১-আম্বিয়া: ১০৫)

এ আয়াতে উল্লেখিত যাবূর (زبور)-শব্দটি দ্বারাও হযরত দাউদ (আ.)–এর উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাবকেই বোঝানো হয়েছে।

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী বলেন, "অনেকের মতে যাবূর এমন এক কিতাবের নাম, যা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক তত্ত্বকথা সম্বলিত, তার মধ্যে শরীআতের কোন আহকাম নেই এবং কিতাব তাকেই বলে, যার মধ্যে শরয়ী আহকাম ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের কথা থাকে। হযরত দাউদ (আ.)-এর যাবূর গ্রন্থে শরীআতের কোন নির্দেশ ছিল না।" জ্ঞানপূর্ণ তাত্ত্বিক সহীফা হওয়ার কারণে তাকে যাবূর বলা হয়েছে।

খলীফা হারূনুর রশীদের আযাদকৃত গোলাম আহ্‌মাদ ইব্‌নে আবদিল্লাহ ইব্‌নে সালাম থেকে বর্ণিত আছে যে, যাবূর زبور) দ্বারা ঐ সকল মাযামীর (مزامير/গীত)কে বোঝানো হয়েছে যা ইয়াহূদী ও নাসারাগণ সাধারণভাবে ব্যবহার করত। যার সংখ্যা ছিল ১৫০টি।

যাবূর নামে বর্তমানে ভিন্ন কোন কিতাবের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ বলেন, বাইবেলের ওলড টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত গীত-সংগীতা অংশটি যবূর কিতাবেরই বিকৃত রূপ মাত্র।

ওলড টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত এই যবূর সম্বন্ধে মাওলানা রহমাতুল্লাহ্ কিরানভী (রহ.) বলেন, এ কিতাবটি কে সংকলন করেছেন এবং কখন সংকলন করা হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট কোন সূত্রে প্রমাণিত নয়। বরং এ সম্বন্ধে সমূহ মতভেদ বিদ্যমান রয়েছে। কেউ বলেন, এটি হযরত দাউদ (আ.)-এর জমানাতেই সংকলন করা হয়েছে। কেউ বলেন, পরবর্তীকালে তার সহচরগণ সংকলন করেছেন। আবার কারও কারও মতে, বিভিন্ন সময়ে তা সংকলন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন লেখক সংকলনের এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তারাও বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এ কারণেই ঐতিহাসিকগণ বলেন, বাইবেলের গীত-সংগীতা অংশটি যাবূর কিতাবেরই বিকৃত রূপ মাত্র।[১]

ইঞ্জীল

ইঞ্জীল (إنجيل) হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের নাম। বর্তমানে বাইবেল নামে পরিচিত। হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন ইসরাঈলী বংশোদ্ভূত। তার মাতৃভাষা, আঞ্চলিক ভাষা ও ধর্মীয় ভাষা ছিল হিব্রু। কেউ কেউ একে হিব্রু মিশ্রিত সুরিয়ানী ভাষা বলে বর্ণনা করেছেন। অধিকন্তু বলা যায় তার ভাষা ছিল আরামী বা আরামী-র কোন শাখা। ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র বর্ণনা মতে তিনি ও তার

১. তথ্যসূত্র: ইসলামী বি: কো: ২১ খণ্ড ও ইসলামী আকীদা, মাও: ইসহাক ফরীদী

শিষ্যগণ আরামী ভাষায় কথা বলতেন। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে মূল ইঞ্জীলের ভাষা ছিল সুরিয়ানী।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, বাইবেল পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের সমষ্টি। অর্থাৎ, বাইবেলের দুটো গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে। যথা:–

১. পুরাতন নিয়ম (Old Ttestament)। এ অংশটি মূলত তাওরাত যা ইয়াহূদী-দের বিভিন্ন সহীফার সংকলন।

২. নতুন নিয়ম (New Ttestament)। এ অংশটি মূলত ইঞ্জীল ও অন্যান্য সহীফা সম্বলিত।

ইঞ্জীল শব্দটিকে সাধারণভাবে একটি গ্রীক শব্দ রূপে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। গ্রীক ভাষায় শব্দটির অর্থ সুসংবাদ। অক্সফোর্ড অভিধানে বলা হয়েছে শব্দটি anggelos থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর অর্থ পয়গম্বর। একটা দুর্বল মতানুসারে শব্দটি আরবী نجل (ينجله نجلا) الشى থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ মূল, ভিত্তি, কোন কিছু বের করা। এরূপ হলে ইঞ্জীল শব্দের ভাবার্থ হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎপত্তিস্থল। তাজুল উরূস গ্রন্থকার ইঞ্জীল শব্দটিকে সুরিয়ানী ভাষা থেকে উদ্ভূত বলেছেন।

সম্ভবত ইঞ্জীলকে ইঞ্জীল (সুসংবাদ) বলার কারণ হল- হযরত ঈসা (আ.) শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। যেমন কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

وَ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ.

অর্থাৎ, এবং সুসংবাদদাতা রূপে এমন রসূলের যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমদ। (সূরা: ৬১-সাফফ: ৬)

আজকাল খৃষ্টানদের নিকট প্রচলিত ইঞ্জীল মূলত হযরত ঈসা (আ.)-এর কথিত চার শিষ্য– মথি (ST. Mathew), মার্ক (ST. Mark), লুক (ST.Luke) ও যোহন (ST. John) কতৃক রচিত চারটি গ্রন্থকে বোঝায়, যা চারটি সুসমাচার নামে পরিচিত। অভিজ্ঞ লেখকদের মতে এই চারটি সুসমাচার প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে ১৭০ খৃষ্টাব্দের দিকে। উক্ত চারটি ইঞ্জীল ছাড়াও শীষ্যদের রচিত বহুসংখ্যক চিঠি রয়েছে যার সংখ্যা ১১৩ বলে উল্লেখ করা হয়।

কথিত আছে যে, উপরোল্লেখিত চারটি সুসমাচার উপরোক্ত চার শিষ্য কর্তৃক রচিত। কিন্তু মথি, মার্ক, লুক ও যোহন-এর মধ্যে যোহন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, তিনি হযরত ঈসা (আ.)–এর সাথী ছিলেন। অবশিষ্ট তিন জন সম্পর্কে গবেষকদের মত হল তারা হযরত ঈসা (আ.)–এর শিষ্য নন।

ড. মরিচ বুকাইলি লিখেছেন– যোহন যীশুর সঙ্গী ছিলেন, তবে তিনি তার সুসমাচার লিখেছেন অনেক পরে। তার রচিত সুসমাচারের স্বীকৃত পাঠ রচিত হয়েছে প্রথম শতাব্দির শেষ দিকে। সময়ের দিক থেকে যীশুর আবির্ভাবের প্রায় ৬০ বৎসর পর। তদুপরি তার সুসমাচারের অনেক অংশই তার রচনা নয়। বরং অন্য অজ্ঞাত লেখকদের রচনাও এর সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এ কথা সবাই স্বীকার করেছেন।

আর মার্ক সম্পর্কে তিনি লিখেছেন- এ কথা সর্ববাদীসম্মত যে, মার্ক কস্মিনকালেও যীশুর শিষ্য ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন জনৈক প্রেরিতের একজন শিষ্য। (ও. ক্যালম্যান)

আর মথি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন- মথি যীশুর শিষ্য ছিল বলে তার যে পরিচিতি ছিল তা এখন মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। মথির সাথে যীশুর সাক্ষাত হয়েছিল এই অভিমত এখন পরিত্যাক্ত হয়েছে। তদুপরি তার রচনায় মার্ক-এর সুসমাচার থেকে প্রচুর বিষয় গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ পূর্বে বলা হয়েছে, এ কথা সর্ববাদীসম্মত যে, মার্ক কস্মিনকালেও যীশুর শিষ্য ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন জনৈক প্রেরিতের একজন শিষ্য। (ও. ক্যালম্যান)

আর লুক সম্পর্কে তিনি লিখেছেন- লুক থিয়াফলের নামে লিখিত উৎসর্গপত্রে প্রথমেই পাঠকবর্গকে এ মর্মে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, অন্যেরা যীশুখ্রীস্ট সম্পর্কে যা যা লিখেছেন, সেসব অনুসরণ করেই তিনি তার পুস্তকে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণও তুলে ধরেছেন। (এর থেকেই বোঝা যায় লুক নিজে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না) এবং প্রেরিতদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যও তার পুস্তকে ব্যবহার করেছেন। ও. ক্যালম্যানের গবেষণা-মতে লুক যীশুর শিষ্য ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন পৌলের সফরসঙ্গী।[১]

ইঞ্জীল শরীফ হিসাবে পরিচিত এই সুসমাচারসমূহ কখন কিভাবে রচিত হয়েছিল সে সম্পর্কে ড. মরিচ বুকাইলি বলেন, হযরত ঈসা (আ.)কে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার সত্তর বছর পর নিউ টেষ্টামেন্টের সুসমাচারসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ ঐশী বাণীসমূহ জনকথা তথা মানুষের স্মৃতি-নির্ভর কাহিনী ছিল মাত্র।

ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ১১ সংস্করণে বলা হয়েছে, যতদূর জানা যায় হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর সহচরগণ তাদের জীবদ্দশায় পুরাতন নিয়মকে নিজেদের হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন। ফলে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পর ২০ বৎসর পর্যন্ত কেউই নতুন গ্রন্থ সংকলনের প্রয়োজন অনুভব করেনি। তারপর প্রয়োজন দেখা দিলে আদি পুস্তক (old Testament)কে নমূনা হিসাবে সামনে রেখে ধীরে ধীরে ইঞ্জীল সংকলনের কাজ আরম্ভ করা হয়।

এ সুসমাচারসমূহের মধ্যে কতটুকু ঈসা (আ.)-এর বাণী বা ঐশী বাণী রয়েছে তা বর্ণনা করতে গিয়ে "ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশন অব দি বাইবেল"-এর অনুবাদকগণ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের তাগিদে ধর্মপ্রচারকগণ যেসব কাহিনী ও বিবরণ পেশ করতেন, তাই লোকমুখে প্রচারিত হত। আবার লোকমুখে প্রচারিত এসব কাহিনী সংকলিত করে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত। বাইবেলের নতুন নিয়মের সুসমাচারগুলো এমন ধরনেরই সংকলন। এভাবে অসংখ্য ধর্মপ্রচারকগণ অসংখ্য বাইবেল সংকলন করে নেয়।

১. দ্রঃ বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান, ড. মরিস বুকাইলী

খৃষ্টীয় প্রাথমিক যুগে ইঞ্জীলের অনেক পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল। এ গুলোর কোন্‌টি বিশুদ্ধ তা নিরুপণের জন্য পূর্ব রোমের ফীলস শহরে ৩২৫ খৃষ্টাব্দে পাদ্রীদের এক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিন শতাধিক পাদ্রী অংশ গ্রহণ করে। অঃযধহধংরঁং-এর প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিত উক্ত ঘরবপধ সম্মেলনের পর ইঞ্জীলের উপরোক্ত চারটি পাণ্ডুলিপি ছাড়া অবশিষ্ট ইঞ্জীলসমূহকে অপ্রামাণ্য অংশরূপে অভিহিত করে পরিত্যাগ করা হয়। প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য অংশ পৃথক করার জন্য পাদ্রীগণ এ যাবত যত সুসমাচার লেখা হয়েছে তা একত্র করে একটি স্তূপ দেয়। তারপর সর্বজনমান্য এক পাদ্রী সাজদাবনত অবস্থায় মন্ত্র আওড়াতে থাকে যে, “যেটি অসত্য তা যেন পড়ে যায়, যেটি অসত্য তা যেন পড়ে যায়”। এভাবে বলতে বলতে চারটি সুসমাচার ব্যতীত বাকি সব কটি মাটিতে পড়ে যায়। আর এ চারটি হল- মার্ক, মথি, লুক ও যোহনের সুসমাচারসমূহ।

বস্তুত সুসমাচারসমূহ হচ্ছে সেই রচনার সমাহার “যেসব রচনার দ্বারা বিভিন্ন মহলকে সন্তুষ্ট করা হয়েছে, গির্জার প্রয়োজন মিটানো হয়েছে, ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত নানা বক্তব্যের জওয়াব দেয়া হয়েছে, প্রচলিত ধর্মীয় ভুল-ক্রটিগুলো সংশোধন করা হয়েছে এবং এমনকি প্রয়োজনে বিরুদ্ধপক্ষীদের উত্থাপিত নানা অভিযোগের দাঁতভাংগা জওয়াবও সেসব পুস্তকের মাধ্যমে দেওয়ার প্রয়াস দেখা গেছে। সুসমাচারের লেখকগণ এভাবে স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে লোককাহিনী হিসাবে যেসব রচনা হাতের কাছে পেয়েছেন, তা থেকে উপাদান নিয়ে নিজ নিজ পুস্তক সংকলন ও প্রণয়ন করেছেন।” (ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশন অব দি বাইবেল)

এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, এসব সুসমাচার হচ্ছে বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনার এলোমেলো এক সাহিত্যকর্ম তো বটেই, সে সাথে এগুলোতে রয়েছে অতুলনীয় বৈপরিত্যের সমাহার। এ মন্তব্য আমাদের নয়। এ মন্তব্য করেছেন, “ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশন অব দি বাইবেল”-এর শতাধিক বিজ্ঞ ভাষ্যকার। তারা বলেন, যেসব বাইবেল আমাদের হাতে এসেছে, এর সবগুলোর রচনা ও বক্তব্য এক নয় বরং একটির সাথে আরেকটির পার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রাপ্ত বিভিন্ন বাইবেলের মধ্যে এই যে তফাৎ তাও বিভিন্ন ধরনের। সংখ্যার দিক থেকেও সে পার্থক্য কম নয়, বরং প্রচুর। কোন কোন বাইবেলের মধ্যে ব্যাকরণ সংক্রান্ত ভাষাগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। শব্দ চয়নে কিংবা শব্দের অবস্থানের ভিন্নতাও কম নয়। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এমন ধরনের পার্থক্যও বিদ্যমান, যার ফলে দু'টি বাইবেলের গোটা একটা অনুচ্ছেদের অর্থ পুরোপুরি ভিন্ন রকম হয়ে দাঁড়ায়। এতে সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, বাইবেলের সুসমাচারসমূহ মূলত মানুষের রচনা। আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ঐশী বাণী নয় এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর বাণীসমূহের হুবহু বর্ণনাও নয়।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, বাইবেলের নতুন নিয়মের সুসমাচার চারটি যদি ‘প্রেরিত’ তথা যীশুর সহচরদের ‘স্মৃতিকথা’ না হয়ে থাকে, তাহলে এসব এলো কোত্থেকে? ও. ক্যালমান বলেছেন, “সুসমাচারের লেখকবৃন্দ ছিলেন প্রাথমিক যুগের

বিভিন্ন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মুখপাত্র। কেউ কেউ তখন লোকমুখে প্রচলিত ঐতিহ্যভিত্তিক কাহিনী লিখিত আকারে ধরে রাখতেন। প্রায় ৩০/৪০ বছর ধরে এই সব সুসমাচার শুধুমাত্র লোক-কাহিনী হিসাবে জারী থাকে। পরবর্তীকালে এসব রচনার সঙ্গে বিভিন্ন বাণী ও বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী জুড়ে দেয়া হয়। সুসমাচার লেখকগণ নিজেদের ধ্যান-ধারণা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজনীয় ধর্মীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ওইসব কাহিনীকে একসূত্রে গ্রথিত করেন। তার আগে লোকজনের নিকট থেকে প্রাপ্ত বাণী ও বিবরণগুলোকে তারা একটার সাথে আরেকটা জুড়ে নিতেও ভুল করেননি। এভাবে জুড়ে-গেঁথে নেওয়ার পরে যীশুখ্রীষ্টের মুখে কোন বাণী তুলে দিতে গিয়ে কিংবা কোন ঘটনার বিবরণ পেশ করতে গিয়ে ‘এর পরের ঘটনা’ বা ‘তিনি যখন বলেন’ কিংবা তিনি যখন করলেন’ শব্দগুলো সুকৌশলে তাঁদের ব্যবহার করতে হয়েছে। আর এভাবেই সিনোপটিক গসপেলস অর্থাৎ, মার্ক, মথি ও লুক লিখিত সুসমাচার তিনটির বর্ণনাভঙ্গি নিখুঁত সাহিত্যগুণসম্পন্ন হতে পেরেছে। কিন্তু কোন বর্ণনারই ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নেই।”

ইসলামী বিশ্বকোষ ৩য় খণ্ডে বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে ৬৯২ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান বিশ্বের খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ পূর্ণাঙ্গ বাইবেলের উপর একমত হন। এর পূর্ব পর্যন্ত কোন একটি সম্প্রদায় একটি সংকলন প্রস্তুত করত, অন্য একটি সম্প্রদায় এর বিপরীতে আর একটি ভিন্ন সংকলন উপস্থিত করত।

তবে ৬৯২ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান বিশ্বের খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ কর্তৃক একটি পূর্ণাঙ্গ বাইবেলের উপর একমত হওয়া সত্ত্বেও এখনও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাইবেলের অধ্যায়ের সংখ্যা বিভিন্ন। ক্যাথলিকদের বাইবেলে অধ্যায়ের সংখ্যা ৭২ আর প্রোটেস্টানদের বাইবেলে অধ্যায়ের সংখ্যা ৬৬।

ড. মরিস বুকাইলী সুসমাচারসমূহের ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা হিসাবে বলেন, “সুসমাচারসমূহের কোন বর্ণনাই আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার মত নয়। ওসব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। তাদের নিজেদের সমাজে লোকের মুখে-মুখে যীশুখ্রীষ্ট সম্পর্কে যেসব কাহিনী প্রচলিত ছিল, সুসমাচারের লেখকবৃন্দ সেগুলো সংকলন করেছেন মাত্র।” (ফাদার কানেনগিয়েসার)

ড. মরিস বুকাইলী আরও বলেন, একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, বাইবেলের এসব গ্রন্থে বিভিন্ন পয়গম্বর কর্তৃক প্রাপ্ত ওহী বা প্রত্যাদেশের সংমিশ্রণ অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে, এসব প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বাণীর ভিত্তিতে সেকালের লেখকরা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যেসব রচনা আমাদের উপহার দিয়েছেন তা আমরা ওল্‌ড টেস্টামেন্ট বা তওরাত নামে পাচ্ছি। সেকালের লেখকরা বিভিন্ন নবীর প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বাণীর মধ্যে পরিবর্তন তো করেছেনই, অধিকন্তু তারা তাদের নিজেদের স্বার্থে নিজস্ব যুগের এবং পরিবেশের প্রয়োজনে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ব্যাপক অদল-বদল, এমনকি সংযোজন ঘটাতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন-

নি। বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশিত সমস্ত বাইবেলেই এ ধরনের বিভ্রান্তিকর কর্মকাণ্ড বিদ্যমান। বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত সব পুস্তকই বেশ কয়েকবার করে সংশোধন ও সম্পাদনা করা হয়েছে এবং প্রতিবারই বর্জিত বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ওইসব বাড়তি বিষয় সম্ভবত পরবর্তী সময়ের সংযোজন। বস্তুত বাইবেলের কোথাও রয়েছে ঐতিহাসিক তথ্যের বিভ্রান্তি, কোথাও পুনরাবৃত্তির দোষ, কোথাও কাহিনীগত গরমিল এবং কোথাও রচনাগত তারতম্য। এক কথায় ইয়াহূদীদের গির্জার যেমন বিভিন্নতা রয়েছে, তেমনি গির্জাভিত্তিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক বাইবেল। কেননা বাইবেল সম্পর্কে একেক গির্জার ধারণা একেক রকম। আর পারস্পরিক বিভিন্ন ধারণার কারণেই অন্য ভাষায় বাইবেল তরজমা করতে গিয়েও তাদের পক্ষে একমতে পৌছা সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতি এখনো অব্যাহত রয়েছে।[১]

আমরা আবার মূল আলোচনায় ফিরে আসছি।

আল্লাহর কিতাব বা আসমানী কিতাব সম্বন্ধে ঈমান রাখার মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত

আল্লাহ্‌র কিতাব বা আসমানী কিতাব সম্বন্ধে ঈমান রাখার অর্থ হল প্রধানত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশ্বাস করা।

১. এ সমস্ত কিতাব আল্লাহর বাণী, মানব রচিত নয়।
২. আল্লাহ যেমন অনাদি (قديم) ও চিরন্তন, তাঁর বাণীও তদ্রূপ অনাদি ও চিরন্তন। কুরআন অনিত্য-সৃষ্টি (حادث/مخلوق) নয়।[২]
৩. আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ।
৪. কুরআন সর্বশেষ কিতাব-এর পর আর কোনো কিতাব নাযিল হবে না। কেয়ামত পর্যন্ত কুরআনের বিধানই চলবে। কুরআনে কারীমের মাধ্যমে অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিধান রহিত (منسوخ) হয়ে গিয়েছে, যেমন ইঞ্জীলের মাধ্যমে তাওরাতের বিধান রহিত হয়ে গিয়েছিল।
৫. কুরআনের হেফাজতের জন্য আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, কাজেই কেউ এর পরিবর্তন করতে পারবে না। কুরআনকে সর্বদা অবিকৃত বলে বিশ্বাস করতে হবে।[৩] এ মর্মে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَه لَحٰفِظُوْنَ.

অর্থাৎ, আমি এই কুরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমি তার হেফাজতকারী। (সূরা: ১৫-হিজ্‌র: ৯)

১. তথ্যসূত্র ঃ (১) বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান, ড. মরিস বুকাইলী। (২) ইসলামী আকীদা, মাওঃ ইসহাক ফরিদী। (৩) ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড

২. এ ব্যাপারে মুতাযিলাদের ভিন্ন মত রয়েছে, দেখুন "মুতাযিলা" শিরোনাম।

৩. এ ব্যাপারে বার ইমামপন্থী শিআদের ভিন্ন মত রয়েছে, দেখুন ইছনা আশারিয়াদের তৃতীয় মৌলিক আকীদা বিষয়ক আলোচনা ("কুরআন বিকৃতি বিষয়ক আকীদা" বিষয়ক উপশিরোনাম)।

* যারা বলে বর্তমান কুরআন মূল কুরআনের এক তৃতীয়াংশ, অপর দুই তৃতীয়াংশ গায়েব, তারা কুরআনের হক্কানিয়্যাত অস্বীকারকারী। রাফিযীগণ (শীআগণ) এরূপ বলে থাকেন। এটা স্পষ্ট কুফ্‌রী।[১]

কুরআন সত্য তার প্রমাণ

কুরআন যে সত্য, তার আরও অনেক প্রমাণ রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি প্রমাণ হল:

১. একজন উম্মী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নবী কারীম ইঞ্জীলসমূহকে অপ্রামাণ্য অংশরূপে অভিহিত করে পরিত্যাগ করা হয়। প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য-এর মুখ থেকে কুরআনের ন্যায় এরূপ মহা জ্ঞানভাণ্ডারের গ্রন্থ প্রকাশ পাওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এসব জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন।
২. কুরআন মানব রচিত হলে কুরআনের অনুরূপ আর একটি রচনা পেশ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হত। কিন্তু কুরআনের অনুরূপ রচনা পেশ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন চ্যালেঞ্জও পেশ করেছেন। ইরশাদ করেছেন,

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِه وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ. فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا. الآية.

অর্থাৎ, আমি আমার এই বান্দার উপরে যে কিতাব নাযিল করেছি, এ ব্যাপারে তোমাদের যদি সামান্যতম সন্দেহ থাকে (যে, এটা তাঁর রচনা করা কি না,) তাহলে এই কুরআনের (বড় কোন সূরা নয়, ছোট্ট) সূরার মত একটা সূরা রচনা করে দেখাও। তোমরা (একারা নয়) তোমাদের সব সহযোগীদের ডাক (ডেকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এরকম একটা সূরা রচনা করে দেখাও।) আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেছেন, তবুও তোমরা এর সমকক্ষ রচনা পেশ করতে পারবে না। (সূরা: ২-বাকারা: ২৩) বাস্তবেও কোন দিন কেউ কুরআনের সমকক্ষ রচনা পেশ করতে পারেনি।

এখানে চিন্তা করার বিষয় হল– ইসলামের মিশনকে ব্যর্থ করার জন্য কাফের শক্তিরা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ডলার পাউন্ড ব্যয় করে। শত রকম ষড়যন্ত্র করে। অথচ কুরআনের মোকাবিলা করার জন্য সামান্য একটা সূরা রচনা করে তা পেশ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে না।

৩. কুরআন অনেক ক্ষেত্রে মানুষের মনের কথা বলে দিয়েছে, যা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এটাও কুরআনের সত্য হওয়ার প্রমাণ। একটা ঘটনা। আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উবাই একজন মুনাফিক ছিল। সে ধোকা দিয়ে, প্রতারণা করে মুসলমানদেরকে ওহুদ যুদ্ধ থেকে সরাতে চেয়েছিল। যাতে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা হ্রাস পায় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়ে যায়। তার ষড়যন্ত্রে পড়ে মুসলমানদের দুটো গোত্র– বনূ হারেছা এবং বনূ সালামার লোকেরা সংশয়ে পড়ে গিয়েছিল যে, তারা যুদ্ধে থাকবে, না চলে যাবে। এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হয়ে গেল–

১. بدائع الكلام. مولانا المفتي يوسف التاؤلوي থেকে গৃহীত।

اِذْ هَمَّتْ طَّآىِٕفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَ اللّٰهُ وَلِيُّهُمَا. الآية.

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে দুটো দল যুদ্ধ থেকে সরে যাবে কি না -এই চিন্তা-ভাবনায় লিপ্ত হয়েছিল, তবে আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তাদের অভিভাবক। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ১২২) আয়াত নাযিল হওয়ার পর উক্ত দুই গোত্রের লোকেরা স্বীকার করল যে, তারা এরূপ চিন্তা-ভাবনা করেছিল।

৪. কুরআন সত্য হওয়ার আর একটা প্রমাণ হল কুরআনে অনেক বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। একটা ঘটনা। একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে খৃষ্টানদের একটা প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিল। ঐ মজলিসে কিছু ইয়াহুদীও উপস্থিত হল। ইয়াহুদী খৃষ্টানদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হল। ঝগড়ার এক পর্যায়ে ইয়াহূদীরা দাবী করল একমাত্র আমরাই হকপন্থী, আর কোনো দল হকপন্থী নয়। আমাদের জন্যই জান্নাত নিশ্চিত, আর কারও জন্য নয়। খৃষ্টানরাও দাবী করল একমাত্র আমরাই হকপন্থী অন্য কেউ নয়, জান্নাত একমাত্র আমাদের জন্যই নিশ্চিত আর কারও জন্য নয়। উপরন্তু ইয়াহূদীরা দাবী করত যে, আমরা হলাম আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র, অতএব আমাদের জন্য জান্নাত সুনিশ্চিত। এরূপ দাবী করনেওয়ালা ইয়াহুদীদেরকে বলা হয়েছিল,

قُلْ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

অর্থাৎ, (হে মুহাম্মাদ!) তুমি বলে দাও, যদি অন্যরা বাদে কেবল তোমরাই আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে থাকবে, (মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জান্নাত নিশ্চিত একথা যদি সত্য হয়, এটা যদি মনের কথা হয়,) তাহলে মৃত্যু কামনা করে দেখাও। (সূরা: ৬২-জুমুআ: ৬) আল্লাহ্ তাআলা সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে দিয়েছেন যে,

وَ لَا يَتَمَنَّوْنَهٗ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ.

অর্থাৎ, কখনোই ওরা (এ সাহস করবে না,) ওরা মৃত্যু কামনা করবে না, ওদের কৃতকর্মের দরুন। (সূরা: ৬২-জুমুআ: ৭)

এ আয়াত তাদেরকে পড়ে শোনানো হল, কিন্তু তাদের কেউ মৃত্যু কামনা করতে সাহস পেল না। কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যই প্রমাণিত হল।

আর একটা ঘটনা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পাঁচ-ছয় বছর পূর্বের ঘটনা। তখনকার দুই পরাশক্তি– রূম ও পারস্য সম্রাটের মধ্যে যুদ্ধ লাগল। যুদ্ধে পারস্য সম্রাট বিজয়ী হয়ে গেল। রোমকরা পরাজিত হল। মক্কার মুশরিকরা ছিল পারস্যের সমর্থক। কারণ পারস্যবাসীরাও মক্কাবাসীদের মত কোনো আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করত না। তাদেরও কেউ কেউ মক্কাবাসীদের মত মূর্তি পূজা করত, কেউ আগুন পূজা করত। তাই মক্কার মুশরিকরা পারস্যের লোকদেরকে নিজেদের পক্ষশক্তি মনে করত। আর মুসলমানরা তুলনামূলকভাবে রোমকদেরকে

বেশি পছন্দ করতেন। কারণ রোমকরা ছিল খৃষ্টান। তারা আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করত। এদিক থেকে তারা মুসলমানদের কাছাকাছি ছিল। পারস্যের বিজয়ে মক্কার মুশরিকরা খুব খুশি হল এই ভেবে যে, আমাদের পক্ষশক্তির বিজয় শুরু হল। তারা মুসলমানদেরকে বলল, হে মুসলমানরা! পারস্যবাসীরা যেমন রোমকদেরকে পরাজিত করেছে, ভবিষ্যতে আমরাও তোমাদেরকে ওরকম পরাজিত করব। এতে মুসলমানগণ কিছুটা মনক্ষুন্ন হলেন। আয়াত নাযিল হয়ে গেল–

الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْۢ بَعْدُ وَ يَوْمَىِٕذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ.

অর্থাৎ, রোমকরা পরাজিত হয়েছে। আগামী তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে আবার রোমকরা বিজয়ী হবে। সেদিন মুসলমানরা আনন্দিত হবে। (সূরা: ৬২-রূম: ১-৪)

আয়াত শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) দৌড় দিয়ে মুশরিক নেতৃবৃন্দের কাছে চলে গেলেন। বললেন, তোমাদের খুশি হওয়ার কিছু নেই, কিছুদিন পরেই তোমাদের লোকেরা অর্থাৎ, পারস্যবাসীরা পরাজিত হবে, রোমকরা বিজয়ী হবে। কাফের নেতা উবাই ইব্নে খালাফ বলল, না, এটা কখনো হবে না, তাহলে বাজি ধর। বাজি ধরা হল। ঘটনা বেশ দীর্ঘ। শেষ পর্যন্ত একশত উট বাজি ধরা হল। কথা হল– যদি আগামী নয় বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয়, তাহলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) উবাই ইব্নে খালাফকে একশত উট দিবেন, আর বিজয়ী হলে উবাই ইব্নে খালাফ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)কে একশত উট দিবে। এর সাত বছরের মাথায় যখন বদর যুদ্ধ হয়, তখন একদিকে বদর যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হল, অপরদিকে রূম পারস্যের মধ্যকার যুদ্ধে রোকমরা বিজয়ী হল। এভাবে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হল।

৫. কুরআন শরীফে পূর্ববর্তী উম্মত, সেকালের শরীআত ও তাদের ইতিহাস এমন পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে যুগের ইয়াহূদী খৃষ্টানদের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণও ততটা অবগত ছিল না। অথচ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না।

৬. কুরআনকে বারংবার পাঠ করলেও মনে কোনো বিরক্তি আসে না। বরং যতই তিলাওয়াত করা হয়, ততই তাতে আগ্রহ বাড়তে থাকে। অথচ দুনিয়ার কোন আকর্ষণীয় থেকে আকর্ষণীয় পুস্তকের বেলায়ও দেখা যায় দু'চারবার পাঠ করার পর আর তা পাঠ করতে মন চায় না।

৭. কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নিজে নিয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যেকেউ বিন্দু-বিসর্গ পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না। লক্ষ লক্ষ হাফেজে কুরআন তৈরি হওয়া ও বিদ্যমান থাকার ফলে এই কিতাবে কোনোরূপ পরিবর্তনের সম্ভাবনাও কেউ কল্পনা করতে পারে না।

৮. কুরআনে কারীমে জ্ঞানের যে মহাভাণ্ডার পুঞ্জিভূত করা হয়েছে, তা অন্য কোনো কিতাবে আজ পর্যন্ত করা হয়নি এবং ভবিষ্যতেও তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

৯. কুরআনে কারীম পাঠের ফলে মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

১০. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্য নবী প্রমাণিত হওয়া কুরআনেরও সত্য কিতাব হওয়ার প্রমাণ।

কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কুরআনে কারীম সুদীর্ঘ ২৩ বৎসরে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নাযেল হত বলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশায় কুরআনে কারীমকে বিন্যস্ত কোন গ্রন্থরূপে সংকলন করা সম্ভব ছিল না।

অন্যান্য আসমানী কিতাবের মুকাবেলায় কুরআন শরীফের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এই কুরআনকে লিখিত আকারে সংরক্ষণের চেয়ে মুখস্থ করার মাধ্যমে সংরক্ষণের উপর বেশি জোর দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ.

অর্থাৎ, কুরআনের এই সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ জ্ঞানীজনের বক্ষে সংরক্ষিত। (সূরা: ২৯-আনকাবূত: ৪৯)

ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাওয়ার আশংকায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখস্থ করে নেয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতেন। আল্লাহ তাআলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেন,

لَا تُحَرِّكْ بِه لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِه اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه وَ قُرْاٰنَه.

অর্থাৎ, কুরআনকে আয়ত্ব করার জন্য তোমার ব্যতিব্যস্ত হয়ে রসনা সঞ্চালনের প্রয়োজন নেই। (এর পঠন-পাঠন, সঞ্চয়ন-সংকলন আমারই দায়িত্বে।) [সূরা: ৭৫-কিয়ামাহ: ১৬-১৭]

সহীহ মুসলিমের এক হাদীছে বর্ণিত আছে– আল্লাহ তাআলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন,

وَمُنَزِّلٌ عَلَيْكَ كِتَابًا يَغْسِلُه الْمَاءُ.

অর্থাৎ, আমি তোমার নিকট এমন একটি কিতাব নাযেল করছি পানি যাকে কোনদিন ধুয়ে নিতে পারবে না। অর্থাৎ, মু'মিনের বক্ষে তা সংরক্ষিত থাকবে।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِه.

অর্থাৎ, অগ্র-পশ্চাত কোন দিক থেকে তাতে কোনো প্রকার অন্যায় হস্তক্ষেপ হতে পারবে না। (সূরা: ৪১-হা মীম সাজদা: ৪২)

সুতরাং এই শাশ্বত গ্রন্থ চির সংরক্ষিত।

প্রথমদিকে প্রধানত কুরআন মুখস্থ করণের মাধ্যমেই সংরক্ষিত হয়েছে। প্রতি বৎসরের মত ইন্তিকালের বৎসরও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে পূর্ণ কুরআন 'দাওর' করেছেন। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.)ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পূর্ণ কুরআন শরীফ মুখস্থ শুনিয়েছেন। খোদা প্রদত্ত প্রখর স্মৃতিশক্তির পুরোটাই সাহাবায়ে কেরাম কুরআন শরীফ হেফজ করার পেছনে ব্যয় করেছেন। ফলে চার খলীফাসহ সাহাবায়ে কেরামের মাঝে পূর্ণ কুরআন শরীফের বহুসংখ্যক হাফেজ বিদ্যমান ছিলেন।

মুখস্থ করার মাধ্যমে সংরক্ষণের পাশাপাশি লিখিত আকারে সংরক্ষণের ব্যবস্থাও তখন চালু ছিল। ওহী অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "কাতিবে ওহী" (ওহী লেখক) কাউকে ডেকে লিখিয়ে নিতেন। তিনি তখন বলে দিতেন, এই আয়াত অমুক সূরায় অমুক আয়াতের পর লিখে রাখ। লেখা শেষ হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাচাই-বাছাই করে দেখতেন। হযরত যায়েদ ইব্‌নে ছাবেত (রা.)সহ তখন ৪০ জন সাহাবী ওহী লেখার কাজ আঞ্জাম দিতেন। তাঁরা হাড়ে, পাথরে, গাছের পাতায়, বাঁশের টুকরায়, কাগজে ও চামড়ায় পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ লিখে রাখতেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খেলাফাতকালে বিক্ষিপ্ত আকারে লিখিত কুরআন শরীফকে গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ ও সংকলনের কাজ শুরু হয়। ইয়ামামার যুদ্ধে প্রচুর সংখ্যক হাফেজ ও কারী সাহাবী শাহাদাত বরণ করায় হযরত উমর (রা.) কুরআন শরীফকে গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ ও সংকলনের পরামর্শ দেন। প্রয়োজন উপলব্ধি করে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত যায়েদ ইব্‌নে ছাবেত (রা.)কে পবিত্র কুরআন সংকলনের দায়িত্ব অর্পন করেন।

সংকলনকালে কেউ কোন আয়াত পেশ করলে হযরত উমর (রা.) এবং হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) যৌথভাবে নিরীক্ষণ করে নিতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে লিখিত হয়েছে– এ মর্মে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তারা লিখিত আয়াত গ্রহণ করতেন। এরপর হযরত আলী (রা.)সহ যাদের কাছে পূর্ণ বা আংশিক লেখা ছিল তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন।

এই সংকলনে আয়াতসমূহকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশিত বিন্যাস অনুযায়ী সাজানো হয়। এতে "সাত হরফ" তথা আরবের সাত গোত্রের আঞ্চলিক ভাষা-পদ্ধতির সমন্বয় ছিল। এই সংকলনের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি সার্বজনীন নুস্‌খা তৈরি করা যার দিকে উম্মতের সকলে যেকোনো সমস্যায় রুজূ করবে এবং সমাধান গ্রহণ করবে।

কুরআন শরীফ মূলত কুরায়শী ভাষা-পদ্ধতি অনুসারে নাযিল হয়েছিল। হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত এই এক হরফেই (পদ্ধতিতেই) কুরআনে কারীমের পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল। কিন্তু হিজরতের পর সহজীকরণার্থে সাময়িকভাবে আরবের আরও ছয়টি গোত্রের

ভাষা-পদ্ধতি অনুসারে পঠন-পাঠনের অনুমতি দেয়া হয়। হযরত উছমান (রা.)-এর খেলাফাতকালে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমনকি খোদ মদীনাতেও এই সমস্যা দেখা যায় যে, অজ্ঞতাবশত এক গোত্র অন্য গোত্রের হরফ বা পাঠ-পদ্ধতিকে এবং দূরবর্তী অঞ্চলের মুসলমানগণ নিজেদের শেখা কেরাত ব্যতীত অপর কেরাতগুলোকে অশুদ্ধ ও ভুল সাব্যস্ত করতে থাকেন। পরিস্থিতি এতই জটিল আকার ধারণ করে যে, একে অপরকে কাফের পর্যন্ত আখ্যায়িত করতে আরম্ভ করেন।

হযরত উছমান (রা.) জানতেন যে, সাত হরফে পড়ার অনুমতি ছিল সাময়িক প্রয়োজনের খাতিরে। বর্তমানে সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। উপরন্তু তা সমস্যার সৃষ্টি করছে। তাই সমস্যার সমাধান কল্পে তিনি শুধুমাত্র কুরায়শী ভাষা-পদ্ধতিতে কুরআন শরীফের 'নুস্খা' তৈরি করার জন্য হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)সহ আরও কয়েকজন সাহাবীকে দায়িত্ব দেন। (এ দায়িত্বে কে কে ছিলেন তা জানার জন্য দেখুন "কুরআন সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য" শিরোনামের আলোচনা।) তাঁরা মাসহাফে আবূ বকরকে সামনে রেখে সাতটি নুসখা তৈরি করেন। হযরত উছমান (রা.) বিভিন্ন অঞ্চলে এসব নুসখা পাঠিয়ে দেন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে লিখিত নুসখাগুলো পুড়িয়ে ফেলেন। এভাবে সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এবং এর উপর সকল সাহাবীর ইজমা তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

হযরত উছমান (রা.)-এর সংকলনের বৈশিষ্ট্য হল– মাসহাফে আবূ বকরে সূরাগুলো একসঙ্গে ছিল না, বিন্যস্ত ছিল না। এই মাসহাফে এক সঙ্গে সবগুলো সূরাকে বিন্যস্ত করে দেয়া হয়। হযরত উছমান (রা.) কৃত মাসহাফই আজ আমাদের সামনে বিদ্যমান।

মাসহাফে উছমানীতে হরকত, নুকতা ইত্যাদি ছিল না। পরবর্তীতে তেলাওয়াত সহজ করার নিমিত্তে হরকত, নুকতা ইত্যাদি সংযোজন করা হয়।

মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে হাতে লিখে কুরআনে কারীমের নুসখা তৈরি করা হত। এই কাজে নিয়োজিত থাকতেন বহু কাতেব। আর একে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে হস্তলিখন শিল্প।

মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর সর্বপ্রথম জার্মানীর হামবুর্গ শহরে ১১১৩ হিজরী সনে কুরআনে কারীম মুদ্রিত হয়। এর একটি কপি মিসরের দারুল কুরআনে এখনও সংরক্ষিত আছে। এরপর প্রাচ্যবিদদের অনেকেই কুরআন শরীফ মুদ্রণ করে। তবে মুসলিম বিশ্বে তাদের মুদ্রিত কুরআন শরীফ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলায়ে উছমান কর্তৃক রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে কুরআন শরীফের একটি কপি মুদ্রিত হয়। একই সময়ে কাযান শহরেও একটি কপি মুদ্রিত হয়। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের তেহরান শহরে কুরআন শরীফের আরও একটি কপি মুদ্রিত হয়। এরপর থেকে বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও ছাপাখানার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে কুরআন শরীফের মুদ্রণ হতে থাকে।

কুরআন সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য

- **কুরআনের সূরা সংখ্যা: ১১৪**
- **কুরআনের পারা সংখ্যা: ৩০**
- **কুরআনের রুকূ সংখ্যা: ৫৪০**
- **কুরআনের মানযিল সংখ্যা: ৭**
- **কুরআনের আয়াত সংখ্যা**

ক্বেরাত বিশারদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কুরআন শরীফে ছয় হাজার দুই শত আয়াত আছে কিন্তু তারপরের সংখ্যাগুলোতে মতভেদ আছে। কয়েকটি মতামত বর্ণিত আছে– ৬২০৪, ৬২০৫, ৬২১০, ৬২১৪, ৬২১৭, ৬২১৯, ৬২২০, ৬২২৬, ৬২৩৬।[১]

- **কুরআনের সর্বপ্রথম যে আয়াত নাযেল হয়**

নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাযেল হয় তা হল সূরা "আলাক্ব"-এর শুরুর কয়েকটি আয়াত اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق।....

- **কুরআনের সর্বশেষ যে আয়াত নাযেল হয়**

কুরআনে কারীমের সর্বশেষ আয়াত নাযেল হয় কোন্‌টি এ বিষয়ে অনেকগুলো মত পাওয়া যায়। সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সর্বশেষ নাযেল হয় সূরা বাকারার ২৮১ নং আয়াত–

وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ.

কেউ কেউ এর পূর্বের ২৮০ নং আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, সেটিই সবার শেষে নাযেল হয়। হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) বলেছেন, এই দুই উক্তির মধ্যে মূলত কোন বৈপরিত্য নেই। উভয় আয়াতই একই সঙ্গে নাযেল হয়, যেমন কুরআনে কারীমের তারতীব রয়েছে। সে ক্ষেত্রে কেউ প্রথম আয়াতের কথা এবং কেউ শেষ আয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন। হাফিজ ইব্‌নে হাজার আসকালানী (রহ.)ও বলেছেন, এ দুটি উক্তির মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই; উভয় আয়াতই একই প্রসঙ্গে অর্থাৎ, সূদ প্রসঙ্গে এবং একটি আয়াত অপর আয়াতের সাথে حرف عطف (সংযোগ অব্যয়) যোগে সংযুক্ত।

কেউ কেউ বলেছেন, সর্বশেষ নাযেল হয় সূরা নেছার সর্বশেষ আয়াত (১৭৬ নং আয়াত)। হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) ও ইব্‌নে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেছেন, ফারায়েয তথা মীরাছ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের মধ্যে সর্বশেষে এটি নাযেল হয়। এ হিসাবে এটিকে সর্বশেষ বলা হয়েছে। সামগ্রিক বিবেচনায় কুরআনের সর্বশেষ আয়াত নয়।[২]

---

১. البيان فى علوم القرآن ومناهل العرفان

১. الإ تقان فى علوم القران للسيوطي থেকে গৃহীত।

❑ যারা কুরআনের লেখক (কাতেবে ওহী) ছিলেন

ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)সহ ৪০ জনের নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন– হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত উছমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আবূ সারাহ (রা.), হযরত যুবায়ের ইব্‌নে আউয়াম (রা.), হযরত খালেদ ইব্‌নে সাঈদ ইবনে আস (রা.), হযরত আবান ইব্‌নে সাঈদ ইব্‌নে আস (রা.), হযরত হানযালা ইব্‌নে রবী' (রা.), হযরত আকিব ইব্‌নে আবূ ফাতিমা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আরকাম যুহায়রী (রা.), হযরত শুরাহবীল ইব্‌নে হাসনাহ (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে রওয়াহা (রা.), হযরত আমের ইব্‌নে ফুহায়রা (রা.), হযরত আম্‌র ইবনুল আস (রা.), হযরত ছাবেত ইব্‌নে কায়ছ ইব্‌নে শাম্মাস (রা.), হযরত মুগীরা ইব্‌নে শু'বা (রা.), হযরত খালেদ ইব্‌নে ওয়ালীদ (রা.), হযরত মুআবিয়া ইব্‌নে আবূ সুফইয়ান (রা.) ও হযরত যায়েদ ইব্‌নে ছাবেত (রা.)।[২]

❑ কুরআন সংকলন হয়

কুরআন সংকলন হয় দু'বার। প্রথমবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর জমানায়। দ্বিতীয়বার হযরত উছমান (রা.)-এর জমানায়। দ্বিতীয়বারের সংকলনই সারা বিশ্বে চালু হয় এবং অদ্যাবধি সেটিই চালু রয়েছে।

❑ কুরআন সংকলন করেন

প্রথমবার কুরআন সংকলন করা হয় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খেলাফত কালে। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর দিক নির্দেশনা মোতাবেক হযরত যায়েদ ইব্‌নে ছাবেত (রা.) কুরআন সংকলন করেন।

দ্বিতীয়বার কুরআন সংকলন করা হয় হযরত উছমান (রা.)-এর খেলাফতকালে। এ সময় কুরআন সংকলনের দায়িত্ব অর্পন করা হয় চারজন সাহাবীর সমন্বয়ে গঠিত একটি জামাতের উপর। সে চারজন হলেন– হযরত যায়েদ ইব্‌নে ছাবেত (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে যুবায়ের (রা.), হযরত সাঈদ ইব্‌নে আস (রা.) ও হযরত আব্দুর রহমান ইব্‌নে হারিছ ইব্‌নে হিশাম (রা.)।

উপরোক্ত চারজন সাহাবীর সঙ্গে কুরআন সংকলন কাজে আরও অনেকে সহযোগিতা করেন। ইমাম আবূ দাউদের বর্ণনানুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল ১২। হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব (রা.), হযরত কাছীর ইব্‌নে আফলাহ (রা.), হযরত মালিক ইব্‌নে আবূ আমর (রা.), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রা.)ও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৫. আখেরাত সম্বন্ধে ঈমান

মৌলিক যেসব বিষয়ে ঈমান আনতে হয়, তার মধ্যে আর একটি হল আখেরাত সম্বন্ধে ঈমান। এই জগতের যেমন শুরু আছে তেমনি এর একটা শেষও রয়েছে।

২. علوم القرآن لتقى العثمانى نقلا عن فتح البارى والبيان فى علوم القرآن

মৃত্যুর পর পুনরায় সকলে জীবিত হবে। দুনিয়ায় কৃত সকল কর্মের জবাবদিহী করতে হবে এবং কর্মের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি হবে। সকল আসমানী কিতাব পরকালে বিশ্বাসের ব্যাপারে একমত। পরকালে অবিশ্বাস করলে তার ঈমান থাকে না। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْأٰخِرِ.

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না, তাদের সাথে যুদ্ধ কর। (সূরা: ৯-তাওবা: ২৯)

প্রসঙ্গ: পুনর্জন্মবাদ

হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের ন্যায় পরকালে বিশ্বাস করে না। তারা পুনর্জন্মবাদ (تَنَاسُخ)-এর প্রবক্তা। তারা বলে, যারা ইহজগতে পূণ্য অর্জন করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে, তারা তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী আবার অন্য কোন দেহে পুনরায় পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। যেমন: বাহাদুর ব্যক্তি বাঘের দেহে, কাপুরুষ খরগোসের দেহে আবির্ভূত হয়। এভাবে প্রত্যেকে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী তার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করার জন্য আবার অন্য কোন দেহে পৃথিবীতে আবির্ভূত হতে থাকে। এক সময় যখন সে পূণ্য অর্জন করে এবং আবিলতা থেকে মুক্তি পায়, তখন তার আত্মা স্বর্গলোকে আত্মিক সুখে মগ্ন হয়। এর বিপরীত যে দেহ শারীরিক আবিলতা তথা অজ্ঞতা ও অসৎচরিত্র থেকে মুক্তি অর্জন করতে না পারে, তার আত্মা পরকালে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে। এটাকেই তারা পুনর্জন্মবাদ বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

কিন্তু পরজন্মে কে কোন্ অপরাধের কারণে কোন্ দেহে আবির্ভূত হল তা যখন জানতে পারল না, তখন সংশোধনের এই প্রক্রিয়া যুক্তিসংগত ও মনস্তাত্বিক নীতিসমৃদ্ধ নয়। কেননা মনস্তাত্বিকভাবে কারও সংশোধন তখনই হয়, যখন সে জানতে পারে তার অপরাধ কি? সংশোধনের জন্য কাউকে প্রেরণ করা হল অথচ সে জানতেই পারল না তার অপরাধ কি, এটা কোনোক্রমেই যুক্তিসংগত নয়। তদুপরি মানুষকে যদি অপরাধের কারণে বাঘ ভল্লুক বা শিয়াল কুকুরের আকারে পুনরায় আবির্ভূত হতে হয়, তাহলে তার সংশোধন কীভাবে হবে? পূর্ব জন্মে তার যে অপরাধ হয়েছিল সেটা ছিল মনুষ্য সংক্রান্ত; এখন বন্য প্রাণী হয়ে তার পক্ষে মনুষ্য চরিত্রের ত্রুটি সংশোধন হবে কীভাবে? এটা কোনো যুক্তিতেই বোধগম্য নয়।

পুনর্জন্মবাদের প্রবক্তা দার্শনিকদের কেউ কেউ পুনর্জন্মবাদের পক্ষে ঐসব হাদীছ থেকে প্রমাণ পেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে জাহান্নামীর দেহ ওহুদ পাহাড়ের মত বড় হবে, তাদের শরীরের চামড়া কয়েক গজ পুরু হবে ইত্যাদি। এমনিভাবে জান্নাতীদের দেহও হযরত আদম (আ.)-এর দেহের মত ৬০ হাত দীর্ঘ হবে। তারা বলতে চায়, দুনিয়াতে তাদের এই দেহ ছিল না, অথচ এই দেহে তাদের পৃথিবীর আত্মা প্রবিষ্ট হচ্ছে। এটাই হল এক আত্মার অন্য দেহে আবির্ভাব। এটাকেই তো পুনর্জন্মবাদ বলা হয়। কিন্তু এই যুক্তি ভ্রান্ত। কারণ–

১. পুনর্জন্মবাদ বলা হয় আত্মার এক দেহ থেকে অন্য দেহে আবির্ভাব। আর এখানে যে দেহে জাহান্নামী ও জান্নাতীদের আত্মার আবির্ভাব হচ্ছে, তা ভিন্ন কোন দেহ নয় বরং তারই দেহ, তবে সেটাকে বর্ধিত করে দেয়া হয়েছে। এই বর্ধিত দেহে তার দুনিয়ার আত্মা আবির্ভূত হচ্ছে। বর্ধিত দেহ আর ভিন্ন দেহের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারার কারণেই জান্নাতী ও জাহান্নামীদের বড় দেহে দুনিয়ার আত্মার আবির্ভাবে পুনর্জন্মবাদের ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।
২. তাছাড়া পুনর্জন্মবাদের সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে, আর জান্নাত বা জাহান্নামের দেহ পরকালীন জগতের বিষয়। পরকালীন জগতের বিষয় দিয়ে দুনিয়ার বিষয়ে দলীল দেয়া চলে না।

পুনর্জন্মবাদীরা আরও একটি হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়ে থাকে; যাতে বলা হয়েছে,

إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ تَعَلَّقُ فِيْ شَجَرَةِ الْجَنَّةِ.

অর্থাৎ, মুমিনের আত্মা পাখীর আকৃতি ধারণ করে জান্নাতের বৃক্ষে বিচরণ করবে। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণ দেয়া চলবে না। কেননা, এ হাদীছের শেষাংশে বলা হয়েছে,

حَتّٰى يُرْجِعَ اللهُ فِيْ جَسَدِه يَوْمَ بَعْثِه.

অর্থাৎ, তারপর পুনরুত্থানের সময় আল্লাহ তাকে তার দেহে ফিরিয়ে দেবেন। বোঝা গেল অন্তবর্তীকালীন সময়ে যে পাখির মধ্যে সে ছিল সেটা তার দেহ নয় বরং তা হল একটা বাহনের মত।[১]

আখেরাতে ঈমান রাখার মধ্যে যে যে বিষয় অন্তর্ভুক্ত

আখেরাত বা পরকাল সম্বন্ধে বিশ্বাস করার অর্থ হল- মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে কবর ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়, হাশর-নাশর ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়, জান্নাত জাহান্নাম ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় –যেগুলো সম্পর্কে ঈমান আনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে– তার সব কিছুতেই বিশ্বাস করা।[২] অতএব এ পর্যায়ে মোটামুটিভাবে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীতে বিশ্বাস রাখতে হবে।

(এক) কবরের সওয়াল জওয়াব সত্য

কবরে প্রত্যেক মানুষের সংক্ষেপে কিছু পরীক্ষা হবে। মুনকার ও নাকীর নামক দু'জন ফেরেশতা কবরবাসীকে প্রশ্ন করবে, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? তোমার রসূল কে? সে নেককার হলে এ প্রশ্নাবলীর উত্তর সঠিকভাবে দিতে সক্ষম হবে। তখন তার কবরের সাথে এবং জান্নাতের সাথে দুয়ার খুলে যোগাযোগ স্থাপন করে দেয়া হবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত সে সুখে বসবাস করতে থাকবে। আর নেককার না হলে (অর্থাৎ, কাফের বা মুনাফেক হলে) প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে সে বলবে, هاه هاه لا أدري অর্থাৎ, হায় হায় আমি জানি না! তখন জাহান্নাম ও তার কবরের মাঝে দুয়ার খুলে দেয়া হবে

---

১. عقائد الاسلام . عبد الحق حقانى ও অন্যান্য গ্রন্থের আলোকে। ২. مرقاة ج/١

এবং বিভিন্ন রকম শাস্তি দেয়া হবে।[১] কবরে মুনকার নাকীর নামক ফেরেশতাদ্বয়ের আগমন ও প্রশ্ন করা সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে,

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ، أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْأٰخَرِ النَّكِيْرُ . الحديث . (رواه الترمذي وصححه وأخرجه أيضا كثيرون)

অর্থাৎ, যখন মাইয়্যেতকে কবরস্থ করা হবে, তখন তার কাছে কাল রংয়ের নীল চক্ষু বিশিষ্ট দুজন ফেরেশতা আগমন করবে, যাদের একজনকে বলা হয় মুন্‌কার, অন্যজনকে বলা হয় নাকীর। (তিরমিযী)

জমহুরের মতে এই সওয়াল জওয়াব মু'মিন গায়রে মু'মিন নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রেই হবে। তবে সহীহ মত অনুসারে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও শহীদগণকে তাঁদের উচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে কবরে প্রশ্ন করা হবে না। সহীহ মুসলিম ও নাসায়ী শরীফের হাদীছ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।[২]

দুনিয়ার মানুষ সওয়াল জওয়াব শুনতে পায় না বলে সেটাকে অস্বীকার করা যায় না। একজন ঘুমন্ত মানুষ বহুকিছু স্বপ্নে দেখে এবং শোনে, অথচ তার পার্শ্ববর্তী লোকটি তা কিছুই টের পায় না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর কথা শুনতেন এবং তাকে দেখতেন অথচ পাশে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম তা কিছুই শুনতে পেতেন না, দেখতে পেতেন না। কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ.

অর্থাৎ, মানুষ আল্লাহ্‌র জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না, তিনি যতটুকু চান তা ছাড়া। (সূরা: ২-বাকারা: ২৫৫)

(দুই) কবরের আযাব সত্য

কবর মূলত শুধু নির্দিষ্ট গর্তকে বলা হয় না, কবর বলতে মূলত বোঝায় মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে হাশরের ময়দানে পুনর্জীবিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালীন জগতকে। এ জগতকে কবর জগত (عالم القبر), আলমে বরযখ (عالم البرزخ) বা বরযখের জগত বলা হয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ مِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ.

অর্থাৎ, তাদের পশ্চাতে রয়েছে বারযাখ তাদের পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (সূরা: ২৩-মু'মিনূন: ১০০)

মুর্দাকে কবরস্থ করার পর তার দেহে রূহ প্রত্যাবর্তন করে। জমহুর এবং অধিকাংশের মতে রূহের প্রত্যাবর্তন পূর্ণাঙ্গভাবে হয় না বরং দেহ বা দেহের অংশ বিশেষের উপর তার প্রভাব পড়ে। যাকে পরিভাষায় اشراق এবং اسراف বলা হয়।[৩]

---

১. জাহমিয়া ও মুতাযিলা সম্প্রদায় কেয়ামতের পূর্বে মুর্দার জীবিত হওয়া এবং মুনকার নাকীরের সওয়াল জওয়াব ও কবরের আযাবকে অস্বীকার করে। দ্রঃ ২য় খণ্ড, জাহ্‌মিয়া ও মুতাযিলা শিরোনাম।
২. الإتحاف ج/٢ تسكين الصدور محمد سرفرازخان صفدر

মৃত্যুর পর মানুষের মরদেহ যেখানেই যেভাবেই থাকুক না কেন সে কবর জগতের অধিবাসী হয়ে যায় এবং বদকার হলে তার উপর আযাব চলতে থাকে।[১] কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে,

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ.

অর্থাৎ, সকাল-সন্ধা তাদের কাছে আগুন পেশ হয়। আর কেয়ামতের দিন বলা হবে, হে ফিরআউনী সম্প্রদায়! তোমরা কঠিন শাস্তিতে প্রবেশ কর। (সূরা: ৪০-মু'মিন: ৪৬)

কুরআনে কারীমে আরও ইরশাদ হয়েছে,

مِمَّا خَطِيْٓئٰتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا.

অর্থাৎ, তাদের পাপের কারণে তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়। অনন্তর তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করানো হয়। (সূরা: ৭১-নূহ: ২৫)

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ اَوْ تُعَذَّبُوْنَ فِيْ قُبُوْرِكُمْ. (رواه الشيخان عن عائشة)

অর্থাৎ, "তোমাদেরকে কবরে পরীক্ষায় ফেলানো হবে, অথবা তোমাদেরকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে।" অন্য এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. (رواه مسلم)

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্র কাছে কবরের আযাব থেকে পানাহ কামনা কর। (মুসলিম)

কবরের এ আযাব মূলত হয় রূহের উপর এবং রূহের সাথে দেহও সে আযাব উপলব্ধি করে থাকে। তাই দেহ যেখানেই যেভাবেই থাকুক না কেন, জ্বলে পুড়ে ছাই বা পঁচে গলে মাটি হয়ে যাক না কেন, তার যে অংশ অবশিষ্ট থাকবে, সেটুকু আযাব উপলব্ধি করবে।[২] আর মৌলিকভাবে আযাব যেহেতু রূহের উপর হবে, তাই কবরের আযাব হওয়ার জন্য এই দেহ অবশিষ্ট থাকাও অপরিহার্য নয়।

যিন্দা মুসলমানদের দুআ, দান-খয়রাত ও নামায তিলাওয়াত দ্বারা মুর্দা মুসলমানদের উপকার হয়। তবে কাফেররা কারও দুআ খয়রাত দ্বারা উপকৃত হয় না। এর দ্বারা তাদের শাস্তিও লাঘব বা লঘু হয় না। কুরআনে মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

অর্থাৎ, তাদের থেকে আযাব লঘু করা হবে না। আর না তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (সূরা: ২-বাকারা: ৮৬)

---

১. খাওয়ারিজ, মু'তাযিলা ও কতক মুরজিয়া কবর আযাবকে অস্বীকার করে। তাদের বিষয়ে জানার জন্য সংশ্লিষ্ট শিরোনাম দেখুন।

২. وفي الفتاوى البزازية حتى لو اكله السبع فالسوال بطنه.

(তিন) পুনরুত্থান ও হাশর ময়দানের অনুষ্ঠান সত্য

কিয়ামতের সময় শিংগায় ফুঁক দেয়ার পর সবকিছু নেস্ত-নাবূদ হয়ে যাবে।[১] কোন কোন আলেম বলেন, একমাত্র আল্লাহ্র অস্তিত্ব ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।[২] আবার আল্লাহ্র হুকুমে এক সময় শিংগায় ফুঁক[৩] দেয়া হলে আদি-অন্তের সব জিন ইনছান ও যাবতীয় প্রাণী পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্র হবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ.

অর্থাৎ, শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। ফলে আল্লাহ যাদেরকে চান তারা ছাড়া সকলে বেহুশ হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। (সূরা: ৩৯-যুমার: ৬৮)

যুক্তিগতভাবেও পুনরুত্থান সম্ভব। কারণ, পুনরুত্থান হল পুনর্বার সৃষ্টি। আর যে খোদা প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি পুনর্বার সৃষ্টি করতে আরও বেশি সক্ষম। যেমন কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَ هِىَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ.

অর্থাৎ, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে যখন তা পচে গলে যাবে? তুমি বলে দাও, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনি, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা: ৩৬-ইয়াসীন: ৭৮–৭৯)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَ هُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ, তিনি ঐ সত্তা যিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন। অনন্তর আবার তাকে সৃষ্টি করবেন। পুনর্বার সৃষ্টি করা তার জন্য আরও সহজ। (সূরা: ৩০-রূম: ২৭)

আরও বলা হয়েছে,

كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ.

অর্থাৎ, যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনর্বার সৃষ্টি করব। (সূরা: ২১-আম্বিয়া: ১০৪)

কুরআন শরীফে উল্লেখিত সূরা বাকারায় বনী ইসরাঈলের একটি ঘটনায় গাভী যবেহ করত তার এক অংশের ছোয়ায় মৃতের জীবিত হওয়া, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে চারটি পাখি যবেহ করার পর পুনরায় তাদের জীবিত হওয়া,

---

১. কোন কোন উলামায়ে কেরামের মতে ৮টি জিনিস এই ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। তা হল ঃ আরশ, কুরসী, লওহ, কলম, বেহেশ্ত, দোযখ, শিংগা ও রূহ। তবে রূহের উপর এক ধরনের বেহুশী আপতিত হবে।

২. عقائد الاسلام. عبد الحق حقانی

৩. এটা হবে দ্বিতীয় ফুঁক। দুই ফুঁকের মাঝখানে ৪০ বৎসরের ব্যবধান হবে। عقائد الاسلام. عبد الحق حقانی

হযরত উযায়ের (আ.)-এর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়া এবং আসহাবে কাহাফের পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনা প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম তার চাক্ষুস প্রমাণ দেখিয়েছেন।

পুনরুত্থান শারীরিক, না শারীরিক-আত্মিক উভয়ভাবে

পুনরুত্থান শারীরিক না শারীরিক-আত্মিক উভয়ভাবে সংঘটিত হবে, এ সম্বন্ধে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মুতাকাল্লিমীনের অধিকাংশের মতে পুনরুত্থান হবে শারীরিকভাবে। তাদের মতে রূহ বা আত্মাও একটি সুক্ষ্ম দেহ বিশেষ যা শরীরের সর্বত্র মিশে আছে। যেমন গোলাবের পানি গোলাবের সর্বত্র মিশে থাকে। অতএব রূহ ও দেহ উভয়ের সমভিব্যাহারে পুনরুত্থান হল শারীরিক। (الاتحاف ج/٢) দলীল কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত–

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ وَ ادْخُلِيْ جَنَّتِيْ.

অর্থাৎ, হে নফ্ছে মুতমায়িন্না (প্রশান্ত আত্মা)! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরা: ৮৯-ফাজ্র: ৩০)

এক শ্রেণীর দার্শনিক এই বলে শারীরিক পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে যে, পরকালে এরূপ আসমান জমিন থাকবে না। তাই সেখানে এরূপ শরীর নিয়ে জীবন ধারণ সম্ভব নয়। এরূপ সন্দেহের জওয়াব দিয়ে আল্লাহ পাক বলেছেন,

اَوَ لَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ.

অর্থাৎ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (সূরা: ৩৬-ইয়াসীন: ৮১)

পুনরুত্থান কোন্ দেহের উপর হবে?

পুনরুত্থান হবে শরীরের মৌলিক অংশের উপর ভিত্তি করে যা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকে। খাদ্য-খাবার দ্বারা যার প্রবৃদ্ধি ঘটে কিংবা রোগ-ব্যধিতে যার হ্রাস ঘটে তার নয়। অতএব দেহ যেখানে যেভাবেই থাকুক না কেন, কোন প্রাণীর পেটে চলে যাক, জ্বলে পুড়ে ছাই বা পঁচে গলে মাটি হয়ে যাক না কেন, তার যে অংশ অবশিষ্ট থাকবে সেটুকু আযাব উপলব্ধি করবে। আর মৌলিকভাবে আযাব যেহেতু রূহের উপর হবে, তাই কবরের আযাব হওয়ার জন্য এই দেহ অবশিষ্ট থাকা অপরিহার্য নয়।

শরীরের মৌলিক অংশের উপর ভিত্তি করে পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়ার নির্দেশনা পাওয়া যায় নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে:

ليس من الإنسان شيء إلَّا يَبْلٰى إلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (متفق عليه. رواه البخاري برقم ٤٩٣٥ وراه مسلم برقم ٧٦٠٣)

অর্থাৎ, মানুষের সবকিছুই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাবে। তবে একটি অস্থি ব্যতিক্রম। সেটি হল লাঙ্গুলাস্থি। কেয়ামতের দিন তার থেকেই মাখলূক পুনর্গঠিত হবে। (বোখারী ও মুসলিম)

(চার) আল্লাহ্র বিচার ও হিসাব নিকাশ সত্য

পুনর্জীবিত হওয়ার পর সকলকে আল্লাহ তা'আলার বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ.

অর্থাৎ, অনন্তর সেদিন তোমাদেরকে নেয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা: ১০২ তাকাছুর: ৮)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর-এগুলোর সবটা সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা: ১৭-বানী ইসরাঈল: ৩৬)

হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

لا تَزَالُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِه فِيْمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِه فِيْمَا فَعَلَ، وَعَنْ مَالِه مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَه وَفِيْمَا أَنْفَقَه، وَعَنْ جِسْمِه فِيْمَا أَبْلَاهُ. (رواه الترمذى فى أبواب صفة القيمة –باب ما جاء فى شان الحساب والقصاص وقال : هذا حديث حسن صحيح.)

অর্থাৎ, (কেয়ামতের দিন) এই (পাঁচটা) বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ার আগে কোন বনী আদমের পা নাড়ানোরও ক্ষমতা থাকবে না। তার জীবন কোথায় ব্যয় করেছিল, যা জেনেছিল তার কতটুকু আমল করেছিল, তার সম্পদ কোথা থেকে আয় করেছিল এবং কোথায় ব্যয় করেছিল এবং দেহ কোথায় ক্ষয় করেছিল। (তিরমিযী)

(পাঁচ) কিয়ামতের দিন আল্লাহ কর্তৃক মানুষকে সওয়াল করা সত্য

কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষকে সওয়াল করবেন এটা সত্য।[১] বোখারী শরীফের এক হাদীছে এসেছে–

إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَه وَيَسْتُرُه فَيَقُوْلُ : أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُوْلُ : نَعَمْ أَيْ رَبِّ، حَتّٰى قَرَّرَه بِذُنُوْبِه وَرَأٰى فِيْ نَفْسِه أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ : سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا و أَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطٰى كِتَابَ حَسَنَاتِه . الحديث. (رواه البخاري فى المظالم والقصاص)

অর্থাৎ, আল্লাহ মু'মিনকে কাছে আনবেন অতঃপর তার দিকে ঝুকবেন, তার ওপর পর্দা ঢেলে দিবেন, তার থেকে তার পাপের স্বীকৃতি নিবেন। তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, অমুক অমুক পাপ চেন কি? (অর্থাৎ, তুমি এগুলো করেছ কি?) সে বলবে, হ্যাঁ হে আমার প্রতিপালক। অবশেষে যখন তার থেকে তার পাপের স্বীকৃতি নেয়া হবে এবং সে মনে

১. شرح العقائد النسفية

মনে ভাববে আমার ধ্বংস তো অনিবার্য। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার এ সব পাপ গোপন করে রেখেছিলাম, আজও আমি তা ক্ষমা করে দিব। অতঃপর তার নেক আমলনামা তার হাতে দেয়া হবে। (বোখারী)

(ছয়) নেকী ও বদীর ওজন সত্য

কেয়ামতের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্য মিযান (میزان) বা দাড়িপাল্লা (মাপযন্ত্র) স্থাপন করা হবে এবং তার দ্বারা নেকী-বদী ওজন করা হবে এবং ভাল-মন্দ ও সৎ-অসতের পরিমাপ করা হবে। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ.

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন আমি ইন্‌সাফের দাড়িপাল্লা স্থাপন করব। (সূরা: ২১-আম্বিয়া: ৪৭) অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذِ نِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُه فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُه فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ.

অর্থাৎ, সেদিনকার ওজন সত্য। তখন যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে, তারা সফলকাম। আর যাদের নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তারা এমন লোক যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এভাবে যে, তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি অবিচার করত। (সূরা: ৭-আ'রাফ: ৮-৯)

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট সহীহ মত হল- কেয়ামতের দিন আমলকে দেহে রূপান্তরিত করে সেই দেহ ওজন দেয়া হবে কিংবা কোন দেহে রেখে আমলকে ওজন দেয়া হবে। তখন নেককার লোকদের আমল সুন্দর এবং বদকার লোকদের আমল কুৎসিত আকার ধারণ করবে। আল্লামা যাবীদী বলেন, আমল ওজন হবে- এই মতটিই সহীহ। দলীল নিম্নোক্ত হাদীছসমূহ:

حديث أبي الدرداء : مَا شيء أثقل من مِيْزَانِ المؤمن يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ. الحديث.

(أخرجه الترمذى برقم ۲۰۰۲ وقال : حديث حسن صحيح. و أخرجه ابن حبان برقم ٥٦٩٣. واللفظ للترمذي.)

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দরদা (রা.) থেকে বর্ণিত- রসূল (সা.) বলেছেন, কেয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী কিছু রাখা হবে না। (তিরমিযী ও সহীহ ইবনে হিব্বান)

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীছে আছে:

تُوْضَعُ الْمَوَازِيْنُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَتُوْزَنُ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، فَمَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُه عَلٰى سَيِّئَاتِه مِثْقَالَ حَبَّةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُه عَلٰى حَسَنَاتِه مِثْقَال حَبَّةٍ دَخَلَ النَّار، قِيْلَ : فَمَنْ اِسْتَوَتْ حَسَنَاتُه وَ سَيِّئَاتُه؟ قَالَ : أُولٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ. (الإتحاف جـ ٢)

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন ওজনের পাল্লা স্থাপন করা হবে। অতঃপর নেকী ও বদী ওজন দেয়া হবে। বদীর চেয়ে যার নেকী সরিষার দানা পরিমাণও বেশি হবে, সে জান্নাতে

প্রবেশ করবে। আর যার নেকীর চেয়ে বদী সরিষার দানা পরিমাণও বেশি হবে, সে জাহান্নামে যাবে।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে:

وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس : اِنَّ اللهَ تَعَالٰى يُقَلِّبُ الْأَعْرَاضَ أَجْسَامًا فَيَزِنُهَا. (المصدر السابق)

অর্থাৎ, দেহহীন আমলগুলোকে দেহে রূপান্তরিত করে তা ওজন দেয়া হবে।

মু'তাযিলাগণ আমলের দেহ না থাকায় তার ওজন হওয়াকে অসম্ভব মনে করেছেন। এর জওয়াব অতিবাহিত হল যে, আল্লাহ তা'আলা আমলকে দেহে রূপান্তরিত করবেন। তদুপরি এই যুগে দেহহীন আলো, বাতাস, তাপ ইত্যাদির ওজন হওয়ার বাস্তবতা সামনে এসে যাওয়ায় মুতাযিলাদের যুক্তি এ যুগে অচল বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

(সাত) শাফাআত সত্য

শাফাআত সম্পর্কিত বিশদ আকীদা মশহুর হাদীছ (خبر مشهور) দ্বারা প্রমাণিত।[১] মুতাযিলাগণ এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেননা, তাদের ধারণায় পাপীকে ক্ষমা করা আল্লাহ্‌র পক্ষে সম্ভব নয়।[২] আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট আল্লাহ তাআলা কবীরা গোনাহ্ ক্ষমা করতে পারেন যদি সে গোনাহকে হালাল মনে করে করা না হয়। পক্ষান্তরে কোন সগীরা গোনাহ করার কারণেও তিনি বান্দাকে শাস্তি দিতে পারেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِه وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। অন্য গোনাহ যাকে তিনি ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সূরা: ৪-নিছা: ১১৬)

مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا.

অর্থাৎ, এ কী অদ্ভূত আমলনামা ছোট-বড় কোন কিছুকে বাদ দেয় না; বরং সবটারই হিসাব রেখেছে! (সূরা: ১৮-কাহ্‌ফ: ৪৯)

পরকালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হাফেয, মুজাহিদ প্রমুখদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়া হবে। রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক প্রকারের শাফা'আত বা সুপারিশ করবেন। তন্মধ্যে:

১. হাশরের ময়দানের কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য। হাশরের ময়দানে কষ্টে সমস্ত মাখলূক যখন পেরেশান হয়ে বড় বড় নবীদের কাছে আল্লাহ্‌র নিকট এই মর্মে সুপারিশ করার আবেদন করবে যেন আল্লাহ পাক বিচার কার্য শুরু করে হাশরের ময়দানের কষ্ট থেকে সকলকে মুক্তি দেন, তখন সকল নবী অপারগতা প্রকাশ করবেন। কারণ

---

১. শাফাআতের মৌলিক ধারণা সূরা আম্বিয়ার ২৮ নং আয়াত, সূরা মুদ্দাচ্ছিদের ৪৮ নং আয়াত প্রমুখ আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত।

২. شرح العقائد النسفيه

আল্লাহ তাআলা সেদিন অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন। অবশেষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুপারিশ করবেন। এটাকে শাফা'আতে কুব্‌রা (شفاعت کبری) বা বড় সুপারিশ বলা হয়। এ ছাড়াও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ করবেন। যথা:–

২. হিসাব ও সওয়াল সহজ করার জন্য।
৩. কোন কোন কাফেরের আযাব সহজ করার জন্য। যেমন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আবূ তালেবের জন্য এরূপ সুপারিশ হবে।
৪. কোন কোন মুমিনকে জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য।
৫. যে সব মুমিন বদ আমল বেশি হওয়ার কারণে জাহান্নামের যোগ্য হয়েছে- এরূপ মুমিনদের কতকের জাহান্নামে না পাঠানো বরং ক্ষমা করে দেয়ার জন্য।
৬. কোন কোন মুমিনকে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করানোর জন্য।
৭. আ'রাফ তথা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত প্রাচীরে যারা অবস্থান করবে তাদের মুক্তির জন্য।
৮. বেহেশ্‌তে কতক মুমিনের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য।

মুতাযিলাগণ প্রথম ও শেষোক্ত প্রকার ব্যতীত অন্য সব প্রকার সুপারিশকে অস্বীকার করেন। কারণ, তাদের ধারণায় পাপ করলে কেউ মুমিন থাকে না আর মুমিন না হলে তার ক্ষমা হতে পারবে না। অতএব তার জন্য সুপারিশ অর্থহীন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন "মুতাযিলা" শিরোনাম।

(আট) আমলনামার প্রাপ্তি সত্য

* কিয়ামতের ময়দানে আমলনামা উড়িয়ে দেয়া হবে। প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে গিয়ে পড়বে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَ كُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَه فِىْ عُنُقِه وَ نُخْرِجُ لَه يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا.

অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক মানুষের কর্ম তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব (আমলনামা) যা সে উন্মুক্ত পাবে। (সূরা: ১৭-বানী ইসরাঈল: ১৩)

* নেককারের আমলনামা তার ডান হাতে গিয়ে পৌঁছবে, আর বদকারের আমলনামা বাম হাতে গিয়ে পড়বে। কুরআনে কারীমে এসেছে,

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَه بِيَمِيْنِه فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ...... اَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَه بِشِمَالِه فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ. الأية.

অর্থাৎ, তখন যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ ... আর যাকে তার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, হায় আমাকে যদি আমার আমলনামা দেয়াই না হত! (সূরা: ৬৯-হাক্কা: ১৯-২৯)

* প্রত্যেকে তার জীবনের ভাল-মন্দ ক্ষুদ্র-বৃহৎ যা কিছু করেছে সব তার আমলনামায় লিখিত অবস্থায় পাবে। কুরআনে মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

وَ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا.

অর্থাৎ, তারা বলবে হায় আমাদের দূর্ভোগ এ কী অদ্ভুত আমলনামা ছোট-বড় কোনো কিছুকে বাদ দেয় না; বরং সবই হিসাব রেখেছে! তারা তাদের যাবতীয় আমল উপস্থিত পাবে। তোমার প্রতিপালক কারও প্রতি জুলুম করেন না। (সূরা: ১৮-কাহ্ফ: ৪৯)

* প্রত্যেককে তার আমলনামা পড়তে দেয়া হবে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا.

অর্থাৎ, তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ কর। আজ তোমার হিসাব নেয়ার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ঠ। (সূরা: ১৭-বানী ইসরাঈল: ১৪)

(নয়) হাউযে কাউছার সত্য

কবর থেকে উঠার পর কেয়ামতের ময়দানে প্রত্যেকে পিপাসার্ত থাকবে। তাদেরকে পানি পান করানোর জন্য প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তাআলা তাঁদের মর্তবা অনুযায়ী একটি একটি হাওয দান করবেন। এই হাউয থেকে তাঁরা তাদের উম্মতকে পানি পান করাবেন, যার ফলে পিপাসা আর তাদেরকে কষ্ট দিবে না। আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে হাউয দান করা হবে তার নাম "হাউযে কাউছার"। হাউযে কাউছার অন্যান্য সকল হাউয থেকে বড় হবে।[১]

হাউযে কাউছার কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ.

অর্থাৎ, আমি তোমাকে কাউছার দান করেছি। (সূরা: ১০৮-কাউছার: ১)

হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বর্ণিত এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه لَاٰنِيَتُه أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ، وَكَوَاكِبُهَا فِيْ لَيْلَةٍ مَظْلِمَةٍ مُصْحِيَّةٍ مِنْ اٰنِيَةِ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ اٰخِرَ مَا عَلَيْهِ عَرْضُه مِثْلَ طُوْلِه مَا بَيْنَ عُمَانَ إِلٰى أَيْلَةَ، مَائُه أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ. (رواه الترمذي برقم ٨٧٧ وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب.)

অর্থাৎ, ঐ সত্তার কমস, যার হাতে আমার জীবন! তার (হাউযে কাউছারের) পেয়ালা জান্নাতের। তার সংখ্যা মেঘমুক্ত আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের চেয়ে বেশি। কেউ একবার তা থেকে পান করলে আর কখনও সে পিপাসার্ত হবে না। তর প্রস্থ তার দৈর্ঘের সমান– ওমান থেকে আইলা-র সমপরিমাণ। তার পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্ট। (তিরমিযী)

১. عقائد الإسلام. ادريس كاندهلوى

(দশ) পুলসিরাত সত্য

* জাহান্নামকে হাশরের ময়দানের কাছে আনা হবে। তাফসীরে কাবীর, রুহুল মাআনী ও কুরতুবীর বর্ণনা অনুযায়ী আরশের বাম পাশে স্থাপন করা হবে। এই জাহান্নামের উপর একটি পুল স্থাপন করা হবে, যা চুলের চেয়ে সরু এবং তলোয়ারের চেয়ে ধারালো হবে। এটাকে বলা হয় পুলসিরাত। সকলকেই এই পুল পার হতে হবে। যে খোদা পাখিকে হাওয়ায় উড়াতে সক্ষম, তিনি এমন পুলসিরাতের উপর দিয়ে মানুষকে চালাতেও সক্ষম।

* এই পুরসিরাত হল দুনিয়ার সিরাতে মুসতাকীমের স্বরূপ। দুনিয়াতে যে যেভাবে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর চলেছে, সে সেভাবে পুরসিলাত পার হয়ে যাবে। কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ চোখের পলকে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, কেউ দৌড়ে, কেউ হেঁটে, আবার কেউ হামাগুড়ি দিয়ে পার হবে। মোটকথা, যার যে পরিমাণ নেকী সে সেরকম গতিতে উক্ত পুল পার হবে। আর পাপীদেরকে জাহান্নামের আংটা জাহান্নামের মধ্যে টেনে ফেলে দিবে। পুলসিরাত সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلٰى جَهَنَّمَ، وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ، وَيَقُوْلُوْن : اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. قِيْلَ : يَارَسُوْلَ اللهِ! وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ : دَحْضٌ مُزِلَّةٌ فِيْهَا خَطَاطِيْفُ وَكَلَالِيْبُ ...... فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُوْنَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيْدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَمَخْدُوْشٌ مُرْسَلٌ، وَمَكْدُوْسٌ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ. الحديث. (مسلم ج/١)

অর্থাৎ, অনন্তর জাহান্নামের উপর পুল স্থাপন করা হবে। শাফা'আত সংঘটিত হবে। লোকেরা বলবে হে আল্লাহ! নিরাপত্তা দাও নিরাপত্তা দাও। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল পুল কী? তিনি বললেন, পদস্খলন ঘটার এক পিচ্ছিল স্থান। তাতে থাকবে সাঁড়াশি ও আংটা। ... তখন মুমিনরা কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ পাখির মত, কেউ দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় এবং কেউ সাধারণ সওয়ারীর গতিতে সে পুল পার হয়ে যাবে। তখন কেউ অক্ষত অবস্থায় মুক্তি পাবে, আর কেউ জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। (মুসলিম)

* রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং এই উম্মত সর্বপ্রথম এই পুল পার হবে। তারপর অন্যান্যরা পার হবে। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

فَأَكُوْنُ أَنَا وَأُمَّتِيْ أَوَّلَ مَنْ يُجِيْزُ. الحديث. (مسلم ج/١)

অর্থাৎ, তখন আমি এবং আমার উম্মত সর্বপ্রথম পার হবো। (মুসলিম)

(এগার) আ'রাফ সত্য

* আ'রাফ সত্য। আ'রাফ বলা হয় জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত প্রাচীরকে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَ عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمٰهُمْ.

অর্থাৎ, তাদের উভয়ের (জান্নাতী ও জাহান্নামীদের) মাঝে থাকবে আঁড়। এবং আ'রাফে কিছু লোক অবস্থান করবে, যারা সকলকে তাদের চিহ্ন দেখে চিনতে পারবে। ... (সূরা: ৭-আ'রাফ: ৪৬)

* এটা কোন স্থায়ী জায়গা নয়। যাদের নেকী বদী সমান হবে, তাদেরকে সাময়িক এখানে অবস্থান করানো হবে। অবশেষে আল্লাহ্র মঞ্জুরী হলে তাদের পাপ ক্ষমা করে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেবেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমরা দুঃখিতও হবে না। (সূরা: ৭-আ'রাফ: ৪৯)

(বার) জান্নাত বা বেহেশ্ত সত্য

* আল্লাহ্র নেক বান্দাদের জন্য আল্লাহ এমন সব নেয়ামত তৈরি করে রেখেছেন যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, কারও অন্তরে তার পূর্ণ ধারণাও আসতে পারে না। এই সব মহানেয়ামতের স্থান হল জান্নাত বা বেহেশ্ত। এর কিছুটা বিবরণ দিয়ে এক হাদীছে কুদছীতে বলা হয়েছে,

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه و سلم : قَالَ اللهُ تَعَلٰى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ. وَاقْرَؤُوْا اِنْ شِئْتُمْ . (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ.) (متفق عليه)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি যা কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কান শ্রবণ করেনি, আর না কোনো মানুষের হৃদয়ে তার কল্পনাও আসতে পারে। তোমরা (এর প্রমাণ স্বরূপ) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতে পার (যাতে বলা হয়েছে,) কেউই জানে না তার জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হয়েছে।

এখানে أعددت (আমি প্রস্তুত রেখেছি) শব্দটি স্পষ্টতই দলীল যে, জান্নাতের নেয়ামতরাজি পূর্বাহ্নেই সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। মুতাযিলাগণ বিচার দিবসের পূর্বে এর সৃষ্টিকে ফায়দাহীন মনে করে এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এর উত্তর হল পূর্বাহ্নেই সৃষ্টি হওয়া ফায়দাহীন– এটা ঠিক নয়। বর্তমানেও সেখানে হুর গেলমানদের অবস্থান রয়েছে। তদুপরি পূর্বাহ্নেই সৃষ্টি করার মধ্যে অন্য কোন হেকমতও নিহিত থাকতে পারে যা আমাদের বোধগম্য নয়। কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে,

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُوْنَ.

অর্থাৎ, তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না, বরং তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। (সূরা: ২১ আম্বিয়া: ২৩)

* জান্নাত কোন কল্পিত বিষয় নয় বরং সৃষ্টরূপে ও অস্তিত্বশীল হিসাবে তা বিদ্যমান আছে[১] এবং অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে[২] মুমিনগণও অনন্তকাল সেখানে থাকবেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত মত হল জান্নাত জাহান্নাম এখনই সৃষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। এমন নয় যে, পরবর্তীতে তা সৃষ্টি করা হবে। দলীল–

১. কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের ন্যায়; যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ১৩৩)

২. পূর্বে বর্ণিত যে হাদীছে জান্নাতের নেয়ামতরাজি প্রস্তুত রাখার কথা বলা হয়েছে, তাও জান্নাত সৃষ্টরূপে বিদ্যমান থাকার দলীল।

* জান্নাতের অবস্থান এখন কোথায় এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে, তবে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে জান্নাত আকাশসমূহের উপর। যেমন কুরআনে কারীমে জান্নাতের অবস্থান সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা এসেছে,

وَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى.

অর্থাৎ, আর সে তাকে (জিব্রাঈলকে) দেখেছিল সিদরাতুল মুন্‌তাহা–র কাছে; যার নিকট জান্নাতুল মা'ওয়া অবস্থিত। (সূরা: ৫৩-নাজ্‌ম: ১৩-১৫)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতুল ফিরদাউসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন,

سَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمٰنِ. (الإتحاف ج/٢)

অর্থাৎ, তার ছাদ হল আল্লাহ্‌র আরশ।

* জান্নাতবাসীদের কখনও মৃত্যু হবে না। জান্নাতবাসীগণ যা পেতে ইচ্ছা করবেন, তাই পাবেন। তাদের জন্য হুর গেলমান ও খাদেম থাকবে।

(তের) জাহান্নাম বা দোযখ সত্য

* পাপীদেরকে আল্লাহ আগুন ও আগুনের মধ্যে অবস্থিত সাপ, বিচ্ছু, সৃঙ্খল প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্তির উপরকণ দ্বারা আযাব দেয়ার জন্য যে স্থান প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাকে বলা হয় জাহান্নাম বা দোযখ। দোযখ আল্লাহর সৃষ্টরূপে বিদ্যমান রয়েছে[৩] এবং অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে।[৪] কাফেররা অনন্তকাল তাতে অবস্থান করবে।

১. এ ব্যাপারে ন্যাচারিয়া দলের মতবিরোধ রয়েছে। দেখুন "ন্যাচারিয়া দল" শিরোনাম।
২. এ ব্যাপারে ফিরকায়ে জাহ্‌মিয়ার এর ভিন্ন মত রয়েছে। দেখুন "জাহ্‌মিয়া" শিরোনাম।
৩. এ ব্যাপারে ন্যাচারিয়া দলের মতবিরোধ রয়েছে। দেখুন "ন্যাচারিয়া দল" শিরোনাম।
৪. এ ব্যাপারে জাহ্‌মিয়া সম্প্রদায়ের ভিন্ন মত রয়েছে। দেখুন "জাহ্‌মিয়া" শিরোনাম।

* কবীরা গোনাহকারীগণ তওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলেও অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে না। এক সময় শাস্তি ভোগ করার মাধ্যমে পাপ মোচন হওয়ার পর কিংবা পাপ মোচন হওয়ার পূর্বেই নবীর সুপারিশক্রমে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

* জাহান্নামের সাতটা স্তর বা দরজা থাকবে। একেক স্তরের শাস্তির ধরন হবে একেক রকম। অপরাধ অনুসারে যে যে স্তরের উপযোগী হবে তাকে সে স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। স্তরগুলোর পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। যথা:–

১. জাহান্নাম (جهنم) (وَجِيْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ.)
২. লাযা (لظى) (كَلَّآ اِنَّهَا لَظٰى.)
৩. হুতামা (حطمة) (كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ.)
৪. সায়ীর (سعير) (بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا.)
৫. সাকার (سقر) (سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ وَمَا اَدْرٰكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ.)
৬. জাহীম (جحيم) (وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغَاوِيْنَ.)
৭. হাবিয়া (هاوية) (فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ وَمَا اَدْرٰكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ.)

* জাহান্নামের অবস্থান এখন কোথায় এ ব্যাপারে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত হল জাহান্নাম জমিনের নিচে অবস্থিত। তবে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষ্য (نص صريح) পাওয়া যায় না বিধায় এর জ্ঞান আল্লাহর উপরই ন্যাস্ত করা শ্রেয়।[২]

মুফতী শফী সাহেব (রহ.) লিখেছেন, এ সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে, জমিনের সপ্তম স্তরের নিচে জাহান্নাম রয়েছে।[৩] কীভাবে রয়েছে তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। ইউরোপ থেকে একবার চেষ্টা করা হয়েছিল যে, মাটি খুড়ে সরাসরি প্রাচ্যের সঙ্গে একটা সংক্ষিপ্ত রাস্তা করা যায় কি না। তারা চেষ্টা করে দেখল জমিন খুড়ে চার মাইল পর্যন্ত নিচে যাওয়া যায়, তার নিচে আর যাওয়া যায় না। তার নিচে আর তারা খুড়তে পারে না। তার নিচে এমন শক্ত পাথরের স্তর আসে, যা পৃথিবীর কোন শক্তিশালী মেশিন দিয়েও কাটা সম্ভব নয়। কয়েক জায়গায় এরকম খোড়ার চেষ্টা করে একই অবস্থা দেখা গেল। তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে- এর ভিতরে মারাত্মক ধরনের কোন দাহ্য পদার্থ রয়েছে, যা একটা কঠিন পাথরের আবরণ দিয়ে ঘেরা। হতে পারে এখানেই আল্লাহ পাক জাহান্নামকে রেখেছেন। কিংবা যদি এটা নাও হয়, তবুও যেভাবেই হোক জাহান্নামকে দুনিয়ার সপ্তম স্তরের নিচে রাখা হয়েছে।[৪]

মে'রাজের ঘটনায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহান্নাম ও কবরের শাস্তিগুলো দেখেছিলেন আসমানে উঠার পূর্বে। কারণ, কবর এবং জাহান্নামের শাস্তিগু-লা হবে আসমানের নিচে। সপ্তম আসমানের নিচ পর্যন্ত সমগ্র এলাকা জাহান্নামে

১. شرح العقائد النسفيه
২. الإتحاف ج/٢
৩. হাদীছটি মুস্তাদরক হাকিমে (নং ৮৭৬৩) সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। إن جهنم تحت الارض السابعة.
৪. معارف القرآن

পরিণত হবে। এখনও জাহান্নাম আসমানের নিচে দুনিয়াতেই রয়েছে। দুনিয়ার কোন এক জায়গায় ক্ষুদ্র আকারে সংকুচিত অবস্থায় জাহান্নামকে রাখা হয়েছে। কেয়ামতের দিন এটাকে বিস্তৃত করে সপ্তম আসমানের নিচ পর্যন্ত পুরো স্থানকে জাহান্নামে পরিণত করে দেয়া হবে।

তবে জাহান্নাম এখন কোথায় আছে- এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন দলীল (نص صريح) পাওয়া যায় না বিধায় এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু না বলাই শ্রেয়। শুধু এতটুকুই বলা হবে যে, জাহান্নাম জমিনের নিচে অবস্থিত।

৬. তাকদীর সম্বন্ধে ঈমান

ষষ্ঠ মৌলিক যে বিষয়ে ঈমান রাখতে হয়, তা হল তাকদীরের বিষয়ে ঈমান। "তাকদীর" (تقدير) শব্দটি قدر থেকে গঠিত। এর শাব্দিক অর্থ হল– পরিকল্পনা, নকশা, পরিমাণ, নির্ধারণ করা, ব্যবস্থাপনা করা ইত্যাদি। পরিভাষায় তাকদীরের সংজ্ঞা হল–

هو تحديد كل مخلوق بِحَدِّه الذي يوجد من حُسْنٍ و قُبْحٍ و نَفْعٍ وضَرَرٍ وما يحويه من زمان ومكان وما يترتب عليه من ثواب وعقاب. (قواعد الفقه)

অর্থাৎ, সমুদয় সৃষ্টির ভাল–মন্দ, উপকার–ক্ষতি ইত্যাদি যাবতীয় সবকিছুর স্থান–কাল এবং এ সবের শুভ–অশুভের পরিমাণ ও পরিণাম পূর্ব হতে নির্ধারিত করা।

আল্লাহ তাআলা সবকিছু সৃষ্টি করার পূর্বে সৃষ্টি জগতের একটা নকশাও লিখে রেখেছেন, সবকিছুর পরিকল্পনাও লিখে রেখেছেন, এই নকশা ও পরিকল্পনাকেই বলা হয় তাকদীর। এই পরিকল্পনা এবং নকশা অনুসারেই সবকিছু সংঘটিত হয় এবং হবে। অতএব ভাল-মন্দ সবকিছুই আল্লাহ্র তরফ থেকে পূবাহ্নেই নির্ধারিত এবং সেই নির্ধারণ বা তাকদীর অনুযায়ী সবকিছু সংঘটিত হয়– এই বিশ্বাস রাখতে হবে।[১] ভাল এবং মন্দ, ঈমান ও কুফ্র, হেদায়েত ও গোমরাহী, ফরমাবরদারী ও নাফরমানী সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ– এই বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি একক, মহাপরাক্রমশালী। (সূরা: ১৩-রা'দ: ১৬)

এর বিপরীত কেউ যদি ভাল বা 'সু'-র জন্য একজন সৃষ্টিকর্তা আর মন্দ বা "কু"-র জন্য অন্য একজন সৃষ্টিকর্তা মানে, তাহলে সেটা ঈমানের পরিপন্থী কুফ্র ও শির্ক হয়ে যাবে। যেমন: অগ্নিপূজারীগণ কল্যাণ ও 'সু'-র সৃষ্টিকর্তা "আহ্রমান"কে মানে। হিন্দুগণ 'সু'-র সৃষ্টিকর্তা লক্ষ্মীদেবী এবং 'কু'-র সৃষ্টিকর্তা শনি দেবতাকে মানে। এটা কুফ্র ও শির্ক।

১. কাদরিয়া ফিরকা তাকদীরকে অস্বীকার করে। তাদের সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন "কাদরিয়া" শিরোনাম।

এখানে এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, সবই যখন আল্লাহর পরিকল্পনা অনুসারে হয়, তখন আমলের প্রয়োজন কী, যা হওয়ার তা তো হবেই? এ প্রশ্ন করা যাবে না এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা কর্ম জগতের নক্শায় লিখে রেখেছেন, যদি মানুষ ইচ্ছা করে তাহলে এরূপ হবে আর যদি ইচ্ছা না করে তাহলে এরূপ হবে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা মন্দ-এর সৃষ্টিকর্তা হলেও তিনি দায়ী নন বরং মানুষ মন্দ করার জন্য দায়ী। এ কারণে যে, তাকে আল্লাহ ক্ষমতা ও ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন, সে নিজের ক্ষমতা ও ইচ্ছা শক্তি মন্দের জন্য ব্যয় করল কেন? এরপরও তাকদীর সম্পর্কে এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে এবং মনে তাকদীর ও ভাগ্য সম্পর্কে নানান প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, এরূপ প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করে অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন, কেননা তাকদীরের বিষয়টা এমন এক জটিল রহস্যময়, যার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা মানব মেধার পক্ষে সম্ভব নয় এবং তা উদঘাটনের চেষ্টা করাও নিষিদ্ধ। আমাদের কর্তব্য তাকদীরে বিশ্বাস করা, আর আল্লাহ পাক আমলের দায়িত্ব দিয়েছেন তাই আমল করে যাওয়া।

তাকদীর সম্বন্ধে ঈমান রাখার অর্থ হল নিম্নোক্ত বিষয়াবলীতে বিশ্বাস রাখতে হবে:

১. সবকিছু সৃষ্টি করার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা সবকিছু লিখে রেখেছেন। তিনি পূর্বাহ্নেই সবকিছুর নকশা করে রেখেছেন। কুরআনে মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ.

অর্থাৎ, পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে মুসীবত আসে তা সংঘটিত করার পূর্বেই কিতাবে (লওহে মাহ্ফূযে) লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহ্র পক্ষে তা খুবই সহজ। (সূরা: ৫৭-হাদীদ: ২২)

২. সবকিছু ঘটার পূর্বেই আল্লাহ তাআলার অনাদি জ্ঞান সে সম্বন্ধে অবহিত এবং তাঁর জানা ও ইচ্ছা অনুসারেই সবকিছু সংঘটিত হয়। তবে কোন পাপ করে তার দায় থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তাকদীরের দোহাই দেয়া জায়েয নয়। কুরআনে মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَ لَا رَطْبٍ وَّ لَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থাৎ, তাঁর অজ্ঞাতসারে একটা পাতাও পড়ে না; মাটির অন্ধকারে কোন শস্যকণা কিংবা কোন রসযুক্ত বা শুষ্ক কোন কিছুই রয়েছে সব সম্পর্কেই তিনি অবগত, সবই সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহ্ফূযে) রয়েছে। (সূরা: ৬-আনআম: ৫৯)

৩. তিনি ভাল ও মন্দ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তবে মন্দ সৃষ্টির জন্য তিনি দোষী নন বরং যে মাখলূক মন্দ উপার্জন করবে সে দোষী, কেননা মন্দ সৃষ্টি (خلق شر) মন্দ নয় বরং মন্দ উপার্জন (كسب شر) হল মন্দ। মন্দ সৃষ্টি এজন্য মন্দ নয় যে, তার মধ্যেও

বহু রহস্য এবং বহু পরোক্ষ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই ভাল কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং মন্দ কাজে তিনি অসন্তুষ্ট।

৪. আল্লাহ তাআলা কলম দ্বারা লওহে মাহ্ফূযে (সংরক্ষিত ফলকে) তাকদীরের সবকিছু লিখে রেখেছেন। তাই লওহ, কলম ও লওহে যা কিছু লিখে রাখা হয়েছে সবকিছুতে বিশ্বাস রাখা তাকদীরে বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত।

৫. মানুষ একদিকে নিজেকে অক্ষম ভেবে নিজেকে দায়িত্বহীন মনে করবে না এই বলে যে, আমার কিছুই করার নেই, তাকদীরে যা আছে তা-ই তো হবে! আবার তাকদীরকে এড়িয়ে মানুষ খোদার সৃষ্টির বাইরেও কিছু করে ফেলতে সক্ষম– এমনও মনে করবে না। মোটকথা, তাকদীরের সাথে তাদবীর বা চেষ্টা-চরিত্রের কোন বিরোধ নেই। তাকদীরে বিশ্বাসও রাখতে হবে, শরীয়তসম্মত পন্থায় চেষ্টা-তাদবীরও করতে হবে।

يٰبَنِىَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّ ادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَ مَاۤ اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ.

অর্থাৎ, সে (ইয়া'কূব [আ.]) বলল, 'হে আমার পুত্র! তোমরা এক দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করবে না, ভিন্ন ভিন্ন দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না। বিধান আল্লাহ্রই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি। এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা তাঁরই উপর নির্ভর করুক।' (সূরা: ১২-ইউসুফ: ৬৭)

৬. মানুষের প্রতি আল্লাহর যত হুকুম ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তার কোনটি মানুষের সাধ্যের বাইরে নয়। কোনো অসাধ্য বিষয়ে আল্লাহ কোন হুকুম ও বিধান দেননি। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে বিধান দেন না। (সূরা: ২-বাকারা: ২৮৬)

৭. আল্লাহ তাআলার উপর কোন কিছু ওয়াজিব নয়,[১] তিনি কাউকে কিছু দিতে বাধ্য নন, তাঁর উপর কারও কোন হুকুম চলে না, যা কিছু তিনি দান করেন সব তাঁর রহমত ও মেহেরবানী মাত্র। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُوْنَ.

অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ) যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না, বরং তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। (সূরা: ২১-আম্বিয়া: ২৩)

৮. কোন অপরাধের দায় থেকে বাঁচার জন্য তাক্দীরকে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করানো জায়েয নয়।

৯. তাক্দীর সম্পর্কে বিতর্ক করা নিষেধ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাক্দীর সম্পর্কে বিতর্ক করতে দেখলে প্রচণ্ড রাগান্বিত হতেন। তাছাড়া হাদীছে

১. এ ব্যাপারে মুতাযিলাদের ভিন্ন মত রয়েছে, দেখুন "মুতাযিলা" শিরোনাম।

আরও এসেছে তাক্দীর সম্বন্ধে বিতর্ক করলে কেয়ামতের দিন এ সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে। হাদীছে[২] এসেছে,

مَنْ تَكَلَّمَ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الْقَدْرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. الحديث. (رواه ابن ماجة)

অর্থাৎ, তাক্দীর সম্পর্কে কেউ বিতর্ক করলে কিয়ামতের দিন এ ব্যাপারে তাকে জবাবদিহী করতে হবে। (ইবনে মাজা)

১০. তাক্দীর সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা হল এটা আল্লাহ্ তাআলার এমন এক জটিল রহস্যময় বিষয়, যার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা মানব মেধার পক্ষে সম্ভব নয় এবং তা উদঘাটনের চেষ্টা করাও নিষিদ্ধ। হযরত আলী (রা.) বলেন,

طريق مُظْلِمٌ فلا تَسْلُكْهُ، بحر عميق فلا تَلِجْهُ، وسِرُّ الله قد خَفِيَ عليك فلا تُفَتِّشْهُ. (المرقاة ج/١)

অর্থাৎ, তাক্দীর হল এক আঁধারাচ্ছন্ন পথ তাতে চল না, একটা গভীর সমুদ্র তাতে ডুব দিও না, সেটা হল আল্লাহ্র এক রহস্য যা তোমার কাছে প্রচ্ছন্ন, তুমি তা উদঘাটনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়ো না।

আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত ফয়সালা হল কাযা (قضاء) ও কদর (قدر) সত্য। অণু পরিমাণ কোন কিছু এর আওতা-বহির্ভূত নয়। কেউ এর অণু পরিমাণ কোন কিছুর ব্যতিক্রম ঘটাতে সক্ষম নয়। এই قضاء ও قدر এ ঈমান-বিশ্বাস রাখা ফরয। এ বিশ্বাস ব্যতীত ঈমান পূর্ণাঙ্গ হবে না। হাদীছে এসেছে,

عن على قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ : يَشْهَدُ أَنْ لَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ وَ يُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ وَيُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ. (رواه الترمذي باب ما جاء فى الإيمان بالقدر خيره و شره.)

অর্থাৎ, হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, চারটা বিষয়ে ঈমান আনা ব্যতীত কেউ মু'মিন হবে না। এ কথার সাক্ষ্য ব্যতীত যে, আল্লাহ এক ও আমি তাঁর রসূল; তিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান সম্বন্ধে ঈমান ব্যতীত এবং তাক্দীর সম্বন্ধে ঈমান ব্যতীত। (তিরমিযী)

কাযা (قضاء) ও কদর قدر-এর মাঝে পার্থক্য হল, কাযা শব্দের আভিধানিক অর্থ ফায়সালা করা, হুকুম দেয়া ইত্যাদি। পরিভাষায় কাযা (قضاء) বলা হয়,

الإرادة الأزلية المتعلقة بالموجودات الكائنة فيما لا يزال. (النبراس)

অর্থাৎ, অনাদিতে সৃষ্টবস্তু সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলার যে ইচ্ছা বা পরিকল্পনা ছিল তাকেই কাযা বলে। আর কদ্‌র হল ঐ সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনার বিস্তারিত ও বাস্তব রূপ।

যেমন প্রথমে একটা ইমারত নির্মাণের পরিকল্পনা করা হল। নির্মাণের পূর্বে মনে মনে তার একটা চিত্র কল্পনা করা হল। তারপর সেই কল্পিত চিত্র অনুসারে বাস্তবে ইমারত তৈরি করা হল। এখানে প্রথমটা হল কাযা আর দ্বিতীয়টা হল কদ্‌র।

২. হাদীছটি সনদের দিক থেকে ضعيف হলেও পরবর্তিতে উল্লেখিত হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি থেকে এর বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

হযরত কাছেম নানুতবী (রহ.)-এর মতে সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনার নাম কদ্‌র আর বিস্তারিত রূপের নাম কাযা।

মুসলমানদের আরও কতিপয় আকীদা

মে'রাজ সম্বন্ধে আকীদা

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা একদা রাত্রে জাগরিত অবস্থায় স্বশরীরে মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে যান। সেখান থেকে সাত আসমানের উপর এবং সেখান থেকেও আরও উপরে যতদূর আল্লাহর ইচ্ছা নিয়ে যান। সেখানে আল্লাহ্‌র সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথাবার্তা হয়। তখনই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিধান দেয়া হয় এবং সেই রাতেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন। একে মে'রাজ বলে। মে'রাজ হক ও সত্য। কুরআন-হাদীছ দ্বারা এটা প্রমাণিত। এ বিষয়ে উম্মতের ইজমাও সংঘটিত হয়েছে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গমনকে ইসরা (اسراء) বলা হয়। এটা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَکْنَا حَوْلَہٗ لِنُرِیَہٗ مِنْ اٰیٰتِنَا.

অর্থাৎ, পবিত্র ও মহিমময় ঐ সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমন করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায়; যার পরিবেশ আমি করেছি বরকতময়, তাঁকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। (সূরা: ১৭-বানী ইসরাঈল: ১)

মুসলিম শরীফের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ اَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : أُتِيْتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيْلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُوْنَ الْبَغْلِ، يَقَعُ حَافِرَه عِنْدَ مُنْتَهٰى طَرْفِه. فَرَكِبْتُه حَتّٰى اَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ. الحديث.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার কাছে আনা হল বোরাক। সেটি ছিল একটি প্রাণী সাদা, গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চেয়ে ছোট। সেটি তার দৃষ্টির শেষ সীমানায় এক একটা পদক্ষেপ চালায়। তখন আমি তাতে আরোহণ করলাম। এমনকি বায়তুল মুকাদ্দাস এলাম। ...।

ইস্‌রা (اسراء) শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুকে রাত্রে চালানো বা রাতে নিয়ে যাওয়া। আর পরিভাষায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমনকে اسراء বলা হয়।

বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে সপ্তম আসমানের উপর সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমনকে মে'রাজ বলা হয়। হাদীছ (خبر واحد) দ্বারা এটা প্রমাণিত। মে'রাজ معراج শব্দের আভিধানিক অর্থ উর্ধ্বে আরোহণ করা। মে'রাজ (معراج) শব্দটি عروج ধাতু থেকে উদগত। এর অর্থ উর্ধ্বে আরোহণ করা। পরিভাষায় মসজিদে আকসা থেকে উর্ধ্ব জগতে সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা পর্যন্ত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভ্রমনকে মে'রাজ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, মে'রাজ শব্দের অর্থ সিড়ি। যেহেতু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটা চলন্ত সিড়িতে করে উর্ধ্বলোকে আরোহণ করানো হয়েছিল, তাই এই ভ্রমনকে মে'রাজ বলে অভিহিত করা হয়। কখনো কখনো উভয় ভ্রমনকে ইস্‌রা ও মে'রাজ বলা হয়।

সাহাবা, তাবিয়ীন ও আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের গবেষক উলামায়ে কেরামের মতে মে'রাজ হয়েছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে। মে'রাজ সম্পর্কিত উপরোল্লেখিত আয়াত–এর بعبده শব্দটিও (যার অর্থ "তাঁর বান্দাকে") শারীরিক মে'রাজকেই প্রমাণিত করে। তদুপরি কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মে'রাজে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে আল্লাহ্‌র কুদরত প্রত্যক্ষ করানো। আর এটা স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় দেখানোকেই বোঝায়। জাগ্রত অবস্থার প্রত্যক্ষণই শক্তিশালী হয়ে থাকে।

কারও কারও[১] ধারণা- এটা স্বপ্নের মাধ্যমে ঘটিত বিষয়। তাদের ধারণার ভিত্তি হল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত–

وَ مَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِیْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ.

অর্থাৎ, আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও কেবল মানুষের জন্য পরীক্ষা বানিয়েছি। (সূরা: ১৭-বানী ইসরাঈল: ৬০)

তারা বলতে চান, এ আয়াতে الرؤيا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ হল স্বপ্ন। কিন্তু তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা, এ আয়াতে উল্লেখিত الرؤيا শব্দটি বদর যুদ্ধের সময়ের স্বপ্ন অথবা হুদায়বিয়ার ঘটনা সম্পর্কে দেখা স্বপ্ন কিংবা মক্কায় উমরা পালনের ব্যাপারে দেখা স্বপ্নের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। একান্তই এ আয়াতকে মে'রাজের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট বললে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.)-এর ভাষ্যমতে এখানে الرؤيا শব্দটি رویت তথা দেখার অর্থে ব্যবহৃত হবে।

কেউ কেউ মে'রাজের ঘটনাকে আধ্যাত্মিক (روحانی) ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন। এ ধারণা ঠিক নয় এ কারণে যে, সেরূপ হলে এ ঘটনা শুনে মক্কার মুশরিকদের এত বিস্ময় বোধ করা এবং এটাকে নিয়ে তাদের এত হৈ চৈ করার কোনো অবকাশ থাকত না। কেননা আধ্যাত্মিক উপায়ে এর চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনাও একজন সাধারণ মানুষ থেকেও ঘটতে পারে।[২]

প্রাচীন দার্শনিকরা মে'রাজকে অসম্ভব মনে করত। তারা মনে করত মে'রাজ হতে গেলে আসমান বিদীর্ণ হওয়া বা তাতে ছিদ্র করা আবার তাতে জোড়া লাগানোর প্রশ্ন এসে পড়ে। আর আসমান বিদীর্ণ হওয়া বা তাতে ছিদ্র করা আবার তাতে জোড়া

---

১. হযরত মুআবিয়া ও আয়েশা (রা.)-এর দিকে এ মতটির সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়।

২. نشر الطیب، معارف القرآن ادریس کاندھلوی ও ইসলামী আকীদা থেকে গৃহীত।

লাগানো অসম্ভব। কিন্তু খোদার অস্তিত্বকে মেনে নিলে এ সব প্রশ্ন উত্থাপিত হতেই পারে না। খোদার পক্ষে তো সবই সম্ভব। তদুপরি আসমানের দরজা আছে বলে মেনে নিলে বিদীর্ণ হওয়া বা ছিদ্র করার প্রশ্নও উত্থাপিত হয় না। মে'রাজের বর্ণনা সম্বলিত হাদীছে প্রত্যেক আসমানে গিয়ে হযরত জিব্রাঈল (আ.) কর্তৃক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিচয় প্রদান এবং তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে মর্মে অবগতি প্রদানের পর খুলে দেওয়ার কথা (ففتح لنا) বর্ণিত আছে, যা আসমানের দরজা থাকার দিকে ইংগিত বহন করে।

আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকেও মে'রাজ অসম্ভব মনে হতে পারে। কারণ:

১. বিজ্ঞানে এখনও আসমানের অস্তিত্ব আছে বলে প্রমাণিত হয়নি।
২. এ পৃথিবীর উপরে যে বায়ুর স্তর আছে তার উচ্চতা মাত্র ৫২ মাইল। এর উপরে কোন বায়ুর স্তর নেই। অতএব সেখানে কোন প্রাণীর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।
৩. প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে বায়ুর স্তরের উর্ধ্বে শৈত্যমণ্ডল অবস্থিত। প্রাচীন বিজ্ঞানীদের মতে আরও রয়েছে অগ্নিমণ্ডল। মে'রাজে যেতে হলে উল্লেখিত দুটো স্তর অতিক্রম করে যেতে হবে। অথচ এ স্তরে জড়দেহ বিশিষ্ট কোন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।
৪. মাধ্যাকর্ষণের যুক্তি দিয়েও কেউ কেউ মে'রাজে স্বশরীরে গমনকে অসম্ভব বলেছিল।

প্রথম কারণ হিসাবে উল্লেখিত কথার উত্তর হল– আকাশের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি বলেই তার অস্তিত্ব নেই বলা অবৈজ্ঞানিক। কোন কিছু দৃষ্টির অধিগম্য না হওয়ায় সেটার অস্তিত্বকে অস্বীকার করলে মহা বিশ্বের অনেক কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে হবে। এমন অনেক কিছু আছে যা আমরা দেখতে পাই না।

দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ কারণের উত্তর হল– এখন উর্দ্ধ জগতে বিজ্ঞানীদেন গমন এসব প্রশ্নকে অবান্তর প্রমাণিত করেছে। এরপরও স্বশরীরে মে'রাজে গমনকে অস্বীকার করা হলে তা সত্যের প্রতি বিদ্বেষ বলেই প্রমাণিত হবে।[১]

আল্লাহ্‌র দীদার সম্বন্ধে আকীদা

দুই ধরনের দীদার প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েছে। যথা:–

১. মে'রাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দীদার

মে'রাজে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করেছিলেন কি না– এ ব্যাপারে চারটা মত পাওয়া যায়।

১. দীদার হয়নি। এটা হযরত আয়েশা (রা.)-এর মত। হযরত ইব্‌নে মাসঊদ ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর প্রসিদ্ধ মতও এটাই। হযরত মাছরুক থেকে বর্ণিত আছে,

১. উপরোক্ত ৪টি প্রশ্নের বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক উত্তরের জন্য কবি গোলাম মোস্তফা রচিত বিশ্বনবী–র দ্বিতীয় খণ্ড দেখা যেতে পারে।

قَالَ لِعَائِشَةَ رضـ. : هَل رَأى مُحَمَّدٌ رَبَّه؟ قَالَتْ : لَقَدْ قَفَّ شَعْرِيْ مِمَّا قُلْتَ، مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأي رَبَّه فَقَدْ كَذَبَ. قَالَ : فأَيْنَ قَوْلُه تَعَالٰى : (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى. الآيات)؟ قَالَتْ : ذٰلِكَ جِبْرِيْلُ كَانَ يَأتِيْهِ فِيْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ وَاَتَاهُ هٰذه الْمَرَّةَ فِيْ صُوْرَتِه الَّتِيْ هِيَ صُوْرَتُه فَسَدَّ الْأُفُقَ. (رواه البخاري ومسلم)

অর্থাৎ, তিনি হযরত আয়শা (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন– মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি তাঁর রবকে দেখেছিলেন? আয়শা (রা.) জওয়াবে বললেন, তোমার কথায় আমার লোম খাড়া হয়ে গিয়েছে। যে তোমাকে বলেছে, মুহাম্মাদ তাঁর রবের দর্শন লাভ করেছেন সে মিথ্যা বলেছে। ...। (বোখারী ও মুসলিম)

২. আল্লাহর দীদার হয়েছে কল্‌ব তথা অন্তর দ্বারা। এটা হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.)-এর একটি মত। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত,

إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَبَّه مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِبَصَرِه وَمَرَّةً بِفُؤَادِه. (رواه الطبراني فى الأوسط ورجاله وجال الصحيح خلا جهور بن منصور الكوفي، وجهور بن منصور ذكره ابن حبان فى الثقات. كذا في مجمع الزوائد ج/١ في باب في الرؤية.)

অর্থাৎ, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রবকে দু'বার দেখেছেন। একবার দেখেছেন চোখ দ্বারা আর একবার দেখেছেন অন্তর দ্বারা। (তাবারানী)

৩. তিনি আল্লাহকে দেখেছেন স্বচক্ষে। এটা হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.)-এর প্রসিদ্ধ মত। শায়খ আবুল হাসান আশআরীর মতও এই। আল্লামা নববী মুসলিম শরীফের শরাহ্-র মধ্যে বলেন, এটাই অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের নিকট প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

৪. আল্লাহর দীদার হয়েছিল কি না এ ব্যাপারে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা। এটাস-ঈদ ইব্‌নে জুবায়ের (রহ.)-এর মত। আল্লামা তাফতাযানী শরহে আকাইদ গ্রন্থে এ মতকেই চয়ন করেছেন। তার কারণ এই– (১) হাদীছ দ্বারা এটা সমর্থিত, (২) হাদীছের কোন স্পষ্ট ভাষ্য চাক্ষুষ দেখার ব্যাপারে স্পষ্ট নয়। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি সম্ভবত তাঁর এজতেহাদ। আর হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ–

رَاَيْتُ رَبِّيْ مُشَافَهَةً لَا شَكَّ فِيْه.

অর্থাৎ, আমি আমার রবকে সামনা সামনি দেখেছি এতে কোন সন্দেহ নেই।– এ হাদীছের ছুবূতের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে।[১]

১. ماخوذ من النبراس وغيره- উল্লেখ্য– গাউছুল আযম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর নামে প্রচলিত "গুনিয়াতুত তালিবীন" গ্রন্থে এ হাদীছটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিন্তু গুনিয়াতুত তালিবীন-এর বর্ণনা দ্বারা ধোকায় পতিত হওয়া ঠিক নয়। এটি মূলত হযরত গাউছুল আযমের লিখিত গ্রন্থ নয়। তাঁর প্রতি এর সম্বন্ধকরণ সহীহ নয়। এর মধ্যে প্রচুর মওযূ' (জাল) হাদীছ রয়েছে।

২. পরকালে আল্লাহ্র দীদার

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট জান্নাতে আল্লাহ্র দীদার লাভ হবে। প্রত্যেকে তার আমল অনুযায়ী আল্লাহ্র দীদার লাভ করবে। কেউ সর্বদা আল্লাহ্র জামাল ও সৌন্দর্য প্রত্যক্ষকরণে ডুবে থাকবে। আবার কেউ জীবনে একবার দীদার লাভ করবে। সহীহ মত অনুযায়ী নারীগণও দীদার লাভ করবেন।[১] জান্নাতে আল্লাহ্র দীদার লাভ হওয়ার দলীল–

(১) কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

অর্থাৎ, সেদিন বহু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। (সূরা: ৭৫-কিয়ামা: ২২-২৩)

(২) বোখারী ও মুসলিমের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا. (رواه الشيخان)

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে প্রকাশ্যভাবে।

মুতাযিলাগণ আল্লাহ্র দীদার সম্ভব নয় বলে মত পোষণ করেন। তাদের আক্লী (যুক্তিগত) দলীল হল কোন কিছু দেখার জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি শর্ত রয়েছে।

১. যা দেখা হবে তা কোন নির্দিষ্ট স্থানে থাকতে হবে।
২. সেটা নির্দিষ্ট কোন দিকে থাকতে হবে।
৩. সেটা যে দেখবে তার সামনে থাকতে হবে।
৪. দ্রষ্টা ও দৃশ্য বস্তুর মধ্যে খুব বেশি দূরত্ব বা খুব বেশি নৈকট্য কোনটাই থাকতে পারবে না।
৫. দৃশ্য বস্তু পর্যন্ত দৃষ্টির জ্যোতি পৌঁছতে হবে।

এ সমস্ত শর্ত আল্লাহ্কে দর্শনের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত বিধায় আল্লাহ্কে দেখা সম্ভব নয়। এর জওয়াব হল– দর্শনের এসব শর্ত দৈহিক দর্শনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর আল্লাহ তাআলা এরূপ দৈহিক বিশেষণ থেকে পবিত্র। অতএব তাঁকে দর্শনের ক্ষেত্রে এসব শর্ত কার্যকরী নাও থাকতে পারে। তদুপরি জান্নাতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে এমন দৃষ্টিশক্তি দান করবেন যা এসব শর্ত ছাড়াও দেখতে সক্ষম হবে।

মুতাযিলাদের প্রথম নক্লী (বর্ণনাজাত) দলীল হল–

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ.

অর্থাৎ, তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন কিন্তু দৃষ্টি তাঁর অধিগম্য। (সূরা: ৬-আনআম: ১০৩)

এর জওয়াব হল– এখানে সব দৃষ্টির কথা বলা হয়নি, কিছু দৃষ্টি এর থেকে ব্যতিক্রম রয়েছে। কিংবা বলা হবে, এখানে সব স্থান ও সব সময়ের কথা বলা হয়নি।

১. عقائد الاسلام . عبد الحق حقانی

কিংবা বলা হবে এখানে এদরাক (ادراک) অর্থাৎ, বেষ্টন করা বা সম্যকভাবে দেখা না যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, মোটেই দেখা যায় না তা বলা হয়নি।

মুতাযিলাদের দ্বিতীয় নক্লী দলীল হল–

قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ.

অর্থাৎ, সে (মূসা) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব। তিনি বললেন, তুমি কোনক্রমেই আমাকে দেখতে পাবে না। (সূরা: ৭-আ'রাফ: ১৪৩)

এর জওয়াব হল, হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় হটকারিতা পূর্বক আল্লাহ তাআলাকে দেখতে চেয়েছিল, তাই তাদেরকে দর্শন দেয়া হয়নি। তদুপরি হযরত মূসা (আ.)-এর আবেদনই একথা বোঝায় যে, আল্লাহ্ তাআলার দর্শন সম্ভব; নতুবা আল্লাহ্র নবী অসম্ভব জিনিসের আবেদন করতেন না বরং শুরু থেকেই বলে দিতেন যে, আল্লাহ্র দীদার সম্ভব নয়।

আরশ কুরছী সম্বন্ধে আকীদা

'আরশ' অর্থ চেয়ার বা আসন। আল্লাহ যেমন, তাঁর আরশ এবং কুরছীও তেমনই শানের হয়ে থাকবে। সপ্তম আসমানের উপর আরশ ও কুরছী অবস্থিত। হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী আরশ কুরছী এত বিশাল যে, তা সমগ্র আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ পাক কোন মাখলূকের ন্যায় উঠা-বসা করেন না এবং তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নন। মাখলূকের কোন কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের সাথে আল্লাহর কোন কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের তুলনা বা সাদৃশ্য হয় না। তারপরও তাঁর আরশ কুরছী থাকার কী অর্থ, তা অনুধাবন করা মানব জ্ঞানের উর্ধ্বে। আমাদেরকে শুধু আরশ কুরছী সম্বন্ধে আকীদা-বিশ্বাস রাখতে হবে।

সাহাবায়ে কেরাম সম্বন্ধে আকীদা

* "সাহাবা" (صحابہ) শব্দটি "সাহিব" (صاحب) শব্দের বহুবচন। একবচন হিসেবে "সাহাবী" শব্দটিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাহাবী বলা হয়–

من لقي النبي صلى الله عليه و سلم مسلما و مات على إسلامه. (مدريب الراوي ج/٢)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুসলমান অবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাক্ষাত পেয়েছে এবং মুসলমান অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে।

* সমস্ত নবী রসূলের পর উম্মতের মধ্যে খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণের মর্যাদা সর্বাধিক।

* সকল সাহাবী আদিল অর্থাৎ, নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী, মুত্তাকী-পরহেযগার, ন্যায়পরায়ণ এবং ইসলাম ও উম্মতের স্বার্থকে উর্ধ্বে স্থান দানকারী। প্রত্যেক সাহাবীর মধ্যে হেদায়েতের নূর এবং আলো রয়েছে, কারও মধ্যে অন্ধকার নেই।

* সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত ও ভক্তি শ্রদ্ধা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্যতম শি'আর বা প্রতীক। সাহাবায়ে কেরামকে ভালবাসা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই ভালবাসা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اللهَ اللهَ فِيْ أَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذُوْ هُمْ غَرَضًا بَعْدِيْ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ أَبْغَضَهُمْ. الحديث. (رواه الترمذي في أبواب لمناقب– في من سب أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و قال : هذا حديث غريب. قلت : ومعنى الحديث مؤيد بأحاديث صحيحة.)

অর্থাৎ, তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর, তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর! আমার পরে তোমরা তাঁদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিও না। বস্তুত যে তাঁদেরকে ভালবাসল, সে আমার প্রতি ভালবাসার কারণেই তাঁদেরকে ভালবাসল, আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখার কারণেই তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল। (তিরমিযী)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পষ্ট ভাষায় সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ করেছেন,

لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِيْ. الحديث. (رواه الترمذي في أبواب لمناقب– في من سب أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و قال : هذا حديث حسن صحيح.)

অর্থাৎ, তোমরা আমার সাহাবীদের সমালোচনা কর না। (তিরমিযী)

শায়েখ শিবলী বলেন,

مَآ اٰمَنَ بِرَسُوْلٍ مَنْ لَّمْ يُوَقِّرْ اَصْحَابَه. (عقائد الإسلام)

অর্থাৎ, যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণকে তা'জীম ও সম্মান করল না, সে প্রকৃতপক্ষে রসূলের প্রতি ঈমান আনেনি।

* যেসব ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দ্বিমত বা বাহ্যিক বিরোধ দেখা দিয়েছে, সেসব ক্ষেত্রেও প্রত্যেক সাহাবী হক ছিলেন। তাঁদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সংঘর্ষের ক্ষেত্রে মানুষ হিসাবে কোন পক্ষের এজতেহাদী ভুল-চুক থাকতে পারে, তবে তাঁরা সেটা ব্যক্তিগত হিংসা-বিদ্বেষ বা ব্যক্তি স্বার্থে করেননি বরং দ্বীনের খাতিরে এবং ইখলাছের সাথেই করেছেন– এই আকীদা বিশ্বাস রাখতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রেও যে কোন একজন বা এক পক্ষের অনুসরণ করলে হেদায়েত, মুক্তি ও নাজাত পাওয়া যাবে। কিন্তু একজনের অনুসরণ করে অন্যজনের দোষ চর্চা করা যাবে না। দোষ চর্চা করা হারাম হবে।

* সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সমস্ত ওলী-আউলিয়ার উর্ধ্বে। উম্মতের সবচেয়ে বড় ওলী (যিনি সাহাবী নন) তার মর্যাদাও একজন নিম্নস্তরের সাহাবীর সমান হতে পারে না বরং সাহাবী আর সাহাবী নন– এমন দুই স্তরের মধ্যে মর্যাদার তুলনাই অবান্তর।

* সমস্ত সাহাবীর মধ্যে চারজন গোটা উম্মতের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম (১) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং তিনি প্রথম খলীফা।

তারপর (২) হযরত ওমর (রা.) এবং তিনি দ্বিতীয় খলীফা। তারপর (৩) হযরত উসমান গনী (রা.) এবং তিনি তৃতীয় খলীফা। তারপর (৪) হযরত আলী (রা.), তিনি চতুর্থ খলীফা।

* খলীফা হওয়ার ক্ষেত্রে উপরোক্ত তারতীব হক ও যথার্থ।

* সকল সাহাবীর প্রতি আল্লাহ্ তাআলা চির সন্তুষ্টির খোশখবরী দান করেছেন। বিশেষভাবে একসঙ্গে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ পূর্বক তাঁদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছেন। উক্ত দশজনকে আশারায়ে মুবাশ্শারাহ্ (সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন) বলা হয়। তাঁরা হলেন– (১) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), (২) হযরত ওমর (রা.), (৩) হযরত উসমান (রা.), (৪) হযরত আলী (রা.), (৫) হযরত তাল্হা (রা.), (৬) হযরত যোবায়ের (রা.), (৭) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.), (৮) হযরত সা'আদ ইব্নে আবী ওয়াক্কাছ (রা.), (৯) হযরত সাঈদ ইব্নে যায়েদ (রা.) এবং (১০) হযরত আবূ উবায়দা ইব্নে জাররাহ (রা.)। এই দশজনের মর্যাদা উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে চার খলীফা ব্যতীত অপর ছয় জনের মর্যাদা চার খলীফার পর।

এছাড়াও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সময় জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

* আশারায়ে মুবাশশারার পর বদরী সাহাবীদের মর্যাদা অধিক। যাদের সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে,

لَعَلَّ اللهَ اَطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. (متفق عليه)

অর্থাৎ, সম্ভবত আল্লাহ তাআলা বদরী সাহাবীদের ব্যাপারে অবগত আছেন, তাই তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

* বদরী সাহাবীদের পর ওহুদ যুদ্ধে শরীক হওয়া সাহাবীদের মর্যাদা। তারপর বাই'আতুর রিদওয়ানে শরীক হওয়া সাহাবীগণের মর্যাদা, যাদের সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ.الآية.

অর্থাৎ, মুমিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বাইআত গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাঁদের অন্তরস্থিত অবস্থা সম্বন্ধে তিনি অবগত ছিলেন। (সূরা: ৪৮-ফাতহ: ১৮)

মর্যাদার ক্ষেত্রে উল্লেখিত সাহাবীগণের মধ্যকার উপরোক্ত তারতীব বা বিন্যাস উম্মতের সর্বসম্মত বিষয়।[১] অতপর সকল সাহাবীর মর্যাদা তাঁদের ইল্ম ও তাক্ওয়ার তারতম্য অনুসারে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

১. علم الکلام، ادریس کاندھلوی

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقٰكُمْ .

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের মধ্যে যে অধিক তাক্ওয়ার অধিকারী, সে আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানী। (সূরা: ৪৯-হুজুরাত: ১৩)

* প্রত্যেক সাহাবী সত্যের মাপকাঠি। ঈমান ও আমল সবক্ষেত্রে তাঁরা মাপকাঠি। সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ঈমানের কষ্টিপাথর, যার নিরিখে অবশিষ্ট সকলের ঈমান পরীক্ষা করা হবে। আমল এবং দ্বীনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁরা মাপকাঠি। সাহাবায়ে কেরাম হকের মাপকাঠি, তাঁদের নিরিখে নির্ণিত হবে পরবর্তীদের হক বা বাতিল হওয়া।

ঈমানের ক্ষেত্রে তাঁদের মাপকাঠি হওয়ার দলীল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত–

اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ.

অর্থাৎ, তোমরা ঈমান আনয়ন কর এই লোকেরা (সাহাবীরা) যেমন ঈমান এনেছে। (সূরা: ২-বাকারা: ১৩)

অন্য আর এক আয়াতে বলা হয়েছে,

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَاۤ اٰمَنْتُمْ بِه فَقَدِ اهْتَدَوْا .

অর্থাৎ, তাঁরা (সাহাবীগণ) যেমন ঈমান এনেছে, তারা যদি তদ্রূপ ঈমান আনে, তাহলে নিশ্চিত তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হল। (সূরা: ২-বাকারা: ১৩৭)

আমলের ক্ষেত্রে তাঁদের মাপকাঠি হওয়ার দলীল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত–

وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّه مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِه جَهَنَّمَ.

অর্থাৎ, কারও নিকট সৎপথ প্রকাশ পাওয়ার পর সে যদি এই রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং এই মুমিনদের (সাহাবীদের) পথ (মাসলাক/আমল) ব্যতীত অন্য পথ (মাসলাক/আমল) অনুসরণ করে, তাহলে যেদিকে সে ফিরে যায়, সেদিকে তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। (সূরা: ৪-নিসা: ১১৫)

* আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল– সকল সাহাবী সমালোচনার উর্ধ্বে। তাঁদেরকে দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে মনে করা বিধেয়। তাঁদের ভাল আলোচনা করা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নীতি। شرح الفقه الأكبر গ্রন্থে আছে–

اعتقاد أهل السنة والجماعة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم كما أثنى الله تعالى ورسوله عليهم. (صفحه/٢١–٢٠)

অর্থাৎ, আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল- সকল সাহাবীর পবিত্রতা বর্ণনা করা এবং তাঁদের প্রশংসা করা, যেমন আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল তাঁদের প্রশংসা করেছেন।

* সাহাবীদের প্রতি মহব্বত রাখা ওয়াজিব। তাঁদের সমালোচনা করা, দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা গোমরাহী এবং সম্পূর্ণ অমার্জনীয় অপরাধ। সাহাবীদের সমালোচনাকারী-রা ফাসেক, ফাজের ও গোমরাহ্।

বি: দ্র: সাহাবীগণের সত্যের মাপকাঠি হওয়া এবং তাঁদের সমালোচনার উর্ধ্বে হওয়া প্রসঙ্গে ২য় খণ্ডে "সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা: তাদের আদালত ও সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রসঙ্গ" শিরোনামে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ পেশ করা হয়েছে।

রসূল (সা.)-এর বিবিগণ ও আওলাদ সম্বন্ধে আকীদা

* নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আহ্লে বায়ত ও তাঁর বিবিগণের প্রতি আযমত ও মহব্বত ঈমানের দাবী।

* সাইয়্যেদা হযরত ফাতেমা (রা.) জান্নাতের সমস্ত মহিলাদের সর্দার।

* হযরত ফাতেমা (রা.)-এর পর হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) এবং তাঁরপর হযরত আয়েশা (রা.)-এর মর্যাদা। তারপর অন্য আযওয়াজে মুতাহ্হারাত সমস্ত দুনিয়ার নারীদের চেয়ে মর্যাদাবান।

* অন সাহাবীদের স্ত্রীদের ব্যাপারে তাদের মর্যাদা অনুসারে বিশ্বাস রাখতে হবে।[১]

কেয়ামতের আলামত সম্বন্ধে আকীদা

কুরআন ও হাদীছ দ্বারা জানা যায়, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে দুই প্রকারের আলামত প্রকাশ পাবে। (১) علامت صغرى বা ছোট আলামত (২) علامت كبرى বা বড় আলামত। বড় আলামতগুলো কেয়ামতের খুবই কাছাকাছি সময়ে প্রকাশ হবে। এগুলোকে اشراط ساعت বা কেয়ামতের আলামত বলে। এসব আলামতকে সত্য-সঠিক জানা এবং তার উপর ঈমান রাখা জরুরী।

কেয়ামতের ছোট ছোট আলামত দেখে বোঝা যাবে কেয়ামত তথা দুনিয়ার ধ্বংস হওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। এই সব আলামতের মধ্যে রয়েছে:

১. কেয়ামতের ছোট আলামতগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম হল আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আবির্ভাব। এ জন্যই পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লকব বা উপাধি ছিল نبى الساعة অর্থাৎ, কেয়ামতের নবী।
২. তারপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অব্যবহিত পর মুরতাদ হওয়ার ফিতনা فتنۂ ارتداد। যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকা-লের অব্যবহিত পর সংঘটিত হয়েছিল। অতঃপর কেয়ামতের বহু ছোট ছোট আলামত প্রকাশ পাবে। তার মধ্যে রয়েছে:
৩. ইল্ম উঠে যাওয়া।
৪. যেনা ও মদ্যপান বেড়ে যাওয়া। এমনকি প্রকাশ্যে জনসম্মুখে অশ্লীল কাজ হতে থাকবে।
৫. নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া। এমনকি পঞ্চাশজন নারীর তত্ত্বাবধানকারী হবে একজন পুরুষ।
৬. লোকেরা ওয়াক্ফ ইত্যাদি খোদায়ী মালকে নিজের মালের মত মনে করে ভোগ করতে থাকবে।

---

১. علم الكلام، ادريس كاندهلوى

৭. যাকাত দেয়াকে দণ্ড স্বরূপ মনে করবে।
৮. আমানতের মালকে নিজের মাল মনে করে তাতে হস্তক্ষেপ করবে।
৯. পুরুষ স্ত্রীর তাবেদারী করবে।
১০. মায়ের নাফরমানী করবে।
১১. পিতাকে পর মনে করবে।
১২. বন্ধু-বান্ধবকে আপন মনে করবে।
১৩. খারাপ ও বদ লোকেরা রাজত্ব ও সরদারী করবে।
১৪. অযোগ্য লোকেরা বিভিন্ন কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে।
১৫. লোকেরা জুলুমের ভয়ে জালেমের তাজীম-সম্মান করবে।
১৬. নাচ, গান ও বাদ্য বাজনার প্রচলন খুব বেশি হবে।

ইত্যাদি। বিভিন্ন হাদীছে এ বিষয়গুলো কেয়ামতের আলামত হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

কুরআন ও হাদীছে কেয়ামতের কিছু বড় বড় আলামত বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোকে "আলামতে কুবরা" (علامت کبری) বা বড় বড় আলামত বলা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১. হযরত মাহ্দীর আবির্ভাব,
২. দাজ্জালের-আবির্ভাব,
৩. আকাশ থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর দুনিয়াতে অবতরণ,
৪. ইয়াজূজ-মাজূজের আবির্ভাব,
৫. দাব্বাতুল আরদ-এর বহিঃপ্রকাশ,
৬. দাব্বাতুল আরদের বহিঃপ্রকাশের কিছুকাল পর একটা ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হওয়া।
৭. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়,
৮. তিনটা বিরাটাকারের ভূমিধস,
৯. আকাশ থেকে এক ধরনের ধোঁয়া প্রকাশ পাওয়া ও
১০. ইয়ামান থেকে (বা এডেনের এক গুহা থেকে) একটা বিশেষ আগুন প্রকাশ পাওয়া ইত্যাদি।

হযরত মাহ্দীর আবির্ভাবের পর থেকে কেয়ামতের উপরোক্ত বড় বড় আলামত জাহির হওয়া শুরু হবে। হযরত হুযাইফা ইবনে আসীদ গিফারী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষদভাবে সেগুলোরই বর্ণনা প্রদান করেছেন।

عَنْ أَبِيْ سَرِيْحَةَ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيْدٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلُ مِنْهُ فَاطَّلَعَ إِلَيْنَا فَقَالَ ك مَا تَذْكُرُوْنَ؟ قُلْنَا : نَذْكُرُ السَّاعَةَ. قَالَ : اِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُوْنُ حَتّٰى تَكُوْنَ عَشْرُ آيَاتٍ : خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَالدُّخَانُ،

وَالدَّجَّالُ، وَ دَابَّةُ الْأَرْضِ، وَيَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ، وَ طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ– وَفِيْ رِوَايَةٍ وَنُزُوْلُ عِيْسٰى بْنِ مَرْيَمَ– وَرِيْحٌ تُلْقِى النَّاسَ فِى الْبَحْرِ. (رواه مسلم في باب الفتن وأشراط الساعة)

হযরত মাহ্দী সম্বন্ধে আকীদা

কেয়ামতের পূর্বে প্রকাশিত বড় বড় আলামতের মধ্য থেকে প্রথম আলামত ইমাম মাহ্দী-এর আত্মপ্রকাশ। "আল-আকীদাতুস সাফারীনিয়্যাহ" গ্রন্থকার মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আস-সাফারীনী, সুয়ূতী, কাজী শওকানী প্রমুখ মাহদী সম্পর্কিত হাদীছকে মুতাওয়াতির (متواتر معنوی) বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেয়ামতের ছোট ছোট আলামত প্রকাশিত হওয়ার পর একটা সময় এমন আসবে, যখন কাফেরদের প্রভাব খুব বেশি হবে, চতুর্দিকে নাসারাদের রাজত্ব কায়েম হবে, খায়বারের নিকট পর্যন্ত নাসারাদের আমলদারী হবে। এমন সময় মুসলমানগণ তাদের বাদশা বানানোর জন্য হযরত মাহ্দীকে তালাশ করবেন এবং এক পর্যায়ে কিছুসংখ্যক নেক লোক মক্কায় বায়তুল্লাহ শরীফে তওয়াফরত অবস্থায় হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে তাঁকে চিনতে পারবেন এবং তার হাতে বায়'আত করে তাঁকে খলীফা নিযুক্ত করবেন। এ সময় তাঁর রয়স হবে ৪০ বৎসর। ঐ সময় একটি গায়েবী আওয়াজ আসবে যে,

هٰذَا خَلِيْفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ فَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا.

অর্থাৎ, "ইনিই আল্লাহর খলীফা–মাহ্দী। তোমরা (তাঁর কথা) শোন এবং (তাঁর) আনুগত্য কর।" তাবারানী (مسند الشاميين رقم ٩٣٧)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এ ঘোষণাকারী হবেন একজন ফেরেশতা।

মাহ্দী শব্দের শাব্দিক অর্থ হেদায়েতপ্রাপ্ত। এ অর্থের দিক থেকে সকল হক্কানী আলেম ও পরহেযগার মুসলমানকেও মাহ্দী বলা যেতে পারে। কিন্তু যে মাহ্দীর আগমনের কথা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন তিনি হবেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সেই মাহ্দীর নাম হবে মুহাম্মাদ। তাঁর পিতার নাম হবে আবদুল্লাহ। তিনি ফাতেমা (রা.)-এর বংশোদ্ভুত অর্থাৎ, সাইয়্যেদ বংশীয় হবেন। তিরমিযী ও আবূ দাউদ শরীফের নিম্নোক্ত দুটো হাদীছে এ বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ يُوَاطِئُ اِسْمُه اِسْمِيْ. (رواه الترمذى في ابواب الفتن باب ماجاء في المهدي وقال : هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود في أول كتاب الفتن يُوَاطِئُ اِسْمُه اِسْمِيْ وَاسْمَ أَبِيْهِ اِسْمَ أَبِيْ يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا.)

এ হাদীছদ্বয়ের সারকথা হল– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনি আমার বংশোদ্ভুত হবেন, আরবদের কতৃত্ব করবেন, তার নাম হবে আমার নাম,

তার পিতার নাম নাম হবে আমার পিতার নাম, তিনি রাজ্যে বিরাজমান জুলুম ও বে-ইনসাফী দূর করে সেখানে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবেন।

মদীনা তাঁর জন্মস্থান হবে। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস হিজরত করবেন। তাঁর দৈহিক গঠন ও আখলাক-চরিত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুরূপ হবে। তিনি নবী হবেন না, তাঁর উপর ওহীও নাযিল হবে না। মক্কায় তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। ইরাক ও সিরিয়ার ওলী-আবদাল তাঁর হাতে বায়'আত হবেন। কাবা ঘরের নিচে যে সম্পদ সঞ্চিত ও রক্ষিত আছে তিনি তা বের করে মুসলমানদের মাঝে বিতরণ করবেন। তিনি মুসলমানদের খলীফা হবেন। প্রথমে শুধু আরবের এবং পরবর্তীতে সমগ্র বিশ্বের খলীফা হবেন। সারা দুনিয়ায় ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করবেন। অবশ্য তার পূর্বে দুনিয়া অন্যায়-অবিচারে, জুলুম-নির্যাতনে পিষ্ট হতে থাকবে। মুহাম্মাদী শরীআত অনুযায়ী তার কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। তিনি আধিপত্য বিস্তারকারী নাসারাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করবেন এবং তাদের দখল থেকে শাম, কনষ্ট্যান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) প্রভৃতি অঞ্চল জয় করবেন। তাঁর যুগেই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে।

হযরত মাহ্দীর শাসনামলেই একদিন হযরত ঈসা (আ.) ফজরের নামাযের সময় দামেস্কের এক মসজিদের পূর্ব দিকের মিনারার নিকট (অনেকের ব্যাখ্যা হল বায়তুল মুকাদ্দাসে। এ সম্বন্ধে আরও দেখুন ১৬৫ নং পৃষ্ঠার টীকা।) আসমান থেকে অবতরণ করবেন। এবং হযরত মাহ্দী (আ.)-এর পিছনে মুক্তাদী হয়ে নামায আদায় করবেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমন ও দাজ্জালের ধ্বংস হওয়ার কিছুকাল পর তিনি ইন্তেকাল করবেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত শেষ যমানায় হযরত মাহ্দীর আগমনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং এর উপর বিশ্বাস রাখা জরূরী মনে করে। কারণ, হযরত মাহ্দীর আগমনের বিষয়টি মুতাওয়াতির হাদীছ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। যদিও বা কিছু বিবরণ خبر واحد দ্বারা প্রমাণিত। "আল-আকীদাতুস সাফারীনিয়্যাহ" গ্রন্থকার মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আস-সাফারীনী, সুয়ূতী, কাজী শওকানী প্রমুখ মাহদী সম্পর্কিত হাদীছসমূহকে মুতাওয়াতির (متواتر معنوی) বলে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত মাহ্দীর আগমনের বার্তা সাহাবা ও তাবেয়ীন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল প্রান্তে, সকল যুগে, সর্বস্তরের উলামা, সুলাহা, আম-খাছ মুসলমান বর্ণনা করে আসছেন! শায়খ জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রহ.) হযরত মাহ্দী সম্বন্ধে একটি কিতাব রচনা করেন, যাতে এ বিষয়ের সমস্ত হাদীছ ও সাহাবীদের মতামত একত্র করেছেন। সে কিতাবের নাম العرف الوردي في أختار المهدي। আল্লামা সাফারিনী (রহ.) شرح عقيده سفارينيه কিতাবের ২য় খণ্ডের ৬৭ নং পৃষ্ঠায় উক্ত কিতাবের সমস্ত হাদীছের সংক্ষিপ্তসার এক বিশেষ ধারায় বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আলামত সম্বলিত একটি পুস্তিকা লিখেছেন যাতে তিনি দুইশতের মত আলামত উল্লেখ করেছেন।

মিথ্যা মাহ্দী দাবীদারদের প্রসঙ্গ

হাদীছে প্রতিশ্রুত মাহ্দী এর পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য সবিস্তারে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও যুগে যুগে অসংখ্য প্রতারক নিজেদেরকে মাহ্দী দাবী করেছে। কিন্তু হাদীছে বর্ণিত মাহ্দীর একটি আলামতও তাদের মাঝে পাওয়া যায়নি। কোন কোন দাবীদার সে আলামতগুলোর মনগড়া ও কাল্পনিক ব্যাখ্যা করে বাস্তব ও সত্য আলামত ত্যাগ করে কাল্পনিক আলামত নিজের মাঝে প্রযোজ্য বলে দেখিয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার! এ তো সে মাহ্দী নয় যার আলামত বার্তা হাদীছে এসেছে। কারণ, এরূপ মাহ্দী দাবীদারদের মাঝে হাদীছে বর্ণিত আলামতগুলোর একটি আলামতও বিদ্যমান নেই; বরং তারা মনগড়া-কাল্পনিক আলামতের আধিকারী স্বঘোষিত মাহ্দী।

এরূপ কাল্পনিক ও মনগড়া আলামত দ্বারা মাহ্দী হওয়ার দাবী যারা করেছে, তাদের মধ্যে একজন হলেন মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী। তিনি শুধু মাহ্দী নয় ঈসা হওয়ার দাবীও করেছিলেন। অতঃপর নিজের মাঝে ঈসা ও মাহ্দী হওয়ার কোন একটি আলামতও দেখাতে না পেরে পরে দাবী করে বসেন যে, আমি ঈসা এর (مماثل في مشابه) মত-উপমা। কিন্তু তিনি এ দাবীটাও সত্য বলে প্রমাণিত করতে পারেননি।

যুগে যুগে এরূপ আরও অনেকে মাহ্দী হওয়ার দাবী করেছে, কিন্তু হাদীছে বর্ণিত মাহ্দীর একটি আলামতও তাদের মাঝে পাওয়া যায়নি। যার ফলে তারাও ভণ্ড এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে তারাও বোকা ও বিভ্রান্ত।

দাজ্জাল সম্বন্ধে আকীদা

দাজ্জাল শব্দটি আরবী دجل থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ ধোঁকা ও প্রতারণা। অতএব দাজ্জাল (دجال) শব্দের অর্থ প্রতারক, ধোঁকাবাজ। আল্লাহ তাআলা শেষ যমানায় লোকদের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য একজন লোককে প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করবেন। বিভিন্ন সহীহ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী তার এক চোখ কানা আর এক চোখ টেরা থাকবে, চুল কোঁকড়া ও লাল বর্ণের হবে। সে খাটো দেহের অধিকারী হবে। তার কপালে লেখা থাকবে ك ف ر অর্থাৎ, কাফের। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মুমিনই সে লেখা পড়তে পারবে। সে ইয়াহূদী বংশোদ্ভূত হবে। ইরাক ও শাম দেশের মাঝখানে তার আবির্ভাব ঘটবে। তিরমিযী শরীফের এক সহীহ রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী খোরাসানে তার আবির্ভাব হবে।[১] প্রথমে সে নবুওয়াতের দাবী করবে। তারপর ইস্পাহানে যাবে, সেখানে ৭০ হাজার ইয়াহূদী তার অনুগামী হবে, তখন খোদায়ী দাবী করবে। লোকেরা চাইলে সে বৃষ্টি বর্ষণ করে দেখাবে, মৃতকে পর্যন্ত জীবিত করে দেখাবে। কৃত্রিম বেহেশ্ত দোযখ তার সঙ্গে থাকবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার বেহেশ্ত হবে দোযখ আর তার দোযখ হবে বেহেশ্ত। সে আরও অনেক অলৌকিক কাণ্ড দেখাতে পারবে, যা দেখে কাঁচা ঈমানের লোকেরা তার দলভুক্ত হয়ে জাহান্নামী হয়ে যাবে। এক ভীষণ ফেৎনা ও এক ভীষণ পরীক্ষা হবে সেটা। দাজ্জাল

১. মূলত এই দুই বর্ণনার মধ্যে কোন সংঘর্ষ নেই। অভ্যুত্থানের পর সে বিভিন্ন স্থানে গমন করবে, সম্ভবত এ হিসাবে বিভিন্ন স্থানকে তার আবির্ভাবের স্থান বলা হয়ে থাকবে।

একটা গাধার উপর সওয়ার হয়ে ঝড়ের বেগে সমগ্র ভূখণ্ডে বিচরণ করবে এবং চল্লিশ দিনের মধ্যে মক্কা, মদীনা ও বায়তুল মুকাদ্দাস ব্যতীত (এসব এলাকায় সে প্রবেশ করতে পারবে না, ফেরেশতাগণ এসব এলাকার পাহারায় থাকবেন।) সবস্থানে ফেৎনা বিস্তার করবে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছে দাজ্জালের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে,

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَالِ نَا حَدَّثَ بِه نَبِيٌّ قَوْمَه اَعْوَرُ وَاَنَّه يَجِئُ مَعَه بِتِمُثَال الْجَنَّةِ وَالنَّار، فَالَّتِيْ نَقُوْلُ : إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّرُ وَإِنِّيْ أُنْذِرُكُمْ بِه كَمَا أَنْذَرَ بِه نُوْحٌ قَوْمَه. (متفق عليه. رواه البخاري فى كتاب الأنبياء باب قول الله عزوجل : (ولقد ارسلنا نوحا الى قومه)، وراه مسلم فى كتال الفتن باب ذكر الدجال.) وفِي رواية منهما مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر. وفِي رواية مسلم عن حذيفة مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأه كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ.

এ হাদীছের সারকথা হল– সব নবীই তাঁদের সম্প্রদায়কে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন। তবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা বিশেষ তথ্য প্রদান করেছেন যে, দাজ্জালের এক চোখ কানা হবে। (অতএব তার খোদা হওয়ার দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা কানা নন।) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দাজ্জালের সঙ্গে কৃত্রিম বেহেশ্ত দোযখ থাকবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার বেহেশ্ত হবে দোযখ আর তার দোযখ হবে বেহেশ্ত। তার কপালে লেখা থাকবে ك ف ر অর্থাৎ, কাফের। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মুমিনই সে লেখা পড়তে পারবে।

হযরত মাহ্দীর সময় তার আবির্ভাব হবে। সে সময় হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং তাঁরই হাতে দাজ্জাল নিহত হবে। আবির্ভাবের পর দাজ্জাল সর্বমোট ৪০ দিন দুনিয়াতে থাকবে।

হযরত ঈসা (আ.)-এর পৃথিবীতে অবতরণ সম্বন্ধে আকীদা

দাজ্জালের বাহিনী বায়তুল মুকাদ্দাসের চতুর্দিক ঘিরে ফেলবে এবং মুসলমানগণ আবদ্ধ হয়ে পড়বে। ইত্যবসরে একদিন ফজরের নামাযের একামত হওয়ার পর হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে ফেরেশতাদের উপর ভর করে অবতরণ করবেন।[১] এবং হযরত মাহ্দী উক্ত নামাযের ইমামতি করবেন। হযরত ঈসা (আ.) দাজ্জালকে

১. মুসলিম শরীফের এক হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী দামেস্কের এক মসজিদের পূর্ব দিকের শুভ্র মিনারার নিকট তিনি অবতরণ করবেন। (رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة –باب ذكر الدجال) মুহাদ্দিছীনে কেরামের অনেকের ব্যাখ্যা হল তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করবেন। অধিকাংশ রেওয়ায়েত থেকে এটাই বুঝে আসে। সেমতে মুসলিম শরীফের উপরোক্ত রেওয়ায়েতের সঙ্গে সংঘর্ষ হবে না এভাবে যে, বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকাকেও এক হিসাবে দামেস্কের অন্তর্ভুক্ত ধরা যায় এবং হতে পারে হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণের পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসেও শুভ্র মিনারা তৈরি হবে।

হত্যা করবেন। তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হযরত ঈসা (আ.) হাতে ছোট একটা বর্শা নিয়ে বের হবেন। তাঁকে দেখেই দাজ্জাল পলায়ন করতে আরম্ভ করবে। হযরত ঈসা (আ.) তার পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং “লুদ”[১] নামক স্থানের প্রবেশদ্বারে গিয়ে তাকে নাগালে পেয়ে বর্শার আঘাতে তাকে বধ করবেন।

মুসলমানদের আকীদা অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.)কে আল্লাহ তাআলা স্বশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন, তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণও করেননি কিংবা ইয়াহূদীরা তাঁকে শূলীতে চড়িয়ে হত্যাও করতে পারেনি। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

وَ مَا قَتَلُوْهُ وَ مَا صَلَبُوْهُ وَ لٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِه مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا.

অর্থাৎ, তারা তাঁকে হত্যাও করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি, কিন্তু তাদের সামনে সদৃশকরণ ঘটানো হয়েছিল।[২] (ফলে তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল।) যারা তাঁর সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা নিশ্চিতই এ ব্যাপারে সন্দেহে ছিল, এ সম্পর্কে অনুমান ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি, বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের নিকট তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী। (সূরা: ৪-নিছা: ১৫৭)

হযরত ঈসা (আ.) আকাশে জীবিত আছেন। দাজ্জালের আবির্ভাবের পর তিনি দুনিয়াতে আগমন করবেন, বিবাহ করবেন, তাঁর সন্তান হবে এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী ৭ বৎসর রাজত্ব পরিচালনা করার পর ইন্তেকাল করবেন। আর এক বর্ণনায় পৃথীবিতে অবতরণের পর হযরত ঈসা (আ.)-এর ৪০ বৎসর অবস্থান করার কথা জানা যায়। হতে পারে হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে তুলে নেয়ার পূর্বের ৩৩ বৎসর ও পরের ৭ বৎসরসহ মোট ৪০ বৎসরকেই এখানে একত্রে বলা হয়েছে। আর এক বর্ণনায় ৪৫ বৎসরের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাঁকে আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযা শরীফের পার্শ্বেই (নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবূ বকর [রা.] ও হযরত ওমর [রা.]-এর মাঝে) দাফন করা হবে। নিম্নোক্ত হাদীছে এ বর্ণনাই প্রদান করা হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : يَنْزِلُ عِيْسٰى بْنُ مَرْيَمَ إِلَى الأَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُوْ لَدُ وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَّأَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوْتُ فَيُدْفَنُ مَعِيْ فِيْ قَبْرِيْ فَاَقُوْمُ أَنَا وَعِيْسٰى بْنُ مَرْيَمَ مِنْ قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبِيْ بَكْرٍ وعُمَرَ. (رواه ابن الجوزي في الوفاء بأحوال المصطفى– أبواب بعثه وحشره وما يجري له [الباب الثاني في حشر عيسى بن مريم نع نبينا])

২. বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে উত্তর দিকে একটি স্থানের নাম “লুদ”।

৩. হযরত ঈসা (আ.)কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আগমনকারী ইয়াহূদীদের একজনকে ঈসা (আ.)-এর রূপ দিয়ে দেয়া হয়। ইয়াহুদীরা তাকেই ঈসা মনে করে শূলে চড়ায়।

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঈসা ইবনে মারইয়াম পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, বিবাহ করবেন, তাঁর সন্তান হবে এবং ৪৫ বৎসর জীবিত থাকবেন। অতঃপর তাঁর ওফাত হবে। তাঁকে আমার সাথে আমার কবরে দাফন করা হবে আর আমি ও ঈসা ইবনে মারইয়াম একই কবর থেকে অর্থাৎ, আবূ বকর ও হযরত ওমর-এর মধ্যস্থিত কবর থেকে উত্থিত হব।

হযরত ঈসা (আ.) নবী হিসাবে আগমন করবেন না বরং তিনি আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত হিসাবে আগমন করবেন এবং এই শরীআত অনুযায়ীই তিনি জীবন যাপন ও খেলাফত পরিচালনা করবেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَنْزِلَ فِيْكُمْ اِبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتّٰى لَا يَقْبَلَه أَحَدٌ. (متفق عليه. وراه البخاري فى باب كسر الصليب وقتل الخيزير برقم ٢٤٧٦ رواه مسلم في كتاب الإيمان– باب نزول عيسى بن مريم برقم ٤٠٦. واللفظ للبخاري)

অর্থাৎ, ঈসা ইব্‌নে মারইয়াম একজন ইনসাফগার শাসক হিসাবে অবতরণ করবেন। অতঃপর তিনি ক্রুশচিহ্নকে ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকরকে বিনাশ করবেন আর জিয্‌য়াকে রহিত করবেন। তখন সম্পদের এরূপ প্রবাহ ঘটবে যে, কেউ তা গ্রহণ করার মত থাকবে না। (মুসলিম)

উল্লেখ্য, মুহাদ্দিছীন ও মুফাসসিরীনে কেরাম হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমন সম্পর্কিত হাদীসসমূহকে মুতাওয়াতির (متواتر معنوی) আখ্যায়িত করেছেন।

ইয়া'জূজ মা'জূজ সম্বন্ধে আকীদা

দাজ্জালের ফেৎনা ও তার মৃত্যুর পর আসবে ইয়া'জূজ ও মা'জূজের ফেৎনা। হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ ও দাজ্জালের ধ্বংস হওয়ার কিছুকাল পর হযরত মাহ্‌দীর ইন্তেকাল হবে। তখন হযরত ঈসা (আ.) রাজত্ব পরিচালনা করতে থাকবেন। এরই মধ্যে এক সময় ইয়া'জূজ মা'জূজের আবির্ভাব হবে।

ইয়া'জূজ মা'জূজের আবির্ভাব কেয়ামতের আলামতসমূহের অন্যতম। এ সম্পর্কে বহু সহীহ রেওয়ায়েত রয়েছে। যেমন মুসলিম শরীফের একটি রেওয়ায়েত নিম্নে প্রদত্ত হল–

قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ اَسِيْدِ الْغِفَارِيْ : أَطْلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ : مَا تَذْكُرُوْنَ؟ فَقُلْنَا : نَذْكُرُ السَّاعَةَ. قَالَ : اِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتّٰى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُوْلَ عِيْسٰى بْنَ مَرْيَمَ، وَيَاْجُوْجَ وَمَاْجُوجَ، وَثَلٰثَةَ خُسُوْفٍ خَسْفٍ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٍ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٍ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَاٰخِرُ ذَالِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ

الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاس اِلَى مَحْشَرِهِمْ وَفِيْ رِوَايَةٍ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ تَسُوْقُ النَّاسَ اِلَى مَحْشَرِهِمْ وَفِيْ رِوَايَةٍ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ تَسُوْقُ النَّاسَ اِلَى الْمَحْشَرِ وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الْعَاشِرَةِ وَرِيْحٌ تُلْقِيْ النَّاسَ فِيْ الْبَحْرِ. الحديث. (رواه مسلم في كتاب الفتن)

ইয়া'জূজ মা'জূজ[১] অত্যন্ত অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মানুষ। তাদের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সমৃদ্ধ মুসলিম শরীফ ও বোখারী শরীফের রেওয়ায়েতসমূহের[২] সারকথা হল– তাদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে। তারা দ্রুত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং ভীষণ উৎপাত শুরু করবে, হত্যা এবং লুটতরাজ চালাতে থাকবে। তখন হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁরসঙ্গীরা তূর পর্বতে আশ্রয় নিবেন। হযরত ঈসা (আ.) ও মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করবেন। আল্লাহ তাআলা মহাম-ারীর আকারে রোগ-ব্যাধি প্রেরণ করবেন। ইয়া'জূজ মা'জূজের গর্দানে এক ধরনের পোকা সৃষ্টি হবে, ফলে অল্প সময়ের মধ্যে ইয়া'জূজ মা'জূজের গোষ্ঠী সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। তাদের অসংখ্য মৃত দেহের দূর্গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। তখন হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের দুআয় আল্লাহ তাআলা এক ধরনের বিরাটকায় পাখী প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় উটের ঘাড়ের মত। তারা মৃতদেহগুলো উঠিয়ে নিয়ে সাগরে বা যেখানে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ফেলে দিবে। তারপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আকাশের এক ধরনের ধোঁয়া সম্বন্ধে আকীদা

হযরত ঈসা (আ.)-এর ইন্তেকালের পর কয়েকজন নেককার লোক ন্যায়পরায়ণতার সাথে রাজত্ব পরিচালনা করবেন। তার পর ক্রমান্বয়ে ধর্মের কথা কমে যাবে এবং

১. তাদের সত্যিকার পরিচয় কি এবং বর্তমানে কোন দেশের কোথায় কিভাবে তারা অবস্থান করে তাদের বর্তমান পরিচয় কি -তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহীগণ মাওলানা হেফজুর রহমান সিওহারবী রচিত "কাছাছুল কোরআন" পাঠ করতে পারেন। সংক্ষেপে এ সম্পর্কে অনেকগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত রয়েছে, যেমন (১) তারা এক বিঘত লম্বা আকৃতির এক অদ্ভূত মাখ্‌লূক। (২) তারা আদম ও হাওয়া উভয়ের বংশধর নয় বরং তারা শুধু হযরত আদম থেকে। তাই তারা হল এক ধরনের বরযখী সৃষ্টি (برزخی مخلوق)। (৩) তারা এমন এক অদ্ভূত প্রাণী, যাদের এক কান হয় উড়না আর এক কান হয় বিছানা। হযরত মাওলানা হেফজুর রহমান সাহেব বলেন, ইত্যাদি অনেকগুলো মত দেখা যায়। এগুলো সব ইসরাঈলী রেওয়ায়েত, যা ভিত্তিহীন। মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের মতে ইয়া'জূজ ও মা'জূজ হল মঙ্গোলিয়ান তাতারীদের একটি জঙ্গলী গোত্র। মা'জূজ (ماجوج)-এর মূল নাম ছিল মগ (موگ), তা থেকে হয়েছে মেগাগ (میگاگ), তা থেকে হয়েছে মা'জূজ (ماجوج)। আর ইয়া'জূজ (یاجوج)-এর মূল নাম ছিল ইউওয়াচী (یواچی), সেখান থেকে হয়েছে ইউয়াজী (یواجی), সেখান থেকে হয়েছে ইউগাগ (یواگاگ), সেখান থেকে হয়েছে ইয়া'জূজ (ياجوج)।محاسن التاويل নামক তাফসীরের কিতাবে আল্লামা জামালুদ্দীন কাসিমী কোন কোন মুহাক্কিক আলেমের বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, কোহেকাফ এলাকার পর্বতমালার পেছনে আকূক (آقوق) ও মাকূক (ماقوق) নামক দুটো গোত্র ছিল, যাদের বংশধর থেকে রাশিয়া এবং এশিয়ার অনেক গোত্র সৃষ্টি হয়েছে। আহলে কিতাবদের কিতাবেও এ দুই গোত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদেরকেই আরবরা ইয়া'জূজ ও মা'জূজ বলে থাকে।

২. رواه البخاري فى كتاب الفتن باب يأجوج وراه مسلم في كتاب الفتن باب ذكر الدجال

চতুর্দিকে বে-দ্বীনী শুরু হবে। এ সময় আকাশ থেকে এক ধরনের ধোঁয়া আসবে, যার ফলে মুমিন মুসলমানদের সর্দির মত ভাব হবে এবং কাফেররা বেহুঁশ হয়ে যাবে। ৪০ দিন পর ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে যাবে। কুরআন শরীফে এই ধোঁয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থাৎ, অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে। (সূরা: ৪৪-দুখান: ১০)

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের আকীদা

তার কিছু দিন পর একদিন হটাৎ একটা রাত তিন রাতের পরিমাণ লম্বা হবে। মানুষ ঘুমাতে ঘুমাতে ত্যক্ত হয়ে যাবে। গবাদি পশু বাইরে যাওয়ার জন্য চিৎকার শুরু করবে। শিশুরাও চিৎকার শুরু করবে। মুসাফিরগণ ভয়াবহ কি ঘটতে যাচ্ছে ভেবে ঘাবড়ে যাবে। তারপর সূর্য গ্রহণের সময়ের মত সামান্য আলো নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। সূর্য মধ্য আকাশ পর্যন্ত এসে আবার আল্লাহর হুকুমে পশ্চিম দিকে গিয়েই অস্ত যাবে। তারপর আবার যথারীতি পূর্বের নিয়মে পূর্বদিক থেকে উদয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যেতে থাকবে। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় কেয়ামতের বড় বড় আলামতসমূহের অন্যতম আলামত। কুরআন শরীফে এই আলামত সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ.الآية.

অর্থাৎ, তারা কি শুধু এরই অপেক্ষা করছে যে, তাদের নিকট আসবে ফেরেশতা কিংবা আসবেন তোমার প্রতিপালক, অথবা আসবে তোমার প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের একটা। (সূরা: ৬-আনআম: ১৫৮)

বোখারী মুসলিমসহ অন্য আরও কিতাবের সহীহ হাদীছসমূহে উল্লেখিত হয়েছে যে, এখানে بعض آيات ربك (তোমার প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের একটা) দ্বারা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়কে বোঝানো হয়েছে।

সহীহ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী (হাদীছটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পর কোন কাফেরের ঈমান আনয়ন ও কোন ফাসেকের তওবা কবূল হবে না। কুরআন শরীফেও এ বক্তব্য রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا.

অর্থাৎ, যেদিন আসবে "তোমার প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের একটি" সেদিন ইতিপূর্বে যে ঈমান আনেনি বা ঈমান অবস্থায় কোন ভাল কাজ করেনি তার ঈমান তার কোন উপকারে আসবে না। (সূরা: ৬-আনআম: ১৫৮)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃত বর্ণিত এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ثَلٰثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا : طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ. (رواه مسلم في كتاب الإيمان– باب بيان الزمن الذي لايقبل فيه الإيمان)

অর্থাৎ, তিনটি জিনিস যখন প্রকাশ পাবে, তখন ইতিপূর্বে যে ঈমান আনেনি বা ঈমান অবস্থায় কোন ভাল কাজ করেনি তার ঈমান তার কোন উপকারে আসবে না। সে তিনটি জিনিস হল: পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, দাজ্জাল ও দাব্বাতুল আর্দ-এর আত্মপ্রকাশ।

দাব্বাতুল আর্দ সম্বন্ধে আকীদা

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের দিন বা একদিন পর[১] মক্কা শরীফের সাফা পাহাড় ফেটে অদ্ভুত আকৃতির এক জন্তু বের হবে। একে বলা হয় দাব্বাতুল আর্দ (ভূমির জন্তু)[২] এ প্রাণীটি মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। সে অতি দ্রুত বেগে সারা পৃথিবী ঘুরে আসবে। সে মু'মিনদের কপালে একটি নূরানী রেখা টেনে দিবে, ফলে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যাবে এবং বে-ঈমানদের নাকের অথবা গর্দানের উপর সীল মেরে দিবে, ফলে তাদের চেহারা মলিন হয়ে যাবে। সে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরকে চিনতে পারবে। এ জন্তুর আবির্ভাব কেয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের অন্যতম। উপরোক্ত বর্ণনা ব্যতীত দাব্বাতুল আর্দের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ইবনে কাছীরে আরও বিভিন্ন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে, যার অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কুরআন শরীফে দাব্বাতুল আর্দের বহিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

وَ اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ.

অর্থাৎ, যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট আসবে, তখন আমি ভূমি থেকে বের করব এক জীব; যা তাদের সাথে কথা বলবে এ জন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে না। (সূরা: ২৭-নাম্‌ল: ৮২)

হাদীছে দাব্বাতুল আর্দের বহিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে এসেছে–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ثَلٰثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا : طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ. (وراه مسلم في كتاب الإيمان– باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিনটি জিনিস যখন প্রকাশ পাবে, তখন ইতিপূর্বে যে ঈমান আনেনি বা ঈমান অবস্থায় কোন ভাল কাজ করেনি তার ঈমান তার কোন উপকারে

১. ইবনে মাজার একটি সহীহ হাদীছে (নং ৪০৬৯) এরূপ বর্ণিত হয়েছে।
২. ~~সাধারণ প্রজনন পদ্ধতির ব্যতিক্রম ভূমি থেকে~~ এর জন্ম হওয়ায় এরূপ নামকরণ হয়ে থাকবে।

আসবে না। সে তিনটি জিনিস হল– পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, দাজ্জাল ও দাব্বাতুল আর্‌দ-এর আত্মপ্রকাশ।

এক ধরনের আগুনের বহিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে আকীদা

কেয়ামতের আলামতসমুহের মধ্যে সর্বশেষ আলামত হল মধ্য ইয়ামান থেকে একটা আগুন বের হবে। যার আলোতে শাম দেশ পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে। এই আগুন মানুষকে বেষ্টন করে হাশরের ময়দানের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে, অর্থাৎ, শাম দেশের দিকে নিয়ে যাবে। দিবা রাত্র কখনই এ আগুন মানুষ থেকে পৃথক হবে না। মুসলিম শরীফে হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে- রসূলুল্লাহ (সা.) কেয়ামতের দশটি আলামত বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে সর্বশেষ আলামত হল এটি। তিনি বলেন,

نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ اِلَى مَحْشَرِهِمْ. وَفِيْ رِوَايَةٍ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ تَسُوْقُ النَّاسَ اِلَى الْمَحْشَرِ. (رواه مسلم في كتاب الفتن)

অর্থাৎ, একটা আগুন বের হবে ইয়ামান থেকে, যা মানুষকে তাদের হাশরের ময়দানের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে- এডেনের এক গুহা থেকে যে আগুন বের হয়ে লোকদেরকে ময়দানে হাশরের দিকে পরিচালিত করবে। (মুসলিম)

ঈছালে ছওয়াব সম্বন্ধে আকীদা

"ঈছালে ছওয়াব" অর্থ ছওয়াব রেছানী বা ছওয়াব পৌঁছানো। মৃত মুসলমানদের জন্য কৃত নামায, রোযা, দান-সদকা, তাসবীহ-তাহলীল, তিলাওয়াত ইত্যাদি শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের ছওয়াব পৌঁছে থাকে। এক মতে ফরয ইবাদতের দ্বারাও ঈছালে ছওয়াব করা যায়। এতে নিজের জিম্মাদারীও আদায় হবে, মৃতও ছওয়াব পেয়ে যাবে।[১]

* মৃতের জন্য জীবিতগণের দুআ ও তাদের উদ্দেশে দান সদকা দ্বারা মৃতগণ উপকৃত হয়ে থাকে। মুতাযিলাগণ এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন এই যুক্তিতে যে, আল্লাহ্‌র ফয়সালার কোন পরিবর্তন ঘটে না, আর মানুষের কৃতকর্ম অনুযায়ী আল্লাহ্‌র ফয়সালা হয়ে থাকে। মানুষ তার নিজের আমলের বিনিময় লাভ করে থাকে, অন্যের আমলের নয়। আমাদের দলীল ঐসব সহীহ হাদীছ, যার মধ্যে মৃতদের জন্য দুআ করার কথা বলা হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতুল বাকীতে উপস্থিত হয়ে তথাকার কবরবাসীদের জন্য এস্তেগ্‌ফার করেছেন এবং বলেছেন, জিব্রীল আমাকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন- এটা সহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।[২]

১. امداد الفتاوی ج /৫ واحسن الفتاوی ج /৪

২. نبراس

জানাযার নামাযে মৃতদের জন্য দুআই করা হয়ে থাকে। এই জানাযার দ্বারা

জানাযা আদায়কারীগণ সুপারিশ করার ক্ষমতা অর্জন করেন– এর দ্বারাও ঈছালে ছওয়াবের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। হাদীছে এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ رضـ مَرْفُوْعًا : لَا يَمُوْتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَتُصَلِّيْ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْا أَنْ يَكُوْنُوْا مِاَةً فَيَشْفَعُوْا لَه إِلَّا شُفِّعُوْا فِيْهِ. (رواه الترمذى في أبواب الجنائز– باب كيف الصلوة على الميت والشفاعة له وقال : هذا حديث حسن صحيح. رواه ابن أبي شيبة برقم ١١٧٤٣)

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কোন মুসলমান মারা গেলে তার উপর মুসলমানদের কিছু লোক -যাদের সংখ্যা শতে উপনিত হয়- জানাযা আদায় করলে ঐ মাইয়্যেতের ব্যাপারে তাদের সুপারিশ কবূল করা হয়। (তিরমিযী ও মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা)

নিম্নোক্ত হাদীছসমূহ দ্বারাও বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে ঈছালে ছওয়াবের বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضـ اَنَّه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : اَلْمَاءُ. فَحَفَر بِيْرًا وَقَال : هٰذِه لِأُمِّ سَعْدٍ. (رواه أبو داود في كتاب الزكوة – باب في فضل سقي الماء)

অর্থাৎ, সা'দ ইব্‌নে উবাদাহ (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ! উম্মে সা'দ ইন্তেকাল করেছে, (তার জন্য) কোন্ সদকা সবচেয়ে উত্তম হবে? তিনি উত্তর দিলেন, পানি। সেমতে তিনি একটি কূপ খনন করে বললেন, এটা উম্মে সা'দের উদ্দেশে। (আবূ দাঊদ)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ. (رواه الترمذي في أبوب الزكوة – باب ما جاء في فضل الصدقة وقال : هذا حديث حسن غريب)

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দান আল্লাহর রোষ প্রশমিত করে এবং মন্দ মৃত্যু রোধ করে। (তিরমিযী)

إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يُعْتِقَانِ عَنْ عَلِيٍّ بَعْدَ مَوْتِه. (رواه ابن أبي شيبة في كتاب الجنائز حديث رقم ١٢٢١٤)

অর্থাৎ, হাছান ও হুসাইন আলী (রা.)-এর মুত্যুর পর তাঁর পক্ষে গোলাম আযাদ করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা)

দুআর মধ্যে ওসীলা প্রসঙ্গে আকীদা

দুআ কবূল হওয়ার জন্য নবীদের বা কোন জীবিত বা মৃত নেককার লোকের ওসীলা দিয়ে কিংবা কোন নেক কাজের ওসীলা দিয়ে দুআ করা জায়েয বরং তা মুস্তাহ-াব। সাম্প্রতিককালে এ বিষয়ে সালাফীগণ ভিন্ন মত পোষণ করছেন। এ প্রসঙ্গে ২য়

খণ্ডে "ওয়াহ্হাবী ও সালাফীগণ" শিরোনামে দলীল-প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

জিন সম্বন্ধে আকীদা

জিনঃ আল্লাহ তাআলা আগুনের তৈরি এক প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন, যারা আমাদের দৃষ্টির অগোচর, তাদেরকে জীন বলে।

* তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ সব রকম হয়। কুরআনে কারীমে জিনদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে,

وَّ اَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَ مِنَّا الْقٰسِطُوْنَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَ اَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.

অর্থাৎ, আমাদের মধ্যে কতক মুসলমান (আত্মসমর্পনকারী) আর কতক সীমালংঘনকারী। (সূরাঃ ৭২-জিন: ১৪)

* তাদের সন্তানাদিও হয়।

* তাদের মধ্যে বেশী প্রসিদ্ধ এবং বড় দুষ্ট হল ইবলীস অর্থাৎ, শয়তান।

* জিন মানুষের উপর আছর করতে পারে। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ.الآية.

অর্থাৎ, যারা সূদ খায়, তারা ঐ ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল বানিয়ে দেয়। (সূরাঃ ২ বাকারা: ২৭৫)

কারামত, কাশ্ফ, ইল্হাম ও পীর-বুযুর্গ সম্বন্ধে আকীদা

নবী-রসূল ব্যতীত আল্লাহ্‌র যেসব খাস বান্দা আল্লাহ্‌র হুকুম এবং নবীজীর তরীকা মত চলেন, নাফরমানী করেন না এবং যারা আল্লাহ্ তাআলাকেই স্বীয় কর্মের অভিভাবক মনে করেন, পরিভাষায় তাদেরকে ওলী/বুযুর্গ বলা হয়। আল্লাহ্ তাআলা কখনো কখনো ওলী/বুযুর্গদের থেকে কারামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। তবে ওলী হওয়ার জন্য কারামত শর্ত নয়।

কারামত-এর আভিধানিক অর্থ হল সম্মান, মর্যাদা, মহত্ত্ব ইত্যাদি। পরিভাষায় কারামত বলা হয়-

ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة.

অর্থাৎ, নবী নন-এমন কোন বুযুর্গ ব্যক্তি থেকে প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম কোন বিষয় সংঘটিত হওয়াকে কারামত বলা হয়।

বুযুর্গ এবং ওলী-আউলিয়ার দ্বারা আল্লাহ তাআলা যেসব অসাধারণ কাজ দেখিয়ে থাকেন, তাকে বলা হয় কারামত। আর জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় তারা যে সব ভেদের কথা জানতে পারেন বা চোখের অগোচর জিনিসকে দেলের চোখে দেখতে পারেন,

তাকে বলা হয় কাশ্ফ ও এল্হাম।

* বুযুর্গদের কারামত ও কাশ্ফ এল্হাম সত্য। কুরআন-হাদীছ দ্বারা কারামত সত্য হওয়া প্রমাণিত।[১] হযরত মারইয়ামের কাছে অমৌসুমী ফল আসা এবং (আসিফ ইবনে বারখিয়া কর্তৃক) মুহূর্তে ইয়ামান হতে বিলকীসের সিংহাসন স্থানান্তরের ঘটনা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। ইরশাদ হয়েছে,

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ. الآية.

অর্থাৎ, যখনই যাকারিয়া তার (মারইয়ামের) কাছে ইবাদতখানায় প্রবেশ করত, তার কাছে পেত আহার্য। সে বলত, হে মারয়াম! এটা কোত্থেকে তোমার কাছে এল? সে বলত, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৩৭)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَه عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِه قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَه قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ.

অর্থাৎ, যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল সে (অর্থাৎ, আসিফ ইবনে বারাখিয়া) বলল, আপনার চক্ষুর পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর যখন সে (সুলাইমান) সেটাকে সম্মুখে অবস্থিত দেখল তখন সে বলল, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। (সূরা: ২৭-নামল: ৪০)

মারইয়াম ও আসিফ ইবনে বারাখিয়া-র ঘটনা মু'জিযা নয়। কেননা, মারইয়াম (আ.) বা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সহচর আসিফ ইবনে বারখিয়া- এ দু'জনের কেউই নবী ছিলেন না। তাই এগুলো পয়গম্বরীর প্রমাণজ্ঞাপক অলৌকিক ঘটনা (মু'জিযা) হতে পারে না। বরং এ হচ্ছে কারামতের অন্তর্ভুক্ত।

আবূ নুআইম ও আবূ ইয়া'লা কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে- হযরত ওমর (রা.) নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে হযরত সারিয়াকে সেনাপতি বানিয়ে প্রেরণ করেন। একদিন কাফেররা পাহাড়িয়া ঘাটিতে ওঁত পেতে থেকে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন হযরত ওমর (রা.) মদীনায় জুমুআর খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি يا سارية الجبل (অর্থাৎ হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখ।) বলে চিৎকার দেন। আল্লাহ তাআলা এই আওয়াজ সারিয়ার সৈন্যবাহিনী পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

* মৃত্যুর পরও কোন বুযুর্গের কারামত প্রকাশিত হতে পারে।

* কারামত ও কাশ্ফ এল্হাম হয়ে থাকে বুযুর্গ এবং ওলীদের দ্বারা। বুযুর্গ এবং ওলী বলা হয় আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাকে। আর শরীআতের বরখেলাফ করে কেউ আল্লাহর

১. মুতাযিলারা কারামতকে অস্বীকার করে।

প্রিয় তথা ওলী বা বুযুর্গ হতে পারে না। অতএব যারা শরীআতের বরখেলাফ করে,

যেমন নামায রোযা করে না, গাঁজা, শরাব বা নেশা খায়, বেগানা মেয়েলোককে স্পর্শ করে বা দেখে, গান-বাদ্য করে ইত্যাদি, তারা কখনও বুযুর্গ নয়। তারা যদি অলৌকিক কিছু দেখায় তাহলে সেটা কারামত নয় বরং বুঝতে হবে হয় সেটা যাদু বা কোনরূপ তুকতাক ও ভেল্কীবাজি, কিংবা যে কোন রূপ প্রতারণা। অনেক সময় শয়তান এসব লোকদেরকে গায়েব জগতের অনেক খবর জানিয়ে দেয়, যাতে করে তাদের মুখে এসব শুনে মূর্খ লোকেরা তাদের ভক্ত হয়ে যায় এবং এভাবে তারা বিভ্রান্তির শিকার হয়। এসব দেখে তাদের ধোঁকায় পড়া যাবে না।

* কাশ্ফ এলহাম কখনও কখনও মিথ্যা তথা বাস্তব পরিপন্থীও হয়ে থাকে। তাই কাশ্ফ ও এল্হাম দলীল (حجت) নয় অর্থাৎ, তার দ্বারা কোন আমল প্রমাণিত হয় না। যদি কাশ্ফ ও এল্হাম শরীআতের মোতাবেক হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য, অদৃশ্য জগতের কোন বিষয় প্রকাশিত হওয়াকে কাশ্ফ বলে। আর এলহাম হল চিন্তা ও চেষ্টা ছাড়াই অন্তরে কোন কথা উদিত হওয়া। (কাশফ, কারামত সম্বন্ধে আরও কিছু কথা দেখুন ২৩১-২৩২ পৃষ্ঠায়।)

* কোন বুযুর্গ বা পীর সম্বন্ধে এই আকীদা রাখা শিরক যে, তিনি সব সময় আমাদের অবস্থা জানেন।

* কোন পীর বা বুযুর্গকে দূর দেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে তিনি জানতে পেরেছেন- এটা শিরক। কোন পীর বুযুর্গ গায়েব জানেন না, তবে কখনও কোন বিষয়ে তাদের কাশ্ফ এল্হাম হতে পারে, তাও আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

* কোন পীর বুযুর্গের মর্যাদা –চাই সে যতবড় হোক– কোন নবী বা সাহাবী থেকে বেশি বা তাঁদের সমানও হতে পারে না।

* কোন আকেল বালেগ কখনও এই স্তরে উপনীত হয় না যে, তার উপর থেকে ইবাদত-বন্দেগী মাফ হয়ে যায়। কেউ আল্লাহ্র ওলী হয়ে গেলেও তার ব্যাপারে এই নীতি প্রযোজ্য। কুরআনে কারীমে হুকুম দিয়ে বলা হয়েছে,

وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ.

অর্থাৎ, ইয়াকীন তথা মৃত্যু আসা পর্যন্ত তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাক। (সূরা: ১৫-হিজ্র: ৯৯)

এ আয়াত দ্বারা যারা বলতে চায় যে, ইয়াকীনের দরজা হাসিল হয়ে গেলে তার ইবাদতের প্রয়োজন থাকে না, তাদের ব্যাখ্যা ভুল। কারণ, সব মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে اليقين (ইয়াকীন) দ্বারা মৃত্যুকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এখানে আমরণ ইবাদতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১]

* বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের নিদর্শন থেকে বরকত লাভ হয়ে থাকে। تبرك بآثار الصالحين বা বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের নিদর্শন থেকে বরকত লাভ দুইভাবে হয়ে থাকে।

১. كذا قاله العلي القاري في شرح الفقه الأكبر

১. তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত বস্তু দ্বারা বরকত লাভ। এটাকে বলা হয় التبرك بالأشياء।

যেমন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চুল মুবারক, তার জুব্বা মুবারক, ইত্যাদি। এমনিভাবে ওলী-আউলিয়ার এ জাতীয় কোন বস্তু।

২. তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ। এটাকে বলা হয় التبرك بالمكان। যেমন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মস্থান, তাঁর উপর প্রথম ওহী আগমন ও তাঁর সুদীর্ঘ ধ্যানমগ্ন থাকার স্থান হেরা গুহা, হাজার বার ওহী আগমনের স্থান খাদীজার গৃহ, হিজরতের সময় তাঁর আত্মগোপন থাকার স্থান গারে ছাওর, দারে আরকাম, আবু বকর, ওমর প্রমুখ সাহাবীর গৃহ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার সম্বন্ধে সালাফী ও গায়রে মুকাল্লিদগণের মতবিরোধ ও তা নিয়ে তাদের বাড়াবাড়ি রয়েছে। ২য় খণ্ডে এ বিষয়ে কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও কিয়াসের দলীল প্রমাণাদি ও সালাফীগণের দলীলের জওয়াবসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন "বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী-আল্লাহদের নিদর্শন থেকে বরকত লাভের প্রসঙ্গ" শিরোনাম।

কারামত ও ইস্তিদ্রাজ-এর মধ্যে পার্থক্য

ইস্তিদ্রাজ-এর আভিধানিক অর্থ কাউকে নিকটে টেনে আনা, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নিত হওয়া, কাউকে ধোকা দেয়া ইত্যাদি। পরিভাষায় কোন কাফের, মুলহিদ, অমুসলিম ব্যক্তি হতে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাকে ইস্তিদরাজ বলে। বস্তুত ইস্তিদ্রাজ হল মন্দ আমলের পরিণাম এবং কারামত হল নেক আমলের পরিণাম। (علم الكلام)

আবদাল, গাউছ, কুতুব ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা

তালীমুদ্দীন কিতাবে আছে, বুযুর্গানে দ্বীন লিখেছেন, মানব জগতে বার প্রকার ওলী বিদ্যমান রয়েছেন। যথা:-

১. কুতুব: তাঁকে কুতবুল আলম, কুত্বুল আকবর, কুত্বুল এরশাদ ও কুত্বুল আক্তাবও বলা হয়। আলমে গায়েবের মধ্যে তাঁকে আবদুল্লাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর দুইজন উযীর থাকেন, যাদেরকে ইমামাইন বলা হয়। ডানের উযীরের নাম আবদুল মালেক এবং বামের উযীরের নাম আবদুর রব। এতদ্ব্যতীত আরও বার জন কুতুব থাকেন, সাতজন সাত একলীমে থাকেন, তাদেরকে কুত্বে বেলায়েত বলা হয়। এই নির্দিষ্ট কুতুবগণ ব্যতীত অনির্দিষ্ট কুতুব প্রত্যেক শহরে এবং প্রত্যেক গ্রামে থাকেন এক এক জন করে।

২. ইমামাইন: ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

৩. গাওছ: গাওছ থাকেন মাত্র একজন। কেউ কেউ বলেছেন, কুতুবকেই গাওছ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, গাওছ ভিন্ন একজন, তিনি মক্কা শরীফে থাকেন।

৪. আওতাদ: আওতাদ চারজন, পৃথিবীর চার কোণে চারজন থাকেন।

৫. আবদাল: আবদাল থাকেন ৪০ জন।

৬. আখ্ইয়ার: তারা থাকেন পাঁচশত জন কিংবা সাতশত জন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তারা ভ্রমন করতে থাকেন। তাদের নাম হুসাইন।
৭. আব্রার: অধিকাংশ বুযুর্গানে দ্বীন আব্দালগণকেই আবরার বলেছেন।
৮. নুকাবা: নুকাবা আলী নামে ৩০০ জন পশ্চিম দেশে থাকেন।
৯. নুজাবা: নুজাবা হাসান নামে ৭০ জন মিসরে থাকেন।
১০ আমূদ: আমূদ মুহাম্মাদ নামে চারজন পৃথিবীর চার কোণে থাকেন।
১১.মুফাররিদ: গাওছ উন্নতি করে ফর্দ বা মুফাররিদ হয়ে যান। আর ফর্দ উন্নতি করে কুতুবুল অহ্দাত হয়ে যান।
১২.মাক্তুম: মাক্তুম শব্দের অর্থ পুশীদা বা লুকায়িত। অর্থ যেমন তারাও তেমনিই পুশিদা থাকেন।

উল্লেখ্য যে, ওলীদের উপরোক্ত প্রকারসমূহের মধ্যে "আবদাল" সম্বন্ধে হাদীছে কিছু বিষয় বর্ণিত হয়েছে। (দেখুন ৩৯৫ পৃষ্ঠা) অবশিষ্টদের সম্বন্ধে বিবরণ কুরআন-হাদীছে আসেনি। হযরত থানবী (রহ.) তালীমুদ্দীন কিতাবে লিখেছেন, "বুযুর্গানে দ্বীনের কাশ্ফের দ্বারা সেসব জানা গিয়েছে। আর কাশ্ফ যার হয় তার জন্য সেটা (শরীআতের খেলাফ না হওয়ার শর্তে) দলীল, অন্যদের জন্য সেটা দলীল হয় না।" তিনি আরও লিখেছেন, "এই ধরনের কাশফী মা'লুমাত হাছিল করে কোনই লাভ নেই।" অতএব এগুলো নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি না করাই শ্রেয়। এসব বিষয় আকীদা সংক্রান্ত আলোচনায় আসারও নয়। কিছু মানুষ এগুলো নিয়ে খুব ঘাটাঘাটি করে বিধায় তাদেরকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে এগুলো আলোচনায় আনা হল।

মাজার সম্বন্ধে আকীদা

"মাজার" শব্দের অর্থ যিয়ারতের স্থান। সাধারণ পরিভাষায় বুযুর্গদের কবর –যেখানে যিয়ারত করা হয়– তাকে 'মাজার' বলা হয়। সাধারণভাবে কবর যিয়ারত দ্বারা বেশ কিছু ফায়দা হয়। যেমন: কল্ব নরম হয়, মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, আখেরাতের চিন্তা বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি। বিশেষভাবে বুযুর্গদের কবর যিয়ারত করলে তাদের রূহানী ফয়েযও লাভ হয়। মাজারের এতটুকু ফায়দা অনস্বীকার্য, এর অতিরিক্ত সাধারণ মানুষ মাজার ও মাজার যিয়ারত সম্পর্কে এমন কিছু গলত ও ভ্রান্ত আকীদা রাখে, যার অনেকটা শির্ক-এর পর্যায়ভুক্ত, যেগুলো অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যেমন:–

মাজার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাসমূহ

১. মাযারে গেলে বিপদ আপদ দূর হয়।
২. মাযারে গেলে আয়-উন্নতিতে বরকত হয়।
৩. মাযারে গেলে ব্যবসা বাণিজ্য বেশি হয়।
৪. মাযারে সন্তান চাইলে সন্তান লাভ হয়।
৫. মাযারে গেলে মকসূদ হাসেল হয়।
৬. মাযারে মান্নত মানলে উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

৭. মাযারে টাকা-পয়সা নযর-নিয়ায দিলে ফায়দা হয়।
৮. মাযারে ফুল, মোমবাতি, আগরবাতি ইত্যাদি দেয়াকে ছওয়াবের কাজ মনে করা ইত্যাদি।

আস্বাব/বস্তুর ক্ষমতা ও প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা

কোন আস্বাব বা বস্তুর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। কোনো আস্বাব বা বস্তুর নিজস্ব ক্ষমতা আছে– এরূপ বিশ্বাস করা শির্ক। বস্তুর মধ্যে যে ক্ষমতা দেখা যায় বা বস্তু থেকে যে প্রভাব প্রকাশ পায় তা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত, তার নিজস্ব ক্ষমতা নয়। তাই আল্লাহ ক্ষমতা না দিলে কিংবা তার স্বাভাবিক কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে না– আল্লাহ পাকের এরূপ ফয়সালা হলে বস্তুর স্বাভাবিক ক্ষমতাও প্রকাশ পায় না। বস্তু সম্বন্ধে এ হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা। এ সম্পর্কিত তাফসীল নিম্নরূপ–

আসবাব প্রথমত দুই ধরনের। যথা:–

১. পার্থিব

পার্থিব কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-মুসীবত দূর করার জন্য বা পার্থিব কোন উদ্দেশ্য হাছিল করার জন্য যে আসবাব বা উপায় উপকরণ গ্রহণ কিংবা যে চেষ্টা-তদবীর করা হয়ে থাকে তা তিন প্রকারো। এই তিন প্রকার এবং তার হুকুম এক রকম নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন। যথা:

(১) আসবাব যদি স্বাভাবিকভাবে নিশ্চিত পর্যায়ের (يَقِيْن) হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা জরূরী। যেমন: ক্ষুধা বা পিপাসা দূর করার নিশ্চিত আসবাব বা উপায় হল খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করা। এরকম আসবাব গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় বরং এরকম আসবাব পরিত্যাগ করা নাজায়েয। যদি কেউ তাওয়াক্কুলের দোহাই দিয়ে জীবনের আশংকা দেখা দেয়ার মুহূর্তেও আসবাব বর্জন করে অর্থাৎ, খাদ্য-পানীয় গ্রহণ না করে, তাহলে এ আসবাব বর্জনটা হারাম হবে। এ পর্যায়ের আসবাব গ্রহণ না করা তাওয়াক্কুল নয় বরং এ পর্যায়ে তাওয়াক্কুল হল আসবাব গ্রহণ করবে এবং সেই সঙ্গে এই বিশ্বাসও রাখবে যে, খাদ্য-পানীয় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কিংবা তা গ্রহণের শক্তি আমার থেকে রহিত হয়ে যেতে পারে, কাজেই ভরসা চূড়ান্তভাবে আল্লাহ্রই প্রতি।

(২) যদি আসবাব এমন পর্যায়ের হয় যা দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়া নিশ্চিত নয় তবে অর্জিত হওয়ার প্রবল ধারণা করা যায় (ظَنّ)- যেমন: রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে ডাক্তার বা হেকিমের ওষুধপত্র গ্রহণ কিংবা সফরে গেলে পানাহার ও অন্যান্য প্রয়োজন পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে পাথেয় গ্রহণ, জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে আয়-উপার্জনের কোন পন্থা গ্রহণ ইত্যাদি। এ ধরনের আসবাব বর্জন করা তওয়াক্কুলের জন্য শর্ত নয়। আবার এ ধরনের আসবাব গ্রহণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থীও নয় বরং এ ধরনের আসবাব গ্রহণই পূর্ববর্তীদের সুন্নাত। তবে কেউ যদি এমন মজবূত অন্তরের অধিকারী হন যিনি এসব আসবাব গ্রহণ না করার ফলে

কোন কষ্ট দেখা দিলে তখন পূর্ণ সবর করতে পারবেন– কোনোরূপ হা-হুতাশ করবেন না এবং ঈমানহারা হবেন না বা পাপ পথে অগ্রসর হবেন না, তাহলে তার জন্য এসব আসবাব বর্জন করা জায়েয হবে। আর এরূপ মজবুত অন্তরের অধিকারী না হলে তার জন্য এসব আসবাব পরিত্যাগ করা উচিত হবে না, তার জন্য এ ধরনের আবসাব গ্রহণই উত্তম।

(৩) যদি আসবাব এমন পর্যায়ের হয়, যা দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়া নিতান্তই ধারণা মাত্র (وہمی), যেমন: লোহা পুড়িয়ে দাগ দিলে কোন রোগ-ব্যাধি দূর হওয়াটা নিতান্তই ধারণা মাত্র, এমনিভাবে জীবিকা বৃদ্ধির জন্য আয়-উপার্জনের রকমারি পন্থায় ডুবে থাকা ইত্যাদি। এ পর্যায়ের আসবাব গ্রহণ না করার হুকুম রয়েছে। এ ধরনের আসবাব গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী।

উল্লেখ্য যে, এতক্ষণ পর্যন্ত আসবাব গ্রহণ বা বর্জন সম্পর্কে যা কিছু বলা হল তা পার্থিব বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২. দ্বীনী

যদি দ্বীনী বিষয় হয়, তাহলে সে বিষয়টি ফরয পর্যায়ের হলে তার আসবাব গ্রহণ করাও ফরয, ওয়াজিব পর্যায়ের হলে তার আসবাব গ্রহণও ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব পর্যায়ের হলে তার আসবাব গ্রহণ করা মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে বিষয়টা হারাম বা মাকরূহ হলে তার আসবাব গ্রহণ করাও হারাম বা মাকরূহ হবে।

(ماخوذازبیان القرآن وحاشیۃ کوکب الدری بحوالۂ عالمگیریۃ وار بعین للغزالی وغیرہا)

রোগ সংক্রমণ সম্বন্ধে আকীদা

সাধারণত ছোঁয়াচে রোগ বা সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে যে ধারণা রয়েছে সে সম্বন্ধে ইসলামের আকীদা হল– কোনো রোগের মধ্যে সংক্রমণের নিজস্ব ক্ষমতা নেই। তাই দেখা যায় তথাকথিত সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকের কাছে যাওয়ার পরও অনেকে আক্রান্ত হয় না, আবার অনেকে না যেয়েও আক্রান্ত হয়ে যায়। রোগের মধ্যে নিজস্ব সংক্রমণ ক্ষমতা না থাকার কথা বলা হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لَا عَدْوٰى وَلَا صَفَرَةَ وَلَا هَامَّةَ. فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : يَارَسُوْلَ اللهِ! فَمَا بَالُ الإِبِلِ تَكُوْنُ فِي الرَّمَلِ لَكَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيْرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ (متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الطب– باب لاهامة، و رواه مسلم في كتاب السلام– باب لاعدوى ولاطيرة الخ واللفظ للبخاري)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, রোগ সংক্রমণ নেই, ক্ষুদার সময় পেটে সাপ কষ্ট দেয়– এমন ধারণা নেই এবং "হামা" (সম্পর্কিত ধারণার কোনো ভিত্তি) নেই। তখন একজন

বেদুঈন বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! মরুভূমিতে উট থাকে, যেন তরতরে হরিণ। অতঃপর সেগুলোর সঙ্গে খোস-পাঁচড়াযুক্ত উট মেলামেশা করে, ফলে সেগুলোকে খোস-পাঁচড়াযুক্ত বানিয়ে দেয়। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে (বল) প্রথমটাকে খোস-পাঁচড়াযুক্ত কে বানাল? (বোখারী ও মুসলিম)

এ হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামপূর্ব জাহিলী যুগের আরবদের কতিপয় ভ্রান্ত ধারণা-বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে খণ্ডন করেছেন। এ ধারণাগুলোর মধ্যে ছিল রোগ সংক্রমণের ধারণা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধারণা খণ্ডন করে বলেছেন, রোগের মধ্যে নিজস্ব কোন সংক্রমণ-ক্ষমতা নেই, নতুবা প্রথম উটটা আক্রান্ত হল কীভাবে?

রোগ সংক্রমণ প্রসঙ্গ এবং এসম্পর্কিত হাদীছসমূহের মধ্যকার বিরোধ (تعارض) ও তার সমাধান (حل)

এ হাদীছ থেকে বাহ্যত মনে হয় কোনো রোগ সংক্রমিত হয় না। এমনিভাবে হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীছ থেকেও অনুরূপ বুঝা যায়। হাদীছটি এই–

عَنْ جَابِرٍ رضـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْزُوْمٍ فَوَضَعَهَا مَعَه فِي الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ : بِسْمِ اللهِ ثِقَةً بِاللهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ. (رواه الحاكم في المستدرك حديث رقم ٧٣٥٣ وقال : صحيح اللإسناد، ووافقه الذهبي في التلخيص : صحيح)

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক কুষ্ঠ রোগীর হাত ধরে তাকে নিজের সঙ্গে বরতনে আহার করতে বসান। তারপর বলেন, আল্লাহর নামে, আল্লাহর উপর ভরসা করে। (মুস্তাদরকে হাকিম)

পক্ষান্তরে বেশ কিছু হাদীছ থেকে এর বিপরীত বুঝা যায় যে, রোগ সংক্রমিত হয়। যেমন বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে এসেছে,

لَا يُوْرِدُ مُمْرِضٌ عَلٰى مُصِحٍّ. (متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الطب– باب لاعدوى، وروراه مسلم في كتاب السلام– باب لاعدوى ولاطيرة الخ واللفظ لمسلم)

অর্থাৎ, যার অসুস্থ উট আছে, সে যেন তার উট সুস্থ ব্যক্তির উটের সঙ্গে পানি পান করতে না পাঠায়। (বোখারী ও মুসলিম)

এমনিভাবে বোখারী শরীফে আরও এসেছে,

فِرَّ مِنَ الْمَجْزُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ. (رواه البخاري في كتاب الطب– باب الجذام)

অর্থাৎ, সিংহ থেকে যেমন পলায়ন কর, কুষ্ঠ রোগী থেকেও তদ্রূপ পলায়ন কর। (বোখারী)

এই উভয় প্রকার হাদীছসমূহের মাঝে বাহ্যত বিদ্যমান বিরোধ تعارض দূর (حل)

করার জন্য উলামায়ে কেরাম তিন ধরনের পন্থা গ্রহণ করেছেন। যথা:–

১. কতক উলামায়ে কেরাম لا عدوى .... أخ হাদীছকে لايورد ممرض علي مصح. হাদীছ দ্বারা রহিত منسوخ বলেছেন। তবে আল্লামা নববী দুই কারণে এটাকে ভুল বলেছেন।

(এক) দুই হাদীছের মধ্যে সমন্বয় (تطبيق) সম্ভব, অতএব রহিত হওয়া نسخ-এর শর্ত অনুপস্থিত।

(দুই) ناسخ منسوخ বলতে হলে ناسخ হাদীছ যে পরবর্তী তার তারিখ/প্রমাণ জানা থাকা আবশ্যক, অথচ এখানে তা জানা নেই।

২. কতিপয় আলেম প্রাধান্য প্রদান (ترجيح) -এর পন্থা গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে কেউ কেউ .... لاعدوى হাদীছকে বিপরীত ধরনের হাদীছের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ তার উল্টো করেছেন। তবে প্রাধান্য দেয়ার পন্থা এখানে গ্রহণযোগ্য নয় এ কারণে যে, প্রাধান্য দেয়ার পন্থা গ্রহণ করা হয় তখন, যখন সমন্বয় (تطبيق) সম্ভব না হয়, অথচ এখানে সমন্বয় সম্ভব, যা সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে।

৩. কতিপয় আলেম সমন্বয় (تطبيق) -এর পন্থা গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে এখানে দুই ধরনের হাদীছের মধ্যে মূলত কোন تعارض বা বৈপরিত্য নেই। যেসব হাদীছে রোগ সংক্রমণ না হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা-ই মূলত প্রকৃত কথা, আর যে হাদীছে কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে, তা হল মানুষের আকীদা সংরক্ষণের স্বার্থে। কেননা, এ ধরনের রোগীর সংস্পর্শে যাওয়ার পর আল্লাহ্‌র ফয়সালায় আক্রান্ত হলে তার আকীদা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই ভেবে যে, এই রোগীর সংস্পর্শে আসার কারণেই সে আক্রান্ত হয়েছে। অথচ যা হয়েছে তা আল্লাহ্‌র ফয়সালাতেই হয়েছে।

কেউ কেউ এভাবে সমন্বিত করেছেন যে, বস্তুবাদীরা রোগ সংক্রমণের ক্ষেত্রে রোগের মধ্যে নিজস্ব সংক্রমণ ক্ষমতা আছে বলে মনে করে। জাহিলী যুগের আরবরাও অনুরূপ মনে করত অর্থাৎ, তারা সংক্রামক রোগকে স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন (مؤثر بالذات) মনে করত, এ প্রেক্ষিতে হাদীছে "রোগ সংক্রমণ হয় না" বলে রোগের মধ্যে এরূপ নিজস্ব সংক্রমণ ক্ষমতা না থাকার কথা বোঝানো হয়েছে। বরং আল্লাহ্‌র ফয়সালাতেই সংক্রমিত হওয়ার থাকলে আক্রান্ত হয় নতুবা আক্রান্ত হয় না। আর যেসব হাদীছে কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকার বা রোগাক্রান্ত প্রাণীকে সুস্থ প্রাণীর কাছে নিতে নিষেধ করা হয়েছে, তা এ কারণে যে, এরূপ রোগীর সংস্পর্শ আক্রান্ত হওয়ার কারণ (علت)। তাই কারণ থেকে নিষেধ করা হয়েছে, যেমন: পতনোন্মুখ দেয়ালের কাছে যেতে নিষেধ করা হয় এ কারণে যে, তার কাছে গেলে এই যাওয়াটা তার ক্ষতির কারণ হতে পারে। এছাড়াও সমন্বয় সাধনের (تطبيق দেয়ার) আরও বিভিন্ন সূরত হতে পারে।

আল্লামা নববী, مجمع بحار الأنوار -এর مصنف তাহের পাটনী ও হযরত গঙ্গুহী প্রমুখ

মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এ কারণে যে, এতে হাদীছ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন হয়ে যায় এবং কোনো সংঘর্ষ থাকে না।

সারকথা– রোগ সংক্রমণ প্রসঙ্গে সহীহ আকীদা হল রোগের মধ্যে সংক্রমণ বা অন্যের মধ্যে বিস্তৃত হওয়ার নিজস্ব ক্ষমতা নেই। কেউ অনুরূপ রোগীর সংস্পর্শে গেলে যদি তার আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ফয়সালা হয়, সে ক্ষেত্রেই সে আল্লাহ্‌র হুকুমে আক্রান্ত হবে, অন্যথায় নয়। কিংবা এরূপ আকীদা রাখতে হবে যে, এসব রোগের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ তাআলা সংক্রমণের এই নিয়ম রেখে দিয়েছেন। তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে সংক্রমণ না-ও ঘটতে পারে। অর্থাৎ, সংক্রমণের এ ক্ষমতা রোগের নিজস্ব ক্ষমতা নয়, এর পশ্চাতে আল্লাহ্‌র দেয়া ক্ষমতা এবং তাঁর ইচ্ছার দখল থাকে। তবে ইসলাম প্রচলিত এসব সংক্রামক রোগে আক্রান্ত লোকদের নিকট যেতে নিষেধ করেছে বিশেষভাবে কুষ্ঠ রোগীর নিকট, এ কারণে যে, উক্ত রোগীর নিকট গেলে আর তার আক্রান্ত হওয়ার খোদায়ী ফয়সালা হওয়ার কারণেই সে আক্রান্ত হয়ে থাকলে সে হয়ত ভাববে যে, রোগীর সংস্পর্শে আসার কারণেই সে আক্রান্ত হয়েছে। এভাবে তার আকীদা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তা যেন না হতে পারে এজন্যই ইসলাম এরূপ বিধান দিয়েছে। তবে কেউ মজবুত আকীদার অধিকারী হলে সে অনুরূপ রোগীর নিকট যেতে পারে। এমনিভাবে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত লোককেও সুস্থ এলাকার লোকদের নিকট যেতে নিষেধ করেছে, যাতে অন্য কারও আকীদা নষ্ট হওয়ার কারণ না ঘটে।

রাশি ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা

রাশি বলা হয় সৌরজগতের কতকগুলো গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতীককে। এগুলো কল্পিত। এরূপ বারটা রাশি কল্পনা করা হয়। যথা:– মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, ও মীন। এগুলোকে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতীক সাব্যস্ত করা হয়েছে। জ্যোতিঃশাস্ত্র (অর্থাৎ, ফলিত জ্যোতিষ বা Astrology)-এর ধারণা অনুযায়ী এসব গ্রহ-নক্ষত্রের গতি, স্থিতি ও সঞ্চারের প্রভাবে ভবিষ্যত শুভ-অশুভ সংঘটিত হয়ে থাকে। নিউমারোলজি বা সংখ্যা-জ্যোতিষের উপর ভিত্তি করে এই শুভ-অশুভ নির্ণয় তথা ভাগ্য বিচার করা হয়।

ইসলামী আকীদা অনুসারে গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে নিজস্ব কোনো প্রভাব বা ক্ষমতা নেই। সুতরাং ভাগ্য তথা শুভ-অশুভ গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে ঘটে এই আকীদা রাখা শিরক। গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ কোন প্রভাব থাকলে থাকতেও পারে, কিন্তু তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যা কিছু বলা হয় সবই কাল্পনিক। যদি প্রকৃতই এরূপ কোন প্রভাব থাকেও, তবুও তা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত, গ্রহ-নক্ষত্রের ক্ষমতা নয়। অতএব শুভ-অশুভ মৌলিকভাবে আল্লাহ্‌রই ইচ্ছাধীন ও

তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।[১]

বর্তমান যুগে জ্যোতিষঃশাস্ত্র বা Astrology-এর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটা এবং এ ব্যাপারে বহু লোকের আকীদা ও আমলগত বিভ্রান্তি ঘটায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত একটি প্রবন্ধ পেশ করা হল।

জ্যোতিঃশাস্ত্র ও ইসলাম

অধুনা জ্যোতিঃশাস্ত্রের চর্চা বেশ ব্যাপকতা লাভ করেছে। ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষ সর্বশেষ পন্থা হিসাবে জ্যোতিষীদের দারস্থ হচ্ছেন এবং তাদের দেয়া পাথর বা অন্য কোন পরামর্শকে ভাগ্য ফেরানোর নিয়ামক ভেবে শেষ রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। অনেকে বিবাহ-শাদি, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেখাপড়া, বিদেশ গমন, ঘর-বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি জীবনের অনেক ক্ষেত্রের ভবিষ্যত শুভ-অশুভ জানার জন্য জ্যোতিষীদের আগাম ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং সাফল্য লাভ করবেন বলে আত্মস্থ থাকছেন। এভাবে জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীকে তারা জীবন পরিচালনার গাইড বানিয়ে চলছেন। জ্যোতিষীদের ব্যবসাও ভাল চলছে। জ্যোতিঃশাস্ত্র চর্চায় ব্যবসা ভাল দেখে এ বিদ্যা শিক্ষার হারও তাই বেড়ে চলেছে। কিন্তু এ শাস্ত্রের হিসাব-নিকাশ ও তার ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন বা এ শাস্ত্র চর্চা ইসলামে কতটুকু অনুমোদিত তা ঈমান-আকীদা সংরক্ষণে প্রয়াসী এবং জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে আগ্রহী একজন সচেতন মুসলমানকে অবশ্যই জানতে হবে।

জ্যোতিঃশাস্ত্র বলতে দুটো শাস্ত্রকে বোঝানো হয়।

(এক) নক্ষত্রবিদ্যা অর্থাৎ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, আকৃতি ও গতি সম্পর্কে যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। এ শাস্ত্রকে ইংরেজিতে বলা হয় অংঃৎড়হড়সু। আরবীতে বলা হয় علم الهيئة

(দুই) গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। এ শাস্ত্রে নক্ষত্রের গতি, স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে ভবিষ্যত শুভ-অশুভ বিচার করা হয়। ভবিষ্যত শুভ-অশুভ নিরূপণ বিষয়ক এ শাস্ত্রকে ফলিত জ্যোতিষ বা Astrology বলা হয়।

"আরবীতে ইলমুন্নুজূম" (علم النجوم) বলতে বিশেষভাবে এই ফলিত জ্যোতিষ বা Astrology কেই বোঝানো হয়। আরবীতে বিশেষভাবে এটাকে ইলমু আহ্কামিন্নুজূম (علم احكام النجوم) বলা হয়। তবে সূর্যের বিভিন্ন ডিগ্রীতে অবস্থানের তারতম্যে আবহাওয়া এবং শীত গ্রীষ্মের অর্থাৎ, মৌসুমের যে পরিবর্তন, চন্দ্রের প্রভাবে জোয়ার ভাটা ইত্যাদির যে প্রাকৃতিক পরিবর্তন, এটাকেও সাধারণভাবে ইলমুন্নুজূম-এর অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। এটাকে বিশেষভাবে 'ইল্মুন্নুজূম তাবিয়ী' বলা হয়।

১. ١/فتح الملهم ج ও آپکے مسائل اور انکا حل থেকে গৃহীত।
বাংলা ইংরেজিতে এ শাস্ত্রের বিষয়গুলো ভূগোল শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। চন্দ্র সূর্য

ইত্যাদি গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও চলাচল সম্পর্কিত বিদ্যা যা সাধারণত Astronomy-তে আলোচিত হয়ে থাকে, আরবীতে এটাকেও "ইলমুন্নুজূম"-এর অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। এটাকে বিশেষভাবে "ইলমুন্নুজূম হিছাবী" বলা হয়।

Astronomy (নক্ষত্র বিদ্যা) শিক্ষা করা অর্থাৎ, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, আকৃতি ও গতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। নিষিদ্ধ হল ভাগ্যের ক্ষেত্রে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষা করা বা তাতে বিশ্বাস করা। আল্লামা ইব্নে রজব বলেন,

فالمأذون في تعلمه علم التسيير لاعلم التأثير فإنه باطل مُحَرَّمٌ قليلُه وكثيره. (فتح الملهم ج/١)

অর্থাৎ, গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও চলাচল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার অনুমতি রয়েছে, তবে (ভাগ্যের শুভ-অশুভের ক্ষেত্রে) তার প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা (অল্প হোক বা বিস্তর) নিষিদ্ধ এবং হারাম।

যাহোক Astronomy শিক্ষা করা নিষিদ্ধ নয় বরং এর কিছু কিছু অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়ে উপকারে আসে। অজানা স্থানে রাতের বেলায় কেবলা নির্ধারণের জন্য উত্তর আকাশের ধ্রুবতারা (North Star) চেনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর ধ্রুবতারা চিনতে হলে প্রয়োজন হয় সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa major/Great Bear) চেনার এবং সন্ধার আকাশে, মধ্যরাতের আকাশে এবং শেষ রাতের আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অবস্থান কেমন থাকে তা জানার। দক্ষিণ আকাশেও এমন কিছু নক্ষত্র আছে যা দ্বারা দিক চেনা যায়। আর রাত কতটা গভীর হল তা বুঝা যায় 'কালপুরুষ' (Orion) নামক তারকামণ্ডলের অবস্থান দেখে। কুরআনে কারীমে বাণিজ্যিক সফরের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ.

অর্থাৎ, তারকারাজি দ্বারাও তারা পথের (দিকের) পরিচয় লাভ করে থাকে। (সূরা: ১৬-নাহ্ল: ১৬)

এ বক্তব্য দ্বারা এদিকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, তারকারাজি সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য অন্য কিছু হলেও পথের (দিকের) পরিচয় লাভ এবং দিক-নির্ণয় করতে পারাও অন্যতম উপকারিতা।

সহীহ্ বোখারীতে হযরত কাতাদাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে,

خُلِقَ هٰذِه النُّجُوْمُ لِثَلَاثٍ : جَعَلَهَا زِيْنَةً لِّلسَّمَاء، وَرُجُوْمًا لِّلشَّيَاطِيْنِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدٰى،فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيْهَا بِغَيْرِ ذَالِكَ أَخْطَأَ و أَضَاعَ نَصِيْبَه وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِه. (رواه البخاري في كتاب بدأ الخلق–باب في النجوم)

অর্থাৎ, এই নক্ষত্রগুলো তিন উদ্দেশ্যে- আল্লাহ এগুলোকে আকাশের সৌন্দর্য, শয়তানদের জন্য ক্ষেপণাস্ত্রবৎ এবং পথ লাভ করার নিদর্শন বানিয়েছেন। এই তিনটি বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো রকম ব্যাখ্যা যে প্রদান করবে সে ভুল করবে, নিজের সময়

ও লিপ্ততাকে নষ্ট করবে এবং যে বিষয়ে জানা নেই এমন বিষয় চর্চায় অযথা কষ্ট করবে। (বোখারী)

গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের দূরত্ব এবং আকৃতির বিশালতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান আল্লাহ্‌র কুদরত অনুধাবনে সহায়ক হয় এবং ঈমান বৃদ্ধির কারণ ঘটে। হাজার হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরে থাকা একটা নক্ষত্র সম্পর্কে অবগতি লাভ হলে তার চেয়ে উপরের বিশাল অবস্থানে জুড়ে থাকা জান্নাতের পরিধির বিশালতায় বিশ্বাস স্থাপন করা সহজ লাগে, আর তখন সর্বনিম্ন জান্নাতীর জন্য জান্নাতে কমপক্ষে দশ দুনিয়া পরিমাণ স্থান থাকার কথা আর মোল্লাদের অন্ধবিশ্বাস বলে মনে হয় না এই যুক্তিতে যে, জান্নাতে এত স্থান আসবে কোত্থেকে?

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নিয়ে যে চিন্তা করার নির্দেশ হাদীছে এসেছে, অংংৎড়হড়সু-এর বিদ্যা সে চিন্তাকে বিকশিত করতে সহায়ক হয়ে থাকে। এ দৃষ্টিভংগীতে এ শাস্ত্র শিক্ষা করা গর্হিত হবে না বরং প্রশংসিত হবে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

تَفَكَّرُوْا فِيْ خَلْقِ اللهِ وَلَا تَفَكَّرُوْا فِي اللهِ. (قال السخاوي : رواه أبو نعيم في الحلية وأسانيدها ضعيفة لكن اجتماعها يكبسب قوة والمعنى صحيح. كذا في المقاصد الحسنة)

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা কর, আল্লাহর সত্তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর না। (হিল্‌য়া)

"ইল্‌মুন্নুজূম তবীয়ী" (علم النجوم الطبيعى) অর্থাৎ, সূর্যের বিভিন্ন ডিগ্রীতে অবস্থানের তারতম্যে আবহাওয়া ও মৌসুমের পরিবর্তন এবং শীত গ্রীষ্মের আবর্তন সম্পর্কিত বিদ্যাও ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। (فقح الملهم ج/١) এ বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইসলামে নিষেধাজ্ঞাও নেই আবার তাতে তেমন ধর্মীয় উপকারিতাও নেই শুধু এতটুকু যে, এর দ্বারা আল্লাহ্‌র কুদরত অনুধাবিত হয়ে থাকে। এক মৌসুমে দিন ছোট রাত বড়, আবার অন্য মৌসুমে দিন বড় রাত ছোট হয়ে থাকে, এটাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের আলামত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ.

অর্থাৎ, তুমি রাতকে দিনের ভিতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভিতরে প্রবেশ করাও। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ২৭)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ.

অর্থাৎ, নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে (কুদরতের) নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ১৯০)

এখানে রাত ও দিনের আবর্তন (اختلاف الليل والنهار) বলতে যেমন একের গমন ও অপরের আগমন অর্থ বোঝায়, তেমনি কম-বেশি হওয়ার অর্থও বোঝায়।

যেমন: শীতকালে রাত দীর্ঘ এবং দিন খাটো হয়, গরমকালে তার বিপরীত। অনুরূপ এক দেশ থেকে অন্য দেশে রাত দিনের দৈর্ঘে তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন: উত্তর মেরুর নিকটবর্তী দেশগুলোতে দিবাভাগ উত্তরমেরু থেকে দূরবর্তী দেশের তুলনায় দীর্ঘ হয়। এসব কিছুই আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন।

"ইল্‌মুন্নুজূম হিছাবী" (علم النجوم الحسابي) অর্থাৎ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির গতি, কক্ষপথ ও চলাচল সম্পর্কিত হিসাব-নিকাশের বিদ্যা। জ্যোতিঃশাস্ত্র (Astronomy, Astrology) ও ভূগোলে সবটাতেই এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে। ইসলাম এরূপ একটা হিসাব-নিকাশের তথ্য মৌলিকভাবে স্বীকার করেছে, তবে তার বিস্তারিত বিবরণ এবং চুলচেরা বিশ্লেষণ প্রদান থেকে বিরত রয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اَلشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ.

অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্র হিসাব মত চলে। (সূরা: ৫৪-আর রহমান: ৫)

এ আয়াতের উদ্দেশ্য হল– সূর্য ও চন্দ্রের গতি এবং কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা একটা বিশেষ হিসাব ও পরিমাণ অনুযায়ী চালু রয়েছে। সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকের পরিক্রমের আলাদা আলাদা হিসাব রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের হিসাবের উপর সৌরব্যবস্থা চালু রয়েছে। এসব হিসাবও এমন অটল ও অনড় যে, লাখো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এতে এক মিনিট বা এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয়নি। (মাআরেফুল কুরআন)

এক আয়াতে বলা হয়েছে,

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَّرَه مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ.

অর্থাৎ, তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি সূর্যকে বানিয়েছেন উজ্জল আলোকময় আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলোকময়। অতঃপর নির্ধারিত করেছেন তার জন্য মনযিলসমূহ যাতে তোমরা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। (সূরা: ১০-ইউনুসঃ ৫)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা চন্দ্র সূর্যের চলাচলের জন্য বিশেষ সীমানা নির্ধারণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। যার প্রত্যেকটাকে একেক মনযিল বলা হয়। চাঁদ যেহেতু প্রতিমাসে তার নিজস্ব কক্ষপথে পরিক্রমণ সমাপ্ত করে ফেলে, সেহেতু তার মনযিল হল ত্রিশ অথবা উনত্রিশটা। তবে যেহেতু চাঁদ প্রতিমাসে একদিন লুকায়িত থাকে, তাই সাধারণত চাঁদের মনযিল আঠাশটা বলা হয়। আরবের প্রাচীন জাহেলী যুগে এবং জ্যোতির্বিদদের মতেও এই মনযিলগুলোর নাম সেসব নক্ষত্রের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হয়েছে যেগুলো সেসব মনযিলের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। কুরআন-হাদীছে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। কেননা এগুলোর খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবাদির উপর নির্ভরশীল। আর ইসলাম তার বিধি-বিধানের ভিত্তি অঙ্কশাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের ওপর রাখেনি। যেমন: চাঁদের হিসাবে বছর, মাস ও দিন তারিখ নির্ধারিত হয় এবং এর সাথে ইসলামের অনেক বিধি-বিধানের সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু

চাঁদ হল কি হল না তার ভিত্তি গাণিতিক হিসাবের উপর নয় বরং কেবল চাঁদ দেখা ও প্রত্যক্ষ করার ওপর রাখা হয়েছে।

যেহেতু এসব খুটিনাটি হিসাবের সঙ্গে ইসলামী কোন বিধানের সম্পর্ক রাখা হয়নি। তাই এগুলো সম্পর্কে বিদ্যার্জন ইসলামের দৃষ্টিতে অনর্থক। চাঁদ কেন বাড়ে কমে, এরকম বৃদ্ধি, আত্মগোপন ও উদয়ের রহস্য কী? এ সম্পর্কে কতিপয় সাহাবী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলে তার জওয়াবে নাযিল হয়–

قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ .

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, এটা মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম। (সূরা: ২-বাকারা: ১৮৯)

মুফতী শফী সাহেব (রহ.) লিখেছেন যে, এ জওয়াব ব্যক্ত করেছে যে, তোমাদের প্রশ্ন অনর্থক। এ রহস্য জানার উপর তোমাদের কোনো ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয় নির্ভরশীল নয়। তাই তোমাদের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে– এমন প্রশ্নই করা দরকার। (معارف القرآن)

"ফলিত জ্যোতিঃশাস্ত্র" (Astrology/العلم بأحكام النجوم) যাতে গ্রহ-নক্ষত্রের গতি, স্থিতি, সঞ্চার অনুসারে ভবিষ্যত শুভ-অশুভ নিরূপণ করা হয়, ভবিষ্যত শুভ-অশুভ বিচার করা হয়। এ শাস্ত্র সম্পর্কে ইসলাম কঠোর নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছে। ইসলামী আকীদা অনুসারে গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে নিজস্ব কোন প্রভাব বা ক্ষমতা নেই। সুতরাং ভাগ্য তথা শুভ-অশুভ গ্রহ নক্ষত্রের নিজস্ব প্রভাবে ঘটে– এরূপ বিশ্বাস রাখা শিরক ও কুফ্র। গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত কোন প্রভাব থাকলে থাকতেও পারে। কিন্তু তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যা কিছু বলা হয় তা সবই কাল্পনিক। যদি প্রকৃতই এরূপ কোন প্রভাব থাকেও, তবুও তা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত, গ্রহ-নক্ষত্রের নিজস্ব ক্ষমতা নয়। অতএব শুভ-অশুভ মৌলিকভাবে আল্লাহরই ইচ্ছাধীন ও তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে মারফূ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ اِقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُوْمِ اِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السحرِ (رواه أبو داود في باب في النجوم

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জ্যোতিঃশাস্ত্রের একটা জ্ঞান শিক্ষা করল, সে যাদুর একটা শাখা শিক্ষা করল।

এ হাদীছে জ্যোতিঃশাস্ত্র শিক্ষা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রকে যাদুর ন্যায় কুফ্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্য এক হাদীছে জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশ্বাস করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ইরশাদ হয়েছে,

اَخَافُ عَلٰى اُمَّتِيْ تَعَدِيْ خَصَلَتَيْنِ تَكْذِيْبًا بَالْقَدْرِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْقَدْرِ وَتَصْدِيْقًا بِالنُّجُوْمِ. (إسناده حسن أخرجه أبو يعلى في مسنده وبن عدي في الكامل والخطيب في كتاب النجوم عن أنس. كذا في الإتحاف ج/١)

অর্থাৎ, আমার পরে আমার উম্মতের ব্যাপারে আমি দুটো বিষয়ের আশংকা করছি: তাকদীরে অবিশ্বাস ও গ্রহ-নক্ষত্রের বিশ্বাস।

অন্য এক হাদীছে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

لَا تَسْأَلُوْا عَنِ النُّجُوْمِ. إلخ (أخرجه الديلمي في الفردوس وابن حصر في أماليه والسيوطي في الجامع الكبير. كذا في الإتحاف ج/١)

অর্থাৎ, তোমরা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে জানতে চাইবে না। (আল-ইতহাফ–দাই-লামী)

অন্য এক হাদীছে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

إِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوْا، وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُوْمُ فَأَمْسِكُوْا، وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِيْ فَأَمْسِكُوْا. (أخرجه الطبراني بإسناد حسن. كذا في الإتحاف ج/١)

অর্থাৎ, তাকদীর সম্পর্কে চুলচেরা আলোচনা উঠলে তা থেকে বিরত থাকবে। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা উঠলে তা থেকে বিরত থাকবে। আমার সাহাবী-দের সমালোচনা উঠলে তা থেকে বিরত থাকবে। (আল-ইতহাফ–তাবারানী)

উপরোক্ত চারটি হাদীছ থেকে বুঝা গেল গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে বিশ্বাস করা, এ সম্পর্কিত বিদ্যা শিক্ষা করা, এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া এবং এ সবের চুলচেরা আলোচনা ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া সবই নিষিদ্ধ।

গ্রহ-নক্ষত্রের নিজস্ব প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস করা কুফরী, তবে ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেছেন, যদি কেউ আল্লাহ্‌কেই মূল নিয়ন্তা বলে বিশ্বাস করে, তবে আসবাব বা উপকরণের মাধ্যমে সবকিছু সংঘটনের চিরাচরিত খোদায়ী নিয়মানুসারে গ্রহ-নক্ষত্রের মাধ্যমে কোন প্রভাব তিনি সংঘটিত করছেন বলে মনে করলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। সেক্ষেত্রে হাদীছের নিষেধাজ্ঞা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে যে গ্রহ-নক্ষত্রের নিজস্ব প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস করে। তবে বিশ্বাস যাই থাকুক কোনো অবস্থাতেই কোন প্রভাবকে কোন গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি সম্পৃক্ত করার অনুমতি নেই। তা ছাড়া যে ব্যাখ্যায় ইমাম শাফিয়ী (রহ.) গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস করার অনুমতি দিয়েছেন সাধারণভাবে উলামায়ে কেরাম অনুরূপ ব্যাখ্যা সহকারেও তা বিশ্বাস করাকে হারাম বলেছেন। আর বিনা ব্যাখ্যায় গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস করাকে কুফ্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের পশ্চাতে আল্লাহকে মূল নিয়ন্তা মেনে নেয়ার পরও জ্যোতিঃশাস্ত্র (Astrology) চর্চার ব্যাপারে পূর্বোক্ত কঠোর নেতিবাচক মনোভাব অব্যাহত থাকবে। ইমাম গাযালী (রহ.) এহ্‌য়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে তার তিনটা কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা:–

১. গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের আলোচনা শুনতে শুনতে ক্রমান্বয়ে অন্তরে তার নিজস্ব প্রভাব থাকার ধারণা জন্ম নিবে, এভাবে ঈমান বিনষ্ট হবে।

২. এ বিদ্যায় কোনো উপকারিতা নিহিত নেই। অতএব এটা একটা অনর্থক বিষয়ে মূল্যবান সময় অপচয় করার নামান্তর।

৩. এ শাস্ত্রের কোনোকিছু যুক্তি, চাক্ষুস প্রমাণ বা কুরআন-হাদীছের দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং এ শাস্ত্রের সবকিছুই আনুমানিক ও কাল্পনিক।

এ শাস্ত্রের সবকিছুই যে কাল্পনিক, যুক্তি বা বিজ্ঞাননির্ভর নয় ও দলীল-প্রমাণ-বিহীন, তার কিঞ্চিত ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদান করা হল।

প্রথমত ধরা যাক রাশির কথা। জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে রাশি হল বারটা। যথা:- মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। সূর্য বার মাসে বারটা রাশিতে অবস্থান করে বিধায় রাশির সংখ্যা বারটা। আর সূর্যের যে রাশিতে অবস্থানকালে কারও জন্ম হয় তাকে সেই রাশির জাতক/জাতিকা বলা হয়। কিন্তু রাশি সূর্যের অবস্থানের প্রেক্ষিতে কেন হবে চন্দ্র বা অন্য কোন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের প্রেক্ষিতে কেন হবে না তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা দলীলসাপেক্ষ ব্যাখ্যা নেই। এই রাশির নামগুলোও কাল্পনিক, এসব রাশির যে প্রতীক সাব্যস্ত করা হয়েছে তাও কাল্পনিক। এক এক রাশির যে নম্বর এবং তার যে মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরে নেয়া হয়েছে তাও কাল্পনিক। এসব সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে কোনো দলীল তো নেই-ই কোন ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিকভাবেও এগুলো প্রমাণিত নয়।

দ্বিতীয়ত ধরা যাক সংখ্যাতত্ত্বের কথা। জ্যোতিষীগণ নিউমারোলজি বা সংখ্যাতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যত শুভ-অশুভ নির্ণয় তথা ভাগ্য বিচার করে থাকেন। সংখ্যা জ্যোতিষের মূল কথা হল- ১ থেকে ৯- এই নয়টি সংখ্যা হল মৌলিক এবং এক এক সংখ্যার এক এক ধরনের প্রভাব রয়েছে। সেমতে প্রত্যেক মানুষ নয় সংখ্যার যে কোন এক সংখ্যার জাতক/জাতিকা হবেন এবং যিনি যে সংখ্যার জাতক/জাতিকা হবেন তার জীবনে ঐ সংখ্যার প্রভাব এবং ঐ সংখ্যার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে। যেমন: বলা হয়, ১ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা অগ্রপথিক এবং অভিযাত্রিক হবেন, তাদের মধ্যে একটা সহজাত সৃজনশীলতা প্রচ্ছন্ন থাকবে ইত্যাদি। ২ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা ভদ্র ও বিনয়ী, তারা কল্পনা প্রবণ, রোমান্টিক ও শিল্পানুরাগী হবেন ইত্যাদি। এখন কথা হল- এই যে এক এক সংখ্যার এক এক ধরনের বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা হল এটা কাল্পনিক ছাড়া আর কী? আর মানুষের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে এই নয়-এর গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করার কোন যুক্তি বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি শুধু কল্পনার অন্ধ অনুসরণ ছাড়া?

তৃতীয়ত আলোচনা করা যাক জাতক/জাতিকা নির্ধারণের পদ্ধতি প্রসঙ্গে। জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে কে কোন্ সংখ্যার জাতক/জাতিকা তা নির্ধারণ করা হয় তার জন্ম তারিখ (ইংরেজি তারিখ) দেখে। জন্ম তারিখ ১ থেকে ৯ পর্যন্ত যেটা হবে সেটাই হল তার জন্ম সংখ্যা। আর ৯-এর উপরের যৌগিক সংখ্যা হলে সেই যৌগিক সংখ্যাকে পারস্পরিক যোগ দিতে দিতে যে মৌলিক সংখ্যা বের হবে সেটাই হবে তার জন্ম সংখ্যা এবং সে হবে ঐ সংখ্যার জাতক/জাতিকা। যেমন: ১৮ তারিখে কারও জন্ম হলে

সে হবে (১+৮ = ৯) ৯ সংখ্যার জাতক/জাতিকা। ২১ তারিখে জন্ম হলে সে হবে (২+১= ৩) ৩ সংখ্যার জাতক/জাতিকা। ২৯ তারিখে জন্ম হলে সে হবে (২+৯=১১-১+১= ২) ২ সংখ্যার জাতক/জাতিকা।

জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে জাতক/জাতিকাদের আরও দুই ধরনের সংখ্যা আছে। তাহল কর্মসংখ্যা ও নামসংখ্যা। জন্মসংখ্যা হচ্ছে জন্ম তারিখ/তারিখের যোগফল, আর কর্মসংখ্যা হচ্ছে জন্ম বছর, জন্ম মাস ও জন্ম তারিখ-এই সব কয়টার যোগফল। যেমন: কেউ জন্মগ্রহণ করল ১লা নভেম্বর ১৯৪৮ সালে, তাহলে নভেম্বর যেহেতু ১১তম মাস তাই কর্মসংখ্যা বের হবে এভাবে ১+১+১+১+৯+৪+৮ = ২৫
আবার ২+৫ = ৭
অতএব ১-১১-১৯৪৮ সালে জন্ম গ্রহণ কারীর জন্মসংখ্যা ১ আর কর্মসংখ্যা হল ৭।

জ্যোতিষীদের ধারণা হল জন্ম সংখ্যা নির্দেশ করে জাতক/জাতিকার সহজাত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। আর কর্ম সংখ্যা থেকে জানা যায় জাতক/জাতিকার জীবনে কোন্ কর্মপন্থা অবলম্বন করা উচিত, কোন্ পেশায় তার অগ্রগতি নিহিত। কোন্ পথে অগ্রসর হয়ে সে সাফল্য লাভ করতে পারবে ইত্যাদি। জন্মসংখ্যার ন্যায় কর্মসংখ্যাও ১ থেকে ৯ পর্যন্ত মোট ৯টি।

এখন কথা হল জন্মসংখ্যা দ্বারা যে জাতক/জাতিকা নির্ধারণ হবে তার কী প্রমাণ? আর কর্মসংখ্যার জন্য জন্মের তারিখ, মাস ও সন সবটা যোগ করতে হবে এবং জন্মসংখ্যার জন্য শুধু জন্মের তারিখ দেখা হবে, সন, মাস যোগ করা হবে না- এসবের ভিত্তি কী? স্পষ্টতই এখানে কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকা সম্ভব নয়। কারণ এটা কোন পদার্থগত বিষয় নয়। থাকলে কোন ঐশী দলীল থাকতে পারত, তা-ও অনুপস্থিত। তাহলে কল্পনা ব্যতীত আর কী ভিত্তি রয়ে গেল? আর একটা কথা চিন্তা করা যায়। তাহল- জন্মসংখ্যা কর্মসংখ্যা এসবই বের করা হয় ইংরেজি তারিখ ও ইংরেজি সন মাস থেকে। আর ইংরেজি সন গণনা করা হয় ঈসা (আ.)-এর জন্ম থেকে। তাহলে ঈসা (আ.)-এর জন্মের ভিত্তিতে শুরু করা হিসাবের সঙ্গে সারা পৃথিবীর মানুষের জন্মসংখ্যা, কর্মসংখ্যা তথা চরিত্র ভাগ্য সবকিছুর সম্পর্ক- এরই বা কী প্রমাণ? পৃথিবীর আদি থেকে যে আরবী মাস ও সন গণনা শুরু তার সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও না হয় ক্ষণিকের জন্য কিছুটা মেনে নেয়ার চিন্তা করা যেত।

জ্যোতিষীদের ধারণামতে জন্মসংখ্যা ও কর্মসংখ্যার ন্যায় মানুষের রয়েছে একটি নামসংখ্যা। প্রত্যেকের নামের ইংরেজি হরফগুলোর মান (সংখ্যা) থেকে বের করা হয় নামসংখ্যা। ইংরেজিতে হরফের মান সংখ্যা নিম্নরূপ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
A	B	C	D	E	U	O	F
I	K	L	M	H	V	Z	P
J	R	S	T	N	W		
Q	G	X					
Y							

জ্যোতিষীদের ধারণা- প্রত্যেকের নামের মধ্যে তার জীবনের লক্ষ্য ও মিশন সম্পর্কে নির্দেশনা লুকিয়ে থাকে। কি কি গুণাবলী অর্জন করতে হবে, কি কি বর্জন করতে হবে, কোন্ কোন্ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে নামের সংখ্যার মধ্যে এ সবকিছু-রই দিক-নির্দেশনা থাকে। এ ক্ষেত্রেও জ্যোতিষীগণ ১ থেকে ৯ মোট ৯টি সংখ্যা নির্ধারণ করে প্রত্যেক সংখ্যার জন্য এক এক ধরনের দিক-নির্দেশনা নির্ধারণ করে রেখেছেন।

জ্যোতিষীগণ কি এর কোন জবাব দিতে পারবেন যে, ইংরেজি এক এক হরফের এক এক মান দেয়া হয়েছে– এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কী? কিংবা এর স্বপক্ষে কোন ঐশী প্রমাণ আছে কি? আর নামসংখ্যার মধ্যে যদি কোন জীবনের দিক-নির্দেশনা লুকিয়ে থাকেও তবে তা বের করতে ইংরেজি হরফের আশ্রয় নেয়া হবে কেন? অন্য কোন ভাষার হরফ গ্রহণ করা যাবে না তার কী প্রমাণ? অন্য ভাষার হরফে গেলে যে নাম সংখ্যায় পার্থক্য দেখা দিবে তার সমাধান কি?

কেউ কেউ কুরআন হাদীছের ভাষা এবং প্রথম মানব আদম (আ.)-এর ভাষা ও জান্নাতের ভাষা আরবী–এর হিসাবে আরবী হরফের মান দেখে নামসংখ্যা বের করে থাকেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার আরবী হরফের যে মান ধরা হয় তাও কুরআন-হাদীছ বা বৈজ্ঞানিক তথ্যে প্রমাণিত নয়, তাছাড়া আরবী হরফ অনুযায়ী নামসংখ্যা বের করার পর ঐ সংখ্যার যে প্রভাব বা দিক-নির্দেশনা সাব্যস্ত করা হচ্ছে তা তো জ্যোতিষীদেরই সাব্যস্ত করা কাল্পনিক ব্যাপার।

এমনিভাবে জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রত্যেকটা উপাত্ত সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলেই প্রতিভাত হবে যে, তা একান্তই কল্পনাপ্রসূত এবং দলীলহীন আন্দাজ মাত্র।

মুফতী শফী সাহেব (রহ.) জওয়াহেরুল ফেকাহ ৩য় খণ্ডে লিখেছেন যে, আল্লামা মাহ্মূদ আলূছী তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে ঐতিহাসিক এমন বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন যেসব ক্ষেত্রে জ্যোতিঃশাস্ত্রের স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী ঘটনা যা ঘটার ছিল বাস্তবে সম্পূর্ণ তার বিপরীত ঘটেছে। বস্তুত এ শাস্ত্রের বহু বড় বড় ব্যক্তিত্ব শেষ পর্যন্ত অকপটে একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ শাস্ত্রের পরিণাম অনুমানের উর্ধ্বে নয়। প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ কুশিয়ার দায়লামী তার রচিত জ্যোতিঃশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ– "আল্ মুজ্‌মাল ফিল আহ্‌কাম"-য়ে লিখেছেন যে, জ্যোতিঃবিদ্যা হল একটা দলীলহীন বিদ্যা, এতে মানুষের কল্পনা ও অনুমানের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

আর দুটো প্রশ্নের উত্তর লিখেই প্রবন্ধ শেষ করছি। একটা প্রশ্ন হল জ্যোতিঃবিদদের সব ভবিষ্যদ্বাণী না হলেও কিছু কিছু তো বাস্তবে সত্যে পরিণত হয়। এতে অনুমিত হয় যে, এ শাস্ত্রের কিছুটা হলেও ভিত্তি রয়েছে, সবটাই অনুমাননির্ভর নয়। এ প্রশ্নের একটা উত্তর হল- যে কোন বিষয়ে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা অর্জন হলে মানুষ হাবভাব ও লক্ষণ দেখে সে সম্বন্ধে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করতেও পারে, যার কিছুটা খেটেও যায়। তাই বলে সেটা কোন প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র বলে স্বীকৃতি পেতে পারে না। এ প্রশ্নের

দ্বিতীয় উত্তর হল যা একটি প্রসিদ্ধ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, আসমানে যখন পৃথিবীর ফয়সালা ঘোষিত হয়, তখন গুপ্তসারে জিন শয়তানরা তার কিছুটা শুনে নিতে সক্ষম হয়। তারা সেই শ্রুত তথ্যের সঙ্গে আরও শতটা মিথ্যা যোগ করে গণক ও জ্যোতিষী-দের অন্তরে তা প্রক্ষিপ্ত করে, আর জ্যোতিষী ও গণকরা তা মানুষদেরকে শোনায়। পরে দেখা যায় কিছুটা সত্যে পরিণত হয়। এটা হল সেই অংশ যা আসমান থেকে জিন শয়তানরা উদ্ধার করেছিল। হাদীছটি বোখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা ও মুসনাদে আহ্‌মদে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল– ভবিষ্যত শুভ-অশুভের ক্ষেত্রে গ্রহ-নক্ষত্রের কি আদৌ কোন প্রভাব নেই? জড়জগতের অনেক কিছুর ক্ষেত্রে উর্ধ্বজগতের অনেক কিছুর যেমন প্রভাব রয়েছে, তেমনি মানুষের ভাগ্য তথা শুভ-অশুভ-এর ক্ষেত্রে গ্রহ-নক্ষত্রের কিছু প্রভাব থাকবে তাতে অসম্ভবতা কী? এরকম প্রশ্নের উত্তর হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (রহ.) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থে প্রদান করেছেন যে, শরীআত গ্রহ-নক্ষত্রের এরূপ প্রভাবের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেনি, তবে তা চর্চা করতে নিষেধ করেছে। এই চর্চা করতে কেন নিষেধ করা হয়েছে তার কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। সারকথা, শুভ-অশুভের ক্ষেত্রে গ্রহ-নক্ষত্রের কোন প্রভাব থাকলে থাকতেও পারে, তবে তা কোনো দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়; না কুরআন-হাদীছের দলীল-প্রমাণ দ্বারা, না চাক্ষুস কোন দলীল-প্রমাণ দ্বারা, না বৈজ্ঞানিক কোন দলীল-প্রমাণ দ্বারা। যা কিছু এ শাস্ত্রের উপাত্ত ও মূলনীতি, তা সবই কাল্পনিক এবং যা কিছু বলা হয় তা সেই কল্পনাপ্রসূত উপাত্ত নির্ভর বা কিছুটা অভিজ্ঞতার সংমিশ্রনযুক্ত, প্রকৃত দলীলসাপেক্ষ নয়।

এ বিষয়ে সর্বশেষ আর একটা বিষয় জানার হল- কোন পাথর (Stone) ভাগ্য বদলাতে পারে, কোন গ্রহকে খুশি করে তার অনুকূলে আনতে পারে- এরূপ বিশ্বাস করা শিরক এর পর্যায়ভুক্ত। তবে পাথরের কোন বিকিরণ ক্ষমতা (Radiative activity) যদি বৈজ্ঞানিকভাবে শারীরিক উপকারে আসে বলে প্রমাণিত হয়, তবে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করায় কোন অসুবিধা নেই।

এ প্রবন্ধে উল্লেখিত তথ্যসূত্র:

(১) الإتحاف للزبيدي
(২) فتح الملهم، الشيخ شبير أحمد العثماني
(৩) تفسير معارف القرآن، مفتي محمد شفيع
(৪) جواہر الفقہ، مفتي محمد شفيع
(৫) المقاصد الحسنة
(৬) الصحيح المسلم
(৭) السنن لابن ماجة
(৮) আকাশ ভরা সূর্য তারা, এ এম হারুন অর রশীদ
(৯) তারামণ্ডল পরিচয় ও বিশ্বের বিশালতা, কামিনী কুমার দে
(১০) নিউমারোলজী সংখ্যা/সৌভাগ্যের চাবিকাঠি, মহাজাতক শহীদ আল-বোখারী।

হস্তরেখা বিচার সম্বন্ধে আকীদা

পামিস্ট্রি (Palmistry) বা হস্তরেখা বিচার বিদ্যার মাধ্যমে যে হাতের রেখা ইত্যাদি দেখে ভাগ্যের বিষয় ও ভূত-ভবিষ্যতের শুভ-অশুভ সম্পর্কে বিশ্লেষণ দেয়া হয়, ইসলামে এরূপ বিষয়ে বিশ্বাস রাখা কুফরী।[১]

গণক সম্বন্ধে আকীদা

গণকের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করা কুফ্‌রী। কারণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ اَتٰى كَاهِنًا فَصَدَّقَه بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. (قال الهيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا أسحاق تن الربيع وهو ثقة. كذا في مجمع الزوائد– كتاب الطب)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি গণকের কাছে এল, অতঃপর সে যা বলে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করল, সে আল্লাহ কর্তৃক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর নাযিলকৃত বিধি-বিধানের সাথে কুফ্‌রী করল।[২]

রত্ন ও পাথরের প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা

মণি, মুক্তা, হিরা, চুনি, পান্না, আকীক প্রভৃতি পাথর ও রত্ন মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে, মানুষের ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে- এরূপ বিশ্বাস রাখা মুশরিকদের কাজ, মুসলমানদের কাজ নয়।[৩] পূর্বেও বলা হয়েছে, কোন পাথর (Stone) ভাগ্য বদলাতে পারে, কোন গ্রহকে খুশি করে তার অনুকূলে আনতে পারে– এরূপ বিশ্বাস করা শিরক-এর পর্যায়ভুক্ত। তবে পাথরের কোন বিকিরণ-ক্ষমতা (Radiative activity) যদি বৈজ্ঞানিকভাবে শারীরিক উপকারে আসে বলে প্রমাণিত হয়, তবে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করায় কোন অসুবিধা নেই।

তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক সম্বন্ধে আকীদা

* তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকে কাজ হওয়াটা নিশ্চিত নয়, হতেও পারে না হতেও পারে। যেমন: দুআ করা হলে রোগ-ব্যাধি আরোগ্য হওয়াটা নিশ্চিত নয়- আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে আরোগ্য হয় নতুবা হয় না। তদ্রূপ তাবীজ এবং ঝাড়-ফুঁকও একটি দুআ এবং তাবীজের চেয়ে দুআ বেশি শক্তিশালী। তাবীজ এবং ঝাড়-ফুঁকে কাজ হলেও সেটা তাবীজ বা ঝাড় ফুঁকের নিজস্ব ক্ষমতা নয় বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়ে থাকে।

* সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকই এজতেহাদ এবং অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত, কুরআন ও হাদীছে যার ব্যাপারে স্পষ্ট বলা হয়নি যে, অমুক

১. آپکے مسائل اور انکا حل . یوسف لدھیانوی

২. شرح العقائد النسفيه থেকে গৃহীত।

৩. آپکے مسائل اور انکا حل/١

তাবীজ বা অমুক ঝাড়-ফুঁক দ্বারা অমুক কাজ হবে। অতএব কোন তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁক

দ্বারা কাঙ্খিত ফল লাভ না হলে কুরআন-হাদীছের সত্যতা নিয়ে কিছু বলার বা ভাবার অবকাশ নেই।

* তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক কুরআন হাদীছের বাক্যাবলী এবং আল্লাহ্‌র আসমায়ে হুসনা দ্বারা বৈধ উদ্দেশ্যে করা হলে তা জায়েয। পক্ষান্তরে কোন কুফ্‌র শিরকের কথা থাকলে বা এরূপ কোন যাদু হলে তা দ্বারা তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক হারাম। এমনিভাবে কোন অবৈধ উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক করা হলে তা জায়েয নয়, যদিও কুরআন হাদীছের বাক্য দ্বারা তা করা হয়। মুসলিম শরীফের হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيُّ قَال : كُنَّا نَرْقِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَيْفَ تَرٰى فِيْ ذَالِكَ؟ فَقَالَ :أَعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقٰى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ. (رواه مسلم في كتاب السلام– باب استحباب الرقية من العين والنملة والحية والنظرة)

অর্থাৎ, হযরত আউফ ইবনে মালিক আশজায়ী বলেন, আমরা জাহিলী যুগে ঝাড়-ফুঁক করতাম। তাই জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! এ ব্যাপারে আপনার মত কী? তিনি বললেন, তোমরা কি দিয়ে ঝাড়-ফুঁক কর তা আমার কাছে পেশ কর। যাতে শিরক নেই এমন কিছু দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করাতে কোনো দোষ নেই। (মুসলিম)

* যেসব বাক্য বা শব্দ কিংবা যেসব নকশার অর্থ জানা যায় না তা দ্বারা তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ নয়।

* কোন বিষয়ের তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন বা সময় রয়েছে বা বিশেষ কোন শর্ত ইত্যাদি রয়েছে- এরূপ মনে করা ঠিক নয়।

* তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের জন্য কারও এজাযতপ্রাপ্ত হওয়া জরুরী– এরূপ ধারণাও ভুল।

* তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁক দ্বারা ভাল আছর হলে সেটাকে তাবীজদাতার বা আমেলের বুযুর্গী মনে করা ঠিক নয়। যা কিছু হয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই হয়।[১]

তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক কুরআন হাদীছের বাক্যাবলী দ্বারা বৈধ উদ্দেশ্যে করা হলে তা জায়েয। এ সম্পর্কে কয়েকটি দলীল নিম্নে পেশ করা হল।

عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : إِذَا فَزَعَ أَحَدُكُمْ فِيْ نَوْمه فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللهِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِه وَسُوْءِ عِقَابِه وَمِنْ شَرِّ عِبَادِه وَمِنْ شَرِّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا يَحْضُرُوْنِ. فَكَانَ عَبْدُ اللهِ (يَعْنِيْ بْنَ عَمْرٍو رض) يُعَلِّمُهَا وَلَدَهُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكَ كَتَبَهَا وَعَلَّقَهَا عَلَيْهِ. (أخرجه بن أبي شيبه في مصنفه جديث رقم ٢٤٠١٣– وفي هامشه إسناد المصنف حسن. وفيه عنعنة ابن إسحاق ومع ذالك حسنه الحافظ "نتائج الافكار".)

১. ماخوذاز معارف القرآن، شامی ج /٦، مرقاة واغلاط العوام

এ হাদীছে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর ইব্‌নুল আস (রা.) কর্তৃক তার বাচ্চাদের জন্য

তাবীজ লিখে দেয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা)

(٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِيَ الْفَزَعِ كَلِمَاتِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِه وَ شَرِّ عِبَادِه وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ. وَكَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيْهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ فَعَلَّقَه عَلَيْهِ.

(أخرجه أبو داود في الطب– باب كيف الرقى؟)

এ হাদীছেও হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর ইব্‌নুল আস (রা.) কর্তৃক তার বাচ্চাদের জন্য তাবীজ লিখে দেয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। (আবূ দাউদ)

(٣) عَنْ ثُوَيْرٍ قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٍ يَكْتُبُ لِلنَّاسِ التَّعْوِيْذَ فَيُعَلِّقُه عَلَيْهِمْ. (أخرجه ابن أبي شيبة حديث رقم ٢٤٠١١) وأخرج عن أبي جعفر ومحمد بن سيرين وعبيد الله بن عبد الله بن عمر والضحاك مايدل على أنهم كانوا يبيحون كتابة البعويذ و تعليقه أو ربطه بالعضد ونحوه. (النظر حديث رقم ٢٤٠١٢، ٢٤٠١٤، ٢٤٠١٥ و ٢٤٠١٨)

এ রেওয়ায়েতে হযরত মুজাহিদ (রহ.) কর্তৃক মানুষকে তাবীজ লিখে দেয়ার কথা বর্ণিত আছে এবং আবু জাফর, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর পুত্র উবায়দুল্লাহ ও জাহ্‌হাক প্রমুখের অন্যদেরকে তাবীজ লিখে দেয়ার কথা, সুতা বাঁধা, তাবীজ হাতে বা গলায় বাঁধা ও তাবীজ লেখা বৈধ হওয়ার মর্মে তাদের মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা)

(٤) قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ : قَرَأْتُ عَلَى اَبِيْ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَرْاَةِ وَلَادَتُهَا فَلْيَكْتُبْ بِسْمِ اللهِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحَاهَا، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِنْ نَّهَارٍ، بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ.)

এ রেওয়ায়েতে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বাচ্চা প্রসবের সময় প্রসূতীর প্রসব বেদনা লাঘব করা ও সহজে প্রসব হওয়ার জন্য বিশেষ তাবীজ শিক্ষা দেয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ রেওয়ায়েতটি সালাফী ও গায়রে মুকাল্লিদগণের সর্বজনমান্য ব্যক্তিত্ব ইব্‌নে তাইমিয়া (রহ.) তাঁর ফাতাওয়াতে উল্লেখ করেছেন। (দ্র ঃ فتاوي ابن تيميه ج/١٩ صفحه/٦٤)

বর্তমান যুগের গায়রে মুকাল্লিদ ও সালাফীগণ তাবীজ কবজকে নিষিদ্ধ, এমনকি শিরক বলে আখ্যায়িত করেন। এ প্রসঙ্গে ২য় খণ্ডে “ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ-কবচ” প্রসঙ্গ শিরোনামে আমাদের বিস্তারিত বক্তব্য ও দলীল-প্রমাণ এবং তাদের দলীল-প্রমাণ খণ্ডনসহ আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

নজর ও বাতাস লাগা সম্বন্ধে আকীদা

হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী নজর লাগার বিষয়টা সত্য। জান-মাল ইত্যাদির প্রতি বদনজর লেগে তার ক্ষতি সাধিত হতে পারে। আপনজনের প্রতিও আপনজনের বদনজর লাগতে পারে, এমনকি সন্তানের প্রতিও মাতা-পিতার বদনজর লাগতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَلْعَيْنُ حَقٌّ. (رواه مسلم في كتاب السلام– باب الطب المرض والرقى)

অর্থাৎ, নজর লাগা সত্য। (মুসলিম)

আর বাতাস লাগার অর্থ যদি হয় জিন-ভূতের বাতাস অর্থাৎ, তাদের খারাপ নজর বা খারাপ আছর লাগা, তাহলে এটাও সত্য; কেননা জিন-ভূত মানুষের উপর আছর করতে সক্ষম।

কেউ কারও কোন ভাল কিছু দেখলে যদি ماشاء الله (মাশা আল্লাহ) বলে, তাহলে তার প্রতি তার বদনজর লাগে না। আর কারও উপর কারও বদনজর লেগে গেলে যার নজর লাগার সন্দেহ হয় তার মুখ, হাত (কনুইসহ) হাঁটু এবং কাপড়ের নিচের জায়গা ধুয়ে সেই পানি যার উপর নজর লেগেছে তার উপর ঢেলে দিলে খোদা চাহে তো ভাল হয়ে যাবে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : اَلْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاَغْسِلُوْا. (رواه مسلم في كتاب السلام– باب الطب والمرض والرقى، ورواه الترمذي في أبواب الطب– باب ما جاء أن العين حق والغسل لها وقال : هذا حديث حسن صحيح. واللفظ لمسلم)

অর্থাৎ, ইব্‌নে আব্বাস (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নজর লাগা সত্য। যদি কোন কিছু ভাগ্য অতিক্রম করতে পারত, তাহলে নজর তাকে অতিক্রম করত। যখন তোমাদের কাউকে ধুয়ে দিতে বলা হয়, সে যেন ধুয়ে দেয়। (মুসলিম ও তিরমিযী)

বদনজর থেকে হেফাজতের জন্য কাল সুতা বাঁধা বা কালি কিংবা কাজলের টিপ লাগানো ভিত্তিহীন ও কুসংস্কার।

কুলক্ষণ ও সুলক্ষণ সম্বন্ধে আকীদা

ইসলামী আকীদামতে কোন বস্তু বা অবস্থা থেকে কুলক্ষণ গ্রহণ করা বা কোন সময়, দিন ও মাসকে খারাপ মনে করা বৈধ নয়। এমনিভাবে হাদীছ দ্বারা স্বীকৃত নয়- এরূপ কোন লক্ষণ মানা বৈধ নয়। তবে কেউ কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা বা দুশ্চিন্তায় রয়েছে- এরূপ মুহূর্তে ঘটনাক্রমে বা কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবে খুশি বা সাফল্যসূচক কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হলে কিংবা এরূপ কিছু দৃষ্টিগোচর হলে সেটাকে সুলক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এটা মূলত কোন শব্দ বা বস্তুর প্রভাবকে বিশ্বাস করা নয়, এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র রহমতের আশাকে শক্তিশালী করা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সম্বন্ধে আকীদা

এক হাদীছে বলা হয়েছে,

تَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّ سَبْعَيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِيْ النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً. قَالُوْا : مَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ (رواه الترمذي في أبواب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم – باب افتراق هذه الأمة وقال : هذا حديث حسن غريب.)

অর্থাৎ, আমার উম্মত তেহাত্তর ফির্কায় (দলে) বিভক্ত হয়ে পড়বে, তন্মধ্যে মাত্র একটি দল হবে মুক্তিপ্রাপ্ত (অর্থাৎ, জান্নাতী) আর বাকি সবগুলো দল হবে জাহান্নামী। জিজ্ঞাসা করা হল ইয়া রসূলাল্লাহ! সেই মুক্তিপ্রাপ্ত দল কারা? তিনি (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন, তারা হল আমি ও আমার সাহাবীগণ যে মত ও পথের ওপর রয়েছি তার অনুসারীগণ।

এ হাদীছের মধ্যে যে মুক্তিপ্রাপ্ত বা জান্নাতী দল সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাঁদেরকেই বলা হয় "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত।" নামটির মধ্যে 'সুন্নাত' শব্দ দ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মত ও পথ এবং 'জামাআত' শব্দ দ্বারা বিশেষভাবে সাহাবায়ে কেরামের জামাআত উদ্দেশ্য। মোটকথা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের মত ও পথের অনুসারীদেরকেই বলা হয় "আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত"। ইসলাম ধর্মে বিভিন্ন সময়ে যেসব সম্প্রদায় ও ফির্কার উদ্ভব হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বযুগে এ দলটিই হল সত্যাশ্রয়ী দল। সর্বযুগে ইসলামের মৌলিক আকাইদ বিষয়ে হকপন্থী গরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম যেভাবে কুরআন, হাদীছ ও সাহাবায়ে কেরামের মত ও পথের অনুসরণ করে আসছে, এ দলটি তারই অনুসরণ করে আসছে। এর বাইরে যারা গিয়েছে, তারা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বহির্ভূত বিপথগামী ও বাতিল সম্প্রদায়। এরূপ বহু বাতিল সম্প্রদায় কালের অতল গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, যারা রয়েছে তারাও বিলীন হবে, হকপন্থী দল চিরকাল টিকে থাকবে।

দ্বীনের চার বুনিয়াদ সম্বন্ধে আকীদা

দ্বীনের বুনিয়াদ অর্থাৎ, যে সমস্ত জিনিসের উপর শরীআতের ভিত্তি, তা হল চারটি। এই চারটি দ্বারা যা প্রমাণিত নয়, তা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। বুনিয়াদ বা ভিত্তি চতুষ্ঠয় এই–

১. কুরআন।

২. হাদীছ/সুন্নাত। হাদীছ/সুন্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা (قول), কাজ (فعل) ও সমর্থন (تقرير)। প্রথমটাকে সুন্নাতে কওলী, দ্বিতীয়টাকে সুন্নাতে ফে'লী এবং তৃতীয়টাকে সুন্নাতে তাক্রীরী বলে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদার পবিত্র যুগের অনুসরণীয় আমলসমূহ হাদীছের এবং শরীআতের দলীলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তারাবীর বিশ রাকআত এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।[১]

১. بدائع الكلام . نولانا المفتي يوسف التاؤلوي

কুরআন-হাদীছের ভাষ্যসমূহ (نصوص)কে জাহেরী অর্থে গ্রহণ করতে হবে যতক্ষণ

জাহেরী অর্থ থেকে ফিরে যাওয়ার কোন কারণ (قرینۂ صارفہ) না পাওয়া যাবে। বিনা কারণে জাহেরী অর্থ পরিত্যাগ করে বাতেনী অর্থ গ্রহণ করা এলহাদ (الحاد) বা ধর্মত্যাগ ও ধর্মবিকৃতির নামান্তর।[১]

৩. ইজ্মা। যেসব বিষয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতের[২] ইজ্মা বা ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা হক এবং সঠিক। ইজ্মা দলীল হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ হল কুরআনের আয়াত–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ. الآية.

অর্থাৎ তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ১১০)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَ مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ.

অর্থাৎ, কারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি এই রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং এই মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তাহলে সে যেদিকে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। (সূরা: ৪-নিছা: ১১৫) এখানে বোঝানো হয়েছে, মুমিনগণ যে পথে চলে সেটা হক। এর ব্যতিক্রম চললে জাহান্নামের পথ সুগম হবে। এ বক্তব্য ইজ্মা দলীল হওয়াকে বোঝায়।

ইজ্মা দলীল হওয়ার ব্যাপারে হাদীছ থেকে প্রমাণ হল–

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِيْ عَلٰى ضَلَالَةٍ.أخرجه كثيرون. انظر المقاصد الحسنة)

অর্থাৎ, বিভ্রান্তির উপর আমার উম্মতের ঐক্যমত্য হবে না।

অন্য এক হাদীছে আছে,

يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ. (المصدر السابق)

অর্থাৎ, জামাআতের উপর আল্লাহ্র সাহায্য রয়েছে। আর যে জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জাহান্নামে পতিত হবে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া إقامة الدليل গ্রন্থে বলেছেন,

اجماعهم حجة قاطعة يجب اتباعها بل هي أوكد الحجج وهي مقدمة على غيرها.

অর্থাৎ, উম্মতের ইজমা একটি অকাট্য দলীল, তার অনুসরণ করা ওয়াজিব। বরং ইজমা অন্য দলীলগুলোর চেয়ে বেশি তাগিদপূর্ণ।

৪. চতুর্থ বুনিয়াদ হল কিয়াস। অর্থাৎ, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের কিয়াস। তাদের কিয়াস মানার অর্থ তাদের তাকলীদ করা। তাক্লীদের সারকথা হল কোন বুযুর্গ ও বিজ্ঞ

১. شرح العقائد النسفيه

২. এখানে "উম্মত" দ্বারা উদ্দেশ্য উলামা ও সুলাহা। সাধারণ মূর্খ মানুষের ইজ্মা দলীল নয়। عقائد الاسلام . عبد الحق حقانى

আলেম ব্যক্তির হক্কানিয়্যাতের প্রতি আস্থা রেখে –যে, তিনি কুরআন ও হাদীছ

মোতাবেক এ উক্তিটি করেছেন এবং সে মোতাবেক তিনি এ কাজটি করেছেন– তাঁর কথা ও কাজের অনুসরণ করা।[১]

কিয়াস বলা হয়–

القياس في اللغة عبارة عن التقدير، يقال : "قست النعل بالنعل" إذا قَدَّرْتَه وسَوَّيْتَه. وعند الأصوليين هو تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلم. (قواعد الفقه)

অর্থাৎ, আভিধানিকভাবে কিয়াস্-এর অর্থ হল পরিমাপ, অনুপাত ও তুলনা করা। যেমন: একটা স্যাণ্ডেলকে আরেকটার সাথে পরিমাপ করে দেখলে বলা হয় সে এক স্যাণ্ডেলকে আরেকটার উপর কিয়াস করেছে। উসূলে ফেকাহ্-এর পরিভাষায় কিয়াস বলা হয় (কুরআন হাদীছে বর্ণিত) কোন মূল বিধান থেকে (কুরআন হাদীছে বর্ণিত হয়নি- এমন) কোন শাখা বিষয়ের হুকুম ও কারণকে পরিমাপ বা অনুমান করে নেয়া। অর্থাৎ, ঐ শাখা বিষয়ের হুকুম ও কারণ ঐ মূল বিধান থেকে বের করে নেয়া।

কিয়াসের বুনিয়াদ কখনো হয় কুরআনের ওপর। যেমন: কুরআনে উল্লেখিত শরাবের উপর বর্তমান গাঁজা, ভাং, আফিম ও হেরোইনকে কিয়াস করে এগুলোকে হারাম বলা।

কিয়াসের বুনিয়াদ কখনো হয় হাদীছের ওপর। যেমন: হাদীছে এসেছে গম, যব, খোরমা, লবণ এবং স্বর্ণ ও রূপা- এই ছয় প্রকার মালামালকে নগদে কমবেশ করা ব্যতীত বিক্রয় করতে হবে, বেশি গ্রহণ করা সূদ হবে। এর মধ্যে একই প্রকার (جنس)-এর একটাকে নগদ প্রদান ও অন্যটাকে বাকি রাখাও নিষেধ হবে। কারণ, তাতে যে পক্ষ বাকি রাখল সে যেন বেশি গ্রহণ করল (এ হিসাবে যে, বাকি রাখাও একটা লাভ)। এ হাদীছে উল্লেখিত ছয় প্রকার মালামালের হুকুমের ওপর ঐ সব মালামালের হুকুমও কিয়াস করা হবে যা এই ছয় প্রকারের বাইরে তবে একই প্রকার (جنس) ভুক্ত।

কিয়াসের বুনিয়াদ কখনো হয় ইজ্মার উপর। যেমন উম্মতের সর্বসম্মত মত হল কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে সহবাস করলে ঐ নারীর মা ঐ পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যায়। এখন হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর উপর কিয়াস করে বলেছেন, কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে যেনা করলেও ঐ নারীর মা ঐ পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

১. যারা কিয়াসকে সনদ মনে করেন না অর্থাৎ, কিয়াসকে দলীল হিসাবে মানেন না এবং তারা তাকলীদে বিশ্বাস করেন না, তাদেরকে বলা হয় জাহিরিয়্যা, যাদের সর্দার হলেন দাউদ জাহিরী। ইবনে হায্ম এবং আল্লামা শাওকানীও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতি গায়রে মুকাল্লিদ বা আহ্লে হাদীছ বলে যারা পরিচিত, তারা মুখে তাকলীদের বিরুদ্ধে বললেও কার্যত উপরোক্ত আলেমদের তাক্লীদ করে থাকেন। এ সম্পর্কে ২য় খণ্ডে "তাক্লীদ প্রসঙ্গ" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তাক্লীদ ও চার মাযহাব সম্বন্ধে আকীদা

তাক্লীদ (تقليد)-এর আভিধানিক অর্থ গলায় হার পরিধান করানো। তাক্লীদের পারিভাষিক সংজ্ঞা হল–

التقليد اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقية من غير نظر إلى الدليل كأنَّ هذا المتبع جعل قول الغير أو فِعْلَه قلادة في عنقه من غير مطالبة دليل.

অর্থাৎ, পরিভাষায় তাক্লীদ বলা হয় অন্যের কোন উক্তি বা কর্ম সঠিক– এরূপ সুধারণার ভিত্তিতে কোন দলীল-প্রমাণ না দেখে তার অনুসরণ করা। যেন এই অনুসরণকারী ব্যক্তি অন্যের কথা বা কাজকে প্রমাণ তলব করা ছাড়া নিজের গলার হার বানিয়ে নিল।[১]

তাক্লীদের সারকথা হল– কোন বুযুর্গ ও বিজ্ঞ আলেম ব্যক্তির হক্কানিয়্যাতের প্রতি আস্থা রেখে –যে, তিনি কুরআন ও হাদীছ মোতাবেক এ উক্তিটি করেছেন এবং সে মোতাবেক তিনি এ কাজটি করেছেন– তাঁর কথা ও কাজের অনুসরণ করা। আর এই অনুসরণকে সংশ্লিষ্ট কথা ও কাজের দলীল-প্রমাণ জানার ওপর ঝুলন্ত না রাখা। কিন্তু তার দলীল-প্রমাণ যদি তখন জানা হয় অথবা পরবর্তীতে জানা যায়, তাহলে এটা তাক্লীদের পরিপন্থী নয়। মোটকথা, তাক্লীদে দলীল-প্রমাণ অন্বেষণ অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে দলীল-প্রমাণ জানা এর পরিপন্থী হয় না।

প্রত্যেক মুসলমানের উপর মূলত আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য ও অনুসরণ করা ফরয। কুরআন এবং হাদীছের অনুসরণের মাধ্যমেই এ ফরয আদায় হবে। কিন্তু সরাসরি যারা কুরআন হাদীছের ভাষা-আরবী বোঝেন না, কিংবা আরবী ভাষা বুঝলেও কুরআন-হাদীছ যথাযথভাবে অনুধাবন ও তা থেকে মাসআলা- মাসায়েল চয়ন ও ইজতেহাদ করার জন্য আরবী ব্যাকরণ, আরবী অলংকার, আরবী সাহিত্য, উসূলে ফেকাহ, উসূলে হাদীছ, উসূলে তাফসীর ইত্যাদি যেসব আনুষঙ্গিক শাস্ত্রগুলো বোঝা প্রয়োজন নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেগুলো পাঠ করেননি বা পাঠ করলেও গভীরভাবে এসব বিদ্যায়া পারদর্শী হতে পারেননি, তাদের পক্ষে সরাসরি সব মাসআলা কুরআন হাদীছ থেকে চয়ন ও ইজতেহাদ (গবেষণা) করে বের করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি তা নিরাপদও নয়। বরং গভীর বুৎপত্তি ও দক্ষতার অভাবে এরূপ লোকদের গবেষণা ও ইজ্তিহাদে অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর শিকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই স্বাভাবিক। তাই এসব শ্রেণীর লোকদের জন্য বিস্তারিত মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধানের নিমিত্তে এমন কোন বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই, যিনি উপরোক্ত বিদ্যাসমূহে পারদর্শী ও দক্ষ হওয়ার ফলে সরাসরি সব মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধান কুরআন হাদীছ থেকে চয়ন ও ইজতেহাদ করে বের করতে সক্ষম। এরূপ বিজ্ঞ ও ইজতেহাদের ক্ষমতা সম্পন্ন আলেম তথা মুজতাহিদ ইমামের শরণাপন্ন হওয়া এবং তিনি কুরআন-হাদীছ থেকে চয়ন ও

১. كشاف اصطلاحات الفنون থেকে গৃহীত।

ইজতেহাদ করে সব মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধান যেভাবে বলেন তার অনুসরণ করাকেই বলা হয় উক্ত ইমামের তাকলীদ করা বা উক্ত ইমামের মাযহাব অনুসরণ করা। তাকলীদ করা তাই উপরোক্ত শ্রেণীসমূহের লোকদের জন্য ওয়াজিব এবং যে ইমামেরই হোক এরূপ যেকোন এক জনেরই তাকলীদ করা ওয়াজিব। এক এক মাসআলায় এক এক জনের অনুসরণ করার অবকাশ নেই এবং সেরূপ করা জায়েযও নয়, কারণ তাতে সুবিধাবাদ ও খাহেশাতের অনুসরণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তার ফলে গোমরাহীর পথ উন্মুক্ত হয়।

ইতিহাসে অনুরূপ মুজতাহিদ ইমাম অনেকেই অতিবাহিত হয়েছেন। তবে তন্মধ্যে বিশেষভাবে চারজন ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছেন এবং তাঁদের চয়ন ও ইজতেহাদকৃত মাসআলা-মাসায়েল তথা তাঁদের মাযহাব ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে। তাই আমরা চার ইমাম ও চার মাযহাব-এর কথা শুনে থাকি। উক্ত চার জন ইমাম হলেন–

১. হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.),
২. হযরত ইমাম শাফিয়ী (রহ.),
৩. হযরত ইমাম মালেক (রহ.) ও
৪. হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)।

তাঁদের মাযহাবকেই যথাক্রমে হানাফী মাযহাব, শাফিয়ী মাযহাব, মালেকী মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাব বলা হয়ে থাকে। আমাদের আকীদা হল এ সব মাযহাবই হক, তবে অনুসরণ যে কোন একটারই করতে হবে, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। উপমহাদেশের মুসলমানসহ পৃথিবীর অধিকসংখ্যক মুসলমান হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর তথা হানাফী মাযহাব-এর অনুসারী।

সালাফী ও গায়রে মুকাল্লিদগণ তাক্‌লীদের প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন। এমনকি তারা তাক্‌লীদকে প্রায় শিরক পর্যায়ভুক্ত মনে করেন। এ প্রসঙ্গে ২য় খণ্ডে তাক্‌লীদের প্রয়োজন প্রমাণে কুরআন, হাদীছ, তা'আমুলে সাহাবা ও কিয়াস প্রভৃতি দলীল-প্রমাণ-যোগে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

ইবাদত ও শরীআতের বিভিন্ন প্রকার আহকাম সম্বন্ধে আকীদা

* নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত যেমন শরীআতের ফরয, তেমনি

* মু'আমালাত তথা লেন-দেন, কায়-কারবার, আয়-উপার্জন ইত্যাদিও শরীআতের নিয়মমত পরিচালিত করা ফরয। ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সবল থেকে দুর্বলের অধিকার আদায়, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা, ইসলামী হুদূদ প্রতিষ্ঠা, ইসলামী জিহাদ পরিচালনা প্রভৃতি প্রয়োজনে ইমাম/খলীফা মনোনীত করা ওয়াজিব।[১]

১. عقائد الاسلام. الأحكام السلطانيه وغيرها

হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহ.), শায়খুল হিন্দ (রহ.), হাবীবুর রহমান উছমানী (রহ.) প্রমুখ উলামায়ে কেরামের মতে সরকারী ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমীর না হলেও নিজেরা একজন আমীর মনোনীত করে নিবে, যার দ্বারা মাযহাবী ও ধর্মীয় প্রয়োজন নিষ্পন্ন করা যায়।[১]

* ইবাদত ও মু'আমালাতের ন্যায় মু'আশারাত তথা পারস্পরিক আচার-আচরণ ও সমাজ-সামাজিকতা দোরস্ত করা এবং আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার রক্ষা করাও ফরয।[২]

* নামায, রোযা, প্রভৃতি শরীআতের জাহেরী বিধানের উপর আমল করা যেমন জরূরী, তদ্রূপ এখ্‌লাস, তাক্‌ওয়া, সবর, শোক্‌র প্রভৃতি কলবের গুণাবলী অর্জন এবং রিয়া, তাকাব্বুর প্রভৃতি অন্তরের ব্যাধি দূর করা তথা শরীআতের বাতেনী বিধানাবলীর ওপর আমল করাও ওয়াজিব। এই বাতেনী বিধানাবলীর ওপর আমল করাকে বলা হয় তায্‌কিয়ায়ে নফ্‌স (تزكيۂ نفس) বা আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধির এই সাধনাকে বলা হয় আধ্যাত্মিক সাধনা। আর এই শাস্ত্রকে বলা হয় তাসাওউফ বা সূফীবাদ।

কুরআন-হাদীছে তাসাওউফ শব্দটি উল্লেখিত হয়নি। তবে ইহ্‌সান (احسان) শব্দটি প্রসিদ্ধ হাদীছে জিব্রীলে এসেছে। তাসাওউফ-এর মামূলাত এই ইহ্‌সান-এর মাকাম অর্জনের উদ্দেশ্যেই পালন করা হয়। অতএব এটাও কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত বলতে হবে। বস্তুত ইহ্‌সান (احسان) হল ফযীলতের স্তর। আর তাসাওউফ এই ফযীলতের স্তর অর্জন করার ওসীলা বা মাধ্যম। অতএব ইহ্‌সানের ন্যায় তাসাওউফ অর্জন করাও কাম্য। তাসাওউফ-এর সমালোচনাকারীগণ মহা ভুলে নিপতিত।[৩]

* আকেল বালেগ বান্দা কখনও এমন স্তরে উন্নিত হয় না যে, তার থেকে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ তথা শরীআতের বিধি-বিধান রহিত হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান সংক্রান্ত আদেশ-নিষেধ শর্তহীনভাবে এসেছে এবং এ বিধি-বিধান কখনও রহিত না হওয়ার ব্যাপারে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের ইজ্‌মা' সংঘটিত হয়েছে।[৪]

কিছু আধুনিক ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে আকীদা

* জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মানা, জনগণকে আইনের উৎস মানা ঈমান পরিপন্থী। কেননা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে আল্লাহ্‌কেই সর্বময় ক্ষমতার উৎস স্বীকার করা হয় এবং বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র।

* প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণকেই সকল ক্ষমতার উৎস এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আইন বা বিধানের অথরিটি বলে স্বীকার করা হয়, তাই প্রচলিত গণতন্ত্র- এর ধারণা ঈমান-আকীদার পরিপন্থী।

১. اسلام میں امامت وامارت کا تصور حبیب الرحمن قاسمی
২. اسلامی تہذیب . اشرف علی تہانوی
৩. بدائع الكلام . مولانا المفتي يوسف التاؤلوي প্রভৃতি থেকে গৃহীত।
৪. شرح العقائد النسفيه থেকে গৃহীত।

* গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র[১] ইত্যাদি তন্ত্রমন্ত্রকে মুক্তির পথ মনে করা এবং একথা বলা যে, ইসলাম সেকেলে মতবাদ, এর দ্বারা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এই যুগে উন্নতি অগ্রগতি সম্ভব নয়- এটা কুফ্‌রী।

* "ধর্ম নিরপেক্ষতা"-এর অর্থ যদি হয় কোন ধর্মে না থাকা, কোন ধর্মের পক্ষ অবলম্বন না করা, কোন ধর্মকে সমর্থন দিতে না পারা, তাহলে এটা কুফ্‌রী মতবাদ। কেননা ইসলাম ধর্মে থাকতেই হবে, ইসলামের পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে, ইসলামী কার্যক্রমকে সমর্থন দিতেই হবে। আর যদি ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত না করা, তাহলে সে ধারণাও ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী। কেননা, ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকলে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা ফরয। আর কোন ফরযকে অস্বীকার করা কুফ্‌রী। যদি ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ শুধু এতটুকু হয় যে, সকল ধর্মাবলম্বী লোক নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারবে, জোর-জবরদস্তী কাউকে অন্য ধর্মে প্রবেশ করানো যাবে না, তাহলে এতটুকু ধারণা ইসলাম পরিপন্থী হবে না।[২]

* ডারউইন-এর বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করা কুফ্‌রী অর্থাৎ, একথা বিশ্বাস করা যে, বিবর্তন অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হতে হতে এক পর্যায়ে বানর থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ বিশ্বাস ইসলাম ও ঈমান পরিপন্থী। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকেই মানব জাতির বিস্তৃতি ঘটেছে। বিবর্তনবাদ সম্পর্কে ২য় খণ্ডে সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

* ইসলাম মসজিদের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে, ইসলাম ব্যক্তিগত ব্যাপার, ব্যক্তিগত জীবনে এটাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে এটাকে টেনে আনা যাবে না- এরূপ বিশ্বাস করা কুফ্‌রী। কেননা, এভাবে ইসলামের ব্যাপকতাকে অস্বীকার করা হয়। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী কুরআন-হাদীছে তথা ইসলামে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় যাবতীয় ক্ষেত্রের সকল বিষয়ে শাশ্বত সুন্দর দিক-নির্দেশনা রয়েছে।

* নামায রোযা, হজ্জ, যাকাত, পর্দা করা ইত্যাদি ফরযসমূহকে ফরয তথা অত্যাবশ্যকীয় জরূরী মনে না করা এবং গান, বাদ্য, সূদ, ঘুষ ইত্যাদি হারামসমূহকে হারাম মনে না করা এবং এগুলোকে মৌলভীদের বাড়াবাড়ি বলে আখ্যায়িত করা কুফ্‌রী। কেননা কোন ফরযকে ফরয বলে স্বীকার না করা বা কোন হারামকে জায়েয মনে করা কুফ্‌রী।

১. গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট শিরোনামের আলোচনা দেখুন।

২. ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন পঞ্চম অধ্যায়ের "ধর্মনিরপেক্ষতা" শীর্ষক আলোচনা।

* টুপী, দাড়ি, পাগড়ী, মসজিদ, মাদ্রাসা, আলেম-মৌলভী ইত্যাদিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, এগুলোকে হেয় দৃষ্টিতে দেখা, এগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা মারাত্মক গোমরাহী। ইসলামের কোন বিষয় –তা যত সামান্যই হোক তা– নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

* আধুনিককালের নব্য শিক্ষিতদের কেউ কেউ মনে করেন যে, কেবল ইসলামই নয়, হিন্দু, খৃষ্টান, ইয়াহূদী, বৌদ্ধ নির্বিশেষে যেকোনো ধর্মে থেকে মানবতা, মানব-সেবা পরোপকার প্রভৃতি ভাল কাজ করলে পরকালে মুক্তি হবে। এরূপ বিশ্বাস করা কুফ্‌রী। একমাত্র ইসলাম ধর্ম অনুসরণের মধ্যেই পরকালীন মুক্তি নিহিত– একথায় বিশ্বাস রাখা ঈমানের জন্য জরূরী। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ.

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ১৯)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থাৎ, কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করলে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। এমন ব্যক্তি পরকালে চির হতভাগাদের দলে থাকবে। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৮৫)

হাদীছে এসেছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا لَمَا وَسِعَه إِلَّا اِتِّبَاعِيْ. (مشكوة عن أحمد والبيهقي)

অর্থাৎ, হযরত মূসা নবীও যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ না করে তাঁরও কোনো উপায় থাকত না।

বি. দ্র. এ গ্রন্থে যেসব বিষয়কে কুফ্‌রী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, কারও মধ্যে তা পরিলক্ষিত হলেই তাকে কাফের বলে ফতওয়া দিয়ে দেয়া যাবে না। কেননা কুফ্‌রের মধ্যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যদিও সব স্তরের কুফ্‌রী গোমরাহী এবং যার মধ্যে তা পাওয়া যাবে সে পথভ্রষ্ট, গোমরাহ এবং আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বহির্ভূত, তবে কুফ্‌রের কোন্ স্তর পাওয়া গেলে কাউকে কাফের বলে ফতওয়া দেয়া যায় তা বিজ্ঞ উলামা ও মুফ্‌তীগণই নির্ণয় করতে পারেন। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের পক্ষে বিজ্ঞ উলামা ও মুফ্‌তীগণের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত নিজেদের থেকে কোন ফতওয়া বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা সমীচীন হবে না। কাউকে কাফের আখ্যায়িত করার জরূরী কয়েকটি মূলনীতি এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে।

কতিপয় মাসআলা সম্বন্ধে আকীদা

* সফর এবং একামত সর্বাবস্থায় নির্দিষ্ট মেয়াদে মোজায় মাসেহ করা জায়েয। হাসান বসরী (রহ.) বলেন, আমার নিকট সত্তর জন সাহাবী মোজায় মাসেহ করা সম্পর্কে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবুল হাসান কারখী (রহ.) বলেন, যে

ব্যক্তি মোজায় মাসেহ করাকে জায়েয মনে করে না, আমি তার কাফের হয়ে যাওয়ার আশংকা বোধ করি।[১] মোজায় মাসেহ করাকে জায়েয মনে করা আহ্‌লে হকের আলামতের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

* জমহুরের অনুসরণ করা ওয়াজিব। জমহুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ।[২]

* এক শব্দে তিন তালাককে তিন তালাকই গণনা করা হবে, এ ব্যাপারে ইজ্‌মা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআন, হাদীছ, ইজ্‌মা ও কিয়াস– শরীআতের এই চার ধরনের দলীল মওজূদ রয়েছে।[৩]

* সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাসমূহ ফরযসমূহের পরিপূরক (مكملات)।

* জুমুআয় খুতবা দেয়া ফরয। খুতবা আরবীতেই হতে হবে তা কুরআন থেকেই বুঝা যায়। কেননা কুরআনে খুতবাকে যিক্‌র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যিক্‌র (ذكر) একমাত্র আরবীতেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللهِ.الآية.

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌র যিক্‌রের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। (সূরা: ৬২-জুমুআ: ৯)

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে "যিক্‌র" বলে খুতবাকে বোঝানো হয়েছে। এর সমর্থন পাওয়া যায় মুসলিম ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েতে যার মধ্যে বলা হয়েছে,

فَإِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلٰئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ. (رواه مسلم في كتاب الجمعة– باب فضل التبكير الجمعة باقتبار الساعات، ورواه الترمذي في أبواب الجمعة– باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة وقال : هذا حديث حسن صحيح. واللفظ لتسلم)

অর্থাৎ, যখন ইমাম বের হন তখন ফেরেশতাগণ যিক্‌র শ্রবণ করার জন্য উপস্থিত হন।

এ হাদীছেও খুতবাকে "যিক্‌র" বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

* কোন মুসলমানকে হত্যা করা জায়েয নয়, যদি সংগত কারণ দেখা না দেয়। সংগত কারণ যেমন বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যেনা করা, কাউকে হত্যা করা, ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করা প্রভৃতি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً.

অর্থাৎ, কোন মুমিনের জন্য কোন মুমিনকে হত্যা করা বৈধ নয়, তবে ভুলবশত অবস্থার কথা ব্যতিক্রম। (সূরা: ৪-নিসা: ৯২)

হাদীছে এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ و أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدٰى ثَلَاثٍ : اَلثَّيِّبُ الزَّانِيْ وَالنَّفْسُ

১. بدائع الكلام . مولانا المفتي يوسف التاؤلوي ২. أيضا ৩. أيضا

بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِه اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. (رواه الترمذي في أبواب الديات– باب ما جاء لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقال : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.)

অর্থাৎ, যে মুসলমান ব্যক্তি এক আল্লাহ ও আমার রসূল হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, তাকে হত্যা করা জায়েয নয় তবে তিনটার যে কোন কারণে। যথা:–

(১) বিবাহিত যেনাকারী,
(২) জানের বদলে জান ও
(৩) স্বধর্ম ত্যাগকারী জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি। (তিরমিযী)

* সূদ (-এর সর্বপ্রকার) হারাম। এ ব্যাপারে কুরআনের স্পষ্ট ভাষ্য (نص) রয়েছে। এসত্ত্বেও যে লোক সূদ জায়েয হওয়ার ফতওয়া দিবে সে নিজে গোমরাহ এবং অন্যকে গোমরাহকারী।

* নেককার বা বদকার সকলের জানাযা পড়তে হবে। যদি সে "আহ্‌লে কিবলা"[১] -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صَلُّوْا عَلٰى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ. (رواه الدار قطنى في باب صفة من تجوز الصلاة معه الصلاة عليه برقم ١٧٥٠. وفي إسناده مكحول عن أبي هريرة وهو منقطع ومن دونه من الرواه ثقات. وفي روايه منه : الصلاة على كل من مات من أهل القبلة.)

অর্থাৎ, নেককার বদকার সকলের জানাযা নামায পড়। (দারাকুতনী)

এ হাদীছের আলোকে কাফের মুশরিক ব্যতীত সব ধরনের পাপীর জানাযা নামায পড়া হবে। তবে নেতৃস্থানীয় আলেম আত্মহত্যাকারী বা প্রকাশ্য বড় ধরনের পাপীর জানাযা পড়ানো থেকে বিরত থাকবেন লোকদের তাম্বীহ হওয়ার জন্য। এরূপ ক্ষেত্রে ছোটখাট কোন আলেম উক্ত জানাযার ইমামত করাবেন।

* মুসলমানদের ক্ষতি দূর করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত যাদু শিক্ষা করা ও দেয়া কুফ্‌রী নয়। বরং কুফ্‌রী হল যাদুতে বিশ্বাস করা এবং তদনুযায়ী আমল করা। হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয় প্রয়োজনে মানুষকে যাদু শিক্ষা দিয়েছিলেন। সাথে সাথে তাতে বিশ্বাস ও তদনুযায়ী আমল করতে নিষেধও করেছিলেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. الآية.

অর্থাৎ, তারা কাউকে শিক্ষা দিত না এ কথা না বলে যে, আমরা পরীক্ষা। অতএব তোমরা কুফ্‌রী কর না। (সূরা: ২-বাকারা: ১০২)

* সালাফে সালেহীন-এর সমালোচনা করা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পথ রচনা করে। সালাফে সালেহীনের ভাল আলোচনা করাই হকপন্থীদের অনুসৃত নীতি।[২]

১. "আহ্‌লে কিব্‌লা" একটি পরিভাষা। যে ব্যক্তি জরূরিয়াতে দ্বীনকে স্বীকার করে, তাকে আহ্‌লে কিবলা বলা হয়। জরূরিয়াতে দ্বীনের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন ২১৪ নং পৃষ্ঠা।

২. بدائع الكلام . مولانا المفتي يوسف التاؤلوي

* মক্কা মুকাররমা এবং মদীনা মুনাওয়ারা দুটি পবিত্র ভূমি। তার সমতুল্য কোন ভূমি নেই। অনন্তর জমহুরের মতে মদীনা মুনাওয়ারার তুলনায় মক্কা অধিক মর্যাদা রাখে।[১]

ঈমান সম্পর্কিত কয়েকটি আকীদা

* সংক্ষিপ্ত ঈমান (ایمان اجمالی)-এর ক্ষেত্রে খাঁটি দেলে শুধু কালিমায়ে তাইয়্যেবা বা কালিমায়ে শাহাদাত বলে নেয়াই যথেষ্ট। অতএব কেউ মুসলমান হতে চাইলে সে কালিমায়ে তাইয়্যেবা কিংবা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে। বোবা হলে ইশারায় তাওহীদ ও রেসালাতের স্বীকৃতি দিবে।

কালিমায়ে তাইয়্যেবা এই–

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ.

কালিমায়ে শাহাদাত এই–

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

* কালিমার মধ্যে আল্লাহ তাআলার যে একত্ববাদ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যে রেসালাত (রসূল হওয়া) সম্বন্ধে স্বীকৃতি রয়েছে তা জেনে ও বুঝে মেনে নিতে হবে এবং দ্বিধাহীন চিত্তে তা গ্রহণ করতে হবে। কালিমার এই অর্থ ও বিষয়বস্তু উপলব্ধি ব্যতিরেকে কেবল মুখে মুখে কালিমা উচ্চারণ করে নিলেই সে আল্লাহ্‌র কাছে মুমিন ও মুসলমান বলে গণ্য হবে না।[২]

* বিস্তারিত ঈমান (ایمان تفصیلی)-এর মধ্যে যা কিছু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত[৩] আছে, তা একে একে বিস্তারিতভাবে সবটা বিশ্বাস করতে হবে এবং সেগুলো সত্য হওয়ার স্বীকৃতি দিতে হবে। কেউ তার কোনো একটি অস্বীকার করলেও সে কাফের হয়ে যাবে এবং অনন্তকাল তাকে জাহান্নামে থাকতে হবে।[৪]

উল্লেখ্য, ঈমানের জন্য মৌখিক স্বীকৃতির যে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হল, তা শামসুল আইম্মা ও ইমাম ফখ্রুল ইসলামের নিকট। তবে ওজরের সময় তাদের নিকটও শুধু অন্তরের বিশ্বাস ঈমানের জন্য যথেষ্ট। যেমন: হত্যার হুমকি দিয়ে আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রসূলকে অস্বীকার করার জন্য কাউকে বাধ্য করা হলে সে যদি মুখে অস্বীকার

---

১. ইমাম মালেকের মতে মদীনার মর্যাদা অধিক। তবে জমহুরের মতে মদীনার মধ্যে রওযায়ে আত্হারের স্থানটুকুর মর্যাদা পৃথিবীর সব স্থানের চেয়ে অধিক। بدائع الکلام থেকে গৃহীত।

২. دین کیا ہے؟ منظور نعمانی

৩. "নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত" বলতে বোঝায় যা কিছু কুরআনের স্পষ্ট ইবারতের দ্বারা এবং মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা ছাবিত ও প্রমাণিত। এরূপ অনেকগুলো বিষয় রয়েছে, তবে তার মধ্যে প্রধান হল ৬টি বিষয়, যা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। عقائد اسلام . عبد الحق حقانی

৪. প্রাগুক্ত।

করে কিন্তু তার অন্তরে বিশ্বাস থাকে, তাহলে তাতে তার ঈমান বহাল থাকবে। এ ক্ষেত্রে মুখের স্বীকৃতি ঈমানের জন্য অপরিহার্য নয়। আর জমহুর মুহাক্কিকীন ও ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদীর নিকট ঈমানের জন্য শুধু অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট। তাদের নিকট মৌখিক স্বীকৃতি শুধু পার্থিব বিধানাবলী কার্যকরী হওয়ার জন্য। অতএব কেউ শুধু অন্তরে বিশ্বাস করলে মুখে স্বীকার না করলে সে পরকালে আল্লাহ্‌র কাছে মুমিন বলে গণ্য হবে, তবে দুনিয়াতে তার উপর মুমিনের বিধান জারী হবে না। পক্ষান্তরে কেউ মুখে স্বীকার করলে আর অন্তরে অবিশ্বাস থাকলে দুনিয়াতে তার উপর মুমিনের বিধান জারী হবে তবে পরকালে সে মুমিন-মুসলমান বলে গণ্য হবে না।[১]

* বিস্তারিত যেসব বিষয়ে ঈমান রাখতে হয়, সেসব বিষয়ের সমন্বয়ে যে কালিমা গঠন করা হয়েছে, তাকে বলা হয় ঈমানে মুফাস্‌সাল। এর মধ্যে ঈমানের তাফসীলী বিষয় রয়েছে বলে একে ঈমানে মুফাস্‌সাল বলা হয়।

ঈমানে মুফাস্‌সাল এই–

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى.

* কালিমায়ে তাইয়্যেবা, কালিমায়ে শাহাদাত, কালিমায়ে তাওহীদ[২] কালিমায়ে তামজীদ[৩] প্রভৃতি কালিমাসমূহ মুখস্থ করা জরূরী নয়, শুধু তার বিষয়বস্তুতে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট।[৪]

* কোন মুমিনের পক্ষে একথা বলা শোভনীয় নয় যে, আমি ইন্‌শাআল্লাহ ঈমানদার। কেননা "ইন্‌শাআল্লাহ" (অর্থাৎ, যদি আল্লাহ চান) কথাটি যদি ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহের ভিত্তিতে হয়ে থাকে তাহলে সেটা হবে নিশ্চিত কুফরী। আর যদি আদবের কারণে কিংবা সব বিষয়কে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করণের আওতায় কিংবা পরিণাম সম্পর্কে সন্দেহের ভিত্তিতে কিংবা আল্লাহ্‌র যিক্‌রের দ্বারা বরকত হাসিল করার উদ্দেশ্যে অথবা নিজের গুণকীর্তন হয়ে যাওয়া থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বলা হয়, তবুও এরূপ বলা উত্তম নয়। কেননা, এ কথাটি ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পরিজ্ঞাপক।[৫]

* আমল ঈমানের অংশ কি না– এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফিয়ী (রহ.), ইমাম আহ্‌মদ (রহ.) ও আশাইরাদের নিকট ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর নিকট ঈমানের মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না। মূলত এই মতবিরোধ

---

১. عقائد الاسلام . عبد الحق حقانی

২. কালিমায়ে তাওহীদ এই–

لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَاحِدًا لَّا ثَانِيَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ إِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

৩. কালিমায়ে তামজীদ এই–

لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِيَ اللهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ إِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ.

৪. خير الفتاوى ج/١

৫. شرح العقائد النسفيه

আমল ঈমানের অংশ (جزء) কি না– এ বিষয়ে মতবিরোধের ওপর নির্ভরশীল। যারা বলেন, আমল ঈমানের অংশ, তাদের নিকট আমলের কারণে ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ঘটে আর আমল বিহনে ঈমান হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে যারা বলেন, আমল ঈমানের অংশ নয়, তাদের নিকট আমল না থাকলে ঈমানের মধ্যে হ্রাস ঘটে না এবং আমল থাকলে ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ঘটে না। তবে এই মতবিরোধ মূলত শাব্দিক মতবিরোধ। বস্তুত যারা আমলকে ঈমানের অংশ বলেন, তারাও খাওয়ারিজদের ন্যায় এমন অংশ বলেন না যে, আমল না থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুমিনই থাকবে না। আবার যারা আমলকে ঈমানের অংশ বলেন না, তারাও আমলের প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন না। বরং বলেন, আমলের দ্বারা ঈমানের নূর বৃদ্ধি পায়। এর বিপরীত গোনাহ দ্বারা ঈমানের নূর হ্রাস পায় এবং এভাবে ঈমানের ক্ষতি হয়। তাই বিদআত, কুসংস্কার ইত্যাদি দ্বারা ঈমানের ক্ষতি হয়।

বিদআত সম্বন্ধে আকীদা

* বিদআত শরীআতে হারাম। বিদআতের শাব্দিক অর্থ নতুন সৃষ্টি। শরীআতের পরিভাষায় বিদআত বলা হয়, দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন সৃষ্টিকে১অর্থাৎ, দ্বীনের মধ্যে ইবাদত মনে করে এবং অতিরিক্ত ছওয়াবের আশায় এমন কিছু আকীদা বা আমল সংযোজন ও বৃদ্ধি করা, যা রসূল (সা.) সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে অর্থাৎ, আদর্শ যুগে ছিল না। তবে যেসব নেক কাজের প্রেক্ষাপট সে যুগে সৃষ্টি হয়নি, পরবর্তীতে নতুন প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হওয়ায় নতুন আঙ্গিকে দ্বীনের কোন কাজ করা হয় সেটা বিদআত নয়। যেমন: প্রচলিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। নিম্নে আমাদের উপমহাদেশে প্রচলিত কিছু বিদআতের তালিকা পেশ করা হল।

কতিপয় বিদআত

* কোন বুযুর্গের মাজারে ধুমধামের সাথে মেলা মিলানো।
* উরস করা।
* জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা।
* মৃতের কুলখানী করা (অর্থাৎ, চতুর্থ দিনে ঈছালে ছওয়াব করা)।
* মৃতের চেহলাম বা চল্লিশা করা।
* কবরের উপর চাদর দেয়া।
* কবরের উপর ফুল দেয়া।
* কবর পাকা করা।
* কবরের উপর গম্বুজ বানানো।
* মাযারে চাদর, শামিয়ানা, মিঠাই ইত্যাদি নযরানা দেয়া।
* প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠান।

১. নতুন সৃষ্টি বলতে বোঝায় যা কোনভাবে (لا نصا ولا إشارة ولا دلالة) কুরআন-হাদীছে নেই।

* মীলাদ অনুষ্ঠানে কেয়াম করা।
* জানাযার নামাযের পর আবার হাত উঠিয়ে দুআ করা।
* জানাযা নামাযের পর জোর আওয়াজে কালিমা পড়তে পড়তে জানাযা বহন করে নিয়ে যাওয়া।
* দাফনের পর কবরের কাছে আযান দেয়া।
* ঈদের নামাযের পর মুসাহাফা ও মুআনাকা বা কোলাকুলি করা।
* আযানের পর হাত উঠিয়ে দুআ করা।[১]
* আযান ইকামতের মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম এলে বৃদ্ধা আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখে লাগানো।[২]
* রমযানের শেষ জুমুআর খুতবায় বিদায় জ্ঞাপনমূলক শব্দ (যেমন আল-বিদা) যোগ করা। "জুমুআতুল বিদা" বলে কোনো ধারণা ইসলামে নেই।
* আমীন বলে মুনাজাত শেষ করা নিয়ম। অনেকে কালিমায়ে তাইয়েবা বলতে বলতে মুখে হাত বুলান এবং মুনাজাত শেষ করেন। এটা কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়, এটা বিদআত।[৩]
* জানাযার উপর কালিমা ইত্যাদি লেখা বা ফুলের চাদর বিছানো।

(ما خوذ از تعلیم الدین.آپکے مسائل اور انکا حل.راہ سنت. واحسن الفتاوی ج/۱. الفرقان و غیرہا)

নিম্নে কতিপয় রসম বা কুসংস্কার ও কুপ্রথার তালিকা পেশ করা হল, যা সরাসরি বিদআতের সংজ্ঞার আওতাভুক্ত নয় তবে তা শরীআতে গর্হিত। এগুলো বিদআতেরই মত বা বিদআতের সোপান।

কতিপয় রসম বা কুসংস্কার ও কুপ্রথা

* বিবাহ-শাদিতে হিন্দুদের রছম পালন করা। যেমন: ফুল-কুল দ্বারা বৌ বরণ করা, ভরা মজলিসে বউ-এর মুখ দেখানো, গীত গেয়ে নারী পুরুষ একত্র হয়ে বর কনেকে গোসল দেয়া ইত্যাদি।
* মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়কে দোষণীয় মনে করা।
* বিবাহ-শাদি, খতনা ইত্যাদিতে হাদিয়া-উপঢৌকন দেয়া। এসব হাদিয়া-উপঢৌকন প্রদানের পশ্চাতে ভাল নিয়ত থাকে না বা খারাপ নিয়ত থাকে, যেমন না দিলে অসম্মান হয়, দুর্নাম হয় বিধায় দেয়া হয় কিংবা অমুক অনুষ্ঠানে তারা দিয়েছিল তাই দিতে হয় ইত্যাদি উদ্দেশ্যে মানুষ দিয়ে থাকে।
* শবে বরাতে হালুয়া রুটি করা, পটকা ফুটানো, আতশবাজী করা।
* আশুরায় খিচুড়ি ও শরবত তৈরি এবং বন্টন করা।
* শবে বরাত ও শবে কদরে রাত্র জাগরণের জন্য ফরয ওয়াজিব থেকে বেশি গুরুত্ব সহকারে লোকদের সমবেত করার উদ্যোগ নেয়া।

১. احسن الفتاوی ج/۱ ২. احسن الفتاوی/۱ و راہ سنت ৩. احسن الفتاوی ج/۱

* শাব্দিক অর্থে "ঈদ মুবারক" বলা খারাপ ছিল না, কিন্তু এটা রছমে পরিণত হয়েছে বিধায় পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।
* ঈদগাহে বা মসজিদে যাওয়ার আগেই তাসবীহ বা জায়নামায দিয়ে স্থান দখল করে রাখা।
* মুয়াজ্জিনের জন্য জায়নামায দিয়ে স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা।
* বিপদ-আপদে যে কোন দান-সদকা করলে বিপদ দূরীভূত হয়, কিন্তু গরু ছাগল মোরগ প্রভৃতি কোন প্রাণীই জবাই করতে হবে- যেমন বলাও হয় জানের বদলে জান- এটা একটা রছম। জানের বদলে জান হওয়া জরূরী নয় বরং যে কোন সদকা হলেই তা বিপদ দূরীভূত হওয়ার সহায়ক।
* তারাবীহ্তে কুরআন খতম হওয়ার দিন মিষ্টি বিতরণ করা।
* মাইয়্যেতের জন্য ঈছালে ছওয়াব করা দুআ করা শরীআতসম্মত বিষয়, কিন্তু সেটা সম্মিলিত হয়েই করতে হবে এরূপ বাধ্যবাধকতার পেছনে পড়াও রছমে পরিণত হয়েছে।

(ماخوذ از بہشتی زیور. تعلیم الدین. اصلاح الرسوم. واحسن الفتاوی وغیرہا)

গোনাহ সম্পর্কে আকীদা

* কোন গোনাহকে গোনাহ না মনে করা কুফ্রী।
* গোনাহ দুই ধরনের: কবীরা গোনাহ ও সগীরা গোনাহ।
* কেউ কবীরা গোনাহ করলে সে ইসলাম থেকে খারেজ ও কাফের হয়ে যায় না।
* কবীরা গোনাহ করলে অনন্তকাল জাহান্নামে থাকতে হবে না।
* সগীরা গোনাহ বিভিন্ন নেক আমল দ্বারাও মোচন হয়ে যায়।
* এক হিসাবে কোন গোনাহকেই সগীরা বা ছোট মনে করতে নেই। সগীরা বা ছোট বলা হয় কোনটা কোনটা থেকে ছোট এ হিসাবে। নতুবা এক হিসাবে কোন গোনাহই ছোট নয়। যেমন: ছোট সাপও ছোট নয়, সেটাও জীবন ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট।
* সগীরা গোনাহের উপর হটকারিতা করলে সেটা কবীরা হয়ে যায়।

বিঃদ্রঃ কবীরা ও সগীরা গোনাহের বিস্তারিত বিবরণ ও তালিকার জন্য "আহ্কামে যিন্দেগী", মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) কৃত گناہ بےلذت ও শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.) কৃত كتاب الكبائر প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

* কবীরা গোনাহ তওবা করলে মাফ হয়ে যায়। তবে শির্ক মাফ হয় না। শির্ক করলে ইস্লাম নবায়ন করে নিতে হয়।

নিম্নে কতিপয় শির্কের বিষয়কে চিহ্নিত করে দেয়া হল।

কতিপয় শির্ক

* কোন বুযুর্গ বা পীর সম্বন্ধে এই আকীদা রাখা যে, তিনি সব সময় আমাদের অবস্থা জানেন। তিনি সর্বত্র হাজির নাযির।
* কোন পীর বুযুর্গকে দূর দেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে, তিনি জানতে পেরেছেন।

* কোন পীর বুযুর্গের কবরের নিকট সন্তান বা অন্য কোন উদ্দেশ্য চাওয়া।
* পীর বা কবরকে সাজদা করা।
* কোন বুযুর্গের নাম অযীফার মত জপ করা।
* কোন পীর বুযুর্গের নামে শিন্নি, ছদকা বা মানত মানা।
* কোন পীর বুযুর্গের নামে জানোয়ার জবেহ করা।
* আল্লাহ ছাড়া কারও দোহাই দেয়া।
* কারও নামের কছম খাওয়া বা কিরা করা।
* আলীবখ্শ, হোছাইন বখ্শ ইত্যাদি নাম রাখা।
* নক্ষত্রের তাছীর (প্রভাব) মানা বা তিথি পালন করা,
* জ্যোতির্বিদ, গণক, ঠাকুর বা যার ঘাড়ে জিন এসেছে তার নিকট হাত দেখিয়ে অদৃষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। তাদের ভবিষ্যদ্বাণী ও গায়েবী খবর বিশ্বাস করা।
* কোন জিনিস দেখে কু-লক্ষণ ধরা বা কু-যাত্রা মনে করা। যেমন: অনেকে যাত্রা মুখে কেউ হাঁচি দিলে কু-যাত্রা মনে করে থাকে।
* কোন দিন বা মাসকে অশুভ মনে করা।
* মহররমের তাজিয়া বানানো।
* এরকম বলা যে, খোদা রসূলের মর্জি থাকলে এই কাজ হবে বা খোদা রসূল যদি চায় তাহলে এই কাজ হবে।
* এরকম বলা যে, উপরে খোদা নিচে আপনি (বা অমুক)।
* কাউকে "পরম পূজনীয়" লেখা।
* "কষ্ট না করলে কেষ্ট (শ্রীকৃষ্ণ) পাওয়া যায় না" বলা বা "জয়কালী নেগাহ্বান" ইত্যাদি বলা।
* কোন পীর বুযুর্গ, দেও-পরী, বা ভূত ব্রাহ্মণকে লাভ-লোকসানের মালিক মনে করা।
* কোন পীর বুযুর্গের দরগাহ বা কবরের চতুর্দিক দিয়ে তওয়াফ করা।
* কোন পীর বযুর্গের খানকা বা বাড়ীকে কা'বা শরীফের ন্যায় আদব-তাযীম করা।[১]

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

---
১. ماخوذ از تعلیم الدین واحسن الفتاوی

২য় খণ্ড

ভ্রান্ত মতবাদ

(বাতিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদ বিষয়ক)

প্রথম অধ্যায়

(হক ও বাতিল সংক্রান্ত কিছু বিষয়)

কয়েকটি পরিভাষার পরিচয়

● ঈমান/ایمان

"ঈমান" শব্দের শাব্দিক অর্থ অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, স্বীকার করা, ভরসা করা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করা ইত্যাদি। শরীআতের পরিভাষায় ঈমান বলা হয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনীত ঐ সকল বিষয় যা স্পষ্টভাবে এবং অবধারিত রূপে প্রমাণিত, সে সমুদয়কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি আস্থাশীল হয়ে বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়া এবং মুখে তা স্বীকার করা (যদি স্বীকার করতে বলা হয়)। আর কুরআন, হাদীছ এবং সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মতের সর্বসম্মত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্মের জরূরিয়্যাত তথা অবধারিত বিষয়গুলো-এর ব্যাখ্যা প্রদান করা। সংক্ষেপে ও সাধারণ কথায় ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়।

● মু'মিন/مؤمن

যার মধ্যে ঈমান আছে তাকে মু'মিন বলা হয়।

● ইসলাম/اسلام

"ইসলাম" শব্দের শাব্দিক অর্থ মেনে নেয়া, আনুগত্য করা। শরী'আতের পরিভাষায় ইসলাম বলা হয় (ঈমানসহ) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যকে মেনে নেয়া। সংক্ষেপে ও সাধারণ ভাবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনীত ধর্মকে ইসলাম বলা হয় বা ধর্মীয় কর্মকে ইসলাম বলা হয়।

বি: দ্র: 'ঈমান' ও 'ইসলাম' শব্দ দুটো সমার্থবোধকভাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

• মুসলমান/মুসলিম

'ইসলাম' ধর্ম অনুসারীকে মুসলমান বা মুসলিম বলা হয়।

• কুফ্র/كفر

যে সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখাকে ঈমান বলা হয়, প্রকাশ্যে তার কোনো কিছুকে মুখে অস্বীকার করা বা তার প্রতি অন্তরে বিশ্বাস না রাখা হল কুফ্র।

• কাফের/كافر

যার মধ্যে কুফ্র থাকে সে হল 'কাফের'।

• শির্ক/شرك

আল্লাহ্র যাত (ذات/সত্তা) তাঁর ছিফাত (صفات/গুণাবলী) এবং তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক বা অংশীদার বানানো হল শির্ক।

• মুশ্রিক/مشرك

যে শির্ক করে তাকে বলা হয় মুশ্রিক।

• নিফাক/মুনাফিকী

মুখে ঈমান প্রকাশ করা, প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করা অথচ অন্তরে কুফর প্রচ্ছন্ন রাখা-এরূপ কপটতাকে বলা হয় নিফাক বা মুনাফিকী।

• মুনাফিক/منافق

যে মুনাফিকী করে তাকে বলা হয় মুনাফিক।

• ক্বাত্ইয়্যুল লফ্জ/قطعي اللفظ : যে সব ভাষ্যের শব্দ সন্দেহাতীত বা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত। কুরআনের শব্দাবলী এবং মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীছের শব্দাবলী এই পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত।

• ক্বাত্ইয়্যুল মা'না /قطعي المعنى : কুরআন-হাদীছের যে সব ভাষ্যের শব্দার্থ দ্ব্যর্থহীন, তাকে ক্বাত্ইয়্যুল মা'না বলা হয়।

• ক্বাত্ইয়্যাত/قطعيات : কুরআন-হাদীছের যে সব ভাষ্য একই সাথে কাত্ইয়্যুল লফ্জ ও ক্বাত্ইয়্যুল মা'না, তাকে বলা হয় ক্বাত্ইয়্যাত।

• জরূরিয়্যাত/ضروريات : ক্বাত্ইয়্যাত দুই ধরনের। (১) যে সমস্ত ক্বাত্ইয়্যাত এমন পর্যায়ের যা আওয়াম (عوام) খাওয়াস (خواص) নির্বিশেষে সকলের নিকট সুবিদিত, যা জানার জন্য তেমন কোন লেখাপড়ার প্রয়োজন পড়ে না, মুসলমান মাত্রই যে সম্বন্ধে অবহিত। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিষয়ের ফরয হওয়া, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খতমে নবুওয়াত বা শেষ নবী হওয়া ইত্যাদি। এসব ক্বাত্ইয়্যাতকে "জরূরিয়্যাত" বলা হয়। "জরূরিয়্যাত"কে "বদীহিয়্যাত"

(بديهيات) ও বলা হয়। (২) আর যে সমস্ত ক্বাত্ইয়্যাত এমন পর্যায়ের নয়, তাকে কাত্ইয়্যাতে মাহ্যা (قطعيات محض) বা সাধারণ ক্বাত্ইয়্যাত বলা হয়।

• আহ্লে কিব্লা/اہل القبلہ : যারা জরূরিয়্যাতে দ্বীন (ضروريات دين)কে স্বীকার করেন, তাদেরকে বলা হয় "আহ্লে কিব্লা"।

• মুলহিদ/যিন্দীক-ملحد / زنديق

যে ব্যক্তি মৌলিকভাবে ও প্রকাশ্যে ইসলাম এবং ঈমান-এর অনুসারী কিন্তু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি জরূরী তথা অবধারিত বিষয়গুলোর এমন ব্যাখ্যা দেয়, যা কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য ও উম্মতের সর্বসম্মত ব্যাখ্যা বিরুদ্ধ, এরূপ লোক প্রকৃত মুমিন-মুসলমান নয়, কুরআনের পরিভাষায় তাকে বলা হয় "মুল্হিদ" আর হাদীছের পরিভাষায় তাকে বলা হয় "যিন্দীক"। কারও কারও ব্যাখ্যামতে সব ধরনের ধর্ম বিরোধী বা মুশ্রিকদেরকেও যিন্দীক বলা হয়। যারা দাহ্রী তথা নাস্তিক, তাদেরকেও যিন্দীক বলা হয়ে থাকে।

কুরআন-হাদীছের ভাষ্যসমূহ (نصوص)কে জাহিরী অর্থে গ্রহণ করতে হবে, যতক্ষণ জাহিরী অর্থ থেকে ফিরে যাওয়ার কোন কারণ না পাওয়া যাবে। বিনা কারণে জাহিরী অর্থ পরিত্যাগ করে বাতিনী অর্থ গ্রহণ করা এল্হাদ (الحاد)। এবং এমন লোককে বলা হবে মুল্হিদ।

মুরতাদ/مرتد ইসলাম ধর্মের অনুসারী কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করলে কিংবা ঈমান পরিপন্থী কোন কথা বললে বা কাজ করলে তাকে মুর্তাদ বলে। সংক্ষেপে মুর্তাদ অর্থ ধর্মত্যাগী।

আহ্লুস সুন্নাতি ওয়াল জামাআত (اہل السنۃ والجماعۃ)

"আহ্লুস সুন্নাতি ওয়াল জামাআত" বা হক্কপন্থীদের পরিচয় নিম্নে প্রদান করা হল।

হক্কপন্থীদের পরিচয়

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্নোক্ত হাদীছে "আহ্লুস সুন্নাতি ওয়াল জামাআত" তথা হক্কপন্থীদের পরিচয় পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে,

تَفَرَّقَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى إِحْدٰى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً أَوْاثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَالنَّصَارٰى مِثْلَ ذٰلِكَ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً– وَفِيْ رِوَايَةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً– قَالُوْا : مَنْ هِيَ يَارَسُوْلَ اللهِ! قَالَ كَ مَاأَنَا عَلَيْه وَأَصْحَابِيْ. (رواه الترمذى في أبواب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم– باب افتراق هذه الأمة، وقال : هذا حديث حسن صحيح.)

অর্থাৎ, ইয়াহুদীরা একাত্তর/বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। এমনিভাবে নাসারাগণও। আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। (আর এক রেওয়ায়েতে আছে) তন্মধ্যে একদল ব্যতীত আর সকলে জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন (জাহান্নামে না যাওয়া অর্থাৎ, জান্নাতী) সেই দলটি কারা? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

এ পরিভাষাটিও উপরোক্ত ما أنا عليه وأصحابي কথাটা থেকে গৃহীত হয়েছে। এ পরিভাষায় উল্লেখিত "সুন্নাত" বলে বোঝানো হয়েছে মত ও পথ তথা কিতাবুল্লাহ্‌কে। আর "জামাআত" বলে বোঝানো হয়েছে রিজালুল্লাহ্‌কে। বস্তুত আহ্‌লে সুন্নাতি ওয়াল জামাআত হল কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ্- উভয়টির সু-সমন্বয়কারীদের নাম।

কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ

উভয়টার সুসমন্বয় জরূরী-এ প্রসঙ্গ

কুরআনে কারীমে সূরা ফাতেহা-য় "সিরাতে মুস্তাকীম" (الصراط المستقيم)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে "অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পথ" (صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) কথাটা বলে বোঝানো হয়েছে যে, রিজালুল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে শুধু কিতাবুল্লাহ দ্বারা হক পথ নির্ণয় করা সম্ভব নয় এবং এরূপ নীতি বিধিবদ্ধও নয়। হেদায়েতের জন্য কিতাবুল্লাহ এবং রিজালুল্লাহ উভয়টাই জরূরী। কিতাবুল্লাহ এবং রিজালুল্লাহ এই দুটো হল হেদায়েতের দুই বাহু। হক অনুধাবন ও হেদায়েতের জন্য শুধু কিতাবুল্লাহ যথেষ্ট হলে নবী রসূলদের প্রেরণের প্রয়োজন হত না। বরং আসমান থেকে লিখিত আকারে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান সম্বলিত কিতাব প্রেরণ করে দেয়াই যথেষ্ট হত।

"অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ" তথা রিজালুল্লাহ কারা তাদের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে।

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا.

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্‌র ও রসূলের আনুগত্য করবে, তাঁরা ঐসব লোকদের সঙ্গ লাভ করবে, যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন অর্থাৎ, নবী, সিদ্দীকীন, শুহাদা ও সালিহীন। আর বন্ধু হিসাবে তাঁরা কত উত্তম! (সূরা: ৪-নিসা: ৬৯)

উপরোক্ত আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী নবী, সিদ্দীকীন, শুহাদা, সালিহীন তথা উম্মাতের হক্কপন্থী সমস্ত পূর্বসূরী হলেন রিজালুল্লাহ্-র অন্তর্ভুক্ত। উম্মতের সাহাবা, তাবিয়ীন, তাবে তাবিয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন সকলেই এই রিজালুল্লাহ্-র জামাআতের অংশ। সাহাবায়ে কেরাম হলেন এই জামাআতের প্রথম ও প্রধান দিকপাল।

কুরআনে কারীমে ঈমান আমল সবকিছুর ক্ষেত্রে সাহাবীদের ঈমান আমলকে নমুনা ও মাপকাঠি হিসাবে তুলে ধরে ঈমান আমলের সবক্ষেত্রে রিজালুল্লাহ্‌র প্রয়োজন ব্যক্ত করা হয়েছে। বোঝানো হয়েছে যে, রিজালুল্লাহ্ ব্যতীত ঈমান আমল কোনটির সঠিকতায় পৌঁছা সম্ভব নয়। ইরশাদ হয়েছে,

اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ.

অর্থাৎ, তোমরা ঈমান আন এই লোকেরা (সাহাবীরা) যেমন ঈমান এনেছে। (সূরা:

২-বাকারা: ১৩)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ.

অর্থাৎ, তোমরা (সাহাবীরা) যেমন ঈমান এনেছ, তারা অনুরূপ ঈমান আনলে তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হল। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তারা সুদূর বিরোধে রয়েছে। (সূরা: ২-বাকারা: ১৩৭)

এ আয়াতে ঈমানের ক্ষেত্রে সাহাবাদের ঈমান মাপকাঠি হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ.

অর্থাৎ, আর যার নিকট হেদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পর এই রসূলের বিরোধিতা করবে এবং এই মুমিনদের (সাহাবীদের) পথ ছাড়া অন্য পথ অবলম্বন করবে, তাকে আমি করতে দিব যা সে করতে চায়, আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব। (সূরা: ৪-নিসা: ১১৫)

এ আয়াতে আমল ও মাসলাক তথা মত ও পথের ক্ষেত্রে সাহাবীদের মাপকাঠি হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

এ ছাড়াও নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে রিজালুল্লাহ্-র অনুসরণ ও আনুগত্যের তাগীদ প্রদান করা হয়েছে,

(১) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যপন্থীদের সঙ্গে থাক। (সূরা: ৯-তাওবা: ১১৯)

(২) وَّ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ.

অর্থাৎ, যারা বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে, তাঁদের পথ অনুসরণ কর। (সূরা: ৩১-লুকমান: ১৫)

(৩) وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ.

অর্থাৎ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বের অধিকারী। (সূরা: ৪-নিসা: ৫৯)

হকপন্থীদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

১. আহ্‌লে হক কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ উভয়টা মান্য করেন।

আহ্‌লে হকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তারা কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ উভয়কে ভিত্তি করে কুরআন-হাদীছ অনুধাবন, মাসলাক-মাশরাব নির্ধারণ ও চিন্তা-চেতনাকে পরিচালিত করে থাকেন। তারা কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন ও তার ব্যাখ্যা হাদীছকে বাদ

দিয়ে যেমন কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত হয়ে সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত হন না, তেমনিভাবে রিজালুল্লাহ তথা হক্বপন্থী আস্‌লাফ ও পূর্বসূরীদেরকে বাদ দিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশিমত কুরআন-হাদীছ অনুধাবন করেও সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। তারা রিজালুল্লাহ তথা আস্‌লাফ এবং পূবসূরীদের ব্যাখ্যা ও নীতির আলোকে কুরআন হাদীছ অনুধাবন করে থাকেন। তারা কিতাবুল্লাহ্‌র ভিত্তিতে রিজালুল্লাহ্‌কে বিচার করেন এবং সেই রিজালুল্লাহ্‌র আশ্রয়ে কুরআন-হাদীছ অনুধাবন ও হেদায়েত সন্ধান করেন।

বাতিল ফির্‌কাসমূহের মতবাদ ও চিন্তাধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পূর্বসূরী ও আসলাফের কৃত কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা এবং তাদের অনুসৃত নীতি ও চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই অধিকাংশ দলের গোমরাহীর মূল কারণ। খাওয়ারেজ সম্প্রদায় اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ আয়াতের সাহাবায়ে কেরামকৃত ব্যাখ্যা থেকে বিচ্যুত হয়ে নতুন ব্যাখ্যার অবতারণা করেই তাদের যাত্রা শুরু করেছিল।[১] মুতাশাবিহাত (متشابہات) আয়াতসমূহের ক্ষেত্রে পূর্বসূরী আহ্‌লে হকের ব্যাখ্যা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলেই মুজাস্‌সিমা,[২] মুশাব্বিহা[৩] ও মুআত্তিলা[৪] ফিরকার জন্ম হয়েছে। খেলাফতের ব্যাপারে পূর্বসূরী জমহুরের মতামত থেকে সরে যাওয়ার ফলেই শীআ সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে। গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী "খাতামুন্নাবিয়্যীন" কথাটির পূর্বসূরী উলামায়ে কেরামকৃত ব্যাখ্যা থেকে সরে নিজস্ব ব্যাখ্যা গ্রহণ করেই তার গোমরাহী প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে।[৫] মওদূদী সাহেব সাহাবায়ে কেরামকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে না করে, তাঁদের সমালোচনা করে এবং পূর্বসূরী আসলাফ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নীতি গ্রহণ করে এরূপ গোমরাহীর পথকেই উন্মুক্ত করেছেন।[৬]

২. আকীদা আমল ও কর্মপদ্ধতিতে মধ্যম পন্থা গ্রহণ করা।

আহ্‌লে হকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল আকীদা, আমল ও কর্মপদ্ধতিতে মধ্যম পন্থা গ্রহণ তথা ভারসাম্য অবলম্বন করা। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا. الآية.

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে বানিয়েছি মধ্যপন্থী উম্মত। (সূরা: ২-বাকারা: ১৪৩)

মধ্যম পন্থা গ্রহণ করার অর্থ কোন ক্ষেত্রে افراط/تفریط বা বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি না করা বরং মধ্যম পন্থা গ্রহণ করা তথা ভারসাম্য অবলম্বন করা। মূলত ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও আমল সব ক্ষেত্রেই রয়েছে اعتدال বা ভারসাম্য। কোনো ক্ষেত্রেই افراط বা বাড়াবাড়িও নেই تفریط বা ছাড়াছাড়িও নেই। যেমন:

১. দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের "খাওয়ারেজ" শিরোনামের আলোচনা।
২. দেখুন প্রথম খণ্ডের "মুজাসসিমা, মুশাব্বিহা ও মুআত্তিলা ফিরকা প্রসঙ্গ" শিরোনামের আলোচনা।
৩. দেখুন প্রথম খণ্ডের "মুজাসসিমা, মুশাব্বিহা ও মুআত্তিলা ফিরকা প্রসঙ্গ" শিরোনামের আলোচনা।
৪. দেখুন প্রথম খণ্ডের "মুজাসসিমা, মুশাব্বিহা ও মুআত্তিলা ফিরকা প্রসঙ্গ" শিরোনামের আলোচনা।
৫. দেখুন "খতমে নবুওয়াত প্রসঙ্গ" শিরোনামের আলোচনা।

৬. দেখুন "মওদূদী মতবাদ" শিরোনামের আলোচনা।

* আল্লাহ্‌র সত্তার প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রে

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্য। বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। যারা একেবারে খোদাকেই স্বীকার না করার মত ছাড়াছাড়ি করে, তারা হল নাস্তিক। আর যারা খোদাকে স্বীকার করে কিন্তু একাধিক খোদাকে স্বীকার করে, তারা বাড়াবাড়ি করে। যেমন: খৃষ্টান, ইয়াহুদী ও হিন্দু সম্প্রদায় এরূপ বাড়াবাড়ির শিকার।

* রিসালাত সম্পর্কে

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্য। বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। রসূলদের ব্যাপারে আগের যুগেও বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি ছিল এখনও আছে। খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আ.)কে খোদা বা খোদার পুত্র সাব্যস্ত করে তাঁর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছিল। ইয়াহুদী-রা হযরত ওযায়ের (আ.)কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে বাড়াবাড়ি করেছিল। পক্ষান্তরে যারা নবী রসূলদেরকে অমান্য করেছে, এমনকি নবীদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে, তারা নবীদের ক্ষেত্রে ছাড়াছাড়ি করেছে।

এক শ্রেণীর লোক রয়েছেন যারা বলেন রসূল মানুষ নন, তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর খোদার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই বলতে চান, তারা বাড়াবাড়িতে আছেন। যেমন" দেওয়ানবাগীর পীর এবং তার অনুসারীরা বলে থাকেন। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, তিনি মানুষ ছিলেন। ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ.

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, আমি তো তোমাদের মত মানুষ। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ একক ইলাহ। (সূরা: ১৮-কাহ্‌ফ: ১১০)

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যারা সরাসরি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খোদা বলেন না, তবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি এমন বিষয় আরোপ করেন যা আল্লাহ্‌র একান্ত বিষয়, যেমন: তারা বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানেন অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অদৃশ্যের কথা জানেন। একথা বলার পশ্চাতে তাদের উদ্দেশ্য হল মীলাদে কেয়াম করা। তারা বলতে চান মীলাদের সময় যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম উচ্চারণ করা হয়, যখন দুরূদ শরীফ পড়া হয়, তখন দাঁড়াতে হবে; কারণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারেন এবং তিনি সেই মজলিসে হাজির হয়ে যান, তাই তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াতে হবে। হক্কানী উলামায়ে কেরাম বলেন, যেহেতু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানেন না, তাই তাঁর নামে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হলে তিনি জানবেন কীকরে? মানুষ গায়েব জানে না, গায়েব জানেন একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। তবে আল্লাহ তাঁর কোন খাস বান্দাকে গায়েবের অর্থাৎ, অদৃশ্যের

বিষয়ে জানাতেও পারেন। কিন্তু মীলাদের ক্ষেত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানানো হয় এবং তিনি হাজির হয়ে যান– এমন কোনো দলীল নেই; বরং তার বিপরীত এমন অনেক দলীল রয়েছে যাতে বোঝা যায় তিনি হাজির হন না। হাদীছে পরিষ্কার বর্ণিত আছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ سَمِعْتُه، وَمَنْ صَلّٰى عَلَيَّ نَائِيًا أُبْلِغْتُه. (رواه البيهقي في شعب الإيمان في باب في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله و توقيره. حديث رقم ١٥٨٣. وللحديث شواهد ساقها السخاوي في القول البديع.)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আমার কবরের নিকট এসে আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করবে আমি তা সরাসরি শুনব, আর যে দূরে থেকে আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করবে তা আমার নিকট পৌছানো হবে। (শুআবুল ঈমান)

অন্য এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : إِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِيْ الْأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِيْ مِنْ أُمَّتِيْ السَّلَامَ. (رواه الدامي في كتاب الرقاق باب في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم ٢٧٧٤. وإسناده صحيح كذا في هامشه. ورواه النسائي في كتاب الافتتاح– باب التسليم على النبي صلى الله عليه و سلم. ورواه ابن جبان في صحيحه حديث رقم ٩٠٢. واللفظ للدارمي.)

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসঊদ (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর কতক ফেরেশতা রয়েছেন, যারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন এবং আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছান। (দারিমী, নাসায়ী ও সহীহ ইবনে হিব্বান)

*** ইবাদতের ক্ষেত্রে**

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্য। বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। যারা মনচাহী ও খাহেশাতের যিন্দেগী চালায়, তারা ছাড়াছাড়ি করে, যাদের সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

اِتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّ لَعِبًا.

অর্থাৎ, তারা ক্রিড়া-কৌতুককে তাদের ধর্ম বানিয়েছে। (সূরা: ৭-আ'রাফ: ৫১)

আবার যদি কেউ ইবাদতে লিপ্ত হয়ে, দ্বীনী কাজে লিপ্ত হয়ে বিবি বাচ্চার খোঁজ-খবর রাখা ছেড়ে দেন, কিংবা বিবাহ-শাদী পর্যন্ত না করতে চান, তাহলে সেটাও হবে এক ধরনের বাড়াবাড়ি। এ শ্রেণীর লোকেরা হচ্ছে সন্ন্যাসী গোছের লোক। ইসলামে সন্ন্যাসবাদ নেই। এক হাদীছে এসেছে, একদিন হযরত উছমান ইবনে মাজঊন (রা.)-এর স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম অপরিপাটি কাপড়-চোপড় পরিহিত

অবস্থায় হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ অবস্থা কেন? খাওলা উত্তর দিলেন, আমার স্বামী সারাদিন রোযা রাখেন, সারা রাত নফলে লিপ্ত থাকেন, (আমি সেজেগুঁজে থাকব কার জন্য?) হযরত আয়েশা (রা.) বিষয়টি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উছমান ইবনে মাজঊনকে বললেন,

يَا عُثْمَانُ! إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا. اَمَالَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. (رواه أحمد في مسنده حديث رقم ٢٥٧٦٩. وإسناده صحيح كذا في هامشه، و رواه ابن حبان في صحيحه حديث رقم٩.)

অর্থাৎ, হে উছমান! আমাদেরকে সন্যাসবাদের বিধান দেয়া হয়নি। আরে তোমার জন্য কি আমার মধ্যে আদর্শ নেই। (মুসনাদে আহমদ ও সহীহ ইবনে হিব্বান)

ইসলামে কোন সন্যাসবাদ নেই। বরং ইবাদতও করতে হবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘর সংসার এবং সমাজের সাথে সম্পর্ক সামঞ্জস্যও রাখতে হবে। বিবি বাচ্চার খোঁজ-খবরও রাখতে হবে, তাদের হক আদায় করতে হবে, তাদের ব্যাপারে ইসলাম যে দায়িত্ব অর্পন করেছে তাও পালন করতে হবে।

*** সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভক্তির ক্ষেত্রে**

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্য। বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। যারা বাড়াবাড়ি করেছে, –যেমন: এক দল গালী শীআ হযরত আলী (রা.)কে অতি ভক্তির কারণে খোদা পর্যন্ত বলে ফেলেছিল– তারা বাড়াবাড়ি করে হকপন্থী জামাআত থেকে বের হয়ে গেছে। আবার একদল লোক (যারা "শীআ" নামে পরিচিত) হযরত আলী (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবারের সদস্য হেতু তাঁর প্রতি অতিভক্তিতে বলে ফেলেছে যে, হযরত আলী (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর প্রথম খলীফা হওয়ার যোগ্য, যেহেতু তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবারের লোক। এভাবে বাড়াবাড়ির কারণেও তারা হকপন্থী দল থেকে বের হয়ে গেছে।

শীআ সম্প্রদায় হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি অতিভক্তির কারণে একদিকে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে, আবার তিন খলীফাসহ অন্য অনেক সাহাবীর ব্যাপারে কঠোর সমালোচনায় জড়িত হয়ে ছাড়াছাড়িতে লিপ্ত হয়েছে। এভাবেও তারা হকপন্থী জামাআত থেকে বের হয়ে গেছে। আবার কোন এক ঘটনার প্রেক্ষিতে কতিপয় খারিজী হযরত আলী (রা.)কে কাফের পর্যন্ত বলে ফেলেছিল। এরাও সাহাবীর ব্যাপারে ছাড়াছাড়িতে লিপ্ত হয়ে হকপন্থী দল থেকে বের হয়ে গেছে। মওদূদী সাহেব সাহাবাদের সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে সাহাবী ভক্তির ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা ত্যাগ করে ছাড়াছাড়িতে লিপ্ত হয়েছেন।

*** উলামায়ে কেরামের প্রতি ভক্তি ও তাঁদের ব্যাপারে অবস্থান**

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্য। বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। এ ক্ষেত্রেও

আহলে হক ভারসাম্যনীতি বজায় রাখেন। এর বিপরীত যারা উলামায়ে কেরামকে একেবারেই মানেন না, অহেতুক তাঁদের সমালোচনায় লিপ্ত হন, তারা আলেম সমাজের ব্যাপারে ছাড়াছাড়িতে আছেন। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীজনকে জিজ্ঞাসা কর। (সূরা: ১৬-নাহ্ল: ৪৩)

আবার একদল লোক আছেন, যারা কোন আলেম বা পীর-ভক্তির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে খোদা বানিয়ে ফেলেছেন। যেমন করেছিল ইয়াহুদীরা। তাদের সম্পর্কে কুরআনে কারীমে এসেছে–

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত ও দরবেশদেরকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা: ৯-তাওবা: ৩১)

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, তারা তাদের ধর্মীয় নেতাদেরকে খোদা বানিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ, খোদার কথা যেমন বিনা যুক্তিতে মানতে হয়, কোন বিচার-বিবেচনা ছাড়াই মানতে হয়, তারা ধর্মীয় গুরুদের বেলায়ও তা-ই করে।

*** ওয়াজ-নছীহতের ক্ষেত্রে**

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্য। বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। যারা সাধারণ মানুষের সামনে তাদের ধারণ ক্ষমতার বাইরের কথাও ব্যক্ত করেন, তারা এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেন। এটাও নিষেধ। যেমন নিম্নের রুখসুতের হাদীছ–

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رض مَرْفُوْعًا : مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذَالِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ : وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ. (رواه مسلم في كتا الإيمان – باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة....)

অর্থাৎ, হযরত আবূ যর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, যে কোন বান্দা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তার ওপর মৃত্যু হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যেনা করলেও? চুরি করলেও? হুজুর জওয়াব দিলেন, যেনা করলেও চুরি করলেও ...। (মুসলিম)

হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রা.) বলেন,

مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيْثًا لَا تَبْلُغُه عُقُوْلُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً. (رواه مسلم في مقدمة– باب النهي عن الحديث بكل ما سمع)

অর্থাৎ, তুমি যদি সাধারণ মানুষের সামনে এমন কথা বয়ান কর যা তাদের ধারণ ক্ষমতার বাইরে, যা তারা বুঝতে পারবে না, তাহলে এটা তাদের কারও কারও জন্য ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তুমি তাহলে সত্যিকার আলেম আখ্যায়িত হওয়ার

যোগ্য নও, তুমি বিবেচনা সম্পন্ন আলেম নও। (মুসলিম)

আবার প্রয়োজনীয় স্থানে ইল্‌ম গোপন করা ছাড়াছাড়ির অন্তর্ভুক্ত, সেটাও অন্যায়। হাদীছে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ. (رواه الترمذي في أبواب العلم– باب ماجاء في كتمان العلم وقال : حديث أبي هريرة حديث حسن.)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, (মানুষের দ্বীনী বিষয়ে) যে ইল্‌ম রাখে আর তাকে জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও সে তা গোপন করে রাখে, (কেয়ামতের দিন) তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে। (তিরমিযী)

*** পীর মাশায়েখ ও বুযুর্গদের ব্যাপারে অবস্থান**

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্য। বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। যারা মনে করেন পীর না ধরলে মুক্তি নেই তারা বাড়াবাড়িতে আছেন। পীর ধরা ফরয/ওয়াজিব নয়, পীরের হাতে বায়'আত হওয়া ফরয/ওয়াজিব নয়। এটাকে সুন্নাত বলা হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে অনেক সাহাবী বায়'আত হয়েছেন এই মর্মে যে, আমরা শির্ক করব না, যেনা করব না, চুরি করব না, কোন পাপ কাজ করব না, ভাল কাজ করব ইত্যাদি। এটাকে বায়'আতে সুলূক বলা যায়। কোন কোন সাহাবী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে এরূপ বায়'আত হয়েছেন আবার অনেকে হননি। বায়'আত হওয়া ফরয/ওয়াজিব হলে সব সাহাবীই বায়'আত হতেন। পীর মাশায়েখ হলেন রূহানী ডাক্তার। তাঁরা হলেন আধ্যাত্মিক চিকিৎসক।

এমনিভাবে কেউ কেউ মনে করেন পীর ধরলে পীর-মাশায়েখ মুরীদদের পাপের বোঝা বহন করে বা কবরে হাশরে মুরীদদেরকে তা'লীম ও তালকীন দিয়ে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন, যেমন মাইজভাণ্ডারী ও আটরশির পীরদ্বয় মনে করেন।[1] এটা কুরআন- হাদীছ বিরোধী কথা। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى.

অর্থাৎ, কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না। (সূরা: ৬-আন্‌আম: ১৬৪)

কেউ নিজে আমল করে নিজের নাজাতের ব্যবস্থা না করলে কোনো পীর তাকে নাজাত দিতে পারবে না। কোন পীর তো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বড় হতে পারে না। স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গোত্র বনূ হাশেম, বনূ মুত্তালিব ও নিজ কন্যা ফাতেমাকে ডেকে বলেছেন,

يَا بَنِيْ هَاشِمٍ! أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ! أَنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّيْ لَا اَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. الحديث. (رواه مسلم في كتاب الإيمان– باب بيان أن من مات على الكفر فهو فى النار لاتناله شفاعة ولاتنفعه قرابة المقربين.)

১. দেখুন "মাইজভাণ্ডারী" ও "আটরশি" শিরোনামের আলোচনা।

অর্থাৎ, হে বনী হাশেম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর। হে বনূ আব্দিল মুত্তালিব! তোমরা তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর। হে ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, আমি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না। ...। (মুসলিম)

আবার যারা মনে করেন পীর-মাশায়েখের কাছে যাওয়ার কোনো দরকারই নেই, তারা ছাড়াছাড়িতে রয়েছেন।

* অর্থনীতির ক্ষেত্রে

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্য। বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। ইসলাম সাম্যবাদের ন্যায় ব্যক্তি-মালিকানাকে একেবারে অস্বীকারও করেনি, আবার পুঁজিবাদের ন্যায় অবাধ ও বল্গাহীন মালিকানাকেও প্রশ্রয় দেয়নি। বরং হালাল-হারামের বন্ধনী এটে দিয়ে বল্গাহীন সম্পদ অর্জনের পথকে রুদ্ধ করেছে। আবার ধনীর সম্পদে গরীব মিসকীনের অধিকার প্রবর্তিত করে সবশ্রেণীর মাঝে সম্পদ আবর্তিত হওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

অর্থাৎ, যাতে কেবল তোমাদের মধ্যকার বিত্তবান লোকদের মধ্যেই সম্পদ আবর্তন করতে না থাকে। (সূরা: ৫৯-হাশ্‌র: ৭)

এমনিভাবে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-আমল, মু'আমালা-মু'আশারা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইসলামের সবকিছুতে মধ্যম পন্থা তথা ভারসাম্য রয়েছে।

৩. متشابہات কে মাসআলা-মাসায়েল ও চিন্তাধারার বুনিয়াদ না বানানো

আহ্‌লে হকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল তারা কুরআন-হাদীছের متشابہات বা অস্পষ্ট অর্থ বিশিষ্ট অংশ নিয়ে চর্চা ও ঘাটাঘাটি করেন না। তাঁরা মাসআলা-মাসায়েলের ন্যায় তাঁদের চিন্তাধারারও বুনিয়াদ রাখেন محکمات বা স্পষ্ট অর্থবোধক نصوص বা ভাষ্যসমূহের উপর। পক্ষান্তরে বহু বাতিল ফিরকা متشابہات বা অস্পষ্ট অর্থবিশিষ্ট ভাষ্যসমূহ নিয়ে অতিরিক্ত ঘাটাঘাটি করে এবং তাদের চিন্তাধারার বুনিয়াদ রাখে সেসব متشابہات বা অস্পষ্ট অর্থবিশিষ্ট ভাষ্যসমূহের উপর।

হাদীছে এসেছে- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন–

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَآءَ تَأْوِيْلِه وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهٗ.الآية.

এ আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে যে, কিছু লোক বক্র চিন্তাধারার অধিকারী হয়ে থাকে, তারা তাদের ভ্রান্ত মতবাদ, তারা তাদের ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে সমর্থিত করার জন্য কুরআন শরীফের কিছু অস্পষ্ট অর্থবিশিষ্ট অংশের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। (সূরা:

৩-আলে ইমরান: ৭)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করার পর বললেন,

إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوْهُمْ. (رواه مسلم في أول كتاب العلم، وراه ابن ماجة في باب اجتناب البدع والجدل. واللفظ لمسلم)

অর্থাৎ, যখন তোমরা ঐসব লোকদেরকে দেখবে, যারা তাদের ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে সমর্থিত করার জন্য কুরআনের এসব অংশের- অর্থাৎ, যেগুলোর অর্থ অস্পষ্ট বা যার অর্থ একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন আর কেউ জানে না, এরকম অংশের পেছনে পড়ে, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে, তাদের থেকে বিরত থাকবে। (মুসলিম ও ইবনে মাজা)

বহু বাতিল ফিরকার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কোন কোন متشابہات নিয়ে অতি চর্চা ও ঘাটাঘাটিই তাদের বুতলান বা বাতিল হওয়ার মূল কারণ। যেমন: আল্লাহ্‌র আরশে সমাসীন হওয়া এবং তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিষয়টি ছিল متشابہات-Gi পর্যায়ভুক্ত। এটা নিয়ে অতি ঘাটাঘাটির ফলে এক শ্রেণী হয়েছে মুজাস্‌সিমা/মুশাব্বিহা[1] (مجسمہ/مشبہہ) আর এক শ্রেণী হয়েছে মুআত্‌তিলা[2] معطلہ যেমন মুতাযিলাগণ। তাক্‌দীরের বিষয়টিও অনেকটা متشابہات-এর পর্যায়ভুক্ত। কারণ তাকদীরের পূর্ণ রহস্য মানব জ্ঞানের অগম্য। এই তাক্‌দীর বিষয়ে অতিরিক্ত ঘাটাঘাটির ফলে কেউ কেউ হয়েছে কাদরিয়া[3] (قدریہ) কেউ কেউ হয়েছে জাব্‌রিয়া[4] (جبریہ)। কিন্তু আহ্‌লে হক আল্লাহ্‌র আরশে সমাসীন হওয়া এবং তার অঙ্গ-প্রতঙ্গের বিষয়টা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে সংক্ষিপ্তভাবে (اجمالا) তার প্রতি ঈমান এনেছে এবং তার বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করেছে। তাক্‌দীরের ব্যাপারেও আহ্‌লে হক জাব্‌রিয়া ও কাদ্‌রিয়া মতবাদের মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করেছেন। আহ্‌লে হক মুতাশাবিহাতকে চিন্তাধারার বুনিয়াদ বানায় না।

আল্লাহ্‌র নূর-এর বিষয়টাও অনেকটা متشابہات-এর পর্যায়ভুক্ত। কারণ আল্লাহ্‌র নূরের হাকীকত সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ না থাকায় সেটা অস্পষ্ট বা পরিপূর্ণভাবে মানব জ্ঞানের অগম্য। অতএব আল্লাহ্‌র যাতী নূর, সিফাতী নূর ইত্যাদি নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি করা এবং তার ভিত্তিতে কোন মাসআলা দাঁড় করানো এবং তা নিয়ে বাহাছ-মুবাহাছা করা সত্য থেকে বিচ্যুতির কারণ হতে পারে। যেমন সর্বপ্রথম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নূর তৈরি করা হয়েছে।[5] অতএব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

১. দেখুন "মুজাসসিমা, মুশাব্বিহা ও মুআত্তিলা ফিরকা প্রসঙ্গ" শিরোনামের আলোচনা। (প্রথম খণ্ড)
২. দেখুন "মুজাসসিমা, মুশাব্বিহা ও মুআত্তিলা ফিরকা প্রসঙ্গ" শিরোনামের আলোচনা। (প্রথম খণ্ড)
৩. দেখুন "কাদরিয়া সম্প্রদায়" শীর্ষক আলোচনা।
৪. দেখুন দেখুন "জাবরিয়া সম্প্রদায়" শীর্ষক আলোচনা।
৫. কিছু লোক মুসান্নাফে আব্দুর রজ্জাকের বরাতে হযরত জাবের (রা.)-এর সূত্রে "আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর তৈরি করেছেন"–এ হাদীছটি বর্ণনা করে থাকে, অথচ উক্ত কিতাবে এ হাদীছ পাওয়া যায়

না। এ প্রসঙ্গে "নবী কারীম (সা.)-এর নূর ও বাশার হওয়া প্রসঙ্গ" শিরোনামের আলোচনা দেখুন। (পৃষ্ঠা নং ৬০৩)

নূরের তৈরি। তার পর তিনি কি যাতী নূরের তৈরি না সিফাতী নূরের তৈরি ইত্যাদি আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া এবং আরও আগে বেড়ে এর ভিত্তিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ বলা যাবে না– এমন আলোচনায় জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি। এগুলো متشابہات নিয়ে ঘাটাঘাটি জনিত বিচ্যুতির আশংকা থেকে মুক্ত নয়।

৪. চার দলীলকে ভারসাম্যের সাথে মান্য করা

আহ্‌লে হকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল তারা কুরআন, হাদীছ, ইজমা' ও কিয়াস এই চার দলীলকে ভারসাম্যের সাথে মান্য করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদার পবিত্র যুগের অনুসরণীয় আমলসমূহ (متوارثات) হাদীছের এবং শরীআতের দলীলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আহ্‌লে হক এই মুতাওয়ারিছাতকেও মান্য করেন।[১] যারা এসব দলীলের কোন একটিকেও অস্বীকার করেন, তারা আহ্‌লে হকের জামাআত বহির্ভূত। অতএব যারা কুরআন মানেন কিন্তু হাদীছ মানেন না, তারাও গোমরাহ। মুনকিরীনে হাদীছ যেমন পারভেজ গোলাম আহ্‌মদ প্রমুখের বিচ্যুতি হাদীছ না মানার কারণে। যারা ইজমা'কে অস্বীকার করেন, তারা আহ্‌লে হক থেকে বিচ্যুত। স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খানের বিচ্যুতির একটা কারণ এই ইজমা'ভুক্ত বেশ কিছু বিষয়কে অস্বীকার করা। আল্লামা ইব্‌নে হুমাম (রহ.) বলেন,

إنكار حكم الإجماع القطعي يكفر عند الحنفية وطائفة.

অর্থাৎ, হানাফী মতাবলম্বীদের নিটক অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইজ্‌মার হুকুমকে অস্বীকারকারী কাফের।

আল্লামা সুবকী (রহঃ) তার جمع الجوامع গ্রন্থে লিখেছেন,

جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر مطلقا.

অর্থাৎ, জরূরিয়াতে দ্বীন –যা সর্বযুগে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত, তা– অস্বীকারকারী এক বাক্যে কাফের।

উল্লেখ্য, যারা এসব দলীলের কোন একটির উপর নিজের আক্‌ল বা বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেন, তারাও গোমরাহ। আহ্‌লে হক আক্‌ল-বুদ্ধি প্রয়োগ করেন, তবে কুরআন-হাদীছের খাদেম বা সহায়ক হিসাবে। তারা আক্‌ল-বুদ্ধিকে কুরআন-হাদীছ ডিঙ্গিয়ে উপরে যেতে দেন না। পক্ষান্তরে বাতিলপন্থীরা আক্‌লকে প্রধান নিয়ামক হিসাবে প্রয়োগ করে থাকে। ফলে তারা তাদের ঠুনকো আক্‌লে না ধরলে কুরআন-হাদীছ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত কোন বিষয়কেও অবলিলায় অস্বীকার করে বসে। স্যার সৈয়দ আহ্‌মদের গোমরাহীর পশ্চাতে এরূপ কারণও বিদ্যমান ছিল।

এক শ্রেণীর লোক আছেন যারা কুরআন-হাদীছের দলীলের চেয়ে স্বপ্নকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তারা স্বপ্নকে অকাট্য দলীল মনে করেন এবং স্বপ্নের মাধ্যমে কিছু

অবগত হলে সেটাকেই বড় দলীল হিসাবে মূল্যায়ন করে থাকেন। কিছু ভ্রান্ত সূফীকে

১. তারাবিহ্‌র বিশ রাকআত এই পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

এরূপ করতে দেখা যায়। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে কিছু বলতে দেখার দোহাই দিয়ে শরীআত-নির্ধারিত সীমানা লংঘন করে তারই অনুসরণ করতে থাকে। আল্লামা শাতিবী (রহ.) বিদআতপন্থীদের দলীলসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথাগুলোই অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে বলেছেন, যার আরবী ইবারত নিম্নরূপ।

وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها، فيقولون : رأينا الرجل الصالح. فقال لنا : اتركوا كذا واعملوا كذا. ويتفق مثل هذا كثيرا للمترسمين برسم التصوف، وربما قال بعضهم : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم في النوم. فقال لى كذا، فيعمل بها ويترك بهامُعْرِضًا عن الحدود الموضوعة فى الشرع.

দেওয়ানবাগী, রাজারবাগী, সুরেশ্বরী প্রমুখকে দেখা গেছে তারা স্বপ্নকে স্বতন্ত্র দলীল হিসাবে মূল্যায়ন করে থাকেন, যা পরবর্তিতে সংশ্লিষ্ট শিরোনামে আলোচনা করা হবে। অথচ স্বপ্ন কোন দলীল নয়। কাযী ইয়ায বলেন, স্বপ্নের দ্বারা কোন নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয় না। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজ্‌মা' রয়েছে। আল্লামা নববী বলেন, তদ্রূপ স্বপ্নের দ্বারা কোন হুকুমের পরিবর্তন ঘটানো যায় না। এ ব্যাপারে ইত্তেফাক বা সর্বসম্মত মত রয়েছে। যদিও হাদীছে বলা হয়েছে,

مَنْ رَآنِيْ فِيْ الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ. (رواه مسلم في كتاب الرؤيا)

অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে সত্য দেখল।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখা মিথ্যা হতে পারে না। কেননা, শয়তান রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আকৃতি ধারণ করতে পারে না। তবে স্বপ্নে সে যা শুনেছে তা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে এবং তা সঠিকভাবে মনে রাখতে পেরেছে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই স্বপ্ন কোন দলীল হতে পারে না।

এখানে আরও মনে রাখা দরকার যে, কেউ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সপ্নে দেখলে সেটা সত্য, কেননা শয়তান রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রূপ ধরতে পারে না। কিন্তু স্বপ্নে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা বলতে শুনেছে, সেটা সঠিক মনে রাখতে পেরেছে, তার নিশ্চয়তা নেই। হতে পারে তার মনের মধ্যে শয়তান কোন কথার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দিয়েছে। এ কারণেই উলাম-

ায়ে কেরাম বলেছেন, শরীআতে প্রমাণ নেই এমন কোন ব্যাপারে যদি কারও মনে হয় যে, স্বপ্নে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাই বলেছিলেন, তাহলে সেই স্বপ্ন অনুযায়ী সে তা করতে পারবে না।

এ ব্যাপারে আল্লামা নববীর ইবারত নিম্নরূপ–

قال القاضي عياض : ..... لايقطع بأمر المنام ولا أنه تَبْطُلُ بسببه سنة ثبتت ولا تثبت به سنة لم تثبت. وهذا بإجماع العلماء. هذا كلام القاضى، وكذا قاله غيره من أصحابنا وغيرهم فنقلوا الاتفاق على أنه لايغير بسبب ما يراه النائم ماتقرر في الشرع.

অর্থাৎ, কাজী ইয়াজ বলেন, ... "স্বপ্নের বিষয় দ্বারা কোন কিছু নিশ্চিত হওয়া যায় না। হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত– এমন কোন বিষয় স্বপ্ন দ্বারা বাতিল হয় না। এমনিভাবে হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়– এমন কোন বিষয়ও স্বপ্ন দ্বারা প্রমাণিত হয় না। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে।" এটা কাজী ইয়াজের বক্তব্য। অন্যান্য উলামায়ে কেরামের বক্তব্য এই যে, শরীয়তে প্রতিষ্ঠিত কোন বিষয় স্বপ্ন দ্বারা পরিবর্তিত হয় না।

কেউ কেউ মনে করতে পারেন হাদীছে ভাল স্বপ্নকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে "সুসংবাদ" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অতএব স্বপ্ন দলীল। তার জওয়াব হল- হাদীছে ভাল স্বপ্নকে যেমন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদ বলা হয়েছে, তেমনি স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকেও হতে পারে এবং মনের কল্পনাঘটিতও হতে পারে– একথাও হাদীছে বলা হয়েছে। আর কোন্ স্বপ্নটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শরীআতে তার পরিচয় যেহেতু দেয়া হয়নি, শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, সেটি ভাল স্বপ্ন। আর দ্বীনী ব্যাপারে ভাল-মন্দ নির্ধারণ শরীআতের কোন দলীল ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই কোন স্বপ্নকে ভাল বা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলতে গেলে অবশ্যই শরীআতের কোন না কোন দলীলের আশ্রয় নিতে হবে। অতএব স্বপ্ন কোন স্বতন্ত্র দলীল নয়। কোন স্বপ্ন শরীআতের অনুকূলে হলে সেটাকে সমর্থক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারবে মাত্র।

স্বপ্ন দলীল হওয়ার পক্ষে কিছু লোক প্রমাণ পেশ করে থাকেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) স্বপ্নে আযানের শব্দগুলো দেখেছিলেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে অনুযায়ী আযান প্রবর্তন করেছিলেন– এ দ্বারা বুঝা যায় যে, সপ্ন দলীল। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা সেখানে স্বপ্নটি সঠিক বলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

إِنَّ هٰذِه لَرُؤْيَا حَقٍّ. (رواه الترمذي ج/١باب ماجاؤ في بدأ الأذان)

অর্থাৎ, এটা অবশ্যই সত্য স্বপ্ন। (তিরমিযী)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ স্বীকৃতি না দিলে শুধু ঐ সাহাবীর স্বপ্নের ভিত্তিতে আযান প্রচলিত হত না। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর কারও স্বপ্ন সত্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়ার যেহেতু

কেউ থাকেনি, তাই এখন কারও স্বপ্নকে দলীল হিসাবে দাঁড় করানো যাবে না। এখানে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে- হযরত ওমর (রা.) এর ২০ দিন পূর্বে আযানের এরূপ শব্দ স্বপ্নে দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি সে স্বপ্নের ভিত্তিতে সেভাবে আযান দেয়া শুরু করেননি। এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেটা জানার পর ওমর (রা.)কে এ কথা বলেননি যে, স্বপ্নে দেখা সত্ত্বেও কেন তুমি সে মোতাবিক আমল শুরু করলে না? স্বপ্ন দলীল হলে অবশ্যই হযরত ওমর (রা.) স্বপ্ন মোতাবিক সেরূপ আমল করতেন বা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানার পর অনুরূপ বলতেন।

৫. হক প্রকাশে কারও পরোয়া না করা

আহ্লে হকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল সহীহ্ কথা বলা হলে কে কি বলবে, কে সমালোচনা করবে, কে বিরুদ্ধে চলে যাবে তার পরোয়া না করা। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

لَا يَزَالُ طَآئِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ عَلَى الْحَقِّ مَنْصُوْرِيْنَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. (رواه ابن ماجة بإسناد ثقات في باب أتباع سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم) وفِي رواية لَايُبَالُوْنَ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ نَصَرَهُمْ. وفي روايه البخاري (كتاب الأنبياء– باب سؤال المشركين أن يريهم آية إلخ) عَنْ مُعَاوِيَةَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ.

অর্থাৎ, কেয়ামত পর্যন্ত একদল লোক হকের উপর টিকে থাকবে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (তাদের বিরোধিতা হবে, কিন্তু) কেউ বিরোধিতা করে তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কে তাঁদের পক্ষে থাকল আর কে তাঁদের পক্ষে থাকল না, কে সাহায্য করল আর কে সাহায্য করল না- এর পরোয়া তাঁরা করবে না।[১]

৬. পরাভূত মানসিকতা নিয়ে কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা না দেয়া

আহ্লে হকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল তারা পরাভূত মানসিকতা নিয়ে কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা দেন না। বিজ্ঞানের সামনে পরাভূত হয়ে অনেকে আম্বিয়ায়ে কেরামের মু'জিযা এবং আউলিয়ায়ে কেরামের কারামতকে অস্বীকার বা তার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে হক্ব থেকে বিচ্যুত হয়েছে। যুগের হাওয়া ও প্রগতির সামনে পরাভূত হয়ে কেউ কেউ ফটোকে জায়েয বলেছেন, কেউ কেউ প্রচলিত গণতন্ত্রকে ইসলাম সমর্থিত বলে মত ব্যক্ত করেছেন, কেউ কেউ নারী নেতৃত্বকে বৈধ বলে চালানোর চেষ্টা করেছেন। এভাবে পরাভূত মানসিকতার কারণে তারা হক্ব থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

যেসব বিষয় হক্কানী বা কামেল হওয়ার দলীল নয়

১. কারও কাছে যাওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি হওয়া তার হক্কানী হওয়ার দলীল নয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে আগমনকারী সাহাবীদের অধিকাংশই গরীব ও দরিদ্র ছিলেন।

১. অনেকে বিদআত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলা হলে কিংবা কোন শক্ত মাসআলা বলা হলে সেটাকে বাড়াবাড়ি বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু সহীহ্ কথা যত কড়াই হোক তা বাড়াবাড়ি নয়। বাড়াবাড়ি হল ইসলামের মাত্রা ছেড়ে যাওয়া। যতটুকু বিধিবদ্ধ, তার মধ্যে অতিরঞ্জন সাধিত করা। শরীআতের আওতার মধ্যে থেকে কোন শক্ত বিষয় বলা বা শক্ত নীতি গ্রহণ করা বাড়াবাড়ি নয়।

২. কারও দরবারে বেশি লোক যাওয়া বা ভক্ত মুরীদের সংখ্যা বেশি হওয়া কিংবা সমর্থক বেশি হওয়া হক্কানী হওয়ার দলীল নয়। একাধিক আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, হকপন্থী লোক সংখ্যায় কম হতে পারে। কুরআনে কারীমে হযরত নূহ্ (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَ مَآ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلٌ.

অর্থাৎ, অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছিল। (সূরা: ১১-হুদ: ৪০)

সাড়ে নয়শত বৎসর দাওয়াত দেয়ার পরও এক বর্ণনায় হযরত নূহ (আ.)-এর অনুসারী হয়েছিল মাত্র ৮০ জন। কওমের অবশিষ্ট সকলেই ছিল তাঁর বিরোধী।

৩. বেশি হারে নামী-দামী ও ধনিক-বণিক শ্রেণীর লোকদের কোন মতবাদ গ্রহণ করাও সেটা হক হওয়ার দলীল নয়। দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণত ইসলামের অনুসারী হয়ে থাকে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছের এক ব্যাখ্যা অনুরূপ–

بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْبًا، فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ. (رواه مسلم في كتاب الإيمان – باب بيان الإسلام بدأ غريبا إلخ)

অর্থাৎ, ইসলামের সূচনা হয়েছে মুসাফির অবস্থায়, আবার অচিরেই সেই মুসাফির অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। তাই এই মুসাফির গোছের লোকদের জন্য সুসংবাদ।

৪. কোন মতবাদ অনুসারীদের জাগতিক শক্তি, আর্থিক শক্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি হওয়া তার হক হওয়ার দলীল নয়। এগুলো কম থাকলেও কেউ হক হতে পারে। কুরআন শরীফে এসেছে, হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে বলেছিল,

وَ مَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ وَ مَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ.

অর্থাৎ, আমরা তো দেখছি না-বুঝে তোমার অনুসরণ করছে তারাই, যারা আমাদের মধ্যে অধম। আমাদের ওপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না। (সূরা: ১১-হুদ: ২৭)

হযরত শুয়ায়িব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে বলেছিল,

وَ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا.

অর্থাৎ, আমরা তোমাকে দেখছি আমাদের মধ্যে দূর্বল। (সূরা: ১১-হুদ: ৯১)

৫. কোন অলৌকিক বা অদ্ভুত ধরনের কিছু দেখাতে পারাও কারও হক হওয়ার দলীল নয়।[১]

১. হযরত মুজাদ্দিদে আল্ফে ছানী (রহ.)-এর দরবারে একজন লোক দশ বছর পর্যন্ত ছিলেন। এই দশ বছরের মধ্যে উক্ত লোকটি হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.) থেকে অলৌকিক কিছু ঘটতে দেখেননি। একদিন তিনি মনে মনে ভাবলেন, এই দশ বছর থাকলাম, অলৌকিক কিছু দেখলাম না, অতএব এখানে থেকে আর কী হবে? আগামী কাল চলে যাব। সকাল বেলায় (পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অদ্ভুত কিছু অনেকভাবে দেখানো যায়। খাঁটি সাধনার মাধ্যমেও দেখানো যায়, আবার গলত তরীকায় সাধনার মাধ্যমেও দেখানো যায়। বুযুর্গীর শক্তিতেও দেখানো যায়, আবার যাদু, টোনা, তুকতাকের মাধ্যমেও দেখানো যায়।

তবে ঘটিতব্য অলৌকিক বিষয়টা যাদু টোনার মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে, না ভ্রান্ত সাধনার মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে, সেটা কি সত্যিকারের বুযুর্গী-ঘটিত কারামত না ভেল্কীবাজি? তা বিজ্ঞ আলেমগণ তার আমল আকীদা ও শরীআতের পাবন্দীর বিচার পূর্বক বুঝতে সক্ষম হন। জহুরী জওহর চেনে। প্রকৃত কারামত এবং ভেল্কী-বাজির মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম মানুষদের পক্ষে কোন বিচক্ষণ আলেম বা বুযুর্গ থেকে সে ব্যাপারে পরিষ্কার জেনে না নিয়ে এগুলোর পেছনে পড়ে বা এগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করে কারও ভক্ত হওয়া ভুল।

৬. কারও তাবীজ-তদবীরে ভাল কাজ হওয়া তার হক্কানী বা কামেল হওয়ার দলীল নয়। কারও তাবীজ-তদবীরে নিঃসন্তান ব্যক্তির সন্তান লাভ হওয়া বা কোন জটিল রোগ-ব্যাধি সেরে যাওয়া তদবীরদাতার কামেল হওয়ার দলীল নয়। তাবীজ-তদবীর হল দুআর মত। যা কিছুই হয় আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ীই হয়; এক্ষেত্রে তাবীজদাতার কোনো ক্ষমতা নেই। যেমন কারও দুআ কবূল হওয়া তার কামেল হওয়ার কোন প্রমাণ নয়। ফাসেক ফাজের, এমনকি কাফেরের দুআও কবূল হতে পারে। কেয়ামত পর্যন্ত হায়াত দান বিষয়ে সবচেয়ে বড় কাফের শয়তানের দুআ কবূল হয়েছিল। তাই দুআ কবূল হওয়া যেমন বুযুর্গীর প্রমাণ নয়, তাবীজ-তদবীরে কাজ হয়ে যাওয়াও তেমনি বুযুর্গীর প্রমাণ নয়। একজন সাধারণ মানুষের তাবীজ-তদবীরেও কাজ হতে পারে, আবার একজন বুযুর্গের তাবীজ-তদবীরেও কাজ না হতে পারে। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ্র ইচ্ছা, এটা মানুষের হাতে নয়।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা)

মুজাদ্দিদে আল্ফে ছানী (রহ.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল তোমার মনে কী ইচ্ছা জেগেছে? তিনি বললেন, হযরত! এতদিন আপনার কাছে থেকে কোনোই কারামত দেখলাম না। তাই আজ আমি চলে যাব বলে ইচ্ছা করেছি। হযরত মুজাদ্দিদে আল্ফে ছানী (রহ.) বললেন, তোমার কী কারামত আছে? তিনি বললেন, হুজুর! আমি ধ্যান করে কবরের মধ্যে ঢুকে যেতে পারি এবং মুর্দার সঙ্গে কথা বলে তার খবরাখবর জেনে আসতে পারি। মুজাদ্দিদে আল্ফে ছানী (রহ.) বললেন, তুমি ধ্যান করে কবরের ভিতর ঢুকে যেয়ে তাদের অবস্থা জানবে। আর আমি এখানে বসে ডাক দিলে সেরহিন্দের সব রূহ্ হাজির হয়ে যাবে। কিন্তু এটা কোন কামালিয়াত নয়, এটা কোন বুযুর্গী নয়। বুযুর্গী হল আমল করা, শরীআতের পাবন্দী করা, সুন্নাতের এত্তেবা' করা। তুমি বল, এই দশ বছর যে আমার কাছে থেকেছ, এর মধ্যে আমার থেকে কোন ফরয, ওয়াজিব নয় কোন সুন্নাত, মোস্তাহাব ছুটতে দেখেছ? তিনি বললেন, জি না ছুটতে দেখিনি। তখন মুজাদ্দিদ আল্ফে ছানী (রহ.) বললেন, এটাকেই বুযুর্গী বলা হয়, এটাকেই কামাল বলা হয়। مجالس حکیم الامت

৭. কারও কাশ্ফ হয়ে যাওয়া বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন গায়েবী খবর বলে দিতে পারা তার হক্কানী বা কামেল হওয়ার দলীল নয়। যেমন: একজন বলল, অমুক স্থান থেকে আমার দরবারে অমুক অমুক লোক আসছে বা এই এই মাল আসছে ইত্যাদি। কেউ এগুলোকে তার কামেল, হক্কানী বা বুযুর্গ হওয়ার দলীল ভাবলেন– এটা ভুল।

না দেখা খবর অনেকভাবে বলে দেয়া যেতে পারে। প্রতারণার মাধ্যমে হতে পারে। যেমন: তার নিয়োগ করা লোক ফোনের মাধ্যমে তাকে জানিয়ে দিচ্ছে আর এভাবে তিনি কামালাত প্রকাশের প্রয়াস নিচ্ছেন– এমনও হতে পারে। কিংবা এমনও হতে পারে তার দরবারে লোক ঠিক করা থাকে যে, কেউ অমুক সমস্যা নিয়ে আসলে তাকে দরবারে নিয়ে আসবে অমুকে। এভাবে তাকে যখন দরবারে আনা হয় তখন পীর সাহেব বলে দেন, তুমি এই সমস্যা নিয়ে এসেছ না? ইত্যাদি। অনেক সময় জিনদের মাধ্যমেও অনেক না দেখা বিষয় জানা যায়। আবার অনেক সময় শয়তান এ জাতীয় লোকদেরকে অনেক গোপন বিষয় জানিয়ে দেয় সাধারণ মানুষকে তার খপ্পরে ফেলে বিভ্রান্ত করার জন্য। কিংবা আরও বহুভাবে এমনটা হতে পারে।

যদি মেনে নেয়া হয় এসব কোন কৌশল বা ছল-চাতুরী নয় বরং প্রকৃতপক্ষেই তার কাশ্ফ হয়ে থাকে আর কাশ্ফের মাধ্যমেই গোপন বিষয় তিনি জানতে পারেন, তাহলেও এটাকে তার হক্কানী, কামেল বা বুযুর্গ হওয়ার দলীল মনে করা যাবে না। কারণ ফাসেক ফাজের এবং পাপী মানুষেরও কাশ্ফ হতে পারে। হেকিমী শাস্ত্রের কিতাবে আছে সাস্থ্যগত এবং মস্তিস্কগত বিভিন্ন কারণেও অনেক সময় না দেখা বিষয় মস্তিস্কে উদিত হয়ে যায়। তাই শিশু, এমনকি পাগলও অনেক সময় গায়েবী খবর বলে দিতে পারে। হযরত থানভী (রহ.) কুদরাতুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, সে ছিল পথভ্রষ্ট ধরনের লোক, নামাযের পর্যন্ত ধার ধারত না, কিন্তু অনেক অজানা লোকের কবরের কাছে গিয়ে বলে দিত যে, এই এই কারণে এই কবরওয়ালার শাস্তি হচ্ছে বা সে এই অবস্থায় আছে। পরে তদন্ত করে দেখা যেত তার কথা সত্য।[১]

কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা-এর নীতি

(اصول تکفیر)

১. যখন কেউ প্রকৃতই কাফের হয়ে যায়, তখন তাকে কাফের বলে ফতওয়া দিয়ে দেয়া মুফতীদের কর্তব্য, যাতে অন্য মুসলমান তার আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে মুফতীদের এ কথার ভয় করা উচিত হবে না যে, মৌলভী-রা শুধু ফতওয়াবাজী করে বেড়ায় বা নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি করে। কেউ কাফের হয়ে গেলে তাকে তাক্ফীর (কাফের আখ্যায়িত) না করার অর্থ অনেকটা তাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত আখ্যায়িত করা। কেননা সাধারণ মানুষ তার তাক্ফীর

১. مجالس حکیم الامت

হতে না দেখলে তাকে হেদায়েতপ্রাপ্তই মনে করবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ইরশাদ হয়েছে,

اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ.

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত বলতে চাও? (সূরা: ৪-নিসা: ৮৮)

২. যদি কেউ প্রকৃতই কাফের না হয়ে যায়, তাহলে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা মহা পাপ। এতে এরূপ ফতওয়া প্রদানকারী স্বয়ং নিজেই কাফের হয়ে যাবে। কেননা এতে করে সে যেটা কুফ্রী নয় অর্থাৎ, যেটা সঠিক ঈমান-ইসলাম সেটাকেই কুফ্রী আখ্যায়িত করল। আর সঠিক ঈমান-ইসলামকে কুফ্রী আখ্যায়িত করা কুফ্রীই বটে। কাজেই কুফ্রীর ফতওয়া প্রদানের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া সংগত নয়। যে কাফের নয় তাকে কাফের আখ্যায়িত করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا.

অর্থাৎ, কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে (অর্থাৎ, নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করলে) তোমরা বল না যে, তুমি মুমিন নও। (সূরা: ৪-নিসা: ৯৪)

যে কাফের নয় তাকে কাফের আখ্যায়িত করা দ্বারা নিজে কাফের হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

اَيُّمَا مُسْلِمٍ قَالَ لِأَخِيْهِ "يَاكَافِرُ" فَقَدْ بَآءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ.

(رواه مسلم في كتال الإيمان، باب بيان حال أيمان قال لأخيه المسلم "ياكافر")

অর্থাৎ, যে তার কোন (মুসলমান) ভাইকে বলবে হে কাফের! তাহলে (এ ক্ষেত্রে) তাদের দু'জনের একজন এ কথার পাত্র হবে– যদি সম্বোধিত ব্যক্তি এমনই হয়, তবে তো তা-ই, অন্যথায় কথাটা বক্তার দিকে ফিরে আসবে। (মুসলিম)

৩. কোন মুসলমানের কোন কথা বা কাজ কুফ্র কি না– এ ব্যাপারে উভয় দিকের সম্ভাবনা থাকলে তাকে সেই কথা বা কাজের ভিত্তিতে কাফের বলে ফতওয়া দেয়া যাবে না, এমনকি কুফ্রের দিকটার সম্ভাবনা বেশি থাকলেও। এমনকি সেটা কুফ্র হওয়ার সম্ভাবনা ৯৯ ভাগ আর কুফ্র না হওয়ার সম্ভাবনা ১ ভাগ হলেও। তবে হ্যাঁ একটা কথা বা একটা কাজও যদি এমন পাওয়া যায় যা নিশ্চিতই কুফ্রী, তাহলে তার কারণে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে।

বি. দ্র. কেউ মনে করতে পারেন যে, আকাইদের কিতাবে উল্লেখিত আছে কোন আহ্লে কিবলাকে তাক্ফীর করা হবে না। এর দ্বারা শুধু শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয় যে, কেউ কেবলামুখী হয়ে শুধু নামায পড়লেই আর তাকে তাক্ফীর করা হবে না, চাই তার মধ্যে যতই কুফ্রীর কারণ পাওয়া যাক না কেন। কেননা "আহ্লে কিব্লা" একটি

পরিভাষা, যার অর্থ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা জরূরিয়্যাতে দ্বীনকে[১] স্বীকার করে তারা আহ্‌লে কিব্‌লা। পক্ষান্তরে যারা দ্বীনের কোন জরূরিয়্যাতকে অস্বীকার করে, তারা পরিভাষায় আহ্‌লে কিবলা নয়। তাদের তাক্‌ফীর করা হবে। তদ্রূপ তাক্‌ফীরের অন্যান্য কারণ পাওয়া গেলেও তাক্‌ফীর করা হবে। আবুল বাকা-এর كليات-য়ে এ কথাগুলো অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে।

وفي كليات أبي البقاء : فلا نكفر أهل القبلة ما لم يأت بما يُوْجِبُ الكفرَ وهذا من قبيل قوله تعالى : (إن الله يغفر الذنوب جميعا.) وفي شرح الفقه الأكبر : ولا يخفى أن المراد بقول علمائنا : "لايجوز تكفير أهل القبلة بذنب" ليس مجرد التوجه إلى القبلة، فإن الغلاة من الروافض– الذين يدعون أن جبرئيل غلط في الوحي فإن الله تعالى أرسله إلى علي رض، وبعضهم قالوا : إنه إله– وإن صلُّوا إلى القبلة ليسوا بمؤمنين. وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : من صلى صلوتنا وأكل ذبيحتنا واستقبا قبلتنا فذالك مسلم.

যেসব কারণে কেউ কাফের হয়ে যায়

১. যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে কুরআনে বর্ণিত সুস্পষ্ট কোন বিধান বা খবরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথবা কুরআন দ্বারা স্বীকৃত বিষয়কে অস্বীকার বা কুরআনের মাঝে অস্বীকৃত বিষয়কে স্বীকার করে কিংবা এ বিষয়ে সংশয় সন্দেহ পোষণ করে, নিঃসন্দেহে সে কাফের হয়ে যায়। كتاب الإعلام بقواطع الإسلام গ্রন্থে এ কথাগুলোই বলা হয়েছে।

من كذب بشيء مما صرح به في القرآن من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذالك أو شكَّ في شيء من ذالك كفر.

২. এমন কথা বলা বা উক্তি করা যার দ্বারা আল্লাহ অথবা রসূলকে অস্বীকার করা বোঝায় অথবা রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা বোঝায়, অথবা শরীআতের সুস্পষ্ট বিধান সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্রূপ করা, এমনিভাবে শরীআতের জরূরিয়্যাতকে অস্বীকার করা, এসবের দরুন সে ব্যক্তি মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যাবে। حجة الله البالغة গ্রন্থে এ কথাগুলোই বলা হয়েছে।

وتثبت الرِدَّة بقولٍ يدل على نفي الصانع أو الرُّسُل أو تكذيب رسول أو فعلٍ تَعَمَّدَ به استهزاءً صريحًا بالدين وكذا إنكار ضروريات الدين.

জরূরিয়্যাতে দ্বীনের মধ্যে ভিন্ন কোন ধরনের ব্যাখ্যা দেয়াও কুফ্‌রী।

وفي حاشية الخيالي للعلامة عبد الحكيم السياكوتي : والتأويل في ضروريات الدين لايدفع الكفر. وقال الشيخ محى الدين ابن العربي في الفتوحات المكية : التأويل

১. জরূরিয়্যাত-এর ব্যাখ্যা ২১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

الفاسد كالكفر. وفي إيثار الحق على الخلق للوزير اليماني : لأن الكفر هو جحد الضروريات من الدين أو تأويلها.

(اسلام اور کفر قرآن کی روشنی میں مفتی محمد شفیع)

৩. فتاوی ظہیریہ গ্রন্থে আছে-

إن الأخبار المروِيَّة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلث : متواتر، فمن أنكره كفر. ومشهور، فمن أنكره كفر إلا عند عيسى بن أبان، فإنه يُضَلِّل ولا يُكَفِّرُ. وخبر الواحد، فلا يُكَفَّرُ جَاحِدُه غير أنه يأثم بترك القبول، ومن سمع حديثا فقال : "سمعناه كثيرا" بطريق الاستخفاف كفر.

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীছ তিন প্রকার। যথা:–
(এক) মুতাওয়াতির (متواتر) : এ প্রকার হাদীছকে অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যাবে।
(দুই) মাশ্‌হুর (مشہور) : অধিকাংশ উলামার মতে এ প্রকার হাদীছ অস্বীকারকারীও কাফের হয়ে যাবে। তবে হযরত ঈসা ইবনে আবান (রহ.) তাকে কাফের বলেন না বরং তাকে গোমরাহ বলেন।
(তিন) খবরে অহেদ (خبر واحد) : এ প্রকার হাদীছকে অস্বীকারকারী কাফের হবে না বটে, তবে হাদীছকে গ্রহণ না করার অপরাধে সে অবশ্যই ফাসেক ও গোমরাহ হবে। আর যে ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন হাদীছ শোনার পর তাচ্ছিল্যভরে বলবে যে, আমি অনেক শুনেছি, সে-ও কাফের হয়ে যাবে।

৪. ইজ্‌মার হুকুমকে অস্বীকার করা কুফ্‌রী। আল্লামা ইব্‌নে হুমাম (রহ.) বলেন,

إنكار حلم الإ جماع القطعي يكفر عند الحنفية وطائفة.

অর্থাৎ, হানাফী মতাবলম্বীদের নিটক অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইজমার হুকুমকে অস্বীকারকারী কাফের।

৫. যেসব জরূরিয়্যাতে দ্বীনের উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে এমন জরূরিয়্যাতে দ্বীনের অস্বীকার করা কুফ্‌রী। আল্লামা সুবকী (রহ.) লিখেছেন-

جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر مطلقا. (شرح جمع الجوامع)

অর্থাৎ, জরূরিয়্যাতে দ্বীন –যার ওপর সর্বযুগে ইজ্‌মা সংঘটিত আছে– তার অস্বীকারকারী এক বাক্যে কাফের!

অবশ্য তাদের যদি কেউ এমন হয় যে, কুরআন-হাদীছের যেসব ভাষ্য অস্বীকার পূর্বক তারা যে ধ্যান-ধারণা পোষণ করেছে তা শরয়ী বিধানের মাঝে তাবীল বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষে করেছে, আর কুরআন-হাদীছের কোন ভাষ্যের অস্বীকৃতি যদি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ হয়, তাহলে তাকে কুফ্‌রী বলা যায় না। নিদেনপক্ষে সেটাকে মুজতাহিদ ব্যক্তির ইজতিহাদী ভুল বলে গণ্য করা যেতে পারে।

তবে এ ধরনের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, প্রথমত যদি তারা কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই বেধড়ক কুরআন-হাদীছের ভাষ্যকে অস্বীকার পূর্বক মনগড়া মতামত ব্যক্ত করে। কিংবা শরয়ী হুকুমের মাঝে যে ব্যাখ্যামূলক মতামত (تاویل) তারা দেয় তা সঠিক ব্যাখ্যা (تاویل)-এর নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে না দেয়, তাহলে তারা যে ব্যাখ্যা (تاویل)-এর আলোকে নিজেদের ধ্যান-ধারণা পোষণ করেছে তা শরীআতের নীতি মাফিক না হওয়াতে তারা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

৬. নুসূসে কাত্ইয়্যা (قطعيہ نصوص) বা কাত্ইয়্যাতকে[১] অস্বীকার করা কুফরী।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) إكفار الملحدين গ্রন্থে বলেন, "যারা কুরআনে বর্ণিত কোন স্পষ্ট ভাষ্য (نص صریح)কে প্রত্যাখ্যান করবে বা তা নিয়ে বিরোধ করবে, তাদের তাক্ফীরের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা' রয়েছে। যেমন: কতক বাতিনিয়া তার জাহিরী অর্থ বাদ দিয়ে ভিন্ন অর্থের দাবী করে থাকে। অথবা সকলের নিকট নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত কোন ব্যাপক ও নিশ্চিত অর্থবোধক কোন হাদীছ –যার মানসূখ না হওয়া, তাতে কোনরূপ তাখসীস না থাকা এবং তার জাহিরী অর্থ গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে উলামা ও ফকীহদের ঐক্যমত্য রয়েছে– এমন কোন হাদীছকে তাখ্সীস করলেও তার ভিত্তিতে তাক্ফীর হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা' রয়েছে। যেমন: খাওয়ারেজ সম্প্রদায় কর্তৃক বিবাহিত যেনাকারী পুরুষ ও নারীদের রজম সম্পর্কিত বিধানকে অস্বীকার করার কারণে তাদেরকে তাক্ফীর করা। বিবাহিত যেনাকারী পুরুষ ও নারীদের রজম সম্পর্কিত বিষয়টা সর্বসম্মত ও বদীহী বিষয়।" ফাতহুল মুগীছ কিতাবে বলা হয়েছে,

وفي فتح المغيث شرح ألفية الحديث : لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار تطعي من الشريعة. (اسلام اور کفر قرآن کی روشنی مین مفتی محمد شفیع)

অর্থাৎ, কোন "আহ্লে কিবলা"[২] কে তাক্ফীর করা হবে না, তবে কেউ শরীআতের কোন সুস্পষ্ট বিধানকে অস্বীকার করলে ভিন্ন কথা।

কাতইয়্যাত বা জরূরিয়্যাত অস্বীকারকারীদের তাকফীরের[৩] ব্যাপারে আল্লামা তাকী উছমানী সাহেবের বক্তব্য খুব পরিষ্কার। তিনি বলেছেন, কেউ কেউ বলেছেন, কাতইয়্যাতের যেকোনোটা অস্বীকার করলেই তাকফীর করা হবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, "কাতইয়্যাতের মধ্যে যেগুলো জরূরিয়্যাত (যে সম্বন্ধে আম-খাস নির্বিশেষে

১. কুরআন-হাদীছের যেসব ভাষ্য একই সাথে কাত্ইয়্যুল লফ্জ ও ক্বাত্ইয়্যুল মা'না, তাকে বলা হয় ক্বাত্ইয়্যাত।

২. যারা জরূরিয়্যাতে দ্বীনকে স্বীকার করে, তাদেরকে "আহলে কিবলা" বলে। জরূরিয়্যাতে দ্বীন কাকে বলে তার ব্যাখ্যা ২১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

২. তাকফীর অর্থ কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা, কাউকে কাফের বলে ফতোয়া দেয়া।

সব মানুষ জানে যে, সেটা দ্বীনের অংশ।) সেগুলোর কোনোটা অস্বীকার করলে তাকফীর করা হবে। কাতয়ী কিন্তু জরূরী বা বদীহী নয় এমনটা অস্বীকার করলে তাকফীর করা হবে না, তবে এরূপ লোক সম্বন্ধে বলা হবে সে ফাসেক।" তাকী উছমানী সাহেব বলেন, তবে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী কথা হল কাতইয়্যাতের মধ্যে যেগুলো জরূরী তথা বদীহী নয়, শুধুই কাতয়ী– এমন কোন কিছু কেউ অস্বীকার করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে তাকফীর করা হবে না, বরং তাকে জানানো হবে সে যেটা অস্বীকার করছে তা কাতয়ী (قطعي اللفظ ও قطعي الدلالة), বিষয়টা যে কাতয়ী তার দলীল-প্রমাণাদিও তার সামনে পেশ করা হবে, এরপরও যদি অস্বীকার করায় হটকারিতা প্রদর্শন করে, তাহলে তাকে তাকফীর করা হবে। আর যদি তাকে জানানো ও তার সামনে দলীল-প্রমাণাদি পেশ করার পর সে মেনে নেয়, তাহলে তাকে তাকফীর করা হবে না, বরং সে মুসলমান। (إنعام الباري شرح صحيح البخاري ج/١)

দ্বিতীয় অধ্যায়
(এ'তেকাদী ফিরকা বিষয়ক)

*** প্রাচীন এ'তেকাদী ফিরকাসমূহ**

খাওয়ারেজ
(الخوارج)

নাম ও নামকরণ রহস্য

এই সম্প্রদায়ের অনেকগুলো নাম আছে। যথা:

১. আল-খাওয়ারেজ (الخوارج)[১]
২. আল-হারূরিয়্যাহ (الحرورية)[২]

---

১. শব্দটি খারিজ (الخارج) কিংবা খারেজী (الخارجي)-এর বহুবচন। আরবী (الخروج) ধাতুমূল থেকে উদগত, যার অর্থ অবাধ্য হওয়া, বিদ্রোহ করা। এই শব্দে এদেরকে এ কারণে নামকরণ করা হয়েছে যেহেতু সিফ্‌ফীন যুদ্ধের সময় 'সালিস' নির্ধারণের দিন হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করেছিল। অনুরূপভাবে কেউ হক শাসক (الإمام الحق)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে –চাই সেটা সাহাবী যুগের খোলাফায়ে রাশেদার বিরুদ্ধে হোক, তাবেয়ী যুগের শাসকদের বিরুদ্ধে হোক, বা অন্য যে কোন কালের হকপন্থী শাসকের বিরুদ্ধে হোক– এই বিদ্রোহীকে 'খারেজী' বলা হবে।

২. কূফার ছোট শহর কিংবা গ্রাম 'হারূরা'-র দিকে সম্পৃক্ত করে এই নাম রাখা হয়েছে। এরাও হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। হযরত আলী (রা.) যখন সিফ্‌ফীন থেকে কূফায় ফিরে আসছিলেন, তখন এরা 'হারূরা' নামক স্থানে সংঘবদ্ধ হয়েছিল।

৩. আল-বুগাত (البغاة)[১]
৪. আল-হাকামিয়্যা বা আল-মুহাক্‌কিমা (الحكمية أو المحكمة)[২]
৫. আল-মারেকা (المارقة)[৩]
৬. আশ-শুরাত (الشراة)[৪]
৭. আন-নাওয়াসিব বা আন-নাসিবী (النواصب أو الناصبي)[৫]

খারিজী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও প্রেক্ষাপট

হযরত আলী এবং হযরত মুআবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মধ্যে সিফফীন যুদ্ধ যখন প্রচণ্ডরূপ ধারণ করল, হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর বাহিনী যখন পালাতে শুরু করল, তাদের খুব সামান্য যোদ্ধাই ময়দানে বহাল রইল। তখনই এই অবশিষ্ট ক্ষুদ্র বাহিনীর মাথায় সালিসী চিন্তা চেপে বসল। তখন তারা পবিত্র কুরআনকে উঁচু করে ধরল। উদ্দেশ্য, যাতে প্রতিপক্ষ কুরআনের ফয়সালাকে মেনে নেয়। বিজ্ঞ সাহাবী হযরত আলী (রা.) তাঁর বাহিনীকে বিজয় না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম লড়ে যেতে আদেশ করলেন। আর তখনই হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনীর একটা অংশ বিদ্রোহ করে বসল। তারা বলল, ওরা আমাদেরকে কুরআনের দিকে আহবান করছে আর আপনি আমাদেরকে ডাকছেন যুদ্ধের দিকে, তলোয়ারের দিকে!

হযরত আলী (রা.) তখন বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআনে কি আছে তা আমি তোমাদের চেয়ে ভাল জানি। সুতরাং অবশিষ্ট বাহিনীকে ধাওয়া কর, লড়। তারা বলল, আপনি উশতুর[৬]কে ফিরিয়ে আনুন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে বিরত করুন। নইলে আমরা আপনার সঙ্গে সেই আচরণই করব, যা উছমানের সাথে করা হয়েছিল। অবশেষে বাধ্য হয়ে হযরত আলী (রা.) সালিসী মেনে নিলেন। তারপর সালিস কর্তৃক

---

১. আরবী باغ শব্দের বহুবচন। অর্থ বিদ্রোহী। খারিজীরা হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তাই এ শব্দে নামকরণ করা হয়েছে।

২. এ দলটার সার্বক্ষণিক শ্লোগানই ছিল "لاحكم إلا الله" অর্থাৎ, শাসনের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। তাই এই 'حكم' শব্দ থেকেই 'হাকামিয়্যা'র উৎপত্তি। অথবা তাহ্‌কীম (التحكيم –সালিস নির্ধারণ করা) শব্দ থেকে এই নামের সৃষ্টি। খারিজীদেরকে এ কারণেই 'মুহাক্‌কিমা'-ও বলা হয়।

৩. আরবী শব্দ المروق 'মুরূক' থেকে উদগত। যার অর্থ সটকে পড়া, দ্রুত বেরিয়ে পড়া। কারণ তীর যেমন ধনুক থেকে ছিটকে পড়ে এরাও তেমনি দ্বীন থেকে ছিটকে পড়েছিল। এই ছিটকে পড়া বা দ্বীন থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়া অর্থেই খারিজীদেরকে মারেকা (مارقة) বলা হয়।

৪. আরবী শব্দ شار (শারিন)-এর বহুবচন। অর্থ ক্রেতা বা বিক্রেতা। এদের ধারণা, এরা তাদের জীবনকে আল্লাহ্‌র কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এ অর্থেই এদেরকে শুরাত (বিক্রেতা) বলা হয়।

৫. আরবী নাসিব (ناصب) শব্দের বহুবচন হলো নাওয়াসিব (نواصب)। অর্থ কঠিন, ক্লান্তিকর। এই ফিরকাটা যেহেতু হযরত আলী (রা.)-এর বিরোধিতায় খুবই প্রান্তিক, তাই এ শব্দে নামকরণ করে এদেরকে নাসিবীও বলা হয়।

৬. আল–উশতুর আন-নাখঈ। হযরত আলী (রা.)-এর অন্যতম সহযোদ্ধা ও তাঁর বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন।

যখন সালিসী কর্ম সমাপ্ত হল– হযরত আলী (রা.) অপসারিত হলেন, বহাল রইলেন হযরত মুআবিয়া (রা.)– তখন এই সালিসীর কারণেই বিদ্রোহ আরও বলবান হয়ে উঠল। তখন আবার এই খারিজী-বিদ্রোহী গোষ্ঠীই হযরত আলী (রা.)-এর ওপর চড়াও হয়ে বসল। বলল, মানুষকে কেন সালিস নিযুক্ত করলেন? শাসন ও ফয়সালার মালিক তো কেবল আল্লাহ! তারা এ কারণে হযরত আলী (রা.)কে অপরাধী সাব্যস্ত করে বসল। বলল, এই সালিসী মেনে নিয়ে তিনি কুফ্‌রী করেছেন। তাঁকে তওবা করতে হবে, যেমনটা তারা করেছে। আর এখান থেকেই এই নতুন চিন্তা ও দর্শনের উদ্ভব হল যে, যে ব্যক্তি কোন কবীরা গোনাহ করবে, সে ইসলামের সীমানা থেকে বেরিয়ে পড়বে। তার পর ধীরে ধীরে তাদের চিন্তাধারা আরও প্রসারিত হয়েছে, বিস্তৃত হয়েছে।[১]

প্রতিষ্ঠাতা

শাহরাসতানী লিখেছেন,[২] আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যারা বিদ্রোহ করে, তারা সিফফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দলভূক্ত একটি জামাআত। তাঁর বিরোধিতা ও ইসলাম থেকে ছিন্ন হয়ে পড়ার ক্ষেত্রে কঠোর ও অগ্রণী ছিল আশআছ ইবনে কায়স আল-কিন্দী, মিসআর ইব্‌নে ফাদাক আত-তাইমী, যায়েদ ইবনে হুসাইন আত-তাঈ। তারাই এই শ্লোগান তুলেছিল, এরা তো আমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে ডাকছে আর আপনি ডাকছেন তলোয়ারের দিকে?

খারেজীদের দল-উপদলসমূহ

খারেজী সম্প্রদায় মৌলিকভাবে আট দলে বিভক্ত। যথা:–

১. আল-মুহাককিমা আল-উলা (المحكمة الأرلى)[৩]
২. আল আযারিকা (الأزاوقة)[৪]

১. দেখুন- تاريخ المذاهب الإسلامية وملل والنحل
২. আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, মিসর, ১৯৭৬ ইং, ১ম খণ্ড, ১১৪ পৃ.
৩. আল-মুহাককিমা আল-উলা: এরা সেই দল যারা আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে সালিসীর ঘটনাকালে বিদ্রোহ করেছিল এবং হারূরা নামক স্থানে সমবেত হয়েছিল। তাদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ ইবনুল কাওয়া, আত্তাব ইবনুল আ'ওয়ার, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহাব আর-রাসিবী, উরওয়া ইব্‌ন জারীর, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবু আসিম আল-মুহারিবী, হারকূস ইব্‌ন যুহায়র আল-বাজালী, যিনি "যুছ-ছাদ্‌য়া" (ذو الثدية) নামে খ্যাত।

এই দলটার ধর্মবিশ্বাস বলতে যা ছিল তা হল, হযরত আলী, হযরত উছমান, জঙ্গে জামালে অংশগ্রহণকারী মুসলমানগণ, হযরত মুআবিয়া (রা.) ও তার অনুসারীদেরকে কাফের মনে করা, অনুরূপভাবে গোনাহ্‌কারী পাপী বলতে সকলেই কাফের। তারা বলত, যারা আমাদের বিরোধী তারা সকলেই কাফের।

৪. আল-আযারিকা: এ দলটা আবূ রাশিদ নাফি' ইব্‌নুল আযরাক (نافع بن الأزرق) আল-হানাফীর অনুসারী। বনূ হানীফা গোত্রে জন্ম বলে তাকে 'হানাফী' বলা হয়। খারিজীদের মধ্যে এরা ছিল সর্বাধিক ভণ্ড, দুর্দান্ত। সংখ্যাধিক্য ও মর্যাদায় তারা খারেজীদের শীর্ষ দল। তাদের একটা অন্যতম বিশ্বাস হল- যে অঞ্চল বা দেশের লোকেরা তাদের বিরোধিতা করবে (পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৩. আন-নাজদাত (النجداب)[১]
৪. আল-আজারিদা (العجاردة)[২]
৫. আছ-ছা'আলিবা (الثعالبة)[৩]
৬. আল-ইবাযিয়্যা (الإباضية)[৪]
৭. আস-সাফারিয়্যা আয-যিয়াদিয়্যা (الصفرية الزيادية)[৫]

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা)
সে দেশ ও অঞ্চল হবে দারুল কুফ্‌র। সেখানকার শিশু, নারী ও বৃদ্ধদেরকে হত্যা করা জায়েয আছে। তারা মনে করে, তাদের বিরোধীরা এমনকি এই বিরোধীদের ছোট শিশুরা পর্যন্ত অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। তারা ব্যভিচারীদের উপর পাথর মারার শাস্তি-বিধানকে অস্বীকার করে এবং এ-ও বিশ্বাস করে যে, নবীগণ সগীরা এমনকি কবীরা গোনাহ্‌ও করতে পারেন। তাদের মতে তাদের অনুসারী ছিল এমন ব্যক্তি যদি তাদের কাছে 'হিজরত' করে চলে না যায় তাহলে তারা মুশরিক। এমনকি যদি তাদের বিশ্বাসের অনুসারী হয় তবুও। এই দলের নেতা আযরাক মৃত্যুবরণ করে ৬৮৫ ঈ: সালে। المنجد في قسم الأعلام ॥

১.আন-নাজ্‌দাত: এটা নাজদা ইব্‌ন আমির এর অনুসারী দল। কেউ কেউ আবার বলেছেন, নাজদা ইব্‌ন আসিম। আবার কারো কারো মতে নাজদা ইব্‌ন উমায়র আল-হানাফী। বনূ হানীফা গোত্রভুক্ত। সে ইয়ামামা অঞ্চলে বিদ্রোহ করেছিল। তার গোমরাহীর অন্যতম কয়েকটা দিক হল সে মদ পানের শাস্তি 'হদ'কে রহিত করে দিয়েছিল। তার মতে, যে তার ধর্ম-মতের বিরোধিতা করবে সেই জাহান্নামী। তাকে তার-ই অনুসারীরা হিজরী ৬৯ সাল মোতাবেক ৬৮৮ খৃষ্টাব্দে হত্যা করে দেয়। المنجد في قسم الأعلام ॥

২.আল-আজারিদা: এ দলটা মূলত আবদুল করীম ইবনুল আজারিদ-এর অনুসারী। এই আব্দুল করীম আতিয়্যা ইবনুল আসওয়াদ আল-হানাফী-র একজন অনুসারী। আল-আতিয়্যা নাজ্‌দার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অতঃপর নাজদাতের একটি ক্ষুদ্র দলসহ সিজিস্‌তানে চলে যায়।

৩. আছ-ছা'আলিবা: ছা'লাবা ইব্‌নে মিশ্‌কান (ثعلبة بن مشكان)–এর অনুসারী দল। (الفرق بين الفرق) আর الملل النحل গ্রন্থে এর নাম লেখা হয়েছে ছা'লাবা ইব্‌ন আমের। خطط المقريزي তেও অনুরূপই উল্লেখিত হয়েছে। সে মনে করত তাদের গোলাম যখন সম্পদশালী হয়ে উঠবে তখন তাদের থেকে যাকাত নেয়া হবে। আর তাদেরকে যাকাত দেয়া হবে তখন, যখন তারা অভাবী হবে।

৪. আল-ইবাযিয়্যা: এরা হল আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইবায আল-মারী আত-তামিমীর অনুসারী। তাদের মতাবলীর মধ্যে রয়েছে- মুসলমানদের মধ্যে যারা তাদের বিরোধী তারা মুশরিক নয়। তবে মুমিনও নয়। এরা তাদেরকে কাফের বলে এই অর্থে যে, এরা আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের অস্বীকারকারী। উল্লেখ্য, "কাফের" শব্দটি আভিধানিকভাবে নেয়ামত অস্বীকারকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তারা এ-ও বলে, তাদের বিরোধীদের দেশ তাওহীদের দেশ। তাদের সৈনিকদের অঞ্চল হল বিদ্রোহীদের অঞ্চল। তার মৃত্যু হয়েছে আনুমানিক ঈ: ৭০৬ সালে। المنجد في اللغة الأعلام

৫. আস-সাফরিয়্যা আয-যিয়াদিয়্যা: এরা হল যিয়াদ ইব্‌নুল আস্‌ফারের অনুসারী। তাদের মতে তাকিয়্যা (সত্য গোপন করা) জায়েয আছে কথায়, কর্মে নয়। সাফরিয়্যাদের একটা ফিরকার ধারণা হল যেসব পাপে 'হদ' নেই, যেমন নামায-রোযা বর্জন– এসব পাপ কুফ্‌রী। যারা এসব পাপ করে তারা কাফের।

৮. আল-বায়হাসিয়্যা (البيهسية)[১]

উল্লেখিত আজারিদা আবার সাত দলে বিভক্ত। তার মধ্যে একটা হল আল-হাযিমিয়্যা (الحازمية)। এই হাযিমিয়্যা আবার ২ দলে বিভক্ত। এতে করে আজারিদার মোট শাখা দাঁড়ায় ৮টি। অনুরূপভাবে উল্লেখিত ছা'আলিবাও ৬ দলে বিভক্ত। ইবাযিয়্যা বিভক্ত ৫ দলে। এভাবে খারিজীদের মোট দলসংখ্যা দাঁড়ায় ২৪।[২]

খারিজীদের মৌলিক আকীদা ও চিন্তাধারা

ইমাম আবূ যুহরা আল-মিসরী বলেছেন, যেসব বুনিয়াদী চিন্তাধারা খারেজীদের সকল ফিরকার মধ্যেই পাওয়া যায় তা হল–

১. খলীফা নির্বাচনের একমাত্র পদ্ধতি হল সুস্থ স্বাধীন লোকের নির্বাচন। এই দায়িত্ব পালন করবে সাধারণ মুসলমানগণ। তাদের নির্দিষ্ট কোন দল নয়। খলীফা যতক্ষণ ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, শরীআতের বিধি-বিধান বাস্তবায়িত করবে, ভুল, বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত থাকবে, ততক্ষণ সে-ই খলীফা থাকবে। আর যদি সে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে অপসারণ করা কিংবা হত্যা করা ওয়াজিব।

(আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল খলীফা দু'ভাবে হতে পারে। অধিকারীদের নির্বাচন অথবা পূর্ববর্তী খলীফার পক্ষ থেকে মনোনয়ন দ্বারা। দেখুন, ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী (রহ.) কৃত الأحكام السلطانية "আল-আহকামুস সুলতনিয়্যা"।)

২. খলীফা কুরাইশী হবে এমন কোন কথা নেই- যেমনটি অন্যরা বলে। অনুরূপভাবে কোন আরবী কোন অনারবীর চেয়ে অধিক হকদারও নয়। বরং সকলেই এক্ষেত্রে সমান। তবে তারা অ-কুরাইশী খলীফা হওয়াকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। এটা এ কারণে, যাতে তাকে অপসারণ করা কিংবা হত্যা করা সহজ হয় যদি সে শরীঅ-াত-বিরোধী কিছু করে অথবা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

১. আল-বাইহাসিয়্যা: الفرق بين الفرق গ্রন্থে বলা হয়েছে, আবূ বাইহাস হাইছাম ইব্ন আমেরের অনুসারী দল এটা। الملل النحل গ্রন্থে শাহরাসতানী বলেছেন, তার নাম হাইছাম ইব্নে জাবির। আবূ বাইহাছ থেকে বর্ণিত আছে, তার মত হল হক ও বাতিলকে জানার নামই ঈমান। সে আরও বলেছে, ঈমান হল কৃলব দ্বারা জানার নাম। কওল ও আমল তথা মুখে স্বীকার ও তা আমলে রূপায়ন নয়। তবে তার থেকে এরূপও বর্ণিত আছে যে, মুখে স্বীকৃতি ও অন্তরে জানার সমন্বিত রূপ হল ঈমান। দুটোর যে কোন একটিকে ঈমান বলা যাবে না। আর সাধারণ বাইহাসিয়্যাদের মতে অন্তর দিয়ে জানা, মুখে স্বীকারোক্তি করা এবং আমল করা সবটার সমন্বিত রূপই হল ঈমান। উল্লেখ্য, কেউ কেউ উমাবিয়্যা, ইয়া'কূবিয়্যা, ফাদ্লিয়্যা এবং দাহিকিয়্যাকেও এ ফিরকার অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তবে খারিজীদের মধ্যে আযারিকা, ইবাযিয়্যা, সাফরিয়্যা প্রভৃতিই অধিক পরিচিত।

২. এই ২৪ দলের ছক ও তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমার রচিত الاستفادة بشرح ابن ماجة দেখা যেতে পারে।

(এ বিষয়ে আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ভিন্ন মত রয়েছে। তাদের মত জানার জন্য দেখুন الأحكام السلطانية . تاريخ المذاهب الإسلامية مقدمة ابن خلدون)

৩. খারিজীদের বিশিষ্ট ফিরকা 'নাজ্দাত'-এর মত হল, যদি জনগণ পরস্পরে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় তাহলে 'ইমাম' বা 'খলীফা' নির্বাচনের কোনো প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ জনগণ যদি মনে করে, ইমাম ব্যতীত পরিপূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়, তারা যদি মনে করে তাদেরকে সত্য ও হকের উপর উৎসাহিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একজন ইমাম দরকার এবং তারা তা করেও নেয়, তাহলে জায়েয আছে। তাদের দৃষ্টিতে শরীআতের পক্ষ থেকে নির্ধারিত কর্তব্য হিসাবে ইমাম নির্বাচন করা ওয়াজিব নয় বরং জায়েয। যদি ওয়াজিব হয় সেটা জনগণের কল্যাণ ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে, ইসলামের আদেশ হিসাবে নয়।

(ইমাম আবূ যুহরা মিসরী [রহ.] বলেছেন, জমহূর উলামা একমত যে, এমন একজন ইমাম নির্বাচন করা আবশ্যক যিনি মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য-সংহতি ও পারস্পরিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করবেন; হুদূদে শরীআত ও দণ্ড-বিধি বাস্তবায়ন করবেন; ধনীদের থেকে যাকাত আদায় করবেন; যারা ঝগড়া-বিবাদে তাঁর স্মরণাপন্ন হবে তিনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন; একতা প্রতিষ্ঠা করবেন; ইসলামী আইন-কানূন বাস্তবায়ন করবেন; বিশৃংখলা দূর করবেন; শৃংখলা কায়েম করবেন; এমন শহর প্রতিষ্ঠিত করবেন যেমন শহর প্রতিষ্ঠিত করতে ইসলাম উৎসাহিত করেছে।)

৪. খারিজীরা পাপীদেরকে কাফের মনে করে। তারা বড় পাপ আর ছোট পাপের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। বরং তারা মতের ভুলকেও পাপ মনে করে, যদি সে মত তাদের দৃষ্টিতে যা সঠিক তার বিপরীত হয়। তারা সালিস মানার কারণে হযরত আলী (রা.)কেও কাফের মনে করে। হযরত আলী (রা.), হযরত উছমান (রা.), জঙ্গে জামালে অশংগ্রহণকারী সকল মুসলমান এবং উভয় সালিসকেও তারা কাফের মনে করে। অধিকন্তু যারা এটাকে সঠিক মনে করেছে কিংবা যে কোন একজন সালিসকে হক মনে করেছে, অথবা যারা সালিসী মেনে নিয়েছে তারা সকলেই কাফের। এটা সকল খারিজীদের ঐকমত্যের অভিমত।[১]

(আর আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত হল, যেমনটি আকীদাতুত-তাহাবী-তে আছে– আহ্লে কিবলার[২] কাউকে কোন গোনাহের কারণে আমরা কাফের মনে করি না, যতক্ষণ সে তা বৈধ মনে না করে।)

৫. তারা অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে জায়েয মনে করে। বরং বলে, শাসক যদি বিচ্যুত হয়ে পড়ে তখন তাকে হত্যা কিংবা অপসারণ করা ওয়াজিব।

১. ॥الفرق بين الفرق॥ ২. "আহলে কিবলা" হল, যে বা যারা জরুরিয়্যাতে দ্বীনের স্বীকৃতি দেয়।

(আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন, আমরা আমাদের ইমাম/খলীফা কিংবা শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে জায়েয মনে করি না। যদি তারা অত্যাচার করে, তবুও না। আমরা তাদের জন্যে বদ-দুআও করি না। তাদের আনুগত্য থেকে আমরা আমাদের হাতকে সরিয়েও নেই না। আমরা তাদের আনুগত্যকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মত কর্তব্য মনে করি। কারণ, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত কোন অপরাধের আদেশ না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করতে আদেশ করেছেন।[১]

৬. তারা হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি লা'নত ও অভিশম্পাত করে।[২]

(আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত ইমামদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কোন ব্যক্তি কোন সাহাবীকেই মন্দভাবে স্মরণ করেন না।)

৭. তারা নামায ও জামাআতের সুন্নাতকে অস্বীকার করে।[৩]

শায়েখ আবুল হাসান (রহ.) বলেন, খারেজী গোষ্ঠী তাদের দলের দর্শন এবং চিন্তাগত বিভক্তি ও বিভাজন সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.), হযরত উছমান (রা.), জঙ্গে জামালে অংশগ্রহণকারীগণ, দুই সালিস, সালিসীর প্রতি সমর্থক ও সন্তুষ্ট, উভয় সালিস কিংবা যে কোন একজনকে সত্যায়নকারী– এই সকলকে তারা কাফের মনে করে এবং জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকেও বৈধ মনে করে। এসব বিষয়ে তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই।

খারিজীদের দলীলসমূহ

খারিজীদের আকীদাসমূহের মূল হলঃ গোনাহে কবীরায় লিপ্ত হলে কেউ মুসলমান থাকে না বরং সে কাফের হয়ে যায়। তারা তাদের এ আকীদার পক্ষে দলীল স্বরূপ পেশ করে থাকে ঐ সব আয়াত ও হাদীছ, যেগুলোর বাহ্যিক অর্থ দৃষ্টে মনে হয় কোন নেক আমল বর্জন করলে বা কোন গোনাহে লিপ্ত হলে সে মুমিন থাকে না, কাফের হয়ে যায়। যেমন কয়েকটি আয়াত–

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা কর্তব্য ঐসব লোকদের ওপর যারা সে পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। আর কেউ কুফ্‌রী করলে আল্লাহ জগৎবাসীদের মুখাপেক্ষী নন। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৯৭)

---

১. عقيدة الطحوي

২. المصدر السابق. مقدمة

৩. المصدر السابق

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ.

অর্থাৎ, আর যাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন হবে, (তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা ঈমানের পর কুফ্‌রী করেছিলে? অতএব তোমাদের কুফ্‌রীর কারণে তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করতে থাক। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ১০৬)

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اُولٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ.

অর্থাৎ, আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলিধূসর। সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা। তারাই কাফের ও পাপাচারী। (সূরা: ৮০-আবাসা: ৪০–৪১)

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.

অর্থাৎ, যেনাকারী পুরুষ ও যেনাকারিনী নারী, তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর। (সূরা: ২৪-নূর: ২)

এছাড়া তারা ঐ সমস্ত হাদীছও দলীল হিসাবে উপস্থাপন করে থাকে যেসব হাদীছে বাহ্যত কবীরা গোনাহের কারণে বেহেশতে প্রবেশ না করার কথা এবং জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বিধৃত হয়েছে। যেমন কয়েকটি হাদীছ–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِه مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. (مسلم ج/١ كتاب الأيمان– باب تحريم الكبر وبيانه)

অর্থাৎ, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ. (منفق عليه)

অর্থাৎ, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَه بِشَىْءٍ عُذِّبَ بِه وَفِيْ رِوَيَةٍ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا. (مسلم ج/ كتاب الإيمان – باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه إلخ)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন কিছু দিয়ে আত্মহত্যা করবে, তাকে ঐ বস্তু দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে সে জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এ সমস্ত আয়াত ও হাদীছসমূহকে কঠিন অভিব্যক্তি জ্ঞাপক (تشدد) অর্থে গ্রহণ করেছেন বা আরও বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অন্যান্য সহীহ হাদীছের আলোকে সেরূপ ব্যাখ্যা দেয়া বৈ গত্যন্তর নেই।

খারিজীদের তাক্‌ফীর (تكفير) সম্পর্কিত বিধান

এটা যে একটা নিন্দিত ও ভ্রান্ত দল এতে উম্মতের কারও কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু তারা কি কাফের? এ প্রশ্নে এসে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। আমরা এ সুবাদে দুই রকমের অভিমত পাই। ১. তারা বিদ্রোহী, ফাসেক, অপরাধী। ২. তারা কাফের। যারা তাদেরকে কাফের নয় বরং ফাসেক মনে করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা খাত্তাবী,

ইমাম গাযালী, কাযী ইয়ায প্রমুখ মনীষী। আর যারা কাফের মনে করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন শায়েখ তাকী উদ্দীন সুবকী, ইমাম তাবারী। ইমাম বুখারীর ঝোঁকও এই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতি বলে অনুমিত হয়। তিরমিযী শরীফের বাখ্যাগ্রন্থে কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, বিশুদ্ধ মত হল তারা কাফের। ইমাম কুরতুবীও 'المفهم'-গ্রন্থে একথা বলেছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ, যারা খাওয়ারেজদের তাক্‌ফীর করেন তাদের দলীলসমূহ:

১. বিভিন্ন হাদীছ। যেমন-

(١) قوله عليه السلام : يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

অর্থাৎ, নবী (সা.) বলেছেন, তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায় যেমন তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়।

(٢) و قوله عليه السلام : هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ.

অর্থাৎ, নবী (সা.) বলেছেন, তারা মাখ্‌লূকের মধ্যে নিকৃষ্টতর।

(٣) وقوله عليه السلام : لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ وَفِيْ لَفْظٍ ثَمُوْدَ.

অর্থাৎ, নবী (সা.) বলেছেন, তাদেরকে পেলে আদ/ছামূদ গোত্রের মত হত্যা করব।

(٤) وقوله عليه السلام : كِلَابُ اَهْلِ النَّارِ.

অর্থাৎ, নবী (সা.) বলেছেন, তারা জাহান্নামের কুকুর।

২. তারা বিশিষ্ট সাহাবীদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছিল। এর দ্বারা প্রকারান্তরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই অস্বীকার করা হয়েছে। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন।

৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, খাওয়ারেজদের কাফের আখ্যায়িত করার ব্যাপারে সবচেয়ে স্পষ্ট দলীল হল ইব্‌নে মাজা শরীফে বর্ণিত হাদীছ, যা হযরত আবূ উমামাহ (রা.) বয়ান করেছেন,

قَدْ كَانَ هٰؤُلَاءِ مُسْلِمِيْنَ فَصَارُوْا كُفَّارًا.

অর্থাৎ, তারা মুসলমান ছিল অতঃপর কাফের হয়ে গিয়েছে।

প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ, যারা খারেজীদেরকে কাফের মনে করেন না, তাদের দলীলসমূহ:

১. উপরে বর্ণিত প্রথম হাদীছ অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে খারেজীদের ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা বলা এবং তীর নিক্ষেপকারী কর্তৃক তীরের দিকে দৃষ্টিপাত করার কথা বলার পর সবশেষে বলা হয়েছে,

فَيَتَمَارٰى هَلْ يَرٰى شَيْئًا اَمْ لَا؟

অর্থাৎ, তখন সন্দেহ হল যে, সে কিছু দেখল কি না।

এখানে تمارى অর্থ সন্দেহ। অর্থাৎ, তাদের ইসলাম থেকে বের হওয়াটা সন্দেহপূর্ণ হয়ে গেল। আর কারও ইসলামে প্রবেশের ব্যাপারে একীন অথচ বের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে এমন কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা যায় না।

২. হযরত আলী (রা.)কে নাহ্‌রওয়ান অধিবাসীদের সম্পর্কে (তারা ছিল খাওয়ারেজ) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তারা কি কাফের? তিনি জওয়াব দিয়েছিলেন,

مِنَ الْكُفْرِ فَرُّوْا.

অর্থাৎ, তারা তো কুফ্‌রী থেকে ভেগেছে। আবার জিজ্ঞাসা করা হল তারা কি মুনাফিক? তিনি বললেন,

اَنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلَّا قَلِيْلًا، وَهٰؤُلَاءِ يَذْكُرُوْنَ اللهَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا.

অর্থাৎ, মুনাফিকরা খুবই কম আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, অথচ এরা সকাল-সন্ধা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে।

আবার জিজ্ঞাসা করা হল তবে তারা কি? তিনি জওয়াব দিলেন,

قَوْمٌ اَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا.

অর্থাৎ, তারা এমন এক সম্প্রদায়, ফিতনায় পতিত হওয়ার ফলে যারা অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে।

হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) إكفار الْمُلحدين গ্রন্থে বলেন, হযরত আলী (রা.) থেকে উপরোক্ত উক্তি যদি প্রমাণিত থেকে থাকে, তবে তা খারেজীদের কুফ্‌র প্রমাণিত হতে পারে এমন আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর অবগত না থাকার ভিত্তিতেই হয়ে থাকবে। তা দ্বারা দলীল দেয়া চলবে না এ কারণে যে, উপরোক্ত হাদীছের কোন কোন তুরুকে لم يعلق منه بشيء বাক্য এসেছে। আবার কোন কোন তুরুকে سبق الفرث و الدم বাক্য এসেছে। সবগুলো তুরুকের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, মূল সন্দেহ ছিল তীরের উপরিভাগে শিকারের কোন রক্ত মাংস লেগে আছে কি না সে ব্যাপারে। তারপর দেখা গেল তীর বা তার কোন অংশেই শিকারের কোন চিহ্ন লেগে নেই। এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, মতবিরোধ মূলত খারিজীদের কিছু ব্যক্তি সম্পর্কে। এমতাবস্থায় يتمارى উক্তিটি দ্বারা ইংগিত হবে যে, তাদের কতক ব্যক্তির মধ্যে ইসলামের কিছুটা অবশিষ্ট থেকে থাকবে। আল্লামা কুরতুবী المفهم গ্রন্থে বলেন, খারিজীদের কাফের বলার উক্তিটি হাদীছে অধিকতর স্পষ্ট।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) إكفار الْمُلحدين গ্রন্থের অন্যত্র বলেন, "যারা কুরআনে বর্ণিত কোন স্পষ্ট ভাষ্য (نص صريح)কে প্রত্যাখ্যান করবে বা তা নিয়ে বিরোধ করবে, তাদের তাকফীরের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা' রয়েছে। যেমন কতক বাতিনিয়া তার জাহিরী অর্থ বাদ দিয়ে ভিন্ন অর্থের দাবী করে থাকে।অথবা সকলের নিকট নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত কোন ব্যাপক ও নিশ্চিত অর্থবোধক কোন হাদীছকে -যার মানসূখ না হওয়া, তাতে কোনরূপ তাখসীস না থাকা এবং তার জাহিরী

অর্থ গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে উলামা ও ফকীহদের ঐক্যমত্য রয়েছে এমন কোন হাদীছকে– তাখ্সীস করলেও তার ভিত্তিতে তাক্ফীর হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজ্মা' রয়েছে। যেমন: খাওয়ারেজগণ কর্তৃক বিবাহিত যেনাকারী পুরুষ ও নারীদের রজম সম্পর্কিত বিধানকে অস্বীকার করার কারণে তাদেরকে তাক্ফীর করা। বিবাহিত যেনাকারী পুরুষ ও নারীদের রজম সম্পর্কিত বিষয়টি একটি সর্বসম্মত ও দ্বীনের জরূরিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।"

খাওয়ারেজদের তাক্ফীর সম্পর্কিত إكفار الْمُلحدين গ্রন্থে বর্ণিত উপরোক্ত উলামায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্টত বুঝা গেল যে, নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের একটা বিরাট অংশ তাদের তাক্ফীরের পক্ষে রয়েছেন। এসত্ত্বেও আল্লামা খাত্তাবী বলেন, খাওয়ারিজগণ গোমরাহ হওয়া সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের একটা দল– এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা' রয়েছে। আরও অনেকে তাদের তাক্ফীর না করার ব্যাপারে জমহুরের মত রয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাক্ফীর করার পক্ষে উপরোক্ত নির্ভরযোগ্য বহু সংখ্যক উলামায়ে কেরামের মতামতকে বাদ দিয়ে কীভাবে ইজমা' সংঘটিত হওয়ার দাবী করা যায় তা কিছুটা বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

শীআ মতবাদ

শীআ الشيعة শব্দটির আভিধানিক অর্থ দল, অনুসারী, সমর্থক ও সাহায্যকারী। বর্তমানের পরিভাষায় শীআ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি হযরত আলী (রা.) ও আহ্লে বায়ত-এর সমর্থক, ইমামত আকীদায় বিশ্বাসী এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-এর চেয়ে হযরত আলী (রা.)-এর অধিক মর্তবা থাকার প্রবক্তা।[১] শীআদেরকে "রাফিজী"ও বলা হয়।[২]

শীআ মতবাদ সৃষ্টির প্রেক্ষাপট ও সূচনা

ইয়ামানের সানআ শহরের জনৈক ইয়াহুদী আলেম ছিল আব্দুল্লাহ ইব্নে সাবা ওরফে ইব্নে সাওদা' (ابن سوداء)। হযরত উছমান (রা.)-এর খেলাফতকালে সে ইসলাম গ্রহণ করে। তার আসল লক্ষ্য ছিল নিজেকে মুসলমান বলে জাহির করে

১. رد شیعیت. مولانا محمد جمال صاحب استاد تفسیر دار العلوم دیوبند.

২. এই নাম হযরত যায়েদ ইব্নে আলী (রা.) প্রদান করেন। ১২১ হিজরীতে যখন যায়েদ ইব্নে আলী হিশাম ইব্নে আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখন যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায়ই শীআদের একটা দল তাকে বলেছিল, আমরা এই শর্তে আপনার সহযোগিতা করতে পারি যে, আপনি হযরত আবূ বকর ও ওমর সম্বন্ধে আপনার মত প্রকাশ করবেন। হযরত যায়েদ ইব্নে আলী প্রথমত হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর জন্য রহমতের দুআ করলেন এবং বললেন, আমি তাঁদের সম্বন্ধে ভাল কথাই বলব। তখন শীআরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল হযরত যায়েদ ইব্নে আলীর সঙ্গে থাকল আর একদল তার পক্ষ ত্যাগ করল। হযরত যায়েদ ইব্নে আলী তখন দলত্যাগী লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, رفضتموني অর্থাৎ, তোমরা আমাকে ত্যাগ করলে? এখান থেকেই তাদের নাম হয়ে যায় "রাফিজী" বা দলত্যাগী।

মধ্যে বিরোধ ও ফাটল সৃষ্টি করে মুসলমানদের মধ্যে ফিৎনা ও গোলযোগ সৃষ্টি করত ভিতর থেকে ইসলামকে বিকৃত ও ধ্বংস করা। সে মদীনায় কিছু দিন কাজ করে সফলকাম হতে না পেরে বসরা গেল। এক সময় সিরিয়া গেল। কিন্তু এসব জায়গায় পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে না পেরে অবশেষে মিসর গমন করল। এখানে সে কিছু লোককে তার দুরভিসন্ধিতে সাহায্যকারী পেয়ে গেল।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে সে সর্বপ্রথম এই ধোঁয়া ছাড়ল যে, মুসলমানদের প্রতি আমার আশ্চর্য লাগে, যারা এ পৃথিবীতে হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরায় আগমন করার কথায় বিশ্বাস রাখে কিন্তু সাইয়্যিদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ ধরনের পুনরাগমনে বিশ্বাস রাখে না। অথচ তিনি সকল পয়গম্বরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। তিনি অবশ্যই পুনরায় এ পৃথিবীতে আগমন করবেন। অতঃপর যখন সে দেখল এ কথাটা মেনে নেয়া হয়েছে, তখন সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে হযরত আলী (রা.)-এর বিশেষ আত্মীয়তার ভিত্তিতে তাঁর প্রতি অসাধারণ ভক্তি ও মহব্বত প্রকাশ করে তাঁর শানে নানান রকম বাড়াবাড়ির কথাবার্তা শুরু করে দিল। এক পর্যায়ে সে বলল, প্রত্যেক নবীর একজন ওসী বা ভারপ্রাপ্ত থাকেন। নবীর ইন্তেকালের পর সেই ভারপ্রাপ্তই নবীর স্থানে উম্মতের প্রধান হয়ে থাকেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরও নিয়মানুযায়ী একজন ভারপ্রাপ্ত থাকার কথা। তিনি কে? তিনি হলেন হযরত আলী (রা.)। সে বলল, তাওরাতেও তাঁকেই ভারপ্রাপ্ত বলা হয়েছে। অতএব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর খলীফা হওয়ার অধিকার প্রকৃতপক্ষে হযরত আলী (রা.)-এর। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের পর চক্রান্ত করে হযরত আলী (রা.)-এর অধিকারকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁর স্থলে আবূ বকরকে খলীফা বানানো হয়েছে। তারপর তিনি পরবর্তী সময়ের জন্য ওমরকে মনোনীত করে গেছেন। ওমরের পরও আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত হয়েছে এবং উছমানকে খলীফা করা হয়েছে, যে এর মোটেই যোগ্য নয়। সে হযরত উছমান (রা.)কে অযোগ্য প্রমাণিত করার জন্য তার বিভিন্ন গভর্ণরের নানান বিষয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতির দিক তুলে ধরতে থাকল। এভাবে এক পর্যায়ে আব্দুল্লাহ ইব্নে সাবার অনুসারী একদল লোক হযরত উছমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠল এই বলে যে, উছমান এবং তার গভর্ণরদের কারণে উম্মতের মধ্যে যে ভ্রষ্টতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তা দূর করা দরকার। শেষ পর্যন্ত তারা হযরত উছমান (রা.)কে হত্যা করল। এবং তারাই তলোয়ারের মুখে হযরত আলী (রা.)কে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করল। কিন্তু হযরত উছমান (রা.)-এর মজলুমসুলভ শাহাদাতের কারণে অথবা এ শাহাদাতের খোদায়ী শাস্তি স্বরূপ মুসলিম উম্মাহ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীনের মত পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্যন্ত সংঘটিত হল।

এই জঙ্গে সিফফীনে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সাবার বিপুলসংখ্যক ভক্ত হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে ছিল। তাদেরকে বলা হত "শীআনে আলী", সংক্ষেপে "শীআ"। "শীআনে আলী" কথাটার অর্থ হল আলী-র দল। আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সাবাই হল এই শীআ দলের প্রতিষ্ঠাতা।[১]

এই ঐতিহাসিক পেক্ষাপটে শীআ সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি রাজনৈতিক দল। যদিও তাদের উদ্ভব হয় রাজনৈতিকভাবে, কিন্তু কালের বিবর্তনে তাদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত ব্যাপারে অভূতপূর্ব বিতর্ক ও বিভ্রান্তির সূচনা করে। জঙ্গে সিফফীনের সময় থেকেই এই আকীদা-বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির সূচনা হয়। জঙ্গে সিফফীনের সময়ে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সাবা ও তার অনুসারীরা তখনকার বিশেষ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনীতে তাঁর সম্পর্কে গোমরাহীমূলক প্রচার শুরু করে। ইব্‌নে সাবা কিছু সংখ্যক মূর্খ ও সরলপ্রাণ লোককে এই সবক দেয় যে, হযরত আলী (রা.) এ পৃথিবীতে খোদার রূপ।[২] তাঁর দেহে খোদায়ী আত্মা রয়েছে এবং তিনিই খোদা। সে আরও বলে, "মূলত আল্লাহ নবুওয়াত ও রেসালাতের জন্য আলীকে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু ওহী বাহক ফেরেশ্‌তা জিবরাঈল ভুলবশত ওহী নিয়ে মুহাম্মাদ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে গেলেন।" নাউযুবিল্লাহ! এভাবেই শীআদের মধ্যে আকীদাগত বিভ্রান্তির সূত্রপাত ঘটতে আরম্ভ করে, পরবর্তিতে যার আরও বিস্তৃতি ঘটে। পরবর্তিতে বিভিন্ন আকীদাগত বিষয়ে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধও দেখা দেয়, যার ফলে শীআদের মধ্যে সৃষ্টি হয় নানান দল-উপদল।

শীআদের দল-উপদলসমূহ

শীআদের প্রথমত তিনটা দল।

১. তাফযীলিয়া (تفضيليه) শীআ। এরা হযরত আলী (রা.) কে শায়খাইনের উপর ফযীলত তথা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকেন।

২. সাবইয়্যা (سبئيه) শীআ। এদেরকে "তাব্‌রিয়া"ও (تبريه) বলা হয়। এরা হযরত সালমান ফারসী, আবূ জর গিফারী, মেকদাদ ও আম্মার ইব্‌নে ইয়াছির প্রমুখ

---

১. শীআদের ইতিহাসের এই কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্য কতিপয় শীআ ঐতিহাসিক বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সাবা নামে ইতিহাসে কোনো ব্যক্তি অতিবাহিত হয়নি। তার নাম হল একটা কাল্পনিক নাম। বাগদাদ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক মুর্তজা আল-আসকারী عبد الله ابن سبا গ্রন্থে এরূপ বলেছেন। ডক্টর তাহা হোসাইনও তার التاريخ الاسلامى الحضارة السلامية ج/١ صفحه/٤٣٢ নামক গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সাবা নামের কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকার ব্যাপারে সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন। অথচ মুসলমানদের সর্বজনবিদিত শত্রু সার উইলিয়াম ম্যুরের ন্যায় ব্যক্তিও আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবার কথা স্বীকার করেছেন। প্রসিদ্ধ শীআ ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ হাছান ইব্‌নে মূসাও অনুরূপ স্বীকৃতি দিয়েছেন। শীআদের নিকট নির্ভরযোগ্য গ্রন্থেও তার কথা স্বীকার করা হয়েছে। روشيعيت. مولانا محمد جمال صاحب استاد تفسير دار العلوم ديوبند. থেকে গৃহীত।

২. কুচক্রি সেন্ট পলও খৃষ্টানদের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে এরূপ আকীদার শিক্ষা দিয়েছিল। বংশগতভাবে সেও ছিল ইয়াহুদী। তার ইয়াহুদী নাম ছিল "সাউল"। ايرانى انقلاب. منظور نعمانى

অল্পসংখ্যক সাহাবী ব্যতীত অন্য সকল সাহাবী থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, এমনকি তাঁদেরকে মুনাফেক এবং কাফের পর্যন্ত বলে।[১]

৩. গুলাত (غلاة) বা চরমপন্থী শীআ। এদের কতক হযরত আলী (রা.)-এর খোদা হওয়ার প্রবক্তা ছিল। আর কতক মনে করত খোদা তাঁর মধ্যে প্রবেশ (حلول) করেছেন অর্থাৎ, তিনি ছিলেন খোদার অবতার বা খোদার প্রকাশ।

গুলাত (غلاة) বা চরমপন্থী শীআদের ২৪টা উপদল ছিল। যাদের একটা দল ছিল ইমামিআ (اماميه)। এই ইমামিয়া ছিল শীআদের একটা বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। সাবইয়্যাদের ছিল ৩৯টা উপদল।[২] ইমামিয়া দলের মধ্যে প্রধান ও প্রসিদ্ধ হল ৩টা উপদল। যথা:-

১. ইছনা আশারিয়া (اثنا عشريه)।

২. ইসমাঈলিয়া (اسماعيليه)।

৩. যায়দিয়া (زيديه)।

ইছনা আশারিয়া
(اثنا عشريه)

শীআদের উপরোক্ত ৩টা উপদলের মধ্যে "ইছনা আশারিয়া"(বার ইমামপন্থী) শীআদের অস্তিত্বই প্রবল। এদেরকে "ইমামিয়া"ও বলা হয়। বর্তমানে "ইছনা আশারিয়া" ও "ইমামিয়া" নাম দু'টো প্রায় সমার্থবোধকে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক-কালে সাধারণভাবে শীআ বলতে এই "ইছনা আশারিয়া" বা "ইমামিয়া" শীআদেরকে বোঝানো হয়ে থাকে। তাদেরকেই শীআ বলা হয়। শীআদের মধ্যে সবচেয়ে এদের সংখ্যাই অধিক। উপমহাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র তাদের অনুসারী রয়েছে। বর্তমান ইরানে তারাই ক্ষমতাসীন।[৩] ইরাকেও প্রচুরসংখ্যক এরূপ শীআ রয়েছে। নিম্নে তাদের বিশেষ কিছু আকীদা-বিশ্বাসের উল্লেখ করা হল।[৪]

---

১. কিতাবুর রওযায় ইমাম বাকের থেকে রেওয়ায়েত আছে-

قال : كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه إلا الثلثة. فقلت : ومن الثلاثة؟ فقال : المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله عليهم وبركته.

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর তিনজন বাদে সকলেই মুরতাদ হয়ে যায়। (রাবী বলেন,) আমি আরয করলাম, সেই তিনজন কে? ইমাম বললেন, মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, আবূ যর গেফারী ও সালমান ফারসী। তাঁদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত নাযিল হোক।

২. শীআদের এসব দল ও তাদের তাফসীলী আকায়েদ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য مختصر التحفة الاثنا عشرية/ التحفة الاثنا عشرية. عبد العزيز الدهلوي দেখা যেতে পারে।

৩. আমরা এ গ্রন্থে ইছনা আশারিয়াদের যেসব আকীদা-বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেছি, বর্তমান ইরানের শীআগণ সেই ইছনা আশারিয়া এবং তারা সেসব আকীদাই পোষণ করে থাকেন। তারা যে এই ইছনা আশারিয়া এবং তাদের আকীদা-বিশ্বাসও যে এগুলো, তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ হল রুহুল্লাহ খোমেনী-র লিখিত বই-পত্র। উল্লেখ্য, রুহুল্লাহ খোমেনী সাহেব একাধারে ইছনা আশারিয়াপন্থী আলেম ও ইরানের বর্তমান শীআদের সর্বজনমান্য (পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বার ইমামপন্থী শীআদের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস

"ইছনা আশারিয়া" বা বার ইমামপন্থী শীআদের সাথে আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বহু বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান হল তিনটা। তা হল ইমামত সংক্রান্ত আকীদা, সাহাবা বিদ্বেষ সংক্রান্ত আকীদা ও কুরআন বিকৃতি বিষয়ক আকীদা। নিম্নে এ ৩টি আকীদা বিষয়ে বিশদ বিবরণ পেশ করা হল।

১. ইমামত সংক্রান্ত আকীদা

ইমামত সংক্রান্ত আকীদা (عقيده امامت)-এর অর্থ হল আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের হেদায়েত ও পথ প্রদর্শন এবং নেতৃত্বের জন্যে যেমন তাঁর পক্ষ থেকে রসূলগণকে মনোনীত করে এসেছেন। তদ্রূপ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের পর থেকে বান্দার পথ প্রদর্শন ও নেতৃত্বের জন্যে ইমাম মনোনীত করা শুরু করেন। কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে তিনি এরূপ ইমাম মনোনীত করেছেন। ইছনা আশারিয়াদের মতে আল্লাহ তাআলা এরূপ বারজন ইমাম মনোনীত করেছেন। দ্বাদশতম ইমামের উপর পৃথিবীর লয় তথা কেয়ামত হবে। এই বারজন ইমাম হলেন:

১. ইমাম হযরত আলী মুর্তযা (রা.)। এরপর হযরত আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র
২. হাসান ইব্‌নে আলী (রা.)। তাঁরপর তাঁর ছোটভাই
৩. হযরত হুসাইন ইব্‌নে আলী (রা.)। এরপর তার পুত্র
৪. আলী ইবনে হুসাইন ওরফে জয়নুল আবেদীন। এরপর তার পুত্র
৫. মোহাম্মাদ ইবনে আলী ওরফে ইমাম বাকের। এরপর তার পুত্র
৬. জা'ফর ছাদেক ইব্‌নে বাকের। এরপর তার পুত্র
৭. মূসা কাযেম ইব্‌নে জা'ফর ছাদেক। এরপর তার পুত্র
৮. আলী রেযা ইব্‌নে মূসা কাযেম। এরপর তার পুত্র
৯. মোহাম্মাদ তাকী ইব্‌নে আলী রেযা ওরফে জাওয়াদ। এরপর তার পুত্র

(পূর্বের পৃষ্ঠার পর) ধর্মীয় নেতা ও গ্রন্থকার। তিনি "الحكومة الإسلاميه" ও "كشف الأسرار" গ্রন্থদ্বয়ে ইছনা আশারিয়া শীআদের প্রসিদ্ধ আকীদা তথা ইমামত, সাহাবা বিদ্বেষ ও কুরআন বিকৃতি বিষয়ে হুবহু সেই আকীদা-বিশ্বাস তুলে ধরেছেন যেগুলোকে ইছনা আশারিয়াদের আকীদা-বিশ্বাস হিসাবে আমরা এ গ্রন্থে তুলে ধরেছি। সংক্ষিপ্তভাবে এর প্রমাণের জন্য মাওলানা মানযূর নোমানী রচিত 'ইরানী ইনকিলাব' গ্রন্থখানি দেখা যেতে পারে।

৪.তাদের অধিকাংশ আকীদা উল্লেখ করা হয়েছে أبو جعفر محمد بن يعقوت ب بن إسحاق الكليني الرازي. المتوفى ٣٢٨/٣٢٩ه রচিত اصول كافى থেকে। اصول كافى কিতাবটি শীআদের নিকট প্রায় সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। আমার নিকট ছিল এ কিতাবের از انتشارات كتاب فروشى عليه اسلاميه. طهران خيابان ناصر خسرو -এর নুসখা। আরও ছিল كشف الاسرار -এর از انتشارات ورستكار كتابهاے مذہبى كلى وجزئى ناصر خسر وتهران، ايران নুসখা। কিছু আকীদা অন্যান্য শীআ মনীষী যেমন মজলিসী প্রমুখের কিতাব থেকেও নেয়া হয়েছে। সেগুলোর বরাত মাওলানা মানযূর নো'মানী রচিত "ইরানী ইনকিলাব" থেকে গৃহীত।

১০.আলী নাকী ইব্‌নে মুহাম্মাদ তাকী ওরফে হাদী। এরপর তার পুত্র
১১.হাসান আসকারী ইব্‌নে আলী নাকী ওরফে যাকী। এরপর তার পুত্র দ্বাদশতম ও সর্বশেষ ইমাম।
১২.মোহাম্মদ আল্‌-মাহ্‌দী আল-মুন্‌তাজার ইব্‌নে হাসান আস্‌কারী। (অন্তর্হিত ইমাম মেহদী), যিনি শীআ আকীদা অনুযায়ী এখন থেকে প্রায় সাড়ে এগার শত বছর পূর্বে ২৫৫ অথবা ২৫৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করে চার অথবা পাঁচ বছর বয়সে অলৌকিকভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান এবং এখন পর্যন্ত একটি গুহায়[১] আত্মগোপন করে আছেন। তাঁর উপর ইমামত শেষ হয়ে গেছে। শেষ যমানায় তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটবে।[২]

ইমামদের সম্বন্ধে শীআদের আকীদা-বিশ্বাস

(এক) ইমামগণের গর্ভ ও জন্ম হয় অদ্ভুত প্রক্রিয়ায়।

শীআগণ ইমামগণের গর্ভ ও জন্ম সম্পর্কে অদ্ভুত বিশ্বাস রাখেন। এ ব্যাপারে উছূলে কাফীতে[৩] উল্লেখিত একটা দীর্ঘ রেওয়ায়েতের সারমর্ম নিম্নরূপ:

ইমাম জাফর ছাদেকের বিশেষ মুরীদ আবূ বছীর বর্ণনা করেন, যেদিন ইমাম সাহেবের পুত্র ইমাম মূসা কাযেম জন্মগ্রহণ করেন (যিনি সপ্তম ইমাম), সেদিন তিনি বর্ণনা করলেন যে, প্রত্যেক ইমামের জন্ম এমনিভাবে হয়- যে রাতে মায়ের গর্ভে তার

---

১. গুহাটি "সুররা মান রাআ" (سر من رأى) নামক শহরে অবস্থিত।

২. ইমামিয়া ইছনা আশারিয়া শীআদের ধারণায় দ্বাদশতম ইমাম (মাহ্‌দী মুনতাজার)-ই শেষ যমানার ইমাম (অন্তর্হিত ইমাম)। তার আত্মপ্রকাশ কবে হবে? এ সম্পর্কে তাদের নিষ্পাপ ইমামগণের উক্তি নিম্নরূপ:

"ইহ্‌তিজাজে তবরিযীতে" উল্লেখিত নবম ইমাম মোহাম্মাদ ইব্‌নে আলী ইব্‌নে মূসার একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। তিনি "আল-কায়েম" (অন্তর্হিত ইমাম) সম্পর্কে বলেন,

هو الذي يخفى على الناس ولادته، ويغيب عنهم شخصه، يجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر ثلاث مأة وثلاثة عشر رجلا من أقاصى الأرض .... فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر الله أمره.

অর্থাৎ, তার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তার জন্ম হবে গোপনে। মানুষ টেরও পাবে না। তার ব্যক্তিত্ব মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য থাকবে। বিশ্বের প্রতি প্রান্ত থেকে বদর যোদ্ধাদের সংখ্যার অনুরূপ তার ৩১৩ জন অনুচর তার কাছে সমবেত হবে। যখন তিনশ' তেরজন খাঁটি লোক তার জন্যে সমবেত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপার প্রকাশ করবেন। (অর্থাৎ, তিনি গুহা থেকে বাইরে এসে আপন কাজ শুরু করবেন।)

মাওলানা মানযূর নো'মানী সাহেব বলেন, "এখানে একটি চিন্তার বিষয় হল- শেষ ইমামের এ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ না করাটা ইমাম মোহাম্মাদ ইব্‌নে আলী ইব্‌নে মূসার উক্তি অনুযায়ী এ বিষয়ের প্রমাণ যে, ২৬০ হি. থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে এগারশ' বছর সময়ের মধ্যে তার অকৃত্রিম সহচর ৩১৩ জন শীআও কখনও হয়নি এবং আজও নেই। নতুবা তার আত্মপ্রকাশ করে হয়ে যেত।"

৩. باب مواليد الأئمة عليهم السلام

গর্ভসঞ্চার আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবধারিত থাকে, সে রাতে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এক আগন্তুক (ফেরেশতা) অত্যন্ত সুস্বাদু শরবতের একটি গ্লাস নিয়ে তাঁর পিতার কাছে আসেন এবং তা তাকে পান করিয়ে দেন। এরপর আগন্তুক বলেন, এখন আপনি স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করুন। সহবাসের পর ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী ইমামের গর্ভ মায়ের জরায়ুতে স্থির হয়ে যায়। এ স্থলে ইমাম জাফর ছাদেক সবিস্তারে বর্ণনা করলেন, আমার প্রপিতামহ (ইমাম হুসাইন)-এর সাথে তাই হয়েছে এবং এর ফলশ্রুতিতে আমার পিতামহ ইমাম জয়নুল আবেদীন জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তার সাথেও তাই হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে আমর পিতা ইমাম বাকের জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তার সাথেও সম্পূর্ণ এমনি ধরনের ঘটনা ঘটে এবং আমার জন্ম হয়। তারপর আমার সাথেও এরূপ ঘটে, অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এক আগন্তুক (ফেরেশতা) অত্যন্ত সুস্বাদু ও উৎকৃষ্ট শরবতের গ্লাস নিয়ে আমার কাছে আসে এবং আমাকে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতে বলে। আমি সহবাস করলে এ পুত্রের গর্ভ স্থিতি লাভ করে। এ রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, ইমাম যখন মায়ের গর্ভ থেকে বাইরে আসে, তখন তার হাত মাটিতে এবং মস্তক আকাশের দিকে উঠানো থাকে।[১] ইমাম-গণের গর্ভ মায়ের জরায়ুতে নয়– পার্শ্বে কায়েম হয় এবং তারা মায়ের উরু দিয়ে ভূমিষ্ট হন।

আল্লামা মাজলিসী "হাক্কুল এয়াকীন" গ্রন্থে[২] একাদশতম ইমাম- হাসান আসকারী থেকে আরও রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেন, আমাদের ইমামগণের গর্ভ জননীর পেটে অর্থাৎ, জরায়ুতে স্থিত হয় না; বরং পার্শ্বে থাকে এবং আমরা জরায়ু থেকে বাইরে আসি না; বরং জননীর উরু থেকে জন্মগ্রহণ করি। কেননা, আমরা আল্লাহ্ তাআলার নূর। তাই আমাদেরকে নোংরামী, আবর্জনা ও নাপাকী থেকে দূরে রাখা হয়।

(দুই) ইমামগণ নবীর ন্যায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোনীত হন।

শীআদের বিশ্বাস হল- নবী যেমন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোনীত হন, তেমনি আমিরুল মুমিনীন (আলী) থেকে নিয়ে বার জন ইমাম কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোনীত হয়েছেন। তাদের মনোনয়ন ও নিযুক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়েছে; যেমন তিনি নবী ও রসূলগণকে নিযুক্ত করেছেন। এতে কোনো মানুষের মতামত ও ক্ষমতার দখল থাকে না। স্বয়ং ইমামেরও ক্ষমতা নেই যে, তিনি পরবর্তী ইমাম ও স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করবেন।

উছূলে কাফীতে আছে, ইমাম জাফর ছাদেক বলেন,

إن الإمامة عهد من الله عز و جل معهود لرجال مُسَمَّيْن، ليس للإمام أن يزويها عن الذى يكون من بعده. إلخ. (أصول كافي. جـ/٢. صفحـ/٢٦-٢٥.)

১. اصول كافى جـ/٢. صفحـ/٢٢٧-٢٢٦ (مع اخبصار)ر

২. ১২৬ পৃ. ইরানী মুদ্রণ

অর্থাৎ, ইমামত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট লোকদের জন্যে একটি অঙ্গীকার! ইমামেরও অধিকার নেই যে, সে তাঁর পরবর্তী সময়ের জন্যে মনোনীত ইমাম ছাড়া অন্যের কাছে ইমামত হস্তান্তর করবে।

উক্ত গ্রন্থে আরও আছে– ইমাম জাফর ছাদেক তাঁর বিশেষ সহচরদের এ মর্মে অনুরূপই বলেন,

أترون الموصي منا يوصي إلى من يريد؟ لا والله ولكن عهد من الله و رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل فرجل حتى ينتهى الأمر إلى صاحبه. (إيضا. صفحـ/٢٥)

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইমাম মনোনয়ন সম্পর্কিত বিষয় কীভাবে নবীকে জানানো হয় তার বর্ণনায় উছূলে কাফীতে প্রায় দুই পৃষ্ঠাব্যাপী একটা রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।[১] তার সারমর্ম নিম্নরূপ–

ইমাম জাফর ছাদেক বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের পূর্বে তাঁর প্রতি জিবরাঈলের মাধ্যমে আকাশ থেকে ইমামত ও ইমামগণ সম্পর্কে নির্দেশনামা স্বর্ণের মোহরআঁটা কিতাবের আকারে নাযিল হয়েছিল। এতে প্রত্যেক ইমামের জন্য আলাদা আলাদা মোহরআঁটা খাম ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলো হযরত আলীর হাতে সমর্পন করেন। হযরত আলী কেবল নিজের নামের খামটির মোহর ভেঙ্গে তাঁর সম্পর্কিত নির্দেশনামা পাঠ করেন। এরপর প্রত্যেক ইমাম এমনিভাবে তার নামের মোহরআঁটা খাম পেয়েছেন এবং তিনিই নিজের খামের মোহর ভেঙ্গে তা পাঠ করতেন। এমনিভাবে সর্বশেষ খাম দ্বাদশ ইমাম মেহদী (অন্তর্হিত ইমাম) পাবেন।

আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বার ইমামের মনোনয়ন প্রসঙ্গে উছূলে কাফীতে[২] আকাশ থেকে একটি আশ্চর্যজনক ফলক অবতীর্ণ হওয়ার কিস্‌সাও বর্ণিত হয়েছে, যাতে আকাশ থেকে অবতীর্ণ সবুজ রঙ্গের একটি ফলকের অদ্ভূত কিস্‌সা বর্ণনা করা হয়েছে, যার উপর নূরানী অক্ষরে ক্রমিক অনুসারে বার ইমামের নাম, তাদের বিস্তারিত পরিচিতিসহ লিপিবদ্ধ ছিল। বর্ণনায় আছে– ইমাম বাকের জাবের ইব্‌নে আবদুল্লাহ আনছারী (সাহাবী)কে বললেন, আপনার সাথে আমার একটি বিশেষ কাজ আছে। তাই একান্তে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই এবং একটি ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই। জাবের বললেন, আপনি যখন ইচ্ছা করেন, আসতে পারেন। সেমতে একদিন তিনি তার কাছে গেলেন এবং বললেন, আমাকে সেই ফলক সম্পর্কে বলুন, যা আপনি আমাদের (পরদাদী) আম্মা হযরত ফাতেমা বিন্‌তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে দেখেছিলেন। এ ফলক সম্পর্কে তিনি আপনাকে যা বলেছিলেন এবং তাতে যা লেখা ছিল, তাও বলুন। জাবের ইব্‌নে আবদুল্লাহ বললেন, আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করে এ ঘটনা বর্ণনা করছি যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশায় আপনার (পরদাদী) আম্মা হযরত ফাতেমার

১. صفحـ/٣٠-٢٩

২. اصول كافى باب ماجاء فى الاثنى عشر و النص عليهم جـ/٢. صفحـ/٤٧١-٤٧٠

কাছে তাঁর পুত্র হুসাইনের জন্ম উপলক্ষে মোবারকবাদ দিতে গিয়েছিলাম। আমি তার হাতে একটি সবুজ রঙের ফলক দেখলাম। আমি ধারণা করলাম যে, সেটি পান্নার এবং তাতে সূর্যের ন্যায় চকচকে সাদা রঙে কিছু লেখা রয়েছে। আমি তাকে বললাম, হে রসূল তনয়া, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আমাকে বলুন এ ফলকটি কী এবং কেন? তিনি বললেন, এ ফলক আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূলের কছে প্রেরণ করেছেন। এতে আমার আব্বাজান রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আমার স্বামী (আলী), আমার উভয় পুত্র (হাসান-হুসাইন) এবং আমার আওলাদের মধ্যে আরও যারা ইমাম হবে, তাদের সকলের নাম রয়েছে। আব্বাজান আমাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্যে এই ফলক আমাকে দান করেছেন।

(তিন) শীআদের বক্তব্য হল কুরআন মজীদে ইমামত ও ইমামগণের বর্ণনা ছিল।

উছূলে কাফীতে[১] আছে– আল্লাহ্ তাআলা আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার কাছে যে আমানত পেশ করেছিলেন এবং যা বহন করতে তারা অপারগতা প্রকাশ করেছিল, সেটা ছিল ইমামত। সূরা আহযাবের ৭২ নং আয়াত–

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّه كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا.

(অর্থাৎ, আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পর্বতসমূহের কাছে এই আমানত[২] পেশ করেছিলাম, তারা তা বহন করতে অপারগতা প্রকাশ করল এবং তাতে শংকিত হল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। সে তো অতিশয় জালিম, অতিশয় অজ্ঞ।)

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে যে, বলেন,

هي الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام. (اصول كافى ج/٢. صفحه/٢٧٧)

অর্থাৎ, আয়াতে "আমানত" বলে হযরত আলী মুর্তযার ইমামত বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা হযরত আলীর ইমামতের বিষয়টি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে পেশ করেছিলেন এবং তাদেরকে তা কবূল করতে বলেছিলেন। কিন্তু আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা আমিরুল মুমিনীনের ইমামতের বিষয়টি কবূল করার মহা দায়িত্ব বহন করার সাহস করতে পারল না এবং তারা ভীত হয়ে অস্বীকার করল।

এসব রেওয়ায়েতের উপরই শীআদের মৌলিক বিষয়-ইমামতের ভিত্তি স্থাপিত।

---

১. اصول كافى باب فيه نكب ونبف من التنيل في الولاية ج/٢ এ অধ্যায়ে ইমামগণের সেইসব রেওয়ায়েত ও বাণী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যেগুলোতে ইমামত ও ইমামগণের শান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ কিতাব -কুরআন মাজীদের তথ্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে এতদসম্পর্কিত প্রায় একশ' রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

২. "আমানত" হল ঈমান ও হেদায়াত কবূল করার স্বাভাবিক ক্ষমতা। অন্যমতে আল্লাহ্র আদেশ নিষেধসমূহ।

সূরা শু'আরার শেষ রুকূর ১৯৩-১৯৪ নং আয়াত–

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ.

(অর্থাৎ, রুহুল আমীন অর্থাৎ, জিবরাঈল এ কুরআন নিয়ে -যা সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় রয়েছে- [হে রসূল] আপনার অন্তরে অবতীর্ণ হয়েছে [অর্থাৎ, আপনার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে], যাতে আপনি [কুপরিণাম সম্পর্কে] সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।)

কিন্তু উছূলে কাফীতে ইমাম বাকের থেকে রেওয়ায়েত আছে যে, তিনি এ আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, জিবরাঈল যে বিষয় নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্তরে নাযিল হয়েছিল তা ছিল আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলীর ইমামত।[১]

এর অর্থ হল- এ আয়াতটি কুরআন মাজীদের সাথে নয়; বরং ইমামতের সাথে সম্পৃক্ত।

সূরা মায়েদার নবম রুকূর ৬৬ আয়াত–

وَ لَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ.

এ আয়াতে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং সেই সর্বশেষ ওহী কুরআন মাজীদের উপর –যা তাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে– ঠিকঠিক আমল করত, তবে তাদের প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ রহমত ও বরকত নাযিল হত। কিন্তু উছূলে কাফীতে ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ আয়াতের তাফসীরেও الولاية বলেছেন।[২] উদ্দেশ্য এই যে, ما انزل اليهم من ربهم –এর অর্থ (مصداق) কোরআন মাজীদ নয়; বরং ইমামত।

(চার) ইমামগণ পয়গম্বরগণের মতই আল্লাহ্র প্রমাণ, নিষ্পাপ ও আনুগত্যশীল।

উছূলে কাফীতে সনদ সহকারে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে-তিনি বলেন,

إن الحجة لا تقوم لله عزوجل على خلقه إلا بإمام حتى يعرف. (اصول كافى ج/١. صفحه/٢٥٠)

অর্থাৎ, সৃষ্টিজীবের উপর আল্লাহ্ তাআলার প্রমাণ ইমাম ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হয় না, যাতে তার মাধ্যমে (আল্লাহ্র এবং তাঁর ধর্মে) মারেফত অর্জিত হয়।

(পাঁচ) ইমামগণ পয়গম্বরগণের মত নিষ্পাপ।

উছূলে কাফীতে এক শিরোনাম আছে- باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته - এতে অষ্টম ইমাম ইব্‌নে মূসা রেযার একটা দীর্ঘ খুতবা রয়েছে, যাতে ইমামগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বারবার তাদের নিষ্পাপতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে,

---

১. اصول كافى ج/٢. صفحه/٢٧٧ ২. أيضا. صفحه/٢٧٨

الإمام المطهَّر من الذنوب والمبرأ من العيوب. (اصول كافى ج/١. صفحه/٢٨٧)

এরপর এ খুতবায় ইমাম সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে,

فهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد أمِنَ من الخطاء والزلل والعثار، يخصه الله بذلك ليكون حجةً على عبادِه وشاهدَه على خلقه. (اصول كافى ج/١. صفحه/٢٩٠)

অর্থাৎ, তিনি নিষ্পাপ। আল্লাহ তাআলার বিশেষ সমর্থন ও তাওফীক তাঁর সঙ্গে থাকে। আল্লাহ তাঁকে সোজা রাখেন। তিনি ভুলত্রুটি ও পদস্খলন থেকে হেফাজত থাকেন। আল্লাহ এসব নেয়ামত দ্বারা তাঁকে খাছ করেন, যাতে তিনি তাঁর বান্দাদের উপর তাঁর প্রমাণ হন এবং তাঁর সৃষ্টির উপর সাক্ষী হন।

(ছয়) ইমামগণের মর্তবা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সমান এবং অন্য সকল পয়গম্বরের উর্ধ্বে।

উছূলে কাফীতে আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী মুর্তযা ও তাঁর পরবর্তী ইমাম-গণের ফযীলত ও মর্তবার বর্ণনায় ইমাম জাফর ছাদেকের একটা দীর্ঘ বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। তার প্রাথমিক অংশ নিম্নরূপ-

ما جاء به عليّ أخذُ به، وما نهى عنه انتهِى عنه، جرى له من الفضل مثل ما جري لمحمد، ولمحمد الفضل على جميع خلق الله عز و جل، المتعقب عليه فى شىء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله، والرادُّ عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله، كان أمير المؤمنين بابَ الله الذي لا يؤتى إلامنه. وسبيلَه الذي من سلك بغيره يهلِك وكذلك جرى لأيمة الهدى واحد بعد واحد.

অর্থাৎ, আলী যে সকল বিধান এনেছেন, আমি তা মেনে চলি। আর যে কাজ তিনি নিষেধ করেছেন, আমি তা করি না। তার ফযীলত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুরূপ। আর মুহাম্মাদ সকল মাখলূকের উপর ফযীলত রাখেন। আলীর কোন আদেশে আপত্তিকারী রসূলের আদেশে আপত্তিকারীর মত। কোন ছোট অথবা বড় বিষয়ে তার খণ্ডনকারী আল্লাহ্র সঙ্গে শির্ক করার পর্যায়ে থাকে। আমিরুল মুমিনীন আল্লাহ্র এমন দরজা ছিলেন যে, এ দরজা ছাড়া অন্য কোন দরজা দিয়ে আল্লাহ্র কাছে যাওয়া যায় না এবং তিনি আল্লাহ্র এমন পথ ছিলেন যে, কেউ অন্য পথে চললে ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনিভাবে ইমামগণের একের পর একের জন্য ফযীলত অব্যাহত রয়েছে। অর্থাৎ, সকলের এই মর্তবা।

আল্লামা বাকের মজলিসী তার "হায়াতুল কুলূব" গ্রন্থে[১] লিখেন– ইমামতের মর্তবা নবুওয়াত ও পয়গম্বরীর উর্ধ্বে।

(সাত) ইমামগণ যা ইচ্ছা হালাল অথবা হারাম করার ক্ষমতা রাখেন।

উছূলে কাফীতে মুহাম্মাদ ইবনে সিনান থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে তিনি বলেন, আমি আবূ জা'ফর ছানী (মুহাম্মাদ ইবনে আলী তাকী)কে হালাল ও হারাম সম্পর্কে

১. হায়াতুল কুলূব, ৩য় খণ্ড, ১০ পৃ.

শীআদের পারস্পরিক মতভেদের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন,

يا محمد إن الله تبارك وتعلى لم يزل منفردا بو حدانيته، ثم خلق محمدا وعليا و فاطمة، فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء، فأشهدهم خلقها وأجرى اعتهم عليها وفوَّض أُمورها أليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون مايشاءون، ولن يشاء وا إلا أن يشاء الله تبارك و تعالى. (اصول كافى ج/٢. صفحه/٣٢٦)

অর্থাৎ হে মোহাম্মাদ, আল্লাহ্ তাআলা অনাদিকাল থেকে আপন একক সত্তায় ভূষিত ছিলেন। অতঃপর তিনি মুহাম্মাদ, আলী ও ফাতেমাকে সৃষ্টি করেন। এরপর তাঁরা হাজারো শতাব্দী অবস্থান করলেন। এরপর আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ার সকল বস্তু সৃষ্টি করেন এবং তাঁদের সৃষ্টির ওপর তাঁদেরকে সাক্ষী করলেন। তাঁদের আনুগত্য সকল সৃষ্টির উপর ফরয করলেন এবং সৃষ্টির সকল ব্যাপার তাঁদের হাতে সোপর্দ করলেন। কাজেই তাঁরা যা ইচ্ছা হালাল করেন এবং যা ইচ্ছা হারাম করেন। তবে তাঁরা তা-ই ইচ্ছা করেন, যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লামা কাযভীনী এ রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে মুহাম্মাদ, আলী ও ফাতেমা বলে তাঁদের তিনজন এবং তাঁদের বংশের সকল ইমামকে বোঝানো হয়েছে।

মোটকথা, ইমাম আবূ জা'ফর ছানীর (যিনি নবম ইমাম) জওয়াবের সারকথা হল ইমামগণকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তারা যে কোনো বস্তুকে হালাল অথবা হারাম করতে পারবেন। তাই এ ক্ষমতার অধীনে কোন বস্তুকে অথবা কোন কাজকে এক ইমাম হালাল করেছেন এবং অন্য ইমাম হারাম করেছেন। ফলে আমাদের শীআদের মধ্যে হালাল- হারামের মতভেদ সৃষ্টি হয়ে গেছে।

(আট) ইমাম ব্যতীত দুনিয়া কায়েম থাকতে পারে না।

উছূলে কাফীতে সনদ সহকারে বর্ণিত আছে-

عن أبي حمزة قال لأبي عبد الله : أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال : لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت.

অর্থাৎ, আবূ হামযা থেকে বর্ণিত আছে- আমি ইমাম জা'ফর ছাদেককে জিজ্ঞেস করলাম, এ পৃথিবী ইমাম ব্যতীত কায়েম থাকতে পারে কি? তিনি বললেন, যদি পৃথিবী ইমাম ব্যতীত কায়েম (বাকি) থাকে, তবে ধ্বসে যাবে (কায়েম থাকতে পারবে না)।[১]

আরও বর্ণিত আছে- জা'ফর ছাদেক বলেন,

لو أن الإمام رُفِـعَ من الأرض ساعةً لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله. (اصول كافى. ج/١. صفحه/٢٥٣)

১. اصول كافى باب الأرض لاتخلو من حجة. ج/١ صفحه/٢٥٢.

অর্থাৎ, যদি ইমামকে এক মুহূর্তের জন্যও পৃথিবী থেকে তুলে নেয়া হয়, তাহলে পৃথিবী তার অধিবাসীদের নিয়ে এমন উদ্বেলিত হবে, যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ তার অধিবাসীদের নিয়ে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

(নয়) ইমামগণের অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান অর্জিত ছিল।

শীআদের মতে তাদের ইমামগণ হযরত মূসা (আ.)-এর ন্যায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পয়গম্বরেরও উর্ধ্বে ছিলেন। উছূলে কাফীর এক অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে-

إن الأيمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون، وإنه لايخفى عليهم شيء صلوات الله عليهم.

এ অধ্যায়ের প্রথম রেওয়ায়েত হল, ইমাম জা'ফর ছাদেক তার বিশেষ অন্তরঙ্গ সহচরদের এক মজলিসে রসূলুল্লাহ সসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে হযরত মূসা ও খিযিরের চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখার কথা ব্যক্ত করেন এবং বলেন, মূসা ও খিযিরের অতীতের জ্ঞান ছিল কিন্তু আমাদের ইমামগণের কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যতের জ্ঞানও ছিল। রেওয়ায়েতের আরবী ইবারত নিম্নরূপ:

لو كنتُ بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما ماليس في أيديهم، لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطِيا علمَ ما كان ولم يُعْطَيا علمَ ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة، وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وأله وراثة. (اصول كافى ج/١. صفحه/٣٨٨)

(দশ) ইমামগণের জন্য কুরআন-হাদীছ ছাড়াও জ্ঞানের অন্যান্য অত্যাশ্চর্য সূত্র রয়েছে।

উছূলে কাফীর باب فيه ذكر الصحيفة الجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام নামক অধ্যায়ে বর্ণিত সুদীর্ঘ প্রথম রেওয়ায়েতটার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

আবূ বছীর[১] বর্ণনা করেন, আমি একদিন ইমাম জা'ফর ছাদেকের খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলাম, আমি একটি বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। এখানে ভিন্ন মতাবলম্বী কেউ নেই তো? ইমাম সাহেব এ গৃহ ও অন্য গৃহের মাঝখানে ঝুলানো একটা পর্দা তুলে ভিতরে দেখে বললেন, এখন এখানে কেউ নেই। যা মনে চায় জিজ্ঞাসা করতে পার। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম (প্রশ্নটা হযরত আলী মুর্তযা ও ইমামগণের ইল্‌ম সম্পর্কে ছিল।) ইমাম জাফর ছাদেক এ প্রশ্নের বিস্তারিত জওয়াব দিলেন। তার শেষাংশ এই-

وإن عندنا الجفر وما يُدْريهم ما الجفر؟ قال : وِعاء من أدم فيه عليم النبيين والوصين وعلم العلماء الذين مضوا من بنى إسرائيل.

অর্থাৎ, আমাদের কাছে "আল-জাফ্‌র" রয়েছে। মানুষ জানে না "আল-জাফ্‌র" কি? আমি আরয করলাম, আমাকে বলুন আল-জাফ্‌র কী? ইমাম বললেন, এটা চামড়ার

১. শীআ রেওয়ায়েত অনুযায়ী আবূ বছীর ইমাম জা'ফর ছাদেকের বিশেষ অন্তরঙ্গ শীআ মুরীদ।

একটা থলে। এতে সকল নবী ও ওছীর ইল্‌ম রয়েছে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে যত আলেম পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন, তাদের ইল্‌মও এতে রয়েছে। (ফলে এটা সকল অতীত নবী, ওছী ও ইসরাঈলী আলেমগণের ইল্‌মের ভাণ্ডার।[১] তারপর বললেন,

وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، وما يُدْرِيْهم ما مصحف فاطمةٌ؟ قال : قلت : وما مصحف فاطمةٌ؟ قال : مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. (اصول كافى ج/١. صفحه/٣٤٦-٣٤٥)

অর্থাৎ, আমাদের কাছে "মাসহাফে ফাতেমা"[২] রয়েছে। মানুষ জানে না মাসহাফে ফাতেমা কি? ইমাম বললেন, এটা তোমাদের এই কুরআনের চেয়ে তিনগুণ বড়। আল্লাহর কসম, এতে তোমাদের কুরআনের একটি অক্ষরও নেই।

কুরআন-হাদীছ ছাড়াও ইমামগণের নিকট জ্ঞানের অন্যান্য অত্যাশ্চর্য সূত্র রয়েছে বলে শীআদের যে দাবী এ পর্যায়ে তারা এও বলেন যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের প্রতি

১. রেওয়ায়েতের এ অংশ দ্বারা শীআ মাযহাবের পূর্ণ স্বরূপ বুঝা যেতে পারে। ইমাম জা'ফর ছাদেক ইমাম বাকের প্রমুখ ইমামগণ থেকে শীআ মাযহাবের শিক্ষা রেওয়ায়েতকারী আবূ বছীর ও যুরারা প্রমুখরা নিজেকে ইমাম জা'ফর ছাদেক ও ইমাম বাকেরের বিশেষ অন্তরঙ্গ বলে ব্যক্ত করতেন। তারা তাদের সম্প্রদায়ের বিশেষ লোকদেরকে বলতেন, এই ইমামগণ আমাদেরকে শীআ মাযহাবের কথাবার্তা গোপনীয়তা সহকারে একান্তে বলতেন। এভাবে তারা যা চাইতেন, তাই এই ইমামগণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলতে পারতেন। তারা তাই করেছেন। আমাদের এবং উম্মতে মোহাম্মাদীর অধিকাংশের মতে এই ইমামগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং উচ্চস্তরের আলেম ও পরহেযগার ছিলেন। তাঁদের জাহের ও বাতেন এক ছিল। তাঁরা সকলকে প্রকাশ্যে ধর্ম শিক্ষা দিতেন। তাঁদের জীবনে নিফাকের নামগন্ধও ছিল না, যার নাম শীআরা "তাকিয়্যাহ" রেখেছে। -ইরানী ইনকিলাব

২. মাসহাফে ফাতেমা সম্পর্কে ইমাম জা'ফর ছাদেকেরই বিস্তারিত বর্ণনা উছূলে কাফীর এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে। মাসহাফে ফাতেমা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জওয়াবে ইমাম জা'ফর ছাদেক বলেন,

إن الله لمَّا قَبَضَ نبيه ﷺ دخل على فاطمةٌ من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز و جل. فأرسل الله إليها ملكا يُسلِّيْ غمها ويحدثها ، فشكت ذلك إلى إمير المؤمنين عليه السلام فقال : إذا ضسست بذالك وسمعب الصوت قولي لي، فأعلمته بذلك، فجعل أمير المؤ منين عليه السلام يكتب كلما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا. (اصول كافى ج/١ صفحه/ ٣٤٧-٣٤٦

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যখন তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়া থেকে তুলে নেন, তখন ফাতেমার এত দুঃখ হল, যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানেন না। তখন আল্লাহ এক ফেরেশতাকে তার কাছে পাঠালেন দুঃখে তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য। ফাতেমা আমীরুল মুমিনীনকে একথা জানালে তিনি বললেন, যখন তুমি এই ফেরেশতার আগমন অনুভব কর এবং তার আওয়াজ শোন, তখন আমাকে বল। অতঃপর ফেরেশতা আগমন করলে ফাতেমা তাঁকে জানালেন। অতঃপর আমীরুল মুমিনীন ফেরেশতার কাছে যা শুনতেন, তা লিখতে লাগলেন। অবশেষে তিনি এর দ্বারা একটি মাসহাফ তৈরি করে নিলেন। (এটাই মাসহাফে ফাতেমা।)

অবতীর্ণ সকল গ্রন্থ– তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূর ইত্যাদি ইমামগণের কাছে থাকে এবং তারা এগুলো মূল ভাষায় পাঠ করেন।

উছূলে কাফীর একটি শিরোনাম হচ্ছে-[১]

إن الأيمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز و جل، وإنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها. (اصول كافى ج/١. صفحه/٣٢٩)

এ অধ্যায়ে এ বিষয়বস্তুর রেওয়ায়েত এবং ইমাম জা'ফর ছাদেক ও তার পুত্র মূসা কাযেমের এ সম্পর্কিত ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। এর পূর্ববর্তী অধ্যায়েও এ বিষয়বস্তুর রেওয়ায়েত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, এক রেওয়ায়েতে আছে– ইমাম জা'ফর ছাদেক বলেন,

وان عندنا علمَ التوراة والإنجيل والزبور وتبيانَ ما في الألواح. (اصول كافى ج/١. صفحه/٣٢٦)

অর্থাৎ,"আমাদের কাছে তাওরাত, ইঞ্জীল ও যবূরের ইল্ম আছে এবং আলওয়াহে যা ছিল, তার সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে।" অন্য এক অধ্যায়ে জা'ফর ছাদেকেরই এই উক্তি বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমাদের কাছে "আল-জাফরুল আবইয়াম" আছে। এটা কী, প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন,

ألواح موسى عندنا.(اصول كافى ج/١. صفحه/٣٣٥)

অর্থাৎ, মূসার আল্ওয়াহ বা ফলকগুলো আমাদের নিকট রয়েছে।

(এগার) ইমামগণের এমন জ্ঞান আছে, যা ফেরেশতা ও নবীগণেরও নেই।

উছূলে কাফীতে[২] আছে-

عن أبي عبد الله السلام قال : إن لله تبارك وتعالى عِلْمَيْن : علما أظهر عليه ملائكة وأنبيائه ورسله، فما أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبيائه فقد علمناه، وعلما استاثر به فإذا بدأ لله في شيء منه أعلمنا ذلك وعرض على الأيمة الذين كانوا من قبلنا. (اصول كافى ج/١. صفحه/٣٧٥)

অর্থাৎ, ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলার দু'প্রকার ইল্ম আছে। এক প্রকার এলম সম্পর্কে তিনি ফেরেশতা, নবী ও রসূলগণকে অবহিত করেছেন। অতএব এ সম্পর্কে আমরাও অবহিত হয়েছি। দ্বিতীয় প্রকার এল্ম তিনি নিজের জন্যে নির্দিষ্ট রেখেছেন। (অর্থাৎ, নবী, রসূল ও ফেরেশতাগণকেও এ সম্পর্কে অবহিত করেননি।) আল্লাহ যখন এই বিশেষ ইল্মের কোন কিছু শুরু করেন,

১. শিরোনাম-এর অর্থ হচ্ছে- ইমামগণের নিকট পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ সকল কিতাব রয়েছে। ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁরা এগুলো পাঠ করেন এবং জানেন।

২. শিরোনাম إن الأيمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلام (ইমামগণ সেই সকল ইলমের আলেম হন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা, নবী ও রসূলগণকে দান করা হয়।)

তখন আমাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং আমাদের পূর্ববর্তী ইমামগণের সামনেও পেশ করেন।

(বার) প্রত্যেক জুমুআর রাত্রিতে ইমামগণের মে'রাজ হয়, তারা আরশ পর্যন্ত পৌছেন।

প্রত্যেক জুমুআর রাতে ইমামগণের মে'রাজ হয়, তাঁরা আরশ পর্যন্ত পৌছেন এবং সেখানে তাঁরা অসংখ্য নতুন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হন। উছূলে কাফীতে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন,

إن لنا في ليالي الجمعة لشأنا من الشأن .... يوذن لأرواح الأنبياء الموتى عليهم السلام وأرواح الأوصياء الموتى وروح الوصي الذي بين ظهر انيكم، يعرج بها إلى السماء حتي توافى عرش ربها فتطوف به أسبو عا وتصلي عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين ثم ترد إلى الأبدان التي كانت فيها، فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملئوا سرورا، ويصبح الوصي الذي بين ظهر انيكم وقد زيد في علمه مثل الجم الغفير. (اصول كافى ج/١. صفحه/٣٧٢-٣٧٣)

অর্থাৎ, আমাদের জন্যে জুমুআর রাতগুলোতে এক মহান শান হয়ে থাকে। ওফাতপ্রাপ্ত পয়গম্বরগণের রূহ, ওফাতপ্রাপ্ত ওছীগণের রূহ এবং তোমাদের সামনে বিদ্যমান জীবিত ওছীর রূহকে অনুমতি দেয়া হয়। তাঁদেরকে আকাশে তুলে নেয়া হয়। এমনকি তাঁরা সকলেই খোদার আরশ পর্যন্ত পৌছে যান। সেখানে পৌছে তাঁরা আরশকে সাতবার তাওয়াফ করেন। অতঃপর আরশের প্রত্যেক পায়ার কাছে দু'রাকআত নামায পড়েন। এরপর তাঁদের প্রত্যেক রূহকে সেই দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়, যাতে পূর্বে ছিল। তাঁরা আনন্দে ভরপুর অবস্থায় সকাল করেন এবং তোমাদের মধ্যকার ওছীর এমন অবস্থা হয় যে, তাঁর ইল্ম বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

(তের) ইমামগণের প্রতি প্রতিবছরের শবে কদরে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক কিতাব নাযিল হয়, যা ফেরেশতা ও "রূহ" নিয়ে আসেন।

উছূলে কাফীতে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত–

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ যা ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তারই নিকট আছে কিতাবের মূল। (সূরা: ১৩-রা'দ: ৩৯)

এর তাফসীর ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে,

وهل يمحى إلا ما كان ثابتا وهل يثبت إلا ما لم يكن.

অর্থাৎ, কিতাবের সেই বিষয় মিটানো হয়, যা পূর্বে বিদ্যমান ছিল এবং সেই বস্তুই প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যা পূর্বে ছিল না।

এ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা কাযভীনী লিখেন–

برائے ہر سال کتاب علیحدہ است۔ مراد کتاب است کہ دران تفسیر احکام حوادث کہ محتاج الیہ امام است تا سال دیگر نازل بان کتاب ملا ئکتہ وروح درشب قدر برامام زمان۔

অর্থাৎ, প্রতি বছরের জন্য একটি আলাদা কিতাব থাকে। এর অর্থ সেই কিতাব যাতে পরবর্তী বছর পর্যন্ত সমসাময়িক ইমামের প্রয়োজনীয় বিধানাবলীর তাফসীর থাকে। এ কিতাব নিয়ে ফেরেশতারা এবং "আর-রূহ" শবে কদরে সমসাময়িক ইমামের প্রতি অবতীর্ণ হন। (২২৯ পৃষ্ঠা) প্রকাশ থাকে যে, শীআদের মতে, "আর-রূহ" অর্থ জিবরাঈল নন, বরং এটি এমন একটি মাখলূক যে জিবরাঈল ও সকল ফেরেশতা অপেক্ষা মহান। (ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছ-ছাফীতে একথা পরিষ্কার লেখা আছে।)

উছুলে কাফীতেই ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতে[১] আছে তিনি বলেন,

ولقد قضى أن يكون في كل سنة ليلة يهبط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة. (اصول كافى ج/١. صفحه/٣٦٦)

অর্থাৎ, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একথা স্থিরিকৃত যে, প্রতি বছর এক রাতে পরবর্তী বছরের এ রাত পর্যন্ত সময়ের সকল ব্যাপারে ব্যাখ্যা ও তাফসীর নাযিল করা হবে।

(চৌদ্দ) ইমামগণ তাদের মৃত্যুর সময়ও জানেন এবং তাদের মৃত্যু তাদের ইচ্ছাধীন থাকে।

উছুলে কাফীতে[২] আছে -

عن أبي جعفر عليه السلام قال : أنزل الله عزوجل النصر على الحسين عليه السلام حتى كان [ما] بين السماء والأرض ثم خُيِّرَ : النصرَ أو لقاءَ الله، فاختار لقاء الله تعالى. (اصول كافى ج/١. صفحه/٣٨٧)

অর্থাৎ, ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা (কারবলায়) হুসাইন (আ.)-এর জন্য আকাশ থেকে সাহায্য (ফেরেশতাদের সৈন্যবাহিনী) প্রেরণ করেছিলেন, যা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়েছিল। এরপর আল্লাহ্ তাআলা হুসাইন (আ.)কে এখতিয়ার দিলেন যে, তিনি খোদার সাহায্য (আসমানী ফওজ) কবূল করবেন এবং একে কাজে লাগাবেন, অথবা আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাত (অর্থাৎ, শাহাদাত ও ওফাত) পছন্দ করবেন। তিনি আল্লাহ্র সাক্ষাত (অর্থাৎ, শাহাদাত)কে পছন্দ করলেন।[৩]

---

১. অধ্যায় باب في شأن (إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ) وتفسيرها

২. অধ্যায়ের শিরোনাম إن الأيمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وانهم لايموتون إلا باختيار منهم (অর্থাৎ, ইমামগণ জানেন তাঁদের ওফাত কবে হবে এবং তাঁদের ওফাত তাঁদের ইচ্ছাতেই হয়।)

৩. হযরত মাওলানা মানযূর নো'মানী সাহেব বলেন, এ রেওয়ায়েতের আলোকে শীআদের হযরত হুসাইনের শাহাদাতের কারণে "হায় হুসাইন হায় হুসাইন" বলে কান্নার আচরণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

(পনের) ইমামগণের সামনেও মানুষের দিবারাত্রির আমল পেশ হয়।

উছুলে কাফীতে[১] আছে-

ইমাম রেযা (আ.)-এর কাছে তার এক বিশেষ লোক আব্দুল্লাহ ইব্নে আবান যাইয়াত আবেদন করলেন,

ادع الله لي ولأهل بيتي فقال : أولست افعل؟ والله إن أعمالكم لتعرضُ علي في كل يوم وليلة. (اصول كافى ج/١. صفحه/٣١٩)

অর্থাৎ, আমার জন্য এবং আমার পরিবার-পরিজনের জন্য দুআ করুন। তিনি বললেন, আমি দুআ করি না। আল্লাহ্র কসম, প্রত্যেক দিনে ও রাতে তোমাদের আমলসমূহ আমার সামনে পেশ করা হয় (অর্থাৎ, প্রত্যেক দিন যখন আমার সামনে তোমাদের আমল পেশ হয়, তখন আমি দুআ করি)।

এরপর রেওয়ায়েতে আছে যে, আবেদনকারী আব্দুল্লাহ ইব্নে আবান একে অসাধারণ ব্যাপার মনে করলে ইমাম রেযা বললেন, তুমি কি কুরআনের এ আয়াত পাঠ কর না?–

(فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُه وَالْمُؤْمِنُوْنَ.)

অর্থাৎ, "তোমাদের আমল আল্লাহ্ দেখবেন এবং তাঁর রসূল ও মুমিনগণ দেখবেন।" (সূরা: ৯- তাওবা: ১৫)

এ আয়াতে "মুমিন" বলে খোদার কসম আলী ইব্নে আবী তালেবকে[২] বোঝানো হয়েছে।

(ষোল) ইমামগণ কেয়ামতের দিন সমসাময়িক লোকদের জন্য সাক্ষ্য দিবেন।

উছুলে কাফীতে আছে[৩]- ইমাম জাফর ছাদেককে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়–

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا.

অর্থাৎ, "তখন কী অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষ্যদাতা উপস্থিত করব এবং হে পয়গম্বর, তোমাকে তাদের সকলের উপর সাক্ষ্যদাতারূপে উপস্থিত করব?" (সূরা: ৪-নিসা: ৪১)

জওয়াবে ইমাম জা'ফর ছাদেক বললেন,

نزلت في أمة محمد صلى الله عليه و سلم خاصة في كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم ومحمد شاهد علينا. (اصول كافى ج/١. صفحه/٢٧٠)

---

১. শিরোনাম باب عرض الأعمال عند النبي والأيمة عليهم السلام (বান্দার আমল রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] ও ইমামগণের সামনে পেশ হয়।)

২. আল্লামা কাযভীনী লিখেন– ইমাম রেযা "মুমিনগণের" তাফসীরে কেবল হযরত আলীর কথা বলেছেন। কেননা, তাঁর দ্বারাই ইমামতের সিলসিলা চলে। নতুবা এর অর্থ তিনি এবং তাঁর বংশে জন্মগ্রহণকারী সকল ইমাম। (ছাফী: ১৪০ পৃ.)

৩. باب في الأيمة شهداء الله عز و جل على خلقه

অর্থাৎ, এ আয়াতটি (অন্যান্য উম্মত সম্পর্কে নয়) বিশেষভাবে উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। প্রতি যুগে তাদের মধ্যে আমাদের মধ্য থেকে একজন ইমাম হবেন। তিনি সমসাময়িক লোকদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন।

এ অধ্যায়ের শেষ রেওয়ায়েতে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.) থেকেও উপরোক্ত বিষয়ে নিম্নোক্ত বর্ণনা এসেছে–

إن الله تبارك وتعالى طهَّرنا و عصمنا وجعلنا شهداء على خلقه و حجة فى أرضه. (اصول كافى ج/١. صفحه/٢٧٢)

(সতের) ইমামগণের আনুগত্য করা ফরয।

উছূলে কাফী গ্রন্থের এক বর্ণনায় আলী, হাসান, হুসাইন, জয়নুল আবেদীন ও ইমাম বাকের প্রমুখ সকল ইমাম এবং সকলের আনুগত্য আল্লাহ তাআলা ফরয করেছেন–এ মর্মে রেওয়ায়েত পেশ করা হয়েছে। তার ইবারত নিম্নরূপ:

عن أبي الصباح قال : اشهد أني سمعت أبا عبد الله يقول : اشهد أن عليا إمامٌ فرض الله طاعتَه، وأن الحسن إمام فرض الله طاعته، وأن محمد بن علي إمام فرض الله طاعته. (اصول كافى ج/١. باب فرض طاعة الائمة. صفحه/٢٦٣)

ইমাম জা'ফর ছাদেকের পিতা ইমাম বাকের থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনি (ইমাম বাকের) ইমামগণের আনুগত্য ফরয হওয়ার কথা বর্ণনা করার পর বলেন,

هذا دين الله ودين ملائكته. (اصول كافى ج/١. صفحه/٢٦٧)

অর্থাৎ, এটাই আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের ধর্ম।

ইমামগণের আনুগত্য রসূলগণের আনুগত্যের মতই ফরয– এ মর্মে উছূলে কাফীতে বলা হয়েছে,

عن أبي الحسن العطَّار قال : سمعت أبا عبد الله يقول : أَشْرِكْ بين الأوصياء والرسل في الطاعة. (اصول كافى ج/١. صفحه/٢٦٤)

অর্থাৎ, রসূল ও ওসীগণের আনুগত্যকে সমপর্যায়ের করে নাও।

ইমামের আনুগত্য করা সকলের উপর ফরয– এ ধারণায় শীআগণ এতখানি বাড়াবাড়ি করেছেন যে, তারা বলেছেন স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমাম মেহ্দীর (অন্তর্হিত ইমামের) বাইআত করবেন।

আল্লামা বাকের মজলিসী তার حق اليقين গ্রন্থে[1] ইমাম বাকের থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি (ইমাম বাকের) বলেন,

چون قائم ال محمد صلى الله عليه واله وسلم بيرون ايد خدا او رايارى كند بملائكه واول كسے كه با او بيعت كند محمد باشد وبعدازاں على۔

১. ইরানী মুদ্রণ ১৩৯ পৃ.

অর্থাৎ, যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবারের "কায়েম" (অর্থাৎ, মেহ্দী) আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন খোদা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করবেন। সর্বপ্রথম তার হাতে বাই'আতকারী হবেন মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরে দ্বিতীয় নম্বরে আলী তার হাতে বাই'আত করবেন।

(আঠার) ইমামগণের ইমামত, নবুওয়াত ও রেসালত স্বীকার করা এবং তাঁদের প্রতি ঈমান-বিশ্বাস স্থাপন করা নাজাতের জন্য শর্ত।

উছূলে কাফীতে বর্ণিত আছে–[1]

عن أحد هما أنه قال : لا يكون العبد العبد مؤمنا حتى يعرفَ اللهَ ورسولَه الأيمةَ كلَّهم وإمامَ زمانه. (اصول كافى ج/١. صفحه/٢٥٥)

অর্থাৎ, ইমাম বাকের অথবা ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন বান্দা মুমিন হতে পারে না যে পর্যন্ত সে আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং সকল ইমাম বিশেষত সমসাময়িক ইমামের মা'রেফত অর্জন না করে।

উক্ত গ্রন্থে সনদ সহকারে আরও বর্ণিত আছে, যার সারকথা হল– আলী, হাসান, হুসাইন, বাকের প্রমুখ ইমামকে না জানা আল্লাহ ও রসূলকে না জানার মত এবং তাদেরকে না মানা আল্লাহ ও রসূলকে না মানার মত। বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

عن ذريح قال : سألت أبا عبد الله عن الأيمة بعد النبي صلى الله عليه و سلم فقال : كان أمير المؤ منين عليه السلام إماما ثم كان الحسن رض. إماما ثم كان الحسين رض. إماما ثم كان عليّ بن الحسين إماما ثم كان محمد بن علي لما ما، من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله تبارك وتعالى و معرفة رسول الله. إلخ. (اصول كافى ج/١. صفحه/٢٥٦)

(উনিশ) ইমামত, ইমামগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তা প্রচারের আদেশ সকল পয়গম্বর ও সকল ঐশী গ্রন্থের মাধ্যমে এসেছে।

উছূলে কাফী গ্রন্থে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে-

قال : ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبيا قط إلا بها. (اصول كافى ج/٢. صفحه/٣١٩)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, আমাদের বেলায়াত (অর্থাৎ, মানুষের উপর আমাদের শাসন-কর্তৃত্ব) হুবহু আল্লাহ্ তাআলার বেলায়াত ও শাসন-কর্তৃত্ব। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে নবীই প্রেরিত হয়েছেন, তিনি এ আদেশ নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন।

ইমাম জা'ফর ছাদেকের পুত্র ইমাম আবুল হাসান মূসা কাযেম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

ولاية علي عليه السلام مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد صلى الله عليه و سلم و وصيةِ عليّ عليه السلام. (اصول كافى ج/٢. صفحه/٣٢٠)

১. শিরোনাম হচ্ছে- باب معرفة الإمام والرد إليه

অর্থাৎ, আলী (আ.)-এর বেলায়াত (অর্থাৎ, ইমামত ও শাসন-কর্তৃত্ব) পয়গম্বরগণের সকল সহীফায় লিখিত আছে। আল্লাহ্ তাআলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি, যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবী হওয়া এবং আলী (রা.)-এর ভারপ্রাপ্ত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আদেশ আনেননি এবং তা প্রচার করেননি।

উছূলে কাফীতে আবূ খালেদ কাবূলী থেকে বর্ণিত আছে-[১]

سألت أبا جعفر عن قول الله عز و جل : (أمنوا بالله ورسوله والنور الذى انزلنا) فقال : يا أبا خالد "النور" واللهِ الأيمةُ. (اصول كافى ج/١. صفحه/٢٧٦)

অর্থাৎ, আমি ইমাম বাকেরকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম- "তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর রসূলগণের প্রতি এবং আমার অবতীর্ণ নূরের প্রতি"। ইমাম বাকের বললেন, হে আবূ খালেদ! আল্লাহর কছম, এখানে "নূর" অর্থ ইমামগণ।

তাদের বক্তব্য হল- এখানে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ ও রসূলগণের সঙ্গে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যে নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আদেশ কুরআনে দেয়া হয়েছে, তার অর্থ ইমামগণ। এটা সমগ্র উম্মতের সর্বসম্মত মতের বিরোধীই নয় বরং আরবী ভাষায় সামান্যও ব্যুৎপত্তি রাখে- এমন প্রত্যেক ব্যক্তির মতেও নূর অর্থ কুরআন পাক, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হেদায়েতের নূর।

(বিশ) ইমামগণ দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক এবং তাঁরা যাকে ইচ্ছা দেন ও ক্ষমা করেন।

উছূলে কাফীতে[২] আছে– আবূ বছীর বলেন, আমার এক প্রশ্নের জওয়াবে ইমাম জা'ফর ছাদেক বললেন,

أما علمت أن الدنيا والآخرةَ للإِ مام يَضَعُها حيث شاء ويدفعها إلى من يشاء. (اصول كافى ج/٢. صفحه/٢٦٩)

অর্থাৎ, তুমি কি জান না যে, দুনিয়া ও আখেরাত সকলই ইমামের মালিকানাধীন? তিনি যাকে ইচ্ছা দেন এবং দান করেন।

(একুশ) ইমামগণ মানুষকে জান্নাত ও দোযখে প্রেরণকারী।

উছূলে কাফীতে আছে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী বলেছেন,

وكان أمير الميرالمؤ منين صلوت الله عليه كثيرا ما يقول : أنا قسيم الله بين الجنة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسم، ولقد أُقَرَّتْ لي جميع الملائكة والروح والرسل مثل ما أقروا به لمحمد. إلخ. (اصول كافى ج/١. صفحه/٢٨٠)

অর্থাৎ, আমীরুল মুমিনীন প্রায়ই বলতেন, আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জান্নাত ও দোযখের মধ্যে বন্টনকারী (অর্থাৎ, আমি মানুষকে জান্নাত ও দোযখে প্রেরণ করব)।

---

১. إن الأيمة عليه السلام نور الله عز و جل অধ্যায়ের প্রথম রেওয়ায়েত

২. অধ্যায় باب إن الأرض كلها للإمام عليه السلام (অর্থাৎ, সমগ্র পৃথিবী ইমামের মালিকানাধীন।)

আমার কছে মূসার লাঠি ও সোলাইমানের আংটি আছে। আমার জন্য সকল ফেরেশতা, রূহ[১] এবং সকল পয়গম্বর তেমনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, যেমন তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

(বাইশ) যে ইমামকে না মানে সে কাফের।

উছূলে কাফী গ্রন্থে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন,

نحن الذين فرض الله طاعتنا، لايسع الناس إلا معرفتنا، ولا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمنا، ومن انكرنا كان كافرا، ومن لم يعرفنا لم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة. (اصول كافى ج/١. باب فرض طاعة الائمة صفحه/٢٦٦)

অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদের আনুগত্য ফরয করেছেন। আমাদেরকে চেনা ও মানা সকল মানুষের জন্য জরূরী। আমাদের সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে মানুষকে ক্ষমাযোগ্য মনে করা হবে না। যে আমাদেরকে চিনে ও মানে, সে মুমিন। যে আমাদেরকে অস্বীকার করে, সে কাফের। আর যে আমাদেরকে চিনে না এবং অস্বীকারও করে না, সে পথভ্রষ্ট যে পর্যন্ত সে হেদায়েতের পথে অর্থাৎ, আমাদের ফরয আনুগত্য করার দিকে ফিরে না আসে।

(তেইশ) জান্নাতে যাওয়া না যাওয়া ইমামদের মান্য করা না করার উপর নির্ভরশীল।

শীআদের বিশ্বাস হল ইমামগণকে ইমাম মান্যকারী শীআ ব্যক্তি জালেম ও পাপিষ্ট হলেও জান্নাতী। পক্ষান্তরে ইমামগণকে ইমাম হিসাবে অমান্যকারী মুসলমান ব্যক্তি মুত্তাকী পরহেযগার হলেও দোযখী। উছূলে কাফীতে ইমাম বাকের থেকে এ মর্মেই স্পষ্টত বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

إن الله لايستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في اعمالها برة تقية، وإن الله ليستحيي ان يعذب أمة دانت بإمام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة سيئة. (اصول كافى ج/٢. صفحه/٢٠٦)

উক্ত মর্মে আরও একটি রেওয়ায়েত নিম্নরূপ:[২]

ইমাম জা'ফর ছাদেকের এক অকৃত্রিম শীআ মুরীদ আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াকূব একবার ইমাম জা'ফর ছাদেকের খেদমতে আরয করলেন, আমি সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করি। তখন এটা দেখে খুবই আশ্চর্যবোধ করি যে, যারা আপনাদের ইমামতে বিশ্বাস করে না (অর্থাৎ, শীআ নয়) এবং অমুককে অমুককে (আবূ বকর ও ওমরকে) খলীফা বলে বিশ্বাস করে, তাদের মধ্যে বিশ্বস্ততা, সত্যতা ও অঙ্গীকার পালনের গুণাবলী রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা আপনাদের ইমামতে বিশ্বাস করে (অর্থাৎ, শীআ), তাদের মধ্যে বিশ্বস্ততা, অঙ্গীকার পালন ও সত্য পরায়ণতার গুণাবলী নেই

---

১. শীআদের বর্ণনামতে "রূহ" জিবরাঈল ও সকল ফেরেশতার উর্ধ্বে এক মহান মাখলূক।

২. اصول كافى ج/٢. صفحه/٢٠٥

(বরং তারা বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী ও প্রতারক)। আব্দুল্লাহ ইব্নে আবূ ইয়া'কূব বর্ণনা করেন যে, তার একথা শুনে ইমাম জা'ফর ছাদেক সোজা হয়ে বসে গেলেন এবং ক্রদ্ধ অবস্থায় তাকে বললেন, সেই ব্যক্তির ধর্ম এবং ধর্মীয় আমল গ্রহণযোগ্য নয়, যে কোন অন্যায় ইমামের ইমামতে বিশ্বাসী হয়- এমন ইমাম, যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনোনীত নয়। পক্ষান্তরে এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহ্র কোন ক্রোধ ও আযাব হবে না, যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনোনীত ইমামে আদেলের ইমামতে বিশ্বাসী হয়। (উদ্দেশ্য মানুষ যতবড় পাপিষ্টই হোক, যদি সে ইছনাআশারী ইমামগণের ইমামতে বিশ্বাস করে, তবে সে ক্ষমা পাবেই।)

২. সাহাবা বিদ্বেষ সংক্রান্ত আকীদা

শীআদের দ্বিতীয় প্রধান আকীদা হল সাহাবা বিদ্বেষ সংক্রান্ত আকীদা (عقیدہ تبرا/ عقیدہ بغض صحابہ) এ আকীদা অনুযায়ী হযরত আলীর ইমামত না মানার কারণে খলীফ-ত্রয় ও সাধারণ সাহাবায়ে কেরাম নিশ্চিতই কাফের ও ধর্মত্যাগী। (নাউযুবিল্লাহ!) শীআদের সাহাবা বিদ্বেষ সংক্রান্ত আকীদার পর্যায়ে তারা সাহাবীদের সম্পর্কে যা যা ধারণা রাখে তার কয়েকটা বিষয় তুলে ধরা হল।

১. তারা প্রথম তিন খলীফা (হযরত আবূ বকর, ওমর ও উছমান [রা.]) কে কাফের ও ধর্মত্যাগী মনে করে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটা বর্ণনা তুলে ধরা হল–

(এক) সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াত[১]–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ.

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উছূলে কাফীতে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে রেওয়ায়েত[২] আছে যে, তিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন,

تزلت في فلان وفلان وفلان أمنوا بالنبي صلى الله عليه و سلم في أول الأمر و كفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال النبي صلى الله عليه و سلم : "من كنت مولاه فهذا علي مولاه" ثم أمنوُا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقروا بالبيعة، ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعه لهم، فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيئ. (اصول کافی ج/٢. صفحہ/٢٨٩)

অর্থাৎ, এ আয়াতটি অমুক, অমুক ও অমুক (অর্থাৎ, আবূ বকর, ওমর এবং উছমান) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা তিন জনই শুরুতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। তারপর যখন তাদের সামনে হযরত আলীর ইমামত পেশ করা হল এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, من كنت مولاه فهذا علي مولاه তখন তাঁরা তা অস্বীকার করে কাফের হয়ে গেল। এরপর তারা (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথায়) আমীরুল মুমিনীনের বাই'আত করে নিল এবং পুনরায় ঈমান আনল। এরপর যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত হয়ে গেল, তখন তারা আবার বাই'আত অস্বীকার করে কাফের হয়ে গেল এবং কুফ্রে আরও অগ্রসর হল। তারা যখন সেই সব লোকের কাছ থেকেও নিজেদের খেলাফতের বাই'আত নিয়ে নিল যারা হযরত আলীর হাতে বাই'আত করেছিল, তখন তাদের সকলের অবস্থা এই দাঁড়াল যে, তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও ঈমান বাকি রইল না। (অর্থাৎ, পূরোপুরিই কাফের হয়ে গেল।)

(দুই) সূরা মুহাম্মাদের নিম্নোক্ত আয়াত–[১]

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ اَمْلٰى لَهُمْ.

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে উছূলে কাফীতেই উপরোক্ত রেওয়ায়েতের পর ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, এ আয়াতে যাদের কাফের ও ধর্মত্যাগী হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তারা হল–

فلان وفلان وفلان ارتدوا عن الإيمان في ترك ولاية أمير المؤ منين عليه السلام. (اصول کافی ج/٢. صفحہ/٢٨٩)

অর্থাৎ, অমুক, অমুক এবং অমুক (অর্থাৎ, খলীফাত্রয়)। তারা তিনজনই আমীরুল মুমিনীন (আ.)-এর বেলায়াত ও ইমামত বর্জন করার কারণে ঈমান ও ইসলামত্যাগী হয়ে গেছে।

(তিন) সূরা হুজুরাতের নিম্নোক্ত আয়াত–[২]

وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَ زَيَّنَه فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَ كَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوْقَ وَ الْعِصْيَانَ اُولٰئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ. (সূরা: ৪৯–হুজুরাত: ৭)

১. এ আয়াতের অর্থ হল- যারা ঈমান এনেছে, তারপর কুফ্রী করেছে, অনন্তর ঈমান এনেছে, আবার কুফ্রী করেছে, তার পর কুফ্রীতে আরও অগ্রসর হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করার নন। (সূরা: ৪-নিসা: ১৩৭) এতে বলা হয়েছে, যারা ইসলাম কবূল করে, কিন্তু এরপর মুখ ফিরিয়ে কুফ্রের পথ বেছে নেয়, এরপর পুনরায় ঈমান পকাশ করে এবং এরপর আবার কুফ্রের দিকে ফিরে যায় এবং কুফ্রের মধ্যেই সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে, আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (সূরা নিসা: ১৩৭) বলা বাহুল্য, এতে এমন মুনাফিকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যারা তাদের পার্থিব স্বার্থের তাগিদে কখনও মুসলমানদের মধ্যে শামিল হয়ে যেত এবং কখনও কাফেরদের সঙ্গে হাত মিলাত।

২. রেওয়ায়েতটি পাঠ করার পূর্বে পাঠকবর্গ মনে রাখুন যে, শীআ রেওয়ায়েতসমূহে যেখানে যেখানে (অমুক ও অমুক) শব্দ আসে, সেখানে অর্থ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারুক (রা.) উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর যেখানে এ শব্দটি তিনবার আসে, সেখানে তৃতীয় "অমুক"-এর অর্থ হয় হযরত উছমান (রা.)। –মানযূর নো'মানী, ইরানী ইনকিলাব।

১. এ আয়াতের সহীহ অর্থ হল–যারা নিজেদের কাছে হেদায়েত স্পষ্ট হওয়ার পর, পূর্বের অবস্থায় (কুফ্রী অবস্থায়) ফিরে যায়, তাদের সামনে তা শয়তান সাজিয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকে (মিথ্যা) আশা দিয়েছে। (সূরা: ৪৭-মুহাম্মাদ: ২৫) ॥

২. এ আয়াতের পরিষ্কার ও সোজা অর্থ এই যে, হে মুহাম্মাদের সাহাবীগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত এই যে, তিনি ঈমানের মহব্বত তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তোমাদের অন্তরকে ঈমানের সৌন্দর্য দ্বারা শোভিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের মধ্যে কুফ্র, পাপাচার ও আবাধ্যতার প্রতি ঘৃণা জাগ্রত করে দিয়েছেন। তাঁরাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।

এর ব্যাখ্যায় উছূলে কাফীতে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

قوله : (حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَ زَيَّنَه فِيْ قُلُوْبِكُمْ) يعنى أمير المؤ منين عليه السلام، (وكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ) الأول الثانى الثالث. (اصول كاف ج/٢. صفحه/٢٩٩)

অর্থাৎ, এ আয়াতে উল্লেখিত حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ এর মধ্যে "ঈমান" অর্থ আমিরুল মু'মিনীন (আঃ)-এর পবিত্র সত্তা। وكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ এর মধ্যে "কুফ্র" অর্থ প্রথম খলীফা (আবূ বকর), "ফুসূক"(পাপাচার) অর্থ দ্বিতীয় খলীফা (ওমর) এবং "ইছয়ান"(অবাধ্যতা) অর্থ তৃতীয় খলীফা (উছমান)।[১]

২. শীআদের কথিত ব্যাখ্যা অনুসারে যারা আলী (রা.)-এর ইমামত মানে না, তারা জাহান্নামী। এভাবে তারা সব সাহাবীকে এবং সমস্ত মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করেছে। তারা সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াত-[২]

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِه خَطِيْئَتُه فَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

(সূরা: ২-বাকারা: ৮১)

এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে যে,

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِه خَطِيْئَتُه قال : إذا جحد أمامة أمير المؤمنين فَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ. (اصول كافى ج/٢. صفحه/ ٣٠٤)

অর্থাৎ, আয়াতে বোঝানো হয়েছে, যারা আমীরুল মুমিনীনের ইমামত[৩] অস্বীকার করবে, তারা জাহান্নামী হবে এবং অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।

৩. শীআদের সাহাবা বিদ্বেষের পর্যায়ে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, তাদের ধারণা হল প্রতিশ্রুত মাহ্দী আত্মপ্রকাশ করার পর হযরত আয়েশা (রা.)কে জীবিত করে শাস্তি দিবেন। বাকের মজলিসী علل الشرائع গ্রন্থের বরাত দিয়ে ইমাম বাকের থেকে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেন যে,

چون قائم ما ظاہر شود عائشہ را زندہ تابر اوحد بزند وانتقام فاطمہ ما از وبکشد۔

অর্থাৎ, যখন আমাদের কায়েম (মেহ্দী) আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন আয়েশাকে জীবিত করে শাস্তি দিবেন এবং আমাদের ফাতেমার প্রতিশোধ নিবেন।[৪]

৪. শীআগণ শুধু সাহাবাদের প্রতিই বিদ্বেষ রাখেন না, বরং আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকল লোকের সঙ্গে বিশেষত আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের

১. এসব রেওয়ায়েত ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর দুশমনদের চক্রান্তের অংশ। জ্ঞান ও বিবেক সম্পন্ন লোকদের এ থেকে ধোঁকা খাওয়া উচিত হবে না।

২. এ আয়াতের সহীহ অর্থ হল– যারা মন্দ কর্ম উপার্জন করে, মন্দ কর্মকেই সম্বল করে নেয় এবং মন্দকর্ম তাদেরকে বেষ্টন করে নেয়, (এটা কাফের ও মুশরিকদের অবস্থা) তারা জাহান্নামী, তারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।

৩. উল্লেখ্য, এখানে ইমামত অর্থ শীআদের পারিভাষিক ইমামত।

৪. ইরানী ইনকিলাব, বরাত- হক্কুল ইয়াকীন, ১৩৯ পৃ.।

উলামায়ে কেরামের সঙ্গে চরম বিদ্বেষ পোষণ করেন। কারণ, আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা শীআগণের কথিত ব্যাখ্যা অনুসারে হযরত আলী (রা.)-এর ইমামত মানে না এবং তারা সাহাবীদের প্রতি ভক্তি রাখে। শীআদের ধারণা হল যখন অন্তর্হিত ইমাম আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন কাফেরদের আগে সুন্নীদেরকে কতল করবেন, বিশেষত তাদের উলামায়ে কেরামকে কতল করবেন। এ বিষয়ে "হক্কুল ইয়াকীন" গ্রন্থের একটা রেওয়ায়েত নিম্নরূপ–

وقتیکہ قائم علیہ السلام ظاہر می شود پیش از کفار ابتداء بہ سنیان خواہد کرد باعلماء ایشان و ایشان را خواہد کشت۔

অর্থাৎ, যে সময় কায়েম (আ.) আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন তিনি কাফেরদের পূর্বে সুন্নী বিশেষত তাদের আলেমদের থেকে কাজ শুরু করবেন এবং তাদের সকলকে হত্যা করে দিবেন।[১]

৪. শীআদের সাহাবা বিদ্বেষের পর্যায়ে আরও একটা কথা উল্লেখ্য যে, তাদের ধারণায় (নাউযুবিল্লাহ) সাহাবায়ে কেরামের প্রায় সকলেই বিশেষত খলীফাত্রয় কাফের, ধর্মত্যাগী আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসঘাতক, জাহান্নামী ও অভিশপ্ত।

পূর্বেও আরয করা হয়েছে, যদি স্বীকার করে নেয়া হয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পথে "গাদীরে খুম" নামক স্থানে সকল সফরসঙ্গী বিশিষ্ট ও সাধারণ সাহাবায়ে কেরামকে বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে একত্র করেন। অতঃপর নিজে মিম্বরে আরোহণ করে হযরত আলী মুর্তযাকে উভয় হাতের উপরে তুলে ধরেন, যাতে উপস্থিত সকলেই তাঁকে দেখতে পায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলার আদেশের বরাত দিয়ে পরবর্তী সময়ের জন্য তাঁর ইমামত অর্থাৎ, স্থলাভি-ষিক্তরূপে উম্মতের ধর্মীয় ও জাগতিক শাসন-কর্তৃত্ব ঘোষণা করেন। সকলের কাছ থেকে এর অঙ্গীকার ও স্বীকৃতি আদায় করেন। বিশেষত হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমরকে আদেশ দেন যে, তোমরা আলীকে "আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মুমিনীন" বলে সালাম দাও। তাঁরা এ আদেশ পালন করে এমনিভাবে সালাম দেন। ইহতেজাজে তাবরিযীর উল্লেখিত রেওয়ায়েত অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নিজের হাতে হযরত আলীর পক্ষে সকলের কাছ থেকে বাইআত নেন। এবং সর্বপ্রথম খলীফাত্রয় তাঁর হাত ধরে এই বাইআত করেন। মোটকথা, শীআ গ্রন্থাবলীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই পূর্ণ বিবরণকে বাস্তব ঘটনা বলে স্বীকার করে নেয়া হলে এর অবশ্যম্ভাবী ফলাফল স্বরূপ একথাও স্বীকার করতে হবে যে, যখন এ ঘটনার মাত্র আশি দিন পরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত হয়ে যাওয়ায় সকলেই হযরত আলীকে পরিত্যাগ করে হযরত আবূ বকরকে খলীফা ও স্থলাভিষিক্তরূপে মুসলিম উম্মাহ্র ধর্মীয় ও জাগতিক রাষ্ট্রপ্রধান করে নিল এবং সকলেই তাঁর হাতে বাইআত করল, তখন (নাউযুবিল্লাহ) তাঁরা সকলেই আল্লাহ

১. ইরানী ইনকিলাব।

ও রসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং সকলেই কাফের ও ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। বিশেষত খলীফাত্রয়- হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর ও হযরত উছমান বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেলেন, যাদের কাছ থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষভাবে অঙ্গীকার ও স্বীকৃতি নিয়েছিলেন এবং নিজের হাতে সর্বপ্রথম বাইআত গ্রহণ করিয়েছি-লন।

খলীফা হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.) সম্পর্কে শীআদের বিশেষ বিদ্বেষ প্রমাণিত করার জন্য নিম্নোক্ত বর্ণনাটি লক্ষ করার মত–

কুলাইনীর কিতাবুর-রওযায় রেওয়ায়েত আছে যে, ইমাম বাকেরের জনৈক অকৃত্রিম মুরীদ হযরত আবূ বকর ও ওমর সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, "এ দু'জনের সম্পর্কে কী জিজ্ঞেস কর? আমাদের আহলে বাইতের মধ্য থেকে যে-ই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ অবস্থায় বিদায় নিয়েছে। আমাদের প্রত্যেক বড়জন ছোটজনকে এদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করার ওছিয়ত করেছেন। তারা উভয়েই অন্যায়ভাবে আমাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছে। তারা সর্বপ্রথম আমাদের আহলে বাইতের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে। আমাদের উপর যে কোন বালা–মুসীবত এসেছে, তার ভিত্তি তারা রচনা করেছে। অতএব তাদের উভয়ের প্রতি আল্লাহর লানত, ফেরেশতাগণের লানত এবং সকল মানুষের লানত।" (১১৫-পৃ.)

"রেজাল-কুশীতে বর্ণিত আছে যে, ইমাম বাকেরের একজন খাঁটি মুরীদ-কুমায়ত ইব্‌নে যায়েদ ইমামকে বলল যে, আমি এই দুই ব্যক্তি (আবূ বকর ও ওমর) সম্পর্কে আপনার কছে জানতে চাই। ইমাম বললেন, "হে কুমায়ত ইব্‌নে যায়েদ! ইসলামে যাকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, যে ধন-সম্পদই অবৈধভাবে উপার্জন করা হয়েছে এবং যত যিনা হয়ে থাকবে, আমাদের ইমাম মেহদীর আত্মপ্রকাশের দিন পর্যন্ত, সবগুলোর গোনাহ্ এই দুই ব্যক্তির ঘাড়ে চাপবে।" (১৩৫ পৃ.)

এ পর্যায়ে আরও উল্লেখ করা যায় কুলাইনীর কিতাবুর-রওযার আরও একটা রেওয়ায়েত। কুলাইনী তার সনদ সহকারে হযরত সালমান ফারসী থেকে একটা রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। যার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ–

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের পর ছকীফায়ে বনী-ছায়েদায় যখন আবূ বকরের বাইআতের ফয়সালা হয় এবং সেখান থেকে মসজিদে নববীতে এসে আবূ বকর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মিম্বরে বসে বাইআত নিতে শুরু করলেন, তখন সালমান ফারসী এ দৃশ্য দেখে হযরত আলীকে সংবাদ দিলেন। হযরত আলী সালমানকে বললেন, তুমি জান এখন আবূ বকরের হাতে সর্বপ্রথম কে বাইআত করেছে? সালমান বললেন, আমি সে লোকটিকে চিনি না; কিন্তু আমি একজন বৃদ্ধকে দেখেছিলাম। সে তার লাঠির উপর ভর দিয়ে সামনে এগিয়ে আসে। তার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে কপালে সাজদার চিহ্ন ছিল। সে-ই সর্বপ্রথম আবূ বকরের দিকে অগ্রসর হয়। সে ক্রন্দন করছিল আর বলছিল, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র

জন্য, যিনি আমাকে এ স্থানে আপনাকে দেখার পূর্বে মৃত্যু দেননি। হাত বাড়ান। আবূ বকর হাত বাড়ালে বৃদ্ধ তাঁর হাত ধরে বাইআত করল। হযরত আলী একথা শুনে আমাকে বললেন, তুমি জান সে কে? সালমান বললেন, আমি জানি না। হযরত আলী বললেন, সে ইবলীস। তার প্রতি আল্লাহ্ লানত করুন! হযরত আলী আরও বললেন, খেলাফতের ব্যাপারে যা কিছু হয়েছে, সবই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পূর্বে বলে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, গাদীরে খুমে আমার পরবর্তী সময়ের জন্যে খেলাফতের ব্যাপারে আমার মনোনয়ন ঘোষণা থেকে শয়তান ও তার বাহিনীর মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তারা এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে এবং এর ফলশ্রুতিতে আমার ওফাতের পর লোকজন প্রথমে ছকীফায়ে বনী ছায়েদায় এবং পরে মসজিদে নববীতে এসে আবূ বকরের বাইআত করবে। রেওয়ায়েতের শেষাংশ এই–

ثم يأتون المسجد فيكون أول من يبايعه على منبري إبليس – لعنه الله– في صورة شيخ يقول كذا وكذا. إلخ.

অর্থাৎ, এরপর (ছকীফায়ে বনী ছায়েদা থেকে) তারা মসজিদে আসবে। এখানে আমার মিম্বরের উপর আবূ বকরের হাতে সর্বপ্রথম অভিশপ্ত ইবলীস বাইআত করবে। সে বৃদ্ধের ছদ্মবেশে আসবে এবং এই এই কথা বলবে। (১৫৯, ১৬০)

৫. শীআদের সাহাবা বিদ্বেষের পর্যায়ে আরও উল্লেখ্য যে, তাদের ধারণায় অন্তর্হিত ইমাম যখন আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন শায়খাইন (হযরত আবূ বকর ও ওমর)কে কবর থেকে বের করবেন এবং হাজারো বার শূলীতে চড়াবেন।

বাকের মজলিসী তার "হক্কুল ইয়াকীন" গ্রন্থে শায়খাইনকে কবর থেকে বের করে সারা বিশ্বের পাপীদের পাপের শাস্তিতে প্রত্যহ হাজারো বার শূলীতে চড়ানোর কথা উল্লেখ করেছেন।

৬. শীআদের ধারণা (নাউযুবিল্লাহ)- হযরত আয়েশা ও হযরত হাফ্সা মুনাফিকা ছিলেন, তাঁরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষ দিয়ে খতম করেছেন। বাকের মজলিসী তার "হাক্কুল ইয়াকীন"গ্রন্থে একথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তার "হায়াতুল-কুলূব" গ্রন্থে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের বর্ণনায় লিখেছেন,

وعیاشی بسند معتبر از حضرت صادق روایت کرده است که عائشہ وحفصہ آنحضرت را بزہر شہید کردند۔

অর্থাৎ, আইয়াশী নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা, হাফ্সা রসূলুল্লাহ আলাইহিস সালামকে বিষ দিয়ে শহীদ করেছিল। (৮৭০ পৃ.)

বাকের মজলিসী আরও লিখেছেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপনে হাফ্সাকে বলেছিলেন, আমি ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, আমার পরে আবূ বকর অন্যায়ভাবে খলীফা হয়ে যাবে। তার পরে তোমার পিতা ওমর খলীফা

হবে। তিনি এ গোপন কথা কারও কাছে না বলার জন্যে হাফসাকে তাকিদ করেছিলেন। কিন্তু হাফসা কথাটা আয়েশার কাছে ফাঁস করে দেয় এবং আয়েশা তার পিতা আবূ বকরকে বলে দেয়। আবূ বকর ওমরকে বলল যে, হাফসা একথা বলেছে। ওমর তার কন্যা হাফসাকে জিজ্ঞাসা করলে প্রথমে তিনি বলতে চায়নি, কিন্তু পরে বলে দেয় যে, হ্যাঁ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা বলেছেন। এরপর মজলিসী লিখেন–

پس آں دومنافق وآں دومنافق با یکدیر اتفاق کردند کہ آں حضرت را بہ زہر شہید کنند۔

অর্থাৎ, অতঃপর এ দু' মুনাফিক এবং দু' মুনাফিকা (অর্থাৎ, আবূ বকর, ওমর ও তাঁদের কন্যাদ্বয়) এ বিষয়ে একমত হয়ে যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষ দিয়ে শহীদ করতে হবে। (৭৪৫ পৃ.)

৩. কুরআন বিকৃতি বিষয়ক আকীদা

শীআদের তৃতীয় প্রধান আকীদা হল কুরআন বিকৃতি সম্পর্কিত আকীদা (عقیدہ تحریف قرآن)। তারা বিশ্বাস রাখে যে, মুসলমানদের নিকট সংরক্ষিত কুরআন বিকৃত। মূলত কুরআন বিকৃতির আকীদা ইমামত আকীদারই অবশ্যম্ভাবী ফল। কেননা, শীআদের ধারণায় কুরআন সংকলনকারী হযরত আবূ বকর উছমান ও তাদের সহযোগী সাহাবাগণ ছিলেন আলী বিদ্বেষী। ফলে কুরআন থেকে হযরত আলী ও আহ্লে বাইতের ফযীলতমূলক বর্ণনাসমূহ পরিকল্পিতভাবে তারা বাদ দিয়ে দিয়েছেন। তাই মুসলমানদের নিকট সংরক্ষিত কুরআন বিকৃত। এ পর্যায়ে তাদের ছয়টা বক্তব্য নিম্নে প্রদান করা হল।

১. কুরআনে "পাঞ্জতন পাক" ও সকল ইমামের নাম ছিল।

শীআদের বক্তব্য হল কোরআনে "পাঞ্জতন পাক"[১] ও সকল ইমামের নাম ছিল। এগুলো বের করে দেয়া হয়েছে এবং পরিবর্তন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কুরআনের কয়েকটি আয়াত সম্পর্কে তাদের বক্তব্য পেশ করা হল।

* সূরা তোয়াহার আয়াত নং ১১৫–

وَ لَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَ لَمْ نَجِدْ لَه عَزْمًا.

অর্থাৎ, আমি আদমকে প্রথমেই এক আদেশ দিয়েছিলাম (যে, বৃক্ষের কাছে যেয়ো না।) অতঃপর আদম তা ভুলে গেল।

এ সম্বন্ধে উছূলে কাফীতে আছে যে, ইমাম জা'ফর ছাদেক কসম খেয়ে বলেছেন, এই পূর্ণ আয়াত এভাবে নাযিল হয়েছিল-

১. শীআগণ বলে থাকেন যে, "পাঞ্জতন পাক" বলে বোঝানো হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আলী, ফাতেমা, হাছান ও হুছাইন–এই পাঁচ ব্যক্তিকে। উল্লেখ্য– "পাঞ্জতন" শব্দের অর্থ পাঁচ ব্যক্তি, আর "পাক" শব্দের অর্থ পবিত্র।

﴿ وَ لَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ﴾ كلمات في محمد وعلى وفاطمة والحسن الأيمة من ذريتهم فَنَسِيَ .... هكذا ولله أنزلت علي محمد صلى الله عليه واله وسلم. (اصول كافى ج/٢. صفحه٢٨٣)

এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, এই আয়াত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি এভাবে নাযিল হয়েছিল যে, এতে এ সকল নাম ছিল। (অর্থাৎ, আমি আদমকে আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন এবং তাদের বংশে জন্মগ্রহণকারী ইমামগণ সম্পর্কে কিছু বিধান বলে দিয়েছিলাম।) কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের পরে (শীআ আকীদা অনুযায়ী) যারা জোরপূর্বক খলীফা হয়ে গিয়েছিল, তারা কুরআনে পরিবর্তন করেছে। তাদের অন্যতম পরিবর্তন এই যে, তারা সূরা তোয়াহার এই আয়াত থেকে পাক পাঞ্জতনের নাম ও তাদের বংশে জন্মগ্রহণকারী ইমামগণের আলোচনা অপসারণ করে দিয়েছে।

* সুরা বাকারার শুরুতে আয়াত নং ২৩-[১]

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِه.

এ আয়াত সম্বন্ধে উছূলে কাফীতে ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত হয়েছে–

نزل جبرئيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه واله وسلم هكذا اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا في على فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِه. (اصول كافى ج/٢. صفحه/٢٨٤.)

অর্থাৎ, জিবরাঈল মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি এ আয়াতটি এভাবে নিয়ে নাযিল হয়েছিল যে, এতে على عبدنا -এর পরে এবং فأتوا এর পূর্বে في علىّ শব্দটি ছিল। অর্থাৎ, এ আয়াতটি হযরত আলীর ইমামত প্রসঙ্গে ছিল।

* সূরা রূমের নিম্নোক্ত আয়াত-[২]

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا. (সূরাঃ ৩০-রূম ঃ ৩০)

উছূলে কাফীতে ইমাম বাকের এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, هي الولاية অর্থাৎ, এর অর্থ বেলায়েত ও ইমামত। (اصول كافى ج/٢. صفحه/٢٨٦)

* সূরা আহযাবের নিম্নোক্ত আয়াত–[৩]

مَنْ يُّطِعِ اللهَ وَ رَسُوْلَه فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا. (সূরা: ৩৩-আহযাব: ৭১)

এ আয়াত সম্পর্কে উছূলে কাফীতে আবূ বছীরের বর্ণনায় ইমাম জা'ফর ছাদেক বলেন, আয়াতটি এভাবে নাযিল হয়েছিল–

১. এ আয়াতে ইসলাম ও কুরআন অস্বীকারীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে এবং চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, আমার বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি অবতীর্ণ এই কুরআনের ঐশী গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের কিছু সন্দেহ ও সংশয় থাকে, তবে এর অনুরূপ একটি সূরাই রচনা করে অথবা রচনা করিয়ে নিয়ে এস।

২. এ আয়াতের অর্থ হল তুমি একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের জন্য তোমাকে প্রতিষ্ঠিত কর।

৩. আয়াতের অর্থ হল- "যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে, সে বিরাট সাফল্য অর্জন করবে।"

مَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَه في ولاية علي والأيمة من بعده فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا. (اصول كافى ج/٢. صفحہ/٢٧٩)

অর্থাৎ, এর অর্থ ছিল যে কেউ আলী ও তার পরবর্তী ইমামগণের ব্যাপারে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে, সে বিরাট সাফল্য অর্জন করবে। এ আয়াতে হযরত আলী ও তার পরবর্তী সকল ইমামের ইমামত বর্ণিত হয়েছিল। কিন্তু আয়াত থেকে "আলী ও তার পরবর্তী ইমামগণ সংশ্লিষ্ট" কথাগুলো বের করে দেয়া হয়েছে, যা বর্তমান কুরআনে নেই।

ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে–

عن أبي جعفر عليه السلام قال : نزل جبرئيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله بئسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله في عليّ بغيا. (اصول كاف ج/٢. صفحہ/٢٨٤)

অর্থাৎ, সূরা বাকারার এই ৯০ আয়াতে فی علیّ (আলীর ব্যাপারে) শব্দ ছিল, যা বের করে দেয়া হয়েছে এবং বর্তমান কুরআনে নেই।

* সূরা মা'আরিজের প্রথম আয়াত–

سَاَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَه دَافِعٌ.

এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে আবূ বছীরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, আয়াতটি এভাবে নাযিল হয়েছিল–

(سَاَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ) بولاية علي (لَيْسَ لَه دَافِعٌ) ثم قال : هكذا والله نزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه واله. (اصول كافى ج/٢. صفحہ/٢٩١)

অর্থাৎ, এ আয়াত থেকে بولاية علی শব্দটি বের করে দেয়া হয়েছে।

সারকথা উছূলে কাফীতে এভাবে কুরআনে পাকের বিভিন্ন জায়গায় বহু আয়াতে এ ধরনের পরিবর্তন দাবী করা হয়েছে।

২. কুরআনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ গায়েব করে দেয়া হয়েছে।

عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله سبعة عشر ألف آية.

অর্থাৎ, হিশাম ইব্‌নে সালেমের রেওয়ায়েতে ইমাম জা'ফর ছাদেক বলেন, জিবরাঈল যে কুরআন নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে নাযিল হয়েছিল, তাতে সতর হাজার আয়াত ছিল। (৬৭১ পৃ.)

প্রসিদ্ধ শীআ আলেম আল্লামা কাযভীনী লিখেছেন–

مراد اینست کہ بسیارے ازان قران ساقط شدہ ودر مشاحف مشہورہ نیست۔

অর্থাৎ, ইমাম জা'ফর ছাদেকের এ উক্তির অর্থ হল, জিবরাঈলের আনীত কুরআন থেকে অনেক অংশ বাদ দেয়া হয়েছে এবং তা কুরআনের বর্তমান প্রসিদ্ধ কপিসমূহে নেই।[১]

১. ইরানী ইনকিলাব।

৩. কুরআন বিকৃতি সম্বন্ধে হযরত আলীও বলে গেছেন।

শীআ মাযহাবের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ ইহ্‌তিজাজে তবরিযীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনৈক যিন্দীক তথা ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি হযরত আলীর সঙ্গে এক দীর্ঘ কথোপকথনে কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপন করেছে। হযরত আলী সেগুলোর জওয়াব দিয়েছেন। তন্মধ্যে তার একটা আপত্তি ছিল এরূপ যে, সূরা নিসার প্রথম রুকূর নিম্নোক্ত আয়াত–

وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا.

এর মধ্যে شرط ও جزاء এর মাঝে যে সম্পর্ক হওয়া উচিত, তা নেই। (১২৪ পৃ.) হযরত আলী তখন বলেছেন,

هو قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القران وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القران.

অর্থাৎ, পূর্বে আমি যে কথা উল্লেখ করেছি, এটা তারই একটি দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ, মুনাফিকরা কুরআন থেকে অনেক কিছু বাদ দিয়েছে। এ আয়াতে তারা এই করেছে যে, ان خفتم فی الیتامی এবং فانکحوا ما طاب لکم من النساء এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ কোরআনেরও বেশি ছিল, যা বাদ দেয়া হয়েছে। এতে সম্বোধন ও কিসসা-কাহিনী ছিল। (১২৮ পৃ.)

শীআদের বক্তব্য হল এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আলী বলেছেন যে, এই এক আয়াতের মাঝখান থেকে মুনাফিকরা এক তৃতীয়াংশ কুরআনের চেয়েও বেশি বাদ দিয়েছে। এতে অনুমান করা যায় যে, সমগ্র কুরআন থেকে কতটুকু বাদ দেয়া হয়েছে। তাহলে লক্ষ্যণীয় যে, একটা আয়াত কতটা বড় ছিল!

এ কথোপকথনে যিন্দীকের অন্যান্য কয়েকটা আপত্তির জওয়াবেও হযরত আলী মুর্তযা কুরআনে পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। তার এক আপত্তির জওয়াবে তিনি একথাও বলেছেন যে, এ ব্যাপারে এ স্থলে তুমি যে জওয়াব আমার কাছ থেকে শুনেছ, তাই তোমার জন্যে যথেষ্ট হওয়া উচিত। কেননা, আমাদের শরীআতে তাকিয়্যার যে নির্দেশ আছে তা এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট করে বলার পথে অন্তরায়।[১]

৪. আসল কুরআন ইমামে গায়েবের নিকট রয়েছে।

শীআদের বক্তব্য হল আসল কুরআন তাই, যা হযরত আলী সংকলন করেছিলেন। হযরত আলী যে কুরআন সংকলন করেছিলেন সেটি সেই কুরআনের সম্পূর্ণ অনুরূপ ছিল, যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি নাযিল হয়েছিল এবং বর্তমান কুরআন থেকে ভিন্নতর ছিল। সেটি হযরত আলীর কাছেই ছিল এবং তার পরে তার সন্তানদের মধ্য

১. মাওলানা মানযূর নো'মানী সাহেব বলেন, আশ্চর্যের কথা, কুরআনে পরিবর্তনের কথা প্রকাশ করার পথে তাকিয়্যা অন্তরায় হল না; কিন্তু পরিবর্তনকারীদের নাম প্রকাশ করার পক্ষে তাকিয়্যা অন্তরায় হয়ে গেল!। (১২৫ পৃ.)

থেকে ইমামগণের কাছে ছিল। এখন সেটি ইমামে গায়েব তথা অন্তর্হিত ইমামের কাছে রয়েছে। তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন সেই কুরআন প্রকাশ করবেন। এর আগে কেউ সেটা দেখতে পাবে না। এ প্রসঙ্গে উছূলে কাফীর নিম্নোক্ত দুটো রেওয়ায়েত লক্ষ্যণীয়–

(১) ইমাম বাকের বলেন,[১]

ما ادعى أحد من الناس أن جمع القران كله كماأنزل إلا كذاب، وما جمعه و حفظه كما أنزله الله إلا علي بن أبي طالب والأيمة من بعده عليه السلام. (اصول كافى ج/١. صفحه/٣٣٢)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দাবী করে যে, পুরো কুরআন সংকলিত হয়েছে যেভাবে তা নাযিল হয়েছিল, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তাআলার নাযিল করা অনুযায়ী কুরআন কেবল আলী ইবনে আবী তালেব এবং তার পরবর্তী ইমামগণই সংকলন করেছেন এবং সংরক্ষণ করেছেন। (উসূলে কাফী, ১খ. ২৩৩ পৃষ্ঠা)

(২) উক্ত গ্রন্থেই ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে আরও বর্ণিত আছে–[২]

যখন ইমাম মেহদী আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন তিনি কুরআনকে আসল ও বিশুদ্ধরূপে পাঠ করবেন। তিনি কুরআনের সেই কপিটি বের করবেন, যা আলী (আ.) সংকলন করেছিলেন।

সারকথা, শীআ গ্রন্থাবলীর এসব রেওয়ায়েতে বর্তমান কুরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কথা খুব পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে; বিশেষভাবে কতক রেওয়ায়েতে কুরআন থেকে হযরত আলী ও ইমামগণের নাম বাদ দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কি পরিমাণ বাদ দেয়া হয়েছে, নিম্নে তার বর্ণনা লক্ষ করুন।

৫. পরিবর্তনের রেওয়ায়েত দু'হাজারেরও অধিক।

স্বনামখ্যাত শীআ মুহাদ্দিছ সাইয়েদ নেয়ামতুল্লাহ জাযায়েরী তার কোন কোন গ্রন্থে বলেছেন, যেমন তার কাছ থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআনে পরিবর্তন ব্যক্তকারী রেওয়ায়েতসমূহের সংখ্যা দু'হাজারেরও অধিক। আমাদের একদল আলেম, যেমন শায়খ মুফিদ, মুহাক্কিক দামাদ ও আল্লামা মজলিসী এসব রেওয়ায়েত মশহুর বলে দাবী করেছেন। শায়খ তূসীও তিবইয়ান গ্রন্থে পরিষ্কার লিখেন যে, এসব রেওয়ায়েতের সংখ্যা অনেক বেশি। বরং আমাদের একদল আলেম –যাদের কথা পরে আসবে– দাবী করেছেন যে, এসব রেওয়ায়েত মুতাওয়াতির। (২২৭ পৃ.)

৬. কুরআনে একটি সূরা ছিল যা বর্তমান কুরআনে নেই।

আল্লামা সাইয়েদ মাহমূদ শুকরী আলূসী (রহ.) শাহ আব্দুল আযীয কৃত "তুহফায়ে ইছনা আশারিয়া" গ্রন্থের আরবীতে সারসংক্ষেপ লিখেছিলেন, যা مختصر التحفة الاثنا عشريه নামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মিসরের খ্যাতনামা আলেম শায়খ

২. باب أن لم يجمع القرآن كله إلا الأيمة عليهم السلام

১. باب فضل القران

মুহীউদ্দীন আল খতীব এর সম্পাদনা করেন এবং প্রান্তটীকা ও ভূমিকার সংযোজন সহকারে একে প্রকাশ করেন। এতে তিনি ইরানে লিখিত কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি থেকে নেয়া একটি সূরার (সূরা ওয়ালায়াতের) ফটোও প্রকাশ করেন, যা বর্তমান কুরআনে নেই। এ সম্পর্কে তিনি লিখেন– "প্রফেসর নলডিকি (NOELDEKE) তার HISTORY OF THE COPIES OF THE QURAN গ্রন্থে এ সূরাটি শীআ সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ دبستان مذهب (মুহসিন ফানী কাশ্মীরী কৃত ফারসী গ্রন্থ) =এর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন। এর ফারসী গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ ইরানে প্রকাশিত হয়েছে। মিসরের একজন বড় আইন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর মুহাম্মাদ আলী সউদী খ্যাতনামা প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ ব্রাউন (BROWN)–এর কাছে ইরানে লিখিত কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি কপি দেখিয়েছিলেন। তাতে এই সূরা ওয়ালায়াতও ছিল। তিনি এর ফটো নিয়ে নেন, যা মিসরের সাময়িকী "আল ফাতাহ" ৮৪২ সংখ্যার নবম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। নিম্নে তার ফটোকপি পেশ করা গেল।

কথিত সূরাতুল ওয়ালায়াত (سورة الولاية)-এর ফটোকপি

শীআদের আরও কিছু মৌলিক আকীদা

এখানে শীআদের আরও তিনটা বিশেষ আকীদার কথা উল্লেখ করা হল।

১. তাকিয়্যা

তাকিয়্যা (تقيه) হল এক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা, যাকে তাদের নিকট দ্বীনের এক গুরুত্বপূর্ণ রুক্‌ন মনে করা হত। এর অর্থ মানুষ তার মান ও মর্যাদা এবং জান ও মাল শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যা কিছু অন্তরে আছে তার বিপরীত প্রকাশ করবে।

তাকিয়্যা সম্পর্কে ইমামগণের উক্তি ও কর্ম

উছূলে কাফীতে তাকিয়্যা সম্পর্কেও একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। এ অধ্যায়ের একটা রেওয়ায়েত এই:

عن أبى عمر الأ عجمي قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا عمر ! تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. (اصول كافى ج/٣. صفحه/٣٠٧)

অর্থাৎ, আবূ ওমার আ'জামী রেওয়ায়েত করেন, ইমাম জা'ফর ছাদেক আমাকে বলেছেন, ধর্মের দশ ভাগের নয় ভাগ তাকিয়্যার মধ্যে নিহিত। যে তাকিয়্যা করে না, সে বেদ্বীন।

তাকিয়্যা সম্পর্কে আরও একটা রেওয়ায়েত নিম্নরূপ–

হাবীব ইব্‌নে বিশরের রেওয়ায়েতে ইমাম জা'ফর ছাদেক বলেন, আমি আমার পিতা ইমাম বাকেরের কাছে শুনেছি- তিনি বলতেন, ভূপৃষ্ঠে কোনো বস্তুই আমার কাছে তাকিয়্যা অপেক্ষা অধিক প্রিয় নয়। হে হাবীব, যে ব্যক্তি তাকিয়্যা করবে, আল্লাহ তাকে উচ্চতা দান করবেন, আর যে করবে না, আল্লাহ্ তার অধঃপতন ঘটাবেন। (উছূলে কাফী, ৪৮৩ পৃ.)

উক্ত গ্রন্থের আরও একটা রেওয়ায়েত নিম্নরূপ:

قال أبو جعفر عليه السلام : التقية من ديني و دين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له. (اصول كافى ج/٣. صفحه/٣١١)

অর্থাৎ, ইমাম বাকের বলেন, তাকিয়্যা আমার ধর্ম এবং আমার পিতৃপুরুষদের ধর্ম। যে তাকিয়্যা করে না, তার ঈমান নেই।

তাকিয়্যার একটি ব্যাখ্যা ও তার স্বরূপ

জানা গেছে যে, শীআরা অজ্ঞদের সামনে তাকিয়্যা সম্পর্কে বলে যে, তাদের মতে তাকিয়্যার অনুমতি কেবল তখন, যখন প্রাণের আশংকা বা এমনি ধরনের কোন গুরুতর বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন হওয়া যায়। অথচ শীআ রেওয়ায়েতে ইমামগণের এমন প্রচুর ঘটনা বিদ্যমান আছে, যাতে কোন বাধ্যবাধকতা এবং কোন সামান্য আশংকা ছাড়াই তারা তাকিয়্যা করেছেন, সুস্পষ্ট ভ্রান্ত বর্ণনা দিয়েছেন অথবা আপন

কাজ দ্বারা মানুষকে ধোঁকা দিয়েছেন, প্রতারণা করেছেন। উছূলে কাফীতে ইমাম জা'ফর ছাদেকের এ ধরনের ঘটনা বরাত সহকারে উল্লেখিত হয়েছে। তদুপরি উছূলে কাফীর তাকিয়্যা অধ্যায়ের নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটা দ্বারাও অনুরূপ প্রতীয়মান হয়।

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. (اصول كافى ج/٣. صفحه/٣١١)

অর্থাৎ, যুরারার রেওয়ায়েতে ইমাম বাকের (আ.) বলেন, তাকিয়্যা যে কোন প্রয়োজনে করা যায়। প্রয়োজন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই অধিক অবগত; অর্থাৎ, প্রয়োজন তা-ই; যাকে সংশিষ্ট ব্যক্তি প্রয়োজন মনে করে।

তাকিয়্যা কেবল জায়েয নয়– ওয়াজিব ও জরুরী

বরং বাস্তব ঘটনা এই যে, শীআ মাযহাবে তাকিয়্যা কেবল জায়েয নয়; বরং অত্যাবশ্যকীয় এবং ঈমান ও দ্বীনের অঙ্গ। শীআদের মূলনীতি চতুষ্টয়ের অন্যতম من لايحضره الفقية গ্রন্থে রেওয়ায়েত আছে যে,

قال الصادق عليه السلام : لو قلتُ : إن تارِكَ التقية كتارك الصلوة لكنتُ صادقا وقال عليه السلام : لادين لمن لاتقية له.

অর্থাৎ, ইমাম জাফর ছাদেক (আ.) বলেছেন, যদি আমি বলি যে, তাকিয়্যা বর্জনকারী নামায বর্জনকারীর অনুরূপ (গোনাহগার), তবে এ কথায় আমি সত্য হব। তিনি আরও বলেছেন, যার তাকিয়্যা নেই, তার দ্বীন-ধর্ম নেই।

সম্পূর্ণ বিনা প্রয়োজনে ইমামগণের তাকিয়্যা করার দৃষ্টান্ত

কিতাবুর রওযায় একটা রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এর রাবী ইমাম জা'ফর ছাদেকের খাঁটি মুরীদ মুহাম্মাদ ইব্‌নে মুসলিম। তিনি বর্ণনা করেন,

دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبو حنيفة فقلت له : جعلت فداك رأيت رؤية عجيبة، فقال يا ابن مسلم! هاتها فان العالم بها جالس، وأومى بيده إلى أبي حنيفة.

অর্থাৎ, আমি একদিন ইমাম জা'ফর ছাদেকের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তার কাছে আবূ হানীফাও উপবিষ্ট ছিলেন। আমি (ইমাম জা'ফর ছাদেকের খেদমতে) আরয করলাম, আমি আপনার জন্য উৎসর্গিত, আমি একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। তিনি বললেন, ইব্‌নে মুসলিম! তোমার স্বপ বর্ণনা কর। স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জ্ঞানী একজন আলেম এক্ষণে এখানে উপস্থিত আছেন। তিনি হাত দ্বারা আবূ হানীফার দিকে ইশারা করে বললেন (যে, ইনি)।

এরপর ইব্‌নে মুসলিম বলেন, আমি আমার স্বপ্ন বর্ণনা করলাম, যা শুনে আবূ হানীফা তার ব্যাখ্যা বললেন। তাঁর ব্যাখ্যা শুনে ইমাম জা'ফর ছাদেক বললেন, আল্লাহর কসম! হে আবূ হানীফা, আপনি সম্পূর্ণ ঠিক বলেছেন। ইব্‌নে মুসলিম বলেন, এরপর আবূ হানীফা তার কাছ থেকে চলে গেলেন। আমি আরয করলাম, আমি

আপনার প্রতি উৎসর্গ, এই নাছেবীর[১] ব্যাখ্যা আমার কাছে ভাল লাগেনি। ইমাম জা'ফর ছাদেক বললেন, হে ইব্‌নে মুসলিম, এতে তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। আমাদের ব্যাখ্যা তাদের ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। আবূ হানীফা যে ব্যাখ্যা করেছে, তা ঠিক নয়। ইব্‌নে মুসলিম বলেন, আমি আরয করলাম, আমি আপনার প্রতি উৎসর্গ, তা হলে আপনি 'ঠিক বলেছেন' বলে এবং কসম খেয়ে তার ব্যাখ্যার সত্যায়ন করলেন কেন? ইমাম বললেন, আমি কসম খেয়ে তার ভ্রান্তির সত্যায়ন করেছিলাম। (১৩৭ পৃ.)

২. কিত্‌মান

"কিত্‌মান" অর্থ আসল আকীদা, মাযহাব ও মত গোপন করা এবং অন্যের কাছে প্রকাশ না করা। তাকিয়্যার অর্থ কথায় ও কাজে বাস্তব ঘটনার বিপরীত অথবা আপন আকীদা, মাযহাব ও মতের বিপরীত প্রকাশ করা এবং এভাবে অপরকে ধোঁকা ও প্রতারণায় লিপ্ত করা। শীআদের মতে তাদের ইমামগণ সারা জীবন এ শিক্ষা মেনে চলেছেন।

কিত্‌মান সম্পর্কে ইমামগণের উক্তি ও কর্ম

উছূলে কাফীতে কিত্‌মান অধ্যায়ে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তার শাগরেদ সোলাইমানকে লক্ষ্য করে বলেন,

قال أبو عبد الله عليه السلام يا سليمان! إنكم على دين من كتمه أعزّه الله، ومن أذاعه أذلّه الله. (اصول كافى ج/٣. صفحہ ٣١٥)

অর্থাৎ, তোমরা এমন ধর্মের উপর রয়েছ যে, যে ব্যক্তি একে গোপন রাখবে, তাকে আল্লাহ্ তাআলা ইজ্জত দান করবেন। আর যে এ ধর্মকে প্রকাশ ও প্রচার করবে, আল্লাহ্ তাকে হেয় ও লাঞ্ছিত করবেন।

উক্ত গ্রন্থে ইমাম জা'ফর ছাদেকের পিতা ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিশেষ শীআদেরকে বলেন,

والله إن أحبّ أصحابي إلي أورعهم وأفقهم وأكتمهم لحديثنا. (اصول كافى ج/٣. صفحہ/٣١٧)

অর্থাৎ, খোদার কসম! আমার সহচরদের (শাগরেদ ও মুরীদদের) মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সেই, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরহেযগার এবং আমাদের কথা বেশি গোপন রাখে।

---

১. "নাছেবী" শীআদের পরিভাষায় একটা ধর্মীয় গালী। তাদের মতে যে ব্যক্তি আবূ বকর ও ওমরকে খলীফা বলে মানে এবং শীআগণ হযরত আলী (রা.)-এর জন্য যে ধরনের ইমামতে বিশ্বাস রাখে অনুরূপ বিশ্বাস না রাখে সে হল নাছেবী; যদিও সে হযরত আলী (রা.)-কে সত্য খলীফা বলে জানে। আল্লামা মজলিসী 'হাক্কুল ইয়াকীন' (حق اليقين) গ্রন্থে লিখেছেন যে, তাদের মতে আখেরাতে নাছেবীদের পরিণতি তা-ই হবে, যা কাফেরদের হবে। অর্থাৎ, তারাও জাহান্নামে অনন্তকাল আযাব ভোগ করবে। (২১১ পৃষ্ঠা) কুলাইনীর 'আর রওযা' গ্রন্থে আছে, নাছেবীদের জন্য কারও শাফাআতও কবূল হবে না। (৪৯ পৃ.)

কিতমান ও তাকিয়্যা কোন্ প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে?

কারও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই এবং এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, হযরত আলী মুর্তযা (রা.) থেকে শুরু করে শীআদের একাদশতম ইমাম হাসান আসকারী পর্যন্ত কোন ইমাম মুসলমানদের কোন বড় সমাবেশে ইমামতের বিষয়টা উত্থাপন করেননি। হজ্জ উপলক্ষে মুসলমানদের বিশ্বজনীন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুসলিম-বিশ্বের প্রতিটি কোন্ থেকে মুসলমানগণ আগমন করেন। এতে কোন ইমাম কর্তৃক ইমামতের বিষয় বর্ণনা করার কথাও কার জানা নেই। এমনিভাবে দুই ঈদের সমাবেশ ও জুমুআর সমাবেশে বিভিন্ন অঞ্চল ও শহরের মুসলমানগণ সমবেত হয়। মুসলমানদের এমনি ধরনের কোন সম্মেলনে কোন ইমাম ইমামতের মসআলাটা বর্ণনা করেননি, যা শীআ মাযহাবে তাওহীদ ও রেসালাতের আকীদার মতই ধর্মের ভিত্তি এবং নাজাতের শর্ত। শীআদের কোন ইমাম এ ধরনের কোন সমাবেশেও ইমামত দাবী করেননি। এবং সাধারণ মুসলমানকে তা কবূল করার এবং তার ভিত্তিতে বাইআত করার দাওয়াতও দেননি। বরং এর বিপরীতে স্বয়ং হযরত আলী মুর্তযার কর্মপন্থা খলীফাত্রয়ের চব্বিশ বছরকালীন খেলাফত আমলে এই দেখা গেছে যে, অন্য সকল মুসলমানের ন্যায় তিনিও তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর পরে হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রা.) হযরত মুআবিয়ার খেলাফত আমলে কখনও কোন সমাবেশে নিজেদের ইমামত দাবী ও ঘোষণা করেননি এবং তাঁর পিছনে ও তাঁর নিযুক্ত ইমামের পিছনে সকলের সামনে নামায পড়েছেন। ইছনা আশারী অবশিষ্ট সকল ইমামের (চতুর্থ ইমাম জয়নুল আবেদীন থেকে শুরু করে একাদশতম ইমাম হাসান আসকারী পর্যন্ত সকলের) এহেন আচরণ সকলের জানা আছে। ইমামগণের এই উপর্যুপরি কর্মপন্থা শীআ মাযহাবের ভিত্তি ও বুনিয়াদ তথা ইমামত বাতিল ও অমূলক হওয়ার এমন উজ্জ্বল প্রমাণ যে, এর চেয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ ও সাক্ষ্য কল্পনাও করা যায় না। তাই ইমামত-আকীদা ও শীআ মাযহাবকে রক্ষা করার জন্য তাকিয়্যা ও কিত্‌মান আকীদা রচনা করেছে। তারা এই বলতে বাধ্য হয়েছে যে, আমাদের ইমামগণের প্রতি স্বয়ং আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ ছিল যে ইমামত-আকীদা প্রকাশ করবে না, একে গোপন রাখবে, অর্থাৎ, কিত্‌মান করবে। তাই তাঁরা ইমামত-আকীদা সাধারণ মুসলমানের সামনে এবং জনসমাবেশে বর্ণনা করেননি। একই কারণে তারা সারা জীবন নিজেদের বিবেক ও আকীদার বিপরীত আমল করতে থাকেন।[১]

৩. প্রায়শ্চিত্তের আকীদা

শীআদের প্রায়শ্চিত্তের আকীদা (عقيدۂ كفاره) হুবহু খৃষ্টানদের প্রায়শ্চিত্ত আকীদার অনুরূপ। আল্লামা বাকের মজলিসী ইমাম জা'ফর ছাদেকের বিশেষ মুরীদ মুফাসসাল ইবনে ওমরের এক প্রশ্নের জওয়াবে বলেন,

---

১. ইরানী ইনকিলাব।

"হে মুফাসসাল! রসূলে খোদা দুআ করেছেন-"হে খোদা, আমার ভাই আলী ইবনে আবী তালেবের শীআ এবং আমার সেই সন্তানদের শীআ যারা আমার ভারপ্রাপ্ত-তাদের অগ্রপশ্চাৎ কেয়ামত দিবস পর্যন্ত সময়ের সকল গোনাহ্ আপনি আমার উপর চাপিয়ে দিন এবং শীআদের গোনাহের কারণে পয়গম্বরগণের মধ্যে আমাকে অপমানিত করবেন না।" এ দুআর ফলস্বরূপ আল্লাহ তাআলা সকল শীআর গোনাহ্ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন, অতঃপর সেই সকল গোনাহ্ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কারণে মার্জনা করেছেন। (হাক্কুল ইয়াকীন, ১৪৮ পৃ.)

এরপর এ রেওয়ায়েতেই আরও আছে- মুফাসসাল প্রশ্ন করল- যদি আপনাদের শীআদের মধ্য থেকে কেউ এ অবস্থায় মারা যায় যে, তার যিম্মায় কোন মুমিন ভাইয়ের কর্জ থাকে, তবে তার কী পরিণতি হবে? ইমাম জা'ফর ছাদেক বললেন, যখন ইমাম মেহ্দী আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন সর্বপ্রথম সারা বিশ্বে এই ঘোষণা করবেন যে, আমাদের শীআদের মধ্যে যদি কারও যিম্মায় কারও কর্জ থাকে, তবে সে আসুক এবং আমার কাছ থেকে উসূল করুক। অতঃপর তিনি সকল কর্জদারদের কর্জ আদায় করবেন। (১৪৮ পৃ.)

শীআদের সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহ্র ফতওয়া

যদি কোন লোক হযরত আলী (রা.)কে অন্য সমস্ত সাহাবী থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, যেমন তাফযীলিয়া শীআগণ বলে থাকেন, তাহলে এতটুকু বিশ্বাসের কারণে সে কাফের হয়ে যায় না। কিন্তু বর্তমানকালে শীআ সম্প্রদায় সাহাবায়ে কেরামকে কাফের বলা, কুরআনকে বিকৃত বলা, ইমামতের আকীদার মাধ্যমে খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করা, প্রভৃতি নানাবিধ কারণে কাফের আখ্যায়িত হবে। আহসানুল ফাতাওয়া গ্রন্থকার বলেন, "বর্তমান কালের শীআ সম্প্রদায়ের আকীদা কুফ্রী- এতে কোনো সন্দেহ নেই।"

ইসমাঈলিয়া শীআ

ইমামিয়া শীআদের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হল ইসমাঈলিয়া শীআ। বিভিন্ন মুসলিম দেশে এদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা, সিরিয়া ও পাকিস্তানে এদের কিছু সংখ্যক লোক দেখা যায়। হিন্দুস্তানে এদের সংখ্যা প্রচুর। এই ফিরকা ইসমাঈল ইব্নে জা'ফর ছাদেক ইব্নে বাকের-এর দিকে সম্পৃক্ত। ইছনা আশারিয়াগণ জা'ফর ছাদেকের পর তার ছোট পুত্র মূসা কাযেমকে ইমাম মানেন। কিন্তু ইসমাঈলী সম্প্রদায় জা'ফর ছাদেকের পর তার বড় পুত্র ইসমাঈলের ইমামত এবং ইসমাঈলের পর তার পুত্র মুহাম্মাদ আল- মাক্তূমের ইমামতে বিশ্বাসী।

ইসমাঈলিয়া শীআদেরকে "বাতিনিয়া"ও বলা হয়। কারণ, তাদের মতে ইমাম অধিকাংশ সময় বাতিন বা গোপন থাকেন। একমাত্র ক্ষমতা অর্জন হওয়ার সময় তারা

আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। "বাতিনিয়া" নামকরণের আর একটা রহস্য এই যে, তাদের আকীদা হল শরীআতের একটা জাহির এবং একটা বাতিন থাকে। সাধারণ লোকেরা জাহির সম্বন্ধে অবগত থাকেন আর ইমামগণ জাহির বাতিন সবটা সম্বন্ধে অবগত থাকেন। ইছনা আশারিয়া শীআরাও এ আকীদায় একমত।[১]

যায়দিয়া শীআ

ইমামিয়া শীআদের তৃতীয় বৃহত্তম দল হল "যায়দিয়া"। এরা যায়েদ ইব্নে আলী ইব্নে হুসাইন ইব্নে আলী (রা.)-এর দিকে সম্পৃক্ত। হযরত আলী মুর্তযা থেকে নিয়ে চতুর্থ ইমাম আলী ইব্নে হুসাইন পর্যন্ত ব্যক্তিবর্গের ইমামত সম্পর্কে তারা এবং ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায় একমত। এরপর ইছনা আশারিয়াগণ তার পুত্র ইমাম বাকেরকে ইমাম মানেন এবং তার পরে তার বংশধরের মধ্য থেকে আরও সাতজনকে ইমাম মানেন। কিন্তু যায়দিয়াগণ ইমাম আলী ইব্নে হুসাইন অর্থাৎ, ইমাম জয়নুল আবেদী-নর দ্বিতীয় পুত্র যায়েদ শহীদকে ইমাম মানেন। অতঃপর তারই আওলাদ ও বংশের মধ্যে ইমামত অব্যাহত থাকার বিশ্বাস রাখেন। এ ছাড়া দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে ইমামের মান ও মর্তবা সম্পর্কেও কিছু মতভেদ আছে।

প্রথম দিকে "যায়দিয়া" সম্প্রদায় আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কাছাকাছি সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য হত। তারা কোন সাহাবীর তাকফীর করত না। তবে পরবর্তী-তে অধিকাংশ "যায়দিয়া"-র আকীদা-বিশ্বাস ইছনা আশারিয়াদের ন্যায় হয়ে যায়। বর্তমানে সহীহ আকীদা-বিশ্বাস সম্পন্ন "যায়দিয়া" ইয়ামান প্রভৃতি দেশে কিছু সংখ্যক পাওয়া যায়।

জাব্রিয়া

(الجبرية)

"জাব্রিয়া" মতবাদ (Fatalism বা অদৃষ্টবাদ) কাদ্রিয়া দলের মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। জাব্রিয়া দলের মতবাদ অনুসারে ঘটমান সবকিছুই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পূর্বেই নির্ধারিত এবং সে নির্ধারণ অনুযায়ী সবকিছু সংঘটিত হয়। এ ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছার কোনো দখল নেই। আর যেহেতু সকল জিনিসই আল্লাহ্র হুকুমের অনুগত, সেহেতু কোনো জিনিসই মানুষের ইচ্ছায় পরিবর্তিত হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত। তাই ভবিষ্যত ঘটনাবলী শুরু থেকেই আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ীই নির্ধারিত হয়ে আছে। জাব্রিয়াদের মতে বান্দার ক্রিয়াকলাপ তাদের নিজেদের ইচ্ছাধীন নয়, বরং ইচ্ছা-অনিচ্ছা সবই আল্লাহ্র ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ, বান্দার কৃত সব ক্রিয়াকলাপই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র কর্ম। জাব্রিয়া মতবাদটা কাদ্রিয়া মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। কাদ্রিয়া মতবাদে বান্দাকে তার নিজ কর্মের স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্তা ও সংঘটনকর্তা বলে স্বীকার করা হয়। পক্ষান্তরে জাবরিয়া মতবাদ অনুসারে বান্দাকে তার নিজ ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে পূর্ণ বাধ্যবাধকতার অধীন মনে করা হয়।

১. ماخوذاز ردشیعیت/ جناب مولنا محمد جمال صاحب استاد تفسیر دار العلوم دیوبند وتاریخ المذاهب الاسلامیة. ابوزهره

জাব্‌রিয়াদের মৌলিক শ্রেণী

জাব্‌রিয়াদের মৌলিক দুটো শ্রেণী। একটা পরিপূর্ণ জাব্‌র বা বাধ্যবাধকতার প্রবক্তা। তাদেরকে বলা হয় খালেস জাব্‌রিয়া (الجبرية الخالصة)। তাদের মতে মানুষ এবং জড় বস্তুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এরা জাব্‌রিয়াদের মধ্যে কট্টরপন্থী বলে পরিচিত। অপর একটা শ্রেণী রয়েছে যাদেরকে জাব্‌রিয়া মুতাওয়াস্‌সিতা (الجبرية المتوسطة) বা মধ্যপন্থী জাব্‌রিয়া বলা হয়। এ দলটা একথা স্বীকার করে যে, বান্দার মধ্যে কাজ করার শক্তি-সামর্থ আছে, কিন্তু একথা স্বীকার করে না যে, এই শক্তি কর্মের ওপর কোনোও প্রভাব ফেলতে পারে বা কর্মে ব্যয়িত হতে পারে। এ দলটা কাছ্‌ব (كسب/কাজ করার শক্তি)-এর কথা স্বীকার করলেও জাব্‌র-এর আওতা থেকে বের হতে পারেনি। কারণ, এই কাছ্‌ব-এর অর্থের মধ্যে জাব্‌র বিরুদ্ধ কোনো বিষয় নেই।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত যদিও একথা স্বীকার করে যে, বান্দার ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত সকল ক্রিয়াকলাপই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত ও বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথারও প্রবক্তা যে, বান্দা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আংশিক ইচ্ছা শক্তিকে সকল কাজে ব্যবহার করতে পারে।

জাব্‌রিয়াদের উপদল

কোন কোন লেখকের মতে নিম্নোক্ত দলগুলো জাব্‌রিয়াদের উপদল।

১. নাজ্জারিয়া (النجارية): এরা হুসাইন ইব্‌নে মুহাম্মাদ আন-নাজ্জার (মৃত ২৩০ হি.) এর অনুসারী। হুসাইন-এর অনুসারী হওয়ার কারণে কেউ কেউ এদের নাম "হুসাইনিয়া" বলে থাকেন।

২. দিরারিয়াহ্‌ (الضرارية): এরা দিরার ইব্‌নে আম্‌র ও হাফ্‌স আল-ফর্‌দ এর অনুসারী।

৩. কুল্লাবিয়া (الكلابية)

কারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব সাহেবের মতে জাবরিয়্যাহ একটা স্বতন্ত্র দল এবং জাব্‌রিয়াদের উপদলসমূহ নিম্নরূপ:

১. মুজতার্‌রিয়্যাহ (مضطرية)	২. আফআলিয়্যাহ (افعالية)
৩. মাইয়্যাহ (معية)	৪. মা'যুবিয়্যাহ (معزوية)
৫. মাজাযিয়্যাহ (مجازية)	৬. মুতমাইন্নাহ (مطمئنة)
৭. কাছলিয়্যাহ (كسلية)	৮. সাবিকিয়্যাহ (سابقية)
৯. হাবীবিয়্যাহ (حبيبية)	১০. খাওফিয়্যাহ (خوفية)
১১. ফিক্‌রিয়্যাহ (فكرية)	১২. হাস্‌সাসিয়্যাহ (حساسية)

আল-মিলাল ওয়ান নিহাল গ্রন্থকার-এর বর্ণনামতে জাহ্‌মিয়া দলটা জাবরিয়াদেরই অন্তর্ভুক্ত।

জাব্‌রিয়্যাদের মৌলিক আকীদাসমূহ

কারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব সাহেব (রহ.)-এর মতে জাব্‌রিয়্যাদের মৌলিক আকীদা সমূহ নিম্নরূপ:

১. মানুষ পাথর ও জড়পদার্থের মত নিষ্ক্রীয় বা বাধ্যবাধকতার আওতাধীন। যাদের নিজ কর্মে কোনো ইচ্ছা বা স্বাধীন ক্ষমতা নেই। ফলে তাদের ছওয়াব বা শাস্তি কোনো কিছুই হবে না।

২. সম্পদ আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয় বস্তু।

৩. আল্লাহ কর্তৃক তাওফীক বান্দার ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার পর হয়ে থাকে।

৪. তারা শারীরিক মেরাজকে অস্বীকার করে।

৫. তারা রূহানী জগতে আল্লাহ কর্তৃক অঙ্গীকার গ্রহণের বিষয়কে অস্বীকার করে।

৬. তারা জানাযা নামায ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে।

কাদ্‌রিয়া সম্প্রদায়

(القدرية)

নাম

এই সম্প্রদায়টির নাম কাদরিয়া। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কাদরিয়া এবং মুতাযিলা একই সম্প্রদায়ের নাম। 'আল-মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থের রচয়িতা শাহ্‌রাস্‌তানী (রহ.) এবং 'আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক' গ্রন্থের রচয়িতা আবদুল কাহের আল-বাগদাদী (রহ.)ও অনুরূপ মত পোষণ করেন।

শাহ্‌রাস্‌তানী (রহ.) বলেছেন,[১] এরা নিজেদেরকে "আসহাবুল আদ্‌ল ওয়াত তাওহীদ" নামে পরিচয় দেয়। আবার কাদরিয়া ও আদ্‌লিয়্যা উপাধিতেও স্মরণ করে। বিপুল সংখ্যক আলিম মুতাযিলা সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র মাযহাব হিসাবে গণ্য করেন, তারা তাদেরকে কাদরিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না। তাছাড়া এই উভয় সম্প্রদায়ের উদ্ভবগত প্রেক্ষাপট এবং প্রতিষ্ঠাতাও এক নয়। যেমন মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইব্‌নে আতা (واصل بن عطا) আর কাদরিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হল সীস্‌ওয়াহ্‌ (سيسوية)। তবে এখানে এমন কিছু আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারাও আছে যেগুলো উভয় সম্প্রদায়ই সমানভাবে পোষণ করে। তাই কেউ যদি এসব আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে এ উভয় সম্প্রদায়কে একই সম্প্রদায় মনে করেন তাহলে তার অবকাশ আছে।

নামকরণ রহস্য

ইমাম আবূ যোহ্‌রা (রহ.) বলেছেন,[২] এ সম্প্রদায়টিকে 'কাদরিয়া' শব্দে নামকরণ করায় অনেক ঐতিহাসিকও বিস্ময়াভিভূত হয়েছেন। কারণ, তারা 'কদর'কে অস্বীকার

১. الملل ولنحل. مصر. ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م ج/١. صفحه/٤٠

২. تاريخ المذاهب الإسلامية. دار الفكر العربي . ج/١. صفحه/ ١١٢

করে। তাহলে তারাই আবার কাদরিয়া হল কী করে? কেউ কেউ বলেছেন, কোন সম্প্রদায়কে তাদের দাবীর বিপরীত শব্দে নাম রাখতেও কোন বাধা নেই। অনেক বস্তুরই তো বিপরীতার্থক শব্দ দিয়ে নাম রাখা হয়। ইব্‌নে কুতায়বা (রহ.) ও ইমামুল হারামাইন (রহ.) বলেছেন,[১] হকপন্থী মুসলমানগণ তাদের কাজ-কর্মসহ সকল বিষয়ের উৎস আল্লাহ তাআলাকেই মনে করে থাকে। মনে করে থাকে, সবকিছু তাঁরই পক্ষ থেকে। অথচ ওই মূর্খরা (কাদরিয়া সম্প্রদায়) নিজেদের সকল কর্মকাণ্ডের উৎস মনে করে থাকে নিজেদেরকেই। অতএব যারা কোন কিছুকে নিজেদের দিকে সম্পৃক্ত না করে বরং নিজেদেরকে তা থেকে আলাদা করে নেয় এবং অন্যের দিকে সেটাকে সম্পৃক্ত করে, তাদের তুলনায় যারা কোন কিছুকে নিজেদের দিকে সম্পৃক্ত করে এবং নিজেদেরকেই সেটার স্রষ্টা বলে তাদেরকেই সে নামে অভিহিত করা উত্তম। আর এই দুই মনীষী একথা তখনই বলেছেন যখন কোন কোন কাদরিয়া দাবী করে বসে, আমরা কাদরিয়া নই বরং তোমরাই কাদরিয়া; কেননা, তোমরাই 'কদর'য়ে বিশ্বাসী। আবার কোন কোন লেখক এও বলেছেন, মূলত এদেরকে এ নামটা তাদের বিরোধীরাই দিয়েছে, যাতে তাদের সম্পর্কে القدرية مجوس هذه الأمة (কাদরিয়া সম্প্রদায় এই উম্মতের মাজূসী।) হাদীছটি যথাযথভাবে প্রযোজ্য হতে পারে।

উৎপত্তি ও প্রেক্ষাপট

এই সম্প্রদায়ের উদ্‌ভব ঘটে সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে খোলাফায়ে রাশেদার শেষ আমলে এবং উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিকে। 'ফাত্‌হুল মুলহিম' গ্রন্থকার বলেছেন, কথিত আছে, কা'বা শরীফে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম এ ফিৎনার সূচনা হয়। তখন জনৈক ব্যক্তি মন্তব্য করে, احترقت بقدر الله অর্থাৎ, এটা আল্লাহর ইচ্ছায় (قدر অনুসারে) ঘটেছে। অন্যরা বলে لم يقدر الله هذا অর্থাৎ, আল্লাহ্ এরূপ পরিকল্পনা নিতে পারেন না। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কাদরিয়া মতবাদটা ছড়িয়ে পড়ে। অথচ খোলাফায়ে রাশেদার যুগে কোনো ব্যক্তিই তাকদীরকে (قدر) অস্বীকার করত না।

প্রতিষ্ঠাতা

শাইখুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়া (রহ.) তদীয় গ্রন্থ 'শরহুল ঈমান"য়ে বলেছেন,[২] বসরার অধিবাসী এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম ইরাকে এই মতবাদের সূচনা করে। অগ্নিপূজক বংশোদ্ভূত এ লোকটির নাম হল সীস্‌ওয়াহ (سيسوية)! আল্লামা আত-তূফী (الطوفى) (রহ.) شرح تائية شيخ الإسلام ابن بيمية গ্রন্থে লিখেছেন– কাদরিয়া সম্মপ্রদায়ের এই

১. فتح الملهم. ج/١. بجنور. الهند. صفحه/١٦٠
২. فتح الملهم. ج/١. بجنور. الهند. صفحه/١٦٠

উদ্ভাবকের নাম সুসান (سوسن)। সিররুল উয়ূন গ্রন্থে (পৃ. ২২) আছে,[১] কাদ্‌রিয়া মতবাদ বিষয়ে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কথা তোলে সে হল ইরাকের এক খৃষ্টান। তারপর সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং পুনরায় খৃষ্টান হয়ে যায়।

'الملل والنحل' গ্রন্থের টীকায় এবং الموسوعة الميسرة কিতাবে আছে[২] যে, মা'বাদ আল-জুহানী (معبد الجهني) এই মতবাদ গ্রহণ করে বসরা অধিবাসী আসাভিরা নামক একটা প্রাচীন সম্প্রদায়ের জনৈক খৃষ্টানের কাছ থেকে। তার নাম আবূ ইউনুস সান্‌সও-য়াহ্ বা সুসান (سنسوية/سوسن) আর এক বর্ণনায় মা'বাদ ইব্‌নে খালিদ আল-জুহানী ও গায়লান দামেশকী উভয়ে সান্‌সওয়ায়হ থেকে এই মতবাদ গ্রহণ করে। আর এক বর্ণনায় মা'বাদ ইব্‌নে খালিদ আল-জুহানী থেকে গ্রহণ করে গায়লান আদ-দামেশ্‌কী। তার দ্বারা এই চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়ে। বসরায় প্রচার লাভ করে মা'বাদের মাধ্যমে। আর এ কারণেই মুসলিম শরীফের কিতাবুল ঈমানের প্রারম্ভে বর্ণনা এসেছে যে, বসরায় 'কদর' সম্পর্কে সর্বপ্রথম কথা তুলেছে মা'বাদ আল-জুহানী। সে-ই সমগ্র ইরাকে এর প্রচার কার্য পরিচালনা করে। আর গায়লান আদ-দামেশকী এই চিন্তাধারার প্রচার চালায় দামেশকে।

কাদরিয়া সম্প্রদায়ের দল-উপদলসমূহ

আল্লামা আব্দুল কাহের আল-বাগদাদী (রহ.) 'আল-ফার্‌কু বাইনাল ফিরাক' গ্রন্থে কাদরিয়া সম্প্রদায়ের ২২টা দল-উপদলের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে দুটো হল জঘন্য কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে শাহ্‌রাস্‌তানী বলেছেন, কাদরিয়া সম্প্রদায় মোট ১২ দলে বিভক্ত। তিনি কিছু কিছু ফিরকার কথা উল্লেখ করেননি আবার এক প্রকারকে অন্য প্রকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্তও করে দিয়েছেন। বর্ণিত ফিরকা বা প্রকারগুলো হল নিম্নরূপ:

১. ওয়াসিলিয়্যাহ্ (الواصلية)[৩]
২. আল-'আম্‌রাবিয়্যাহ্ (العمروية)[৪]
৩. আছ-ছুমামিয়্যাহ্ (الثمامية)[৫]

১. تاريخ المذاهب الإسلامية. دار الفكر العربي. ج/١. صفحه/٢٢
২. الملل والنحل. مصر. ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م ج/١. صفحه/٣٣
৩. এই ফিরকার অনুসারীরা মূলত ওয়াসিল ইব্‌নে আতার অনুসারী। আর ওয়াসিল হল মুতাযিলা ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা এবং মা'বাদ আল-জুহানী ও গায়লান আদ-দামেশকীর পর সেই হল এই ফিরকার দা'ঈ বা প্রচারক। মৃত্যু-সন ১৩১ হি.।
৪. এই ফিরকার অনুসারীরা হল বনূ তামীমের আযাদকৃত গোলাম (مولي) আম্‌র ইব্‌নে উবায়দ ইব্‌নে বাব-এর অনুসারী। শাহ্‌রাস্‌তানী অবশ্য এদেরকে প্রথম ফিরকা (الواصليه)-এর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
৫. এরা হল ছুমামা ইব্‌নে আশরাস আন-নুমাইরী-র শিষ্য। ছুমামা বাদশা মামূন, মু'তাসিম ও ওয়াসিক বিল্লাহ'র শাসনামলে একজন গোত্রপতি ছিলেন। কথিত আছে, এই ছুমামা-ই বাদশাহ মামূনুর রশীদকে আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন এবং মুতাযিলা হওয়ার প্রতি আহবান করেছিলেন। তার মৃত্যু-সন ২১৩ হি.।

৪. আল-মারিসিয়্যাহ্ (المريسية)[১]
৫. আল-মা'মারিয়্যা (المعمرية)[২]
৬. আন-নাজ্জামিয়্যা (النظامية)[৩]
৭. আল-হিশামিয়্যা (الهشامية)[৪]
৮. আল-মিরদারিয়্যা (المردارية)[৫]
৯. আল-জা'ফারিয়্যা (الجعفرية)[৬]

---

১. 'মুরজিয়ায়ে বাগদাদ' নামে পরিচিত এই দলটা হল বিশ্‌র আল-মারিসির অনুসারী। ইসলামী ফিক্‌হ এর ক্ষেত্রে বিশ্‌র অনুসরণ করতেন হযরত ইমাম কাযী আবূ ইউসুফ (রহ.)কে। তারপর তিনি যখন কুরআন মাখলূক (القران مخلوق) এই মর্মে রায় প্রকাশ করলেন, তখন ইমাম আবূ ইউসুফ তাকে বর্জন করেন। শাহ্‌রাস্‌তানী অবশ্য কাদরিয়াদের সাথে এদের কথা আলোচনা করেনি-ন। তবে আব্দুল কাহের আল-বাগদাদী (রহ.) "আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক্ব" গ্রন্থে এদেরকে কাদ্‌রিয়া নয়-এমন মুর্‌জিয়াদের সাথে উল্লেখ করেছেন।

২. এটা হল মা'মার ইব্‌নে আব্বাদ আস-সালামীর অনুসারী দল। তিনি ছিলেন 'মুল্‌হিদ' শ্রেণীর মাথা এবং কাদ্‌রিয়াদের লেজুড় স্বরূপ। এ অভিমত আবদুল কাহের বাগদাদীর। তিনি মৃত্যুবরণ করেন হিজরী ২২০ সালে।

৩. নাজ্জাম নামে পরিচিত আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌নে সাওয়ার এর অনুগত দল এটা। আবূ ইসহাকও দার্শনিক (فلا سفه)দের মত (جزء لا يتجزى বা অবিভাজ্য অণু) অস্বীকার করতেন। তিনি দার্শনিকদের প্রচুর গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন। তার পর দার্শনিকদের বিভিন্ন মত ও দর্শনকে মুতাযিলাদের মত ও দর্শনের সঙ্গে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বসরায় তসবীর দানা গাঁথার কাজ করতেন বিধায় 'নাজ্জাম' (অর্থাৎ, যে দানা শৃংখলিত করে) নামে পরিচিত হয়ে পড়েন। হিজরী ২২১ এবং ২২৩ এর মধ্যবর্তীকালে মৃত্যুবরণ করেন। আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল এর টীকার বর্ণনামতে তার মৃত্যুকাল ২৩১ হি.।

৪. এরা মূলত হিশাম ইব্‌নে উমার আল-ফুয়াতী আশ-শাইবানী (هشام بن عمر الفوطي الشيباني)-এর অনুসারী। তাকদীর বিষয়ে অন্যান্য সঙ্গীদের তুলনায় তার বাড়াবাড়িটা ছিল পরিমাণে বেশি এবং মাত্রায় তীব্র। তার মৃত্যু-সন ২২৬ হি.।

৫. এই দলের নেতা হল ঈসা ইব্‌নে সাবীহ্। উপনাম আবূ মূসা। উপাধি মিরদার। তাকে মুতাযিলা ফিরকার রাহেব বা বৈরাগী বলা হত। নাজ্জাম মুতাযিলী-র ন্যায় তিনিও মনে করতেন মানুষ চাইলে কুরআনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করতে পারে। বরং তার চেয়ে উচ্চ সাহিত্যমান সম্পন্ন গ্রন্থ রচনা করতে পারে। তিনি ২২৬ হিজরী সালের শেষ দিকে মৃত্যুবরণ করেন।

৬. এরা হল জা'ফর ইব্‌নে হার্‌ব আছ-ছাকাফী ও জা'ফর ইব্‌নে মুবাশশির আল-হামদানীর অনুসারী। আর এরা উভয়-ই পূর্বে উল্লেখিত মির্‌দার-এর শিষ্য। এদের মধ্যে জা'ফর ইব্‌নে হারব তো ভ্রান্তি ও গোমরাহীর ক্ষেত্রে স্বীয় উস্তাদ মিরদারের পথকেই অবলম্বন করেছেন। তবে সেই সঙ্গে আরও নতুন কিছু যুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে জা'ফর ইব্‌নে মুবাশশির মনে করতেন এই উম্মতের যারা ফাসেক তারা ইয়াহূদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক ও যিনদীক বা ধর্মত্যাগীদের চেয়েও মন্দতর। অথচ তিনি বলতেন, ফাসেক মুওয়াহ্‌হিদ তবে মুমিন নয় এবং কাফেরও নয়। তার ধারণামতে মদ্যপায়ী-কে দোর্‌রা মারার বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের (রা.) ইজমা' ছিল ভুল। কারণ, তাঁরা নিজেদের রায়ের ভিত্তিতেই এ বিষয়ে ঐক্যমত্য করেছিলেন। জা'ফর ইব্‌নে হার্‌ব মৃত্যুবরণ করেন ২৩৪ হি. সালে আর জা'ফর ইব্‌নে মুবাশ্‌শির মৃত্যুবরণ করেন ২৩৬ হি. সালে। শাহ্‌রাসতানী এই দলটার কথা আলোচনা করেননি।

১০. আল-ইসকাফিয়্যা (الإسكافية)[১]
১১. আল- হুযালিয়্যা (الهذلية)[২]
১২. আল-আসওয়ারিয়্যা (الأ سوارية)[৩]
১৩. আশ-শাহ্‌হামিয়্যা (الشهامية)[৪]
১৪. আল-জুববাইয়্যা (الجبائية)[৫]
১৫. আল-বাহ্‌শামিয়্যা (البهشمية)[৬]
১৬. আল-খাবিতিয়্যা (الخابطية)[৭]

---

১. এরা হল আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌নে আবদুল্লাহ আল-ইসকাফীর অনুসারী। তিনি কদর সংক্রান্ত গোমরাহীটা পেয়েছেন জা'ফর ইব্‌নে হার্‌ব থেকে। তারপর প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু বিষয়ে তার বিরোধিতাও করেছেন। ইসকাফীর ধারণাপ্রসূত আকীদাবলীর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলা যাদের আকল-বুদ্ধি নেই যেমন: শিশু, পাগল প্রভৃতিকে জুলুম করতে সক্ষম কিন্তু আকল ও বিবেক সম্পন্নদেরকে জুলুম করতে সক্ষম নন। তার মৃত্যু হয় ২৪০ হিজরীতে। শাহ্‌রাসতানী এই দলটার কথা উল্লেখ করেননি।

২. আবুল হুযায়ল মুহাম্মাদ ইবনুল হুযায়ল এর অনুসারী এরা। এরা "আল্লাফ" নামেই সমাধিক পরিচিত ছিল। আবদুল কায়সের আযাদকৃত গোলাম এবং বসরা-র মুতাযিলাদের শায়খ আবুল হুযায়ল 'আল্লাফ'-এর নামেই তাদের এই পরিচিতি গড়ে ওঠে। তার মৃত্যুকাল হি. ২২৬।

৩. এ দলটা আলী আল-আসওয়ারীর অনুসারী। আল আসওয়ারী ছিলেন আবুল হুযায়লের অনুগত একজন। পরে তিনি নাজ্জাম–এর দলে চলে যান। শাহ্‌রাস্‌তানী এ দলটার নামও উল্লেখ করেননি।

৪. এরা হল আবূ ইয়া'কূব ইউসুফ ইব্‌নে আবদুল্লাহ ইব্‌নে ইসহাক আশ-শাহ্‌হাম এর অনুসারী। আবুল হুযায়লের শিষ্য এই আবূ ইয়া'কূবই ছিলেন বসরার মুতাযিলাদের সমকালীন নেতা। শাহ্‌রাসতানী এই দলটার কথাও উল্লেখ করেননি।

৫. আবূ আলী মুহাম্মাদ ইব্‌নে আবদুল ওয়াহাব ইব্‌নে সালাম আল-জুব্বাঈ'র অনুসারী এরা। খূযিস্তানের অধিবাসীকে তিনিই গোমরাহ করেছিলেন। বসরা ও আহ্‌ওয়াযের দিকে খূযিস্তানের একটি শহরের নাম হল জুব্বী। সেই অঞ্চলের বাসিন্দা বলেই তাকে আল-জুব্বাঈ বলা হত এবং তিনি ছিলেন 'আল- বাহ্‌শামিয়্যা' দল-প্রধানের পিতা।

৬. এটা হল আবূ আলী মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহাব আল-জুব্বাঈ'র পুত্র আবু হাশিম আবদুস সালাম আল-জুব্বাঈ'র অনুসারী দল। শাহরাসতানী এটাকে পুর্বোক্ত (الجبائية) দলের সঙ্গে সংমিশ্রিত করে ফেলেছেন। তবে আবূ হাশিম বেশ কিছু বিষয়ে তার পিতার বিরোধিতা করেছেন, যেমনটি তার পিতা তদীয় উসতাদ আবুল হুযায়লের সঙ্গে করেছেন। (দ্র. টীকা, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক) আবূ হাশিম ৩২১ হি. সনে মৃত্যুবরণ করেন। এ দলটা যেহেতু (استحقاق الذم لا على فعل) কাজ না করার কারণে তিরস্কৃত হওয়ার আকীদা পোষণ করে, তাই তাদেরকে "আয্‌ যাম্মিয়া" (الذمية) ও বলা হয়।

৭. নাজ্জাম মুতাযিলীর শিষ্য আহমদ ইব্‌নে খাবিত-এর অনুসারী এরা। আহমদ দার্শনিকদের গ্রন্থাবলী পড়াশোনা করেন। তার নতুন মতবাদের মধ্যে ছিল তানাসুখ (تناسخ) বা পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করা। "পুনর্জন্মবাদ" বলা হয় মানুষ মারা যাওয়ার পর তার প্রাণ (روح) পূর্ব আমল অনুপাতে বিভিন্ন আকৃতিতে পূনর্বার এই পৃথিবীতে আগমন করাকে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন الملل النحل ج/১ - । তিনি হযরত ঈসা (আ.)কে রব বলতেন। (পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রঃ)

১৭. আল-খাইয়্যাতিয়্যা (الخياطية)[১]
১৮. আল-কা'বিয়্যা (الكعبية)[২]
১৯. আল-বিশরিয়্যা (البشرية)[৩]
২০. আল-জাহিযিয়্যা (الجاحظيه)[৪]

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা)
খৃষ্টানদের মত তিনিও মনে করতেন যে, কেয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আ.) সকলের হিসাব নিবেন। বাগদাদী এবং শাহ্‌রাস্‌তানী এই দলটার সঙ্গে "হাদীছিয়্যা" দলকে যুক্ত করে ফেলেছেন। হাদীছিয়্যা হল ফজল আল-হাদাছীর অনুসারী দল। 'হাদীছা' ফুরাত নদীর তীরবর্তী একটি শহর। সেখানকার বাসিন্দা বলে 'ফজল'কে হাদাছী বলা হয়। তার চিন্তাধারা ছিল আহ্‌মদ ইব্‌নে খাবিতের চিন্তাধারার মত। আহমদ মৃত্যুবরণ করেন হি. ২৩২ সনে আর হাদাছী মৃত্যুবরণ করেন ২৫৭ সনে।

১. এটা হল আবুল হুসাইন আম্‌র আল-খাইয়্যাত-এর দল। এদেরকে মা'দূমিয়্যা (معدومية)ও বলা হয়। কারণ, তারা বাস্তব জগতের অনেক কিছুর কার্যক্ষমতা ও গুণাবলীকেই স্বীকার করেন না। তাছাড়া এই খাইয়্যাত খব্‌রে ওয়াহেদ (اخبار احاد) কেও শরীআতের দলীল হিসাবে স্বীকার করতেন না। তার মৃত্যু-সন ৩৩০ হি.।

২. আল-কা'বী নামে প্রসিদ্ধ আবুল কাসিম আবদুল্লাহ ইব্‌নে আহমদ ইব্‌নে মাহ্‌মূদ আল-বালাখী-'র অনুসারী দল এটা। কা'বী ছিলেন উপরোল্লিখিত আবুল হুসাইন আল-খইয়্যাত-এর ছাত্র। শাহ্‌রাসতানী এটাকে আল-খাইয়্যাতিয়্যার সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন। অথচ কা'বী বেশ কিছু বিষয়ে তার উস্তাদের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এমনকি তিনি اخبار احاد যে শরীআতের দলীল এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং যারা সেটাকে (خبر واحد কে) শরীআতের দলীল হিসাবে স্বীকার করেন না তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে প্রমাণ করেছেন। কা'বীর মৃত্যুকাল ৩১৯ হি.।

৩. বিশ্‌র ইবনুল মু'তামির এর দল এটা। বিশ্‌র ছিলেন মুতাযিলাদের সেরা আলেমদের একজন। তারা নানাবিধ ভয়ংকর চিন্তাধারা পোষণ করতেন। যেমন: কেউ যদি কবীরা গোনাহ করার পর তওবা করে পুনরায় কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয় তাহলে সে পূর্বে তওবাকৃত কবীরা গোনাহ'রও শাস্তি পাবে। তখন তাকে প্রশ্ন করা হল- আচ্ছা, যদি কোন কাফের তওবা করে মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় মদ পান করে এবং এ থেকে তওবা করার পূর্বেই মারা যায় তাহলে কি আল্লাহ তাআলা তাকে পূর্বের কুফ্‌রীর আযাব দিবেন? বললেন, হ্যাঁ! তখন তাকে বলা হল, তাহলে তো কাফেরদের শাস্তির মতই মুসলমানদের শাস্তি হয়ে গেল! কিন্তু তিনি তার মতে অবিচল থাকেন। তার মৃত্যু-সন হি. ৩২৬।

৪. এটা হল আম্‌র ইব্‌নে বাহ্‌র আবূ উছমান আল-জাহেযের দল। অন্যতম মুতাযিলা আলেম ও লেখক। আব্বাসী সাহিত্যের ইমাম ও পথিকৃত। তার ভাষা-বর্ণনা নিয়ে তার অনুসারীরা গর্ববোধ করত। দর্শনশাস্ত্রের প্রচুর গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করেন। তার প্রাঞ্জল ও শিল্প-সৌকর্যপূর্ণ ভাষায় দর্শন শাস্ত্রের প্রচুর বিষয় মিশ্রিত করে দিয়েছেন, প্রচার করেছেন। তার মুখাবয়ব ছিল কুশ্রি। (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা) এক্ষেত্রে বরং ছিলেন উপমা পুরুষ। এ গেল তার কুৎসিৎ আকৃতির বিবরণ। আর তার কুৎসিৎ চিন্তাধারার বিবরণ হল– তিনি মনে করতেন কোন বস্তু একবার সৃষ্টি হওয়ার পর তা ধ্বংস হওয়া অসম্ভব। (যা মূলত এ কথাকেই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করতে সক্ষম কিন্তু ধ্বংস করতে অক্ষম।) আবদুল কাহের বাগদাদী বলেছেন, (পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রঃ)

২১. আল-হিমারিয়্যা (الحمارية)[১]
২২. আসহাবু সালেহ্ কুব্বা (أصحاب صالح قبة)[২]

কাদরিয়্যা সম্প্রদায়ের মৌলিক চিন্তা ও আকীদা-বিশ্বাস

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ দলটার অনেক শাখা ও উপদল রয়েছে এবং প্রতিটা ফিরকা বা উপদলের-ই কিছু ভিন্নতর চিন্তা ও বিশ্বাস রয়েছে, যার আলোকে সে অন্যদল থেকে স্বতন্ত্র বলে বিবেচিত হয়। তবে এখানে এমন কিছু মৌলিক বিশ্বাস এবং চিন্তাও রয়েছে যা সমন্বিতভাবে প্রতিটা দলই ধারণ ও পোষণ করে থাকে, সবগুলো দলের মধ্যেই যা পাওয়া যায়। এমন চিন্তা ও আকীদা-বিশ্বাসগুলো নিম্নরূপ:

১. তারা আল্লাহ তাআলার অনাদি গুণাবলী (صفات ازليہ) যথা: ইল্‌ম, কুদরত, হায়াত, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদিকে অস্বীকার করেন। তারা বলেন, 'অনাদিগুণ' তথা সিফাতে আযালী বলে কিছু নেই। অধিকন্তু তারা এও বলেন, অনাদিকালে আল্লাহ তাআলার কোন নাম বা গুণই ছিল না।

(আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল– আল্লাহ তাআলা তার গুণাবলীসহ অনাদিকাল থেকেই বিদ্যমান আছেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবেন।)

২. তারা বলেন, মানুষের চোখে আল্লাহ তাআলাকে দেখা অসম্ভব। তাঁদের ধারণা হল- আল্লাহ তাআলা নিজেও দেখেন না এবং অন্য কেউও তাঁকে দেখেন না।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা) তার সম্পর্কে আহ্‌লুস-সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অভিমত কবির নিম্নোক্ত কবিতারই অনুরূপ। কবিতা-

لو يمسخ الخنزير مسخا ثانيا + ما كان إلا دون قبح الجاحظ
رجل يدل على الجحيم لو جهه + وهو القذى في عين كل ملاحظ

শূকরকে যদি পূনর্বার বিকৃত করা হয়
তবুও তার কদর্যতা জাহেযের চেয়ে হবে নিম্নতর।
সে এমন এক ব্যক্তি, চেহারাই তার জাহান্নামের পথ দেখায়,
আর সে হল সকল দর্শকের চোখের ময়লা।

তার জন্মও বসরায়, মৃত্যুও বসরায়। খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ ও মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ'র শাসনামলই তার আমল। মৃত্যু-সন ৮৬৮ খৃষ্টাব্দ।

১. এরা ম'তাযিলাদের-ই একটা গোষ্ঠী। তারা কাদরিয়্যাদের থেকে বিশেষ কিছু গোমরাহী গ্রহণ করেছে। যেমন: ইব্‌ন খাবিত থেকে পুনর্জন্মবাদ (تناسخ) দর্শনকে গ্রহণ করেছে। তাদের ধারণা, মানুষ কখনও কখনও বিভিন্ন রকম প্রাণীকে সৃষ্টি করে। যেমন: মাংসকে যখন মানুষ মাটির নিচে পুঁতে রাখে কিংবা সূর্যের তাপে রেখে দেয়, তখন তা থেকে নানা রকমের কীট সৃষ্টি হয়। তাদের ধারণা, মানুষই এসব কীটের সৃষ্টিকর্তা।

২. 'আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক' গ্রন্থের রচয়িতা এদেরকে কাদরিয়াদের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, তবে এদের কোন ব্যাখ্যা দেননি। তারপর মুরজিয়াদের আলোচনায় আবার এদেরকে উল্লেখ করেছেন এবং মুরজিয়াদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন, কাদরিয়্যা কিংবা জাবরিয়্যাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা অন্যকে দেখেন কি না এ বিষয়ে তাদের মধ্যেও মতবিরোধ আছে। তাদের একদল বলেন, দেখেন, আবার অন্য দল তা অস্বীকার করেন।

(আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল– দুনিয়াতেই মানুষের চোখে আল্লাহ তাআলাকে দেখা সম্ভব। পরকালে বেহেশ্‌তবাসীগণ আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাবেন। আর আল্লাহ তাআলার একটি অন্যতম গুণ হল তিনি বাছীর (بصير) বা সর্বদ্রষ্টা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন "আল্লাহ্‌র দীদার সম্বন্ধে আকীদা" শিরোনাম।)

৩. তারা এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ্ তাআলার 'কালাম' সৃষ্ট বা অনিত্ব (حادث)। তাঁর আদেশ, নিষেধ, সংবাদ সবই সৃষ্ট। তাদের সকলেরই ধারণা, আল্লাহর কালাম অনিত্ব (حادث) এবং সৃষ্ট (مخلوق)। বাগদাদী (মৃ. ৪২৯) বলেন, আজকাল তাদের অধিকাংশই বলেন, আল্লাহর কালাম মাখলূক বা সৃষ্ট।

(আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল– আল্লাহর কালাম মাখলূক নয়। দ: عقيدة الطحاوي)

৪. তাদের আকীদা হল মানুষ যেসব কাজ কর্ম করে আল্লাহ তাআলা সেগুলোর সৃষ্টিকর্তা নন। প্রাণী জগতের কারও কোন কাজেরও আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকর্তা নন। বরং মানুষের এসব অর্জন ও সমগ্র প্রাণীজগতের কর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার কোন হাত ও পরিকল্পনাই নেই। তারা মনে করেন– মানুষ নিজে নিজেই তাদের কাজ-কর্ম করতে সক্ষম। আর এ কারণেই মুসলমানগণ তাদের নাম দিয়েছেন "কাদ্‌রিয়া"।

(পক্ষান্তরে আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস হল– নিশ্চয় আল্লাহ তাআলাই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। সকল সৃষ্টি ও অস্তিত্বের তিনিই উৎস। আর বান্দা কেবল তা অর্জনকারী [كاسب] সৃষ্টিকর্তা নয়।)

৫. তাঁরা দাবী করেন, এই উম্মতের মধ্যে যারা ফাসেক তাদের অবস্থান হল (منزلة بين منزلتين) দুই স্তরের মধ্যবর্তী স্তরে। অর্থাৎ, সে ফাসেক; মুমিনও নয় কাফেরও নয়। জমহুর উম্মাহ'র মত ছেড়ে এই ভিন্নতর অভিনব মত গ্রহণ করায় মুসলমানগণ তাদের নাম দিয়েছেন "মুতাযিলা" বা দলছুট লোক। তাঁরা কোন মুসলমান কবীরা গোনাহ করলে তাকে ঈমানের গণ্ডি থেকেই বের করে দেন। আবার খারিজীদের মত কাফের বলেও ঘোষণা দেন না। তারা বরং ঈমান ও কুফ্‌র এর মাঝখানে একটা স্তর মানেন।

(আর আহ্লসু সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল- ফিস্‌ক এবং কবীরা গোনাহ্‌র কারণে কোন মুসলমান ঈমানের সীমানা থেকে বেরিয়ে যায় না। আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত এই 'মধ্যবর্তী স্তর' (منزلة بين منزلتين) কে স্বীকার করেন না।

৬. তাঁদের বিশ্বাস হল, বান্দার যেসব কর্মচিন্তা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কোন আদেশ-নিষেধ করেননি, সেসব বিষয়ে আল্লাহ তাআলার কোন ইচ্ছা এবং ইরাদার সংশ্লিষ্টতাও নেই।

(আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল– আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও ইরাদা ব্যতীত কোনো কিছুই ঘটে না, হয় না। সবকিছুর সঙ্গেই আল্লাহ্‌র ইরাদা সংশ্লিষ্ট।)

৭. তাঁরা মে'রাজকে অস্বীকার করেন।[১]

(আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল, মে'রাজ হক। আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাত্রিকালে ভ্রমন করিয়েছেন এবং স্বশরীরে তাঁকে উর্ধ্বলোকে তুলে নিয়ে গেছেন।[২] অর্থাৎ, স্বশরীরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মে'রাজ ঘটেছে।)

৮. তাঁরা আহ্‌দ ও মীছাক (عهد وميثاق) তথা রূহের জগতে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারকে অস্বীকার করেন।[৩]

(পক্ষান্তরে আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল, আল্লাহ তাআলা রূহানী জগতে হযরত আদম [আ.] ও তাঁর সন্তান-সন্ততিদের থেকে যে অঙ্গীকার (ميثاق) গ্রহণ করেছেন তা সত্য।)

৯. তাঁরা জানাযার নামাযের আবশ্যকতা (وجوب) কে অস্বীকার করেন।[৪]

কাদরিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে শরীআতের হুকুম

কাদরিয়াদের শাখা-উপশাখার মধ্যে যারা পরবর্তীকালীন (متأخرين) কাদরিয়া, তারা কাফের কি না এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে, কিন্তু প্রথম যুগের (متقدمين) কাদরিয়াদের বিষয়ে কোন মত-পার্থক্য নেই। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেছেন, প্রথম যুগের কাদরিয়াগণ –যারা এই কথাকে অস্বীকার করেন যে, আল্লাহ তাআলা এই নিখিল জগত সৃষ্টির পূর্বে সে সম্পর্কে সবকিছু জানতেন। এই জাতীয় কথা যারা বলেন তারা– কাফের এতে কোনো দ্বিমত নেই।[৫] তবে পরবর্তীকালের কাদরিয়াগণ কাফের কি না এ বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। 'আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক' গ্রন্থের রচয়িতা মুহাম্মদ ইবনে তাহির আল- বাগদাদীর মতে কেউ কেউ এদের কোন কোন দলকে কাফের বলেছেন। যেমন: বাগদাদী বলেন, আল-খাবিতিয়্যা এবং হিমারিয়্যা এ দুটো ফিরকা ইসলামী দলের নামে সম্পৃক্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে এ দুটো ইসলামী দল নয়।

---

১. مقدمه. عقيدة الطحاوي

২. এতে মে'রাজে জিসমানী (শারীরিক মে'রাজ)-এর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে এবং তা সংঘটিত হয়েছে জাগ্রত অবস্থায় আকাশ অভিমুখে। অতঃপর উর্ধ্বলোকের যেথায় আল্লাহ চেয়েছেন। عقيدة الطحاوي

৩. أيضا

৪. أيضا

৫. فتح الملهم. ج/١. بجنور. الهند.

আল্লামা আন্ওয়ার শাহ্ কাশমীরী (রহ.) বলেছেন,[১] আলিমগণের অনেকেই কোনরূপ ভাগাভাগি ছাড়া দ্ব্যর্থহীনভাবে (مطلقًا) কাদরিয়াদেরকে কাফের বলেছেন। আল্লামা ইবনুল মুন্যির ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর সূত্রে বলেছেন, কাদরিয়াদেরকে তওবা করারও সুযোগ দেয়া হবে না। সালাফে সালেহীনের অধিকাংশই তাদেরকে কাফের বলেছেন। যেমন: লাইছ, ইব্নে উয়ায়নাহ্, ইব্নে লাহী'আ প্রমুখ। তাঁদের এ মত হল কাদরিয়াদের মধ্যে যারা কুরআনে কারীমকে মাখলূক বলে তাদের সম্পর্কে।

আব্দুল্লাহ ইব্নে মুবারক বলেন, আল-আউদী, ওয়াকী, হাফ্স ইব্নে গিয়াছ, আবূ ইসহাক আল-ফাযারী, হুশায়ম ও আলী ইব্নে আসিম শেষোক্ত মত পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত এবং এটাই অধিকাংশ মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও মুতাকাল্লিমের মত। তাদের এ মত খারিজী ও কাদরিয়া উভয় দল সম্পর্কে। ভ্রান্ত নফস-পূজারী (أهل الأهواء المضلة) এবং অগ্রহণযোগ্য তাবীলপন্থী বিদআতীদের সম্পর্কেও তাদের মত অনুরূপ। ইমাম আহমদ ইব্নে হাম্বল (রহ.)-এর মতও অনুরূপ।[২]

কিতাবুল ওয়াসিয়্যাহ (كتاب الوصية) গ্রন্থে আছে– যে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহ্র কালাম মাখলূক (সৃষ্ট/অনিত্য) সে মূলত আল্লাহ তাআলাকেই অস্বীকারকারী। আর এটা সুবিদিত যে, কাদরিয়াদের সকল ফিরকার লোকেরাই 'কুরআন মাখলূক' এ আকীদায় বিশ্বাসী। ফখরুল ইসলাম (রহ.) বলেছেন,[৩] ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি কুরআন মাখলূক 'কি না' এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর সাথে মুখোমুখি কথা বলেছি। তখন আমি আর তিনি এ অভিন্ন মতেই উপনীত হয়েছি– যে ব্যক্তি 'কুরআন মাখলূক' বলে বিশ্বাস করে সে কাফের। ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) থেকেও বিশুদ্ধ সূত্রে অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত আছে।[৪]

আবার দুটো দিককে যথাযথ অক্ষুন্ন রেখে কেউ কেউ এদের সম্পর্কে স্পষ্ট মন্তব্য করা থেকে বিরত রয়েছেন। দিক দুটো হল- ১. আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে বিদআত একটা অকাট্য অন্যায়, এটা একটা নিন্দিত বিষয় এবং নিন্দিত এর অনুসারী বিদআতী-রাও। ২. যারা তাদের সকলকে বা কতককে কাফের বলেছেন তাদের মতকেও উপেক্ষা না করা। এ দুটো বিষয়কেই অক্ষুন্ন মর্যাদায় রাখার প্রয়াসে তারা নীরবতা অবলম্বন করেছেন এবং বলেছেন, এদের সম্পর্কে আল্লাহ-ই ভাল জানেন।

বর্তমান যুগে এদের অস্তিত্ব আছে কি?

সম্প্রতি কাদরিয়া নামে কোন দল বা ফিরকার সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে বর্তমানে প্রগতিবাদী এবং বুদ্ধিজীবী বলে একটা শ্রেণী আছেন, যারা কুরআন-সুন্নাহ'র বক্তব্য তাদের আকল-বুদ্ধির সাথে সামঞ্জসপূর্ণ না হলে কুরআন-হাদীছের উপর

---

১. إكفار الملحدين . المجلس العلمي. ١٩٦٨م ١٣٨٨هـ. صفحه/٤١
২. (الشفاء) ॥
৩. إكفار الملحدين. المجلس العلمي. ١٩٦٨م ١٣٨٨هـ. صفحه/٥٤
৪. شرح الفقه الأكبر

নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেন এবং কুরআন-সুন্নাহ-র ভাষ্যাবলীকে পশ্চাতে ফেলে তাদের বিবেক-চিন্তাকেই চূড়ান্ত বিচারক বলে মনে করেন। মুতাযিলা এবং কাদরিয়া সম্প্রদায়ও এটাই করত। তাই এ অর্থে যদি এদেরকে আধুনিককালের মুতাযিলা বা আধুনিক কাদরিয়া বলা হয় তাহলে তা অযৌক্তিক হবে না।

মুতাযিলা
(المعتزلة)

"মুতাযিলা" মতবাদ অনুসারীদেরকে বলা হয় মুতাযিলী। এদের এ নাম অন্যদের প্রদত্ত। তারা নিজেদেরকে "আস্হাবুল আদ্লি ওয়াত্তাওহীদ" (أصحاب العدل والتوحيد) বলে পরিচয় দিত। কারণ, আল্লাহ্র আদ্ল বা ইনসাফ ও তাওহীদ সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা শুধু নিজেদেরকেই আদ্ল ও তাওহীদপন্থী বলে মনে করত। অর্থাৎ, তারা মনে করত তাদের বক্তব্যই ইনসাফ ও তাওহীদের অনুকূল।

"মুতাযিলা" নামকরণের রহস্য

* সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, এ মতের উদ্ভাবক ওয়াসিল ইব্নে আতা (واصل بن عطاء)-এর সঙ্গে হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর একটা বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তাদের এ নাম রটে যায়। ঘটনাটি হল– ওয়াসিল ইব্নে আতা (মৃ. ১৩১ হি.) হযরত হাসান বসরী (রহ. মৃ. ১১০ হি.)-এর নিকট একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন, কবীরা গুনাহ্কারী ব্যক্তি মুমিনও নয়, কাফিরও নয়, বরং তার স্থান হল ঈমান এবং কুফ্র-এর মধ্যবর্তী। এ কথা বলে তিনি হাসান বসরীর মাহফিল থেকে উঠে যান এবং নতুন এক পৃথক শিক্ষা-শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। এতে হাসান বসরী (রহ.) বলেন, اعتزل عنا واصل (ওয়াসিল আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে, অর্থাৎ, আমাদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ শুরু করেছে।)। তখন থেকে তার অনুসারীদের নাম মুতাযিলা হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।[১]

---

১. এ ছাড়াও "মুতাযিলা" নামকরণের আরও অনেক রহস্য বলা হয়ে থাকে। যেমন:

(১) কোন কোন প্রাচ্যবিদের মত হল– এদেরকে মুতাযিলা বলা হত কারণ, তারা খুবই মুক্ত থাকতেন।

(২) মুহাম্মাদ আবূ যুহ্রা মনে করেন যে, ইসলামের মুতাযিলা মতবাদ এবং ইয়াহুদীবাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। ইয়াহুদীদের মুতাযিলাগণ যুক্তি এবং দর্শন (منطق وفلسفه)-এর আলোকে তাওরাতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিত। মুসলিম মুতাযিলাগণও কুরআন এবং আল্লাহ্র সিফাতের তাফসীর ও ব্যাখ্যা দর্শন (فلسفه)-এর আলোকে দিয়েছেন (المذاهب الإسلامية)।

(৩) আহমাদ আমীন লিখেছেন– ইয়াহুদীদের মধ্যে ফরাশীম নামে এক গোত্র ছিল, যার অর্থ হল মুতাযিলা। তাদের আকাইদ মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আকাইদের সঙ্গে মিল রাখে। সম্ভবত ইয়াহুদীদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা আকাইদের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের দরুন মুতাযিলাগণকে এ নাম দিয়ে থাকবেন। (فجر الإسلام– خطط المقريزي)

মুতাযিলাদের আবির্ভাব ও তার প্রেক্ষাপট

* পূর্বে বর্ণিত হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর সঙ্গে তাঁর শিষ্য ওয়াসিল ইব্‌নে আতা-র ঘটনা থেকে মুতাযিলাদের আবির্ভাব সম্বন্ধে জানা গিয়েছে। এটাই এ দলের আবির্ভাবের প্রসিদ্ধ বিবরণ। এছাড়াও এ ব্যাপারে আরও কিছু উক্তি পাওয়া যায়। যেমন:

১. অনেকে বলেন, এ দলের উদ্ভব ওয়াসিল ইব্‌নে আতার অনেক পূর্বেই ঘটেছিল, কিছু আহ্‌লে বায়ত (যেমন: যায়েদ ইব্‌নে আলী)ও মুতাযিলাপন্থী ছিলেন।

২. কিছু লোকের ধারণা হল এ মতবাদের সূচনা হয় এভাবে– হযরত হাসান ইব্‌নে আলী (রা.) যখন হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর পক্ষে খিলাফত পরিত্যাগ করেন, তখন খিলাফত পরিত্যাগ করার সময় থেকে শীআনে আলীর (শীআ দলের) কিছু লোক হযরত ইমাম হাসান (রা.) এবং হযরত মুআবিয়া (রা.) উভয় থেকে পৃথক হয়ে যায়। এভাবে তারা রাজনীতি থেকে পৃথক হয়ে কেবল ইল্‌ম এবং ইবাদত নিয়েই লিপ্ত থাকে এবং আকাইদ সংক্রান্ত বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণা করতে থাকে। এখান থেকেই ই'তিযাল (اعتزال) বা পৃথক থাকার নীতির সূচনা হয়।

মুতাযিলাদের উত্থানকাল

বনূ উমাইয়্যাদের শাসনামলেই মুতাযিলী মতবাদের সূচনা হয়। তবে তাদের উত্থান সূচিত হয় আব্বাসী যুগে। আব্বাসী খলীফা মামূনের যুগেই মুতাযিলীদের বিশেষ উত্থান সূচিত হয়। খলীফা মামূন সরকারীভাবে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং মুতাযিলী আলেমগণই সাধারণভাবে মামূনের প্রিয় ও ঘনিষ্ট ছিলেন। খলীফা মামূন ২১২ হিজরী সনে খাল্‌কে কুরআনের আকীদার প্রকাশ্য ঘোষণা দেন এবং মুতাযিলী আলেমগণ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সর্বসাধারণকে এই আকীদা গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। তিনি প্রশাসকগণকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেন উলামা, মুহাদ্দিছ, ফুকাহা এবং বিচারকদেরকে ডেকে আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ জানিয়ে দেন যে, কোন ব্যক্তি খাল্‌কে কুরআনকে স্বীকার না করলে আগামীতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

খলীফা মামূন খাল্‌কে কুরআনের মাসআলায় প্রচুর বাড়াবাড়ি করেন। এমনকি ইমাম আহমাদ ইব্‌নে হাম্বলসহ কয়েকজন প্রখ্যাত আলেমকে বন্দী করে জেলখানায় নিক্ষেপ করেন। ইমাম আহমাদ ইব্‌নে হাম্বলকে বেত্রাঘাত করা হয়। মামূনের পর মু'তাসিম এবং ওয়াছিক বিল্লাহও এই পদ্ধতি অব্যাহত রাখেন। ওয়াছিক-এর যুগে ইমাম শাফিয়ীর শাগরিদ ইউসুফ ইব্‌নে ইয়াহ্‌য়া বুওয়ায়তীকেও অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হতে হয় এবং আহ্‌মাদ ইব্‌নে নাস্‌র খুযায়ীকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়। মোটকথা, এভাবে আব্বাসী খলীফাগণ মুতাযিলাদের পৃষ্ঠপোষকতা করায় এ যুগে মুতাযিলাদের উত্থান ঘটে।

মুতাযিলাদের দল/উপদলসমূহ

১. আল-ওয়াসিলিয়্যা (الواصلية)
২. আল-হুযায়লিয়্যা (الهذلية)
৩. আন্‌-নায্‌যামিয়্যা (النظامية)
৪.আল-জাহিযিয়্যা (الجاحظية)
৪. আল-খাতামিয়্যা (الخاتمية)
৫. আল-কাবিয়্যা (القوية)
৬. আল-জুব্বাইয়্যা (الجبائية)
ইত্যাদি

মুতাযিলাদের মৌলিক মতবাদ ও চিন্তাধারা

মুতাযিলাদের উপদলগুলোর মাঝে কিছু ভিন্ন মতামত ও চিন্তাধারা থাকলেও যে বিষয়গুলো তাদের সকল দলের মধ্যে সম্মিলিত মূলনীতি হিসাবে মর্যাদা রাখত এবং যা স্বীকার করা ব্যতীত কেউ মুতাযিলী হিসাবে স্বীকৃতি পেত না তা হল পাঁচটি। এ গুলোকে ই'তিযাল-এর পঞ্চনীতি বলা হয়। এই মতবাদের উদ্ভাবক ওয়াসিল ইব্‌নে আতা উক্ত পঞ্চনীতির নাম দিয়েছিলেন আল-কাওয়াইদ (القواعد বা নীতিমালা)। নীতিগুলো নিম্নরূপ-

১. আত্‌-তাওহীদ (التوحيد)।
২. আল-আদ্‌ল (العدل)।
৩. আল-ওয়াদ ওয়াল-ওয়াঈদ (الوعد والوعيد)।
৪. আল-মানযিলাহ বাইনাল-মানযিলাতাইন (المنزلة بين المنزلتين)।
৫. আল-আম্‌র বিল মা'রূফ ওয়ান্নাহী আনিল্‌-মুন্‌কার (الأمر بالمعروف النهي عن المنكر)।

পঞ্চনীতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

(১) তাওহীদ (التوحيد)

মুতাযিলাগণ নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ আকীদার বিশেষ দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাদের সেই ব্যাখ্যা অনুসারে আল্লাহ তাআলার সত্তার বাইরে কোন সিফাত বা গুণ নেই। কারণ আল্লাহ্‌র গুণ স্বীকার করলে আল্লাহ্‌র গুণকেও আল্লাহ্‌র ন্যায় চিরন্তন ও নিত্য (قديم) সাব্যস্ত করতে হয়। এভাবে চিরন্তন সত্তার একাধিকত্ব (تعدد قدماء) অবধারিত হয়ে দাঁড়ায়, আর এটা তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্বের পরিপন্থী। তাছাড়া আল্লাহ্‌র বহু গুণাবলীর অর্থ হল তাঁর সত্তায় বহুত্ব পাওয়া যাওয়া, অথচ আল্লাহ্‌র সত্তায় কোনো প্রকারেই বহুত্ব পাওয়া যেতে পারে না। অতএব আল্লাহ্‌র সত্তা গুণাবলী (صفات) থেকে পবিত্র তথা মুক্ত।

এভাবে তাওহীদের নিজস্ব ব্যাখ্যার ফলে তারা আল্লাহ্‌র সিফাতকে অস্বীকার করে বসেছে। একই কারণে তারা কুরআনের চিরন্তনতা ও অসৃষ্ট হওয়াকে অস্বীকার করেছে। তাদের মতে কুরআন অনিত্য ও সৃষ্ট (حادث و مخلوق)। এ ব্যাপারে হক্বপন্থীদের বক্তব্য হল আল্লাহ্‌র গুণাবলী তাঁর সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়, তাঁর সত্তা থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র কোন সত্তা নয় যে, তা মেনে নিলে আল্লাহ্‌র চিরন্তন সত্তার

একাধিকত্ব অবধারিত হয়ে দাঁড়াবে। প্রথম খণ্ডে বহু আয়াত ও হাদীছ দ্বারা আল্লাহর গুণাবলী প্রমাণিত করে দেখানো হয়েছে।

(২) আদ্ল (العدل)

মুতাযিলাগণ নিজেদেরকে "আসহাবুল আদ্লে ওয়াত্-তাওহীদ" (أصحاب العدل والتوحيد) বা "আল্লাহ্র ইনসাফ ও তাওহীদপন্থী" বলে পরিচয় দিত। যদিও মুসলমান মাত্রই আল্লাহ তাআলাকে আদিল বা ইনসাফগার বলে জানেন, কিন্তু মুতাযিলারা এ ব্যাপারেও নিজেদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠা করে। তাদের বক্তব্য ছিল– যেহেতু আল্লাহ আদিল, তাই পাপীকে শাস্তি দেয়া আল্লাহ্র উপর ওয়াজিব এবং নেককারকে ছওয়াব দেয়াও তার উপর ওয়াজিব; নতুবা ইনফাস-পরিপন্থী কাজ হয়ে যাবে। তাদের আরও বক্তব্য ছিল যেহেতু আল্লাহ আদিল বা ইনসাফগার, তাই তিনি কোন অন্যায়ের ইচ্ছাও করেন না আদেশও দেন না। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি কেবল সে নির্দেশই প্রদান করে থাকেন যা তার জন্য কল্যাণকর। এটাই ইনসাফ বা আদ্ল। তাঁর পক্ষে জায়েয নয় যে, কোন অন্যায়ের নির্দেশ দিবেন অতঃপর বান্দাগণকে উক্ত অন্যায়ের দরুন শাস্তি দিবেন। কেননা, এরূপ করা ইনসাফ পরিপন্থী কাজ তথা জুলুম। মুতাযিলাদের এ বক্তব্যের দলীলভিত্তিক খণ্ডনের জন্য দেখুন "আল্লাহর সিফাত বা গুণ প্রকাশক নাম ..." শিরোনামের অধীন ১৫ নং সিফাতের ব্যাখ্যায় পেশকৃত আলোচনা।

(৩) আল-ওয়াদ ওয়াল-ওয়াঈদ (إنفاذ الوعد والوعيد)

মুতাযিলাদের আকীদা হল– আল্লাহ তাআলা ভাল কাজের জন্য ছওয়াবের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং খারাপ কাজের জন্য যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছেন তা অবশ্যই কার্যকর হবে। নেককার লোক অবশ্যই প্রতিদান পাবেন এবং বদকার লোক অবশ্যই শাস্তি পাবে। এ ব্যাপারে কোন কোন মুতাযিলী এতটা বাড়াবাড়ি করেছেন যে, তারা বলেছেন নেককার লোককে ছাওয়াব দেয়া এবং কবীরা গুনাহকারীদেরকে শাস্তি দেয়া আল্লাহ্র উপর ওয়াজিব। ভাল কাজের ছওয়াব প্রদান এবং পাপ কাজের শাস্তি প্রদান এক প্রকার আইনগত বিষয় যা পালন করা আল্লাহ্র জন্য ওয়াজিব বা অপরিহার্য। অতএব আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করতে পারবেন না। এ ব্যাপারে আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বক্তব্য এবং দলীল ও মুতাযিলাদের খণ্ডনের জন্য দেখুন "আল্লাহর সিফাত বা গুণ প্রকাশক নাম ..." শিরোনামের অধীন ১৫ নং সিফাতের ব্যাখ্যায় পেশকৃত আলোচনা।

(৪) আল-মান্যিলাহ বাইনাল-মান্যিলাতাইন (المنزلة بين المنزلتين)

"আল-মান্যিলাহ বাইনাল-মান্যিলাতাইন"-এর অর্থ দুই স্তরের মধ্যবর্তী স্তর। এর দ্বারা তারা বুঝিয়ে থাকে কুফ্র এবং ঈমানের মধ্যবর্তী একটা স্তর। তারা কুফ্র এবং ঈমানের মাঝখানে একটা স্বতন্ত্র স্তর আবিষ্কার করেছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের এই দর্শন 'ফাসেকদের' সম্পর্কে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুখে ঈমান এনে থাকে কিন্তু সেই সঙ্গে গুনাহও করে থাকে তার অবস্থা কী হবে? মুতাযিলাদের নিকট সে ব্যক্তি না সঠিক মুমিন না প্রকৃত অর্থে কাফের। মুমিন নয় এ কারণে যে, তার কাজে ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। আবার কাফেরও নয় এ কারণে যে, মুখে সে ঈমানকে স্বীকার করে।

তবে উল্লেখ্য যে, মুতাযিলাদের নিকট কিছু কবীরা গুনাহ এমন আছে যা মানুষকে কুফ্র-এর সীমা পর্যন্ত নিয়ে যায়, আবার এর থেকে কিছু নিম্নমানের কবীরা গুনাহও রয়েছে। এই শেষোক্ত পর্যায়ের কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি সম্বন্ধেই তারা বলে থাকে যে, সে না মুমিন না কাফের, বরং তার স্থান উল্লেখিত স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী।

'মধ্যবর্তী স্থান'-এর দাবী করা সত্ত্বেও মুতাযিলাদের বক্তব্য হল কবীরা গুনাহকারীর জন্য "মুসলিম" শব্দ ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু তার জন্য এই "মুসলিম" শব্দ ব্যবহার তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নয়, বরং কাফের এবং যিম্মীদের থেকে তার ভিন্নতা বোঝানোর জন্য।

(৫) আল-আম্র বিল মারূফ ওয়ান্নাহী আনিল মুন্কার (الأمر بالمعروف النهي عن المنكر)

"আল-আম্র বিল মারূফ ওয়ান্নাহী আনিল মুন্কার" তথা "ভাল কাজের কথা বলা এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ করা" সকল মুসলমানেরই মৌলিক দায়িত্ব। মুতাযিলাগণ এ বিষয়েও এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে মুতাযিলাগণ সরাসরি হস্তক্ষেপকে ওয়াজিব বরং প্রয়োজনে তরবারীর ব্যবহারকেও জায়েয বলে থাকেন। তাদের বক্তব্য হল ভুল পথ প্রদর্শকারীদেরকে বাধা প্রদানের জন্য এবং হক বিরোধীদের হক গ্রহণে বাধ্য করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক। তারা আব্বাসী খলীফা মামুন, মু'তাসিম এবং ওয়াছিক বিল্লাহ-এর শাসনামলে খাল্কে কুরআন (خلق قرآن) বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় মুহাদ্দিছ এবং ফকীহগণকে জোরপূর্বক তাদের মতানুসারী বানাতে চেয়ে "আম্র বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুন্কার" প্রসঙ্গে তাদের এই বিশেষ দৃষ্টিভংগীর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

মুতাযিলাদের আরও কতিপয় আকীদা

১. আল্লাহ্র সিফাত বা গুণাবলীর অস্বীকৃতি

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুতাযিলাগণ আল্লাহ্র সিফাত বা গুণাবলীকে অস্বীকার করেন। কুরআনে যেসব সিফাতের উল্লেখ এসেছে তারা সেগুলোর অপব্যাখ্যা করে বলেন যে, এগুলো আল্লাহ্র সিফাত নয় বরং তাঁর যাত তথা সত্তার নাম। তারা এই সিফাতকে অস্বীকার করার বিষয়ে এতদূর অগ্রসর হন যে, এ বিষয়টা ইল্মে কালামের বিষয়সমূহের মধ্যে প্রথমসারির বিষয়ে রূপ নেয়।

আল্লাহ্র সিফাত বিষয়ে মুতাযিলাগণ আরও একটা সূক্ষ্ম দর্শনগত জটিলতার সূচনা করেছিলেন, যার ফলে আল্লাহ্র সিফাতসমূহ হুবহু তাঁর যাত/সত্তা (عين ذات) না যাত/সত্তা বহির্ভুত (غير ذات)-এরূপ জটিল আলোচনার উদ্ভব হয়। মুতাযিলাগণ এই

দর্শন স্থাপন করেন যে, আল্লাহ্‌র যাত এবং আল্লাহ্‌র সিফাত একই বস্তু। উদাহরণত ইল্‌মে কালামে সাধারণত আল্লাহ্‌র যেসব সিফাত নিয়ে বেশিরভাগ আলোচনা করা হয়ে থাকে অর্থাৎ:

১. ইল্‌ম বা জ্ঞান (علم)
২. হায়াত বা জীবন (حيات)
৩. ইরাদা বা ইচ্ছা (ارادة)
৪. সামা' বা শ্রবণ (سمع)
৫. বাছার বা দর্শন (بصر)
৬. কালাম বা বলা (كلام)

এর ব্যাখ্যায় তারা বলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর যাত বা সত্তাগতভাবে حی বা জীবিত, তিনি তাঁর সত্তাগতভাবে আলিম (عالم) বা জ্ঞানী এবং তিনি তাঁর সত্তাগতভাবে কাদির (قادر) বা ক্ষমতাবান, এমন কোন সিফাতের ভিত্তিতে নয় যাকে ইল্‌ম, অথবা হায়াত, অথবা কুদরত বলা যায় এবং যা আল্লাহ্‌র যাত বা সত্তা-বহির্ভূত অতিরিক্ত কিছু।

আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণাবলীর ক্ষেত্রে মুতাযিলাদের এরূপ বক্তব্যের পশ্চাতে যুক্তি ছিল নিম্নরূপ−

(এক) কেননা, এসব গুণকে তাঁর যাত বা সত্তা-বহির্ভূত কোন কিছু বললে বিশেষ্য (موصوف) ও বিশেষণ (صفت) অর্থাৎ ধারক ও যা ধারণ করা হয়েছে এরকম আলাদা আলাদা দুটো বস্তু মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এভাবে আল্লাহ্‌র সত্তায় একাধিকত্ব আরোপ করার মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। (পূর্বে এর খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।

(দুই) তাছাড়া এরূপ গুণাবলীর ধারণা কেবল দেহসমূহের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে এবং আল্লাহ দেহগত কোন ব্যাপার থেকেও মুক্ত ও পবিত্র। যদি আমরা বলি যে, প্রত্যেক সিফাত বা গুণ আপনা আপনি বিদ্যমান অর্থাৎ, বিশেষণ বিশেষ্যের সত্তা থেকে পৃথকীকৃত একটা স্বতন্ত্র সত্তা, তাহলে অনেক অনন্ত (قديم) বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে এবং এভাবেও আল্লাহ্‌র সত্তায় একাধিকত্ব আরোপ করার মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

(তিন) মুতাযিলাগণ আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণাবলী অস্বীকার করার পশ্চাতে এরূপ ব্যাখ্যাও প্রদান করেন যে, আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণাবলী মেনে নিলে বলতে হয় তাঁর পবিত্র সত্তা অসংখ্য বিষয় বা বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত, অথচ তাঁর পবিত্র সত্তা অসংখ্য বিষয় বা বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত নয়। কেননা, যদি বলা হয় যে, তাঁর সত্তা অসংখ্য বিষয় বা বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত, তাহলে সেসব বস্তুর প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন, ফলে প্রত্যেকটি হবে আলাদা বা ভিন্ন বস্তু। এমতাবস্থায় সেগুলোকে যুক্ত করার প্রয়োজন। আর প্রয়োজনের অর্থই হল অপরের মুখাপেক্ষী হওয়া। এমতাবস্থায় বলতে হবে আল্লাহ্‌র সত্তা তাঁর গুণাবলীর মুখাপেক্ষী। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অপরের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে। তাছাড়া আল্লাহ্‌র বহু গুণাবলীর অর্থ হল তাঁর সত্তায় বহুত্ব পাওয়া যাওয়া, অথচ আল্লাহ্‌র সত্তায় কোনো প্রকারেই বহুত্ব

পাওয়া যেতে পারে না। অতএব আল্লাহ্‌র সত্তা গুণাবলী (صفات) থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে। (এ ব্যাপারে আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বক্তব্য ও মুতাযিলাদের খণ্ডনের জন্য দেখুন "আল্লাহ্‌র সিফাত সম্পর্কে আরও বিশেষ কিছু আকীদা" শীর্ষক আলোচনা।)

২. খাল্‌কে কুরআনের মাসআলা

মুতাযিলাগণ কর্তৃক আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণাবলীকে অস্বীকার করার পরিণতিতে খাল্‌কে কুরআন (خلق قرآن) মতবাদের জন্ম নেয় এবং তাদের এই মতবাদ এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, আকীদা সংক্রান্ত মতবাদসমূহের ইতিহাসে মুতাযিলাগণ এ মাসআলার ভিত্তিতেই সর্বাধিক পরিচিত হয়ে দাঁড়ায়। যখন তারা সিফাত অস্বীকার করল এবং কালামও আল্লাহ্‌র সিফাতের অন্তর্ভুক্ত, তখন আল্লাহ্‌র এই কালাম-সিফাতের অস্বীকৃতির কারণে আল্লাহ্‌র মুতাকাল্লিম (বক্তা) হওয়ার অস্বীকৃতি অপরিহার্য হয়ে পড়ল। তাই তাদের দর্শন এই দাঁড় হল যে, কালাম আল্লাহর সিফাত বা গুণ নয় বরং তাঁর সৃষ্টিকৃত বিষয় এবং আল্লাহ্‌র কালাম অর্থাৎ, কুরআন মাজীদ হল مخلوق বা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে একটি। অতএব কুরআন অনন্ত (قديم) নয়, বরং حادث বা অনিত্য ও ধ্বংসশীল। তারা কুরআনকে কাদীম (قديم/নিত্য) বলা কুফ্‌র মনে করতেন। (এ ব্যাপারে হকপন্থীদের আকীদার জন্য দেখুন "আল্লাহর কিতাব বা আসমানী কিতাব সম্বন্ধে ঈমান রাখার মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত" শীর্ষক আলোচনা।)

৩. মু'যিজায় অবিশ্বাস

তারা সাধারণত মু'জিযায় বিশ্বাস করতেন না। যুক্তিকে মাপকাঠি নির্ধারণ করার ফলে মু'যিজার পক্ষে কোন বস্তুতান্ত্রিক যুক্তি খুঁজে না পাওয়ার ফলেই তারা মু'জিযাকে অবিশ্বাস করতেন। (মু'জিযা সম্পর্কে দলীল-ভিত্তিক আলোচনার জন্য দেখুন ৯২−৯৩ পৃষ্ঠা।)

৪. কারামতে অবিশ্বাস

মুতাযিলীগণ ওয়ালীগণের কারামতকে অস্বীকার করতেন। যে কারণে তারা মু'জিযাকে অস্বীকার করতেন, একই কারণে কারামতকেও অস্বীকার করতেন। (কারামত সম্পর্কে দলীল ভিত্তিক ও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "কারামত, কাশ্‌ফ, এল্‌হাম ও পীর-বুযুর্গ সম্বন্ধে আকীদা" শীর্ষক আলোচনা।)

৫. তাহ্‌সীন এবং তাক্‌বীহে আক্‌লী-এর দর্শন

তাহসীন এবং তাকবীহ হল আক্‌লী। অর্থৎ, ভাল ও মন্দের ধারণা কেবল বিবেকবুদ্ধি দ্বারাই সম্ভব। মুতাযিলাদের "আদ্‌ল" নীতি থেকেই এই দর্শনের উদ্ভব। আল্লাহ যখন আদিল ও হাকীম এবং তাঁর সকল কাজের কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে তখন মৌলিকভাবে আমল- সমূহের মধ্যে ভাল (حسن) ও মন্দ (قبح) বিদ্যমান, যেমন: সত্যবাদিতার মধ্যে মৌলিকভাবে ভাল (حسن) বিদ্যমান, মিথ্যার মধ্যে মৌলিকভাবে

মন্দ (قبح) বিদ্যমান। এভাবে প্রত্যেক আমলে ভাল (حسن) ও মন্দ (قبح) বিদ্যমান। সুতরাং শারীআতে যেসব কাজের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তা মূলত ভাল (حسن) বলেই সেগুলোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তদ্রূপ যে সকল কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা মৌলিকভাবে মন্দ (قبح) বলেই শারীআতে তা নিষেধ করা হয়েছে। সারকথা এই দাঁড়াল যে, শরীআতের হুকুম জানা না থাকলেও বা শারীআত তার নিকট না পৌঁছলেও মানুষ মুকাল্লাফ (مكلّف) অর্থাৎ ভাল-মন্দ বিবেচনা করে কর্তব্য পালনে বাধ্য। কেননা ভাল-মন্দ যাচাই করার মত বিবেক-বুদ্ধি তার আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীছের ক্ষেত্রেও মুতাযিলগণ আক্লকে বিচারক মানতেন।

৬. সালাহ ও ইস্‌লাহ (صلاح واصلاح) নামক দর্শন

মুতাযিলাদের "আদল" নীতি থেকে কল্যাণের দর্শন (صلاح واصلاح) নামক দর্শনেরও উদ্ভব হয়। এর অর্থ হল– আল্লাহ তাআলার সকল কার্যে বান্দার কল্যাণই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে কোন কোন মুতাযিলী এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, আল্লাহর উপর কল্যাণ (اصلاح)-এর বিবেচনা করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য। (এ সম্পর্কে খণ্ডন ও আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বক্তব্যের জন্য দেখুন ৭৫ নং পৃষ্ঠা।)

কয়েকজন প্রসিদ্ধ মুতাযিলী

১. আবুল-হুযায়ল বসরী (মৃ. ২২৭ হি.)
২. মুআম্মার ইব্‌নে আব্বাদ বসরী
৩. ইব্‌রাহীম ইব্‌নে সাইয়্যার আন-নাজ্‌জাম (মৃ. ২৩১ হি)
৪. আল-জাহিয (মৃ. ২৫৫ হি.)
৫. শির ইব্‌নুল-আশরাস বসরী
৬. আবুল হুসায়ন আল-খাইয়্যাত বসরী
৭. আল-কাবী (মৃ. ৩১৯ হি.)
৮. আহমাদ ইব্‌নে আবী দাউদ (মৃ. ২৪০ হি.)

মুর্‌জিয়া

এ ফিরকাটার নাম "মুরজিয়া"। মুরজিয়া শব্দটি ارجاء ক্রিয়ামূল থেকে উৎপন্ন, যার দুটো অর্থ: (১) অবকাশ দেয়া, বিলম্বিত করা, পশ্চাৎবর্তি করা, যেমন: কুরআনের আয়াত- ﴿أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ﴾ (২) আশা প্রদান করা। প্রথম অর্থের ভিত্তিতে তাদের "মুরজিয়া" নামকরণের হেতু হল তারা আমলকে ঈমান থেকে পশ্চাৎবর্তী করে ফেলেছিল।[১] কেউ কেউ বলেন, এর কারণ হল তারা কবীরা গোনাহকারী (مرتكب الكبيرة) জান্নাতী না জাহান্নামী– এ বিষয়ের সিদ্ধান্তকে কেয়ামত

১. الفرق بين الفرق، صـ/٢٠٢، طبع بيروت، دار المعارف-

পর্যন্ত বিলম্বিত করে দিয়েছে। দুনিয়াতে এ বিষয়ে তারা কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেনি। কেউ কেউ বলেন, এই নামকরণের হেতু হল- তারা হযরত আলী (রা.)কে প্রথম স্তর থেকে নামিয়ে চতুর্থ স্তরে নিয়ে তাঁর মর্যাদাকে পশ্চাৎবর্তী করে দিয়েছে।[১] দ্বিতীয় অর্থ হিসাবে তাদের "মুরজিয়া" নামকরণ হয়েছে এ কারণে যে, তারা বলে, ঈমান থাকলে যেমন কোন গোনাহ দ্বারা ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না, তেমনি কুফ্‌র থাকলে কোন ইবাদত দ্বারাই কোন লাভ হয় না। এভাবে পাপীদেরকে তারা আশা প্রদান করে থাকে। আল্লামা শাহরাস্তানী বলেন, প্রথম অর্থের ভিত্তিতে মুর্‌জিয়া নামকরণই অধিক বিশুদ্ধ।

মুরজিয়া ফিরকার আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট

কোন্ অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ ফিরকার আবির্ভাব ঘটেছিল- এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ যুহ্‌রা মিসরী বলেছেন,[২] কবীরা গোনাহকারী (مرتكب الكبيرة) মুমিন কি মুমিন না– এ প্রসঙ্গে যখন বিতর্ক চলছিল, তখন খাওয়ারিজ দল বলেছিল, এরূপ ব্যক্তি কাফের। মুতাযিলারা বলেছিল, এরূপ ব্যক্তি মুমিন নয়। তারা এরূপ ব্যক্তিকে মুমিন নয় মুসলিম বলত। হাছান বসরী এবং একদল তাবেয়ী বলেছিলেন, এরূপ ব্যক্তি মুনাফিক। কেননা, আমল হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাসের দলীল, জবান অন্তরের দলীল নয়। জমহুরে উম্মত বলেছিল, এরূপ ব্যক্তি পাপী মুমিন। আল্লাহ চাইলে পাপ পরিমাণ তাকে শাস্তি দিবেন কিংবা চাইলে নিজ অনুগ্রহে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এই বিতর্কের মধ্যে মুরজিয়া নামক দলটার আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং তারা বলে যে, ঈমান বলা হয় মুখের স্বীকৃতি এবং মনের বিশ্বাস ও পরিচিতি (معرفت)-কে। অতএব পাপ দ্বারা ঈমানের কোনো ক্ষতি হয় না। কেননা পাপ দ্বারা স্বীকৃতি, বিশ্বাস ও পরিচিতি ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। আমল থেকে ঈমান পৃথক বিষয়।

"আল-মিলাল ওয়ান্নিহাল" গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী মুরজিয়া আকীদা-বিশ্বাসের প্রথম প্রবক্তা হলেন জলীলুল কদর তাবিয়ী হাসান ইব্‌নে মুহাম্মাদ ইব্‌নে আলী ইব্‌নে আবী তালিব। যার পিতা "মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তবে মুহাক্কেক উলামায়ে কেরামের তাহ্‌কীকমতে তিনি এই অর্থে মুরজিয়া ছিলেন না যে অর্থে আমলকে অপ্রয়োজনীয় আখ্যাদানকারী ভ্রান্ত মুরজিয়া দলটা ছিল। বরং তাঁর সম্পর্কে ইতিহাসে যে মুরজিয়া কথাটি পাওয়া যায় তা এ অর্থে যে, তিনি উছমান (রা.)-এর ওফাত পরবর্তী বিবদমান সাহাবায়ে কেরাম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রদানের বিষয়টাকে পশ্চাৎবর্তী রেখেছিলেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তাহকীক জানার জন্য দ্রষ্টব্য– শায়খুল আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাকৃত আর-রফউ ওয়াত্তাকমীল (الرفع والتكميل)-এর টীকা।

১. الملل والنحل، جـ/١، صـ/١٣٩، طبع مصر، ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م-
২. تاريخ المذاهب الإسلامية، جـ/١صـ/١١٩، طبع دار الفكر العربي ١٩٨٧م-

মুরজিয়াদের দল/উপদল

মৌলিকভাবে এই ফিরকাটা চার দলে বিভক্ত। যথা:–

১. খাওয়ারিজ মনোভাবাপন্ন মুরজিয়া (مرجئة الخوارج)
২. কাদরিয়া মনোভাবাপন্ন মুরজিয়া (المرجئة القدرية) যেমন: গায়লান দামেশ্‌কী, মুহাম্মাদ ইব্‌নে শাবীব বসরী প্রমুখ এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।
৩. জাবরিয়া মনোভাবাপন্ন মুরজিয়া (المرجئة الجبرية)
৪. খালেস মুরজিয়া (المرجئة الخالصة)

খালেস মুরজিয়াদের মধ্যে ৫টা ফিরকা রয়েছে। যথা:–

১. ইউনুসিয়্যা (اليونسية) এরা ইউনুস ইব্‌নে আওন আন-নামীরী-র অনুসারী।
২. গাছ-ছানিয়া (الغسانية) এরা গাছছান কুফী-র অনুসারী।
৩. ছাওবানিয়া (الثوبانية) এরা আবূ ছাওবান-এর অনুসারী।
৪. তূমানিয়্যা (التومنية) এরা আবূ মুআয আত-তূমানী-এর অনুসারী।
৫. উবায়দিয়্যা (العبيدية) এরা উবাদ আল-মুক্‌তাইব-এর অনুসারী।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কতিপয় উলামায়ে কেরাম ফিরকায়ে মুরজিয়াকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা:–

১. হকপন্থী মুরজিয়া (مرجئة السنة)
২. বিদআতী মুরজিয়া (مرجئة البدعة)

"হকপন্থী মুরজিয়া" বলে বোঝানো হয়েছে ঐসব লোকেদেরকে, যারা বলেন, কেউ কবীরা গোনাহ করলে তার পাপ পরিমাণ তাকে শাস্তি দেয়া হবে। সে অনন্তকাল জাহান্নামবাসী হবে না। বরং এরূপ কারও কারও ক্ষেত্রে আল্লাহ শাস্তি প্রদান ব্যতীতও ক্ষমা করে দিবেন। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী অধিকাংশ ফোকাহা ও মুহাদ্দিছীন এই শ্রেণীভুক্ত হয়ে যান। আর "বিদআতী মুরজিয়া" বলে ঐসব মুরজিয়া মতাদর্শের অনুসারীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা জমহুরের নিকট মুরজিয়া নামে পরিচিত, যাদেরকে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বহির্ভূত ভ্রান্ত ফিরকা হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

ফিরকায়ে মুরজিয়া-র মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শ

১. নাজাতের জন্য ঈমানই যথেষ্ট। ইবাদতের কোনো উপকারিতা নেই, পাপেও কোনো ক্ষতি নেই।

(আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন, কোন ঈমানদার ব্যক্তি পাপ করলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই– একথা আমরা বলি না। তার ব্যাপারে আমরা নিরাপত্তা বোধ করি না তবে নেককার লোকদের ক্ষমা প্রাপ্তির আশা রাখি। -আকীদাতুত্তাহাবী।)

২. আরশ আল্লাহ্‌র থাকার স্থান।[১]

---

১. كما في مقدمة عقيدة الطحاوي

৩. নারীগণ বাগানের ফুলের ন্যায়। যে ইচ্ছা সে ভোগ করতে পারে- বিবাহ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই।[১] (এটা এত জঘন্ন আকীদা যে, এতে করে যেনার মত হারামকে হালাল আখ্যায়িত করা হয়ে যায়।)
৪. আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.)-কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। মুরজিয়াদের উবায়দিয়া ফিরকা এর প্রবক্তা।[২]

জাহ্‌মিয়্যাহ
(الجهمية)

ফিরকায়ে "জাহ্‌মিয়্যাহ"-এর নামকরণ হয়েছে এই ফিরকা-র প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা জাহ্‌ম ইব্‌নে সাফওয়ান-এর নামের প্রতি সম্পৃক্ত করে। এই ফিরকা-কে "মু'আত্‌তিলাহ"-ও বলা হয়। "মু'আত্‌তিলাহ" শব্দটি تعطيل ক্রিয়ামূল থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ বেকার বা নিষ্ক্রীয় করা। এ দলটা আল্লাহ্‌র صفات বা গুণাবলীকে অস্বীকার করার দ্বারা আল্লাহ্‌কে যেন বেকার ও নিষ্ক্রীয় করে ফেলেছে- এ প্রেক্ষিতেই তাদের এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। কতক উলামায়ে কেরামের মতে "মু'আত্‌তিলাহ" ও "জাহ্‌মিয়্যাহ" এক নয় বরং মু'আত্‌তিলাহ হল মূল দলের নাম আর জাহ্‌মিয়্যাহ হল তার একটা শাখা দল।

বনূ উমাইয়া শাসনামল[৩]-এর শেষ দিকে তৎকালীন খোরাসানের অন্তর্গত সমরকন্দ (মতান্তরে তিরমীয)-এর অধিবাসী জাহ্‌ম ইব্‌নে সাফওয়ান[৪] কর্তৃক এ দলটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। খোরাসান ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা ছিল তার মতাদর্শ প্রচারের ক্ষেত্র। আল্লামা শাহ্‌রাস্তানী বলেন, তার নতুন মতাদর্শের প্রথম প্রকাশ ঘটে তিরমীযে। তার মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা নেহাওয়ান্দ অঞ্চলে এই মতাদর্শ প্রচারের কেন্দ্র বানিয়ে সেখানেই তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে।

ইমাম আবূ যুহ্‌রা বলেন,[৫] উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিকেই এই ফিরকার جبر (মানুষ মাজবূর বা অক্ষম) সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও প্রধান দর্শনটার প্রচার ঘটতে শুরু হয়। অবশেষে উমাইয়া শাসনামলের শেষ দিকে এটা একটা স্বতন্ত্র মতাদর্শে রূপ নেয়।

জাহ্‌ম ইব্‌নে সাফ্‌ওয়ান প্রসিদ্ধ যিন্দীক জা'দ ইব্‌নে দির্‌হাম (جعد بن درهم)-এর শীষ্য ছিল। এই জা'দ ইব্‌নে দির্‌হামই প্রথম "কুরআন মাখ্‌লূক" خلق قرآن (অর্থাৎ, কুরআন নশ্বর সৃষ্ঠি) সংক্রান্ত দর্শন-এর প্রবর্তন ঘটায়। এ-ই প্রথম আল্লাহ্‌র গুণাবলী-কে অস্বীকার করে। এভাবে যিন্দীক হয়ে যাওয়ার ফলে ১২৪ হিজরীতে তাকে হত্যাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জাহ্‌ম ইব্‌নে সাফওয়ান তার গুরু জা'দ ইব্‌নে দিরহাম থেকেই জাহ্‌মিয়্যাহ দর্শন গ্রহণ করে। এ কারণেই জা'দ ইব্‌নে দিরহামকে জাহ্‌মিয়্যাহ

---

১. مقدمة عقيدة الطحاوي ২. المصدر السابق
৩. (৪০-১৩২ হি./৬৬১-৭৫০ খৃ.) ৪. (جهم بن صفوان) মৃত ১২৮ হি./৭৪৫ খৃ.।
৫. تاريخ المذاهب الإسلامية، ج/١، ص/١٠٤، طبع مصر، دار الفكر العربي ١٩٨٧م

মতাদর্শের প্রথম দাঈ বলা হয়ে থাকে। এক মতে[১] জা'দ ইব্‌নে দিরহাম আবান ইব্‌নে সিম্‌'আন থেকে এবং সে তালূত ইব্‌নে আ'সাম (طالوت ابن أعصم) নামক ইয়াহুদী থেকে এই মতাদর্শ গ্রহণ করে। ১২৮/৭৪৫ খৃ. উমাইয়্যা শাসকদের বিরুদ্ধে ফিতনা বিস্তারে অংশ গ্রহণ ও নাস্‌র ইব্‌নে সাইয়্যার-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার দায়ে মুসলিম ইব্‌নে আহ্‌ওয়াজ মাঝিনী জাহ্‌ম ইব্‌নে সাফওয়ানকে মার্ব শাহরে হত্যাদণ্ড প্রদান করে।[২]

আল্লামা শাহরাস্তানী[৩]-এর মতে জাহমিয়্যাহ ফিরকা "জাবরিয়্যাহ" (الجبرية الخالصة) ফিরকা-র অন্তর্ভুক্ত। তিনি এটাকে এমন কোন মৌলিক ফিরকা হিসাবে গণ্য করেননি যার আরও অনেক শাখা ফিরকা রয়েছে। ঐতিহাসিক ইমাম আবূ যুহরা মিসরীও এই মতের সমর্থক। কোন কোন আলেমের মতে জাহ্‌মিয়্যাহ "মুআত্‌তিলাহ্" ফিরকার একটা শাখা বিশেষ। কারী মুহা. তাইয়্যেব (রহ.) আকীদাতুত্তাহাবী গ্রন্থের ভূমিকায় জাহ্‌মিয়্যাহ-কে একটা মৌলিক ফিরকা হিসাবে গণ্য করেছেন, যার ১২টা শাখা ফিরকা রয়েছে। যথা:–

১. মাখ্‌লূকিয়্যাহ (مخلوقية)
২. গাইরিয়্যাহ (غيرية)
৩. ওয়াকিইয়্যাহ (واقعية)
৪. খায়রিয়্যাহ (خيرية)
৫. যানাদিকাহ্ (زنادقة)
৬. লফ্‌যিয়্যাহ (لفظية)
৭. রাবিইয়্যাহ (رابعية)
৮. মুতারাকিবিয়্যাহ (متراقبية)
৯. ওয়ারিদিয়্যাহ (وار دية)
১০. ফানিয়্যাহ (معطلية)
১১. হুরাকিয়্যাহ্ (حرقية)
১২. মু'আত্‌তিলিয়্যাহ্ (معطلية)

ফিরকায়ে জাহ্‌মিয়্যাহ-র মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস

১. আল্লাহ তাআলাকে এমন কোন গুণে গুণান্বিত করা জায়েয নয় যে গুণ কোন মাখ্‌লূকের উপর প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা এতে আল্লাহকে মাখ্‌লুকের সঙ্গে সাদৃশ্য বিধান করা হয়, অথচ আল্লাহ কোন মাখ্‌লূকের মত নন। এ কারণেই তারা আল্লাহ্‌র জীবিত (حی) হওয়া, জ্ঞানী (عالم) হওয়া, ইচ্ছা পোষণকারী (مرید) হওয়া প্রভৃতি গুণাবলীকে রদ করে থাকে। তবে আল্লাহ্‌র শক্তিশালী (قادر) হওয়া, স্রষ্টা (خالق) হওয়া, অস্তিত্ব দানকারী (محیی) হওয়া, জীবন দানকারী (ميت) হওয়া এবং মৃত্যু দানকারী (مميت) হওয়াকে তারা স্বীকার করে। যেহেতু এসব গুণাবলী কোন মাখ্‌লূকের ওপর প্রযোজ্য হয় না।

২. মুতাযিলা ও কাদ্‌রিয়্যা-এর ন্যায় তারা আল্লাহর কালামকে নশ্বর সৃষ্টি (مخلوق) মনে করে।

---

১. أيضا. نقلا عن شرح العيون في رسالة ابن زيدون-

২. المنجد في اللغة الاعلام

৩. الملل والنحل، جـ/١، صـ/٦٨، طبع مصر، ١٣٩٦هـ/١٩٨٦

(আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল-আল্লাহ্‌র কালাম-কুরআন নশ্বর সৃষ্টি নয় বরং তা অবিনশ্বর غير مخلوق)

৩. জাব্‌রিয়্যাহ্ ফিরকার ন্যায় তারা মনে করে যে, মানুষ নিতান্তই মাজবূর। অর্থাৎ, কোনো শক্তি, কোনো ইরাদা, কোনো এখতিয়ার তার নেই। মানুষ অমুক কাজ করে, অমুক কাজ করে– এভাবে মানুষের প্রতি যেসব ক্রিয়াকে সম্পৃক্ত করা হয় তা রূপক অর্থেই করা হয়ে থাকে। যেমন:– গাছের ফল দেয়া, পানির প্রবাহিত হওয়া, সূর্যের উদিত অস্তমিত হওয়া, পাথরের নড়া প্রভৃতি ক্রিয়াগুলোকে রূপক অর্থেই সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে।

(এক্ষেত্রে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল মানুষ সম্পূর্ণ মাজবূর (مجبور محض) নয়, আবার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার অধিকারী (قادر مطلق)-ও নয়। এতদুভয়ের মাঝেই হল ইসলামের অবস্থান। সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ মাজবূর, তবে কর্ম (کسب)-এর ক্ষেত্রে তার এখ্‌তিয়ারের দখল রয়েছে। বান্দার কোন ইরাদা হতে পারে না যদি আল্লাহ্‌র ইরাদা না হয়।)

৪. জান্নাতে জান্নাতীদের উপভোগ সম্পন্ন হওয়ার পর এবং জাহান্নামে জাহান্নামীদের দুর্ভোগ পোহানো সম্পন্ন হওয়ার পর জান্নাত জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাবে। জান্নাত জাহান্নাম চিরস্থায়ী নয়। কুরআনে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চিরস্থায়ী হওয়ার যে বর্ণনা রয়েছে সেগুলোকে তারা তাকিদ ও মুবালাগা অর্থে গ্রহণ করেছে।

(এ বিষয়ে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল- জান্নাত জাহান্নাম এমন দুটো সৃষ্টি যা অনন্তকাল থাকবে, কখনও ধ্বংস হবে না।)

৫. ঈমান হল অন্তরের বিষয়, মুখের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব কারও অন্তরে যদি ঈমান (অর্থাৎ, পরিচিতি معرفت) থাকে আর মুখে সে অস্বীকার করে, তাহলে সে মুমিনই থাকবে, কাফের হয়ে যাবে না। কারণ ঈমান বলা হয় পরিচয় (معرفت)-কে, আর কুফ্‌র বলা হয় পরিচয় না থাকাকে।

৬. ঈমানের মধ্যে কোনো বিভক্তি নেই। অর্থাৎ, অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি ও আমল-এই তিন ভাগে ঈমান বিভক্ত নয়। অতএব ঈমানদারদের ঈমানের মধ্যে কোন মানগত উঁচু-নিচুর পার্থক্য নেই। নবীদের ঈমান এবং উম্মতের ঈমানের মধ্যে কোনো মানগত পার্থক্য নেই-সকলের ঈমানই একই মানের। কারণ ঈমান বলা হয় পরিচয়কে আর পরিচয়ের মধ্যে এমন কোনো মানগত পার্থক্য ঘটে না।

৭. মুতাযিলাদের ন্যায় তারাও মনে করে পরকালে আল্লাহর দীদার (رویت باری) হবে না।

(আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল জান্নাতীদের আল্লাহর দীদার নসীব হবে।)

৮. তারা মালাকুল মাউত-কে অস্বীকার করে। তাদের মতে রূহ সরাসরি আল্লাহ কবজ করেন। মালাকুল মউত-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। এমনিভাবে তারা আলমে বরযাখ, কবরে মুনকার নাকীরের সওয়াল ও হাউযে কাউছার-এর বিষয়গুলোকেও অস্বীকার করে। তাদের মতে এগুলো কল্পিত বিষয়।

(আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে জগৎসমূহের রূহ কব্‌জ করার দায়িত্বে রয়েছেন মালাকুল মউত। তারা কবরে আযাব/আরাম, রব, নবী ও দ্বীন সম্পর্কে মুনকার নাকীরের সওয়াল, হাউযে কাউছার– এসব বিষয়ে বিশ্বাস রাখে। এসব বিষয় সম্পর্কে ১ম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

কাররামিয়্যাহ
(الكرامية)

এ দলটা (কাররামিয়্যাহ)-এর প্রতিষ্ঠাতা আবূ আব্‌দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌নে কার্‌রাম[১] সিজিস্তানী (أبو عبد الله محمد بن كرام السجستاني)-এর দিকে সম্পৃক্ত করে এ দলটাকে কার্‌রামিয়্যাহ বলা হয়। কথিত আছে তিনি ১৯০ হি. মোতাবেক ৮০৬ খৃষ্টাব্দে সীস্তান/ সিজিস্তান-এর অন্তর্গত যারান্‌জ (زرنج)-এর নিকটবর্তী একটা স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য তার পদবী হয় সিজিস্তানী।

কেউ কেউ এ দলটার মতবাদে আল্লাহ্‌র প্রতি মানবত্ব আরোপ (التجسم) ও আল্লাহ্‌কে মানব-গুণ-সম্পন্ন বলা তথা নরত্বারোপবাদী (التشبيه)-এর চিন্তা ভাবনা থাকায় এ দলটাকে মুজাস্‌সিমা (مجسمه) ও মুশাব্বিহা বা সাদৃশ্যবাদী (مشبه) দলভুক্ত হিসাবে গণ্য করেছেন।

শুরুতে ইব্‌নে কাররাম সিজিস্তানে তার স্বরচিত গ্রন্থ عذاب القبر-এর মতবাদ প্রচার শুরু করেন। যার মধ্যে মুন্‌কার নাকীর নামক ফেরেশ্‌তাদ্বয় ও কিরামান কাতিবীন-কে অভিন্ন বলে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়ায় স্থানীয় গভর্ণর তাকে সিজিস্তান থেকে বহিষ্কার করেন। পরে তিনি গুরজিস্তান ও খুরাসানের সাধারণ মানুষের মধ্যে তার মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। এই প্রচারকালে তিনি সুন্নী ও শীআ উভয় দলকে আক্রমণ করতে থাকেন। এখান থেকে তিনি তাঁতী ও নিম্ন শ্রেণীর অনুসারীদেরকে নিয়ে নিশাপূরে উপস্থিত হলে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদের আশংকায় সেখানকার গভর্ণর তাকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। সুদীর্ঘ ৮ বৎসর কারাভোগের পর ২৫১ হিজরী মোতাবেক ৮৬৫ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পান। তারপর নিশাপূর ত্যাগ পূর্বক জেরুজালেমে গমন করেন। এখানেই জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করেন। ২৫৫ হিজরীর সফর মাস মোতাবেক ৮৬৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

কাররামিয়াদের উপদল

শাহ্‌রাস্তানীর বর্ণনা মতে কাররামিয়্যাদের ১২টা উপদল ছিল। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত ৬টা উপদলের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন–

১. আল আবিদিয়্যাহ (العابدية)
২. আননূনিয়্যাহ (النونية)
৩. আয-যারীনিয়্যাহ (الزرينية)
৪. আল-ইসহাকিয়্যাহ (الاسحاقية)
৫. আল-ওয়াহিদিয়্যাহ (الواحدية)
৬. আল-হাইসামিয়্যাহ (الهيصمية)

আব্দুল কাহের বাগ্‌দাদী বলেছেন, খুরাসানী কার্‌রামিয়্যাদের নিম্নোক্ত ৩টা উপদল ছিল। তবে তারা একে অপরকে কাফের বা ধর্ম-বিরোধী আখ্যায়িত করত না বিধায় তিনি তাদেরকে এক দল বলেই গণ্য করেছেন। দল তিনটা এই–

১. হাকাইকিয়্যাহ (حقائقية)
২. তারাইকিয়্যাহ (طر ائقية)
৩. ইসহাকিয়্যাহ (اسحاقية)

কাররামিয়্যাদের কয়েকটা মতবাদ

কার্‌রামিয়্যাদের অভিনব মতবাদের সংখ্যা অগণিত বলা যায়। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটা হল:

১. পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ইব্‌নে কার্‌রামের স্বরচিত গ্রন্থ "আযাবুল কবর" (عذاب القبر)–য়ে মুন্‌কার নাকীর নামক ফেরেশ্‌তাদ্বয় ও কিরামান কাতিবীন-কে অভিন্ন বলে দেখানো হয়েছে।

২. আল্লাহ্‌র প্রতি মানবত্ব আরোপ (التجسيم) ও আল্লাহ্‌কে মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য বিধান। (التشبيه)। ইব্‌নে কার্‌রাম মনে করতেন আল্লাহ্‌ এমন এক শরীরী সত্তা, যার সীমা ও প্রান্ত রয়েছে দুই দিক থেকে, নিচ দিক থেকে এবং তাঁর যে অংশ আরশের সঙ্গে সংযুক্ত সেই দিক থেকে। ইব্‌নে কার্‌রাম তার "আযাবুল কবর" গ্রন্থের ভূমিকায় আল্লাহ্‌কে জওহার (جوہر) বা মূলসত্তা বলে আখ্যায়িত করেছেন। আব্দুল কাহের বাগ্‌দাদীর মতে এভাবে তিনি খৃষ্টীয় বিশ্বাসের দিকে অগ্রসর হন। কারণ, খৃষ্টানগণ আল্লাহকে جوہر বা মূল সত্তা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৩. তারা আল্লাহ্‌র ভারত্ব আছে বলে মনে করত। আল্লাহর বাণী (إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ) (যখন আকাশ ফেটে যাবে)-এতে তারা বলত, আসমান ফেটে যাবে আল্লাহর ভারে।

৪. ইব্‌নে কার্‌রাম اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى (দয়াময় আরশে সমাসীন)-এর ব্যাখ্যায় বলত, আরশের সঙ্গে আল্লাহ্‌ তাআলার শারীরিক ছোঁয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান, আরশ হল আল্লাহ্‌র অবস্থানের স্থান।

৫. তারা মনে করত আল্লাহ্‌র সত্তা অনিত্য গুণাবলী (حوادث)-এর আধার। ইচ্ছা, অনুভূতি, দর্শন, বাকশক্তি এগুলো হল অনিত্য বিষয় (حادث) আর আল্লাহ্‌ হলেন এসব অনিত্য বিষয়ের আধার (محل حوادث)।

৬. তাদের ধারণা। আল্লাহ্‌র সর্বপ্রথম সৃষ্টি এমন প্রাণ বিশিষ্ট কোন শরীরী সত্তা হওয়া উচিত, যা উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম। এর বিপরীত কোন জড়বস্তুকে প্রথমে সৃষ্টি করা হেকমত পরিপন্থী।

১. কেউ কেউ শব্দটিকে "কিরাম" উচ্চারণ করেছেন। অধিকাংশের মতে শব্দটির উচ্চারণ কার্‌রাম। সিমআনী-র মতে আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ-এর পিতা আঙ্গুর গাছের রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিল বিধায় তাকে কাররামী (كرامى) বলা হত। উল্লেখ্য যে, كرم শব্দের এক অর্থ হল আঙ্গুর গাছ।

(এ বক্তব্যের ভিত্তিতে যে হাদীছে বলা হয়েছে আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে লওহে মাহফূজে কেয়ামত পর্যন্ত সবকিছু লিখে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন, তা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়।)

৭. কার্‌রামিয়্যাগণ মনে করত– যে শিশুদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র জানা আছে যে, বড় (বালেগ) হলে তারা ঈমান আনত, তাদের মৃত্যু ঘটানো আল্লাহ্‌র হেকমত অনুসারে সম্ভব নয়।

(এতে করে নবী করীম (সা.)-এর পুত্র ইব্রাহীম এবং অন্য নবীগণের যেসব পুত্রের শিশুকালে মৃত্যু ঘটেছে তাদের ব্যাপারে এই কু-ধারণা পোষণ করা অবধারিত হয়ে যায় যে, তারা বড় হলে কাফের হত - আল্লাহ তাআলার এমনই জানা ছিল।)

৮. কাররামিয়্যাগণ বলত, যেসব গোনাহের কারণে সততা (عدالت) রহিত হয়ে যায় বা হদ্দ (حد) জারী হয় এমন পাপ থেকে নবীগণ মা'সূম (معصوم) বা নিষ্পাপ ছিলেন। এর চেয়ে নীচু পর্যায়ের পাপ থেকে তারা মা'সূম ছিলেন না।

(আহ্‌লে হকের মতে নবীগণ সগীরা কাবীরা সব ধরনের পাপ থেকেই মা'সূম। এ প্রসঙ্গে পরবর্তিতে "ইস্‌মতে আম্বিয়া প্রসঙ্গ" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

৯. তারা বলত, ঈমান হল শুধু মুখে স্বীকৃতি প্রদান (إقرار باللسان)-এর নাম। অন্তরের বিশ্বাস (تصديق بالقلب) না থাকলেও চলে, আমল না থাকলেও চলে। এ কারণে তাদের মতবাদ ছিল যে, একবার কেউ মুখে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করলে তার ঈমান চিরস্থায়ী হয়ে যায়, এমনকি মনে প্রাণে রেসালাতকে অবিশ্বাস করলেও তার ঈমান বিনষ্ট হয় না। কেবল মুরতাদ হলেই তার ঈমান বিনষ্ট হয়।

(এমন হলে মুনাফিকদের সম্পর্কে জাহান্নামের তলদেশে থাকার হুশিয়ারী প্রদানের কোন হেতু ছিল না। কারণ, তারা মুখে ঈমান আনয়নের কথা ব্যক্ত করত। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .

অর্থাৎ, অবশ্যই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। [সূরা: ৪-নিসা: ১৪৫])

১০. খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের ব্যাপারে তাদের মত ছিল- একমাত্র জাতির সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতেই তা হতে হবে।

(এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত-এর মত হল পূববর্তী খলীফা কর্তৃক মনোনয়নের পদ্ধতিও বিশুদ্ধ। যেমন হযরত ওমর [রা.] হযরত আবূ বকর সিদ্দীক [রা.] কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন।)

কাররামিয়্যাদের শেষ শক্তিশালী আশ্রয় ছিল মধ্য আফগানিস্তানের পর্বত-বেষ্টিত অঞ্চল গূর। গূরী সুলতান গিয়াসুদ্দীন মুহাম্মাদ (মৃত ৫৯৯/১২০২-৩) এবং তার ভাই মুইযুদ্দীন মুহাম্মাদ (মৃত ৬০২/১২০৫-৬)-এর কাররামিয়্যা মতবাদের সঙ্গে

একাত্মতার সুবাদে এমনটা হয়েছিল। পরবর্তীতে এ অঞ্চলে মোঘল আক্রমণের পর এখানে কার্‌রামিয়্যাদের তৎপরতার আর কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। হয়ত খোরাসানের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ফলে তারা ছত্রভঙ্গ ও বিলীন হয়ে গিয়ে থাকবে।[১]

* আধুনিক এ'তেকাদী ফিরকাসমূহ

বাহায়ী

এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা হোসেন আলী ইব্‌নে আব্বাস। পরে তিনি বাহাউল্লাহ (আল্লাহ্‌র ঐশী জ্যোতি) উপাধি গ্রহণ করেন। এই উপাধিতে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। তার নামের দিকে সম্পৃক্ত করেই তার মতবাদ সম্বলিত ধর্ম বাহায়ী ধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে।

মির্যা হোসেন আলী বাহায়ী ১৮১৭ সালের নভেম্বর মাস মোতাবিক ১২৩৩ হিজরীর মুহাররম মাসে তেহরান মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন ইরানের একজন মন্ত্রী এবং পরবর্তীতে শাহের প্রধান সচিব। তিনি ছিলেন একজন সম্পদশালী আমীর।

১৮৯২ সালের মে মাস মোতাবিক ১৩০৯ হিজরীতে মির্যা হোসেন আলী বাহায়ী প্যালেস্টাইনের বাহ্‌জীতে ইন্তেকাল করেন। ইসরাঈলের কার্মেল পর্বতের পাদদেশে তাকে কবর দেয়া হয়।[২]

বাহায়ী ধর্মের গোড়ার কথা

বাহায়ী ধর্মের মূল উদ্‌গাতা ছিলেন মির্যা আলী মুহাম্মাদ বাব। তার মূল নাম আলী মুহাম্মাদ।[৩] পরে তিনি "বাব"[৪] উপাধি গ্রহণ করেন।[৫] মির্যা আলী মুহাম্মাদ বাব ১৮২০ সালের ৯ই অক্টোবর মতান্তরে ১৮১৯ সালের ২০ অক্টোবর পারস্যের শীরাজ নগরীর একশীআ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুহাম্মাদ রিদা, মাতার নাম ফাতেমা।[৬] মির্যা আলী মুহাম্মাদ বাব শায়খ কাজেম রাশতীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই কাজেম রাশতী মনে করতেন যে, ইমামে গায়েব-এর আত্মপ্রকাশকাল নিকটে এসে গেছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইমামে গায়েব তথা মাহ্‌দী মুনতাজার (প্রত্যাশিত মাহ্‌দী)-কে

---

১. الفرق بين الفرق، الملل والنحل ও ইসলামী বিশ্বকোষ, ৭ খণ্ড প্রভৃতি থেকে গৃহীত।

২. তথ্যসূত্র: বাহাউল্লাহ, বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম ও بدائع الكلام

৩. তিনি প্রথমে শীআ মতাবলম্বী ছিলেন। এ থেকে কেউ কেউ বাহাই ধর্মকে শীআ ধর্মের শাখা হিসাবে গণ্য করে থাকেন। তবে পরবর্তীতে বাহাই ধর্ম শীআ মতাদর্শ থেকে ভিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র মতাদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

৪. 'বাব' অর্থ দ্বার। বাব ছিলেন পৃথিবীতে নতুন স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের প্রবেশ-দ্বার। নব নিকুঞ্জ, পৃষ্ঠা ২৬, প্রকাশক-বাংলাদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০০ ইং।

৫. ১৮৪৪ সালের ২৩ শে মে তারিখে তিনি নিজেকে বাব (স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের প্রবেশদ্বার/ঐশ্বরিক জ্ঞানের প্রবেশপথ) উপাধিতে ভূষিত করেন। –বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম পৃ, ৫৬

৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫ তম খ. পৃ. ৫৩৬

তালাশ করার জন্য তাঁর মুরীদানকে ইরানের সর্বত্র পাঠিয়েছিলেন। রাশতীর মৃত্যুর চার মাস পর মোল্লা হুসাইন নামক তাঁর এক নিবেদিত প্রাণ মুরীদ আলী মুহাম্মাদকে সত্যের "বাব" বলে মন্তব্য করেন।[১]

অপর দিকে আলী মুহাম্মাদ বাব নিজেও এ মর্মে ঘোষণা করেন যে, "বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে বর্ণিত দিব্যি বার্তা বাহকের আগমন নিকটবর্তী। তিনি নিজেকে ইসলামে বর্ণিত "ইমাম মাহ্‌দী" বলে উল্লেখ করেন।[২] ১৮৪৪ সালের ৩০ মে তারিখে বাব নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলে ঘোষণা দেন।[৩]

আলী মুহাম্মাদ বাব ও তার অনুসারীরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অশালীন ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে বার বার অহেতুক চ্যালেঞ্জ ছুড়তে থাকে। যা মুসলিম উম্মাহকে চরমভাবে মর্মাহত করে তোলে। তদুপরি আলী মুহাম্মাদ বাব তার "আল বয়ান" নামক কিতাবে এ মর্মে ঘোষণা করেন যে, আল বয়ান ছাড়া অন্য কোনো কিতাব পাঠ করা মানুষের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যারা বাবের মতবাদ গ্রহণ না করবে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। যারা বাবী ধর্ম গ্রহণ না করবে তাদের সম্পত্তি কেড়ে নিতে হবে। রাজার জন্য কর্তব্য হবে কোনো অ-বাবীকে তার রাজ্যে জায়গা না দেয়া।[৪] "অবশেষে একদিন যখন বাবের অনুসারীরা শীরাজ নগরীর একস্থানে আযান দেয়ার সময় ধৃষ্ঠতাপূর্বক এই বাক্য যোগ করে, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী নাবীল (অর্থাৎ আলী মুহাম্মাদ বাব)-এর সম্মুখে ঐশ্বরিক আয়না সমূহের আয়না রয়েছে"।[৫] এভাবে একটা ভ্রান্ত ধর্মের প্রবর্তন ও বাড়াবাড়ির কারণে মুসলিম জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, তখন উলামায়ে কেরাম এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

অবশেষে ধর্মত্যাগ, মুসলিম জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও রাষ্ট্রের শান্তি ভঙ্গের অপরাধে ১৮৫০ সালের ৯ জুলাই ৩০ বৎসর বয়সকালে আলী মুহাম্মাদ বাবকে পারস্যের অন্তর্গত তাব্রিজের সেনানিবাসে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।[৬]

আলী মুহাম্মাদ বাবকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করার পর ইয়াহ্ইয়া নামক এক ব্যক্তি "সুবহে আযল" ছদ্মনাম ধারণ করে বাবীদের নেতৃত্ব প্রদান করে। তার নেতৃত্বে বাবীগণ সংগঠিত হয়ে তাদের ধর্মগুরু হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ১৮৫২ সালে তৎকালীন পারস্য সম্রাটের উপর ব্যর্থ হামলা চালায়।

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫তম খ, পৃ, ৫৩৭
২. বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম, পৃঃ ৯
৩. নব নিকুঞ্জ, পৃষ্ঠা ২৭, প্রকাশক-বাংলাদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০০ ইং
৪. বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম, পৃ. ৯
৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫তম খণ্ড
৬. বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম, পৃষ্ঠা ৯

এই হামলায় হোসেন আলী ওরফে "বাহাউল্লাহ" অন্যতম আসামী ছিলেন। যিনি আলী মুহাম্মাদের একজন গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। কৃত অপরাধের জন্য তাকে সেখান থেকে গ্রেফতার করে তেহরানের ভূ-গর্ভস্থ অন্ধকার এক কারাগারে বন্দী করা হয়।[১]

কারাগারে থাকা অবস্থায় ১৮৬৩ সালের ২১ এপ্রিল তিনি নিজেকে এক স্বতন্ত্র শরীআতদাতা হিসাবে দাবী করেন এবং নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বা রসূল হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এ সম্পর্কে তার বক্তব্য হল,

"একদিন রাত্রিকালে অন্ধকার কূপে আমি স্বপ্নাবস্থায় শুনিতে পাইলাম, চতুর্দিক হইতে যেন নিম্নলিখিত বাণী উচ্চারিত হইতেছে- "সত্যিই তোমার স্বকীয় শক্তি ও লেখনী দ্বারা তোমাকে জয়যুক্ত করিতে আমরা সাহায্য করিব। তুমি বর্তমান সময়ে যে দুরবস্থার মধ্যে কাল অতিবাহিত করিতেছ তাহার জন্য দুঃখিত হইয়ো না। তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। যেহেতু তুমি নিরাপদেই আছ। অনতিবিলম্বে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর অমূল্যরত্নসমূহ আহরণ করিয়া দিবেন এবং তাহারাই হইতেছে সেই সকল রত্ন, যাহারা তোমাকে আশ্রয় করিয়া তোমারই নাম অবলম্বন করিয়া তোমাকে সাহায্য করিবে। ঐ নামের দ্বারাই আল্লাহ তাআলার আস্থাভাজন ব্যক্তিদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে নতুন প্রেরণার উৎস।"[২]

তিনি আরও বলেন, "অতীতে শ্রীকৃষ্ণ, মহাত্মা বুদ্ধ, যীশু খ্রীষ্ট, হযরত মুহাম্মাদ এবং অন্যান্য অনেকের ভেতরেই সেই সত্য-সূর্য উদিত হয়েছিল। আজকের অন্ধকার যুগে ঈশ্বরের জ্যোতি-বাহাউল্লাহর ভেতর দিয়েই আবার সত্য-সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমাদের সেই পুরাতন মাটির প্রদীপ বা গলে যাওয়া মোমবাতির আলো নিয়ে তৃপ্ত থাকার কোন প্রয়োজন নেই। সত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জাগো জাগো, উঠো সবাই।"[৩]

বাহাউল্লাহ ছিলেন পারস্যের জনৈক প্রভাবশালী মন্ত্রীর পুত্র। তাই বৃটিশ ও রাশিয়ান দূতাবাসের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত তিনি উক্ত অন্ধকার কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু মুসলিম জনতার রুদ্ররোষে সেখানে বসবাস করা বাবীদের জন্য (যারা বাহাউল্লাহর যুগে বাহাই নাম ধারণ করেছিল) সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলে বাহাউল্লাহর নেতৃত্বে তারা বাগদাদে নির্বাসিত জীবন গ্রহণ করে। সেখানে থেকেই বাহাউল্লাহ তার মতবাদ মানুষের মাঝে প্রচার করতে থাকেন। তিনি আলী মুহাম্মাদ বাব কর্তৃক প্রবর্তিত বাবী মাযহাবের নীতি ও বাণী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে বাবী মাযহাবকে বাহাই মাযহাবে রূপদান করেন। আলী মুহাম্মাদ বাবকে তাই বাহাউল্লাহর পথিকৃত বলা হয়।[৪]

১. বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম, পৃষ্ঠা ১০
২. বাহাউল্লাহ, বাংলাদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ "জাতীয় বাহাই কেন্দ্র" কর্তৃক প্রকাশিত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ৬-৭
৩. নব নিকুঞ্জ, বাংলাদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ "জাতীয় বাহাই কেন্দ্র" কর্তৃক প্রকাশিত, দ্বিতীয় প্রকাশ, পৃ. ৮
৪. বাহাই: একটি ভ্রান্ত ধর্ম ও "কিতাবে ঈক্বান"-এর ভূমিকা।

অবশেষে ১৮৯২ সালের ২৯ মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুবরণ করার পর ইসরাঈলের কার্মেল পর্বতে তার লাশ দাফন করা হয়। যেখানে বর্তমানে তাদের তীর্থ মন্দির অবস্থিত। এই তীর্থ মন্দিরকে "ইউনিভার্সেল হাউস অব জাষ্টিজ" বলা হয়। সেখান থেকেই সারা বিশ্বে বাহাই ধর্মের প্রচার কার্য পরিচালিত হয়ে থাকে।

বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশে বাহাইরা বিস্তার লাভ করেছে। বাহাইদের একটা পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯১৭ সালের মে মাস নাগাদ বাহাই ধর্ম ৩৪৩ দেশে, রাজ্যে ও দ্বীপ পুঞ্জের ১৩১৯৩৩ টির বেশি অঞ্চলে পৌছেছে। ৮০২টি ভাষায় এর লিখিত সাহিত্য রয়েছে। ১৭৯টা জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ রয়েছে। বাংলাদেশে বাহাইদের তৎপরতা সম্পর্কে যতটুকু ইতিহাস পাওয়া যায় তাহল বাহাউল্লাহর জীবদ্দশায়ই ১৮৭২ সালে সুলেমান খাঁন ওরফে জামাল এফেন্দী নামক জনৈক লোক বাহাউল্লাহর নির্দেশে সর্বপ্রথম এদেশে বাহাই ধর্ম প্রচার করতে আসেন। তিনি ঢাকা চট্টগ্রাম হয়ে পরবর্তীতে বার্মায় চলে যান। তার প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামের আলীমুদ্দিন নামক জনৈক ব্যক্তি বার্মার রেঙ্গুনে সর্বপ্রথম এ ধর্ম গ্রহণ করে। ইতিহাসের বর্ণনামতে তিনিই হলেন সর্বপ্রথম বাহাই ধর্ম গ্রহণকারী বাঙ্গালী। ১৯৫২ সালে বাহাইরা ঢাকায় প্রথম স্থানীয় আধাত্মিক পরিষদ গঠন করে। ১৯৭২ সালে জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ গঠন করে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি জেলাতেই স্থানীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ আছে বলে তারা দাবী করে। ১৯৯৯ সালে তাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৩২ হাজার বাহাই রয়েছে। তন্মধ্যে রাজধানী ঢাকাতেই হল সাড়ে সাত হাজার। বর্তমানে বাংলাদেশে বাহাইদের প্রধান অফিস হল ঢাকার শান্তিনগরে হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজের পশ্চিম পার্শে ৭নং নওরতন রোড। একে বাহাইরা "জাতীয় বাহাই হাজিরাতুল কুদ্স" বলে থাকেন। এখান থেকেই সমগ্র বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

বাহাউল্লাহ ইসলামী শরীআতকে মানসূখ বা রহিত বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামী শরীআত এক হাজার বছর পূর্ণ হওয়ার পর সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেছে। তিনি তার প্রবর্তিত নতুন ধর্মের জন্য নতুন শরীআত-গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার রচিত এই শরীআত-গ্রন্থের নাম 'কিতাব-ই-আকদাস'।[১] বাহাই ধর্ম মতে "কিতাবে ঈক্বান" একটি আসমানী গ্রন্থ।[২]

১. এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি। কারণ বাহাউল্লাহ্র পুত্র এবং বাহাই ধর্মের প্রথম অভিভাবক (মাষ্টার) স্যার আব্বাস আফেন্দী (আবদুল বাহা) বলে গেছেন, যদি আকদাস ছাপা হয় তাহলে তা প্রচারিত হয়ে মন্দ লোকের হাতে গিয়ে পৌছবে। অতএব এটি ছাপার অনুমতি নেই। –বাহাই: একটি ভ্রান্ত ধর্ম

২. বাংলাদেশ জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত "কিতাবে ঈক্বান" (বাংলা অনুবাদ, প্রথম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৭৫) গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে, কিতাবে ঈক্বান ফারসী ভাষায় অবতারিত সন্দেহাতীত প্রামাণ্য গ্রন্থ। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বাহাউল্লাহ যখন নির্বাসিত জীবন যাপন করিতেছিলেন, তখন ইহা দুই দিবস ও রজনীতে অবতীর্ণ হয়। বাহাউল্লাহ্র পথিকৃত হযরত বা'ব-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাপ্রাপ্তি এবং হযরত বা'ব-এর 'বয়ান' গ্রন্থের সারাংশ ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি হিসাবে ইহা অবতারিত হয়।

এই সবকিছু মিলালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বাহাই ধর্ম মূলত একটা স্বতন্ত্র ধর্ম। ইসলাম ধর্মের সঙ্গে তার কোনো সংশ্রব নেই। বাহাইগণ ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস যেমন: হাশর-নাশর, বেহেশ্‌ত-দোযখ, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিকেও অস্বীকার করেন। এমনকি বাহাইগণ ইসলাম ধর্মের পরিভাষাও ব্যবহার করেন না। তারা তাদের ধর্মীয় উপাসনালয়ের নাম দিয়েছেন 'মাস্‌রিকুল আসকার'। এ সব উপাসনালয়ের প্রতিটার ৯টা করে দরজা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে তাদের বৃহত্তম মাস্‌রিকুল আসকার অবস্থিত। তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম কিতাব-ই-আকদাস বা কিতাবে ঈক্বান। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির নামও ভিন্ন। তারা আরবী মাসের নামও পাল্টে দিয়েছে।[১] ইসলামের কোনো কিছুই তারা তাদের ধর্মে অবশিষ্ট রাখেনি। তাদের ধর্ম যে একটা স্বতন্ত্র ধর্ম, তা তারাও বলে থাকে।

বাহাই ধর্মের কতিপয় আকীদা-বিশ্বাস

১. বাহাইদের ধর্মমতে নবুওয়াত শেষ হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র শক্তি শেষ হয়নি। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী প্রয়োজনে ঈশ্বর অবতারগণের রূপ ধারণ করতে পারেন। তারা যা বলে তা হল– "মুস্তাকিল খোদায়ী জুহুর"।[২] শুধু তাই নয়; বরং তাদের বিশ্বাস হল অবতারগণ নিজেকে আল্লাহ হিসাবেও দাবী করতে পারেন। এ সম্পর্কে বাহাউল্লাহ বলেন, "যদি সর্ব গুণান্বিত আল্লাহ্র প্রকাশকগণের কেহ বলেন, আমি প্রভু, তিনি নিশ্চয় সত্য বলিবেন। উহাতে কোন সন্দেহ থাকিবে না।"[৩]

অন্যত্র বাহাউল্লাহ নিজের সম্পর্কে বলেন, এই মুহূর্তে কয়েদখানা থেকে যে কথা বলছে সেই সব কিছুর স্রষ্টা।[৪]

অন্যত্র আরও বলেছেন, এই কয়েদখানায় যে আছে সেই আমি ছাড়া এই মুহূর্তে অন্য কোন খোদা নেই।[৫]

বাহাউল্লাহ্র এসব বক্তব্য থেকে এটাই স্পষ্ট যে, তার দাবী হল তিনি মানবরূপী স্বয়ং খোদা, তার লেখা ও বাণী ঐশীবাণী তুল্য। সারকথা, বাহাইদের মতে মির্যা হোসেন আলী (বাহাউল্লাহ) হলেন আল্লাহ তাআলার প্রতিভূ ও নবী।

২. মির্যা আলী মুহাম্মাদ বাব হলেন ইমাম মাহ্‌দী[৬] ও হযরত ঈসা মসীহ।[৭]

১. বাহাই পঞ্জিকার মাসগুলো হল: বাহা, জালাল, জামাল, আজমাৎ, নূর, রহমৎ, কালিমাৎ, কামাল, আসমা, ইজ্জত, মশিয়ৎ, ইল্‌ম, কুদরাৎ, কাওল, মাসাইল, শরফ, সুলতান, মুল্‌ক ও আ'লা। –বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম, পৃষ্ঠা ১২। বরাত-সচিত্র স্বদেশ, ২য় বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ১৯৮২ এবং বাহাই ধর্মপুস্তক

২. বাহাই: একটি ভ্রান্ত ধর্ম, বরাত-মজমুয়া আক্‌দাস, পৃ. ২৮৯

৩. বাহাউল্লাহ, বাংলাদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ "জাতীয় বাহাই কেন্দ্র" কর্তৃক প্রকাশিত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ২৪

৪. বাহাই ঃ একটি ভ্রান্ত ধর্ম, পৃ. ১১ বরাত-মুবিন পৃ, ২৮৬

৫. প্রাগুক্ত পৃ. ১১, বরাত– বাহাই ধর্মের পরিচিতি

৬. পূর্বেও এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে

৭. বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম, ৪২ পৃষ্ঠা

৩. বাহাইদের ধর্মগ্রন্থের নাম কিতাব-ই-আকদাস বা কিতাবে ঈক্কান।[১]

৪. এ ধর্মে নির্দিষ্ট কোন কালিমা নেই, কেবল বাহাউল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেই সে বাহাই হিসাবে পরিগণিত হয়।

৫. পৃথিবীর সব ধর্ম বা মতবাদই আল্লাহ্ প্রদত্ত ধর্ম বা দ্বীন। (এভাবে বাহাইরা সত্য-ভ্রান্ত নির্বিশেষে সব ধর্মকেই আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। যা আল্লাহ তাআলার প্রতি জঘন্ন মিথ্যাচার। কারণ, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক কুরআনে কারীমে বহু ঈশ্বরবাদী প্রতিমা-পূজারীদের ধর্মকে স্পষ্টতই ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমনকি ইসলামের আগমনের পর অন্য সকল আসমানী গ্রন্থধারী ধর্মকেও রহিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।)

৬. শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব এরাও ঈশ্বরের বার্তাবাহক বা নবী। বাহাইদের ধারণামতে নবীর সংখ্যা ৯ জন। যথাঃ– ১. ইব্রাহীম, ২. কৃষ্ণ, ৩. মূসা, ৪. যরথুষ্ট্র, ৫. বুদ্ধ, ৬. যীশু, ৭. মুহাম্মাদ (সা.), ৮. মির্জা আলী মুহাম্মাদ বাব ও ৯. বাহাউল্লাহ।[২]

৭. এ ধর্মমতে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যুর এক হাজার বছর পর ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান রহিত হয়ে গেছে। বাহাউল্লাহ রসূল হিসাবে দাবী করার পর এ ঘোষণা করেন যে, "ইসলামী শরীআত এক হাজার বছর পূর্ণ হওয়ার পর সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে গেছে।[৩]

৮. এ ধর্ম মতে নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়নি; বরং পৃথিবীতে আরও নবী বা রসূলের আগমন ঘটবে। বাহাইগণ মনে করেন যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই সর্বশেষ নবী নন। তাঁরপর বিশ্ব মানুষের হেদায়েতের জন্য যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে অসংখ্য নবী রসূলের আগমন ঘটবে। এ মর্মে বাহাউল্লাহর ঘোষণা হল–

"পৃথিবী যতদিন থাকিবে তাহাদের (নবীদের) আগমনও ক্রমাগত চলিতে থাকিবে। মূসা ও যীশুর উত্তরাধীকারী রূপে আল্লাহ তাঁহার বার্তা-বাহকদের পাঠাইয়াছেন, আর ক্রমাগত পাঠাইতে থাকিবেন শেষ পর্যন্ত; যাহার কোনো শেষ নাই ..."[৪]

৯. পরকালে জান্নাত জাহান্নাম বলে কিছুই নেই; বরং কুরআনে বর্ণিত জান্নাত-জাহান্নাম দ্বারা রূহের বিভিন্ন অবস্থা বোঝানো হয়েছে। বাহাইদের মতে "জান্নাত হচ্ছে এক পরিপূর্ণ অবস্থা বা আল্লাহর ইচ্ছা এবং সৃষ্টির সঙ্গে ঐক্য। এবং দোযখ হচ্ছে বেহেশ্তের উক্ত ধারণার বিপরীত অবস্থা। অন্য কথায় আধ্যাত্মিক জীবনই হচ্ছে বেহেশ্ত, আর দোযখ হচ্ছে এই জীবনের মৃত্যু।[৫]

---

১. বরাত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৪. বাহাউল্লাহ- বাংলাদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ "জাতীয় বাহাই কেন্দ্র" কর্তৃক প্রকাশিত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ২৮

৫. বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম, পৃ. ৫৯

১০. বাইতুল্লাহর যিয়ারতকে এ ধর্মে রহিত করা হয়েছে। বাইতুল্লাহর পরিবর্তে ইসরাঈলে আকা হল তাদের তীর্থস্থান।[১] এখানকার কার্মেল পর্বতের সানুদেশে রয়েছে বাহাই ধর্মের তিন প্রধান দিকপালের সমাধি। "ইউনিভার্সেল হাউজ অব জাষ্টিস" তীর্থ মন্দিরের উদ্দেশ্যে তীর্থ যাত্রা পূণ্যের কাজ। বাহাই ধর্মমতে বছরে ৯ দিন ইসরাঈলের এই তীর্থক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাওয়া বাহাইদের জন্য ফরয।

১১. এ ধর্মে জিহাদ নিষিদ্ধ।

১২. বিজ্ঞান এবং ধর্ম একই অভিন্ন সত্তার দুই দিক। তাই বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে সমন্বয় থাকবে।[২] মূলত তারা সব ধর্মের মধ্যেই সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন, যাতে তাদের ধর্ম সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারে। "বিশ্ব শান্তি ও একতার জন্য বাহাই শিক্ষা" নামক প্রচারপত্রেও এ দিকে ইংগিত রয়েছে। এজন্য তারা বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, যেমন একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছিল বাদশাহ আকবার।

বাহাই ধর্মের কতিপয় রীতিনীতি

১. পৃথিবীর সব জিনিসই পবিত্র।[৩]

২. পৃথিবীর সব জিনিসই পানাহার জায়েয।[৪]

৩. বীর্য পাতের কারণে কেউ অপবিত্র হয় না।[৫]

৪. বাহাউল্লাহর মতে, দুটো এবং আব্দুল বাহার মতে একাধিক বিবাহ নিষেধ। (যদিও বাহাউল্লাহ স্বয়ং তিনটা বিবাহ করেছিলেন।)[৬]

---

১. ইসরাঈলে বাহাইদের তীর্থস্থান থাকা, ইসরাঈলের হাইফাতে তাদের প্রধান অফিস থাকা ইত্যাদি কারণে তথ্যানুসন্ধানী গবেষকগণ বাহাই-ইয়াহুদী সম্পর্কের একটা সূত্র থাকাটা প্রমাণ করেছেন। তদুপরি বাহাই নেতাগণও সেটা স্বীকার করেছেন। ইয়াহুদী বাহাই ঘনিষ্টতার প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায় ইরান জাতীয় বাহাই সোসাইটির মুখপত্র 'আখবার আমেরিকা' পত্রিকায় একবার স্পষ্টতই বলা হয়েছিল, আমরা গর্ব ও আনন্দের সাথে ঘোষণা করতে চাই যে, বাহাই সম্প্রদায় ও ইসরাঈলী সরকারের মধ্যে সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে ও ঘনিষ্টতর হচ্ছে। ১৯৬১ সালে একই পত্রিকায় বাহাই ধর্মনেত্রী রুহিয়া ম্যাগুয়েল বলেছিলেন, "আমরা ইসরাঈলের অঙ্গ এবং তার ওপর নির্ভরশীল। ইসরাঈল ও বাহাইদের ভবিষ্যৎ একটি শৃংখলের বিভিন্ন অংশের মত পরস্পর গ্রন্থীবদ্ধ।" এসব স্বীকারোক্তি এবং পদে পদে বাহাইদেরকে আমেরিকা ও ইসরাঈল কর্তৃক আর্থিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক সব ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়েছে যে, বাহাই ধর্ম আমেরিকা ও ইসরাঈলেরই সৃষ্ট একটা ষড়যন্ত্র। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাই যার লক্ষ্য। তথ্যসূত্র: বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম

২. "জাতীয় বাহাই কেন্দ্র" কর্তৃক প্রকাশিত প্রচারপত্র "বিশ্ব শান্তি ও একতার জন্য বাহাই শিক্ষা"

৩. বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম, পৃষ্ঠা, ১১, বরাত-আকদাস ১৬১-১৬২ নং বাণী

৪. প্রাগুক্ত, বরাত-বাহাউল আছার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩

৫. প্রাগুক্ত, বরাত-আকদাস ২৫৮ নং বাণী।

৬. প্রাগুক্ত, বরাত-আকদাস ১৩০ নং বাণী।

৫. বাহাউল্লাহ্‌র জীবদ্দশায় তার দিকে মুখ করে এবং তার মৃত্যুর পর তার কবরের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করতে হবে।[১]
৬. ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ করা বৈধ।[২]
৭. বাহাইরা সাক্ষাতে পরস্পরকে "আল্লাহ আবহা" বলবে।[৩]
৮. ধনী বাহাইকে দামী বাক্সে এবং সিল্ক কাপড়ে কাফন দিয়ে দাফন করতে হবে।৪
৯. মেয়েরা পিতার বাড়ি-ঘর এবং মূল্যবান পোশাক ইত্যাদি পাবে না।৫
১০. বাহাই ধর্মে উনিশ দিনে মাস এবং ১৯ মাসে বছর হয় এবং ২১ মার্চ হল বাহাই নববর্ষ।

বাহাই সম্প্রদায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী কোন মুসলিম বাতিল সম্প্রদায় নয় বরং তারা একটা কাফের সম্প্রদায়। কেননা তারা ইসলাম রহিত হওয়ায় বিশ্বাসী। তারা মানুষের মধ্যে খোদার অবতারিত হওয়া (حلول)-এর আকীদায় বিশ্বাসী। এমনকি তারা মানুষের খোদা হওয়ায় বিশ্বাসী। তারা খতমে নবুওয়াতের আকীদায় অবিশ্বাসী। এমনিভাবে ইসলামের অন্যান্য জরুরী (بدیہی) আকীদায় অবিশ্বাসী। ফলে তারা সন্দেহাতীতভাবে একটা কাফের সম্প্রদায়। তাই তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও রীতিনীতি সম্বন্ধে পর্যালোচ-না নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করছি।

কাদিয়ানী মতবাদ

"কাদিয়ানী মতবাদ" বলতে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মতবাদকে বোঝানো হয়েছে। আর "কাদীয়ানী ফিরকা" বা "কাদিয়ানী সম্প্রদায়" বলতে তার অনুসারীদেরকেই বোঝানো হয়। তবে তারা নিজেদেরকে "কাদিয়ানী ফিরকা" বা "কাদিয়ানী সম্প্রদায়" নয় বরং "আহমদিয়া মুসলিম জামাত" বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। 'আহমদী জামাত', 'মির্জায়ী', 'কাদিয়ানী' ইত্যাদি নামেও তারা পরিচিত।

উক্ত মির্জা গোলাম আহমদ পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদীয়ান নামক গ্রামের অধিবাসী। কাদিয়ান গ্রামের অধিবাসী বিধায় তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে সংক্ষেপে "কাদিয়ানী" বলে পরিচয় দেয়া হয়।

১৮৪০ ইং সনে মির্জা গোলাম আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। মির্জা গোলাম আহমদ ছিলেন মির্জা গোলাম মুর্তজার কনিষ্ঠ সন্তান। এ পরিবারটা ছিল তৎকালীন ইংরেজ সরকারের হিতাকাংখী ও ইংরেজ সরকারের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ পরিবার। তার পিতা মির্জা গোলাম মুর্তজা তৎকালীন ইংরেজ সরকারের একজন বিশেষ অনুরাগ

১. বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম, বরাত-আকদাস
২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ১১
৩. প্রাগুক্ত।
৪. প্রাগুক্ত, বরাত-আক্দাস, ২৭০-২৭১ নং বাণী।
৫. প্রাগুক্ত, বরাত-আক্দাস ২৬ নং বাণী।

ভাজন ও অনুগত কৃতজ্ঞ জমিদার ব্যক্তি ছিলেন।[১] ইংরেজ সরকারের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।[২] সিপাহী বিপ্লবের সময় তিনি ৫০টি ঘোড়া ক্রয় করে পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে বৃটিশ সরকারের সাহায্য করেছিলেন। অন্য একটি যুদ্ধে চৌদ্দজন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।[৩] তার জ্যেষ্ঠ ভাই মির্জা গোলাম কাদেরও বৃটিশ গভর্ণমেন্টের খিদমতে আন্তরিকভাবে নিয়োজিত ছিলেন।[৪] বৃটিশ সরকারের পক্ষ হয়ে তিনি দেশ প্রেমিক আযাদী আন্দোলনের বীর সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।[৫]

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রাইভেটভাবে মাধ্যমিক ক্লাস পর্যন্ত উর্দু, ফারসী, আরবী ও কিছু ইংরেজি পড়াশোনা করেন। কয়েকবার মোক্তারী পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে ব্যর্থ হন।[৬] অবশেষে শিয়ালকোট আদালতে কেরানীর চাকরি আরম্ভ করেন।

১. তার পিতা ইংরেজ সরকারের একজন অনুগত ও কৃতজ্ঞ জমিদার তথা দালাল ছিলেন- এ সম্পর্কে স্বয়ং মির্জা গোলাম আহমদের স্বীকারোক্তি নিম্নরূপ– "আমার পিতা মরহুম এ দেশের বিশিষ্ট জমিদারের মধ্যে গণ্য ছিলেন। গভর্ণরের দরবারে গেলে তিনি কুর্সি পেতেন। তিনি বৃটিশ সরকারের প্রকৃত কৃতজ্ঞ ও হিতাকাংখী ছিলেন।" إزالة الأوهام حص اول. مضفه مرزاغلام احمد قاديانى. صفحه/٦٧
২. এ সম্পর্কে স্বয়ং মির্জা গোলাম আহমদের স্বীকারোক্তি নিম্নরূপ– "আমার ওয়ালেদ সাহেবের জীবনী থেকে ঐসব খেদমত কিছুতেই পৃথক করা যায় না, যা তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে এই সরকারের কল্যাণে আঞ্জাম দিয়েছিলেন। তিনি নিজ মর্যাদা ও সামর্থ অনুযায়ী সর্বদা বৃটিশ সরকারের সেবাকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। সরকারের বিভিন্ন অবস্থা ও প্রয়োজনের সময় তিনি এমন সততা ও আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন যে, যতক্ষণ কেউ কারও খাঁটি ও আন্তরিক হিতৈষী না হয়, ততক্ষণ তেমন আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারে না।" گور نمنٹ توجہ کے لائق. مفسر مرزا غلام احمد قادیانی مطبع پنجاب پریس سیالکوٹ۔ صفحہ/١
৩. এ সম্পর্কে স্বয়ং মির্জা গোলাম আহমদের স্বীকারোক্তি নিম্নরূপ– "১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের হাঙ্গামায় যখন উচ্ছৃংখল জনতা এ অনুগ্রহদাতা গভর্ণমেন্টের মোকাবেলা করে দেশে হৈ চৈ সৃষ্টি করে, তখন আমার পিতা মরহুম নিজের টাকা দিয়ে পঞ্চাশটি ঘোড়া ক্রয় করে এবং পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সংগ্রহ করে গভর্ণমেন্টের খিদমতে পেশ করেন। আরও একবার চৌদ্দজন অশ্বারোহী দিয়ে সরকারের খিদমত করেন। এসব আন্তরিকতাপূর্ণ খিদমতের কারণে তিনি গভর্ণমেন্টের প্রিয়পাত্র বলে গণ্য হন।" ازالہ الاوہام حصۂ اول. مضف مرزاغلام احمد قادیانی. صفح ١٤٧/ و گورنمنٹ کی توجہ کے لائق . مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی مطبع پنداب پریس سیالکوٹ، صفحہ/١-
৪. এ সম্পর্কে স্বয়ং মির্জা গোলাম আহমদের স্বীকারোক্তি নিম্নরূপ– "এ অধমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মির্জা গোলাম কাদের যতদিন জীবিত ছিলেন তিনিও পিতা মরহুমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন এবং বৃটিশ গভর্ণমেন্টের আন্তরিক খিদমতে মনে প্রাণে নিয়োজিত থেকেছেন। অতঃপর তিনিও মুসাফিরখ-ানা থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।" گورنمنٹ کی توجہ کے لائقں مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. مطبع پنجاب پریس سیالکوٹ۔ صفحہ/١-
৫. এ সম্পর্কে মির্জা সাহেব বলেন, আমার পিতা আমার ভ্রাতাকে একমাত্র গভর্নমেন্টের খেদমতের জন্য কোন কোন যুদ্ধে পঠিয়েছিলেন। সর্বক্ষেত্রেই গভর্ণমেন্টের মনস্তুষ্টি করেছেন। گورنمیسٹ کی توجہ کے لائق مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی مطبع پنجاب پریس سیالکوٹ۔ صفحہ/١۔
৬. কাদিয়ানী ধর্মমত, মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী

কাদিয়ানী মতবাদের পেক্ষাপট

ইংরেজরা উপমহাদেশের ক্ষমতা দখলের পর বিভিন্ন সময়ে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত হয়। সর্বশেষ দিল্লীর শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ-এর আমলে ১৮৫৭ সালে আযাদী আন্দোলন সংঘটিত হয়। ইংরেজরা এই আন্দোলনের নাম দিয়েছিল সিপাহী বিপ্লব। শেষ পর্যন্ত কতিপয় বিশ্বাসঘাতক হিন্দু মুসলিমের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই বিপ্লব পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। সিপাহী জনতার সেই পরাজয়ের পর ইংরেজরা উপলব্ধি করেছিল যে, এ যুদ্ধে যদিও হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতিই অংশ গ্রহণ করেছে, তথাপি বিপ্লবের মূল নেতৃত্ব দিয়েছিল মুসলমানরা। তারা এ সত্যটিও অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, তারা এ দেশ মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। তাই সংগত কারণেই মুসলমানরা ইংরেজদের অধীনতা মেনে নিতে পারে না। মুসলমানদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে না পারলে পুনরায় সুযোগ পেলেই তারা আবার বিদ্রোহ করবে। তারা মুসলমানদের চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার মানসে তাদের উপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়েছিল, হাজার হাজার আলেমকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়েছিল। মুসলমানদের থেকে নবাবী-জমিদারী কেড়ে নিয়ে প্রতিবেশী হিন্দুদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিল। কিন্তু জিহাদের স্পৃহা-তাড়িত মুসলিম জাতির অন্তর থেকে জিহাদের স্পৃহা দূরীভূত করা সম্ভব হয়নি। হাজী শরীয়তুল্লাহর ফারায়েজী আন্দোলন, হাজী নেসার আলী ওরফে তীতুমীরের বাঁশের কেল্লার সশস্ত্র বিপ্লব প্রভৃতি ঘটনাবলী ইংরেজ জাতিকে বিচলিত করে তুলেছিল। তারা ভাবল এতকিছু করার পরও মুসলমানরা বারবার কেন বিদ্রোহ করছে? এ বিষয়ে সঠিক তথ্য উদঘাটনের জন্য ১৮৬৯ সালে উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে একটা কমিশন বা প্রতিনিধি দল ভারতে প্রেরণ করা হল। এ কমিশন প্রায় এক বছর যাবত ভারতবর্ষে অবস্থান করে পর্যবেক্ষণ পূর্বক বৃটিশ সরকারের নিকট এ ব্যাপারে যে রিপোর্ট পেশ করেছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ভারতীয় মুসলমানরা কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে। মুসলমানদের ধর্মীয় নির্দেশ রয়েছে বিজাতীয়দের শাসন মানতে নেই। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ কুরআনেই বিজাতীয়দের শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ রয়েছে। তাদের ধর্মীয় নেতারা ফতওয়া জারি করেছে ভারতবর্ষ দারুল হরব (শত্রু দেশ) এ পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয হয়ে পড়েছে। জিহাদের প্রেরণায় মুসলমানরা উন্মাদের মত আত্মাহুতি দিতে পারে।[১]

উক্ত রিপোর্টে যে কয়েকটা বিষয়ের সুপারিশ করা হয়েছিল তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটা দফা ছিল নিম্নরূপ–

১. দারিদ্রপীড়িত সর্বহারা মুসলমানদের একটি শ্রেণীকে উপঢৌকন ও উপাধি বিতরণের মাধ্যমে বৃটিশের অনুগত করে তুলতে হবে। তারা ভারতবর্ষকে 'দারুল আমান' (শান্তির দেশ) বলে ফতওয়া দিয়ে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ

১. কাদিয়ানী ধর্মমত, মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী, ৫০-৫১ পৃ. থেকে সংক্ষেপিত।

অপ্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করবে। তারা প্রচার করবে, যে দেশে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোন বাধা নেই, সে দেশের সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয হতে পারে না।

২. এ দেশের মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পীর-মুরীদীর ভক্ত। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্য থেকে আমাদের আস্থাভাজন এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে নবীরূপে দাঁড় করাতে হবে, যে বংশ পরম্পরায় আমাদের আস্থাভাজন বলে প্রমাণিত হয়। দারিদ্র- পীড়িত ধর্মজ্ঞানহীন মুসলমানদের মধ্যে তার নবুওয়াত চালিয়ে দেয়ার জন্য আমাদের সরকার কর্তৃক তাকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার নিশ্চয়তা দিতে হবে। অতঃপর তথাকথিত নবী এক সময় ঘোষণা দিবে, "আমার নিকট এই মর্মে ওহী এসেছে যে, ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকার আল্লাহ্‌র রহমত স্বরূপ এবং ওহীর দ্বারা আল্লাহ তাআলা এখন থেকে জিহাদ হারাম করে দিয়েছেন।" এভাবে মুসলমানদের অন্তর থেকে জিহাদের প্রেরণা ও উন্মাদনা দূরীভূত করা সম্ভব হবে। অন্যথায় ভারতে আমাদের শাসন দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হবে না।

৩. সুপারিশমালার মধ্যে আরও ছিল– প্রথমে সে নিজেকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় বই-পুস্তক রচনা করবে। এ কাজে তাকে গড়ে তোলার জন্য আমাদের ওরিয়েন্টালিষ্টরা তাকে উপাদান সংগ্রহ করে দিবে। আমাদের গোয়েন্দা ও প্রচার বিভাগ তার রচিত পুস্তকাদি প্রকাশ ও প্রচার কাজে তাকে সহযোগিতা করবে। এরপর তার প্রতি ভক্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সে নিজেকে মোজাদ্দেদ বলে দাবী করবে। এ দাবী মুসলমানদের গলাধঃকরণ করানোর পর পর্যায়ক্রমে সে নিজেকে মাহ্‌দী বলে দাবী করবে। অতঃপর সে মুসলিম উম্মাহ্‌র মসীহে মাওউদ হওয়ার দাবী করবে। এক সময় ধীরে ধীরে সে নিজেকে নবী মুহাম্মাদের ছায়া (জিল্লী, বুরূজী ও উম্মতী নবী) বলে দাবী করবে। ইত্যাদি।[১]

প্রতিনিধি দলের সুপারিশের প্রেক্ষিতে তৎকালীন বৃটিশ সরকারের কর্মকর্তাগণ মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন নবী দাঁড় করানোর প্রস্তাবটা গ্রহণ করে এবং ভারতে বৃটিশ সরকারের বংশ পরম্পরা দালালদের থেকে একজন নবী দাঁড় করানোর প্রস্তাবটা গৃহীত হয়। প্রস্তাব ও পরিকল্পনা মোতাবেক মির্জা গোলাম আহমদকে নবী

১. উপরোক্ত বিবরণ কাদিয়ানী ধর্মমত ৫১-৫৫ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত (সংক্ষেপিত)। লেখক বলেন, আমাদের এ বক্তব্যের কিয়দাংশ 'উইলিয়াম হান্টার' রচিত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' হতে গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে উক্ত কমিশন ও ভারতে কর্মরত পাদ্রীগণসহ তৎকালীন বৃটিশ সরকারের কর্মকর্তাদের লন্ডনে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সের মুদ্রিত রিপোর্ট 'দি এ্যারাইভেল অব দি বৃটিশ এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া', 'মির্জা কী কাহিনী খোদ মির্জা কী জবানী' এবং 'মিজায়ী তাহ্‌রীক কা পাছ মান্‌জার' হতে উদ্ধৃত।

হিসাবে দাঁড় করানোর জন্য তারা মনোনীত করে। তাই মির্জা গোলাম আহমদ হল ইংরেজদেরই দাঁড় করানো নবী।[১]

পরিকল্পনা মোতাবেক গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এক সময় নিজেকে মোজাদ্দিদ (সংস্কারক) বলে দাবী করে বসলেন। এর পর তিনি নিজেকে ইমাম মাহ্‌দী বলে দাবী করলেন অর্থাৎ, হাদীছে যে ইমাম মাহ্‌দীর আগমনের সু-সংবাদ রয়েছে, তিনি নিজেকে দাবী করে বসলেন যে, আমিই সেই ইমাম মাহ্‌দী। তার পর এক সময় তিনি প্রচার করতে আরম্ভ করলেন যে, মুসলমানগণ যে বিশ্বাস রাখে ঈসা (আ.) স্বশরীরে উর্দ্ধাকাশে উত্তোলিত হয়েছেন- এটা বানোয়াট ও মিথ্যা। আসলে মরিয়মের পুত্র ঈসা নবী আকাশে উত্তোলিত হননি। বরং তিনি তার পরিণত বয়সে কাশ্মীরে এসে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। শেষ যুগে এ উম্মত হতে ঈসা মসীহ নামে একজন মহাপুরুষের আগমনের যে কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ। তার পর এক সময় তিনি দাবী করলেন যে, আমি মোহাদ্দাছ (محدث) অর্থাৎ, (তার ভাষায়) "আল্লাহ তাআলার সঙ্গে ওহীর মাধ্যমে আমার কথোপকথন হয়।"[২]

বিংশ শতাব্দির শুরুতে (১৯০১ সালে) তিনি স্পষ্টভাবে আসল কথায় চলে আসলেন এবং দাবী করলেন যে, 'আমি শরীআতের অধিকারী পূর্ণ নবী।' এরপর থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এ দাবীর উপর অটল ছিলেন। বরং মাঝে-মধ্যে অন্য সকল নবী রসূল থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবীও করেছেন। এমনকি স্বয়ং আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী করেছেন।[৩]

নবুওয়াতের ঘোষণা দেয়ার পরপরই তিনি পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ইতিপূর্বে জিহাদকে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণাও করেছেন।[৪] ইংরেজদের আনুগত্য করার

---

১. মির্জা গোলাম আহমদ যে ইংরেজদেরই দাঁড় করানো নবী তা মির্জা গোলাম আহমদের ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৮ সনে লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায়: "পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতায় সরকার আমার পরিবারকে একটি অনুগত ও ভক্ত পরিবাররূপে সনাক্ত করেছেন এবং বৃটিশ গভর্ণমেন্টের মাননীয় অফিসারবৃন্দ সর্বদা দৃঢ় মনোভাবসহ বিভিন্ন চিঠিপত্রে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, "নিজের লাগানো এ চারাগাছটি" (اس خود کاشتہ پودا)-এর ব্যাপারে সুচিন্তিত, সতর্ক ও সুনজরের মনোভাব পোষণ করুন এবং অধীনস্থ অফিস-ারদেরকে বলে দিন, তারাও যেন এ পরিবারের স্বীকৃত আনুগত্য ও আন্তরিকতার প্রতি লক্ষ রেখে আমাকে ও আমার দলকে কৃপা ও মেহেরবাণীর দৃষ্টিতে দেখেন।" قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن جنوری (۲۰۰۱م). الیاس برنی. صفحہ / ۷۰۲. از تبلیغ رسالت جلد ہفتم. صفحہ /۱۹-۲۰۔

২. ازالۃ الاوہام. مصنفہ مرزاغلام احمد قادیانی. حصہ اول. صفحہ /۳۲۰۔

৩. পরবর্তীতে এ কথার বরাত পেশ করা হয়েছে।

৪. এ সম্পর্কে স্বয়ং মির্জা সাহেবের বর্ণনা নিম্নরূপ: "অদ্য হতে ধর্মের জন্য যুদ্ধ হারাম করা হল। এরপর যে ব্যক্তি ধর্মের জন্য তরবারি উঠাবে এবং গাজী নাম ধারণ করে কাফেরদের হত্যা করবে, সে খোদা ও রসূলের নাফরমান বলে গণ্য হবে।" (এস্তেহার চান্দা মানারাতুল মসীহ-পৃ. বে, তে যমীমা খোতবায়ে এলহামিয়া।) তিনি আরও বলেন, "আমি এ উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক পুস্তক আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় রচনা করেছি যে, (পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ না করার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টায় নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।[১] ইংরেজ সরকারের পক্ষে পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে এবং বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে প্রচার করেছেন।[২] এবং পর্যায়ক্রমে তিনি অনেক কিছু দাবী করেছেন এবং মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ও অনৈক্য সৃষ্টির জন্য অনেক নতুন নতুন আকীদা-বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছেন। তার এসব দাবীর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী জঘন্য দাবী হল মুসলমানদের সর্বসম্মত এবং সুস্পষ্ট আকীদার বিরুদ্ধে নিজেকে তিনি নবী বলে দাবী করেছেন।

১৯০৮ সালে আহলে হাদীছের বিখ্যাত আলেম মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতশরীর সঙ্গে মির্জা কাদিয়ানী চ্যালেঞ্জ করে মুবাহালায় অবতীর্ণ হন।[৩] মুবাহালা অনুষ্ঠিত

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা) অনুগ্রহদাতা গভর্ণমেন্টের (বৃটিশের) বিরুদ্ধে জিহাদ কিছুতেই দুরস্ত নেই। বরং খাঁটি মনে আনুগত্য স্বীকার করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। একই উদ্দেশ্যে আমি বহু অর্থ ব্যয়ে সে সমস্ত পুস্তক প্রকাশ করে মুসলিম দেশসমূহে পৌছিয়েছি। আমি জানি, এসব পুস্তকের বিস্তর প্রভাব ঐসব দেশেও পড়েছে। (তাবলীগ ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৫) তিনি আরও বলেছেন, "জিহাদ নিষিদ্ধকরণ ও ইংরেজ সরকারের আনুগত্য সম্পর্কে আমি এত বেশি পুস্তক রচনা করেছি ও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি যে, ঐগুলো একত্র করলে পঞ্চাশটি আলমারী ভর্তি হতে পারে"। تریاق القلوب. مرزاغلام احمد قادیانی. صفحہ/۲۷۔

১. এ সম্পর্কে স্বয়ং মির্জা সাহেবের বর্ণনা নিম্নরূপ: "আমি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলছি, অনুগ্রহদাতার অমঙ্গল কামনা করা হারামী ও বদকার মানুষের কাজ। সেমতে আমার মাযহাব আমি বারবার প্রকাশ করেছি যে, ইসলাম দু'ভাগে বিভক্ত- একটি খোদার আনুগত্য করা, অপরটি ঐ সাম্রাজ্যের আনুগত্য করা, যে সাম্রাজ্য শান্তি স্থাপন করেছে এবং অত্যাচারীর কবল থেকে নিজের ছায়ায় আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে। সকলের জানা উচিত বৃটিশ সরকারই এরূপ সাম্রাজ্য"। گورنمنٹ کی توجہ کے لائق. مرزا غلام احمد قادیانی. مطبع پنجاب پریس سیالکوٹ۔ صفحہ/۳۔

২. এ সম্পর্কে স্বয়ং মির্জা সাহেবের বর্ণনা নিম্নরূপধ "ইংরেজ সরকারের পক্ষে আমি যেসব খিদমত করেছি তা এই যে, আমি প্রায় পঞ্চাশ হাজার পুস্তক-পুস্তিকা এবং বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে এদেশে ও অন্যান্য মুসলমান দেশে প্রচার করেছি। এ সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকার আলোচ্য বিষয় ছিল এই যে, ইংরেজ সরকার আমাদের অনুগ্রহদাতা, সুতরাং এ সরকারের খাঁটি আনুগত্য করা, মনে প্রাণে এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং দোয়া করা প্রত্যেকটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য মনে করা উচিত। এসব পুস্তক উর্দু, ফার্সী, আরবী ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় রচনা করে সমস্ত মুসলিম দেশে এমনকি মক্কা ও মদীনার ন্যায় পবিত্র শহরগুলোতেও সুন্দরভাবে প্রচার করে দিয়েছি। রোমের রাজধানী কনষ্টান্টিনে-াপল, সিরিয়া, মিসর, কাবুল এবং আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহরেও সাধ্যমত প্রচার করেছি। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ জিহাদের নাপাক ধারণা ত্যাগ করেছে। যা মূর্খ মোল্লাদের শিক্ষায় তাদের অন্তরে বদ্ধমূল ছিল। এ মহৎ খিদমত আঞ্জাম দিতে পারায় আমি গর্বিত। বৃটিশ ইন্ডিয়ার কোনো মুসলমানই আমার খিদমতের নজির দেখাতে সক্ষম হবে না। ستارۂ قیصرہ صفحہ/٦. مرزاغلام احمد قادیانی، مطبع ضیاء الاسلام قادیان. ۱۸۹۹

৩. "মুবাহালা" ইসলামী শরীআতের একটি পরিভাষা। এ প্রসঙ্গ পবিত্র কুরআনেও আলোচিত হয়েছে। শরীআতের পরিভাষায় হক্ব ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব অবসানে, সত্যের জয় এবং অসত্যের নিপাতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র দরবারে চরম বিনয় ও মিনতি সহকারে উভয় পক্ষের প্রার্থনাকে মুবাহালা বলা হয়।

হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে মির্জা কাদিয়ানী সাহেব লাহোর শহরে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মল-মুত্রের মধ্যে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন।[১]

মির্জা গোলাম আহমদের নবী রসূল হওয়ার দাবী সম্বলিত কয়েকটা উক্তি

বুরূজী বা যিল্লী বা ছায়া নবী হওয়া সম্পর্কে তার কয়েকটা উক্তি

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছায়া নবী হওয়ার দাবীর পক্ষে যেসব বক্তব্য দিয়েছেন, তার কয়েকটা উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করা হল। তবে তিনি যিল্লী নবীর সাথে সাথে নিজেকে উম্মতী নবী বলেও দাবী করেছেন।

(১) "ছায়া স্বরূপ যার নাম দেওয়া হয় মুহাম্মাদ ও আহমদ তার (মাসীহে মাওউদ) নবুওয়াতের দাবী সত্ত্বেও আঁ-হযরত (সা.) খাতামুন্নাবিয়্যীন থাকবেন। কেননা এই দ্বিতীয় মুহাম্মাদ ওই মুহাম্মাদ (সা.)-এরই রূপ এবং তারই নাম।"[২]

(২) আমি রসূল ও নবী, অর্থাৎ, পূর্ণাঙ্গ ছায়া হিসাবে। আমি এমন আয়না যার মধ্যে মুহাম্মাদী আকৃতি ও মুহাম্মাদী নবুওয়াতের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব পড়ছে।[৩]

(৩) "আল্লাহ তাআলা নবীজি (সা.)-কে নবুওয়াতের সীল-মোহর দিয়েছেন। অন্য কথায় কামালিয়াতের ফয়েজ দানের ক্ষমতা দিয়েছেন, যা আর কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। সে জন্য তাঁর নাম হয় খাতামুন্নাবিয়্যীন। অর্থাৎ, তাঁর আনুগত্য নবুওয়াতের কামালিয়্যাত দান করে। তার রূহানী তাওয়াজ্জুহ (দৃষ্টি) নবী সৃষ্টি করে। এ পবিত্র ও ঐশ্বরিক শক্তি আর কোনো নবীকে দান করা হয়নি।"[৪]

(৪) "যে সমস্ত জায়গায় আমি নবুওয়াত বা রিসালত সম্পর্কে অস্বীকার করেছি তা শুধু এই অর্থে যে, আমি স্বতন্ত্র কোন শরী'আত নিয়ে আসিনি এবং পৃথক কোন নবীও নই। তবে এই অর্থে আমি রসূল এবং নবী যে, আমি স্বীয় পথ প্রদর্শক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অদৃশ্য বা আধ্যাত্মিক ফয়েজ ও শক্তি লাভ করে এবং নিজের জন্য সেই নাম গ্রহণ করে তাঁরই মধ্যস্থতায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইল্‌মে গায়েব পেয়েছি। কিন্তু নতুন শরীআত ছাড়া আমাকে নবী বলতে আমি কখনো প্রতিবাদ করিনি। বরং এ সব অর্থে আল্লাহ তাআলা আমাকে নবী ও রসূল বলে আহবান করেছেন। সুতরাং এখনো আমি এ অর্থে নবী ও রসূল হওয়ার কথা অস্বীকার করি না।"[৫]

---

১. মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার দাজ্জালের যে দৃষ্টান্তমূলক পরিণতির প্রয়োজন ছিল তাই হয়েছে।

২. ایک غلطی کا ازالہ. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. صفحہ/٦-

৩. مباحثہ راولپنڈی. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. کتابت سید محمد باقرخوشنویس قادیان، صفحہ/١٣٤-

৪. مباحثہ راولپنڈی. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. کتابت سید محمد باقرخوشنویس قادیان، صفحہ/١٤١ اور ضميمه حقيقة الوحی صفحہ/١٧ وعبارته – إني احد من الأمة النبوية ثم مع ذالك سماني الله نبيا تحت فيض النبوة المحمدية وأوحي إلى ما اوحی/.

৫. مباحثہ راولپنڈی. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. کتابت سید محمد با قرخوشنویس قادیان، صفحہ/١٤٢

যিল্লী বা ছায়া নবী হওয়ার দাবী একটা উদ্ভট, অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক দাবী। এটা অনেকটা হিন্দুদের অযৌক্তিক পুণর্জন্মের আক্বীদার নামান্তর। গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যেসব কথার মারপ্যাঁচে নিজেকে যিল্লী বা ছায়া নবী বলেছেন, হিন্দুরা অনুরূপভাবে বলতে পারে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই- মুসলমানদের এই আকীদার সঙ্গে আমাদেরও কোন বিরোধ নেই। আমাদের সব খোদাও হলেন যিল্লী খোদা বা ছায়া খোদা।

স্বতন্ত্র নবী হওয়া সম্পর্কে তার কয়েকটা উক্তি

(১) "আমি সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন এবং তিনিই আমার নাম নবী রেখেছেন।[১]

(২) "আমি যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত তা প্রমাণ করার জন্য তিনি এমন অসংখ্য (বারাহীনে আহমদিয়ার বর্ণনামতে[২] ১০ লক্ষাধিক) নিদর্শন দেখিয়েছেন যে, সেগুলো হাজার নবীর উপর বণ্টন করা হলেও এর দ্বারা তাদের সকলের নবুওয়াত প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু এরপরও মানুষের মধ্যে যারা শয়তান তারা মানে না।"[৩]

(৩) "আমি সেই আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন, তিনিই আমার নাম নবী রেখেছেন। তিনিই মাসীহে মাওউদ নামে আমাকে ডেকেছেন। তিনিই আমার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য বিপুল নিদর্শন পেশ করেছেন, যার সংখ্যা তিন লাখ পর্যন্ত পৌঁছেছে।"[৪]

উল্লেখ্য তিনি (মির্জা সাহেব) যে সব প্রমাণের কথা বলেছেন, তার মধ্যে রয়েছে তার মনি অর্ডারের মাধ্যমে বা বিভিন্ন উপায়ে টাকা-পয়সা বা হাদিয়া-তোহ্‌ফা আগমনের সংবাদ। (অথচ এটা কৃত্রিম কৌশলের মাধ্যমেও বলা যেতে পারে।) যেমন: তিনি বলেছেন, আমার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নিয়ম হল প্রায়শই নগদ টাকা-পয়সা যা আসে বা যা হাদিয়া- তোহ্‌ফা আসে তা পূর্বাহ্নেই এলহাম কিংবা স্বপ্ন যোগে আমাকে অবগত করানো হয়। এ ধরনের নিদর্শন হবে পঞ্চাশ হাজারের উর্ধ্বে।[৫]

(৪) "এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, এই সব এলহামের মধ্যে আমার সম্পর্কে বারবার বলা হয়েছে যে, এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রেরিত, আল্লাহ্‌র আদেশপ্রাপ্ত, খোদার বিশ্বস্ত এবং

---

১. ایضا، صفحہ/١٣٥

২. براهين احمدیہ حصۂ پنجم مرزا غلام احمد قادیانی. صفحہ/٥٩ مطبع انوار احمدیہ مشین پریس قادیان ١٩٠٨

৩. چشمۂ معرفت صفحہ/٣١٧. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. شائع کردہ ڈیوتالیف وتصنیف ربوہ مطبع انوار احمدیہ مشین پریس قادیان ١٩٠٨

৪. تتمه حقيقة الوحي. صفحہ/٦٨. مصنفه مرزا غلام احمد قاديانی. احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاهور ١٣٧١/١٩٥٢ھ

৫. قادیانی مذهب (جدید ایڈیشن. جنوری ٢٠٠١م) الیاس برنی. صفحہ/٤٩٤ از حقیحة الوحی. صفحہ/٣٣٣ وروحانی خزائن ج٢٢. صفحہ/ ٣٤٦

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত। যা কিছু সে বলেন তার প্রতি তোমরা ঈমান আনয়ন কর। তার শত্রুগণ জাহান্নামী।"[১]

(৫) হযরত মসীহ মাওউদ (মির্জা সাহেব) নিজেকে স্তষ্টভাবে আল্লাহ্‌র নবী ও রসূল হিসাবে পেশ করেছেন। এবং নিজেকে নবী রসূলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

মির্জা গোলাম আহমদের দাবীসমূহ

তার দাবীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০টা। এসব দাবীর অনেকটা পরস্পর-বিরোধীও ছিল আবার বিচিত্রও ছিল। যেমন তার কয়েকটা দাবীর কথা নিম্নে তুলে ধরা হল।

১. মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী।[৩]
২. ইমাম হওয়ার দাবী।[৪]
৩. খলীফা হওয়ার দাবী।[৫]
৪. ইমাম মাহ্‌দী হওয়ার দাবী।[৬]
৫. ঈসা ইব্‌নে মারইয়াম হওয়ার দাবী।[৭]
৬. ঈসা ইব্‌নে মারইয়ামের অবতার হওয়ার দাবী।[৮]
৭. মসীহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মাসীহ) হওয়ার দাবী। তিনি বলেন, কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসা মসীহের আসমান থেকে অবতরণ করার যে কথা হাদীছে উল্লেখ আছে, তা আমি।[৯]
৮. যিল্লী নবী বা বুরূজী নবী অর্থাৎ, ছায়া নবী হওয়ার দাবী।[১০]
৯. উম্মতী নবী হওয়ার দাবী।[১১]

---

১. انجام اتھم۔ مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی. صفحه/٦٢
২. قادیانی مذهب (جدید ایڈیشن. جنوری ٢٠٠١م) الیاس برنی. صفحه/٢٦٥-٢٦٤. از خبار الفضل قادیان. ج/٢ نمبر ٣٨ مورخه ١٣ ستمبر ١٩١٤
৩. মির্জা বলেন, "আল্লাহ আমাকে এই যুগ এবং যমানার ইমাম, খলীফা ও মুজাদ্দিদ বানিয়েছেন।" آئینۂ کمالات اسلام. (عربی حصه) مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی. صفحه/٤٢٣
৪. آئینۂ کمالات اسلام. (عربی حصه) مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی. صفحه/٤٢٣۔
৫. প্রাগুক্ত।
৬. তার প্রায় সব গ্রন্থেই এর উল্লেখ রয়েছে।
৭. انجام اتھم. مرزا غلام احمد قادیانی. صفحه/٥٩ و حقیقة الوحي. مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی، صفحه/٧٢ احمدیه انجمن اشاعت اسلام لاهور ١٣٧١ھ/١٩٥٢م
৮. قادیانی مذهب (جدید ایڈیشن. جنوری ٢٠٠١م). الیاس برنی. صفحه/٤٣٥-٤٣٤. ضمیمه. رساله جهد. ص ٧٦، روحانی خزائن ص ٢٨-٢٧ مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی صاحب
৯. حقیقة الوحی. مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی. صفحه/١٩٤۔ احمدیه انجمن اشاعت اسلام لاهور١٣٨١ھ/١٩٥٢م
১০. مباحثۂ راولپنڈی. مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی. کتابت سید محمد باقر خوشنویس قادیان، صفحه/١٣٧
১১. حقیقة الوحی. مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی. صفحه/٣٩٠ احمد یه انجمن اشاقت اسلام لاهور ١٣٧١ ھ/ ١٩٥٢م

১০. এলহামী নবী হওয়ার দাবী।[১]
১১. নবী হওয়ার দাবী।[২]
১২. রসূল হওয়ার দাবী।[৩]
১৩. তার নিকট ওহী আসার দাবী।[৪]
১৪. তার উপর ২০ পারার মত কুরআন নাযিল হওয়ার দাবী।[৫]
১৫. ঈসা (আ.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী।[৬] তিনি নিজেকে ঈসা (আ.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য হযরহ ঈসা (আ.) সম্বন্ধে জঘন্য ধরনের মন্তব্য করেছেন। যেমন: তিনি বলেছেন, ঈসা মাসীহের তিন দাদী ও তিন নানী (বেশ্যা) ছিল (নাউযুবি-ল্লাহ)।[৭] অন্যত্র বলেছেন, ঈসা মসীহের মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিল।[৮]
১৬. সকল নবীর সমকক্ষ হওয়ার দাবী।[৯]
১৭. তিনি আদম, শীষ, নূহ, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়া'কূব, ইউসুফ, মূসা, দাউদ, ঈসা প্রমুখ বিভিন্ন নবী হওয়ার দাবী করেছেন।[১০]

---

১. مباحثۂ را ولڈوی . مصنفه مرزاغلام احمد قادیانی. کتابت سید محمد باقی خوسنویس قادیان، صفحہ /١٣٧
২. মির্জা বলেনঃ এই উম্মতের মধ্যে নবী নাম পাওয়ার জন্য আমাকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। حقیقة الوحی. مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی، صفحه/٣٩١ احمدیه انجمن اشاعت اسلام لاهور ١٣٧١ ھ/١٩٥٢م۔
৩. মির্জা বলেন, "আল্লাহ আমার সম্বন্ধে বলেছেন, আমি তোমাকে রসূলরূপে প্রেরণ করলাম।" ایضا صفحه/١٠١۔
৪. মির্জা বলেন, "আমি যা কিছু আল্লাহ্‌র ওহী থেকে প্রাপ্ত হই, খোদার কসম তাকে সব রকমের ত্রুটি থেকে পবিত্র মনে করি। কুরআনের ন্যায় আমার ওহী ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত। এটা আমার ঈমান ও বিশ্বাস। খোদার কসম, এটাও আল্লাহ পাকের মুখ-নিঃসৃত বাণী। نزول المسیح. مرزا غلام احمد قادیانی/ صفحه/٩٩۔
৫. মির্জা বলেন, "আমার উপর আল্লাহ্‌র কালাম নাযিল হয়েছে, যা লেখা হলে বিশ পারার চেয়ে কম হবে না।" حقیقة الوحی. مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی. صفحه/٣٩١ احمد یه انجمن اشاعت اسلام لاهور ١٣٧١ھ/ ١٩٥٢م۔
৬. মির্জা বলেন, "ইবনে মারইয়াম (ঈসা আ.)-এর কথা ছেড়ে দাও; গোলাম আহমদ তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" নুযূলে মাসীহ ১০১ পৃ.।
৭. যমীমা আঞ্জামে আথহাম, ৫ পৃ.।
৮. প্রাগুক্ত, ৫ পৃ.।
৯. "যদিও দুনিয়ায় অনেক নবী আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু জ্ঞান ও বিচক্ষণতায় আমি কারুর চেয়ে কম নই। نزول المسیح. مرزا غلام احمد قادیانی. صفحه/٩٠۔
১০. তিনি বলেছেন, আদম (আ.) থেকে নিয়ে শেষ নবী পর্যন্ত সব নাম তাকে দেয়া হয়েছে। نزول المسیح. مرزا غلام احمد قادیانی. صفحه/٩٠۔

১৮. কোন কোন নবী থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী।[১]
১৯. সমস্ত নবী রসূল থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী।[২]
২০. আহমদ হওয়ার দাবী।[৩]
২১. মুহাম্মাদ হওয়ার দাবী।[৪]
২২. মুহাম্মাদ বরং মুহাম্মাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী।[৫]
২৩. তিনি জগতবাসীর জন্য আল্লাহর রহমত স্বরূপ।[৬]
২৪. তাকে সৃষ্টি করা না হলে আসমান জমিন কিছুই সৃষ্টি করা হত না।[৭]
২৫. আল্লাহর প্রকাশ হওয়ার দাবী।[৮]
২৬. তিনি আল্লাহর পুত্রবৎ।[৯]

---

১. হাদীছে এসেছে– "যদি মূসা ও ঈসা জীবিত থাকতেন তাহলে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এত্তেবা করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকত না।" কিন্তু আমি বলি, মাসীহে মাওঊদের সময় মূসা ও ঈসা জীবিত থাকলে মাসীহে মাওঊদ (মির্জা সাহেব)-এর অবশ্যই এত্তেবা করতে হত। قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م). الیاس برنی. صفحہ/ ۳۱۰ از اخبار الفضل قادیان/ ج/ ۳ نمبر ۹۸ مورخہ ۱۸ مارچ ۱۹۱۲ء۔

২. মির্জা বলেন, "আমার আগমনে প্রত্যেক নবী জীবন লাভ করেছেন। সমগ্র রসূল আমার জামার মধ্যে লুকিয়ে আছেন।" نزول المسیح. مرزا غلام احمد قادیانی. صفحہ/ ۱۰۰۔ অন্যত্র তিনি বলেছেন, "অনেক নবী আগমন করেছেন, কিন্তু কেউই মারেফতে আমার অগ্রগামী হতে পারেননি।" (ایضا) তিনি আরও বলেছেন, "ঈসা মূসা মুহাম্মাদ প্রমুখের চেয়ে তার একীন বেশি।" (أيضا. صفحہ/ ۹۰-۱۱۰)

৩. মির্জা সাহেব কুরআনের আয়াতে যে "আহমদ" নামের উল্লেখ আছে তা নিজের জন্য দাবী করেছেন। حقیقۃ الوحی. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور ۱۳۸۱ھ/ ۱۹۵۲م۔

৪. حقیقۃ الوحی. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور ۱۳۷۱ھ/ ۱۹۵۲م۔

৫. আমার বিশ্বাস হল হযরত মাসীহে মাওঊদ এত পরিমাণ রসূল (সা.)-এর নকশে কদমে চলেছেন যে, "তিনিই" (মুহাম্মাদ) হয়ে গেছেন। কিন্তু উস্তাদ আর শাগরেদের মর্যাদা কি এক হতে পারে? যদিও শাগরেদ জ্ঞানে উস্তাদের সমকক্ষ হয়ে যায়?... ঠিক আঁ হযরত (সা.) ও মসীহে মাওঊদের ব্যাপারটাও অনুরূপ। قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م). الیاس برنی. صفحہ/ ۳۱۸. از ذکر الٰہی صفحہ/ ۱۹ تقریر میاں محمود احمد صاحب خلیفۂ قادیان۔

৬. মির্জা বলেন, খোদা তাআলা আমাকে বলেছেন, তোমাকে আমি সারা জাহানের জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করলাম। انجام آتھم مرزا غلام احمد قادیانی. صفحہ/ ۷۸

৭. মির্জা বলেন, "খোদা তাআলা আমাকে পাঠিয়েছেন যে, যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম, তবে আসমান জমিন কিছুই সৃষ্টি করতাম না।" حقیقۃ الوحی. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. صفحہ/ ۹۹۔ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور ۱۳۷۱ھ/ ۱۹۵۲م۔

৮. যার প্রকাশ খাস আল্লাহর প্রকাশ। قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م). الیاس برنی. صفحہ/ ۳۲۸ از اخبار الفضل قادیان جلد ۳ نمبر ۱۴۲ص ۳۰۳ مئی ۱۹۱۵ء۔

৯. قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م). الیاس برنی. صفحہ/ ۳۲۸. از تشحیذ الاذہان جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ/ ۴۰۸ نومبر ۱۹۱۱ء۔

২৭. শ্রী কৃষ্ণের অবতার হওয়ার দাবী।[১]
২৮. শ্রী কৃষ্ণ হওয়ার দাবী।[২]
২৯. যুলকারনাইন হওয়ার দাবী।[৩]

এছাড়াও তার দাবীর শেষ ছিল না। এক পর্যায়ে তিনি তার মধ্যে খোদার অবতরিত হওয়ার কথা এবং অন্যত্র (স্বপ্নযোগে) খোদা হওয়ারও দাবী করেছেন।[৪]

খোদার যেমন ৯৯টি নাম রয়েছে মির্জা সাহেব দাবী করেছেন তারও অনুরূপ ৯৯টি নাম রয়েছে।[৫] তার অনুসারীরা মির্জা কাদিয়ানীর এসব দাবীর প্রতি ঈমান এনে তার উম্মত-ভুক্ত হয়েছে। তার অনুসারীরা তার কোন একটা দাবীকেও অস্বীকার করেনি। বরং তাকে মুজাদ্দিদ, ইমাম মাহ্দী, মাসীহে মাওঊদ, (প্রতিশ্রুত মাসীহ) যিল্লী, বুরূজী (ছায়া) নবী, উম্মতী নবী ও শরীআতের অধিকারী নবী হিসাবে মেনে আসছে।

কাদিয়ানীদের বর্ণনামতে মির্জা গোলাম আহমদের এসব দাবীর মধ্যে প্রধান ছিল তার "মাসীহে মাওঊদ" তথা প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ হওয়ার দাবী। অথচ সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত ঈসা (আ.) কেয়ামতের পূর্বে নাযিল হবেন এবং নবী হিসাবে নয় বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতী শাসক হিসাবে রাজ্য পরিচালনা করবেন। লূদ নামক স্থানের দ্বারে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এবং অবশেষে

---

১. قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م). الیاس برنی. صفحہ/ ۴۳۲ لیکچر سیالکوٹ ۲ نومبر ۱۹۰۴. صد/ ۳۴ روحانی خزائن. ص ۲۲۸،۲۲۹ ج/ ۲۰ از مرزا غلام احمد قادیانی صاحب۔

২. মির্জা বলেন, "আমি মুসলমানদের জন্য মাসীহ্ ও হিন্দুদের জন্য শ্রী কৃষ্ণ।" قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م). الیاس برنی. صفحہ/ ۳۴۷-۳۴۶. از روحانی خزائن ج/ ۲۰. صفحہ/ ۲۲۸. ومرزا غلام احمد کا لیکچر سیالکوٹ ۲ نومبر ۱۹۰۴ صفحہ/ ۳۴۔ । তিনি আরও বলেছেন, "যত নবী-রসূল অতিবাহিত হয়েছেন তাদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য আমার মধ্যে বিদ্যমান। হিন্দুদের মধ্যে কৃষ্ণ নামে যে নবী অতিবাহিত হয়েছেন, তারও বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীও।" براهین احمدیہ. مرزا غلام احمد قادیانی. حصہ/ ۵. صفحہ/ ۹۷. انوار احمدیہ مشین پریس. قادیان/ ۱۵ اکتوبر، ۱۹۰۸۔

৩. براهین احمدیہ. مرزا غلام احمد قادیانی. حصہ/ ۵. صفحہ/ ۹۸. انوار احمدیہ مشین پریس. قادیان/ ۱۵ اکتوبر، ۱۹۰۸۔

৪. মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী লিখেছেন, "আমার সত্তার মধ্যে খোদা প্রবেশ করেছেন।" یعنی وحی مقدس. صفحہ/ ۱۹۸۔ আরও বলেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি স্বয়ং খোদা এবং আমি বিশ্বাসও করলাম- আমি প্রকৃতই খোদা।"তিনি আরও লিখেছেন– স্বপ্নের ঘোরে আমি বললাম, 'জমিন ও আসমান আমিই তৈরি করেছি। ... আমি বললাম, আমিই প্রথম আসমানকে আলোকবর্তিকা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি। ... আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দর গঠনে। روحانی خزائن بنام آئینۂ کمالات اسلام/دافع الوساوس، ج/ ۵ صفحہ/ ۵۶۵-۵۶۴۔ তার আরবী ইবারতটুকু নিম্নরূপ–
وبينما أنا في هذه الحالة كنت أقول : إنا نريد نظاما جديدا أو سماء جديدة وأرضا جديدة فخلقت السموت و الأرض.... وقلت : إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح .... وخلقت الإ نسان في أحسن تقويم

৫. قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن جنوری ۲۰۰۱م) الیاس برنی. صفحہ/ ۲۸۵-۲۸۴۔ از حضرت میر محمد اسماعیل صاحب۔

ইন্তেকাল করবেন। মদীনা শরীফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবর মুবারকের পাশে তাঁকে দাফন করা হবে। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ সম্পর্কিত হাদীছগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্য কথা বাদ দিলেও ঈসা দাবী করনেওয়ালা মির্জা কাদিয়ানী মক্কা মদীনা শরীফ জীবনেও যাননি, তার মৃত্যু হয়েছে পাঞ্জাবে এবং সেখানেই হয়েছে তার কবর। ঈসা মাসীহ হওয়ার দাবী করলে প্রশ্ন উঠতে পারত যে, ঈসা (আ.)-এর কোন পিতা ছিল না অথচ মির্জা সাহেবের পিতা রয়েছে। আরও প্রশ্ন উঠতে পারত যে, ঈসা (আ.)-এর মা ছিল মারইয়াম অথচ মির্জা সাহেবের মাতা অন্য? এ সব প্রশ্নের জওয়াব দেয়ার জন্যই তিনি বলেছেন, ঈসা (আ.)-এর পিতা ছিল, যার নাম ইউসুফ নাজ্জার।[১] এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন এড়ানোর জন্য তিনি নিজেকে দাবী করে বলেছেন যে, আমিই মারইয়াম। আমার থেকেই আমার আবির্ভাব হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছিল– মারইয়াম ছিল নারী অথচ আপনি পুরুষ? এর জওয়াবে তিনি বলেছিলেন, আমার মধ্যে নারিত্বও বিদ্যমান। প্রমাণ হল আমার হায়েয হয়। তিনি তার অর্শ রোগের দিকে ইংগিত করেই এ কথা বলেছিলেন। এমন সব হাস্যকর প্রলাপও তিনি বকেছেন।

তার আর একটা প্রধান দাবী ছিল 'মাহ্দী' হওয়ার। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিকার মাহ্দীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গেছেন। তিনি জন্মগ্রহণ করবেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বংশে। তাঁর পিতার নাম হবে আব্দুল্লাহ, মাতার নাম হবে আমিনা। তার আত্মপ্রকাশ হবে মক্কা মুয়াজ্জমায়। পবিত্র কা'বা শরীফের চত্বরেই লোকেরা তাকে সনাক্ত করবে এবং তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করবে। শাম ও ইরাকের আবদালগণ তার কাছে এসে তার হাতে বাই'আত হবেন। তিনি কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করবেন। ইত্যাদি।[২] অথচ এর কোনটির সঙ্গেই গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সামান্যতম মিলও নেই।

কাদিয়ানীদের আকীদা-বিশ্বাস

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পূর্বোল্লেখিত দাবীসমূহ থেকে কাদিয়ানীদের আকীদা-বিশ্বাস কি তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। পূর্বোল্লেখিত বর্ণনা থেকে তাদের যে আকীদা- বিশ্বাস ফুটে ওঠে সংক্ষেপে তা হল–

* ইমাম মাহ্দী সম্পর্কিত মুসলমানদের ধারণা ভুল।
* হযরত ঈসা মাসীহ সম্পর্কিত মুসলমানদের ধারণা ভুল।
* খতমে নবুওয়াত সম্পর্কিত মুসলমানদের ধারণা ভুল, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরেও আরও নবী হতে পারে।
* গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবী, তার নিকট ওহী আসত, তার উপর ২০ পারার মত কুরআন নাযিল হয়েছিল।

১. এভাবে মারইয়ামকে যিনাকারিনী সাব্যস্ত করা হয়েছে। (নাউযু বিল্লাহ!)
২. এ সম্পর্কে "মওদূদী মতবাদ" শিরোনামের অধীনে সংশ্লিষ্ট হাদীছসমূহ উল্লেখ পূর্বক বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

* খোদার পুত্র হতে পারে।
* গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রকাশ (ظہور) ছিলেন।
* গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আল্লাহ্-এর প্রকাশ (ظہور) ছিলেন।
* গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছিলেন মুহাম্মাদ এবং আহমদ।
* গোলাম আহমদ কাদিয়ানী অনেক নবী বরং সমস্ত নবী রসূল থেকে এমনকি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও শ্রেষ্ঠ।
* গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছিলেন খোদার অবতার বা খোদা।
* গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছিলেন কৃষ্ণের অবতার।

এ পর্যন্ত উল্লেখিত আকীদা-বিশ্বাস ছাড়াও তাদের আরও অনেক বিভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে। যেমন: তাদের আকীদা-বিশ্বাস ছিল–

* মির্জা সাহেব ছিলেন ইব্রাহীম।[১]
* পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস।[২]
* কাদিয়ানীগণ নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে নবী মনে করেন– রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, জরদশত, কনফুসিয়াস ও বাবা নানক।[৩]
* মির্জা গোলাম আহমদ খাতামুন্নবী অর্থাৎ, শেষ নবী। তার পরে আর কোনো নবী আসবেন না।[৪]

১. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى আয়াত তার দিকেই ইংগিত করেছে। قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م) الیاس برنی. صفحہ/۳۱۸. از اربعین نمبر ۳. صفحہ/ ۳۸،٦٩. و روحانی خزائن صفحہ/٤٢٠-٤٢١ ج/١٧ مصنف غلام احمد قادیانی۔
২. মির্জা বশীর আহমদ বলেছেন, মাসীহে মাওউদের অস্বীকারকারী যদি কাফের না হয়, তাহলে নাউযুবিল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অস্বীকারকারীও কাফের হবে না। এটা কীভাবে সম্ভব যে, প্রথমবার প্রেরিত হওয়ার প্রাক্কালে তাকে অস্বীকার করা কুফ্রী হবে আর দ্বিতীয়বার প্রেরিত হওয়ার পর তাকে অস্বীকার করা কুফ্রী হবে না? قادیانی مذہب(جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م) الیاس برنی. صفحہ/۳۱۹، از کلمۃ الفصل مندرجہ رسالہ ریویوآف ریلیجز ص ۱۴٦، نمبر ۳ جلد ۱۴۔
৩. قادیانی مذہب(جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م) الیاس برنی. صفحہ/۲۸۲-۲۸۱ از چوہدوی ظفر اللہ خان قاد یانیکا ٹریکٹ جومارچ ۱۹۳۳ء بتقریب یوم التبلیغ شائع ہوا۔ منقول از پیغام صلح لاہور ج/۲۲ مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۳۳ء۔
৪. এই উম্মতের মধ্যে নবী শুধু একজনই আসতে পারেন। তিনি হলেন মাসীহে মাওউদ। তিনি ব্যতীত কোনক্রমেই অন্য কারও আগমনের অবকাশ নেই। যেমন অন্যান্য হাদীছের দিকে দৃষ্টি দিলে বুঝা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু মাসীহ মাওউদের নামই নবী রেখেছেন, আদৌ অন্য কারও এ নাম রাখেননি। قادیانی مذہب(جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م) الیاس برنی. صفحہ/۲٤۹. از رسالہ تشحیذ الاذہان. قادیان، ج/۳ صفحہ/۳۲-۳۰ مارچ ۱۹۱۴۔

গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদের সম্বন্ধে উম্মতে মুসলিমার সর্বসম্মত অভিমত

মুসলমানদের দ্ব্যর্থহীন আকীদা হল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী। তারপর কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না। 'শরীআত বিশিষ্ট নবী' বা 'শরী'আত বিহীন নবী' বা 'ছায়া নবী' 'যিল্লী নবী' 'বুরূযী নবী' বা 'উম্মতী নবী' কোন প্রকার নবীই আর আসবেন না। উম্মতের কেউ নবী-র এসব প্রকার করেননি। অতএব যে বা যারাই যে প্রকারের নবুওয়াত দাবী করবে এবং যে বা যারাই তার নবুওয়াতকে মেনে নিবে, তারা ভণ্ড, প্রতারক, মিথ্যাবাদী, ইসলাম থেকে খারিজ, মুরতাদ, কাফের।

হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতামুন্নাবী অর্থাৎ, তিনি শেষ নবী, তাঁরপর আর কোনো নবী আসবেন না। এই আকীদা-বিশ্বাসকে বলা হয় খতমে নবুওয়াত-এর আকীদা-বিশ্বাস। খতমে নবুওয়াতের এই আকীদা কুরআন, হাদীছ, ইজ্‌মা ও কিয়াস (যুক্তি) তথা শরীআতের সব রকম দলীল দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। "খতমে নবুওয়াত প্রসঙ্গ" শিরোনামে পরবর্তী প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মির্জা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী নবী-রসূল হওয়ার দাবী করে এই অকাট্য আকীদাকে অমান্য করায় নিঃসন্দেহে কাফের সাব্যস্ত হয়েছেন। এ ছাড়াও মাসীহে মাওউদ হওয়ার দাবী, শরীআতের বিভিন্ন বিধান রহিত করার দাবী, সর্বোপরি খোদা হওয়ার দাবী প্রভৃতি দ্বারাও তিনি নিঃসন্দেহে কাফের হয়ে গেছেন। এ কারণে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র উম্মতে মুসলিমা সর্বসম্মতভাবে তাকে কাফের বলে ফতওয়া দিয়েছেন।

১৯৭৪ সালে বিশ্ব মুসলিম সংস্থা 'রাবেতা আলমে ইসলামী-র উদ্যোগে পবিত্র মক্কা মুকাররমার কনফারেন্স ১৪৪টি মুসলিম রাষ্ট্র ও সংগঠনের অংশগ্রহণে ঘোষণা করে যে, কাদিয়ানীরা কাফের এবং তাদের প্রচারিত কুরআন শরীফের তাফসীর বিকৃত এবং তারা মুসলমানদের ধোকা দিচ্ছে ও পথভ্রষ্ট করছে। ১৯৮৮ সালে ও, আই, সি-র উদ্যোগে ইরাকে সকল মুসলিম দেশের ধর্মমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে প্রত্যেক মুসলিম দেশে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়। সেমতে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক মুসলিম দেশই যথা: সউদী আরব, ইরান, ইরাক, কুয়েত, মালয়েশিয়া কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। পাকিস্তান গণপরিষদও ১৯৭৪ সালে আইনগত এবং শাসনতান্ত্রিকভাবে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সম্প্রদায় বলে ঘোষণা দিয়েছে। সৌদী আরবসহ বহু মুসলিম দেশই তাদেরকে অনুরূপ অমুসলিম ঘোষণা করেছে। পাকিস্তানে ১৯৭৪ সালে কাদিয়ানীগণ সংখ্যালঘু অমুসলিম ঘোষিত হওয়ার পর কাদিয়ানী ধর্মমতের সূতিকাগার লন্ডনে তাদের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। বৃটেন ও বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান নেতা আমেরিকা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে এবং কাদিয়ানী ধর্মমত প্রচারের জন্য লক্ষ-কোটি ডলার তাদেরকে দিচ্ছে।

কাদিয়ানীদের লাহোরী গ্রুপ সমাচার

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মৃত্যুর পর কাদিয়ানীদের প্রথম নেতা (তাদের ভাষায় প্রথম খলীফা) নির্বাচিত হন হাকীম নূর উদ্দীন। হাকীম নূর উদ্দীন ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার প্রশ্নে সর্বপ্রথম তাদের মধ্যে মতানৈক্যের সূচনা হয়। কাদিয়ানীদের ভাষায় তাদের দলে হাকিম নূর উদ্দীনের পরে শিক্ষিত ও যোগ্য লোক হিসাবে মোহাম্মাদ আলী সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাই তাদের ভাষায় শিক্ষিত লোকদের অধিকাংশের মনোভাব ছিল মোহাম্মাদ আলীই তাদের নেতা নির্বাচিত হবেন। অন্য দিকে সাধারণ ভক্তরা তাদের নবীপুত্র মির্জা বশীর উদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদকে স্থলাভিষিক্ত করার পক্ষপাতি ছিল। এমনিতে কাদিয়ানী ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা কাদিয়ানীর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে, যা কোন রুচিশীল ব্যক্তির পক্ষে মুখে উচ্চারণ করা দুষ্করই বটে, তবে মির্জা বশীর উদ্দীন মাহ্‌মুদের চারিত্রিক অধঃপতন সম্পর্কে কাদিয়ানী মহলেও বহু জানাজানি ছিল বলে তাদের শিক্ষিত লোকেরা তাকে নেতা হিসাবে মেনে নিতে সম্মত হয়নি। কিন্তু সাধারণ ভক্তদের দল ভারী ছিল, তারা তাকে নেতা মনোনীত করে নিল। ১৯১৪ সালের ১৪ই মার্চ মির্জা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ কাদিয়ানীদের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে নেতা মনোনীত হন। অতঃপর ১৯১৪ সালের ২২শে মার্চ মোহাম্মাদ আলী তার দলবল নিয়ে লাহোর চলে এসে এ দলের নেতা মনোনীত হন। এভাবে কাদিয়ানী ধর্মমতাবলম্বীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথমোক্ত দলটা 'কাদিয়ানী' নামে পরিচিতি লাভ করে। আর অপর দলটা 'লাহোরী কাদিয়ানী' নামে আখ্যায়িত হয়।[১]

কাদিয়ানী ও লাহোরী কাদিয়ানীদের মধ্যে পার্থক্য

হাকিম নূর উদ্দীনের নেতৃত্বের দীর্ঘ ছয় বছরে তাদের যেসব পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, ঐ সবগুলোতে মির্জা কাদিয়ানীকে নবী-রসূল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা সকলে তাকে নবী-রসূল হিসাবে মান্য করে আসছে। পরবর্তীতে সৃষ্ট লাহোরী গ্রুপের নেতা মোহাম্মাদ আলী এ সময় কাদিয়ানীদের ইংরেজি পত্রিকা 'রিভিউ অফ রিলিজিয়াস'-এর সম্পাদকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এসব দিনগুলোতে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় কলাম ও মোহাম্মাদ আলী কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে মোহাম্মাদ আলী তাকে শুধু নবী-রসূল হিসাবে উল্লেখ করেছেন তা নয় বরং নবী-রসূলের সকল বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী হিসাবে প্রমাণ করার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন।[২]

মোহাম্মাদ আলী আরও লিখেছেন– "আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা যাই বলুক না কেন, আমরা কিন্তু এ বিশ্বাসের উপর স্থির ও অটল আছি যে, আল্লাহ তাআলা এখনও নবী

১. কাদিয়ানী ধর্মমত ১০৫ পৃঃ থেকে গৃহীত।
২.কাদিয়ানী ধর্মমত ১০৫ পৃঃ থেকে গৃহীত।

সৃষ্টি করতে পারেন। সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ (আল্লাহ্র অলী ও নেককার) এর মর্যাদা দান করতে পারেন, তবে মর্যাদা লাভের আগ্রহী থাকতে হবে। ... আমরা যে ব্যক্তিত্বের হাতে হাত মিলিয়েছি (মির্জা কাদিয়ানী) তিনি সত্যবাদী ছিলেন এবং আল্লাহ্র মনোনীত পবিত্র রসূল ছিলেন।"[১]

এ সকল উদ্ধৃতি কাদিয়ানী লাহোরী গ্রুপের নেতা মোহাম্মাদ আলীর। এ সকল উদ্ধৃতি দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী মানার দিক থেকে কাদিয়ানীদের উভয় গ্রুপ ঐক্যমত্য পোষণ করে আসছে। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো দ্বিমত ছিল না।

কাদিয়ানীদের দু'দলে বিভক্তি ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতানৈক্যের কারণে নয়। বরং উভয় দলের ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল এক ও অভিন্ন। নেতৃত্বের প্রশ্নে সৃষ্ট কোন্দলের ফলশ্রুতিতেই তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে উভয় দলের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, কাদিয়ানীরা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে স্পষ্ট ভাষায় নবী বলে প্রকাশ করেন। আর লাহোরী কাদিয়ানীগণ বলেন, "আমরা তাকে আভিধানিক ও রূপক অর্থে নবী মান্য করি।" এটাও তাদের বহুবিধ প্রতারণার একটা।

যেহেতু কাদিয়ানীদের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মির্জা কাদিয়ানীর পুত্র মির্জা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদকে নেতা মেনে নিয়েছিল। আর লাহোরী গ্রুপ –যাদের নেতা মোহাম্মাদ আলী মনোনীত হয়েছিলেন, তারা– পূর্বোক্ত দলের তুলনায় একটি ক্ষুদ্রতম দল ছিল। এহেতু লাহোরী কাদিয়ানী জামাতের জন্য এমন দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, এ দলটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় লাহোরী গ্রুপটি তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে মুসলমানদের সহানুভূতি লাভ করা তাদের জন্য অত্যধিক প্রয়োজনীয় মনে করে পরিভাষায় কিছুটা শাব্দিক পরিবর্তন এনে প্রচার করতে আরম্ভ করল, "আমরা মির্জা সাহেবের জন্য নবী শব্দটির ব্যবহার বর্জন করেছি। আর যদি কোথাও এ শব্দটির ব্যবহার আমাদের লেখা কিংবা উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে, তবে নবী শব্দটিকে আমরা আভিধানিক কিংবা রূপক অর্থে ব্যবহার করে থাকি।" তারা আরও বলতে আরম্ভ করল, "আমরা গায়রে আহমদীদেরকে 'কাফের' বলার পরিবর্তে 'ফাসেক' বলে মনে করি।"[২]

সারকথা, কাদিয়ানী গ্রুপ কুরআন, হাদীছ ও উম্মতের সর্ববাদীমতে কাফের ও মুরতাদ সাব্যস্ত হয়েছে। তেমনি কাদিয়ানীদের লাহোরী গ্রুপও নিঃসন্দেহে কাফের ও মুরতাদ বলে গণ্য। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে তারা কাদিয়ানীদের ন্যায় ব্যাপক অর্থে নবী বলে প্রচার না করলেও তাদের প্রামাণ্য পুস্তকাদি দ্বারা প্রমাণিত

১. প্রাগুক্ত, ১০৩-১০৪ পৃঃ বরাত- আহ্‌মদিয়া মিলনায়তনে মোহাম্মাদ আলীর ভাষণ, কাদিয়ানী পত্রিকা আল-হাকাম, ১৮ জুলাই ইং এবং কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত মাসিক ফোরকান, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা ১১ পৃষ্ঠা।

২. কাদিয়ানী ধর্মমত ১০৭ পৃ. ও موقف الأمة الإسلامية من القاديانية

হয়েছে কাদিয়ানীদের এ গ্রুপটিও তাকে যিল্লী নবী ও উম্মতি নবী বলে মান্য করে। তাছাড়া প্রকাশ্যে তারা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মাসীহে মাওউদ বলে ব্যাপকভাবে দাবী করে থাকে। এ দাবীও কুরআন, হাদীছ ও উম্মতের ইজ্মা (ঐক্যমত্য)-এর পরিপন্থী হওয়ায় এটাও তাদের কাফের ও মুরতাদ সাব্যস্ত হওয়ার অন্যতম প্রমাণ।

বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের তৎপরতা

যেহেতু বর্তমানে অপরাপর মুসলিম রাষ্ট্রে কাদিয়ানীদের ধর্মমতের প্রচার রাষ্ট্রীয়ভাবে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে। মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র বাংলাদেশেই তাদের ধর্মমত প্রচারের সুযোগ রয়েছে। তাই বর্তমানে তাদের দৃষ্টি বাংলাদেশের উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে। বাংলাদেশে সরকারীভাবে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা না করার কারণে কাদিয়ানীগণ বাংলাদেশকে তাদের ধর্মমত প্রচারের প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছে। সেমতে কাদিয়ানীগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও কেন্দ্র কায়েম করে নানা ধরনের পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করে দেশে মারাত্মক ধর্মীয় বিশৃংখলা সৃষ্টি করে চলেছে। পুরনো ঢাকায় ৪ নং বকশীবাজারে তাদের প্রধান কেন্দ্র। এ ছাড়াও ঢাকা মহানগরে তাদের আরও ৬টা ছোট কেন্দ্র রয়েছে। কিছুদিন পূর্বেকার একটা জরিপ মোতাবেক বর্তমানে সারা বাংলাদেশে তাদের ১২৩টার মত সেন্টার রয়েছে। এ ছাড়াও মুসলমানদেরকে মুরতাদ বানানোর জন্য তাদের পাঁচটা পৃথক পৃথক সংগঠন রয়েছে।

(১) মসলিসে আনসারুল্লাহঃ চল্লিশোর্ধ বয়সের লোকেরাই কেবল এ সংগঠনের সদস্য হয়ে থাকে। এ সংগঠন সাধারণ মুসলমান, সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষিত লোকদের মধ্যে কাদিয়ানী ধর্মমতের প্রচার করে থাকে। এ সংগঠনের উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ও সংবাদপত্রসেবীদেরকে কাদিয়ানী ধর্মমতের দিকে আকৃষ্ট করা।

(২) মজলিসে খোদ্দামে আহমদিয়াঃ এ সংগঠনের সদস্য তারা হয়ে থাকে যাদের বয়স ১৫ বছরের উর্দ্ধে এবং ৪০ এর কম। এ সংগঠন যুবকদেরকে কাদিয়ানী বেড়াজালে আবদ্ধ করার তৎপরতা চালায়। বেকার যুবকদেরকে কাদিয়ানী অফিসারদের মাধ্যমে চাকরি দানের প্রলোভন এবং শিক্ষিত বেকারদেরকে বৃটেন, আমেরিকাসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রেরণের প্রলোভন দেখিয়ে কাদিয়ানী ধর্মমতে দীক্ষিত করার চেষ্টা চালায়। এ সংগঠনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হচ্ছে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদেরকে শিক্ষা লাভের জন্য সাহায্য দান ও উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে প্রেরণের প্রলোভন দেখিয়ে কাদিয়ানী ধর্মমতে দীক্ষিত করার তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া। এ সংগঠন শিক্ষার্থী ছাত্রদের মধ্যে কাদিয়ানী পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচারপত্রসমূহ বিতরণ করে থাকে।

(৩) মজলিসে আত্ফালুল আহমদিয়া: এ সংগঠনের সদস্যদের বয়সের সীমারেখা হয়েছে ১৫ বছর বা তার কম। এ সংগঠন দ্বারা কাদিয়ানীদের কমবয়সী ছেলেরা তাদের সমবয়সী মুসলমান ছেলেদের নিকট কাদিয়ানীদের রচিত শিশুসাহিত্য বণ্টন করে। যেমন: তারা মুসলমান কচি-কাঁচাদের নিকট 'এসো ভাল মুসলমান হই' জাতীয় প্রচারপত্র বিলি করে মুসলিম শিশুদের অন্তরে কাদিয়ানী মতবাদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে শহরের তথাকথিত অভিজাত পরিবারের মুসলমানরা তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে ইসলামের মৌলিক ও প্রাথমিক শিক্ষা দান করাটা অপ্রয়োজনীয় মনে করে থাকে। এদের ছেলেদের অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে কোনো ধারণাই থাকে না। এদের মধ্যে পূর্বোক্ত প্রচারপত্রসমূহ বিলি করে তাদের অন্তরে কাদিয়ানী ধর্মমতের বীজ বপন করা হয়।

উপরোক্ত তিনটি সংগঠন পুরুষ ও কিশোরদের মধ্যে কাজ করে থাকে। আর মহিলাদের মধ্যে কাদিয়ানী ধর্মমত প্রচারের জন্য দুটো পৃথক সংগঠন রয়েছে।

(১) লাজ্না এমাইল্লা: ১৫ বছরের উর্দ্ধবয়সী মহিলারা এ সংগঠনের সদস্যা হয়ে থাকে। এ সংগঠনের সদস্যা মহিলারা শহর, বন্দর ও গ্রামাঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের মধ্যে কাদিয়ানী ধর্মমতের পুস্তকাদি বিলি করে থাকে এবং সুযোগ পেলে কাদিয়ানী ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে মহিলাদেরকে লোভ-লালসা ও প্রলোভন দিয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে এ সংগঠনের ৩০/৩৫টা কেন্দ্র কার্যরত রয়েছে।

(২) নাসেরাত: ১৫ বছরের কমবয়সের কিশোরীদের মধ্যে প্রচার কার্য পরিচালনার জন্য 'নাসেরাত' নামে একটা পৃথক সংগঠন রয়েছে। এ সংগঠনের কিশোরীরা তাদের সমবয়স্কা কিশোরীদেরকে কাদিয়ানী মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। সমবয়সী কিশোরীদের সাথে স্কুল-কলেজে বন্ধুত্ব পেতে কাদিয়ানী-দের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে কাদিয়ানী মতবাদকে খাঁটি বলে বোঝানো হয়ে থাকে।[১]

কাদিয়ানী ধর্মমতের সঙ্গে ইসলামের বিরোধ কোন্ পর্যায়ের?

কাদিয়ানীদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধ শাখাগত বিরোধ নয়।[২] কাদিয়ানী ফিতনা কোন শাখাগত ফিতনা নয়। ইসলামের নামে আরও অনেক ফিতনা রয়েছে, এটাও তেমন ধরনের ফিতনা নয়। বরং এটা একটা মৌলিক ফিতনা। এটা একটা

১. কাদিয়ানী ধর্মমত থেকে গৃহীত।

২. স্বয়ং কাদিয়ানীরাও বলেছে, "আমাদের এবং অকাদিয়ানীদের মধ্যকার বিরোধকে কোন শাখাগত (فروئی) বিরোধ মনে করা নির্জলা ভুল। ..." আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূলকে অস্বীকার করা কুফ্রী। আমাদের বিরোধীগণ মির্জা সাহেবের আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়াকে অস্বীকার করে। এটা শাখাগত বিরোধ হয় কেমন করে? قادیانی مذہب(جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م) الیاس برنی. صفحہ/۵٦٤ از نہج المصلی مجموعہ فتاوی احمدیہ. صفحہ/ ۲۷۵-۲۷٤. مولفہ محمد فضل خان صاحب قادیانی۔

মৌলিক আকীদাগত ফিতনা। এটা ইসলাম ও অনৈসলামের বিরোধ। মুসলিম উম্মাহ কাদিয়ানীদেরকে মুসলমানদের তালিকাভুক্তই মনে করেন না। স্বয়ং কাদিয়ানীগণও মুসলিমদেরকে তাদের দলভুক্ত মনে করেন না। এ বিষয়টা কাদিয়ানী নয়-এমন লোকদের সম্পর্কে কাদিয়ানীদের ধারণা কি তা জানলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অন্য ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে কাদিয়ানীদের মত ও বিশ্বাস

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার বিরুদ্ধবাদীদেরকে তার ভাষায় অমুসলিম, কাফের, জাহান্নামী বলে সাব্যস্ত করেছেন। মির্জা সাহেব বলেছেন, "নিঃসন্দেহে আমার শত্রুরা অরণ্যের বানরে পরিণত হয়েছে এবং তাদের স্ত্রীরা কুকুরীর চেয়েও বেশি সীমাতিক্রম করেছে।[১]

তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার বিরোধী সে খৃষ্টান, ইয়াহুদী, মুশরিক ও জাহান্নামী।[২]

তিনি আরও বলেছেন, "সমগ্র মুসলমান যারা মাসীহে মাওউদের নিকট বয়াত করেনি, যদি কেউ মাসীহে মাওউদের নাম নাও শুনে থাকে, তবু তারা সকলেই কাফের ও ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত।[৩]

কাদিয়ানীর দ্বিতীয় পুত্র মির্জা বশীর আহমদ এম, এ-এর বক্তব্য হচ্ছে, "যে লোক মূসা নবীকে মানে কিন্তু ঈসা নবীকে মানে না, অথবা ঈসা নবীকে মানে কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানে না, অথবা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানে মাসীহে মাওউদকে মানে না সে যে শুধু কাফের তা নয় বরং কট্টর কাফের ও ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত।"[৪]

কাদিয়ানীদের অপর দল লাহোরী কাদিয়ানীদের নেতা মোহাম্মাদ আলী লিখেছেন- "আহমদী আন্দোলন (কাদিয়ানী ধর্মমত)-এর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক অনুরূপই যেরূপ খৃষ্টানদের সঙ্গে ইয়াহুদী মতবাদের সম্পর্ক রয়েছে।[৫]

উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াহুদী ধর্ম, খৃষ্টধর্ম ও ইসলাম যেমন পৃথক পৃথক ধর্ম, তেমনি কাদিয়ানী ধর্মমতও একটা পৃথক ধর্ম। স্বয়ং কাদিয়ানীদের উভয় দলের স্বীকৃতিও অনুরূপ। বস্তুত কাদিয়ানী ধর্মমত ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ একটা পৃথক ধর্মমত। ইসলামপন্থীরা কোনোক্রমেই কাদিয়ানীদেরকে মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত মনে করতে পারে না।

১. ختم نبوت. از نجم الہدی صفحہ/۱۰ ودر ثمین صفحہ/۲۹٤۔

২. ختم نبوت. از نزول المسیح صفحہ/٤ وتبلیغ رسالت ج/۹ صفحہ/۲۷ وتذکرہ صفحہ/۲۲۷۔

৩. آئینۂ صداقت صفحہ/۳۵

৪. قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م). الیاس برنی. ازکلمۃ الفصل مصنفہ بشیر احمد صاحب قادیانی. مندرجہ رسالہ ریویو آف ریلیجز. صفحہ/۱۱۰ نمبر ۳ جلد ١٤۔

৫. কাদিয়ানী ধর্মমত, ৯৬ পৃ., বরাত- মুবাহাসা রাওয়ালপিণ্ডি ২৪০ পৃ. কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত ও তাবলীগে আক্বায়েদ ১২ পৃ. মোহাম্মদ ইসমাঈল কাদিয়ানী কর্তৃক রচিত।

খতমে নবুওয়াত প্রসঙ্গ

"খতমে নবুওয়াত"-এর অর্থ রসূল হযরত মুহাম্মাদ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী। তাঁর মাধ্যমে নবুওয়াত-এর সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর পর কোনো মানুষের কাছে ওহী আগমন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁরপর আর কেউ নবী হিসাবে দুনিয়ায় আসবেন না।

নবুওয়াত-এর ক্ষেত্রে কোনো প্রকার প্রকারভেদ নেই। "বুরূজী নবী" বা যিল্লী নবী বা ছায়া নবী, "শরীআত বিশিষ্ট নবী" বা "শরীআত বিহীন নবী" অথবা "উম্মতী নবী" ইত্যাদি ধরনের কোনো প্রকারভেদ নবুওয়াত-এর ক্ষেত্রে নেই। নবুওয়াত-এর ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রকারভেদ কুরআন, হাদীছ ও তাফসীরের কিতাবে কোথাও পাওয়া যায় না। উম্মতের কেউ নবুওয়াত-এর ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রকারভেদ আছে বলেও বর্ণনা করেনি-ন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর আর কোনো নবী নেই অর্থ এ জাতীয় কোনো প্রকার নবী নেই।

"খতমে নবুওয়াত"-এর এই আকীদা ইসলামের একটি মৌলিক আকীদা। কুরআন, হাদীছ, ইজ্‌মায়ে উম্মত এবং কিয়াস বা যুক্তি সব রকম দলীল দ্বারা এই "খতমে নবুওয়াত"-এর বিষয়টি সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়টি অস্বীকারকারী উম্মতের সর্বসম্মতমতে কাফের। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের পর থেকে আজ প্রায় চৌদ্দশ বৎসরাধিককাল যাবত উম্মতের সাধারণ ও বিশেষ, শিক্ষিত ও মূর্খ, শহুরে ও গ্রাম্য নির্বিশেষে সকল স্তরের মুসলমান এ আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

নিম্নে "খতমে নবুওয়াত"-এর পক্ষে কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও যুক্তিভিত্তিক সব ধরনের দলীলাদি থেকে কয়েকটি করে পেশ করা হল।

কুরআন থেকে দলীল

"খতমে নবুওয়াত"-এর পক্ষে প্রায় শতাধিক আয়াত রয়েছে।[১] তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি আয়াত নিম্নে প্রদান করা হল।

(١) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّنَ.

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ তোমাদের কারও পিতা নন, তবে সে আল্লাহ্‌র রসূল ও খাতামুন্নাবী (শেষ নবী)। (সূরা: ৩৩-আহ্‌যাব: ৪০)

(٢) اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করলাম আর দ্বীন হিসাবে তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করলাম। (সূরা: ৫-মায়িদা: ৩)

১. মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহ.) তার "খতমে নবুওয়াত" গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এসব আয়াত ও সে সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করেছেন।

(٣) وَ اِذْ اَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ .

অর্থাৎ, আর স্মরণ কর যখন আল্লাহ নবীদের থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, যখন তোমাদেরকে আমি কিতাব ও হেকমত দান করব, অনন্তর তোমাদের নিকট আগমন করবে সেই রসূল যে তোমাদের নিকটস্থ কিতাবের সত্যায়নকারী হবে, তখন অবশ্যই তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর সহযোগিতা করবে। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৮১)

(٤) قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا نِ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ.

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, হে মানুষ! অবশ্যই আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ্‌র রসূল যার অধিকারে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব। (সূরা: ৭-আ'রাফ: ১৫৮)

(٥) تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا.

অর্থাৎ, মহান ঐ সত্তা, যিনি তাঁর বান্দার উপর নাযিল করেছেন ফুরকান (কুরআন) যাতে সে জগৎবাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে। (সূরা: ২৫-ফুরকান: ১)

(٦) وَ اُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَ مَنْۢ بَلَغَ .

অর্থাৎ, আমার নিকট ওহীযোগে প্রেরণ করা হয়েছে এই কুরআন, যেন তার দ্বারা সতর্ক করি তোমাদেরকে এবং ঐ সব লোকদেরকে যাদের নিকট তা পৌছবে। (সূরা: ৬-আন্‌আম: ১৯)

(٧) وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎ, আমি তোমাকে জগৎবাসীর জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি। (সূরা: ২১-আম্বিয়া: ১০৭)

(٨) وَ اَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا.

অর্থাৎ, আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের জন্য রসূল রূপে প্রেরণ করেছি। (সূরা: ৪-নিসা: ৭৯)

(٩) اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎ, এ তো শুধু বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ। (সূরা: ৮১-তাকবীর: ২৭)

(١٠) وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ.

অর্থাৎ, আর অন্যান্য দলের যারা একে (কুরআনকে) অস্বীকার করে অগ্নিই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা: ১১-হূদ: ১৭)

হাদীছ থেকে দলীল

"খতমে নবুওয়াত"-এর পক্ষে প্রায় দুই শতাধিক হাদীছ রয়েছে।[১] তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি হাদীছ নিম্নে প্রদান করা হল।

১. হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহ.) তার "খতমে নবূওয়াত" গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এসব হাদীছ পেশ করেছেন।

(١) عن أبي هريره رضـ أن رسول الله سلى الله عليه و سلم قال : مثلى و مثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه و أجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة. قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. (متفق عليه. رواه البخاري في كتاب المناقب– باب خاتم النبيين، ورواه مسلم في كتاب الفضائل– باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين واللفظ للبخاري)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ হল ঐ ব্যক্তির মত, যে একটা গৃহ নির্মাণ করে, আর ঐ গৃহের সবকিছুই সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে, শুধু এক কোণে একটা ইটের স্থান খালি রাখে। মানুষ ঐ গৃহের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে দেখে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় আর বলতে থাকে, এই ইটটা কেন স্থাপন করা হল না? আমি হলাম সেই ইট, আর আমি হলাম খাতামুন্নাবী (তথা শেষ নবী)। (বোখারী ও মুসলিম)

(٢) عن أبي سعيد الخدري رضـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى دارا فأتَمَّها إلا لبنة واحدة، فجئت أنا فأتْمَمْتُ تلك اللبنة. (رواه مسلم في كتاب الفضائل – باب ذكر كونه صلى الله عليه و سلم خاتم النبيين)

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ হল ঐ ব্যক্তির মত, যে একটা গৃহ নির্মাণ করে আর একটা ইটের স্থান ব্যতীত ঐ গৃহের সবকিছুই পূর্ণ করে। অতঃপর আমি আগমন করি এবং ঐ ইটের স্থান পূর্ণ করি। (মুসলিম)

১. হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহ.) তার "খতমে নবূওয়াত" গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এসব হাদীছ পেশ করেছেন।

(٣) عن أبي حازم قال : قاعدت أبا هريرة خمس سنين، فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبى خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. الحديث. (رواه البخاري في كتاب الأنبياء– باب ما ذكر عن بني إسرائيل)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হাযেম বলেন, আমি পাঁচ বছর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সোহবতে থেকেছি। আমি তাঁকে রসূল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নবীগণ বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব প্রদান করতেন। কোন এক নবী প্রস্থান করলে পরবর্তিতে অন্য নবী আগমন করতেন। আর আমার পরে অন্য কোনো নবী নেই। অচিরেই আমার খলীফা হবে এবং সংখ্যায় তারা প্রচুর হবে। (বোখারী)

(٤) عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لي خمسة اسماء أنا محمد او أنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي ا لكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر

الناس على قدمي، وأنا العاقب (وفي رواية لمسلم والعاقب الذي ليس بعده نبي). (متفق عليه. رواه البخاري في كتاب المناقب– باب ما في اسماء رسول الله صلى الله عليه و سلم، وراه مسلم في كتاب الفضائل – باب في اسمائه صلى الله عليه و سلم اللفظ للبخاري)

অর্থাৎ, হযরত জুবায়র ইব্‌নে মুত্‌ইম (রা.) থেকে বর্ণিত- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার পাঁচটি নাম রয়েছে– আমি "মুহাম্মাদ", আমি "আহ্‌মদ", আমি "মাহী" (মোচনকারী), আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফ্‌রকে মোচন করবেন। আমি "হাশির" (সমবেতকারী), আমার দুই কদমের উপর সকলকে সমবেত করা হবে। আর আমি "আকিব" (পরে আগমনকারী) যার পরে আর কোনো নবী নেই। (বোখারী ও মুসলিম)

(٥) عن أبي هريرة رضـ عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لاتقوم الساعة حتى يبعث دجّالون كذّابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله (متفق عليه. رواه البخاري في كتاب المناقب– باب علامات النبوة في الإسلام و رواه مسلم في كتاب الفتن قبيل باب ذكر ابن صياد)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কেয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ মিথ্যুক প্রতারকদের আবির্ভাব না হবে; যাদের সংখ্যা ত্রিশের কাছাকাছি। যাদের প্রত্যেকে দাবী করবে যে, সে আল্লাহ্‌র রসূল। (বোখারী ও মুসলিম)

(٦) عن أبي هريرة رضـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فضلت على الأنبياء بست أُعْطِيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأُحِلّت لي المغانم و جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرْسِلت الي الخلق كافَّة و ختم بي النبيون. (رواه مسلم في كتاب المساجد و مواضع الصلوة)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমাকে অন্যান্য নবীর উপর ছয়টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে- আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক স্বল্পভাষা দান করা হয়েছে, আমাকে প্রভাব (رعب) দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, আমার জন্য গনীমতকে হালাল করা হয়েছে, আমার জন্য সমগ্র ভূমিকে পবিত্র ও সাজদার স্থান বানিয়ে দেয়া হয়েছে, আমাকে সমগ্র মাখলূকের জন্য রসূল বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, আর আমার মাধ্যমে নবীদের আগমনের সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। (মুসলিম)

(٧) عن ثوبان رضـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : .... وإنه سيكون في أُمّتي كذابون ثلثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لانبي بعدي. (رواه الترمذي في أبواب الفتن– باب ما جاء لاتقوم الساعة حتى يخرج كذابون. وقال : هذا حديث صحيح)

অর্থাৎ, হযরত ছওবান (রা.) থেকে বর্ণিত- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যুক প্রতারকের আবির্ভাব হবে, যাদের প্রত্যেকে মনে করবে যে, সে নবী, অথচ আমি খাতামুন্নাবী- আমার পরে আর কোনো নবী নেই। (তিরমিযী)

(٨) عن أبى هريرة رضـ في حديث الشفاعة فيقول لهم عيسى : اذهبوا إلى غيري إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فياتوني فيقولون : يا محمد! أنت رسول الله و خاتم الأنبياء. الحديث. (متفق عليه. رواه البخاري في كتاب التفسير سورة الإسراء- باب ذرية من حملنا مع نوح، ورواه مسلم في كتاب الايمان- باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار واللفظ لمسلم)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে শাফা'আত সম্পর্কিত হাদীছে বর্ণিত- অতঃপর ঈসা (আ.) তাদেরকে বলবেন, তোমরা অন্যের কাছে যাও- তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে যাও। তখন তারা আমার কাছে এসে বলবে, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্র রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া (শেষ নবী ... আপনি আমাদের জন্য সুফারিশ করুন।) ... (বোখারী ও মুসলিম)

(٩) عن أنس بن مالك رضـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. الحديث. (رواه الترمذي كتاب الرؤيا و قال : هذا حديث صحيح غريب.)

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রেসালাত ও নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অতএব আমার পরে কোনো রসূল নেই, কোনো নবী নেই। (তিরমিযী)

(١٠) عم أبي ذر رضـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر! أول الأنبياء آدم آخره محمد صلى الله عليه وسلم. (رواه ابن حبان في صحيحه وأبو نعيم في الحلية)

অর্থাৎ, হযরত আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, হে আবূ যর! সর্বপ্রথম নবী আদম, সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। (সহীহ ইবনে হিব্বান ও হিল্য়া)

উল্লেখ্য, মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাধারণভাবে উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত خاتم النبين -এর ختم نبوت এবং এসব হাদীছে উল্লেখিত ختم نبوت বা لانبي بعدي-এর অপব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, এখানে তাঁর দ্বারা খতমে নবুওয়াত হয়েছে বা নবুওয়াতের দরজা বন্দ হয়েছে কিংবা "তাঁর পর আর কোনো নবী আসবে না"- এর অর্থ হল স্বতন্ত্র নবুওয়াতের দরজা বন্দ হয়েছে এবং তাঁর পর আর কোনো স্বতন্ত্র নবী আসবে না। কোন বুরূজী বা ছায়া নবী বা উম্মতী নবীর আগমন এর পরিপন্থী নয়। কিন্তু প্রথমত এটা "খতমে নবুওয়াত" এবং তাঁরপরে

"আর কোনো নবী নেই" কথাটার জাহিরী বা প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত। বিনা দলীলে শরীআতের কোন ভাষ্যের জাহির বিরোধী এমন অর্থ করা ইল্হাদ ও কুফ্রী। তদুপরি এটা উম্মতের সর্বসম্মতমতে গৃহীত অর্থের পরিপন্থী। এমন অর্থ করার অবকাশ রাখা হলে তেত্রিশ কোটি দেবতায় বিশ্বাসী হিন্দুগণও বলতে পারবে যে, আমাদের বক্তব্য কুরআন-বিরোধী নয়। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই"। এর অর্থ হল আল্লাহ ছাড়া কোনো স্বতন্ত্র ইলাহ নেই। কোন অসতন্ত্র বা ছায়া ইলাহ কিংবা বিভাগীয় ইলাহ থাকা এর পরিপন্থী নয়। আর আমাদের পরমেশ্বর একজন, অন্যরা তাঁর ছায়া খোদা বা অন্যরা হল ডিপার্টমেন্টাল ইলাহ। (নাউযুবিল্লাহ!) এরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে কেউ খোদায়ীর দাবী করলেও কাদিয়ানীগণের ব্যাখ্যামতে তার বিরুদ্ধেও বলার কিছু থাকবে না।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আয়াতে উল্লেখিত خاتم النبين-এর অপব্যাখ্যায় এও বলেছেন যে, خاتم শব্দের অর্থ মোহর। অতএব خاتم النبيين-এর অর্থ মোহ্রী নবী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে নবুওয়াতের সিল মোহর আছে। তিনি অন্য কারও নবুওয়াতকে সিল মেরে সত্যায়ন করে দিতে পারেন। সেমতে তিনি মির্জা গোলাম আহমদের নবুওয়াতকে সিল মেরে সত্যায়িত করে দিয়েছেন। অতএব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরে তার নবুওয়াতের দাবী উপরোক্ত আয়াতের পরিপন্থী নয়। এক্ষেত্রে প্রথমত কথা হল خاتم النبيين-এর কি অর্থ তাও হাদীছে বলে দেয়া হয়েছে যে, خاتم النبيين-এর অর্থ হল لانبي بعدي। কুরআনের কোন ভাষ্যের যে ব্যাখ্যা হাদীছে স্পষ্টত বর্ণিত হয়েছে তার বিপরীত কোনো ব্যাখ্যা প্রদানের কোনো অবকাশ নেই। এটা কুরআনের তাফ্সীর করার স্বতসিদ্ধ নীতি বিরুদ্ধ। দ্বিতীয়ত তিনি যদি নবুওয়াতের মোহরধারী নবী হয়ে থাকবেন, যার সত্যায়ন ব্যতীত কারও নবুওয়াত স্বীকৃত না হয়ে থাকবে, তাহলে তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের নবুওয়াতকে তিনি মোহর দ্বারা সত্যায়িত করলেন কীভাবে? তিনি তো তখন দুনিয়াতে আগমনই করেননি। আর তাঁর পরের নবীকে সত্যায়িত করার জন্য কি তিনি আবার দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন? অন্যথায় কীভাবে সত্যায়ন করলেন? তদুপরি নবুওয়াত কোন সিল মোহর মেরে সত্যায়িত করার মত বিষয় নয়। বরং নবুওয়াত হল আল্লাহ্ তাআলা-র একান্ত নির্বাচন; আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকেই নবুওয়াত দান করেন। আর আল্লাহ তাআলার নির্বাচনের পর আর কারও সত্যায়নের প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকতে পারে না। নবুওয়াত আল্লাহ্ তাআলার একান্ত নির্বাচন- এ মর্মে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। (সূরা: ২২-হজ্জ: ৭৫)

ইজ্‌মা থেকে দলীল

"খতমে নবুওয়াত"-এর বিষয়টি উম্মতের ইজ্‌মা দ্বারাও সু-প্রতিষ্ঠিত এবং "খতমে নবুওয়াত"-এর বিষয়টি অস্বীকারকারী উম্মতের সর্বসম্মতমতে কাফের। সাইয়্যেদ মাহমূদ আলূসী (রহ.) তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এরূপ বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন–

وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطقت بـه الكتاب و صدقت بـه السـنة وأجمعت عليه الأمة فيكفَّرُ مُدَّعي خلافه ويقتل إن أصرَّ. (روح المعاني ج/٨. صفحه/٣٥)

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খাতামুন্নাবী হওয়া কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা, হাদীছের সত্যায়ন এবং উম্মতের ইজ্‌মা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিষয়। অতএব এর বিপরীত কেউ দাবী করলে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে। আর এর উপর হটকারিতা করলে তাকে হত্যা করা হবে।

যুক্তি ভিত্তিক দলীল

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খতমে নবুওয়াত যুক্তি দ্বারাও সু-প্রমাণিত। কেননা নতুন কোন নবী আগমনের যে প্রয়োজন বা প্রেক্ষাপট থাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর সে রকম কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়নি বা সে রকম কোনো প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়নি এবং হবেও না। যেমন: অন্য কোন নবীর আগমনের প্রয়োজন দেখা দেয় যদি পূর্বের নবী সাময়িককালের জন্য প্রেরিত হয়ে থাকেন বা বিশেষ কোন ভূখণ্ডের জন্য প্রেরিত হয়ে থাকেন বা নবী তাঁর সাহায্যার্থে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অন্য কোন নবীকে চেয়ে নেন[১] বা পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষা যদি বিকৃতি বা পরিবর্তনের শিকার হয়ে পড়ে কিংবা পূর্ববর্তী নবীর শরীআত যদি পূর্ণতা লাভ না করে থাকে ইত্যাদি। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরবর্তীতে এমন কোনো প্রয়োজন বা প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়নি, যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অতএব যুক্তির ভিত্তিতেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর আর কোনো নবী হতে পারে না।

চুন বিশ্ব-ইশ্বর ও তার দ্বীনদার আঞ্জুমান

"দ্বীনদার আঞ্জুমান" বলতে বোঝানো হয়েছে সিদ্দীক দ্বীনদার চুন বিশ্ব-ইশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংগঠনকে। আর চুন বিশ্ব-ইশ্বরের মূল নাম সিদ্দীক। উপাধি দ্বীনদার। তিনি নিজের নামের সঙ্গে লিখতেন চুন বিশ্ব-ইশ্বর। হায়দারাবাদের দাক্ষিণাত্যে ছিল তার অবস্থান। ১৩০৩ হিজরীর ৪ রমযান তিনি দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন এবং হায়দারাবাদের আসিফ নগরে একটা খানকা গড়ে তোলেন। এই খানকার নাম "খানকায়ে সরওয়ারে আলম" তথা জগৎগুরু আশ্রম। ১৯২৪ সনে তিনি দ্বীনদার আঞ্জুমান নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেন।

১. যেমন হযরত মূসা (আ.) হযরত হারুন (আ.) কে চেয়ে নিয়েছিলেন।

সিদ্দীক চুন বিশ্ব-ইশ্বর মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সাথে সম্পর্ক রাখতেন। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর গ্রন্থ থেকে তিনি ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি মির্জা বশীর উদ্দীন মাহমূদ (খলীফা কাদিয়ান)-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। মুহাম্মাদ আলী লাহোরী মির্জায়ীর কাছে যেয়ে কাদিয়ানীর তাফসীর পাঠ করেন। অতঃপর হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্যে এসে হিন্দুদের পুস্তকাবলী এবং মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে টেনে-হিচড়ে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে হিন্দুদের অবতার চুন বিশ্ব-ইশ্বর হওয়ার দাবী করেন। মূলত বিশ্ব-ইশ্বরী ফিতনাকে কাদিয়ানী ফিতনারই একটা শাখা বলা যায়।

এ ছাড়াও তিনি যেসব দাবী করেন বা যেসব মতবাদ পোষণ করেন, সেগুলো তার লিখিত রচনাবলীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তার রচনাবলীর মধ্যে এ পর্যন্ত 'مہر نبوت' 'خادم خاتم النبيين' 'جامع البحرين' 'معراج المؤمنين' ও 'دعوت إلى الله'-এর বরাত পাওয়া যায়। এগুলো ছাড়া আরও অনেক রচনা আছে যেগুলো বাহাইদের পবিত্রতম কিতাবের ন্যায় পরিবেশ অনুকূল হওয়ার পর প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। তার গ্রন্থসমূহের মধ্যে دعوت إلى الله (দাওয়াত ইলাল্লাহ) গ্রন্থখানা তার ধর্ম এবং অন্যান্য পুস্তকরাজির মূল ভিত্তি। তার অন্যান্য গ্রন্থ এবং মুরীদদের অন্যান্য গ্রন্থ যেন এরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

তিনি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভাবশিষ্য হওয়ায় তার দাবীগুলোও ছিল মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মত অসংখ্য এবং বৈচিত্রে ভরা। তার দাবীসমূহের কিছু ছিল তার নিজের সম্বন্ধে, কিছু ছিল তার খানকা (খানকায়ে সরওয়ারে আলম) সম্বন্ধে, আর কিছু ছিল তার সংগঠন- "দ্বীনদার আঞ্জুমান"-এর সদস্যদের সম্বন্ধে। এ ছাড়াও তার আরও কিছু আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে। পৃথক পৃথকভাবে সেই দাবী এবং আকীদাসমূহের কিছুটা তুলে ধরা হল। যার মাধ্যমে তার কুফ্‌রী আকীদা-বিশ্বাসগুলো প্রতিভাত হবে।

নিজের সম্বন্ধে তার দাবীসমূহ

১. চুন বিশ্ব-ইশ্বর হওয়ার দাবী।

তিনি চুন বিশ্ব-ইশ্বর হওয়ার দাবী করেছেন। এ প্রসংগে তিনি বলেন, দাক্ষিণাত্যে একজন আদিষ্ট ব্যক্তির প্রতীক্ষা প্রায় আটশ বছর থেকে চলে আসছে এত ধুমধামের সঙ্গে যে কর্নাটকের প্রতিটি শিশুও এ ব্যাপারে খুব অবহিত। এরকম প্রতীক্ষা কোন আদিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে নেই।[১] এ ব্যাপারে তিনি হিন্দুদের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী থেকে প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করেছেন।

২. প্রতিশ্রুত ইউসুফ হওয়ার দাবী।

তার গ্রন্থসমূহের প্রচ্ছদে যেসব কথা ছাপা থাকত, তার মধ্যে يوسف موعود (প্রতিশ্রুত ইউসুফ)কথাটিও লিখিত থাকত। কাদিয়ান থেকে হায়দারাবাদ পৌছেই

১. خادم خاتم النبيين صفحه/١١

২. প্রতিশ্রুত ইউসুফ হওয়ার দাবী।

তার গ্রন্থসমূহের প্রচ্ছদে যেসব কথা ছাপা থাকত, তার মধ্যে یوسف موعود (প্রতিশ্রুত ইউসুফ)কথাটিও লিখিত থাকত। কাদিয়ান থেকে হায়দারাবাদ পৌছেই তিনি প্রতিশ্রুত ইউসুফ[১] হওয়ার দাবী করেন। তিনি বলেন, "হযরত মির্জা (গোলাম আহমদ) সাহেবের শুভসংবাদে যতগুলো গুণ প্রতিশ্রুত ইউসুফের বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সব পূর্ণাঙ্গরূপে আমার মধ্যে পাওয়া যায়।[২]

৩. মূসা ও দাউদ হওয়ার দাবী।

তিনি বলেন, এমনিতে মাহাত্মের দিক দিয়ে আমি মূসা আবার দাউদ (আ.)।[৩] অন্যত্র তিনি বলেন, প্রতিশ্রুত মাসীহও আমার সম্পর্কে বলেছেন, আমার নিকট ইল্হাম হয়েছে যে, একজন মূসা রয়েছেন আমি তার আবির্ভাব ঘটাব।[৪]

৪. শেষ যমানার মাহ্দী হওয়ার দাবী।

সিদ্দীক চুন বিশ্ব-ইশ্বর শেষ যমানার মাহ্দী হওয়ার দাবী করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জনসাধারণকে সম্বোধন করে বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এর মধ্যে ফানা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আমার নিকট পৌছতে পারবে না।[৫] অন্যত্র তিনি তার এক ওয়াজের বর্ণনা দিয়ে বলেন, অনেক লোক ওয়াজের পরে চিৎকার করে বলে উঠেছিল যে, আপনি মাহ্দী। কেউ কেউ মাহদী মেনে বাইআত হয়ে গেল।[৬]

৫. হিন্দুদের অবতার হওয়ার দাবী।

চুন বিশ্ব-ইশ্বর হিন্দুদের অবতার হওয়ারও দাবী করেছেন। তিনি বলেন, দুনিয়াতে এরূপ কোনো নবী আছে যার দরবারে সমস্ত নবী একত্র হন? আদম (আ.) থেকে নিয়ে সমস্ত আম্বিয়া ... আমি অবতার থেকে নিয়ে গৌতম বুদ্ধ অবতার পর্যন্ত। সমস্ত আম্বিয়া (আ.) একত্র হই।[৭]

৬. নবী হওয়ার দাবী।

তিনি বলেন, দুনিয়াতে এরূপ কোনো নবী আছে যার দরবারে সমস্ত নবী একত্র হন? আদম (আ.) থেকে নিয়ে সমস্ত আম্বিয়া ... আমি অবতার থেকে নিয়ে গৌতম

---

১. উল্লেখ্য, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর তথাকথিত ইলহামে প্রতিশ্রুত ইউসূফের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।

২. خادم خاتم النبيين صفحه/٥٨

৩. دعوت ألى الله. صفحه/٢٨

৪. أيضا. صفحه/٢١

৫. خادم خاتم النبيين صفحه/٨

৬. أيضا، صفحه/٤٨

৭. مهر نبوت. صفحه/٦٢

বুদ্ধ অবতার পর্যন্ত সমস্ত আম্বিয়া (আ.) একত্র হই।[১] তিনি আরও বলেন, আলহামদু লিল্লাহ নবুওয়াতের ঘোষণা প্রতিশ্রুত মাসীহের খ্যাতির কারণ হয়েছে। আর এই খ্যাতি কেয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত একটা বিরাট প্রমাণ।[২]

৭. বুরূযে মুহাম্মাদ হওয়ার দাবী।

'দ্বীনদার জামাআত তাদের খেতাব বা উপাধি, এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অর্জিত হয়েছে। দুইশতের অধিক ময়দানী ব্যক্তি অধিকাংশ নবীর মনযিল পেরিয়ে গেছে। তাদেরকে বিভিন্ন নবীর নামে ডাকা হয়েছে। তারা দরবারে বুরূযে মুহাম্মাদ (খানকায়ে সরওয়ারে আলম আসিফ নগর দাক্ষিণাত্য)-এ সমবেত হয়েছে। শুধু রাম আর কৃষ্ণ অবতারই এক ডজন থেকে বেশি।'[৩] এখানে তিনি নিজেকে বুরূযে মুহাম্মাদ হওয়ার দাবী ব্যক্ত করেছেন।

এ বিষয়টা আরও স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন, "বুরূযে মুহাম্মাদ দ্বারা উদ্দেশ্য দ্বিতীয় উত্থানের সময় পরবর্তী সকলের মালিক ও মনিব। এ সময়টি আম্বিয়া (আ.)-এর সমবেত হওয়ার সময়। যখন সমস্ত নবীগণ সমবেত হবেন। তাদের উপর বিচারক রসূলের মধ্যে ফানা একজন উম্মত হবে যাকে বলা হবে বুরূযে মুহাম্মাদ।[৪]

৮. নবী মুহাম্মাদ হওয়ার দাবী।

তিনি বলেন, "খানকায়ে সরওয়ারে আলম আসিফ নগর হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্যে হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দ্বিতীয়বার প্রেরণ করা হয়েছে।" এভাবে তিনি নিজেকে নবী মুহাম্মাদ হওয়ার দাবী করেছেন।

তিনি আরও বলেন, "এই ফকীর ফানা ফির রসূল। নিজের মধ্য থেকে জ্যোতির উৎস রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শক্তিকে প্রকাশ করেছে। যার কারণে আমার সামনে নয় বরং জ্যোতির উৎস হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে সমস্ত আম্বিয়া স্ব-সম্মানে হাঁটু গুছিয়ে বসেছেন।"[৫]

৯. হাশরের বিচারক হওয়ার দাবী।[৬]

১০. হাউযে কাউছারের বন্টনকারী হওয়ার দাবী।[৭]

১১. খোদার প্রকাশ (مظهر خدا) হওয়ার দাবী।[৮]

১২. স্বয়ং খোদা হওয়ার দাবী।

---

১. مهر نبوت. صفحه/٦٢

২. أيضا. صفحه/٢-٥

৩. شمس الضحى. مصنف مولوى عبد الغنى يكے از شاگردصديق ديندار.صفحه/٥١

৪. مهر نبوت. صفحه/٤٤

৫. أيضا. صفحه/٦٢ এখানে একজন হিন্দু মিথ্যাবাদীর সামনে সমস্ত নবীগণ হাঁটু গুছিয়ে বসে আছেন এ কথায় সমস্ত নবীর চরম অবমাননা করা হয়েছে।

৬. مهر نبوت. صفحه/٤٤

৭. أيضا. صفحه/٤٣

৮. مهر نبوت. صفحه/٤٣

তিনি বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি হাশর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বিচারক রূপে এসেছেন। একটা উঁচু সিংহাসনে বসেছেন। প্রতিদান ও শাস্তির ফয়সালা দিচ্ছেন। আমি দেখলাম তিনি আমার রূপী।'[১]

অন্যত্র তিনি নিজের খোদা হওয়ার দিকে ইংগিত করে বলেন, 'এরা (আহলুল্লাহ) আল্লাহওয়ালার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীতে গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করার পর আল্লাহ তাআলার দরবারে পরামর্শ করেন।'[২]

এ ছাড়াও তিনি কালীমুল্লাহ, (আল্লাহ যার সঙ্গে কথা বলেছেন) ইমামুল গায়েব, (যিনি গায়েব বিষয়ে সর্বজান্তা) ঈসা, সুলাইমান, সেকান্দারে আজম (আলেকজান্ডার দি গ্রেট) যবীহুল্লাহ প্রভৃতি বহু কিছু হওয়ার দাবী করেছেন।[৩]

তার খানকা সম্বন্ধে তার দাবীসমূহ

তিনি তার খানকা (খানকায়ে সরওয়ারে আলম) সম্বন্ধে যেসব দাবী করেছেন তার কয়েকটা নিম্নরূপ–

১. তার খানকা হল বুরূযে মুহাম্মাদীর দরবার।
২. তার খানকায় নবী তৈরি হয়।[৪]
৩. তার খানকায় অবতার তৈরি হয়।
৪. তার খানকার লোকদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে খেতাব প্রদান করা হয়।

এই সবগুলো দাবী তার একটা বক্তব্য থেকেই নির্ধরিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'দ্বীনদার জামাআত তাদের খেতাব বা উপাধি, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্জিত হয়েছে। দুইশতের অধিক ময়দানী ব্যক্তি অধিকাংশ নবীদের মনযিল পেরিয়ে গেছে। তাদেরকে বিভিন্ন নবীর নামে ডাকা হয়েছে।[৫] তারা দরবারে বুরূযে মুহাম্মাদ (খানকায়ে সরওয়ারে আলম আসিফ নগর দাক্ষিণাত্য)-য়ে সমবেত হয়েছে। শুধু রাম আর কৃষ্ণ অবতারই এক ডজন থেকে বেশি।'[৬]

৫. তার খানকা খোদার দরবারের মত।

তিনি বলেন, এরা (আহলুল্লাহ) আল্লাহওয়ালার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীতে গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করার পর আল্লাহ তাআলার দরবারে পরামর্শ করেন।'[৭]

৬. তার খানকা থেকে খোদা হয়ে বের হয়।

---

১. ٧٦/صفحه. شمس الضحى. مصنف مولوى عبد الغنى كے از گرد صديق ديندار
২. ٣٣/صفحه. معراج المؤمنين
৩. দ্র: ٣٥/صفحه. دعوت ألى الله
৪. এতবড় দাবী তো শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও করে যাননি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে তো সাহাবী তৈরি হত, আর তার দরবারে নাউযু বিল্লাহ নবী তৈরি হত। যেন নবী তৈরির ফ্যাক্টরী!
৫. নবী হওয়া যেন একটি খেল-তামাশার বিষয়!
৬. ٥١/صفحه. شمس الضحى. مصنف مولوى عبد الغنى كے از شاگرد صديق ديندار
৭. ٣٣/صفحه. معراج المؤمنين

তিনি বলেন, "এরূপভাবে মৃতদেরকে জীবনদানকারী আমাদের খানকাহ থেকে বের হচ্ছেন।"

তাহলে এ কথা বলা যায় কি যে, দ্বীনদার আঞ্জুমান ওয়ালারা যখন মৃতদের জীবন-দানকারী, তখন আর কিছু না হলেও অন্তত স্বীয় নবী এবং খোদাকে জীবিত করে নিয়ে এনে দেখাক যাতে তার কাছে পৃথিবীবাসী জিজ্ঞাসা করতে পারে তার আকীদা-বিশ্বাস তাকে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে কী দিয়েছে?

তার সংগঠন (দ্বীনদার আঞ্জুমান)-এর সদস্যদের সম্বন্ধে তার দাবীসমূহ

১. তার সংগঠনের সদস্য তথা তার মুরীদগণ নবীদের মর্যাদায় উন্নীত হয় এমনকি নবী হয়ে যায়।

তিনি বলেন, "পরবর্তীদের সরদার সিদ্দীক দীনদার সংসর্গে অনেক লোক নবীদের অনুরূপ হয়েছে এবং হচ্ছে। খানকায় যেয়ে যে জীবন ওয়াকফ করে বসে যায় সে মারয়াম হয়ে যায়। যখন সে ময়দানে বের হয় মাসীহ হয়ে যায়। এরূপভাবে মৃতদেরকে জীবনদানকারী আমাদের খানকা থেকে বের হচ্ছে। বোবা কথা বলছে। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ইয়াহইয়া, নূহ এবং মূসা নামে ডেকেছেন তারাও আমার হাতে বাইআত। কাসিম সাহেব যার উদাহরণ নূহের মত তিনিও আমার হাতে বাইয়াত হয়েছেন। ..."।[১]

২. তার লোকেরা আল্লাহর পক্ষ থেকে খেতাব লাভ করে।

তিনি বলেন, দীনদার জামাআত তাদের খেতাব বা উপাধি, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্জিত হয়েছে। দুইশতের অধিক ময়দানী ব্যক্তি অধিকাংশ নবীদের মনযিল পেরিয়ে গেছে। তাদেরকে বিভিন্ন নবীর নামে ডাকা হয়েছে।[২]

৩. তার লোকেরা বিভিন্ন নবীর নাম অর্জন করে বা তাঁদের সমমর্যাদা সম্পন্ন হয়ে যায়।[৩]

৪. তার লোকেরা নবীদের মর্যাদা অতিক্রম করে যায়।[৪]

চুন বিশ্ব-ইশ্বরের আরও কতিপয় আকীদা

১. কোন মুসলমান নবীদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি মুসলমান হিসাবে জন্মগ্রহণ করে অথবা মুসলমান হয় সে প্রথম কদমেই কোন না কোন নবীর মত হওয়ার শক্তি রাখে। আর জ্যোতির উৎস রসূল (সা.)-এর দ্বিতীয় তাছাররুফ (প্রভাব) মুসলমানদের মধ্যে এটা চলছে যে, কোন মুসলম-ানের ধারণাও হয় না যে, নিজের কোন শিশুর নাম কোন নবীর গোলামীতে রাখে।

---

১. ٩١/صفحه. دعوت إلى الله
২. ٥١/صفحه. شمس الضحى. مصنف مولوى عبدالغنى كے ازشاگرد صديق ديندار
৩. প্রাগুক্ত।
৪. প্রাগুক্ত।

যেমন- সাধারণত গোলাম মুহাম্মদ, গোলাম আহমদ, গোলাম আলী, গোলাম দস্তগীর নাম রাখে। এরূপভাবে গোলাম ইব্রাহীম, গোলাম মূসা, গোলাম ঈসা এই ধরনের নাম রাখার কল্পনাও মুসলমানদের অন্তরে হয় না। কারণ কোন মুসলমান কোনো নবী থেকে কোনো অংশেই কম নয়।"[১]

২. মুমিনের মর্যাদা নবীদের চেয়েও বেশি।

দ্বীনদার আঞ্জুমানের নেতা সাঈদ ইব্‌নে ওয়াহীদ কাশ্মীরে সীরাতুন্নাবীর জলসায় বলেছিলেন, "যেখানে নবুওয়াত সমাপ্ত হয় সেখান থেকে মুমিনের গুণের সূচনা হয়। যদি কোন মুমিন নবুওয়াতের দাবী করে তাহলে সে নিজের মর্তবা থেকে আরও নিম্ন মানের জিনিসের দাবী করে।" চুন বিশ্ব-ইশ্বর সাহেব স্বীয় রচনাবলীতে বার বার একজন মুসলমানের মর্যাদাকে নবুওয়াতের মর্যাদা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি নিজ গ্রন্থ মোহরে নবুওয়াতের শুরুতে লিখেছেন- আমাদের ওলী সমস্ত নবীর উপর শীর্ষস্থানীয়।

৩. মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যে প্রতিশ্রুত মাসীহ হওয়ার দাবী করেছেন এটা সত্য।

চুন বিশ্ব-ইশ্বর গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে প্রতিশ্রুত মাসীহ্ বলে স্বীকার করেন। তিনি বলেন, "নবীদের রহস্যাবলী আমার নিকট স্পষ্ট হওয়ার দুটো কারণ। প্রথম কারণ হল- এই ফকীর ১৯০৮ ইংরেজিতে দাজ্জালের ফিতনা থেকে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল হয়ে মাসীহের অন্বেষণে ছিল। ১৯১৪ ইংরেজিতে মাসীহ (মির্জা গোলাম আহমদ)কে পেলাম। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আঠাশ বছর বয়সে দুনিয়া বর্জন করে অতিরিক্ত জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে কাদিয়ানে পৌছলাম এবং মির্জা সাহেবের লিখিত ১০ হাজার পৃষ্ঠা থেকে –যেগুলোর অন্তত তিনশ স্থানে খতমে নবুওয়াতের বিষয়টির সমাধান দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে– পরিপূর্ণরূপে অবহিত হলাম। এরূপভাবে ফকীরের নিকট নবুওয়াতের রহস্যাবলী প্রতিভাত হওয়ার এটা প্রথম কারণ।"[২]

৪. তিনি হিন্দু সাধকদেরকে আল্লাহর ওলী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

দ্বীনদার আঞ্জুমানের বর্তমান কর্মপদ্ধতি

বর্তমানে দীনদার আঞ্জুমানের তিনটা আন্দোলন তিনটা ভিন্ন ভিন্ন নামে চালু আছে। পুরো হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানে তাদের প্রচারকরা ছড়িয়ে আছে।

১. "হিযবুল্লাহ দ্বীনদার আঞ্জুমান"। ভারতে এই নামে দীনদার আঞ্জুমানের কাজ চালু রয়েছে। এর একটা শাখা করাচীতেও আছে।

২, "জমিয়তে মুজাহিদীন ফী সাবিলিল্লাহ দ্বীনদার আঞ্জুমান"করাচীতেই সাঈদ ইব্‌নে ওয়াহীদ বি. এ আলীগড়ির নেতৃত্বে এই নামে দ্বীনদার আঞ্জুমানের কাজ চলছে। এই সংস্থার কেন্দ্রীয় দপ্তর কোরঙ্গী করাচীতে অবস্থিত।

১. مهر نبوت. صفحه/٦١-٦٠
২. মোহরে নবুওয়াত, পৃ. ২৫

৩. "কেন্দ্রীয় দ্বীনদার আঞ্জুমান"। পাঞ্জাব ও পেশোয়ার ইত্যাদিতে এই নামে প্রকাশ্যে ও গোপন পদ্ধতিতে দীনদার আঞ্জুমানের কাজ চলছে।

জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্য দ্বীনদার আঞ্জুমানের প্রচারকদের বিশেষ দুটো পেশা রয়েছে।

(এক) কেউ কেউ পেশ ইমাম হয়ে বিভিন্ন মসজিদে ইমামতি করছে।

(দুই) কেউ কেউ পীর হয়ে তাদের মুরীদদের মাঝে চুন বিশ্ব-ইশ্বরের মতবাদ ছড়াচ্ছে।

দ্বীনদার আঞ্জুমানের লোকেরা সবুজ রংয়ের পাগড়ী বাঁধে; যার নিচে সাধারণত সাদা টুপি থাকে। গেরুয়া রংয়ের জামা পরিধান করে। মাথায় লম্বা চুল, লম্বা দাড়ি এবং চেহারা ময়লা দেখা যায়। তারা চা পান থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে।

দ্বীনে ইলাহী

"দ্বীনে ইলাহী" বা "দ্বীনে ইলাহী আকবর শাহী" তৃতীয় মোঘল সম্রাট আবুল ফাতাহ জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত একটা ধর্মমত। সম্রাট আকবর ছিলেন সম্রাট হুমায়ুনের পুত্র। শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন যখন তার স্ত্রী হামীদা বানুসহ সিন্ধুর অমরকোটের হিন্দু রাজা রানা প্রসাদের রাজ্যে নির্বাসিত জীবন-যাপন করছিলেন, সে সময় (১৫৪২ খৃষ্টাব্দের ২৩ নভেম্বর) আকবর জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর-এর বয়স যখন ১৩ বছর, সে সময় হুমায়ুনের বিশ্বস্ত সহচর ও বন্ধু শীআ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈরাম খান-এর সহযোগিতায় তিনি (১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারী) দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করতে সক্ষম হন। বৈরাম খান এই কিশোর সম্রাটের অভিভাবকত্ব করতে থাকেন।[১]

পিতার হারানো রাজত্ব ফিরে পেয়ে সম্রাট আকবর পুনরায় রাজত্ব হারাতে না হয় তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। তিনি তার সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও উন্নতি কল্পে যে সব চিন্তা-ভাবনা করেন ও যেসব নীতি গ্রহণ করেন, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজপুতনীতি। প্রতাপশালী রাজপুতদের[২] সমর্থন লাভের জন্য তিনি তাদের সঙ্গে মিলনাত্মক নীতি গ্রহণ করেন এবং রাজপুতাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন।[৩] তাদেরকে সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের উচ্চ পদে নিয়োগ দেন।

তিনি তার সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও উন্নতি কল্পে আর যেসব নীতি গ্রহণ করেন, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল তার সর্বধর্ম সমন্বয়ের নীতি। যাতে বহুজাতিক

১. তথ্যসূত্র: দেওবন্দ আন্দোলন : ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান
২. উত্তর পশ্চিম ভারতস্থ রাজপুতানার প্রধান বসবাসকারী জাতিকে রাজপুত বলা হয়। এই ঐতিহাসিক অঞ্চল এখন প্রায় সমগ্রভাবে রাজস্থান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং তার সঙ্গে সমবিস্তৃত। রাজপুতগণ প্রধানত যুদ্ধ পেশাধারী ক্ষত্রীয় শ্রেণীর হিন্দু।
৩. তার রাজপুত পত্নীদের মধ্যে ছিল অম্বরের রাজা বিহারীমলের কন্যা যোধবাঈ, বিকানীরের রাজা কল্যাণ মল এবং জয়সল মীরের রাজার কন্যাদ্বয়।

দেশ ভারতবর্ষের সব ধর্মের অনুসারীরা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং এটা তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের মনোভাব সৃষ্টি না হওয়ার অনুকূলে কাজ করে। এ নীতির অধীনেই তিনি ইসলাম ধর্মের অনেক বিধি-বিধানকে বাদ দিয়ে এবং অন্যান্য সব ধর্মের কিছু কিছু নিয়মনীতির সমন্বয়ে "দ্বীনে ইলাহী"-র প্রবর্তন ঘটান। এতে জৈন ধর্মের অহিংসবাদ, ক্যাথলিক খৃষ্টানদের বৈরাগ্যবাদও শামিল ছিল। এতে আলো, সূর ও অগ্নির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান জরথুষ্ট্রীয় মতবাদের প্রভাবের প্রতি ইংগিত বহন করে। দ্বীনে ইলাহীতে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রবেশ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হয় হিন্দু ধর্মকে।[1]

দ্বীনে ইলাহী ধর্মমত উদ্ভাবনের পশ্চাতে যে সকল কারণ সক্রিয় ছিল তার মধ্যে প্রশাসনিক স্বার্থকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। তবে এর পশ্চাতে একজন ধর্ম প্রবর্তক হওয়ার খাহেশও যে আকবরের মনে ছিল না তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তার লক্ষণ হল তিনি এমনও কিছু বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছিলেন যা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীকে খুশি করার উদ্দেশ্যে নয় বরং তা নিছক ধর্মের একটা নতুন রূপ দান বা নিতান্তই ইসলাম বিরোধিতার কারণে করেছিলেন, যা সামনে বর্ণিত দ্বীনে ইলাহীর নীতিনিয়ম পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে সব ধর্মের ভেদাভেদ তুলে দিয়ে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের একটা স্বপ্ন নিয়ে ইতিপূর্বে আরও একটা মতবাদ গড়ে উঠেছিল। সেটার নাম হল ভাববাদী ধর্ম। আকবরের সভাকবি আবুল ফজলের পিতা শেখ মুবারক ছিলেন সেই ভাববাদী দর্শনের একজন প্রচারক। আবুল ফজলও সেই চেতনা নিয়েই গড়ে উঠেছিলেন। তারাই সম্রাট আকবরকে সর্ববাদী ধর্মের স্বপ্ন দেখান। এই (উলামায়ে ছূ-র পর্যায়ভুক্ত আলেম) আবুল ফজলই প্রধানত আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত দ্বীনে ইলাহীর বিভিন্ন নীতি ও বিধি উদ্ভাবনের পরামর্শ ও তার পশ্চাতে যুক্তি উদ্ভাবন করে দেখান। মোল্লা শিরাজী, হাজী ইব্রাহীম প্রমুখ আরও অনেকে এ কাজে ভূমিকা রাখেন।[2] আর আবুল ফজলের পিতা শায়খ মুবারক ও আবুল ফজলের ভাই ফায়জীকে আকবর সৃষ্ট দ্বীনে ইলাহীর বড় দুটো

---

১. যেমন রমযানে প্রকাশ্যে পানাহার বৈধ ঘোষণা করা হয়, অথচ হিন্দুদের ব্রত পালনের সময় প্রকাশ্যে পানাহার নিষিদ্ধ করা হয়। হিন্দুগণের দেবতা হেতু গাভী যবাই নিষিদ্ধ করা হয়। কোন কোন অঞ্চলের মুসলমান কুরবানীতে গরু যবাই করায় যবাইকারীকে প্রাণ হারাতে হয়। এক বর্ণনামতে কপালে তিলক আঁকার নীতি প্রবর্তন করা হয়। বাদশাহ স্বয়ং সংস্কৃত ভাষায় সূর্যের এক হাজার নামের জপ করতেন, যা হিন্দু ধর্মের অনুকূলে ছিল। ইত্যাদি। তথ্যসূত্র: ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খণ্ড, দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান প্রভৃতি।

২. যেমন দাড়ি না রাখার পশ্চাতে এই যুক্তি দেখানো হয় যে, জান্নাতেও কারও দাড়ি থাকবে না। ১২ বৎসর বয়সের পূর্বে খতনা না করানোর পশ্চাতে এই যুক্তি দেখানো হয় যে, এ বয়সের পূর্বে কেউ মুকাল্লাফ বা শরীআতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় না। অতএব এর পূর্বে কাউকে খতনা করানো যাবে না। একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ করার পশ্চাতে যুক্তি দেখানো হয় যে, আল্লাহ একজন তাই বিবিও থাকবে একজন ইত্যাদি।

খুঁটি মনে করা হত। অক্ষর-জ্ঞানহীন সম্রাট আকবর বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদের দরবারে আহবান করে তাদের থেকে ধর্মকথা শুনে সব ধর্মের সারবত্তা কি তা অনুধাবন করার চেষ্টা করেন এবং নিজস্ব জ্ঞান অনুসারে যে ধর্মের যে সারবত্তা তিনি মনে করেন তা নিয়ে সব মিলিয়ে দ্বীনে ইলাহীর জগাখিচুড়ি রূপ তৈরি করেন। ৯৮৯ হিজরী মোতাবেক ১৫৮১ সালে দ্বীনে ইলাহীর প্রবর্তন হয়।[1]

বাদশাহ আকবর এবং দ্বীনে ইলাহীর আকীদা-বিশ্বাস ও রীতিনীতি

আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত দ্বীনে ইলাহীতে ইসলামের ঈমান-আকীদা ও আমলে সর্বত্র চরম বিকৃতি সাধন করা হয়েছিল। এ ধর্মে উদারতা, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা, ধৈর্যের মাধ্যমে ক্রোধ দমন, দুনিয়া বিমুখিতা, নম্রতা, স্নেহ-প্রীতি প্রভৃতি ইসলামের কিছু নৈতিক বিধি-বিধান রাখা হয়েছিল, তবে ইসলামের বহু মৌলিক বিধি-বিধান চরমভাবে বর্জন করা হয়েছিল।

ঈমান-আকীদার ক্ষেত্রে যেসব বিকৃতি সাধন ও নতুন বিধান প্রবর্তন করা হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল–

১. এ ধর্মের কালেমা ছিল لا إله الله أكبر خليفة الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবার খলীফাতুল্লাহ)।

এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম কালেমা থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছিল। যদিও আকবর স্পষ্টত নবী হওয়ার দাবী করেননি, তবে রসূল (সা.)-এর নাম কালেমা থেকে বাদ দেয়া এবং একজন শরীআত প্রবর্তকের ন্যায় নতুন ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে তিনি কার্যত নবী হওয়ারই দাবী প্রমাণিত করেছেন। সম্ভবত সেদিকে ইংগিত করার জন্যই কালেমার মধ্যে নবীর নামের স্থলে নিজের নাম ও খলীফাতুল্লাহ শব্দ যোগ করেছেন।[2]

দ্বীনে ইলাহীতে দীক্ষা গ্রহণের সময় উপরোক্ত কালেমা উচ্চারণ করত বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত ইসলামের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন লকরে দ্বীনে ইলাহীর প্রত্যয় চতুষ্টয় (অর্থাৎ, ধনত্যাগ, প্রাণত্যাগ, সম্মানত্যাগ ও ধর্মত্যাগ) ঘোষণা করতে হত।

২. আল্লাহ্‌র নামের সঙ্গে যে "জাল্লা জালালুহু" কথাটা ব্যবহার করা হয়, তিনি নিজের নামের সঙ্গে তা ব্যবহার করার নিয়ম করে দেন। তার প্রবর্তিত ধর্মে পরস্পর সাক্ষাতকালে ইসলামের প্রচলিত সালাম জওয়াবের বাক্যের পরিবর্তে প্রথম ব্যক্তি "আল্লাহু আকবার" বলে সম্ভাষণ করত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জওয়াবে বলত, "জাল্লা জালালুহু"।

---

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খণ্ড

১. প্রথম দিকে সম্রাট আকবরের রাষ্ট্রীয় মুদ্রায় কালিমায়ে তাইয়্যেবা অংকিত ছিল। ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর তার মুদ্রায় উক্ত কালিমার পরিবর্তে রাম ও সীতার নাম অংকিত করা হয়। বৃটিশ মিউজিয়ামে (লণ্ডন) এরূপ মুদ্রার প্রমাণ রয়েছে। دین الہی اور اس کا پس منظر. پروفیسر محمد اسلم

উল্লেখ্য, সালাম ও তার জওয়াবের প্রচলিত রীতি "আসসালামু আলাইকুম" এবং "ওয়া আলাইকুমুস সালাম" বদল করত 'আল্লাহু আকবার জাল্লা জালালুহু' চালু করার পশ্চাতে রহস্য হল সম্রাটের নাম ছিল জালালুদ্দীন আকবর। সালাম ও তার জওয়াবের উপরোক্ত বাক্যটা সেই আঙ্গিকেই প্রবর্তন করা হয়।

৩. বাদশাহ আকবর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি অভক্তি ও অসহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আহমদ, মুহাম্মাদ, মোস্তফা ইত্যাকার নামের প্রতি অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন। বাদায়ুনী লিখেছেন- কোন শাহী কর্মচারীর নাম ইয়ার মুহাম্মাদ বা মুহাম্মাদ খান থাকলে আকবর তাকে অন্য নামে ডাকতেন।[১] এমনকি রসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হিজরতের স্মৃতি বিজড়িত হিজরী সনকে পরিবর্তন করে তিনি সৌরসন চালু করেন এবং শহরের কোতয়ালদেরকে নিজ নিজ দায়িত্বভুক্ত শহরের সর্বত্র এটা চালু করার নির্দেশ জারী করেন।

৪. আগুনকে পবিত্র মনে করা হত এবং আগুনকে সম্মান করা হত। সম্রাট আবুল ফজলকে শাহী মহলে সর্বদা আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছি-লন।[২]

৫. সম্রাট আকবর সূর্যকে দেবতা জ্ঞানে সংস্কৃত ভাষায় সূর্যের এক হাজার নাম জপ করতেন।[৩]

৬. আকবর নিজেকে সাজদা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি সকাল বেলা সূর্য-পূঁজা শেষে প্রত্যাবর্তন করলে দর্শনিয়া[৪] নামক সম্প্রদায়ের লোকেরা এসে তাকে সাজদা করত।[৫]

৭. আকবর পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস রাখতেন।[৬]

আমল ও শরয়ী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে যে সব বিকৃতি সাধন ও নতুন বিধি-বিধান চালু করা হয়েছিল, তার মধ্যে রয়েছে:

১. নামাযের ব্যাপারে: আকবর শাহী মহল ও দরবারে নামায আদায় নিষিদ্ধ করেছিল। যার প্রভাবে মসজিদসমূহ বিরান হওয়ার উপক্রম হয়।[৭]

২. রোযার ব্যাপারে: আবুল ফজল ও তার অনুসারীগণ রমযান মাসকে পিপাসা ও ক্ষুধার মাস বলে আখ্যা দিয়েছিল। সম্রাট আকবর দরবারীদেরকে ভরা দরবারে

---

১. دین الٰہی اور اس کا پس منظر. پرو فیسر محمد اسلم از منتخب التواریخ جلد۲
২. دین الٰہی اور اس کا پس منظر. پرو فیسر محمد اسلم از منتخب التواریخ جلد۲
৩. دین الٰہی اور اس کا پس منظر. از منتخب التواریخ جلد۲ ও ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খণ্ড
৪. দর্শনিয়া নামক একটা দল ছিল যারা সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে বাদশাহ্‌র দর্শন লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত পানাহার করত না, এমনকি মেসওয়াকও করত না।
৫. دین الٰہی اور اس کا پس منظر.
৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খণ্ড
৭. دین الٰہی اور اس کا پس منظر. پرو فیسر محمد اسلم

পানাহার করার হুকুম দিয়েছিলেন। তার নির্দেশ ছিল কারও ক্ষুদা না পেলেও অন্তত মুখে পান এঁটে দরবারে আসবে।[১]

৩. যাকাতের ব্যাপারে: আকবর এক ফরমান জারী পূর্বক মুসলমানদের থেকে যাকাত উসূল করা বন্ধ করে দেন।[২]

৪. হজ্জ-এর ব্যাপারে: আকবর হজ্জে গমনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। বদায়ুনী লিখেছেন– তখন হজ্জে গমনের জন্য আকবরের কাছে অনুমতি প্রার্থনা মৃত্যু কামনা করার নামান্তর ছিল।[৩]

দ্বীনে ইলাহীতে ইসলামের শি'আর বা বৈশিষ্ট্য মোচন করার পর্যায়ে যেসব বিধি-বিধান ছিল, তার মধ্যে রয়েছে:

* নারীদের পর্দা করা নিষেধ।[৪]
* ১২ বৎসর বয়সের পূর্বে খতনা করা নিষিদ্ধ।[৫]
* দাড়ি রাখা নিষেধ।[৬]

এ ছাড়াও দ্বীনে ইলাহীতে যেসব বিধি-বিধান ছিল, তার মধ্যে রয়েছে:

* একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ।[৭]
* বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ।[৮]
* মদ, জুয়া ও সূদ বৈধ।[৯]
* শুকর ও কুকুর নাপাক হওয়ার হুকুম রহিত করা হয়েছিল।[১০]
* রেশমী কাপড় পুরুষদের জন্য বৈধ।[১১]
* কবরে মুরদার মাথা পূর্ব দিকে এবং পা পশ্চিম দিকে রাখা।[১২] ইত্যাদি।[১৩]

---

১. أيضا. از مبلغ الرجال وتذكرة الملوك۔
২. دین الٰہی اور اس کا پس منظر. از منتخب التواریخ جلد۲
৩. ایضا.از منتخب التواریخ جلد ۲
৪. دین الٰہی اور اس کا پس منظر۔
৫. প্রাগুক্ত।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. তথ্যসূত্র: দেওবন্দ আন্দোলন ঃ ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান
১০. প্রাগুক্ত।
১১. دین الٰہی اور اس کا پس منظر۔
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. দ্বীনে ইলাহীর নিয়মনীতি ও বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিষয়গুলোর প্রধান বর্ণনাকারী হলেন বদায়ুনী। কোন কোন ঐতিহাসিক দ্বীনে ইলাহীর প্রবর্তক সম্রাট আকবর ও তার তাত্ত্বিক গুরু আবুল ফজলের সঙ্গে বদায়ুনীর ব্যক্তিগত বিরোধের প্রসঙ্গ টেনে দ্বীনে ইলাহী সম্পর্কিত বদায়ুনীর বর্ণনাগুলোকে ব্যক্তি আক্রোশ জনিত সমালোচনার ফলাফল হিসাবে মূল্যায়ন করে দ্বীনে ইলাহী প্রবর্তনে বাদশাহ আকবরের অপরাধকে লঘু করে দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.)-এর মাকতূবাতের বিভিন্ন বর্ণনা থেকেও বদায়ুনীর বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়। যাতে প্রমাণিত হয় যে, বদায়ুনীর বর্ণনা ভিত্তিহীন নয়।

এভাবে সম্রাট আকবর সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের এক কিম্ভূতকিমাকার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তবে হাতে গোণা কয়েকজন ব্যতীত তার এ ধর্মের কেউ অনুসারী হয়নি। জানা যায় হিন্দু রাজা বিরবলসহ সর্বমোট ১৮ জন আকবরের এই ধর্মমত গ্রহণ করেন।[১]

১০০১ হিজরী সনে শায়খ মুবারক ও ১০০৪ হিজরী সনে ফায়জীর ইন্তেকালের পর এই নতুন ধর্মের দুটো বড় খুঁটি ধসে পড়ে। আর ১০০৭ হিজরী সনে আবুল ফজলকে দাক্ষিণাত্যের অভিযানে প্রেরণ করা হলে রাজদরবারে দ্বীনে ইলাহীর কর্ম তৎপরতায় ভাটা পড়ে যায়। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের পর তার প্রবর্তিত দ্বীনে ইলাহী সর্বতোভাবে পরিত্যাক্ত হয়। স্বয়ং সম্রাটের প্রিয়পুত্র এবং সেনাপতি মানসিংহ প্রকাশ্য দরবারে এ ধর্মের অসারতা প্রমাণ করেন। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের মতে ১০১১ হিজরী সনে আবুল ফজলের ইন্তেকালের পর বাদশাহ আকবরের ভ্রান্ত ধারণারও অবসান ঘটেছিল। এবং তিনি একজন খাঁটি ঈমানদার মুসলিমরূপে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।[২]

তবে আকবর কর্তৃক সৃষ্ট দ্বীনে ইলাহীর প্রভাবে সমাজে নানারূপ বিদআত-কুসংস্কার প্রলুব্ধ হয়েছিল, সারা দেশে ধর্মীয় বল্গাহীনতার মনোভাব ও ধর্মহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। দ্বীনে ইলাহীতে হিন্দু ধর্মের প্রতি অতি মাত্রায় আনুকূল্য থাকায় হিন্দুয়ানী কুসংস্কার বিস্তৃতি লাভ করেছিল। রাষ্ট্র কর্তৃক এরূপ জগাখিচুড়ি ধর্মীয় বিধি পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ায় সঠিক ইসলামের রূপ সম্পর্কে অনেকের মনে অস্পষ্টতা জেগেছিল। পরবর্তিতে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) এ সবের মোকাবিলা করে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেন।

আগাখানী

আগাখান শীআদের একটা উপদলের ধর্মীয় নেতার উপাধি। এ উপাধি সর্বপ্রথম লাভ করেন আগা হাসান আলী শাহ। তিনি মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ হয়ে কাজ করার প্রতিদান স্বরূপ এ উপাধি লাভ করেন। শীআ সম্প্রদায়ের পঞ্চম ইমাম জা'ফর ছাদিকের জেষ্ঠ্যপুত্রের নাম ছিল ইসমাঈল। পিতার জীবদ্দশায় ইসমাঈলের মৃত্যু হয়। ইমাম জা'ফর ছাদিকের মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীগণের একটি দল ইসমাঈলের পুত্র মুহাম্মাদকে নিজেদের ইমাম বলে ঘোষণা করে। এভাবেই ইসমাঈলী নামের একটা ফিরকা সৃষ্টি হয়।

১. কোন কোন ঐতিহাসিক এ থেকে বলতে চান যে, "সম্রাট আকবর তার প্রবর্তিত ধর্মের জন্য কাউকে বাধ্য করেননি। তাদের বক্তব্য হল– মূলত সম্রাট আকবর কোন নতুন ধর্ম প্রবর্তন করতে চাননি। বরং এটি ছিল একটি আধ্যাত্মিক পরিষদ বা ক্লাবের পর্যায়ভুক্ত। তাই আকবরকে কোন নতুন ধর্মের প্রবর্তক বলা অত্যুক্তি।" কিন্তু পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, তিনি তার প্রবর্তিত বিভিন্ন বিধি ও নীতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দিতেন। তদুপরি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধান প্রবর্তন করার কাজকে নিছক কোন পরিষদ বা ক্লাবের কর্মকাণ্ড বলে চালিয়ে দেয়া যায় না।

২. তথ্যসূত্র: ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খণ্ড ও দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান

এ ইসমাঈলী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই ইসলামী খিলাফতের চরম শত্রু বাতেনী সন্ত্রাসবাদী দলের আবির্ভাব ঘটে। এদের একটা দল ইরান ও উপমহাদেশের সিন্ধু প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইসমাঈলী সম্প্রদায়েরই হাসান আলী শাহ্ নামক একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে কাজ করে বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী হন। তার জন্ম ইরানে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে। তিনি ইরানের জনৈকা শাহজাদীকে বিয়ে করে কেরমান প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃটিশের সঙ্গে অতিরিক্ত মাখামাখির কারণে তিনিও ইরান থেকে বহিস্কৃত হয়ে উপমহাদেশের সিন্ধু প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ ব্যক্তি বৃটিশ সরকারের বৃত্তিভোগী চর ছিলেন। ইনিই আগাখান উপাধিতে ভূষিত হন। তারপর থেকেই ইসমাঈলী সম্প্রদায় 'আগাখানী সম্প্রদায়' নামে অভিহিত হতে থাকে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রথম আগাখানের মৃত্যুর পর তার পুত্র আগা আলী শাহ্ দ্বিতীয় আগাখান নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয় এবং তাঁর পুত্র স্যার মুহাম্মাদ আগা সুলতান শাহ্ তৃতীয় আগাখান নিযুক্ত হন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

স্যার আগাখান ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আগাখান নিখিল ভারতে মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি ত্রিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে আলীগড় মুসলিম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার সুযোগ করে দেন। আগাখান সব সময় ধর্ম প্রচারে তৎপর ছিলেন। তার প্রচেষ্টায় অসংখ্য লোক তার ধর্ম গ্রহণ করে। আগাখানের মুরীদগণকে 'ইসমাঈলিয়া' বলা হয়। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় আগাখানের মৃত্যুর পর শাহ্ করীম আল্-হুসাইনী চতুর্থ আগাখান নিযুক্ত হন। বর্তমান আগাখান চতুর্থ আগাখানের পুত্র। আগাখানী সম্প্রদায় বৃটিশের সহায়তায় বড় বড় ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়। এদের নিজস্ব উপাসনালয় আছে। মুসলমান এমনকি ইস্না আশারিয়া শীআদেরকেও এরা মুসলমান বলে গণ্য করে না। এরা নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাস এবং উপাসনা-পদ্ধতি সম্পর্কে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করে থাকে। ইসলামী কোনো ইবাদত পদ্ধতিই এরা অনুসরণ করে না। তবে নিজেদেরকে মুসলমানদেরই একটি অংশরূপে অভিহিত করে মুসলিম উম্মার চরম সর্বনাশ করে চলছে। আগাখানী সম্প্রদায় বিপথগামী ফিরকার অন্তর্ভুক্ত।[১]

খাকছার পার্টি

"খাকছার পার্টি" বলে বোঝানো হয়েছে এনায়েত উল্লাহ মাশরেকী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পার্টিকে। এনায়েত উল্লাহ মাশরেকী ছিলেন অমৃতশরের অধিবাসী। তিনি স্যার সৈয়দ আহমদের সূত্র ধরে ইসলাম ও ইসলামী দর্শন সম্পর্কে নানান অপব্যাখ্যার সূত্রপাত ঘটান। ইসলাম ও ইসলামের সর্বজনবিদিত পরিভাষাসমূহের স্বকপোল কল্পিত

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭ ও الموسوعة الميسرة في الإديان المذاهب والأحزاب المعاصر, ৪৯ পৃষ্ঠা

অর্থ প্রকাশ করে গোটা ইসলামের বিকৃতি সাধনের অপপ্রয়াস পান। তিনি "তায্কিয়া" নামে পবিত্র কুরআনে কারীমের একখানা মনগড়া তাফ্সীর গ্রন্থ রচনা করেন। এই কথিত তাফ্সীর গ্রন্থেই তিনি তার সকল ভ্রান্ত অভিমতসমূহ পেশ করেন। তিনি "খাকছার পার্টি" নামে একটা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তার সমর্থকরা এই পার্টির পতাকা তলে ইসলাম বিকৃতির তৎপরতা চালিয়ে যান। ইংরেজদের সমর্থন করাও ছিল তার এই পার্টির অন্যতম একটা কাজ।

"খাকছার পার্টি"-র কতিপয় বিভ্রান্তি

১. "মুসলিম" শব্দের অর্থ প্রচলিত মুসলমান নয়, বরং মুসলিম শব্দের অর্থ হল দুনিয়ায় আল্লাহ্র নিয়ামত ভোগকারী। অতএব এই অর্থ অনুসারে ইয়াহুদী খৃষ্টান সকলকেই মুসলিম হিসাবে গণ্য করা যাবে।

২. তিনি আরো বলেন, কুরআনে বর্ণিত আসহাবুল জান্নাত ও আসহাবুন্নারীমের অর্থ হল ইয়াহুদী ও খৃষ্টান শ্রেণী।

৩. পক্ষান্তরে আসহাবুন্নার ও আসহাবুল জাহীমের অর্থ হল মুসলমানগণ। কেননা অন্য আয়াতে পৃথিবীর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকারীদেরকে নেক্কার বান্দা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর বর্তমান বিশ্বের আধিপত্য যেহেতু ইয়াহুদী খৃষ্টানদেরই হাতে, অতএব কুরআনের ঘোষণামতে তারাই নেককার এবং তারাই জান্নাতের অধিকারী।

*****

এখান থেকে মুনকিরীনে হাদীছ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তাদের সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে হাদীছ হুজ্জাত হওয়া সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন। সেমতে মুনকিরীনে হাদীছ মৌলিকভাবে কত প্রকার এবং হাদীছ হুজ্জাত হওয়া সম্পর্কিত দলীল কি তা বিশদভাবে আলোচনা করা হল।

মুনকিরীনে হাদীছ তথা হাদীছ অস্বীকারকারীদের ফিতনা এবং হাদীছ হুজ্জাত বা দলীল হওয়া প্রসঙ্গ

হাদীছ কুরআনে কারীমের পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস- এ ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত্য ছিল এবং রয়েছে। প্রায় প্রথম শতাব্দি পর্যন্ত হাদীছের মধ্যে কোনরূপ শ্রেণীভেদ ছাড়াই সব রকম সহীহ হাদীছকে হুজ্জাত বা দলীল হিসাবে গ্রহণ করে আসা হচ্ছিল। তার পর কালামবাদী মুতাযিলাদের আবির্ভাব হল। তাদের দেমাগে যুক্তি-বুদ্ধির প্রাধান্য ছিল। তারা হাশর-নাশর, সিরাত, মীযান, জান্নাত, জাহান্নাম, আল্লাহ্র দীদার ইত্যাদি সম্পর্কিত হাদীছসমূহকে গ্রহণযোগ্য মনে করল না। বরং তারা তাদের মেজাযগত ফ্যাসাদের কারণে মুতাওয়াতির ব্যতীত অন্য সবপ্রকার হাদীছকে স্বমূলে অস্বীকার করে বসল। এক বর্ণনামতে তারা খবরে ওয়াহেদ (خبر واحد)কে অস্বীকার করত। হাফিজ ইব্নে কায়্যিম বলেন, এর পূর্ব পর্যন্ত আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত-সহ খাওয়ারিজ, শীআ, কাদ্রিয়া প্রমুখ সমস্ত ফিরকা ছিকা (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারী-

দের দ্বারা বর্ণিত যাবতীয় হাদীছকে ঐকমত্যে হুজ্জাত বা দলীল মনে করে আসছিল। সর্বপ্রথম মুতাযিলারাই এই ঐক্যমত্যের বিপরীত ভিন্ন মত গ্রহণ করল। ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহ্মদ, ইমাম গাযালী, ইব্নে হায্ম, ইব্নে কায়্যিম প্রমুখ মনীষী হাদীছ অস্বীকার করার এই ফিতনার বিরুদ্ধে কলম ধরেন।

এরপর বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যখন মুসলমানদের ওপর পাশ্চাত্য জাতিসমূহের রাজনৈতিক মতবাদের প্রভাব বেড়েছে, তখন স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানদের এরূপ একটা শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে যারা পাশ্চাত্যের চিন্তা-গবেষণা দ্বারা সীমাহীন প্রভাবিত ছিল। তারা মনে করত পৃথিবীতে পাশ্চাত্যের অনুসরণ ব্যতীত উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরনে ইসলাম একটা বড় বাধা। তাই তারা ইসলামে বিকৃতির ধারা আরম্ভ করে। যাতে এটাকে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা মোতাবেক তৈরি করে নেয়া যায়। এই শ্রেণীটাকে বলা হয় আহলে তাজাদ্দুদ বা আধুনিকতাবাদী। হিন্দুস্তানে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, মিসরে তাহা হোসাইন, তুর্কীতে জিয়া গোগ আলফ এই শ্রেণীর পথ প্রদর্শক। এই শ্রেণীর উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জিত হতে পারেনি যতক্ষণ পর্যন্ত হাদীছকে পথ থেকে না সরানো গিয়েছে। কারণ, হাদীছসমূহে জীবনের প্রতিটি শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট এরূপ বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা রয়েছে, যেগুলো পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে সুস্পষ্টরূপে সাংঘর্ষিক। এ কারণে এ শ্রেণীর কেউ কেউ হাদীছকে প্রমাণ মানতে অস্বীকার করেছেন। হিন্দুস্তানে সর্বপ্রথম এই আওয়াজ বুলন্দ করেছেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং তার বন্ধু মৌলভী চেরাগ আলী। কিন্তু তারা হাদীছ অস্বীকারের মতবাদকে প্রকাশ্যে ও সুস্পষ্ট ভাষায় পেশ করার পরিবর্তে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন যে, যেখানে কোন হাদীছ নিজের দাবী পরিপন্থী বলে পরিলক্ষিত হয়েছে সেখানে তারা তার বিশুদ্ধতাকে অস্বীকার করেছেন, চাই সূত্র যতই শক্তিশালী হোক না কেন। কোথাও কোথাও প্রকাশ করা হত যে, এ হাদীছগুলো বর্তমান যুগে প্রমাণ হওয়া উচিত নয়। কোন কোন স্থানে মতলব উদ্ধারে সহায়ক ও উপকারী হাদীছগুলো দ্বারা প্রমাণ পেশ করাও হত। এর মাধ্যমেই বাণিজ্যিক সূদকে হালাল করা হয়েছে, মু'জিযাসমূহকে অস্বীকার করা হয়েছে, পর্দাকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং বহু পাশ্চাত্য মতবাদকে বৈধতার সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে।

তাদের পর হাদীছ অস্বীকারের মতবাদে আরও উন্নতি হয়, এবং এই মতবাদ কিছুটা সাংগঠনিকভাবে আব্দুল্লাহ চকড়ালভীর নেতৃত্বে অগ্রসর হয়। তিনি ছিলেন একটা ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নিজেকে "আহ্লে কুরআন" বলতেন। তার উদ্দেশ্য ছিল হাদীছকে পুরোপুরি অস্বীকার করা। এরপর আসলাম জয়রাজপুরী আহলে কুরআন থেকে সরে এই মতবাদকে আরও সামনে এগিয়ে নেন। এমনকি গোলাম আহমদ পারভেজ এই ফিতনার নেতৃত্ব হাতে নেন এবং এটাকে একটা সুশৃংখল মতবাদ ও চিন্তাধারা কেন্দ্রের রূপ দেন। যুবকদের জন্য তার লেখায় বিরাট আকর্ষণ ছিল। এজন্য তার যুগে এই ফিতনা সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে। নিম্নে হাদীছ অস্বীকার করার এই ফিতনার মৌলিক মতবাদের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হল।

হাদীছ অস্বীকারকারীদের চারটা মতবাদ

হাদীছ অস্বীকারকারীদের পক্ষ থেকে যেসব মতবাদ এখন পর্যন্ত সামনে এসেছে সেগুলো চার প্রকার। যথা:-

১। রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দায়িত্ব ছিল শুধু কুরআন পৌছানো। আনুগত্য ওয়াজিব শুধু কুরআনের। রসূল হিসাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য না সাহাবায়ে কেরামের উপর ওয়াজিব ছিল না আমাদের উপর ওয়াজিব। এবং ওহী শুধু মাতলূ' (প্রত্যক্ষ ওহী অর্থাৎ, কুরআন)। ওহীয়ে গায়রে মাতলূ' (অপ্রত্যক্ষ ওহী অর্থাৎ, হাদীছ) বলতে কোন জিনিস নেই। তাছাড়া কুরআনে কারীম বোঝার জন্য হাদীছের প্রয়োজন নেই।

২। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীছসমূহ সাহাবীদের জন্য তো প্রমাণ ছিল কিন্তু আমাদের জন্য তা প্রমাণ নয়।

৩। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীছসমূহ সমস্ত মানুষের জন্য হুজ্জাত বা প্রমাণ। কিন্তু হাদীছগুলো আমাদের নিকট নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌছেনি। এজন্য আমাদের উপর এগুলো মানার দায়িত্ব বর্তায় না।

৪। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীছ হুজ্জাত। কিন্তু খবরে ওয়াহেদ জন্নী (ظنى) বা ধারণামূলক (নিশ্চিত অর্থবোধক নয়) বিধায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদীছ অস্বীকারীরা যে কোন শ্রেণী বা দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক তাদের প্রতিটা লেখা এই চারটা মতবাদ থেকে কোন একটার মুখপত্র হিসাবে কাজ করে। এজন্য আমরা তাদের পরস্পর বিরোধী সাংঘর্ষিক এই মতবাদগুলোর প্রত্যেকটার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করছি।

প্রথম মতবাদ খণ্ডন
তথা হাদীছ হুজ্জাত বা দলীল হওয়ার প্রমাণ

১। وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا.

অর্থাৎ, মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে।

(সূরা শূরা: ৫১)

এ আয়াতে রসূল প্রেরণ ছাড়াও "ওহীর মাধ্যম" বলে ওহীর একটি স্বতন্ত্র প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। এটিই হল ওহীয়ে গায়রে মাতলূ'।

২। কুরআনে কারীমে আছে-

وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ.

অর্থাৎ, তুমি এ যাবৎ যে কিবলার অনুসরণ করে আসছিলে, সেটিকে এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, যাতে জানতে পারি কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে অনুসরণ না করে। (সূরা বাকারা: ১৪৩)

এতে القبلة التى كنت عليها "যে কিবলার অনুসরণ করে আসছিলেন" দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে বোঝানো হয়েছে। এর দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশকে সৃষ্টিকর্তা جعلنا "আমি করেছিলাম" শব্দ দ্বারা নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। অথচ পুরো কুরআনের কোথাও বায়তুল্লাহর দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ নেই। অবশ্যই এ হুকুম ছিল ওহীয়ে গায়রে মাতলূর মাধ্যমে। এটাকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিলেন যে, ওহীয়ে গায়রে মাতলূর হুকুমও পালন করা সেরূপ ওয়াজিব যেরূপ ওহীয়ে মাতলূর হুকুম।

৩। عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ. (আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি খেয়ানত বা অবিচার করছিলে। (সূরা বাকারা: ১৮৭) এ আয়াতে রমযানের রাতে স্ত্রী সহবাসকে খেয়ানত আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। কুরআনে কারীমের এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, এর পূর্বে সহবাস হারামের নির্দেশ এসেছিল। তাই সে হুকুমের বিরোধিতা ছিল খেয়ানত। অথচ এই হুকুম কুরআনে কারীমের কোথাও উল্লেখ নেই। অবশ্যই এই নির্দেশ ছিল ওহীয়ে গায়রে মাতলূর মাধ্যমে।

৪। وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّ اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ..... الى قوله تعالى : وَ مَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ.

অর্থাৎ, বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে, আল্লাহ তো তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ... এটাকে কেবল তোমাদের জন্য সুসংবাদ ও তোমাদের চিত্ত-প্রশান্তির নিমিত্তে আল্লাহ করেছেন। (সূরা আলে-ইমরান: ১২৩-১২৬) এ আয়াতটি ওহুদের যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে আল্লাহ ত'আলা বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা অবতরণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অবশ্য এই ভবিষ্যদ্বাণী কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। স্পষ্ট বিষয়- এটা ছিল ওহীয়ে গায়রে মাতলূর মাধ্যমে।

৫। وَ اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ

অর্থাৎ, স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের এক দল তোমাদের আয়ত্বাধীন হবে। (সূরা আনফাল: ৭) এতেও যে প্রতিশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে তা দেয়া হয়েছিল ওহীয়ে গায়রে মাতলূর মাধ্যমে। কুরআনে কারীমের কোথাও এর উল্লেখ নেই।

৬। سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা গৃহে রয়ে গিয়েছিল, তারা বলবে, আমাদেরকে তোমাদের সংগে যেতে দাও। তারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায়। (সূরা ফাত্হ: ১৫)

এ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, মুনাফিকদের খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বেই আল্লাহ তাআলা করেছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীও ওহীয়ে গায়রে মাতলূর মাধ্যমে ছিল। কারণ, কুরআনে কারীমের কোথাও এর উল্লেখ নেই।

৭। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মানসাবে নবুওয়াতের দায়িত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে-

وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ.

অর্থাৎ, আর তিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন। (সূরা বাকারা: ১২৯) তাছাড়া ইরশাদ রয়েছে -

وَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ.

অর্থাৎ, তোমার নিকট আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন মানুষদের সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা নাহ্‌ল: ৪৪)

এসব আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তাঁর মানসাব একজন ডাক পিয়নের ন্যায় নাউযুবিল্লাহ শুধু পয়গাম পৌঁছে দেয়াই ছিল না; বরং কিতাব ও হিকমত শেখানো এবং এর বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা প্রদানও তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইরশাদগুলো প্রমাণ না হত, তাহলে আল্লাহ্‌র কিতাবের বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যার জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলার প্রয়োজন হত না? তাহলে কিতাব ও হিকমতের বিশদ বিবরণ কীভাবে হতে পারে?

৮। কুরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে وَاَطِيْعُوا اللهَ (আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর)-এর সাথে সাথে اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ (রসূলের আনুগত্য কর) কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে। যা স্পষ্টরূপে হাদীছ হুজ্জাত বা প্রমাণ হওয়াকে বোঝায়।

এ সম্পর্কে হাদীছ অস্বীকারকারীরা বলে থাকেন যে, এই আনুগত্য শরীআতের প্রমাণ হিসাবে নয়, বরং মিল্লাতের কেন্দ্র ও শাসক হিসাবে। অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীগুলো একজন শাসকরূপে তৎকালীন লোকদের উপর মান্য করা ওয়াজিব ছিল। তার পর যারাই শাসক হবে তাদের আনুগত্য করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নয়। এর দুটো উত্তর। যথা:-

(১) শাসকের আনুগত্যের আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে পরবর্তীতে করা হয়েছে। অর্থাৎ, اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ। অতএব, রসূলের আনুগত্য ও শাসকদের আনুগত্য দুটো স্বতন্ত্র বিষয়।

(২) এখানে اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি যে, যখন কোন اسم مشتق। তথা ক্রিয়াজাত বিশেষ্যের উপর কোন হুকুম লাগানো হয়, তখন ক্রিয়ামূল এই হুকুমের কারণ হয়ে থাকে। যেমন: اَكْرِمِ الْعَالِمَ বাক্যে আলিমকে সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশের কারণ হল ইল্‌ম। এরূপভাবে اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ বাক্যে আনুগত্যের কারণ হল রিসালত, শাসকত্ব নয়।

৯। فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা কখনো খাঁটি ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার ওপর অর্পন না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়। (সূরা নিসা: ৬৫)

এ আয়াতে স্পষ্টত বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহের আনুগত্য শুধু ওয়াজিব নয়; বরং তার উপর ঈমান নির্ভরশীল।

১০। পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে এরূপ অনেকেই ছিলেন যাঁদের উপর কোনো কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। যদি তাঁদের বাণীসমূহের উপর আমল ওয়াজিব না হয়ে থাকে, তাহলে তাঁদেরকে প্রেরণ করা হল কেন?

হাদীছ হুজ্জাত হওয়ার কয়েকটি যৌক্তিক প্রমাণ (عقلى دلائل)

১। কুরআনে কারীমে জীবনের প্রতিটি শাখা সম্পর্কে যেসব দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সেগুলো তো সাধারণত মৌলিক বিধি-বিধান সম্বলিত। এসব বিধি-বিধানের বিস্তারিত বিবরণ, এগুলোর উপর আমলের পদ্ধতি বর্ণনা করেছে হাদীছ। নামায পড়ার পদ্ধতি, এর ওয়াক্ত, রাকআতের সংখ্যা নির্ধারণ- এসবের কিছুই কুরআনে নেই, রয়েছে হাদীছে। যদি হাদীছ প্রমাণ না হয়, তাহলে اقيموا الصلوة (তোমরা সালাত অর্থাৎ, নামায কায়েম কর)-এর ওপর আমলের পদ্ধতি কী হবে? যদি কেউ বলে যে, সালাত শব্দের অর্থ আরবী অভিধানের আলোকে تحريك الصلوين বা দুই নিতম্ব দোলানো (নৃত্য করা)। অতএব, اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ-এর অর্থ হল নৃত্যের আসর কায়েম করা। তাহলে আপনার কাছে এর কী উত্তর?

২। আরবের পৌত্তলিকদের কামনা ছিল, আল্লাহ্‌র কিতাব যেন রসূলের মাধ্যমে প্রেরণের স্থলে সরাসরি তাদের উপর অবতীর্ণ হয়। তারা দাবি করত যদি আসমান থেকে কাগজে লিখিত অবস্থায় তাদের নিটক কিতাব আসত, তাহলে তাদের কোনো সন্দেহ থাকত না। এমতাবস্থায় মু'জিযাও বেশি প্রকাশ পেত এবং মুশরিকদের ঈমান আনয়নের আশাও অধিক হত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। বরং রসূলের মাধ্যমে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর তাদের দাবির ব্যাপারে বলেছেন,

وَ لَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ.

অর্থাৎ, যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম, অতঃপর তারা তা স্বহস্তে স্পর্শ করত, তবুও অবিশ্বাসীরা একথাই বলত যে, এটা প্রকাশ্য যাদু বৈ কিছু নয়। (সূরা আনআম: ৭)

প্রশ্ন হল, যদি হাদীছসমূহ প্রমাণ না হয়, তাহলে রসূল প্রেরণের উপরই কেন জোর দেয়া হল? মূলত রসূল এজন্য পাঠানো হয়েছে যে, শুধু কিতাব কোন জাতির সংশোধনের জন্য কখনও যথেষ্ট হতে পারে না, যতক্ষণ না এরূপ শিক্ষক হবেন যিনি এর অর্থ নির্ধারণ করবেন, স্বয়ং এর কার্যত আদর্শ হয়ে আসবেন। আর এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিটি বাণী ও কর্মের অনুসরণ ওয়াজিব না হয়।

৩। সমস্ত উম্মত হাদীছগুলোকে প্রমাণ মেনে আসছে। যদি গোটা উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে এবং ১৪০০ বছর পর্যন্ত পারভেজ সাহেব ব্যতীত ইসলাম অনুধাবনকারী কেউ সৃষ্টি না হয়ে থাকে তাহলে চিন্তা করা উচিত যে, সেই দ্বীন কী অনুসরণযোগ্য হতে পারে যা চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত কোন একজন আদম সন্তানও বুঝতে পারেনি।

হাদীছ অস্বীকারকারীদের প্রমাণাদি ও তার খণ্ডন

১। হাদীছ অস্বীকারকারীরা সর্বপ্রথম তাদের দলীলে এ আয়াত পেশ করেন-

١. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ.

অর্থাৎ, কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, কেউ আছে উপদেশ গ্রহণ করার? (সূরা: ৫৪-কামার: ১৭)

তাদের বক্তব্য হল, এ আয়াতের আলোকে কুরআন একেবারেই সহজ। অতএব, তা অনুধাবন এবং তার উপর আমল করার জন্য হাদীছের মাধ্যমে কোন তা'লীম বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

খণ্ডন

(১) কুরআনে কারীমের বিষয়াবলী দুই প্রকার। (এক) কিছু বিষয় এরূপ রয়েছে যেগুলোর উদ্দেশ্য আল্লাহর ভয়, পরকালের ফিকির, আল্লাহর দিকে রুজূ' পয়দা করা এবং সাধারণ উপদেশের বিষয়। (দুই) আর কিছু বিষয় আছে এরূপ, যেগুলোতে আহকাম তথা বিধি-বিধান এবং এগুলোর মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ আয়াতটি প্রথম প্রকার বিষয়াবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট, দ্বিতীয় প্রকার বিষয়াবলীর সাথে নয়। যার প্রমাণ হল, يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ-এর সাথে لِلذِّكْرِ শর্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। যদি বিধি-বিধান উদঘাটন করাও সহজ হত, তাহলে এই শর্ত যোগ করা হত না। তাছাড়া সামনে فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (কেউ আছে উপদেশ গ্রহণ করার?) বলা হয়েছে। هَلْ مِنْ مُّسْتَنْبِطٍ (কেউ আছে গবেষণা পূর্বক বিধান বের করার?) অথবা هَلْ مِنْ مُّجْتَهِدٍ (কেউ আছে ইজতিহাদ করার?)–এ রকম বলা হয়নি।

(২) কুরআনে কারীমের কয়েকটি আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, এই কিতাব রসূল ছাড়া বুঝে আসতে পারে না। যেমন:

١. وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ.

অর্থাৎ, তোমার নিকট আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন মানুষদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। (সূরা: ১৬-নাহ্ল: ৪৪)

২। হাদীছ অস্বীকারকারীরা বলেন, কুরআনে কারীম বিভিন্ন স্থানে স্বীয় আয়াতগুলোকে বায়্যিনাত (স্পষ্ট প্রমাণ) বলে অভিহিত করেছে। এর দ্বারাও বুঝা যায় যে, কুরআন স্বয়ং স্পষ্ট। এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

খণ্ডন

কুরআনে যে আয়াতগুলোকে বায়্যিনাত বা সুস্পষ্ট বলে অভিহিত করা হয়েছে সেগুলো মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাতের প্রমাণাদি এত স্পষ্ট যে, সামান্য মনোযোগ দিলেই তা অন্তরে বসে যায়। খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদী আকীদার মত কোন হেয়ালি বিষয় নয় যে, গোটা বিশ্ব মিলেও তা অনুধাবন করতে পারে না। অতএব এটা আবশ্যক হয় না যে, আহকাম বা বিধি-বিধানের ব্যাপারেও কুরআন এতই সুস্পষ্ট যে, সেগুলোর ব্যাখ্যার জন্য কোন রসূলের প্রয়োজন নেই।

৩। হাদীছ অস্বীকারকারীদের আর একটি দলীল হল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত–

١. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَيَّ. الآية

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। (সূরা: ১৮-কাহ্ফ: ১১০)

হাদীছ অস্বীকারকারীগণ বলেন যে, এ আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অন্যান্য মানুষের ন্যায় মানুষ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ ওহীয়ে মাতলূর তো অনুসরণ করা ওয়াজিব; কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীগুলোর উপর আমল করা আবশ্যক নয়।

খণ্ডন

(১) বস্তুত এ প্রমাণ পেশ করা হয়েছে আয়াতটিকে পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে। আসলে এ আয়াতটি সেসব পৌত্তলিকের উত্তরে এসেছিল যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট মু'জিযা দাবী করে আসছিল। তার উত্তরে বলা হয়েছে, আমি তোমাদের মত মানুষ, এজন্য স্বীয় মর্জি মোতাবেক অলৌকিক বিষয় প্রদর্শনে সক্ষম নই, যতক্ষণ না আল্লাহ ইচ্ছা করবেন। এতে বুঝা গেল, مثلكم শব্দের উপমা দেয়া হয়েছে শুধু আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত অলৌকিক বিষয় প্রদর্শনের ক্ষমতা না থাকার ব্যাপারে, সব ব্যাপারে নয়।

(২) এ আয়াতেই অন্য মানুষের সাথে তার পার্থক্যের কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে ওহীকে। আর "ওহী" কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে শর্তবন্ধনহীনভাবে (مطلقا) যা ওহীয়ে মাতলূ' গায়রে মাতলূ' উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর বাণীর উপর আমল করা ওয়াজিব নয়- এ মর্মে এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করার অবকাশ নেই।

৪। হাদীছ অস্বীকারকারীরা সেসব ঘটনা দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেন, যেগুলোতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি কোন কাজের ফলে কুরআনে কারীমে ভর্ৎসনা অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন, বদরের যুদ্ধের সময় কয়েদীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে কুরআনে কারীমে ভর্ৎসনা অবতীর্ণ হয়েছে।

হাদীছ অস্বীকারকারীদের বক্তব্য হল, এ ঘটনায় কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সিদ্ধান্ত আল্লাহ্র সন্তোষ অনুযায়ী ছিল না। অতএব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উক্তি ও কর্মকে ব্যাপকভাবে প্রমাণ বলা যাবে না।

খণ্ডন

এসব ঘটনাতে নিঃসন্দেহে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইজতিহাদী বিচ্যুতি হয়েছিল, যার ফলে ওহীর মাধ্যমে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যদি গভীরভাবে দেখা হয় তাহলে এ ঘটনাই হাদীছের প্রামাণিকতা প্রমাণ করে। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন এই ইজতিহাদী ভুলের উপর সতর্ক করেনি ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত সাহাবী এই হুকুমের ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ করেছেন। আর যখন কুরআনের সতর্কবাণী অবতীর্ণ হয়েছে তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি তো প্রিয়জনসুলভ ভর্ৎসনা হয়েছে যে,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى. الأية

অর্থাৎ, দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা নবীর জন্য সংগত নয়। (সূরা: ৮-আনফাল: ৬৭)

কিন্তু সাহাবীদের উপর কোনো প্রকার ভর্ৎসনা হয়নি যে, এই ফয়সালাতে তাঁরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ কেন করলেন? এতে পরিষ্কার বুঝা যায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফয়সালার আনুগত্যই কাম্য ছিল।

৫। হাদীছ অস্বীকারকারীরা ঐসব ঘটনা দ্বারাও প্রমাণ পেশ করে, যাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার অনুসারীগণকে তা'বীরে নখল (খেজুর গাছের পরাগায়ন) থেকে নিষেধ করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম তা বর্জন করলে উৎপাদন হ্রাস পায়। এর ফলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أنتم أعلم بأمور دنياكم

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পার্থিব বিষয়ে আমার চেয়ে ভাল জান। (অর্থাৎ, এ ব্যাপারে আমার অনুসরণ করা তোমাদের উপর ওয়াজিব নয়।)

খণ্ডন

এর উত্তর হল, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহের দুটো দিক রয়েছে। যথা: (এক) সেসব বাণী যেগুলো তিনি রসূল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। (দুই) সেসব বাণী যেগুলো তিনি ব্যক্তিগত পরামর্শরূপে দান করেছিলেন। أنتم أعلم بأمور

دنياكم -এর সম্পর্ক দ্বিতীয় প্রকার বাণীর সঙ্গে। আর আলোচ্য বিষয় হল প্রথম প্রকার বাণী। অতএব, হাদীছ অস্বীকারকারীদের এই প্রমাণ ঠিক নয়।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, কোন্ বাণীটি কোন্ শ্রেণীর বা কোন্ প্রকারের সেটা জানা আমাদের জন্য কঠিন। অতএব, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উক্তি ও কর্মগুলোকে ব্যাপকরূপে প্রমাণ বলা যায় না।

এর উত্তর হল- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আসল দিক রসূল হওয়ার। অতএব, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিটি কথা ও কর্মকে এই শ্রেণীভুক্ত ধরে প্রমাণ সাব্যস্ত করা হবে। কোন স্থানে যদি কোন প্রমাণ বা নিদর্শন এরূপ কায়েম হয় যে, এ বাণীটি ব্যক্তিগত পরামর্শের মর্যাদা রাখে এবং বাস্তব ঘটনাও এই যে, পুরো হাদীছভাণ্ডারে ব্যক্তিগত পরামর্শের উদাহরণ হাতে গোণা কয়েকটি এবং এরূপ স্থানে স্পষ্ট ভাষায় বিবরণ রয়েছে যে, এই ইরশাদটি শরঈ হুকুম নয়; বরং ব্যক্তিগত পরামর্শ। এই হাতে গোণা কয়েকটি স্থান ছাড়া বাকি সব বাণী রসূল হিসাবে সম্পাদিত হয়েছে এবং সেগুলো সবই প্রমাণ।

দ্বিতীয় মতবাদ খণ্ডন

তথা সর্বযুগে হাদীছ দলীল-এ প্রসঙ্গ

এ মতবাদ অনুযায়ী হাদীছসমূহ সাহাবীদের জন্য প্রমাণ ছিল, কিন্তু আমাদের জন্য প্রমাণ নয়। এ মতবাদটা এতই স্বতঃসিদ্ধ ভ্রান্ত যে, এর খণ্ডনের জন্য বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নেই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রেসালাত সর্বযুগের জন্য। তিনি শুধু সাহাবীদের জন্যই রসূল ছিলেন না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রেসালাত ব্যাপক- এ সম্পর্কিত দলীলাদিই এ মতবাদ খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট। এরূপ অনেকগুলো দলীল প্রথম খণ্ডে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে কি আকীদা রাখতে হবে এ বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে পেশ করা হয়েছে।

তাছাড়া মৌলিক প্রশ্ন হল- কুরআন বোঝার জন্য রসূলের শিক্ষার প্রয়োজন আছে কি না? যদি না থাকে তাহলে রসূল কেন প্রেরিত হয়েছেন? আর যদি থাকে, তাহলে সাহাবীদের প্রয়োজন থাকলে আমাদের প্রয়োজন কেন থাকবে না? আমাদের প্রয়োজন তো আরও বেশি। সাহাবায়ে কেরাম স্বয়ং কুরআন অবতরণের বিষয় প্রত্যক্ষ করেছেন! অবতরণের কারণ ও পরিবেশ সম্পর্কে তাঁরা পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন, যা থেকে আমরা বঞ্চিত।

তৃতীয় মতবাদ খণ্ডন

তথা হাদীছ সংরক্ষিত হওয়া প্রসঙ্গ

এ বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, হাদীছসমূহ প্রমাণ ঠিকই কিন্তু আমাদের নিকট তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌঁছেনি বলে আমাদের উপর তা মান্য করার কোন দায়-দায়িত্ব বর্তায় না। আমাদের নিকট হাদীছ নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌঁছেছে এ মর্মে নিম্নে কয়েকটি দলীল পেশ করা হল।

১। আমাদের নিকট কুরআন সেসব মাধ্যমেই পৌঁছেছে, যেসব মাধ্যমে হাদীছ পৌঁছেছে। এবার যদি এসব সূত্র অনির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে কুরআন মান্য করা থেকেও হাত গুটিয়ে নিতে হবে।

হাদীছ অস্বীকারকারীদের একটি ভ্রান্তি ও তার খণ্ডন

হাদীছ অস্বীকারকারীরা বলে থাকেন যে, কুরআনে কারীমের আয়াত–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ.

অর্থাৎ, আমি এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমি এর হেফাযতকারী। (সূরা হিজর: ৯)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং কুরআনের হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। হাদীছ সম্পর্কে এরূপ কোন দায়িত্ব নেয়া হয়নি।

খণ্ডন

(১) এর প্রথম উত্তর হল, উপরোক্ত আয়াতটিও আমাদের নিকট সেসব মাধ্যমেই পৌঁছেছে যেগুলো হাদীছ অস্বীকারকারীদের উক্তি অনুযায়ী অনির্ভরযোগ্য। এর কী প্রমাণ যে, এ আয়াতটি কেউ নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেনি। (নাউযু বিল্লাহ!)

(২) এতে কুরআনের হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে। আর কুরআন উসূলিয়্যীনের সর্বসম্মতিক্রমে শব্দ এবং অর্থের নাম। এজন্য এ আয়াতটি শুধু কুরআনের শব্দের নয়; বরং এর অর্থের সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করাও জ্ঞাপন করে। আর কুরআনের অর্থের শিক্ষা দেয়া হয়েছে হাদীছে। তদুপরি উক্ত আয়াতে বর্ণিত ذكر শব্দটি শরীআতের ব্যাপক জ্ঞান অর্থেও গ্রহণ করা যায়। তাহলে তার মধ্যে হাদীছ সংরক্ষণের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেমন এরূপ ব্যাপক অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে–

فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে।

(সূরা নাহল: ৪৩)

২। হদীছগুলো যেসব সূত্রে আমাদের নিকট পৌঁছেছে, সেসব সূত্র অনির্ভরযোগ্য হওয়ার ফতওয়া লাগিয়ে দেয়া অজ্ঞতার প্রমাণ। বস্তুত হাদীছের হেফাজতের যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তা এক কথায় অনুপম। যার বিস্তারিত বিবরণ হাদীছ হেফাজতের ইতিহাস দ্বারা জানা যেতে পারে।

৩। হাদীছের উপর আমল করা ওয়াজিব- এ কথা স্বীকার করে নিলে আপনা আপনি এ কথা স্বীকার করে নিতে হয় যে, হাদীছ কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। অন্যথায় বলতে হবে, আল্লাহ তাআলা হাদীছের উপর আমল করা তো ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু এর সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, যেন বান্দাদের উপর সাধ্যাতীত বিষয়ের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন। অথচ এ বিষয়টি কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতের পরিপন্থী।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত বিষয়ের দায়িত্ব অর্পন করেন না।

(সূরা বাকারা: ২৮৬)

চতুর্থ মতবাদ খণ্ডন

তথা খবরে ওয়াহেদ হুজ্জাত হওয়া প্রসঙ্গ

খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীছগুলোকে অস্বীকারকারীরা বলেন যে, মুহাদ্দিছীনে কেরামের স্পষ্ট বিবরণ অনুযায়ী খবরে ওয়াহেদগুলো সব যন্নী (ظنى) বা ধারণামূলক, ইয়াকীনী নয়। আর ধারণামূলক বিষয়ের অনুসরণ করা কুরআনে কারীমের স্পষ্ট বিবরণ অনুযায়ী নিষিদ্ধ। অতএব খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا

অর্থাৎ, তারা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে, সত্যের বিপরীতে অনুমানের কোনো মূল্য নেই। (সূরা: ৫৩-নাজম: ২৮)

খণ্ডন

তাদের এই উক্তি প্রতারণা বৈ কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে, যন (ظن) শব্দটি আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত। (১) অনুমান-আন্দাজ, (২) প্রবল ধারণা, (৩) প্রমাণ নির্ভর নিশ্চিত জ্ঞান।

কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে যন (ظن) শব্দটি ইয়াকীন বা নিশ্চিত বিশ্বাসের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১। اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ (অর্থাৎ, খুশূ'-এর অধিকারী তারা যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে। -সূরা বাকারা: ৪৬)

২। قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ (অর্থাৎ, যাদের প্রত্যয় ছিল যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে তারা বলল, ...। -সূরা বাকারা: ২৪৯)

৩। وَ ظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ (অর্থাৎ, দাউদ [আঃ] বুঝতে পারলেন যে, আমি তাঁকে পরীক্ষা করেছি। -সূরা সাদ: ২৪)

বস্তুত হাদীছগুলোকে যে ظنى বলা হয়, এটা আন্দাজ-অনুমানের অর্থে নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা আবার কোন কোন স্থানে নিশ্চিত বিশ্বাসের অর্থে। আর কুরআনে যে ধারণার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য অনুমান-আন্দাজ করা। অন্যথায় প্রবল ধারণাকে শরীআতের অগণিত মাসায়েলে প্রমাণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। বাস্তবতা হল, প্রবল ধারণাকে প্রমাণ সাব্যস্ত করা ব্যতীত মানুষ একদিনও বেঁচে থাকতে পারবে না। কারণ, গোটা বিশ্ব এই প্রবল ধারণার উপরই প্রতিষ্ঠিত। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেছেন, খবরে

ওয়াহেদগুলো (اخبار احاد) এই ধরনের যন বা ধারণাকে সৃষ্টি করে। অবশ্য কোন কোন খবরে ওয়াহেদ যেগুলো বিভিন্ন নিদর্শনাবলী (قرائن) দ্বারা সহায়তা ও শক্তিপ্রাপ্ত, সেগুলো প্রমাণনির্ভর নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দাও দেয়। যেমন সেসব হাদীছ, যেগুলো ধারা পরম্পরায় হাফিজ ও ইমামগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেয়।[১]

পারভেজী মতবাদ

"পারভেজী মতবাদ" বলে বোঝানো হচ্ছে পারভেজ গোলাম আহমদ চৌধুরী কর্তৃক কুরআন ও হাদীছ অস্বীকার করার মতবাদ। জেনারেল আইয়্যুব খানের আমলে তিনি তার প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা "তুলূয়ে ইসলাম" (طلوع اسلام)-এর মাধ্যমে তার চিন্তাধারা প্রচার করেছিলেন। তিনি কিছু পুস্তকও রচনা করেছিল। তার মতবাদ ও চিন্তাধারা প্রচার করার জন্য সারা দেশে "বাযমে তুলূয়ে ইসলাম" (بزم طلوع اسلام) নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পাকিস্তানের তৎকালীন উলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীছের দলীল সহকারে তার মতবাদ খণ্ডন করেন এবং এ মর্মে ফতওয়া প্রস্তুত করে দেশব্যাপী সর্বস্তরের উলামায়ে কেরাম থেকে তাতে দস্তখত গ্রহণ করা হয়। মক্কা মদীনার বিভিন্ন মাযহাবের উলামায়ে কেরামও এ ফতওয়ার সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করেন। এ ফতওয়ায় ব্যক্ত করা হয় যে, পারভেজ গোলাম আহমদ একজন মুল্হিদ ও যিন্দীক (কাফের) এবং তার চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে বহু সংখ্যক কুফ্রী আকীদা-বিশ্বাসও রয়েছে। মুফতী ওলী হাছান খান সাহেব (রহ.) এ ফতওয়ার উল্লেখসহ পারভেজ গোলাম আহমদের চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাসের বিবরণ এবং কুরআন-হাদীছের দলীল সহকারে তার খণ্ডন পেশ করে একটি পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকটির নাম "ফিতনায়ে ইনকারে হাদীছ" (فتنۂ انکار حدیث)। এতে পারভেজ গোলাম আহমদের রচিত কিতাব-পত্রের উদ্ধৃতি সহকারেই তার চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাসগুলো তুলে ধরা হয়েছে এবং কুরআন-হাদীছের দলীল সহকারে তার খণ্ডন পেশ করা হয়েছে। পারভেজ গোলাম আহমদের চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অবগতি এবং তার খণ্ডন জানার জন্য উক্ত পুস্তকটিই যথেষ্ট। নিম্নে উক্ত পুস্তক থেকে সংক্ষিপ্তাকারে এসম্পর্কিত বিবরণ তুলে ধরা হল।

পারভেজ গোলাম আহমদের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা

আল্লাহ ও রসূল সম্পর্কে পারভেজ গোলাম আহমদ

১. "আল্লাহ" ও "রসূল" বলতে বোঝায় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বা শাসকমণ্ডলী (central Authority)।

১. মুনকিরীনে হাদীছ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য السنة ومكانتها في ও ترجمان السنة, درس ترمذى, التشريع الإسلامي থেকে গৃহীত।

খণ্ডন

"আল্লাহ" ও "রসূল" শব্দদ্বয়ের এরূপ অর্থ না অভিধান স্বীকার করে না পরিভাষা। যারা কুরআন-হাদীছের কোন শব্দের এরূপ অর্থগত বিকৃতি সাধন করে, তাদেরকে বলা হয় মুলহিদ ও যিন্দীক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا.

অর্থাৎ, যারা আমার আয়াতসমূহে ইল্হাদ (বিকৃতি সাধন) করে, তারা আমার অগোচর নয়। (সূরা: ৪১-হা-মীম-সাজদা: ৪০)

২. আল্লাহর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ বলতে বোঝায় ঐসব উন্নত গুণাবলী যেগুলোকে মানুষ নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করতে চায়।

খণ্ডন

পৃথিবীর কোন ধর্মই এটা স্বীকার করবে না। এটা কুফ্রী আকীদা। কুরআনে আল্লাহ্র পরিচয়ে বলা হয়েছে, তিনি এমন এক সত্তা, যিনি আসমান জমিন ইত্যাদি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এ সবকিছু আল্লাহর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। ইরশাদ হয়েছে,

وَ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ.

অর্থাৎ, তিনি ঐ সত্তা যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা: ৬-আনআম: ৪৭)

وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ.

অর্থাৎ, যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর কে সৃষ্টি করেছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং নিয়ন্ত্রিত করেছে সূর্য ও চন্দ্র? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। তবুও কোথায় তারা ফিরে যায়? (সূরা: ২৯-আনকাবুত: ৬১)

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا وَ اللهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর ইবাদত করবে যা তোমার কোনো উপকার ও ক্ষতির মালিক নয় অথচ আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা: ৫-মায়িদা: ৭৬)

وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ.

অর্থাৎ, তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি অত্যন্ত দয়াময়, অতি দয়ালু। (সূরা: ২-বাকারা: ১৬৩)

৩. "আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য" বলতে বোঝায় কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীর আনুগত্য করা। আর "উলূল আম্‌র" (اولو الامر) অর্থ হল অধীনস্ত অফিসারগণ। কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে আল্লাহ ও রসূলের নিকট গমনের কুরআনী নির্দেশের অর্থ হল অধীনস্ত অফিসারদের সাথে বিরোধ না করে মীমাংসার জন্য কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীর কাছে রুজূ করা।[১]

১. এখানে নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুর দিকে ইংগিত করা হয়েছে,
اَطِيْعُوا اللهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَ الرَّسُوْلِ. الآية (সূরা: ৪-নিসা: ৫৯)

খণ্ডন

এটাও অর্থগত বিকৃতি, যা ইল্‌হাদ ও যান্দাকাহ। "আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য" অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হয়। কেন্দ্রীয় শাসনের অস্বীকারকারীকেও কি কাফের বলা হবে? ইরশাদ হয়েছে,

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং রসূলের। তবুও তারা ফিরে গেলে আল্লাহ এরূপ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৩২)

৪. "খতমে নবুওয়াত-এর অর্থ হল এখন মানুষকে তাদের যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা নিজেদেরই করতে হবে।" এ কথার মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াতের ব্যাপকতা ও খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে রেসালাতকেও অস্বীকার করা হয়েছে।

খণ্ডন

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াতের ব্যাপকতা ও খতমে নবুওয়াতের আকীদা কুরআন ও মুতাওয়াতির রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। এ আকীদা অস্বীকারকারী উম্মতের সর্বসম্মত মতানুসারে কাফের।

ঈমান সম্পর্কিত বিষয়ে পারভেজ গোলাম আহমদ

১. "আখেরাত" বলতে বোঝায় ভবিষ্যত।

২. "জান্নাত" ও "জাহান্নাম" কোন বাস্তব স্থানের নাম নয় বরং তা হল মানুষের ব্যক্তি সত্তাগত অবস্থা।

৩. "ফেরেশতা" দ্বারা উদ্দেশ্য হল আত্মিক চেতনা বা প্রাকৃতিক শক্তি। ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হল মানুষের সামনে এই শক্তিগুলোর নত থাকা চাই।

৪. "জিব্রাঈল" বলতে বোঝায় কোন কিছুর স্বরূপ বিকশিত হওয়া।[১]

খণ্ডন

আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, জিব্রাঈল সম্পর্কিত ধারণা জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। এসব ব্যাপারে কোন রূপ দলীল ছাড়া জাহিরী অর্থ থেকে সরে যাওয়া যায় না। এসব ব্যাপারে প্রসিদ্ধ জাহিরী অর্থ ভিন্ন অন্য কোন রূপ ব্যাখ্যা দাতাদেরকে মুলহিদ ও যিন্দীক বলা হয়। শরহে আকাইদ গ্রন্থে এ কথাই বলা হয়েছে,

النصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظاهرها مالم يصرف عنها دليل قطعي... العدول عنها أي من الظواهر إلى معان يدعيها أهل الباطن وهم الملاحدة لادعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها بل لها معان باطنية إلخ. (شرح العقائد)

১. "জিব্রাঈল"-এর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমাণ কুরআনেও বিধৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّه نَزَّلَه عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. الآية.

অর্থাৎ, কেউ জিব্রাঈলের শত্রু হলে সে জেনে রাখুক সেতো আল্লাহ্‌র নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌছে দিয়েছে। (সূরা : ২-বাকারা : ৯৭)

শামীতে বলা হয়েছে,

وكذالك نكفر من أنكر الجنة والنار نفسهما أو محلهما. (ود المحتار ج/٤)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জান্নাত জাহান্নামকে বা এতদুভয়ের স্থানকে অস্বীকার করবে, তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে।

মনে রাখতে হবে কুরআনের শব্দ যেমন সংরক্ষিত তেমনি তার অর্থও সংরক্ষিত। অতএব এমন খেয়ালখুশীমত অর্থ করার অবকাশ কোথায়? কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَه لَحٰفِظُوْنَ.

অর্থাৎ, আমি এই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তার হেফাযতকারী। (সূরা হিজ্‌র: ৯)

৫. "মে'রাজ" একটি স্বপ্নের ঘটনা কিংবা হিজরতের কাহিনী এবং "মসজিদে আকসা" দ্বারা উদ্দেশ্য মসজিদে নববী।

খণ্ডন

মে'রাজ সম্পর্কে জমহুরের আকীদা হল মে'রাজ স্বশরীরে হয়েছে। মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গমন কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী কাফের। আর পৃথিবী থেকে সপ্তম আসমানের উপর পর্যন্ত গমন মাশহুর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এটা অস্বীকারকারী হাফেজ ইব্‌নে কাছীরের নিম্নোক্ত বর্ণনামতে মুলহিদ ও যিন্দীক। তিনি বলেন,

والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم في النقظة بشخصه إلى السماء ثم إلى ما شاء الله من العلى. (شرح العقائد النسفية)

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মে'রাজ জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে আকাশের দিকে তারপর উর্দ্ধজগতে যতদূর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়েছে। (শরহে আকাইদ)

৬. ঈমান সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যে "তাকদীর"-এর আকীদা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পারস্যবাসী অগ্নিপূজারীদের অনুসরণে।

খণ্ডন

তাকদীরের আকীদা আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের একটি বুনিয়াদী আকীদা। এর অস্বীকারকারী গোমরাহ ও বিভ্রান্ত। অগ্নিপূজারীদের থেকে এ আকীদা গ্রহণের কিচ্ছা ডাহা অবাস্তব। তারা তো তাক্‌দীরকেই অবিশ্বাস করে। যেমন নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায়। হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. (رواه أبو داود في كتاب الفتن– باب في القدر)

অর্থাৎ, কাদরিয়া সম্প্রদায় এই উম্মতের মাজূসী তথা অগ্নিপূজারী। তারা অসুস্থ হলে তাদের শুশ্রূষা করতে যাবে না, তারা মরে গেলে তাদের জানাযায় যাবে না। (আবূ দাউদ)

৭. আদম (আ.)-এর কোন ব্যক্তি-অস্তিত্ব ছিল না। কুরআনে কারীমে যে আদমের উল্লেখ এসেছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য মানব জাতি (نوع انسانی)।

খণ্ডন

হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে এরূপ আকীদা রাখা কুফ্‌রী। শরহে আকাইদ গ্রন্থে আছে–

أول الأنبياء آدم، وآخرهم محمد عليه السلام. أما نبوة آدم عليه السلام فبالكتاب الدال على أنه قد أمر و نهى ... وكذا السنة والإجماع، فإنكار نبوته على ما نقل عن البعض يكون كفرا.

অর্থাৎ, সর্বপ্রথম নবী আদম আর সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আদম (আ.)-এর নবুওয়াত কুরআন দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি আদেশ-নিষেধ করতেন। এমনিভাবে হাদীছ এবং ইজ্‌মা দ্বারাও প্রমাণিত। তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করা কতিপয় মনীষীর মতে কুফ্‌রী।

৮. আদম ও হাওয়া থেকে মানব বংশের বিস্তার ঘটেনি; বরং ডারউইনের "বিবর্তনবাদ" মতবাদ অনুসারে মানব বংশের বিস্তার ঘটেছে।

খণ্ডন

নিঃসন্দেহে এটা কুফ্‌রী আকীদা। কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, আদম ও হাওয়া থেকে মানব বংশের বিস্তৃতি ঘটেছে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً.

অর্থাৎ, হে মানুষ তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি এক ব্যক্তি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সংগিনী সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা: ৪-নিসা: ১)

"বিবর্তনবাদ" সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন "ডারউইনের প্রাণীজগত সম্পর্কিত বিবর্তনবাদ" শিরোনামের আলোচনা।

৯. ছওয়াবের নিয়ত এবং আমল ওজন হওয়ার আকীদা রাখা হল আফিম বিশেষ। মুসলমানদেরকে সে আফিম পান করানো হয়েছে।

খণ্ডন

এ দুটো আকীদা সরাসরি কুরআন বিরোধী, কুফ্‌রী। যেমন কুরআনের কয়েকটি আয়াত–

(১) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ نِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُه فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُه فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ.

অর্থাৎ, সেদিনকার ওজন সত্য। সেমতে যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে, তারা সফলকাম। আর যাদের নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তারা এমন লোক যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে কারণ তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি অবিচার করত। (সূরা: ৭-আ'রাফ: ৮)

(২) وَ مَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِه مِنْهَا.

অর্থাৎ, আর যে পরকালের পুরস্কার কামনা করে তাকে দিলব তার কিছু পুরস্কার। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ১৪৫)

(৩) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ.

অর্থাৎ, কেউ ইহকালের পুরস্কার চাইলে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্‌র নিকট ইহকাল ও পরকালের পুরস্কার রয়েছে। (সূরা: ৪-নিসা: ১৩৪)

১০. "ঈছালে ছওয়াব"-এর আকীদা আমলের প্রতিদান পাওয়ার আকীদার পরিপন্থী।

খণ্ডন

ঈছালে ছওয়াবের আকীদা আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত আকীদা। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নিশ্চিতভাবে এ আকীদাকে প্রমাণ করে–

(১) وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا.

অর্থাৎ, তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের (মাতা-পিতার) প্রতি রহম কর যেমন তাঁরা বাল্যকালে আমাকে লালন-পালন করেছিল। (সূরা: ১৭-বানী ইসরাঈল: ২৪)

(২) وَ مَنْ حَوْلَه يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُوْنَ بِه وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا.

এবং যারা এর চতুর্দিকে আছে (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করতে থাকে, তাঁর প্রতি-ঈমান রাখে এবং মু'মিনদের জন্য ইসতিগফার করে। (সূরা: ৪০-মু'মিন: ৭)

১১. কুরআনে কারীম ব্যতীত রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে কোন মু'জিযা দেয়া হয়নি।

খণ্ডন

এটাও কুফ্‌রী আকীদা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দ্বারা চন্দ্র দিখণ্ডিত হওয়া, অল্প পানি অনেকের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাওয়া, পাথরের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করা ইত্যাদি বিষয়গুলো মুতাওয়াতির রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত ।

قال ابن أبى الشريف : فالقدر المشترك بينها هو ظهور الخارق على يديه متواتر بلاشك. (المسامرة)

কুরআন সম্পর্কে পারভেজ গোলাম আহমদ

১. মুহাম্মাদী শরীআত ছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগের জন্য, সর্বকালের জন্য নয়। তাঁর ওফাতের পর প্রত্যেক যুগে সেই আইন চলবে যা তখনকার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ, শাসকমণ্ডলী ও মজলিসে শুরা রচনা ও বিধিবদ্ধ করে নিবেন।

২. কুরআনের মীরাছ আইন, লেনদেন, সদ্‌কা খায়রাত সম্পর্কিত বিধি-বিধান ইত্যাদি ছিল অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য।

খণ্ডন

এখানে শরীআতকে রহিত বলা হয়েছে এবং কুরআনের শাশ্বত্ব ও খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে। এটা স্পষ্টত কুফ্‌রী। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শেষ নবী, তখন তার আনীত শরীআতও কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য শরীআত। পরবর্তী কোন নবীর আগমন ব্যতীত পূর্ববর্তী নবীর শরীআত মানসূখ বা রহিত হয় না।

হাদীছ সম্পর্কে পারভেজ গোলাম আহমদ

১. যে হাদীছ মুসলমানদের মাযহাব, তা অনারবদের কারসাজী এবং মিথ্যা।

২.কোনক্রমেই রসূলের এই অধিকার নেই যে, তিনি মানুষ থেকে নিজের আনুগত্য করাবেন। রসূলের পজিশন হল তিনি শুধু মানুষ পর্যন্ত আইন পৌঁছে দিবেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন তার আনুগত্য করা হত তিনি "কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধিকারী" এ হিসাবে। তার ইন্তেকালের পর তার আনুগত্যের হুকুম বহাল নেই। কেননা "আনুগত্য"-এর অর্থ হল কোন জীবিত ব্যক্তিকে মান্য করা।

খণ্ডন

এখানে হাদীছ হুজ্জাত হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। হাদীছকে অস্বীকার করা কুফ্‌রী। হাদীছকে অস্বীকার করা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাশ্বত আনুগত্যকে অস্বীকার করা।[১]

৩. পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে পারভেজ বলেন "আল্লাহ" ও "রসূল" বলতে বোঝায় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বা শাসকমণ্ডলী (central Authority)। আর "আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য" বলতে বোঝায় কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীর আনুগত্য করা। এর দ্বারাও পারভেজ সাহেব হাদীছ হুজ্জাত হওয়াকে অস্বীকার করেছেন।

খণ্ডন

এর খণ্ডন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। (দেখুন পৃ ৩৬৯)

ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদ সম্পর্কে পারভেজ গোলাম আহমদ

১. নামায হল পূজা, রোযা হল ব্রত, হজ্ব হল যাত্রা। আল্লাহ্‌র হুকুম হেতু এসব ইবাদত পালন করা হয়। নতুবা উপকারিতার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। যুক্তির সাথেও এর কোনো সম্পর্ক নেই।

১. হাদীছ হুজ্জাত হওয়া সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন ৩৫৯-৩৯০ পৃষ্ঠা।

খণ্ডন

এখানে নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি ইসলামের আরকান ও ইবাদত নিয়ে উপহাস করা হয়েছে। এগুলো নিয়ে উপহাস করা কুফ্‌রী। কেননা এগুলো অকাট্য দলীলাদি (قطعيات) দ্বারা প্রমাণিত, অতএব এগুলো নিয়ে উপহাস করা মূলত সেসব অকাট্য দলীলাদি নিয়েই উপহাস করা। কুরআনে কারীমে এরূপ লোকদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে,

اَبِاللهِ وَ اٰيٰتِه وَ رَسُوْلِه كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ.

অর্থাৎ, তবে কি তোমরা আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রসূলকে নিয়ে উপহাস কর? (সূরা: ৯-তাওবা: ৬৫)

২. নামায অগ্নিপূজারীদের থেকে গৃহীত। কুরআনে কারীম নামায পড়ার নির্দেশ দেয়নি; বরং নামায কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছে। আর নামায কায়েম করার অর্থ হল সমাজকে ঐ বুনিয়াদের উপর দাঁড় করানো মানব জাতির প্রতিপালন (ربّ العلمين)-এর ইমারত যে ভিত্তির উপরে দাঁড় হয়।

খণ্ডন

নামাযের ব্যাখ্যা কী হবে তা স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ আমল দ্বারা করে দেখিয়ে গেছেন এবং ইরশাদ করেছেন,

صلوا كما رأيتموني أُصلى. (رواه البخاري في كتاب الأذان. باب الأذان للمسافر)

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ সেভাবে নামায পড়। (বোখারী)

অতএব এরূপ জরূরিয়াতে দ্বীনের ব্যাপারে অন্য কোন রূপ ব্যাখ্যা দেয়া এটাকে অস্বীকার করার নামান্তর। আর জরূরিয়াতে দ্বীনকে অস্বীকার করা কুফ্‌রী।

وإن صفات الصلوة المذكورة المشهورة المنصوص عليها في القرآن وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه و سلم وشرح بذالك وأَبَانَ حدودَها وأوقاتها ... ولا يرتاب بذلك بعد المرتاب في ذالك المعلوم من الدين بالضرورة والمنكر لذالك بعد البحث عنه وصحبة المسلمين كافر بالاتفاق. (نسيم الرياض ج/٤)

অর্থাৎ, নামাযের উল্লেখিত অবস্থা যা প্রসিদ্ধ এবং যে ব্যাপারে কুরআনে স্পষ্ট ভাষ্য বিদ্যমান- সেটাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন ও সে ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন এবং তার সীমানা ও সময় নির্ধারিত করে দিয়ে গেছেন ... এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। এটা জরূরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। এটা জানার পরও কেউ তা অস্বীকার করলে মুসলমানদের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের। (নাছীমুর রিয়ায: ৪খ.)

৩. রসূলুল্লাহ্‌র যুগে নামাযের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়ার জন্য দুই ওয়াক্ত (ফজর এবং ইশা) নির্ধারিত ছিল।

খণ্ডন

এটাও ডাহা মিথ্যা কথা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়ই নির্ধারিত ছিল। নামায পাঁচ ওয়াক্ত হওয়া সম্পর্কিত রেওয়ায়েত মুতাওয়াতির পর্যায়ের। আর মুতাওয়াতিরকে অস্বীকার করা কুফ্‌রী।

قال السر خسي في أصوله بعد بيان تعريف المتواتر. نحو اعداد الركعات وأعداد الصلوة ومقادير الزكاة والديات وما أشبه ذالك. (المجلد الأول)

অর্থাৎ, সারাখ্‌সী তার اصول কিতাবে মুতাওয়াতির-এর সংজ্ঞা বর্ণনা করার পর বলেন, যেমন রাকআতসমূহের সংখ্যা, নামাযের সংখ্যা, যাকাত ও দিয়াতের পরিমাণ ইত্যাদি।

৪. কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ও শাসকমণ্ডলী নিজেদের যুগের কোন চাহিদা অনুসারে নামাযের কোন অংশ বিশেষে রদবদল করতে পারেন।

খণ্ডন

এ বক্তব্যটা তার আল্লাহ ও রসূল সম্পর্কে অপব্যাখ্যার ভিত্তিতে গঠিত। এ সম্পর্কে পূর্বে খণ্ডন পেশ করা হয়েছে। এরূপ বক্তব্য প্রদানকারী মুল্‌হিদ, যিন্দীক ও কাফের।

৫. "সদকায়ে ফিত্‌র" হল ডাক টিকিট। "রোযা"রূপ খামের উপর এই ডাক টিকিট লাগিয়ে ডাক বাক্সে ছেড়ে দেয়া হয়। যাতে রোযা প্রাপক পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

খণ্ডন

সদকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব। এ ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা অত্যন্ত স্পষ্ট। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সে শিক্ষা অনুযায়ী মুসলমানগণ আমল করে আসছেন। ইসলামের এরূপ কোন বিষয় নিয়ে এভাবে উপহাস করা কুফ্‌রী।

৬. "হজ্জ" কোন ইবাদত নয়। বরং মুসলিম বিশ্বের একটি জাতীয় কনফারেন্স।

খণ্ডন

হজ্জ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ইসলামের একটি রুকন। সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করাকে কুরআনে কারীমে কুফ্‌রী আখ্যায়িত করা হয়েছে। হজ্জ ইবাদত না হলে এরূপ করার কোন অর্থ ছিল না। ইরশাদ হয়েছে,

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ সব লোকদের উপর বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা কর্তব্য (ফরয) যারা সেখানে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। আর (কেউ হজ্জকে অস্বীকার করে) কুফ্‌রী করলে জেনে রাখুক আল্লাহ জগৎবাসীর মুখাপেক্ষী নন। (সূরা: ৩-আলি ইমরান: ৯৭)

৭. যাকাত বলতে বোঝায় ঐ ট্যাক্স, যা ইসলামী হুকুমত কর্তৃক মুসলমানদের উপর ধার্য করা হয়। এই ট্যাক্স-এর পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়। খোলাফায়ে রাশেদার যুগে তখনকার প্রয়োজন অনুসারে শতকরা আড়াইভাগ ধার্য করা সংগত বিবেচিত হয়ে

থাকলে সেটা তখনকার বিষয় ছিল। এখন ইসলামী হুকুমত যদি প্রয়োজন অনুসারে শতকরা বিশ ভাগ নির্ধারণ করতে চায়, তাহলে সেটাও যাকাতের শরীআতসম্মত পরিমাণ বলে স্বীকৃতি পাবে।

খণ্ডন

তার এ বক্তব্য নির্জলা মিথ্যা ও স্পষ্টতঃ কুফ্‌রী। যাকাত ইসলামের রুকন এবং গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কুরআনে কারীম বহু স্থানে তার নির্দেশ দিয়েছে এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সমস্ত পুংখানুপুংখ ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। কখন যাকাত ফরয হয়, কার উপর ফরয হয়, যাকাতের নিসাব কি– সব বিস্তারিত বলে গেছেন। খোলাফায়ে রাশেদা তদনুযায়ী আমল করেছেন। মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত এরূপ একটি বিষয়কে ট্যাক্স আখ্যায়িত করা এবং তার নির্ধারিত পরিমাণকে অস্বীকার করা ইলহাদ ও যিন্দীকদের কাজ।

৮. বর্তমান যুগে যাকাতের প্রশ্নই ওঠে না। একদিকে ট্যাক্স অন্যদিকে যাকাত। এটা হল কায়সার আর খোদার অনৈসলামিক বিচ্ছেদ টানা। যখন কুরআনী বিধান চূড়ান্ত আকারে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন যাকাতের নির্দেশ খতম হয়ে যাবে।

খণ্ডন

এটাও ইল্‌হাদ ও কুফ্‌রী কথা। যাকাতের হুকুম কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য। এটাকে অস্বীকার করা কুরআনের শাশ্বতকেই অস্বীকার করা।

আরও কয়েকটি বিধান সম্পর্কে পারভেজ গোলাম আহমদ

১. হজ্জের স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও "কুরবানী-এর নির্দেশ নেই। হজ্জের প্রাক্কালে কুরবানীর নির্দেশ দেয়া হয়েছে কনফারেন্সে আগত সদস্যদের "রেশন" প্রস্তুত করার জন্য। এ ভিন্ন কুরবানীর অন্য কোনো পজিশন নেই।

খণ্ডন

কুরবানীকে কুরআন শরীফে نسكى (আমার কুরবানী) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, যা স্পষ্টতই পারভেজ সাহেবের বক্তব্যকে খণ্ডন করছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জের বাইরে মদীনাতেও সর্বদা কুরবানী করেছেন এবং মুসলমানদের কুরবানী করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এটা খালেস দ্বীনী বিষয় এতে কোনো মতবিরোধ নেই। কুরবানী-র মৌলিকত্বকে অস্বীকার করা কুফ্‌রী। হাফেজ ইব্‌নে হাজার ও ইব্‌নে নুজায়ম একথা ব্যক্ত করে বলেছেন,

قال الحافظ فى فتح الباري : ولاخلاف في كونها من شرائع الدين. (ج/١٠)

وقال ابن نجيم في بحر الرائق : ويكفر بإنكار أصل الوتر والأضحية. (ج/٥)

২. মাত্র চারটা জিনিস হারাম। ১. মৃত জানোয়ার, ২. প্রবাহিত রক্ত, ৩. শূকরের মাংস এবং ৪. গায়রুল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পৃক্ত বস্তু। এ ভিন্ন হালাল-হারামের যে দীর্ঘ তালিকা রয়েছে তা মানুষের মনগড়া বিবরণ।

খণ্ডন

এটা স্পষ্টত কুফরী দাবী। এর দ্বারা অন্যান্য সমস্ত হারামকে হালাল আখ্যায়িত করা হয়ে যায়।

দ্বীন-ইসলামের শাশ্বত্ব ও সর্বদা হকপন্থী লোকের অস্তিত্ব থাকা প্রসঙ্গে পারভেজ সাহেবের আকীদা

১. "দ্বীন"-এর সবকিছুতে বিকৃতি সাধিত হয়েছে।

খণ্ডন

এটা স্পষ্টত কুফরী কথা। দ্বীন সর্বদা সংরক্ষিত থাকবে- এ ব্যাপারে কুরআনের স্পষ্ট ভাষ্য রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَه لَحٰفِظُوْنَ.

অর্থাৎ, আমি এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমি তার সংরক্ষণকারী। (সূরা: ১৫-হিজ্‌র: ৯)

২. কুরআনের আলোকে সমস্ত মুসলমান কাফের হয়ে গিয়েছে। সাম্প্রতিককালের ব্রহ্ম সমাজ-ই একমাত্র খাঁটি মুসলমান।

খণ্ডন

কোন মুসলমানকে কাফের বলা কুফ্‌রী। তদ্রূপ ব্রহ্ম সমাজীকে খাঁটি মুসলমান আখ্যায়িত করা তথা অমুসলিমকে মুসলিম আখ্যায়িত করাও কুফ্‌রী। এর দ্বারা ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করা হয়। অথচ কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থাৎ, কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম তালাশ করলে আদৌ তার থেকে তা কবূল করা হবে না এবং পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৮৫)

চকড়ালবী ফিরকা

(فرقۂ چکڑالوی)

পাঞ্জাবে চকড়ালবী ফিরকার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ (০০০-১৩৩৭ হি.) চকড়ালবী। সে লাহোরের বাসিন্দা ছিল। আব্দুল্লাহ চকড়ালবী-এর দিকে সম্পৃক্ত হয়েই "চকড়ালবী" নামে এই দলের পরিচিতি গড়ে উঠেছে। তারা নিজেদেরকে "আহ্‌লুয যিক্‌র" নামে আবার "আহ্‌লে কুরআন" নামেও পরিচয় দিয়ে থাকে। "আহ্‌লে কুরআন" (কুরআন অনুসারী) বলে নিজেদেরকে পরিচয় দেয়ার মাধ্যমেই তারা ব্যাক্ত করেছে যে, তারা হাদীছ অস্বীকারকারী (মুনকিরী-নে হাদীছ)দের অন্তর্ভুক্ত। স্বয়ং এই দলের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল্লাহ চকড়ালবী লিখিত برهان الفرقان على صلوة القران গ্রন্থে বর্ণিত এই দলের আকীদাসমূহ নিম্নরূপ:

১. কুরআন কর্তৃক শিখানো নামায পড়াই ফরয। এছাড়া অন্য কোনো রকমের নামায পড়া কুফ্‌র ও শির্‌ক। (উক্ত গ্রন্থ পৃ. ৫)

২. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রসূলের নিকট ওহীযোগে একমাত্র কুরআনই অবতীর্ণ হয়েছে। এ ব্যতীত শেষ নবী-এর উপর আর কোনো কিছু ওহী যোগে আদৌ অবতীর্ণ হয়নি। (উক্ত গ্রন্থ পৃ. ৯)

৩. আসমানী কিতাব ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর ভিত্তিতে কোন ধর্মীয় কাজ করা শির্‌ক ও কুফ্‌র। এরূপ কেউ করলে সে মুশরিক হয়ে যায়। (উক্ত গ্রন্থ পৃ. ১২)

৪. যারা বলে মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সালামুন আলাইহি) আল্লাহ্‌র কিতাবের বাইরেও বিধি- বিধান বলেছেন, তারা প্রকৃতপক্ষে খাতামুন্নাবী (সালামুন আলাইহি)কে গালি দেয়। (উক্ত গ্রন্থ পৃ. ১৫)

৫. আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও হুকুম মান্য করাও আমলকে নষ্ট করে দেয়া। এটা অনন্তকাল জাহান্নামের শাস্তি পাওয়ার কারণ। আফসূস সম্প্রতি অধিকাংশ লোকই এরূপ আমলগত শির্‌ক (شرك فى العمل) এ লিপ্ত। (উক্ত গ্রন্থ পৃ. ১৬)

৬. কিন্তু এই আমলগত শির্‌ক এমনভাবে মানুষের স্বভাব মজ্জায় মিশ্রিত হয়ে পড়েছে যে, এখন এটাকে তারা দ্বীনী বিষয় মনে করছে এবং এটা যে একটা গর্হিত কর্ম সেই বোধটুকুও জাগ্রত হচ্ছে না; বরং এটাকে যারা গর্হিত মনে করে তাদেরকে খারাপ বলে ভাবছে। তারা প্রকাশ্যে জোর গলায় বলছে এবং নিজেদের বক্তব্যের স্বপক্ষে কুরআন থেকে দলীলও পেশ করছে যে, আল্লাহর হুকুমের ন্যায় রসূলুল্লাহ (সালামুন আলাইহি) -এর হুকুম মান্য করাও ফরয। অনন্তর বিস্ময়ের পর বিস্ময় হল এমন মুশরিকসুলভ ধ্যান-ধারণাকে তারা পরম মূলনীতি বানিয়ে বসেছে। (উক্ত গ্রন্থ পৃ. ১৭)

৭. প্রকাশ থাকে যে, কুরআনের আয়াত– الرحمن علم القرآن এর বক্তব্য অনুযায়ী যা শিক্ষা দেয়ার আল্লাহ্‌ই কুরআনে কারীমেই শিক্ষা দিয়েছেন, অন্য কোন পদ্ধতিতে তিনি শিক্ষা দেননি। (উক্ত গ্রন্থ পৃ. ১৯)

৮. যে রসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কুরআন মাজীদেই আছে। واجب الاتباع অর্থাৎ, যার অনুসরণ ওয়াজিব, তা দুই জিনিস নয় বরং একই জিনিস। কুরআনে মাজীদ এবং মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সালামুন আলাইহি) নিঃসন্দেহে দুটো আলাদা আলাদা জিনিস, তবে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্যের হুকুম কুরআনে কোথাও দেয়া হয়নি। (উক্ত গ্রন্থ পৃ. ২১)

৯. আমি অন্তর থেকে মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহকে রসূল বলে জানি, তবে যেসব আয়াতের মধ্যে রসূলুল্লাহ-এর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে "রসূলুল্লাহ" বলে শুধু কুরআনে মাজীদকেই বোঝানো হয়েছে। (উক্ত গ্রন্থ পৃ. ২১)

১০. কিন্তু মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ শুধু তাঁর যুগের লোকদের কাছেই আবির্ভূত হয়েছিলেন, আজকালকার কোন লোকের কাছে তিনি আগমন করেননি। যদি কোন ব্যক্তির কাছে তাঁর আগমন ঘটে থাকে তিনি বলতে পারেন। কুরআনের আয়াত–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ.

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ দ্বারা মুহাম্মাদ ও তাঁর সত্তাকে বোঝানো হয়নি অন্যথায় অর্থ বিকৃত হয়ে যায়। তাই রসূলুল্লাহ দ্বারা কুরআনই উদ্দেশ্য। (উক্ত গ্রন্থ পৃ. ৩০)

১১. প্রকাশ থাকে যে, কুরআনের আয়াত–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ.

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৩১)

এখানে যে আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল যেভাবে আমি কুরআনের উপর আমল করি তোমরাও সেভাবে আমল কর। কোন মু'মিন বা রসূলের সব কাজ আনুগত্য করা ওয়াজিব - এমন অর্থ নয়। (উক্ত গ্রন্থ পৃ. ৪২)

১২. প্রকাশ থাকে যে, কুরআনের মধ্যে জুনুবী (جُنُبٌ)অর্থাৎ, যে ব্যক্তির উপর গোসল ওয়াজিব-এমন ব্যক্তিকে নামায পড়তেই নিষেধ করা হয়েছে ولاتقربوا الصلوة (অর্থাৎ, তোমরা নামাযের কাছেও যেও না) আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু কুরআনে মাজীদের কোথাও জুনুবী ব্যক্তি কুরআন মাজীদ স্পর্শ করতে পারবে না -এমন কথা বলা হয়নি। (উক্ত গ্রন্থ পৃ. ৫৮)

১৩. মেসওয়াকের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন– যদি মেনে নেয়া হয় যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ প্রসঙ্গে বলেছেনও কিন্তু সেটা ওহীয়ে খফী (وحی خفی) যোগে নয় বরং তিনি মানবীয় যুক্তি থেকে বলেছেন। (উক্ত গ্রন্থ পৃ. ৬০)

১৪. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ (সূরা: ৫-মায়িদা: ৬)

উপরোক্ত আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী নিঃসন্দেহে পা ধোয়া ফরয।[১] পায়ে মাসেহ করা জায়েয নয়, চাই পা খোলা থাকুক বা পায়ের উপর কোন পট্টি বা মোজা থাকুক। যে সমস্ত হাদীছে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সালামুন আলাইহি) মোজা বা পট্টির উপর মাসেহ করেছেন এবং অন্যদেরকে এরূপ করার অনুমতি দিয়েছেন সেসব হাদীছ বাতিল এবং রসূলুল্লাহ-এর উপর মিথ্যা বলার শামিল। (উক্ত গ্রন্থ পৃ. ৬৪)

১৫.কুরআন দ্বারা একথা আদৌ প্রমাণিত নয় যে, যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে, নাক দিয়ে রক্ত ঝরলে, আগুনে পাকানো কোন বস্তু আহার করলে কিংবা উটের গোশত ভক্ষণ করলে, কিংবা বমি করলে এসব দ্বারা উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। যে সমস্ত হাদীছে এ সমস্ত জিনিস দ্বারা উযূ ভঙ্গ হয়ে যায় বলে বলা হয়েছে সেগুলো বেহুদা এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (উক্ত গ্রন্থ পৃ. ৮২)

এছাড়াও চকড়ালবী ফিরকা-র আরও কিছু আকীদা দলীলসহ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, সব কিতাবই সমমর্যাদার। কারণ, যে সমস্ত বীজ আদি থেকেই বপণ করা হয়েছে অনন্তকাল পর্যন্ত সেটা

১. আয়াতের এক কেরাআত অনুসারে আয়াতের দ্বারাই মোজা পরিহিত অবস্থায় মাসেহ করা প্রমাণিত। তদুপরি মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা মাসেহের বিষয়টি প্রমাণিত।

থাকবে তাতে কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তদুপরি এ সমস্ত কিতাব একই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত। কাজেই সব কিতাব সমান মর্যাদার হবে। কুরআনে বলা হয়েছে, لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন নেই।

২. নবীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সব নবী একই স্তরের এবং একই মর্যাদার। আর নবুওয়াতের ধারা কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। দলীল কুরআনের আয়াত–

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ.

অর্থাৎ, আমরা তাঁর (আল্লাহ্র) রাসূলদের মাঝে কোনো পার্থক্য করি না। (সূরা: ২ বাকারা: ২৮৫)[১] আরেক আয়াত–

وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا.

অর্থাৎ, তুমি আদৌ আল্লাহ্র নীতিতে পরিবর্তন পাবে না। (সূরা: ৩৩-আহ্যাব: ৬২)

৩. নামাযের ওয়াক্ত মোট চারটা: তাহাজ্জুদ, ফজর, মাগরিব ও যোহর। তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত শুধু নফলের জন্য আর বাকি ওয়াক্তগুলো ফরযের জন্য। দলীল নিম্নোক্ত আয়াত।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ.

অর্থাৎ, তুমি নামায কায়েম কর সূর্য ঢলা থেকে নিয়ে রাত্র অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত। (সূরা: ১৭-বানী ইসরাঈল: ৭৮)

৪. কিবলা দুই দিক পূর্ব এবং পশ্চিম। তাহাজ্জুদ ও ফজরের কিবলা পূর্বদিকে এবং যোহর ও মাগরিবের কিবলা পশ্চিম দিকে। দলীল কুরআনের আয়াত–

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

অর্থাৎ, তিনি পুর্ব ও পশ্চিম দিকের প্রতিপালক। (সূরা শুআরা: ২৮)

মোটকথা– যখন সূর্য পূর্বদিকে থাকবে তখন কিবলা হবে পূর্ব দিকে, যেমন: তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাযে। আর যখন সূর্য পশ্চিম দিকে থাকবে তখন কিবলা হবে পশ্চিম দিকে, যেমন: যোহর ও মাগরিবের নামায।

৫. নামাযের তাকবীর আল্লাহু আকবার নয়; বরং নামাযের তাকবীর হল-বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। দলীল সুলাইমান (আ.)-এর ঘটনা, যা কুরআনে বলা হয়েছে, তাতে আল্লাহু আকবার বলা হয়নি বরং বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম বলা হয়েছে।[২]

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَ اِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. (সূরা: ২৭-নামল: ৩০)

৬. নামাযের ভেতরকার আরকান ১৪টি তবে তা ওগুলো নয়, সাধারণভাবে মানুষ যেগুলোকে মনে করে থাকে এবং বিশ্বাস করে থাকে। দলীল কুরআনের আয়াত:

১. এ আয়াতে উল্লেখিত পার্থক্য না করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে পার্থক্য না করা অর্থাৎ, সকলের প্রতি ঈমান আনা।

২. অথচ এটি নামায প্রসঙ্গে নয় বরং সুলায়মান (আ.) পত্রের শুরুতে তা ব্যবহার করেছিলেন, তাই কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ এখানে كوثر দ্বারা উদ্দেশ্য سبع مثانى, আর سبع مثانى দ্বারা উদ্দেশ্য ১৪টি বিষয়। আর ১৪টি দ্বারা ১৪টি আরকানই উদ্দেশ্য।

৭. প্রচলিত এই আযান নিষিদ্ধ। তারা আযান একামতকে বিদআত বলে। তাদের বক্তব্য হল নামাযীরা আগমন করবে আসমানের নিদর্শন দেখে। দলীল হল এই আযান কুরআনে উল্লেখিত নেই; বরং কুরআনে আছে–

اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই গাধার স্বরই অপ্রীতিকর। (সূরা লুকমান: ১৯)

৮. "উযূ" শব্দটা মনগড়া তৈরি করা এবং ভ্রান্ত। আসল শব্দ হল গোসল। কুরআনের আয়াতে গোসল শব্দই বলা হয়েছে। যেমন,

فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ. (সূরা: ৫-মায়িদা: ৬)

(উল্লেখ্য, বহু হাদীছে "উযূ" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।)

৯. উযূতে শুধু হাত এবং মুখ ধৌত করতে হয় এবং পা ও মাথায় মাসেহ করতে হয়, ব্যস এতটুকুই উযূ।

১০.যখন থেকে যুগের রং পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং আমার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, তখন থেকেই নামাযের আসল রূপ বিগড়ে দিয়েছে এবং মুশরিকসুলভ দুআ তার অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে।

১১. রাকআত শব্দটি বিকৃত। প্রথম রাকআত, দ্বিতীয় রাকআত এরূপ না হয়ে বরং কসরে উলা (قصر اولى) কসরে উখরা (قصر اخرى) এভাবেই হওয়া উচিত।

১২. জানাযার নামাযে হাত বাঁধতে হবে না। দলীল কুরআনের আয়াত:

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ. (সূরা: ১৫-হিজর: ৮৮)

(অথচ এর প্রকৃত অর্থ হল- তুমি মুমিনদের জন্য তোমার পক্ষপুট অবনমিত কর অর্থাৎ, তাদের প্রতি সদয় হও।)

১৩. রমযান শরীফের মাস ৩০ দিনেই হয়ে থাকে। দলীল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত–

وَ وٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً.

অর্থাৎ, আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম ত্রিশ রাত্রের। (সূরা: ৭-আ'রাফ: ১৪২)

১৪. রমযান মাস এটা চান্দ্র মাস নয়; বরং সৌর মাস।

১৫. আহ্‌লে কুরআনদের নামাযের রূপ হল: প্রথমে তাকবীর বলে বৈঠকের মত বসে যাবে। তারপর তাকবীর বলে দাঁড়াবে। অতঃপর বাম হাত ডান বগলের নিচে রাখবে, আর ডান হাত বাম কাঁধের উপর রাখবে। তারপর রুকু করবে। তারপর সাজদায় থুতনি রাখবে তারপর মাথা। অতঃপর জলসায় আসবে এবং সীনার উপর হাত রাখবে। তারপর সাজদা করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। দলীল হল এর অন্যথা হলে উপরোক্ত আয়াতের অর্থ দোরস্ত হয় না। (অথচ নামাযের বিস্তারিত রূপ হাদীছে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।)

১৬. তারা নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায়, রুকূ অবস্থায়, কওমা ও জলসায় এবং বৈঠকে ইত্যাদি সব স্থানে দুআ কেরাত ইত্যাদি সবকিছুই ব্যতিক্রম পাঠ করে থাকে।[১]

এভাবে আব্দুল্লাহ চকড়ালবী ও তার অনুসারীগণ হাদীছ ও কুরআন অস্বীকার করে এক নতুন ধর্মের সূচনা করেন। আব্দুল্লাহ চকড়ালবীর মৃত্যুর পর এই ফিতনা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরবর্তীতে আসলাম জয়রাজপূরী এবং তার পর পারভেজ গোলাম আহ্‌মদ এই ফিতনাকে পুনঃর্জীবিত করার চেষ্টা করেন।

হাদীছ এবং ইসলামের বহু সংখ্যক বদীহী বিষয় (بديهيات) কে অস্বীকার করার ফলে এই দলটা নিঃসন্দেহে কাফের।

(তথ্য সূত্র: جواہر الفقہ. مفتی محمد شفیع، بدائع الکلام. مفتی محمد یوسف التاؤلوی)

মওদূদী মতবাদ

(মওদুদী সাহেব ও তার প্রতিষ্ঠিত জামাআতে ইসলামীর চিন্তাধারা)

জামাআতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী সাহেব ১৩২১ হিজরী মোতাবেক ১৯০৩ সালে ভারতের হায়দারাবাদ প্রদেশের আওরংগবাদ জেলা শহরের আইন ব্যবসায়ী আহমদ হাসান মওদূদীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ৯ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়িতেই তাঁর উর্দু, ফার্সী আরবী ইত্যাদি প্রাথমিক বিদ্যাচর্চা সম্পন্ন হয়। তারপর আওরংগাবাদের ফাওকানিয়া মাদ্রাসায়[২] ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এখানে শেষ বর্ষে ছয় মাস পড়াশোনা করার পর তাঁর পিতা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। ১৭ বছর বয়সের এরকম সংকটময় মুহূর্তে তিনি জীবিকা অর্জনের জন্য লেখনী শক্তিকেই অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করে নেন। প্রথম দু'মাস তাঁর বড় ভাই কর্তৃক বিজনৌর থেকে প্রকাশিত 'মদীনা' পত্রিকায় কাজ করেন। তার পর জবলপুর থেকে জনাব তাজুদ্দীন সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত "তাজ" পত্রিকায় সম্পাদানার কাজে যোগ দেন। এ পত্রিকাটি একটি দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয়। এ সময় মওদূদী সাহেব

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন نفتی محمد یوسف التاؤلوی রচিত بدائع الکلام

২. তখন হায়দারাবাদ ও আওরংগাবাদে এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল যাতে ইতিহাস, ভূগোল, অংক ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, কোরআন-হাদীছ, ফেকাহ, মানতেক প্রভৃতি পড়ানো হত। তথ্যসূত্র: মাওলানা মওদূদী ঃ একটি জীবন একটি ইতিহাস, লেখক আব্বাস আলী খান, প্রকাশনা বিভাগ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, পঞ্চম সংস্করণ, জুন ২০০৩। লেখক আব্বাস আলী খান কোনরূপ সূত্রের উল্লেখ ছাড়াই আরও লিখেছেন যে, মওদূদী সাহেব ১৯২৮ সালে আশফাকুর রহমান কান্ধলভীর কাছ থেকে জামে' তিরমিযী ও মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেকের সনদ হাসেল করেন। (পৃ. ৪৮) কিন্তু মাওলানা মানযূর নো'মানী সাহেবের বর্ণনামতে ১৯৩৬/১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মওদূদী সাহেব ইংরেজি স্টাইলে চুল রাখতেন এবং দাড়ি সেভ করতেন। তারপর নামকে ওয়াস্তে দাড়ি অবস্থায় ছিলেন দীর্ঘ দিন। দ্রঃ مودودی کے ساتھ میری ر فاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف صفحه/٢٦-٢٢। অতএব এরূপদাড়ি সেভকারী ও ইংরেজি স্টাইলের চুলধারী কোন ব্যক্তিকে কোন মুত্তাকী পরহেযগার আলেম হাদীছের সনদ দিতে পারেন তা বোধগম্যতার পর্যায়ে পড়ে না।

রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। বিভিন্ন রাজনৈতিক জনসভায় বক্তৃতাও দিতে শুরু করেন।[১]

১৯৩২ সালে মওদূদী সাহেব দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ থেকে "তরজমানুল কুরআন" নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। প্রথম দিকে পত্রিকাটিতে আধুনিক যুগের আলোকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্ট বিভিন্ন সংশয় নিরসনে মওদূদী সাহেবের বলিষ্ঠ লেখা দেখে মওলানা মুহাম্মাদ মানযূর নো'মানী, মাওলানা আবুল হাছান আলী নদভীসহ বেশ কিছুসংখ্যক উলামায়ে কেরাম মওদূদী সাহেবের প্রতি মুগ্ধ হয়ে ওঠেন। এই মুগ্ধতাই মওলানা মুহাম্মাদ মানযূর নো'মানী ও মাওলানা আবুল হাছান আলী নদভীসহ কিছুসংখ্যক উলামাকে মওদূদী সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামাআতে ইসলামীতে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করে। মওলানা মানযূর নোমানী সাহেবের বর্ণনার[২] আলোকে পরবর্তিতে উলামায়ে কেরাম উপলব্ধি করলেন যে, মওদূদী সাহেবের মূল লক্ষ্য হল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করা। এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করার নিমিত্তে ধর্মহীন রাজনৈতিক দলের ন্যায় যখন যে নীতি গ্রহণ করা তিনি প্রয়োজনীয় মনে করেন, তখনই সেটা গ্রহণ করেন। যদিও তা ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী মৌলনীতিমালার সঙ্গে যতই সাংঘর্ষিক হোক না কেন, তবুও তিনি অবলিলায় তা গ্রহণ করেন এবং ইসলামের নামে গ্রহণ করেন। প্রয়োজন হলে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামের মৌলনীতিসমূহের স্বকপোল কল্পিত ব্যাখ্যা দেন। এভাবে ধর্মকে তিনি রাজনীতিসর্বস্ব করে তোলেন। ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলোর রাজনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান শুরু করেন। তিনি বলেন, "ইলাহ" অর্থ শাসক। "আল্লাহ" অর্থও তাই। "দ্বীন" অর্থ ধর্ম নয় (অর্থাৎ, ঈমান আমল তথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং ইহ্ছান তথা তাসাওউফ যেগুলোর নাম হল দ্বীন, মওদূদী সাহেবের মতে এগুলো দ্বীন তথা ধর্ম নয়।) বরং "দ্বীন" হল রাষ্ট্র সরকার। আর "শরীআত" হল রাষ্ট্রের আইন-কানূন। তিনি বলেন, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিধি-বিধান পালন করার নাম ইবাদত নয়। বরং "ইবাদত" হল রাষ্ট্রের আইন মান্য করা। "খুতবাত" গ্রন্থে তাঁর এসব ব্যাখ্যা বিদ্যমান রয়েছে। পরবর্তিতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে। এভাবে তিনি ইসলামের বহুসংখ্যক মৌলিক পরিভাষার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামের রাজনৈতিকায়ন করেন।

এসব উলামা হযারাত ইসলামের এরূপ রাজনৈতিকায়ন ও ইসলামী মৌলনীতিমালার অপব্যাখ্যা দেখে জামাআতে ইসলামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারায় যেসব বিভ্রান্তি তারা উপলব্ধি করেছেন সেগুলোর বিরুদ্ধে

১. তথ্যসূত্র: মাওলানা মওদূদী : একটি জীবন একটি ইতিহাস, লেখক আব্বাস আলী খান, প্রকাশনা বিভাগ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, পঞ্চম সংস্করণ, জুন ২০০৩।

২. مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف صفحه/٧٦

বয়ান প্রদান ও লেখনী চালাতে শুরু করেন।[১] নিম্নে মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারার বিভ্রান্তি সম্পর্কে তাঁরই লিখিত বই-পত্রের আলোকে কিঞ্চিত আলোচনা পেশ করা হল।

মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারা ও অনুসৃত নীতি হকপন্থীদের চিন্তাধারা ও তাঁদের অনুসৃত নীতি থেকে সর্বতোভাবে বিচ্যুত। ঈমান-আকীদার ক্ষেত্রেও তিনি আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। আমল এবং ইবাদত-বন্দেগী প্রসঙ্গেও তিনি আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। এমনকি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস কুরআন-হাদীছ, তাফসীর, ফেকাহ ও তাসাওউফ সম্পর্কিত ধারণা এবং কুরআন- হাদীছ থেকে জ্ঞান আহরণের পদ্ধতির ক্ষেত্রেও তিনি আহ্লে হকের অনুসৃত নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। নিম্নে তার যৎ কিঞ্চিত বিশদ বিবরণ পেশ করা হল।

আমরা এ সম্পর্কিত আলোচনাকে তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। যথা:–

ক. ঈমান আকীদার ক্ষেত্রে মওদূদী সাহেবের বিচ্যুতি।

খ. আমল এবং ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে মওদূদী সাহেবের বিচ্যুতি।

গ. ইসলামী জ্ঞানের উৎস কুরআন, হাদীছ এবং তাফসীর ও ফেকাহ্শাস্ত্র প্রসঙ্গে মওদূদী সাহেবের বিচ্যুতি।

(ক) ঈমান-আকীদার ক্ষেত্রে মওদূদী সাহেবের বিচ্যুতি

ঈমান-আকীদার পর্যায়ে মওদূদী সাহেব বহু বিষয়ে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। এ পর্যায়ে নিম্নে ৮টি প্রসঙ্গ তুলে ধরা হল।

(১) আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর ইসমত প্রসঙ্গ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে আম্বিয়ায়ে কেরাম নবুওয়াতের আগে ও পরে সগীরা ও কবীরা সব ধরনের গোনাহ থেকে পবিত্র। অর্থাৎ, তাঁরা গোনাহ থেকে মা'সূম বা নিষ্পাপ। شرح الفقه الأكبر গ্রন্থে বলা হয়েছে,

الأنبياء عليهم الصلوة السلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر الكفر والقبائح يعني قبل النبوة و بعدها. (شرح الفقه الأكبر الأبي المنتهي صفحه/١٢)

অর্থাৎ, আম্বিয়ায়ে কেরাম নবুওয়াতের আগে ও পরে সগীরা ও কবীরা সব ধরনের গোনাহ থেকে পবিত্র। উক্ত গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে,

ولم يرتكب (النبي صلى الله عليه و سلم صغيرة ولا كبيرة قط يعنى قبل النبوة وبعدها.

১. মাওলানা মানযূর নো'মানী সাহেব জামাআত ত্যাগপূর্বক লেখেন مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف নামক গ্রন্থ এবং মাওলানা আবুল হাছান আলী নদভী সাহেব জামাআত ত্যাগপূর্বক লেখেন عصر حاضر میں دین کی تفہیم تشریح নামক গ্রন্থ। উল্লেখ্য, জামাআতে ইসলামীর লোকজন মওদূদী সাহেবের পক্ষে প্রদত্ত উপরোক্ত আলেমদ্বয়ের এবং আরও অনেকের বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরে থাকেন। এসব বক্তব্য জামাআতে ইসলামী ও মওদূদী সাহেবের বিভ্রান্তি প্রকাশিত হওয়ার আগে তাদের প্রদত্ত বক্তব্য। কিন্তু তারা জামাআতে ইসলামী বর্জন করার পর যেসব বক্তব্য প্রদান করেছেন সেগুলোর উল্লেখ তারা করেন না। এটা সত্য নিষ্ঠার পরিচয় নয়।

অর্থাৎ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনও নবুওয়াতের আগে ও পরে সগীরা ও কবীরা কোন ধরনের গোনাহ করেননি। মোল্লা আলী কারী লিখেছেন–

عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر قبل النبوة و بعدها. (المرقاة ج/١ تحت حديث رقم ٨١ في باب الإيمان بالقدر)

অর্থাৎ, আম্বিয়ায়ে কেরাম নবুওয়াতের আগে এবং পরে সগীরা ও কবীরা সব ধরনের গোনাহ থেকে মা'সূম তথা নিষ্পাপ। ইবনে হাজার আসকালানী বলেন,

فلم يمكن صدوره (صدور الذنب) منه ولو صغيرة قبل النبوة على الصواب. (نقله القاري في المرقاة ج/١ تحت حديث رقم ٤١٥ في باب الاعتصام بالكتاب السنة)

অর্থাৎ, বিশুদ্ধ মতানুসারে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে গোনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়, যদিও নবুওয়াতের পূর্বে এবং সগীরা গোনাহও হয়।

কিন্তু মওদূদী সাহেবের মতে নবুওয়াত লাভের পূর্বের তো কথাই নেই, নবুওয়াত লাভের পরও নবীদের দ্বারা পাপ সংঘটিত হতে পারে এবং হয়েছেও। তিনি বলেন,

"এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে কেউ কেউ দ্বিধাবোধ করে থাকেন, তার একমাত্র কারণ এই যে, নবীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের ভুল-ভ্রান্তির অভিযোগ তোলা নবীদের নিষ্পাপ হওয়া সংক্রান্ত আকীদার পরিপন্থী বলে মনে হয়। কিন্তু যারা এরূপ মতামত পোষণ করেন তারা সম্ভবত এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেননি যে, নিষ্পাপ হওয়াটা আসলে নবীদের সত্তাগত অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য (لوازم ذات) নয়, বরং আল্লাহ তাঁদেরকে নবুওয়াত নামক সুমহান পদটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করার সুযোগ দানের জন্য একটা হিতকর ব্যবস্থা হিসেবে গুনাহ্ থেকে রক্ষা করেছেন। নচেৎ আল্লাহ্র এই সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাটা যদি ক্ষণিকের জন্যও তাদের ব্যক্তিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সাধারণ মানুষের যেমন গুনাহ্ হয়ে থাকে, তেমনি নবীদেরও হতে পারে। এটা একটা বড়ই মজার কথা যে, আল্লাহ ইচ্ছাকৃত প্রত্যেক নবী থেকেই কোন না কোন সময় নিজের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে নিয়ে দু'একটা গুনাহ্ ঘটে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, যাতে মানুষ নবীদেরকে খোদা মনে করে না বসে এবং তারা যে মানুষ, খোদা নন, সেটা বুঝতে পারে।[১]

কী আশ্চর্য দর্শন! নবীগণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন এটা তাদের মানুষ প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হল না, অধিকন্তু তাঁরা মানুষ- তা প্রমাণ করার জন্য তাঁদের দ্বারা পাপ সংঘটিত করাতে হল!

তিনি অন্যত্র সূরা হুদের ৪৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সব নবী রসূল সম্পর্কে বলেছেন. "বস্তুত নবীগণ মানুষই হয়ে থাকেন এবং কোন মানুষই মু'মিনের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ মাপকাঠিতে সর্বদা অটল থাকতে সক্ষম হতে পারে না।

---

১. (تفہیمات، حصہ دوم، صفحہ/٥٧، اسلامک پبلیکشنز لمیٹیڈ، لاہور (پاکستان) ١٩٨٧) অনুবাদ গ্রন্থ: "নির্বাচিত রচনাবলী" থেকে অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে। ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪, আধুনিক প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯১।

প্রায়শই মানবীয় নাজুক মুহূর্তে নবীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ মানুষও কিছুক্ষণের জন্য মানবিক দুর্বলতার সামনে পরাভূত হয়ে যান।[১]

নবীদের দ্বারা পাপ সংঘটিত হয়েছে এ মর্মে মওদূদী সাহেব অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "এখানে আদম (আ.) থেকে প্রকাশিত ঐ মানবিক দুর্বলতার হাকীকত বুঝে নিতে হবে- যা আদম (আ.)-এর মধ্যে এক আত্মবিস্মৃতির জন্ম দিয়েছিল এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বাঁধন ঢিলা হওয়া মাত্রই তিনি আনুগত্যের সু-উচ্চ মর্যাদা থেকে পাপের অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছিলেন"।[২]

বিঃ দ্রঃ ইসমত সম্পর্কে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বক্তব্য ও দলীল-প্রমাণসহ একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ (শিরোনাম: "ইস্‌মতে আম্বিয়া প্রসঙ্গ") সামনে পেশ করা হয়েছে।

(২) নবীগণ কর্তৃক নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গ

কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী-রসূলগণ তাঁদের নবুওয়াতের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের দ্বারা বিন্দুমাত্র কোনো ত্রুটি সংঘটিত হয়নি। কুরআনে কারীমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রসঙ্গে এসেছে–

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه.

অর্থাৎ, হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তুমি তা পৌঁছে দাও, অন্যথায় তুমি তাঁর রেসালাত পৌঁছে দিলে না। (সূরা মায়েদা: ৬৭)

বিদায় হজ্জের ভাষণে লক্ষাধিক সাহাবীর সামনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করেছিলেন, ألا هل بلغت অর্থাৎ, আমি কি তোমাদের কাছে (দ্বীন) পৌঁছে দিয়েছি? সমবেত সাহাবাগণ উত্তরে বলেছিলেন, জি হ্যাঁ, অবশ্যই পৌঁছে দিয়েছেন। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথার উপর আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখেছিলেন এই বলে যে,

(اللهم اشهد. (رواه البخاري في كتاب المناسل – باب الخطبة أيام منى

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। (বোখারী)

এর দ্বারা প্রমাণিত হল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে কোনোই ত্রুটি করেননি। ফখরুদ্দীন রাযী عصمة الأنبياء গ্রন্থে লিখেছেন– আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিধি-বিধান পৌঁছে দেয়া তথা নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন- এর ক্ষেত্রে নবীদের থেকে কোনো ত্রুটি না হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা' রয়েছে। অথচ মওদূদী সাহেবের ধারণায় নবী রসূলগণ থেকে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি-বিচ্যুতিও হয়েছে। এমনকি মওদূদী সাহেবের লেখা থেকে বুঝা যায়

---

১. تفہیم القرآن، ج/٢، ، مکتبۂ تعمیر انسانیت، لاہور، ایڈیشم ٢، جنوری ١٩٥٨ صفحہ/٣٤٤-٣٤٣۔
২. تفهيم القرآن، ج/٣، صفحہ/١٢٣۔

সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে ক্রটি-বিচ্যুতি হয়েছে। (নাউযু বিল্লাহ!) তিনি লিখেছেন–

"সে পবিত্র সত্তার নিকট কাতর কণ্ঠে আবেদন করুন, হে মালিক, এ তেইশ বছরের নববী জীবনে দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দানকালে স্বীয় দায়িত্বসমূহ আদায়ের বেলায় যে সকল ক্রটি-বিচ্যুতি আমার থেকে সংঘটিত হয়েছে তা ক্ষমা করে দাও।[১]

পর্যলোচনা ও খণ্ডন

এখানে স্পষ্টতই নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে ক্রটি হয়েছে বলে বোঝানো হয়েছে। স্বয়ং খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে মওদূদী সাহেব যখন এমন মারাত্মক আকীদা পোষণ করে থাকেন, তখন অন্যান্য আম্বিয়া (আ.) সম্পর্কে তাঁর আকীদা কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। নবী যদি নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে কোতাহী করেন তবে তো তাঁর নবুওয়াতই বৃথা প্রমাণিত হয়ে যায়। সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার মনোনয়নই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলাই তো নবীকে নবী হিসাবে মনোনীত করেন।

তিনি অন্যান্য নবীদের দ্বারাও নবুওয়াত রেসালাতের দায়িত্ব পালনে ক্রটি হয়েছে বলে বিশ্বাস রাখেন। যেমন: হযরত ইউনুস (আ.) সম্পর্কে তিনি লিখেছেন- "কুরআনে কারীমের বর্ণনা এবং সহীফায়ে ইউনুসের বিস্তারিত বিবরণের উপর চিন্তা করলে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, হযরত ইউনুস (আ.) থেকে রিসালতের দায়িত্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু কোতাহী বা ক্রটি হয়ে গিয়েছিল এবং সম্ভবত তিনি অধৈর্য্য হয়ে সময় হওয়ার আগেই নিজ আবাসস্থল ত্যাগ করেছিলেন"।[২]

(৩) আম্বিয়ায়ে কেরামের সমালোচনা প্রসঙ্গ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত নবী রসূলের সমালোচনা এমনকি সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা থেকেও বিরত থাকেন। তাদের আকীদা হল– নবীগণ নিষ্পাপ, অতএব তাঁরা সমালোচনার উর্ধ্বে।

কিন্তু মওদূদী সাহেব শুধু সাহাবী নয় আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস্‌সালামদের ব্যাপারেও সমালোচনা করেছেন। এটা একদিকে মওদূদী সাহেবের নবী রসূলগণকে নিষ্পাপ ও সমালোচনার উর্ধ্বে মনে না করার প্রমাণ। সঙ্গে সঙ্গে নবী রসূলগণের ব্যাপারে তাঁর মনে অভক্তি বিরাজমান থাকার পরিচায়ক। তিনি বিভিন্ন নবীর সমালোচনা করে বলেছেন,

---

১. قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں. ص /۱۱۱، مرکزی مکتبۂ اسلامی، دہلی، ایڈیشن پنجم ۱۹۷۳م অনুবাদ গ্রন্থ: কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, ১১২ পৃ., ৮ম প্রকাশ, আধুনিক প্রকাশনী, জুন, ২০০২। এখানে অনুবাদ এভাবে করা হয়েছে: তাঁর দরবারে আবেদন কর! প্রভু পরওয়ারদেগার! দীর্ঘ তেইশ বছরের এ খেদমত কালে আমার দ্বারা যে সকল ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তা ক্ষমা করে দাও।

২. تفہیم القرآن، ج/۲ سورہ یونس، آیت ۹۸، مکتبہ تعمیر انسانیت، لاہور، ایڈیشن ۱۹۵۸، جنوری ۱۹۵۸ صفحہ/۳۳۲۔

❑ হযরত দাউদ (আ.) সম্পর্কে

"হযরত দাউদ (আ.) তার যুগের ইসরাঈলী সমাজের সাধারণ-প্রথায় প্রভাবান্বিত হয়ে উরিয়ার কাছে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার আবেদন করেছিলেন"।[১]

অন্যত্র বলেছেন, "হযরত দাউদ (আ.)-এর এ কাজে কু-প্রবৃত্তির কিছুটা দখল ছিল। তাঁর শাসন ক্ষমতার সঙ্গে অসংগত-অশোভনীয় ব্যবহারের সম্পর্ক ছিল। আর তা ছিল এমন ধরনের কাজ যা হক পন্থায় রাজ্য শাসনকারী কোন শাসকের পক্ষেই শোভনীয় নয়"।[২]

❑ হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে

"এটা কেবল অর্থমন্ত্রীর গদী লাভের দাবী ছিল না, যেমন কোন কোন লোক মনে করে থাকেন, বরং তা ছিল 'ডিক্টেটরশীপ' লাভের দাবী। এর ফলে ইউসুফ (আ.) যে পজিশন লাভ করেছিলেন তা প্রায় এ ধরনের ছিল যা ইটালীর মুসোলিনীর রয়েছে"।[৩]

❑ আদি পিতা হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে

"এখানে আদম (আ.) থেকে প্রকাশিত ঐ মানবিক দুর্বলতার হাকীকত বুঝে নিতে হবে- যা আদম (আ.)-এর মধ্যে এক আত্মবিস্মৃতির জন্ম দিয়েছিল এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বাঁধন ঢিলা হওয়া মাত্রই তিনি আনুগত্যের সু-উচ্চ মর্যাদা থেকে পাপের অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছিলেন"।[৪]

❑ সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম সম্পর্কে

সমস্ত পয়গম্বরদের সম্পর্কে কটুক্তি করে মওদূদী সাহেব বলেছেন, "অন্যদের কথা তো স্বতন্ত্র, প্রায়শই পয়গম্বরগণও তাঁদের কু-প্রবৃত্তির মারাত্মক আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছেন।"[৫]

❑ রসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে

রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামম সম্পর্কে জনাব মওদূদী সাহেব বলেছেন, "আল্লাহর নিকট কাতর কণ্ঠে এই আবেদন করুন, যে কাজের দায়িত্ব

---

১. تفہیمات ، حصہ دوم، صفحہ/۵۷، اسلامک پبلیکشنز لمیٹیڈ، لاہور (پاکستان) ۱۹۸۷۔ অনুবাদ গ্রন্থ: নির্বাচিত রচনাবলী ২য় খণ্ড, ৭৩ পৃ. আধুনিক প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১।

২. تفہیم القرآن، ج/۴، سورہ ص، مکتبۂ تعمیر انسانیت، لاہور، ایڈیشن ۱، صفح/۳۲۷۔

৩. تفہیمات، حصہ دوم، صفحہ/۱۲۲، اسلامک پبلیکشنز، لاہور (پاکستان) ۱۹۸۷۔ অনুবাদ গ্রন্থ: নির্বাচিত রচনাবলী ২য় খণ্ড, ১৫১ পৃ., আধুনিক প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১।

৪. تفہیم القرآن، ج/۳، صفحہ/۱۲۳

৫. تفہیمات، حصہ دوم، صفحہ/۱۹۵، اسلامک پبلیکشنز لمیٹیڈ، لاہور (پاکستان) ۱۹۸۷ অনুবাদ গ্রন্থ: নির্বাচিত রচনাবলী ১. (দ্বিতীয় ভাগ) ২৮ পৃ. আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯২। এখানে অনুবাদ করা হয়েছে এরূপ– আর সাধারণ লোক কোন্ ছার, কখনো কখনো পয়গম্বররা পর্যন্ত এই মহা শত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছেন। এ অনুবাদে মূল কিতাবের শব্দ بسااوقات -এর অনুবাদে "কখনো কখনো" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। بسااوقات -এর প্রকৃত অর্থ হল– প্রায়শই।

আপনাকে দেয়া হয়েছিল তা সম্পন্ন করার ব্যাপারে আপনার দ্বারা যে ভুল-ত্রুটি হয়েছে কিংবা তাতে যে অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে তা যেন তিনি ক্ষমা করে দেন"[১]

(৪) সাহাবায়ে কেরামের আদালত ও সমালোচনা প্রসঙ্গ

আদালত বলা হয়:

العدالة في اللغة الاستقامة، وعند أهل الشرع هي الانزجار عن محظورات دينية. (كشاف اصطلاحات الفنون ج/٣)

অর্থাৎ, "আদালত" (العدالة)-এর আভিধানিক অর্থ হল অটল থাকা। আর শরীআতের পরিভাষায় আদালত বলা হয় ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা তথা পাপ থেকে বিরত থাকা।

আবূ বকর ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেছেন, আদালতে সাহাবার বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অবিসংবাদিত বিষয়। তাদের ন্যায়নিষ্ঠতা, আত্মিক-আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাঁদের নির্বাচিত-চয়িত হওয়ার কথা পবিত্র কুরআনে আলোচিত হয়েছে।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদায় সকল সাহাবী আদিল বা নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়নিষ্ঠ। অতএব তাঁরা সমালোচনার উর্ধ্বে। সাহাবীদের সমালোচনা না করা এবং তাঁদের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা রাখা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নীতি। সাহাবী-দের প্রতি মহব্বত ও ভক্তি শ্রদ্ধা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্যতম শি'আর বা প্রতীক। সাহাবায়ে কেরামকে ভালবাসা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই ভালবাসা। আকীদার প্রসিদ্ধ কিতাব "মুসামারা"তে বলা হয়েছে,

اعتقاد أهل السنة والجماعة تزكية جميع الصحابة رضـ وجوبا بإثبات العدالة لكل منهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم. (المسامرة)

অর্থাৎ, আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল- আবশ্যিকভাবে সমস্ত সাহাবীর জন্য "আদালত" গুণ মেনে নিয়ে তাঁদেরকে পবিত্র সাব্যস্ত করা, তাঁদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা থেকে বিরত থাকা এবং তাঁদের প্রশংসা করা।

আকীদাতুত্তাহাবীর শরাতে বলা হয়েছে,

ولا نذكر هم إلا بخير وحبهم دين وإيمان و إحسان.

অর্থাৎ, আমরা তাঁদের ভাল বৈ মন্দের উল্লেখ করি না। তাঁদের প্রতি ভালবাসা দ্বীন, ঈমান এবং ইহ্‌ছান।

সাহাবীদের সমালোচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عن أبى سعيد الخدري رضـ مرفوعا : لاتسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن احدكم أنفق مثل أُحُد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولانصيفه. (متفق عليه. رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم _ باب قول النبي صلى الله عليه و سلم لو كنت متخذا خليلا... ورواه مسلم في باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم)

১. تفهيم القرآن، عم پاره، طباعت مارچ ١٩٧٣، صفحه/٣٦٥-

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদের সমালোচনা কর না। ঐ সত্তার কছম, যার হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করে, তবুও সে তাঁদের (সাহাবাদের) এক মুদ বা তার অর্ধ পরিমাণেও পৌঁছতে পারবে না। (বোখারী ও মুসলিম)

অন্য এক হাদীছে এসেছে,

عن أبي سعيد الخدري رضـ مرفوعا : الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، الحديث. (رواه الترمذي في ابواب المناقب– باب في من سب أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و قال : هذا حديث غريب ١هـ قلت : هذا حال الإسناد و معناه صحيح مؤيد بأحاديث صحيحة.)

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আমার পর তোমরা তাঁদেরকে সমালোচনার পাত্র বানাবে না। যে তাঁদেরকে ভালবাসল, সে আমার প্রতি ভালবাসার কারণেই তাঁদেরকে ভালবাসল। আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল। (তিরমিযী)

কিন্তু হাদীছে সাহাবীদের সমালোচনা নিষিদ্ধ হওয়ার এত সব স্পষ্ট দলীল থাকা সত্ত্বেও মওদূদী সাহেব সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা শুধু জায়েযই মনে করেন না বরং জরূরী মনে করেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের কঠোর নিন্দাবাদ করেছেন। তাঁদের প্রতি জঘন্য মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন এবং তাঁদেরকে অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সময়কার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে লিখেছেন– "অনেক সময় মানবিক দুর্বলতা সাহাবীদেরকেও আচ্ছন্ন করে ফেলত এবং তারা পরস্পরের উপর আঘাত করে কথা বলতেন।"[১] তিনি "খেলাফত ও মুলূকিয়াত" গ্রন্থে হযরত মুগীরা ইব্‌নে শু'বা ও হযরত মুআবিয়া (রা.) সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তিনি হযরত উছমান (রা.)-এর পর্যন্ত সমালোচনা করেছেন। তিনি হযরত মুআবিয়া (রা.) সম্পর্কে সাহাবা বিদ্বেষী শীআ ঐতিহাসিকদের মত খুঁজে খুঁজে বের করে কিংবা ঐতিহাসিকদের ইবারত কাঁট ছাঁট করে হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসাবে তুলে ধরেছেন। হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) তার লিখিত "ভুল সংশোধন" গ্রন্থে এ সম্পর্কে তথ্যবহুল প্রমাণ পেশ করেছেন যে, তিনি কীভাবে ঐতিহাসিকদের ইবারত কাঁট ছাঁট করেছেন এবং কোন কোন সাহাবা বিদ্বেষী শীআ ঐতিহাসিকদের মত তিনি উদ্ধৃত করেছেন।

১. تفہیمات، حصہ اول، صفحہ/٩٥، اسلامک پبلیکشنز لمیٹیڈ، لاہور (پاکستان) ١٩٨٨- অনুবাদ গ্রন্থ: নির্বাচিত রচনাবলী ১ (দ্বিতীয় ভাগ) ১৯০ পৃ., আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ: ১৯৯২।

হযরত শামসুল হক ফরিদপূরী (রহ.) চ্যালেঞ্জ পেশ করেছেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত জামাআতে ইসলামীর লোকজন তার লেখা খণ্ডন করতে পারবে না।[২]

বি. দ্র. : সাহাবায়ে কেরামের আদালত (নির্ভরযোগ্যতা) ও তাঁদের সমালোচনা নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে পরবর্তী একটি প্রবন্ধে (শিরোনাম: "সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা, তাঁদের আদালত ও সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রসঙ্গ") বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(৫) সাহাবায়ে কেরামের সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রসঙ্গ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল সাহাবায়ে কেরাম হক ও সত্যের মাপকাঠি। কুরআন-হাদীছে সাহাবায়ে কেরামের ঈমানকে ঈমানের মাপকাঠি বলা হয়েছে, তাঁদের আমল ও মাসলাককে আমল ও মাসলাকের মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اٰمِنُوْا كَمَاۤ اٰمَنَ النَّاسُ.

অর্থাৎ, এই লোকেরা (সাহাবীরা) যেমন ঈমান এনেছে, তোমরাও তদ্রূপ ঈমান আন। (সূরা: ২-বাকারা: ১৩)

আরও ইরশাদ হয়েছে,

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَاۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِیْ شِقَاقٍ.

অর্থাৎ, তোমরা যেমন ঈমান এনেছ, তারা যদি অনুরূপ ঈমান আনয়ন করে, তাহলে তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হল। আর যদি তারা বিমুখ হয়ে যায়, তবে তো তারা সুদূর বিরোধে রয়েছে। (সূরা: ২-বাকারা: ১৩৭)

এ দুই আয়াতে ঈমানের ক্ষেত্রে সাহাবীদের মাপকাঠি হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَنْ یُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدٰی وَ یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیْلِ الْمُؤْمِنِیْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰی وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ.

অর্থাৎ, যে তার নিকট হেদায়েত স্পষ্ট হওয়ার পর রসূলের বিরোধিতা করবে এবং এই মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি ফিরিয়ে দিব যেদিকে সে ফিরে যায়। অনন্তর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব। (সূরা: ৪-নিসা: ১১৫)

এ আয়াতে আমল ও মাসলাকের ক্ষেত্রে সাহাবীদের মাপকাঠি হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

---

২. জামাআতে ইসলামীর লোকজন "ভুল সংশোধন"-এর বক্তব্য এবং এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে না পেরে অবশেষে এই বলা শুরু করেছেন যে, "ভুল সংশোধন" হযরত শামসুল হক ফরিদপূরী (রহ.)-এর লেখা নয়। কিন্তু যারা হযরত শামসুল হক ফরিদপূরী (রহ.)কে "ভুল সংশোধন" লিখতে দেখেছেন বা এ বইটির পাণ্ডুলিপি দেখেছেন এরকম বহু লোক এখনও (২০০৪ খৃ.) জীবিত আছেন। অতএব এরূপ ছেলেমিপনা করে "ভুল সংশোধন"-এর মোকাবি-লা হবে না।

কিন্তু মওদূদী সাহেবের মতে সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নন। মওদূদী সাহেব জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র-এর মৌলিক আক্বীদার দ্বিতীয়াংশ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র ব্যাখ্যায় ৬নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

'রাসূলে খোদা (অর্থাৎ, হযরত মুহাম্মাদ [সা.])কে ছাড়া কাউকে হকের মাপকাঠি বানাবে না, কাউকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করবে না।' কারও যিহ্‌নী গোলামীতে লিপ্ত হবে না'।[১]

বি. দ্র. : সাহাবায়ে কেরামের সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রসঙ্গে পরবর্তী একটি প্রবন্ধে (শিরোনাম: "সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা, তাঁদের আদালত ও সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রসঙ্গ") দলীল প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(৬) হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কিত কয়েকটি আকীদা প্রসঙ্গ

মওদূদী সাহেবের আকীদাগত বিচ্যুতির ক্ষেত্রে আরও একটা উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় হল- তিনি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হযরত ঈসা (আ.)কে স্বশরীরে আকাশে তুলে নেয়া, তাঁর মৃত্যুবরণ না করা এবং শেষ যুগে তাঁর পুনরায় দুনিয়াতে অবতরণের আকীদায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি সূরা নেসার ১৫৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলেছেন,

"এখানে কুরআনে কারীমের মূল ভাবধারা অনুযায়ী যে কথাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা একমাত্র এটাই যে, হযরত ঈসা (আ.)কে স্বশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এ কথা বলা থেকে বিরত থাকা এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন একথা বলা থেকেও বিরত থাকা।"[২]

মওদূদী সাহেব উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)কে স্বশরীরে আকাশে তুলে নেয়ার এবং তাঁর মৃত্যুবরণ না করা ও শেষ যুগে তাঁর অবতরণ সম্পর্কিত আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত আকীদাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছেন। অথচ এ বিষয়টি কুরআন ও সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্‌মীরী (রহ.) লিখেছেন- এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।[৩] মওদূদী সাহেব

---

১. دستور جماعتِ اسلامی، مرکزی جماعت اسلامی ہند، ۱۹۱۷ء পূর্বে "জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র" নামে প্রকাশিত বইতেও ছিল- "রাসূলে খোদা ব্যতীত আর কাউকে সত্যের মাপকাঠি বানাবে না, কাউকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করবে না, কারো যিহ্‌নী গোলামীতে (মানসিক দাসত্বে) লিপ্ত হবে না।" কিন্তু এসব কথার উপর সমালোচনার মাত্রা হ্রাস করার লক্ষ্যে ভুল স্বীকার না করে তারা এসব ভাষায় পরিবর্তন এনেছেন। যেমন: বর্তমান "গঠনতন্ত্র জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ" (১৪শ সংস্করণ, মার্চ-২০০২, প্রকাশনা বিভাগ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ)-এর ১১ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন চরিতকে কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা এবং উহাকে সকল ব্যাপারে সত্যের একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে মানিয়া লওয়া। আল্লাহর রাসূল ব্যতীত আর কাহাকেও ভুলের উর্ধ্বে মনে না করা। কাহারও অন্ধ গোলামীতে নিমজ্জিত না হওয়া।

১. تفهيم القرآن، ج/١، سوره نساء، مکتبہ تعمیر انسانیت، لاہور، ایڈیشن ٣. ١٩٥٧. صفحه /٤٢١

২. أكفار الملحدين

উপরোক্ত আয়াতের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, সেটা তার মনগড়া ব্যাখ্যা যা জমহুরে উম্মতের ব্যাখ্যার পরিপন্থী। তাফসীরের ক্ষেত্রে তার মনগড়া ব্যাখ্যার এটা একটা স্পষ্ট প্রমাণ।

(৭) ইমাম মাহ্দী সম্পর্কে মওদূদী সাহেবের অভিমত

মওদূদী সাহেব ইমাম মাহ্দী সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে যেয়ে এক জায়গায় বলেছেন, "মুসলমানদের মধ্যে যারা ইমাম মেহেদীর আগমনের ওপর বিশ্বাস রাখেন তারা যথেষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করছেন এবং তাদের বিভ্রান্তি এর প্রতি অবিশ্বাসী নতুন প্রথা প্রবর্তনকারী মুজাদ্দিদের থেকে কোন অংশে কম নয়। তারা মনে করেন, ইমাম মেহেদী পুরাতন যুগের কোনো সুফী ধরনের লোক হবেন। তস্‌বীহ হাতে নিয়ে অকস্মাৎ কোনো মাদ্রাসা বা খানকাহ থেকে বের হবেন। বাইরে এসেই 'আনাল মেহেদী'-আমিই মেহেদী বলে চতুর্দিকে ঘোষণা করে দেবেন। উলামা ও শায়খগণ কিতাব-পত্র বগলে দাবিয়ে তাঁর নিকট পৌঁছে যাবেন এবং লিখিত চিহ্নসমূহের সঙ্গে তাঁর দেহের গঠন প্রকৃতি মিলিয়ে দেখে তাকে চিনে ফেলবেন। অতপর 'বাইআত' শুরু হবে এবং জিহাদের এলান করা হবে। সাধনাসিদ্ধ দরবেশ এবং পুরাতন ধরনের গোঁড়া ধর্ম বিশ্বাসীরা তাঁর পতাকাতলে সমবেত হবেন। নেহায়েত শর্ত পূরণ করার জন্যে নামমাত্র তলোয়ার ব্যবহার করা প্রয়োজন হবে, নয়তো আসলে বরকত ও আধ্যাত্মিক শক্তিবলেই সব কাজ সমাধা হয়ে যাবে। দোয়া দুরূদ যিকির তসবিহ্র জোরে যুদ্ধ জয় হবে। যে কাফেরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে সে-ই তড়পাতে তড়পাতে বেহুশ হয়ে যাবে এবং নিছক বদদোয়ার প্রভাবে ট্যাংক ও জংগী বিমানসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে।" তিনি আরও বলেছেন, "আমার মতে আগমনকারী ব্যক্তি তার নিজের যুগের একজন আধুনিক ধরনের নেতা হবেন।"[১]

মওদূদী সাহেব এখানে পীর আউলিয়া বা ফকীর দরবেশদের ভাবমূর্তি এবং ইসলামী লেবাস-পোশাক, বুযুর্গদের কারামত, বরকত ও আধ্যাত্মিক শক্তির ধারণাকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপের ভাষায় এবং হাস্যকর ভংগিতে বিবরণ দিয়েছেন। এবং যা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তা হাদীছের ভাষ্যসমূহের পরিপন্থী। যেমন: তিনি তার উপরোক্ত বর্ণনায় বোঝাতে চেয়েছেন যে,

১. ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর বেশভূষা সূফী ও মৌলভীদের আকৃতির মত হবে না। অথচ হযরত আবূ উমামা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত তাবারানীর এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতের একাংশে মাহদী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

من ولد ابن أربعين سنة، كان وجهه كوكب دري، في خده الأيمن خال أسود، عليه عبائتان قَعْوايتان. (الطبراني الكبير برقم ٧٣٦٧ وفي مسند الشاميين للطبراني برقم ١٦٠٠ قطوانيتان)

১. ৩২/ص تجديد واحياء دين। অনুবাদ গ্রন্থ: "ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন" (পৃ. ৩০-৩১, ৭ম প্রকাশ, জুন-২০০২, প্রকাশনায় আধুনিক প্রকাশনী।) থেকে অনুবাদটুকু গৃহীত হয়েছে।

অর্থাৎ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "সে আমার সন্তানদের থেকে হবে। তাঁর আত্মপ্রকাশ হবে ৪০ (চল্লিশ) বছর বয়সে। তাঁর মুখাবয়ব তারকাসদৃশ উজ্জ্বল, যার ডান গালে থাকবে কালো তিলক, গায়ে থাকবে দু'টো চরকায় কাটা সুতোয় বোনা আবা।" (তাবারানী)

হযরত আবূ নুআইম থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

يخرج المهدي وعلى رأسه عمامة. (فتنه مودوديت)

অর্থাৎ, "ইমাম মাহ্দী মাথায় পাগড়ী পেঁচানো অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করবেন।"

২. মওদূদী সাহেব স্পষ্টতই বলেছেন, "তাঁর কাজের কোনো অংশে কেরামতি, অস্বাভাবিকতা, কাশ্ফ, ইলহাম, চিল্লা, ও মুজাহাদা-মুরাকাবার কোনো স্থানই আমি দেখি না।[১] এভাবে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নির্ধারিত কোন চিহ্ন থাকবে না যে, তার ভিত্তিতে তাঁকে খুঁজে বের করা হবে। অথচ বহু সংখ্যক রেওয়ায়েতে তাঁর শারীরিক আকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এসব বর্ণনায় তাঁর আকৃতি, অবয়ব, চর্ম, ললাট ও নাসিকা প্রভৃতির উল্লেখ কি নিরর্থকই?

৩. মওদূদী সাহেব আরও বোঝাতে চেয়েছেন যে, ইমাম মাহ্দীর হাতে বাইআত গ্রহণ ধরনের কিছু হবে না। অথচ আবূ দাউদ শরীফের হাদীছে এসেছে,

فيبايعونه بين الركن و المقام. (ابو داود في أول كتاب المهدي من كتاب الفتن)

অর্থাৎ, "তারা (উলামা সম্প্রদায় তাঁর চিহ্নসমূহের মাধ্যমে তাঁকে চিনতে পেরে) তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করবেন হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে।

সহীহ হাদীছে যেখানে ইমাম মাহ্দীর হাতে বাইয়াতের কথা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে কেন মওদূদী সাহেব তাঁর হাতে বাইআত নিয়ে এরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলেন? এতে কি মওদূদী সাহেবের ওপর দ্বীনী বিষয়কে উপহাস্যে পরিণত করার পাপ বর্তাবে না?

৪. মওদূদী সাহেব বিভিন্ন দিক থেকে অলী-আউলিয়াদের ইমাম মাহ্দীর নিকট আগমনকে অস্বীকার করেছেন। অথচ পূর্বোক্ত আবূ দাউদ শরীফের হাদীছেই বলা হয়েছে,

أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق. (أبو داود في أول كتاب المهدي من كتاب الفتن)

অর্থাৎ, শামের আব্দাল ও ইরাকের আসায়েব এসে তাঁর নিকট হাজির হবেন।

এই "আব্দাল ও আসায়েবের" ব্যাখ্যায় "আন-নিহায়া ফী গরীবিল হাদীছ" গ্রন্থে বলা হয়েছে, তারা হবেন দরবেশ তথা পূর্বসূরীদের অনুসৃত আদর্শের অধিকারী শ্রেণী।

১. অনুবাদ গ্রন্থ: "ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন" পৃ. ৩১, ৭ম প্রকাশ, জুন-২০০২, প্রকাশনায়: আধুনিক প্রকাশনী।

৫. মওদূদী সাহেব আরও বোঝাতে চেয়েছেন যে, যুদ্ধ ছাড়া ইমাম মাহ্দীর কারামত, দুআ, কোন তাস্‌বীহ ইত্যাদি ধরনের অন্য কিছুর মাধ্যমে কিছু ঘটার ধারণা ভুল। অথচ মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে শুধুমাত্র নারায়ে তাকরীরের ধ্বনীর দ্বারাই শহর জয় হয়ে যাওয়ার কথা বর্ণিত আছে। ইরশাদ হয়েছে,

فاذا جاء وها وما نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا : لاإله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها، ثم يقول الثانية : لاإله إلا الله ولله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة : لا اله الاالله والله أكبر فيفرج بهم فيد خلونها. الحديث. (رواه مسلم في كتاب الفتن)

অর্থাৎ, যখন তারা (কনস্ট্যান্টিনোপল) শহরে গমন করবে তখন তাদের বধ করতে না প্রয়োজন হবে হাতিয়ার বা অস্ত্রের, না প্রয়োজন হবে তীর নিক্ষেপের; বরং তারা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতেই শহরের এক প্রান্তের পতন হবে। আবার যখন দ্বিতীয়বার 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, তখন দ্বিতীয় প্রান্তেরও পতন ঘটবে। যখন তৃতীয়বার বলবে, তখন তাদের জন্য রাস্তা খুলে যাবে এবং তারা ভিতরে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

ইমাম মাহ্দী সম্পর্কে হাদীছের এসব স্পষ্ট বিবরণ থাকা সত্ত্বেও মওদূদী সাহেব এসব বিষয়কে বিদ্রূপাত্মক ও ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এটা দ্বীনের ব্যাপারে এবং হাদীছ সম্পর্কে মওদূদী সাহেবের বে-খবর ও বে-পরোয়া থাকার প্রমাণ বহন করে। অথচ এটাকেই আখ্যা দেয়া হয়েছে পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা ও স্পষ্টবাদিতা বলে।

(৮) কুরআন ও ইসলাম সর্বযুগে সংরক্ষিত কি না- এ প্রসঙ্গ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে ইসলাম সর্ব যুগের সকল মানুষের জন্য ধর্ম এবং ইসলামের কিতাব কুরআন সর্ব যুগের জন্য ধর্মীয় কিতাব। সেমতে কেয়ামত পর্যন্ত এই ধর্ম এবং এই কিতাব হেফাজত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ্ পাক নিজেই নিয়ে নিয়েছেন এবং সর্বযুগে ইসলামকে সঠিকভাবে বোঝার ও পেশ করার মত যোগ্য ব্যক্তিত্ব তৈরি করার ধারা তিনি অব্যাহত রেখেছেন। ইসলামের ইতিহাসে এমন কোন মুহূর্ত আসেনি যখন ইসলাম তথা কুরআন-হাদীছ সঠিকভাবে বুঝা ও পেশ করার মত ব্যক্তিত্ব ছিল না। বরং কুরআন-হাদীছের সঠিক জ্ঞান-সমৃদ্ধ একটি জামাআত এবং হকপন্থী একটি দল সর্বদাই বিদ্যমান ছিল এবং থাকবে।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَه لَحٰفِظُوْنَ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমিই এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক। (সূরা: ১৫-হিজ্‌র: ৯)

এটা সুস্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআন শব্দ ও অর্থ সমন্বিত একটি ঐশী কিতাব। শুধু শব্দের নাম কুরআন নয়। সুতরাং সর্বযুগে কুরআনে কারীমের সংরক্ষিত থাকার অর্থ হল তার শব্দ ও অর্থ উভয়ই সংরক্ষিত থাকা। আর এটা উপরোক্ত আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত।

হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. (رواه البيهقي في المدخل مرسلا. كذا في المشكوة)

অর্থাৎ, পূর্বসূরীদের কাছ থেকে প্রত্যেক পরবর্তী একটি নির্ভরযোগ্য জামাআত এ ইল্‌ম ধারণ করতে থাকবে। তারা চরমপন্থীদের বিকৃতি, বাতিলের অপমিশ্রণ ও মূর্খদের অপব্যাখ্যা খণ্ডন করে দ্বীনকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখবে। (মেশকাত- বাইহাকী)

অন্য এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. الحديث. (رواه البخاري في كتاب العلم- باب من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين)

অর্থাৎ, এই উম্মত (-এর এক জামাআত কেয়ামত পর্যন্ত) সর্বদা আল্লাহর দ্বীনের উপর (তথা হকের উপর) অটল থাকবে। (বোখারী শরীফ)

❑ মওদূদী সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গী

মওদূদী সাহেব "কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতেলাহেঁ" গ্রন্থে বলেছেন, "কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় এ শব্দগুলোর (ইলাহ, রব, দ্বীন ও ইবাদত) যে মৌল অর্থ প্রচলিত ছিল, পরবর্তী শতকে ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক একটি শব্দ তার সম্পূর্ণ ব্যাপকতা হারিয়ে একান্ত সীমিত বরং অস্পষ্ট অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে।" এর এক পৃষ্ঠা পর তিনি লিখেছেন, "এটা সত্য যে, কেবল এ চারটি মৌলিক পরিভাষার তাৎপর্যে আবরণ পড়ে যাওয়ার কারণেই কুরআনের তিন-চতুর্থাংশের চেয়েও বেশি শিক্ষা এবং তার সত্যিকার স্পিরিটই দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়।"[১]

❑ পর্যালোচনা

কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষার অর্থ যদি বিকৃত হয়ে যেয়ে থাকবে এবং তার কারণে কুরআনের তিন চতুর্থাংশেরও বেশি বরং মূল স্পিরিটই উধাও হয়ে গিয়ে থাকবে এবং মওদূদী সাহেব তা উদ্ধার করে থাকবেন, তাহলে বলতে হবে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রথম শতাব্দীর পর থেকে মওদূদী সাহেবের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ তেরশ বৎসরকাল যাবত কুরআন তার অর্থসহ সংরক্ষিত ছিল না। কুরআনের শাশ্বতের বিরুদ্ধে এর চেয়ে বড় আঘাত আর কী হতে পারে? অথচ আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَه لَحٰفِظُوْنَ.

অর্থাৎ, আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমি তার (শব্দ ও অর্থ উভয়টার) সংরক্ষক। (সূরা: ১৫-হিজ্‌র: ৯)

১. কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতেলাহেঁ, ৮-১০ পৃ. মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী, দিল্লী, ১৯৮৮ ইং ৮ম সংস্করণ। অনুবাদ গ্রন্থ: "কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা" ১২-১৩ পৃ. আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম প্রকাশ, জুন-২০০২।

মওদূদী সাহেবের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ তেরশ' বৎসরকাল যাবত কুরআনের তিন চতুর্থাংশের বেশি যদি কেউ বুঝে না থাকবেন অথচ আক্বাইদ, ফেকাহ ও হাদীছের কিতাবাদি সংকলনসহ ইসলামী দুনিয়ার যাবতীয় মৌলিক ও আনুষঙ্গিক কিতাবাদি প্রায় সবই এ যুগেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাহলে এসব কিতাবাদি ও তার লেখকগণ কুরআন তথা ইসলাম না বোঝার কারণে নির্ভরযোগ্যতা হারাবেন। এমতাবস্থায় দুনিয়াবাসী ইসলাম পাবে কোথায়? তার এ বক্তব্য একই সাথে কুরআন ও ইসলাম সংরক্ষিত না থাকাকে বোঝায়।[১]

এতক্ষণ ঈমান-আকীদার ক্ষেত্রে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে মওদূদী সাহেবের বিচ্যুত হওয়ার বিবরণ পেশ করা হল। মওদূদী সাহেব আমল এবং ইবাদত বন্দেগী প্রসঙ্গেও আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। নিম্নে তার বিবরণ পেশ করা হল।

(খ) আমল এবং ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে মওদূদী সাহেবের বিচ্যুতি

আমল এবং ইবাদত বন্দেগী প্রসঙ্গে মওদূদী সাহেবের আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর্যায়ে নিম্নে ৪টি বিষয় উল্লেখ করা হল।

(১) নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি মূল ইবাদত কি না-এ প্রসঙ্গ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট নামায রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি হল মৌলিক ইবাদত এবং এগুলো ইসলামের মৌলিক ও বুনিয়াদী বিষয়। ঈমানের পর এগুলো ইসলামের মুখ্য উদ্দেশ্য। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة والحج وصوم رمضان. (رواه البخاري و مسلم)

অর্থাৎ, পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে। তাহল - একথার স্বাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, আর নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা রাখা। (বোখারী ও মুসলিম)

এ হাদীছে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত-কে ইসলামের বুনিয়াদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কিন্তু মওদূদী সাহেবের মতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত- এগুলো মূল ইবাদত নয়, বরং এগুলো হল ট্রেনিং কোর্স। তার মতে এ ইবাদতগুলো ইসলামের মূল উদ্দেশ্য নয় বরং মূল উদ্দেশ্য হল ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা। তিনি "ইবাদত একটি টেনিং কোর্স" এই শিরোনামে বলেন,

---

১. কোন কোন সমালোচকের ভাষায় সর্ব যুগের সমস্ত উলামায়ে কেরামের বিপরীতে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা দেয়ার পথ খোলাসা করার জন্যই কি মওদূদী সাহেব সকলকে কুরআন তথা ইসলাম না বোঝার দলে ফেলতে এই অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিলেন?

বস্তুত ইসলামের নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতসমূহ এই উদ্দেশ্যে (জিহাদ ও ইসলামী হুকুমত কায়েম) প্রস্তুতির জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী, পুলিশ ও সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদেরকে সর্বপ্রথম এক বিশেষ ধরনের ট্রেনিং দিয়ে থাকে। সেই ট্রেনিংয়ে উপযুক্ত প্রমাণিত হলে পরে তাকে নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত করা হয়। ইসলামও তার কর্মচারীদেরকে সর্বপ্রথম এক বিশেষ পদ্ধতির ট্রেনিং দিতে চায়। তারপরই তাদেরকে জিহাদ ও ইসলামী হুকুমত কায়েম করার দায়িত্ব দেয়া হয়।[১]

তিনি অন্যত্র বলেন, মূলত মানুষের রোযা, নামায, হজ্জ, যাকাত, যিকির, তাসবীহ্কে ঐ বড় ইবাদতের জন্য প্রস্তুত করার ট্রেনিং কোর্স (Training Courses)।[২]

❑ খণ্ডন

মওদূদী সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি মূল ইবাদত নয় এবং এগুলো ইসলামের মূল উদ্দেশ্য নয় বরং এগুলো হলো জিহাদ ও ইসলামী হুকুমতের জন্য ট্রেনিং কোর্স মাত্র। মূল উদ্দেশ্য হল হুকুমত। অথচ কুরআনে কারীমের বর্ণনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে, হুকুমত বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হলো নামায, যাকাত আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার প্রভৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার করবে। (সূরা: ২২-হজ্জ: ৪১)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে নামায, যাকাত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। অতএব মূল উদ্দেশ্য হল নামায, যাকাত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করা এবং রাষ্ট্র তার জন্য সহায়ক। অথচ মওদূদী সাহেব কুরআনের বক্তব্যের সম্পূর্ণ উল্টো বলেছেন যে, নামায, রোযা, প্রভৃতি হবে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, মূল উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এটাকে ইসলামের এই মহান ইবাদতগুলোর প্রতি গুরুত্বকে হ্রাস করার অপচেষ্টা এবং এই মহান ইবাদতগুলোর প্রতি অবমাননা হিসাবে বিবেচনা করা হলে তা অতিরঞ্জিত হবে না। এটা ইসলামের মূল স্পিরিটকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা। এটা অবশ্যই ইসলামের মৌলিকতার বিকৃতি সাধন।

---

১. (خطبات : صفحہ/۳۱۵، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی ۱۹۸۰)। অনুবাদ গ্রন্থ: ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, ২৭৩ পৃ., আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ১৯৮৪ ইং ৪র্থ সংস্করণ। উল্লেখ্য, এই অনুবাদ গ্রন্থে عبادات -ایک تربیتی کورس ہیں (ইবাদত একটি ট্রেনিং/ প্রশিক্ষণ কোর্স) মূল কিতাবে উল্লেখিত এই শিরোনামটি ফেলে দেয়া হয়েছে।

২. تفہیمات، حصہ اول ، صفحہ/۱۹۶۸،۶۹، اسلامک پبلیکشنز لمیٹیڈ، لاہور (پاکستان)

(২) নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা প্রসঙ্গ

মওদূদী সাহেবের মতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত যেহেতু মূল ইবাদত এবং মূল উদ্দেশ্য নয়, বরং মূল উদ্দেশ্য হল জিহাদ ও ইসলামী হুকুমত কায়েম করা, তাই আল্লাহর আইন তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যতিরেকে নামায রোযা, হজ্জ, যাকাত তেলাওয়াত ইত্যাদি নিরর্থক এবং ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে এরূপ ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ তার দৃষ্টিতে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র। অথচ আল্লাহ তাআলার কাছে ইবাদতকারী অত্যন্ত ভালবাসার পাত্র। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা একটা দায়িত্ব, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এগুলোও সব সতন্ত্র দায়িত্ব। একটা দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করলে অন্যান্য সব দায়িত্ব পালন নিরর্থক হতে পারে না, তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পাত্র হতে পারে না। ইবাদত ও ইবাদতকারীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে পরিণত করা কুফ্রীর নামান্তর। অথচ মওদূদী সাহেব এরূপই করেছেন। তিনি বলেন,

যারা রাত্র দিন আল্লাহ্র আইন ভঙ্গ করে, কাফের মুশরিকদের আদেশ অনুযায়ী কাজ করে এবং নিজেদের বাস্তব কর্ম জীবনে আল্লাহ্র বিধানের কোনও পরওয়া করে না, তাদের নামায, রোযা, তাসবীহ পাঠ, কুরআন তেলাওয়াত, হজ্জ, যাকাত, ইত্যাদিকে আপনি ইবাদত বলিয়া মনে করেন। এ ভুল ধারণারও মূল কারণ "ইবাদত" শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানা। তিনি বলেন, "আর একজন চাকরের কথা ধরুন। সে রাত্র-দিন কেবল পরের কাজ করে, অন্যের আদেশ শুনে এবং পালন করে, অন্যের আইন মানিয়া চলে এবং তাহার প্রকৃত মনিবের যত আদেশ ও ফরমানই হউক না কেন, তাহার বিরোধিতা করে। কিন্তু 'সালাম' দেওয়ার সময় সে তাহার প্রকৃত মনিবের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং মুখে কেবল তাহার নাম জপিতে থাকে। আপনাদের কাহারো কোন চাকর এইরূপ করিলে আপনারা কি করিবেন? তাহার 'সালাম' কি তাহার মুখের উপর নিক্ষেপ করিবেন না? মুখে মুখে সে যখন আপনাকে মনিব আর মালিক বলিয়া ডাকিবে, তখন আপনি কি তাহাকে এই কথা বলিবেন না যে, তুই ডাহা মিথ্যাবাদী ও বেঈমান; তুই আমার বেতন খাইয়া অন্যের তাবেদারী করিস, মুখে আমাকে মনিব বলিয়া ডাকিস, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেবল অন্যেরই কাজ করিয়া বেড়াস? ইহা নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধির কথা, ইহা কাহারো বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্যের কথা! যাহারা রাত্র-দিন আল্লাহ্র আইন ভঙ্গ করে, কাফের ও মুশরিকদের আদেশ অনুযায়ী কাজ করে এবং নিজেদের বাস্তব কর্মজীবনে আল্লাহ্র বিধানের কোন পরওয়া করে না; তাহাদের নামায, রোযা, তাসবীহ পাঠ, কোরআন তেলাওয়াত, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিকে আপনি ইবাদত বলিয়া মনে করেন। এই ভুল ধারণারও মূল কারণ ইবাদত শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানা।

আর একটি চাকরের উদাহরণ নিন। মনিব তাহার চাকরদের জন্য যে ধরনের পোশাক নির্দিষ্ট করিয়াছেন, মাপ জোখ ঠিক রাখিয়া সে ঠিক সেই ধরনের পোশাক পরিধান করে, বড় আদব ও যত্ন সহকারে সে মনিবের সম্মুখে হাজির হয়, প্রত্যেকটি

হুকুম শুনা মাত্রই মাথা নত করিয়া শিরোধার্য করিয়া লয় যেন তাহার তুলনায় বেশি অনুগত চাকর আর কেহই নাই। সালাম দেওয়ার সময় সে একেবারে সকলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় এবং মনিবের নাম জপিবার ব্যাপারে সমস্ত চাকরের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিষ্ঠা প্রমাণ করে, কিন্তু অন্যদিকে এই ব্যক্তি মনিবের দুশমন এবং বিদ্রোহীদের খেদমত করে, মনিবের বিরুদ্ধে তাহাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রে সে অংশগ্রহণ করে এবং মনিবের নাম পর্যন্ত দুনিয়া হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা যে চেষ্টাই করে, এই হতভাগা তাহার সহযোগিতা করে; রাত্রের অন্ধকারে সে মনিবের ঘরে সিঁদ কাটে এবং ভোর হইলে বড় অনুগত চাকরটির ন্যায় হাত বাঁধিয়া মনিবের সম্মুখে হাজির হয়। এই চাকরটি সম্পর্কে আপনি কি বলিবেন? আপনি নিশ্চয়ই তাহাকে মুনাফিক, বিদ্রোহী ও নিমকহারাম প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতে একটুও কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু আল্লাহ্র কোন চাকর যখন এই ধরনের হাস্যকর আচরণ করিতে থাকে তখন তাহাকে 'আপনারা কি বলিতে থাকেন? তখন আপনারা কাহাকেও 'পীর সাহেব' কাহাকেও 'হযরত মাওলানা', কাহাকেও 'বড় কামেল', 'পরহেযগার' প্রভৃতি নামে ভূষিত করেন। ইহার কারণ এই যে, আপনারা তাহাদের মুখে মাপ মত লম্বা দাঁড়ি দেখিয়া, তাহাদের পায়জামা পায়ের গিরার দুই ইঞ্চি উপরে দেখিয়া, তাহাদের কপালে নামাযের কালো দাগ দেখিয়া এবং তাহাদের লম্বা লম্বা নামায ও মোটা মোটা দানার তসবীহ দেখিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন; ইহাদেরকেও বড় দ্বীনদার ও ইবাদতকারী বলিয়া মনে করেন। এই ভুল শুধু এই জন্য যে, 'ইবাদত' ও দ্বীনদারীর অর্থই আপনারা ভুল বুঝিয়া রাখিয়াছেন।

আপনি হয়তো মনে করেন, হাত বাঁধিয়া কেবলামুখী হইয়া দাঁড়ানো, হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া মাথা নত করা, মাটিতে মাথা রাখিয়া সিজদা করা এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করা- শুধু এই কয়টি কাজই প্রকৃত ইবাদত। হয়ত আপনি মনে করেন, 'রমযানের প্রথম দিন হইতে শাওয়ালের চন্দ্রোদয় পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার বন্ধ রাখার নাম ইবাদত। আপনি হয়তো ইহাও মনে করেন যে, কোরআন শরীফের কয়েক রুকু' পাঠ করার নামই ইবাদত, আপনি বুঝিয়া থাকেন মক্কা শরীফে গিয়া কা'বা ঘরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করার নামই ইবাদত। মোটকথা, এই ধরনের বাহ্যিক রূপকে আপনারা 'ইবাদত' মনে করিয়া লইয়াছেন এবং এই ধরনের বাহ্যিক রূপ বজায় রাখিয়া উপরোক্ত কাজগুলি কেউ সমাধা করিলেই আপনারা মনে করেন যে, ইবাদত সুসম্পন্ন করিয়াছে এবং এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়াছে। তাই জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে সে একেবারে আযাদ-নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইতে পারে।[১]

---

১. خطبات : صفحہ/۱۳۵-۱۳۶، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی ۱۹۸۰। অনুবাদটুকু অনুবাদ গ্রন্থ: ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, (১০৪-১০৫, ৪র্থ সংস্করণ, জুন ১৯৮৪) থেকে নেয়া হয়েছে।

(৩) ইসলামী সংস্কৃতি তথা ইসলামী লেবাস-পোশাক ও দাঁড়ি প্রসঙ্গ

ইসলামী লেবাস-পোশাক, দাড়ি প্রভৃতি ধর্মীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এগুলো ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও প্রতীক বা শি'আর (Uniform/شعار)। ইসলামে ধর্মীয় শি'আর বা বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব এতখানি যে, ভিন্ন ধর্মের শি'আর বা বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য গ্রহণকারী ব্যক্তি সম্বন্ধে হাদীছে এসেছে সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। ইরশাদ হয়েছে,

من تشبه بقوم فهو منهم. (قال العجلوني : رواه أحمد وأبو داود الطبراني في الكبير عن ابن عمر رفعه. وفي سنده ضعف كما في اللآلي والمقاصد، لكن قال العراقي : سنده صحيح، وله شاهد عند البزار عن حذيفة وأبو هريرة. كذا في كشف الخفاء و مزيل الإلباس)

অর্থাৎ, হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। (মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ ও তাবারানী)

অথচ মওদূদী সাহেব ইসলামী লেবাস-পোশাক সম্বন্ধে কীভাবে উপহাস করেছেন তার কিছু বর্ণনা একটু পূর্বেই শুনলেন, আর কিছু বর্ণনা ইমাম মাহ্দী সম্পর্কিত আলোচ-না প্রসঙ্গে পেশ করা হয়েছে। এছাড়াও তার লেখার বহু স্থানে সুলাহা তথা বুযুর্গানে দ্বীনের লেবাস-পোশাক নিয়ে বিদ্রূপাত্মক ভাষার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। অথচ হাদীছে জামা নেসফে সাক তথা পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে। অতএব এটা সুন্নাত। আবার বিধর্মীদের লেবাস-পোশাকের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ থেকেও বেঁচে থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এসবের ভিত্তিতে বুযুর্গানে দ্বীনের যে লেবাস-পোশাকের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে সমস্ত মুসলিম উম্মাহ সেটাকে সম্মানের দৃষ্টিতে স্বশ্রদ্ধ মূল্যায়ন করে আসছেন।

দাড়ি রাখা মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শি'আর (Uniform/شعار) বা প্রতীক। চার মাযহাবের সর্বসম্মত মত অনুসারে দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এবং এটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণযোগ্য সুন্নাত তথা আদর্শ। অর্থাৎ, দাড়ি রাখা সুন্নাতে হুদা।

দাড়ি সেভ করা কিংবা মুঠের ভিতরে দাড়ি কাটা, খাটো করা সম্পূর্ণ হারাম। এক হাদীছে হযরত ইব্‌নে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. (رواه البخاري في كتاب اللباس– باب تقليم الأظفار)

অর্থাৎ, মুশরিকদের বিরোধিতা কর- মোচ খাটো কর, দাড়ি লম্বা কর। (বোখারী)

হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মোচ খাটো করা এবং দাড়ি লম্বা করা ইসলামের স্বভাব ও

বৈশিষ্ট্য। যেহেতু অগ্নিপূজক মাজূসীরা মোচ লম্বা করে এবং দাড়ি খাটো করে, অতএব তোমরা তাদের বিরোধিতা করে মোচ খাটো কর, দাড়ি লম্বা কর। (সহীহ ইবনে হিব্বান)

তবে হ্যাঁ, সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে এক মুঠের অতিরিক্ত দাড়ি খাটো করার অনুমতি বুঝে আসে। উপরোল্লিখিত বোখারী শরীফের রেওয়ায়েতে (كتاب اللباس – باب تقليم الاظفار) হযরত ইব্‌নে ওমর (রা.)-এর আমল বর্ণিত আছে যে, তিনি হজ্জ বা ওমরা পালন করার সময় এক মুঠের অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলতেন। হযরত ইব্‌নে ওমর (রা.) ছাড়া হযরত ওমর (রা.) ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও এ ধরনের আমল বর্ণিত আছে। (ফাতহুল বারী)

অথচ মওদূদী সাহেবের মতে দাড়ি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতে হুদা নয় অর্থাৎ, এমন কোন সুন্নাত বা আদর্শ নয় যা অনুসরণ করা জরূরী। তদুপরি তার মতে দাড়ি যে কোন পরিমাণ রাখলেই চলে।

তিনি বলেন, "রাসূল যতোবড় দাড়ি রেখেছেন, ততো লম্বা দাড়ি রাখাই হলো সুন্নাতে রাসূল বা উসওয়ায়ে রাসূল– আপনার এ ধারণার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আপনি রাসূলের অভ্যাসকে হুবহু রাসূলের ঐ সুন্নাতের মর্যাদাসম্পন্ন মনে করেছেন যা জারি ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য নবী পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রেরিত হয়েছিলেন।"[১]

তিনি আরও বলেন, আমার মতে কারো দাড়ি ছোট কিংবা বড় হবার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সেই মূল জিনিস এটা নয় যা মানুষের ঈমান বেশী বা কম হবার প্রমাণবহ। আমার আশংকা হয়, ঈমানের কমতিকে এখনো যেভাবে কোন কোন বাহ্যিক জিনিসের আধিক্য দ্বারা পূর্ণ করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, জামায়াতে ইসলামীর কিছু লোকও সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে না পড়ে। কোন ব্যক্তির আনুগত্য ও প্রাণান্তকর সংগ্রাম যদি আল্লাহর পথে হয় 'দীর্ঘ', তবে তেমন কোন ক্ষতি হয়ে যাবে না, যদি তার দাড়ি হয় হ্রস্ব। কিন্তু যদি তার আনুগত্য ও প্রাণান্তকর সংগ্রামই হয় হ্রস্ব, তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে, দীর্ঘ দাড়ি তার কোন কল্যাণেই আসবে না। বরঞ্চ এটাও অসম্ভব নয় যে, খোদার দরবারে তার বিরুদ্ধে ধোঁকাবাজীর মোকাদ্দমা দায়ের হয়ে যাবে।[২]

তিনি আরও বলেন, শরীআত প্রণেতা দাড়ির ব্যাপারে কোন সীমারেখা নির্ধারণ করে দেননি। আলিমগণ যে সীমা নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন, তা একটি গবেষণালব্ধ জিনিস মাত্র।[৩] (অথচ এটা সহীহ হাদীছ বিরুদ্ধ কথা।)

(৪) তাসাওউফ ও পীর আউলিয়া প্রসঙ্গ

হক্কানী উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে নামায, রোযা প্রভৃতি শরীআতের জাহিরী বিধি- বিধানের উপর আমল করা যেমন জরূরী, তদ্রূপ এখলাস, তাকওয়া, ছবর,

১. رسائل ومسائل ١٢١-١٢٢، ١٠٧-١٠٨ অনুবাদ গ্রন্থঃ রাসায়েল ও মাসায়েল, আব্দুস শহীদ নাসিম অনূদীত, ১ম খণ্ড, ১৮৪ পৃ. শতাব্দি প্রকাশনী, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ-২০০২।
২. رسائل ومسائل ١٢١-١٢٢، ١٠٧-١٠٨ অনুবাদ গ্রন্থ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

শোকর প্রভৃতি কলবের গুণাবলী অর্জন এবং রিয়া, তাকাব্বুর, হাছাদ প্রভৃতি অন্তরের ব্যধি দূর করা তথা শরীআতের বাতিনী বিধানাবলীর উপর আমল করাও জরুরী ও ওয়াজিব। এই বাতিনী বিধানাবলীর উপর আমল করাকে বলা হয় তায্কিয়া বা আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধির এই সাধনাকে আধ্যাত্মিক সাধনাও বলা হয়। আর এই শাস্ত্রকে বলা হয় তাসাওউফ।

কুরআনে কারীমে আত্মশুদ্ধির মৌলিকতার প্রতি ইংগিত করে এটাকে রসূল (সা.)-এর মূল দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে,

وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ.

অর্থাৎ, সে (রসূল) তাদেরকে শিক্ষা দিবে কিতাব ও হেকমত আর তাদের তায্কিয়া বা আত্মশুদ্ধি করবে। (সূরা: ২-বাকারা: ১২৯)

প্রসিদ্ধ হাদীছে জিব্রীলে ইহ্ছান তথা তাসাওউফের বিষয়ে ইরশাদ হয়েছে,

ما الإحسان؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

অর্থাৎ, (জিব্রাঈল [আ.]) জিজ্ঞাসা করলেন ইহ্ছান কী? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিলেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তো তোমাকে দেখছেন। (বোখারী ও মুসলিম)

আহ্লে হক কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত تزكيه এবং উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত احسان-এর ব্যাখ্যার আলোকে তাসাওউফকে জরুরী মনে করেন। তাদের মতে চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া ও সোহরাওয়ার্দিয়া ইত্যাদি তাসাওউফের এই সিলসিলাসমূহ হক্ব এবং এসব সিলসিলার পীর মুরিদী দ্বারা দ্বীন ও মুসলিম উম্মাহ্র প্রভূত খেদমত সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

কিন্তু মওদূদী সাহেবের মতে তাসাওউফের প্রচলিত পীর-মুরিদী তরীকা এক অত্যন্ত ক্ষতিকর বিষয় এবং এ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। তিনি এ ব্যাপারে মুজাদ্দিদে আলফে সানী ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর পর্যন্ত সমালোচনা করেছেন। যদিও তিনি মূল তাসাওউফ বা ইহ্সানকে অস্বীকার করেন না বলে দাবী করেছেন, কিন্তু চিরাচরিত ও সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতি ও পীর মুরীদির প্রচলিত তরীকার এবং সর্বজন স্বীকৃত পীর-মাশায়েখগণের যেভাবে ঢালাও সমালোচনা করেছেন তাতে তাসাওউফের স্বীকৃত অংশ বলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। এরূপ স্বীকৃতি বাস্তবে অস্বীকৃতিরই নামান্তর এবং বাস্তবেও তাই মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী জামাত শিবিরের লোকজন তাসাওউফের সাথে কোনোরূপ সংশ্লিষ্টতা রাখেন না।[১]

এতক্ষণ আমল এবং ইবাদত-বন্দেগী প্রসঙ্গে মওদূদী সাহেবের আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে বিচ্যুত হওয়ার বিবরণ পেশ করা হল। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞা-নের উৎস কুরআন হাদীছ এবং তাফসীর ও ফেকাহ শাস্ত্র সম্পর্কিত ধারণা

১. দ্র: তাজদীদ ও এহ্ইয়ায়ে দ্বীন; অনুবাদ গ্রন্থ: ইসলামী রেনেসা আন্দোলন

এবং কুরআন-হাদীছ থেকে জ্ঞান আহরণের পদ্ধতির ক্ষেত্রেও তিনি আহ্লে হকের গৃহীত ও অনুসৃত নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

(গ) ইসলামী জ্ঞানের উৎস কুরআন, হাদীছ, তাফসীর ও ফেকাহশাস্ত্র প্রসঙ্গে মওদূদী সাহেবের বিচ্যুতি

এ প্রসঙ্গে নিম্নে ৫টি বিষয় তুলে ধরা হল।

(১) তাফসীর প্রসঙ্গ

আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট কুরআনে কারীমের তাফসীর সেটাই গ্রহণযোগ্য যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন ও আসলাফ থেকে সনদ পরম্পরায় বর্ণিত বা তার আলোকে কৃত হবে। এর বাইরে কারও নিজস্ব মস্তিষ্ক প্রসূত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এটা "তাফসীর বির-রায়" (মনগড়া তাফসীর) যা সম্পূর্ণ হারাম। (আল-ইত্কান-আল্লামা সুয়ূতী [রহ.], তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১ম খণ্ড)

কিন্তু মওদূদী সাহেব তাঁর স্বরচিত "তানকীহাত" গ্রন্থে লিখেছেন, কুরআন ও সুন্নাতে রাসূল (হাদীছ)-এর শিক্ষা সবচেয়ে অগ্রগণ্য তবে তা তাফসীর ও হাদীছের পুরাতন ভাণ্ডার থেকে নয়। ... পুরাতন কিতাব কাজে আসবে না।[১]

তিনি আরও বলেছেন, কুরআন (বোঝা)-এর জন্য কোন তাফসীর গ্রন্থের প্রয়োজন নেই। একজন উচুঁ স্তরের প্রফেসরই যথেষ্ট।"[২] এভাবে তিনি কুরআনের তাফ্সীরের ক্ষেত্রে এবং হাদীছের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আসলাফ ও পূর্বসূরী মনীষী তথা রিজালুল্লাহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। আর রিজালুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া গোমরাহীর সোপানে পা রাখা। এ সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

❑ **খণ্ডন**

প্রত্যেকের নিজস্ব মস্তিস্কপ্রসূত ব্যাখ্যাই যদি তাফসীর হয়, তাহলে প্রকৃত তাফসীর- আল্লাহ ও রসূলের উদ্দিষ্ট ব্যাখ্যা কোন্টি হবে? নিজস্ব বুঝ এবং নিজস্ব মস্তিস্কপ্রসূত ব্যাখ্যা পরিবেশন করার কারণেই মওদূদী সাহেব কৃত তাফহীমুল কুরআন একটা মনগড়া তাফসীর গ্রন্থ বৈ আর কিছু নয়।

(২) হাদীছ প্রসঙ্গ

হক্কানী উলামায়ে কেরামের নিকট হাদীছ বিশুদ্ধ হিসাবে গৃহীত হওয়ার জন্য মুহাদ্দিছীন বা হাদীছ বিশারদদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত কথা। বর্ণনাসূত্র বা সনদের ভিত্তিতে মুহাদ্দিছগণ হাদীছের শুদ্ধা-শুদ্ধি নির্ণয় করে গেছেন। আটা থেকে পশম আলাদা করার মত ইলমে হাদীছের ইমামগণ সহীহ, মওযূ' ,শক্তিশালী ও দুর্বল বর্ণনাগুলো সব চিহ্নিত

১. تنقيحات صفحه/١٤٨ مركزى مكتبه اسلامى دهلى، ١٩٩١
২. أيضا صفحه/٢٣٨

করে বড় বড় গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এ ব্যাপারে আর নতুন করে কারও কিছু বলার তেমন প্রয়োজন নেই। বর্ণনাসূত্র বা সনদের ভিত্তিকে বাদ দিয়ে শুধু নিজস্ব রুচি, বুঝ এবং উপলব্ধির দ্বারা হাদীছের শুদ্ধা-শুদ্ধি নির্ণিত করা যায় না। (উসূলে হাদীছের কিতাব-সমূহ দ্রঃ)

কিন্তু মওদূদী সাহেব বলেছেন, মুহাদ্দিছীনে কেরাম যে বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা স্বীকৃত। এও স্বীকৃত যে, তাঁরা হাদীছ বিচারের জন্য যে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তা প্রথম যুগের হাদীছ ও আছারের সত্যতা নির্ধারণের ব্যাপারে খুবই ফলপ্রসূ। এ ব্যাপারে কোন কথা নেই। বরং তাঁদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা কতখানি সঙ্গত, কথা কেবল এ বিষয়টি নিয়েই। কারণ তাঁরা তো মানুষই ছিলেন। মানবীয় জ্ঞানের জন্য আল্লাহ্ যে সীমারেখা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তা অতিক্রম করতে তাঁরা সমর্থ ছিলেন না। মানবীয় কাজকর্মে স্বভাবতই যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায়, তা থেকে তাঁদের কাজও মুক্ত ছিল না। তাহলে তাঁরা যাকেই সহীহ আখ্যা দিয়েছেন, তা বাস্তবেও সহীহ হবে একথা কী করে বলা যায়? বস্তুত কোন জিনিসের নির্ভুল বা সহীহ হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের নিজেদেরও পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল না। তাঁরাও বড় জোর এটুকুই বলতেন যে, এ হাদীছের বিশুদ্ধতা সংক্রান্ত অনুমানটা খুব প্রবল।[১]

মওদূদী সাহেব আরও বলেছেন, "এসব দৃষ্টান্ত পেশ করার মূলে আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, রাবীদের জীবনী সংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞান-তথ্যই ভ্রান্ত। বরং আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এটুকুই ব্যক্ত করা যে, যারা রাবীদের যাচাই-বিচার ও সমালোচনা করেছেন, তাঁরাও তো মানুষই ছিলেন। তাদের সঙ্গেও মানবীয় দুর্বলতার প্রশ্ন জড়িত ছিলো। এর কি নিশ্চয়তা রয়েছে যে, তারা যাঁকে ছিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন, তিনি সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বস্ত এবং তার বর্ণিত সমস্ত রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রেও তিনি নির্ভরযোগ্য, আর যাকে অবিশ্বস্ত বলেছেন, তিনি সুনিশ্চিতভাবে অবিশ্বস্ত এবং তার সমস্ত বর্ণনাই বিশ্বাসের অনুপযোগী। তারপর এক একজন রাবীর স্মরণশক্তি, তাঁর নেক নিয়ত, সিহ্হাতে যাব্ত বা সংরক্ষণ-বিশুদ্ধতা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভুল জ্ঞান লাভ করা তো আরো কঠিন ব্যাপার!"[২]

❑ পর্যালোচনা ও খণ্ডন

মওদূদী সাহেব হাদীছের শুদ্ধা-শুদ্ধি নির্ণয়ের ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণের মতামতের উপর সম্পূর্ণ আস্থা করা যাবে না- এই মত পোষণ করেছেন। যুক্তি হিসাবে তিনি মূলত চারটা কথার অবতারণা করেছেন।

(১) মুহাদ্দিছগণ মানুষ ছিলেন, তারা মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে ছিলেন না। নফ্স তাদের প্রত্যেকের সংগেই লেগেছিল। অতএব তাদের সিদ্ধান্ত দুর্বলতার উর্ধ্বে নয়।

---

১. تفہیمات، حصہ اول، صفحہ/۳۵۲، اسلامک پبلیکشنز لمیٹیڈ، لاہور (پاکستان) ۱۹۷۸ অনুবাদ গ্রন্থ: নির্বাচিত রচনাবলী ১. (দ্বিতীয় ভাগ) ১৮৭ পৃ.।

২. تفہیمات، حصہ اول، صفحہ/۳۵۹، اسلامک پبلیکشنز لمیٹیڈ، لاہور ۱۹۷۸ অনুবাদ গ্রন্থ: প্রাগুক্ত, ১৯০-১৯১।

আর নফ্স যখন তাদের সঙ্গে লেগেই আছে তখন তাদের সিদ্ধান্ত হবে নফ্স-তাড়িত। কাজেই তাদের সিদ্ধান্ত আস্থাযোগ্য নয়।

এখন পাঠকগণই বলুন! এ যুক্তিতে মুহাদ্দিছগণের সিদ্ধান্ত অনাস্থাযোগ্য হয়ে গেলে মওদূদী সাহেবের সিদ্ধান্ত কীকরে আস্থাযোগ্য হবে? তিনি কি মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে ছিলেন? তিনি কি নফ্স থেকে পূঁত-পবিত্র ছিলেন? কিংবা অন্য কেউ যারা এ যুগে হাদীছের বাছ-বিচার করবেন তারা কি ফেরেশ্তা হবেন? উক্ত যুক্তি মেনে নিলে একমাত্র ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কারও সিদ্ধান্তই তো মেনে নেয়া যাবে না। আর ফেরেশ্তাদের সিদ্ধান্ত যখন জানা সম্ভব নয় তখন সব হাদীছই কি তাহলে অশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা হেতু পরিত্যাগ করতে হবে। এটা কি পুরো হাদীছ-ভাণ্ডারের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টির পদক্ষেপ নয়?

(২) তার যুক্তিগুলোর দ্বিতীয় সারমর্ম এই যে, কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে ভাল বা মন্দ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছগণের ব্যক্তিগত ঝোঁক-প্রবণতা প্রভাবশীল থাকতে পারে। অতএব তাদের সিদ্ধান্তকে নিরপেক্ষ বলে মেনে নেয়া যাবে না বা তার উপর আস্থা স্থাপন করা যাবে না। মওদূদী সাহেবের এ বক্তব্য মেনে নিলেও মুহাদ্দিছগণের উপর থেকে আস্থা উঠে যাবে এবং গোটা হাদীছ-ভাণ্ডার থেকে আস্থা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সমষ্টিগতভাবে মুহাদ্দিছদের সিদ্ধান্তকে যদি ঝোঁক-প্রবণতামুক্ত বা নিরপেক্ষ বলে মেনে নেয়া না যায়, তাহলে মওদূদী সাহেব বা সম্প্রতিককালের কোন ব্যক্তি বিশেষের সিদ্ধান্তকে সর্ব প্রকার ঝোঁক-প্রবণতামুক্ত এবং নিরপেক্ষ বলে কীভাবে মেনে নেয়া যাবে?

(৩) মওদূদী সাহেব তৃতীয় যে যুক্তির অবতারণা করেছেন তা হল- মুহাদ্দিছগণ যেসব হাদীছকে সহীহ বা শুদ্ধ বলেছেন, সে ব্যাপারে তাদের নিজেদেরও পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল না। তারাও বড় জোর সেটাকে একটা প্রবল অনুমান-ভিত্তিক মনে করতেন। সেটাকে তারাও নিশ্চিত মনে করতেন না। কাজেই আমরা কীভাবে সেটাকে নিশ্চিত বলে মেনে নিতে পারি? সেটাকে নিশ্চিত বলে মেনে নেয়া যায় না।

প্রবল ধারণার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত যদি আস্থাযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে শরীআতের বহু বিধি-বিধানই গ্রহণযোগ্যতা হারাবে। শরীআতের বহু বিধানের ভিত্তিই এই প্রবল ধারণা। বিবাহ-শাদী, তালাক, এমনকি হদ্দ-কেসাস ইত্যাদি বিষয়ক বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত সবই প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। সাক্ষীগণ সত্য সাক্ষ্য দিয়েছেন এরূপ পুরোপুরি নিশ্চয়তা লাভ করা সম্ভব নয়। প্রবল ধারণার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত যদি প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহলে পৃথিবীর কোর্ট-কাচারী, আদালত কোন কিছুই চলতে পারবে না। আশ্চর্যের বিষয়, মওদূদী সাহেব এমন একটা ঠুনকো যুক্তির অবতারণা করে মুহাদ্দিছগণের সিদ্ধান্তাবলীর প্রতি অনাস্থা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালালেন?[১]

---

১. কোন কোন সুক্ষ্মদর্শী সমালোচক বলেছেন, "বস্তুত মুহাদ্দিছগণের সিদ্ধান্তের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি করে মওদূদী সাহেব তার নিজস্ব মতামত চালিয়ে দেয়ার পথ খোলাসা করে নিয়েছেন। যাতে কোন সহীহ হাদীছ তার নিজস্ব মতামতের বিরুদ্ধে গেলে সহজেই (পরবর্তি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(৪) মওদূদী সাহেবের বক্তব্য থেকে চতুর্থ যে কথাটা বের হয় তা হল হাদীছের শুদ্ধা-শুদ্ধি নির্ণয়ের মূল মাপকাঠি সনদ নয় বরং নিজস্ব রুচি, বুঝ ও উপলব্ধিই হল প্রকৃত মানদণ্ড।

যদি মওদূদী সাহেবের এ কথা মেনে নেয়া হয়, তাহলে যেকোনো বাতিলপন্থীই তার মতাদর্শের বিপরীত বিশুদ্ধ হাদীছগুলোকে অশুদ্ধ বলে উড়িয়ে দিতে পারবে এবং যেকোনো মতলববাজ তার মতলবের পক্ষে অশুদ্ধ হাদীছকেও শুদ্ধ বলে দলীল দাঁড় করাতে পারবে। আর এভাবে পুরো হাদীছের ভাণ্ডারই খেয়াল-খুশির হাতিয়ারে পরিণত হবে (নাউযুবিল্লাহ্)। তাই তো প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুবারক বলেছেন,

الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ماشاء. (مقدمۂ مسلم)

অর্থাৎ, সনদ বা বর্ণনাসূত্র দ্বীনের অংশ। যদি সনদের নিয়ম না রাখা হত, তাহলে যার যা ইচ্ছা তা বলে যেত।

(৩) ফেকাহ, তাক্‌লীদ ও ইজতিহাদ প্রসঙ্গ

ফেকাহ, তাক্‌লীদ এবং ইজতিহাদ সম্পর্কেও মওদূদী সাহেব অত্যন্ত বল্গাহীন নীতি গ্রহণ করেছেন। তিনি জমহুরে উম্মতের বিপরীত বলেন, "আমার মতে দ্বীনী ইল্‌মের ক্ষেত্রে বুৎপত্তি রাখেন এমন ব্যক্তির জন্যে তাক্‌লীদ নাজায়েয এবং গুনাহ, বরঞ্চ তার চাইতেও সাংঘাতিক।[১] এছাড়াও তিনি তার লেখার বহু স্থানে মুক্ত বুদ্ধি প্রয়োগ এবং মুক্ত মনে কুরআন অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রতি যেভাবে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তাতে তার মতবাদ অনুসারীগণ তাক্‌লীদ তথা ইমামগণের অনুসরণ করার ব্যাপারে অত্যন্ত বল্গাহীনতার শিকার হয়ে পড়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা অত্যন্ত বিপদজ-নক বিষয়। যদিও তিনি সাধারণ লোকেরা তাক্‌লীদ করতে পারে বলে মত দিয়েছেন, কিন্তু তার মতে আলেমদের পক্ষে তাক্‌লীদ করা নাজায়েয আবার তার দৃষ্টিতে আলেম হওয়ার জন্য নিয়মতান্ত্রিক কোন আলেমের কাছে পড়াশুনারও প্রয়োজন না থাকায় কার্যত সকলের জন্যই তাক্‌লীদমুক্ত হয়ে যাওয়ার অবকাশ বেরিয়ে এসেছে। আর বাস্তবেও তার অনুসারীবৃন্দের মধ্যে তাক্‌লীদ বিষয়ে এমন বল্গাহীনতাই লক্ষ করা যাচ্ছে। উম্মতের কেউ তাক্‌লীদের বিষয়ে এতখানি বল্গাহীন হওয়াকে জায়েয মনে করেন না।

বিঃ দ্রঃ তাক্‌লীদ প্রসঙ্গে পরবর্তিতে দলীল-প্রমাণসহ একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ পেশ করা হয়েছে।

(পূর্ববর্তি পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা) তিনি সেটাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। কিংবা বলতে হবে, গোটা হাদীছ-ভাণ্ডারের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি করে তিনি ইসলামের একটি বুনিয়াদকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে ওরিয়েন্টালিষ্ট চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। তাই বুঝি তিনি এক দিকে মুহাদ্দিছগণের খেদমতকে স্বীকৃত আখ্যা দিয়েছেন, আবার তার প্রতি অনাস্থা সৃষ্টির জন্য এতসব কথার অবতারণা করেছেন। গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালা এই তো ওরিয়েন্টালিষ্টদের নীতি।"

১. রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ম খণ্ড, আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত, শতাব্দি প্রকাশনী, মার্চ ২০০২।

(৪) কুরআনের চারটি পরিভাষাসহ ইসলামের বহু মৌলিক পরিভাষার স্বরূপ বিকৃত করা প্রসঙ্গ

কুরআন নাযিল হওয়া থেকে সাহাবায়ে কেরাম তাবিঈন, তাবে তাবিঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ আজ পর্যন্ত সকলেই সব যুগে বলে আসছেন এবং বুঝে আসছেন যে, বিশেষ স্থানে বিশেষ কোন করীনা না থাকলে কুরআনের নিম্নোক্ত চারটি পরিভাষার অর্থ নিম্নরূপ:

(এক)" ইলাহ" অর্থ মা'বূদ। অথচ মওদূদী সাহেব বলছেন "ইলাহ" অর্থ শাসক। "আল্লাহ" অর্থও তাই।[১]

(দুই) "রব" অর্থ প্রতিপালক। অথচ মওদূদী সাহেব "রব"-এর অর্থও করেছেন প্রায় ইলাহ্ এর মত।

(তিন) "দ্বীন" অর্থ ধর্ম। অর্থাৎ, ঈমান আমল তথা নামায রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং ইহ্‌ছান তথা তাসাওউফ এই সবকিছুর সমন্বিত নাম হল দ্বীন তথা ধর্ম। যেমন: প্রসিদ্ধ হাদীছে জিব্রীলে হযরত জিব্রীল (আ.) ঈমান ইসলাম তথা নামায, রোযা, হজ্জ যাকাত এবং ইহ্‌ছান তথা তাসাওউফ সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর চলে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন যে,

أتاكم يعلمكم دينكم.

অর্থাৎ, "তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।" এতে করে বুঝা গেল ঈমান ও আমল তথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং ইহ্‌ছান তথা তাসাওউফ এই সবকিছুকে "দ্বীন" বলা হয়। অথচ মওদূদী সাহেব বলছেন, "দ্বীন" অর্থ রাষ্ট্র সরকার।[২] আর "শরীয়ত" অর্থ রাষ্ট্রের আইন-কানুন।[৩]

(চার) "ইবাদত" হল নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিধি-বিধান পালন করা। অথচ মওদূদী সাহেব বলছেন, "ইবাদত" অর্থ আইন মান্য করা।[৪]

এভাবে তিনি বহুসংখ্যক মৌলিক পরিভাষার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামের রাজনৈতিক করণ করেছেন।

মওদূদী সাহেব "কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতেলাহেঁ" গ্রন্থে বলেছেন,

"কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় এ শব্দগুলোর (ইলাহ্, রব দ্বীন, ইবাদত) যে মৌল অর্থ প্রচলিত ছিল, পরবর্তী শতকে ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক একটি শব্দ তার সম্পূর্ণ ব্যাপকতা হারিয়ে একান্ত সীমিত বরং অস্পষ্ট অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে।" এর এক পৃষ্ঠা পর তিনি লিখেছেন, "এটা সত্য যে, কেবল

---

১. خطبات. صفحہ/٣٢٠. مرکزی مکتبۂ اسلام دہلی ١٩٨٠
২. خطبات. صفحہ/٣٢٠. مرکزی مکتبۂ اسلامی دہلی ١٩٨٠
৩. أيضا صفحه/٣١٩
৪. প্রাগুক্ত।

এই চারটি মৌলিক পরিভাষার তাৎপর্য আবরণ পড়ে যাওয়ার কারণেই কুরআনের তিন চতুর্থাংশের চেয়েও বেশী শিক্ষা এবং তার সত্যিকার স্পিরিটই দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়।"[১]

❑ পর্যালোচনা ও খণ্ডন

কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষার অর্থ যদি বিকৃত হয়ে যেয়ে থাকবে এবং তার কারণে কুরআনের তিন চতুর্থাংশের বেশি বরং মূল স্পিরিটই উধাও হয়ে গিয়ে থাকবে এবং মওদূদী সাহেব তা উদ্ধার করে থাকবেন, তাহলে বলতে হবে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রথম শতাব্দীর পর কুরআন তথা ইসলাম সঠিকভাবে সংরক্ষিত ছিল না। (নাউযুবিল্লাহ্) কুরআনের শাশ্বত্যের বিরুদ্ধে এর চেয়ে বড় আঘাত আর কী হতে পারে? অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, নিশ্চয়ই আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমি তা সংরক্ষণ করব। (সূরা হিজ্‌র : ৯)

মওদূদী সাহেবের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ তেরশ' বৎসরের অধিককাল যাবত কুরআনের তিন চতর্থাংশেরও বেশি যদি কেউ বুঝে না থাকবেন অথচ আক্বাইদ, ফেকাহ ও হাদীছের কিতাবাদি সংকলনসহ ইসলামী দুনিয়ার যাবতীয় মৌলিক ও আনুষঙ্গিক কিতাবাদী প্রায় সবই এ যুগেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাহলে এসব কিতাবাদি ও তার লেখকগণ কুরআন তথা ইসলাম না বোঝার কারণে নির্ভযোগ্যতা হারাবেন। এমতাবস্থায় দুনিয়াবাসী ইসলাম পাবে কোথায়? একমাত্র মওদূদী সাহেবের নিকট?[২]

এভাবে তিনি ইবাদত-বন্দেগীর পরিচয় পাল্টে দিয়েছেন, দ্বীন ধর্ম এবং শরীআতের পরিচয় পাল্টে দিয়েছেন। এমনকি পাল্টে দিয়েছেন ইলাহ বা মা'বূদের পরিচয়ও। ইসলামের এসব প্রধান মৌলিক বিষয়াবলীর পরিচয় ও স্বরূপ পাল্টে দেয়ার ফলে মওদূদী সাহেবের পেশকৃত ইসলাম আর সেই ইসলাম থাকেনি, ইসলাম বলতে আজ পর্যন্ত যে ধর্মকে বুঝে আসা হচ্ছে। ইসলাম ও মুসলমানের পরিচয়ও পাল্টে গেছে। বস্তুত মওদূদী সাহেব একথাও স্পষ্টত বলেছেন যে, ইসলাম বলতে যে একটা ধর্ম এবং সেই ধর্মের অনুসারী জাতিকে মুসলমান বলা হয় এটা ঠিক নয়। তিনি বলেন,

"কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম কোন 'ধর্ম' বা মুসলমান কোন 'জাতির' নাম নয়। ইসলাম হচ্ছে মূলত এক বিপ্লবী মতবাদ ও মতাদর্শের নাম। গোটা দুনিয়ার সামাজিক ও সামগ্রিক ব্যবস্থাকে (Social Order) পরিবর্তিত করে নিজস্ব মতবাদ ও মতাদর্শের ভিত্তিতে তাকে পুনর্গঠিত করাই হচ্ছে এর লক্ষ্য। আর মুসলমান হচ্ছে এক আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দলের (International Revolutionary party) নাম। নিজের ইপ্সিত বিপ্লবী প্রোগ্রামকে বাস্তবায়িত করার জন্যেই ইসলাম একে সংগঠিত করেছে। আর এই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে গৃহীত বিপ্লবী চেষ্টা-সাধনা (Revolutionary Struggle) ও চূড়ান্ত শক্তি-প্রয়োগেরই নাম হচ্ছে 'জিহাদ'।[১]

---

১. ١٩٨٨،قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں، صفحہ/١٠-٨. مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی অনুবাদ গ্রন্থ: কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, ১২-১৩ পৃ., আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম প্রকাশ, জুন-২০০২।

২. কোন কোন সমালোচক বলেছেন, সর্ব যুগের সমস্ত উলামায়ে কেরামের বিপরীতে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা দেয়ার পথ খোলাসা করার জন্যই কি মওদূদী সাহেব সকলকে কুরআন তথা ইসলাম না বোঝার দলে ফেলতে এই অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিলেন?

চারটি মৌলিক পরিভাষার কথিত অর্থের স্বপক্ষে মওদূদী সাহেবের দলীল প্রসঙ্গ

মওদূদী সাহেব উপরোক্ত চারটি পরিভাষার যে অর্থ করেছেন তার দলীল প্রদান করেছেন কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা গ্রন্থে। কিন্তু আশ্চর্য লাগে তিনি তার বক্তব্যের স্বপক্ষে সরাসরি কোন দলীল প্রদান করতে সক্ষম না হয়ে এমন একটা পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন যা কোন উসূল বা মূলনীতির পর্যায়ে পড়ে না। যেমন তিনি 'ইলাহ'-এর অর্থ করেছেন শাসক। আর এই বক্তব্যের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে যে সব আয়াত উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি বিশেষ আয়াত হল–

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ .

অর্থাৎ, তাদের কি এমন শরীক রয়েছে, যারা তাদের জন্য এমন শরীআত নির্ধারণ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। (সূরা শুরা: ২১)

মওদূদী সাহেব বলেছেন এখানে 'ইলাহ' এ অর্থে যে, তার নির্দেশকে আইন হিসাবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, তার আদেশ-নিষেধ মেনে নেয়া হয়েছে, তার হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এ ধারণা করে নেয়া হয়েছে যে, তার নির্দেশ দেয়ার বা নিষেধ করার ইখতিয়ার রয়েছে, তার চেয়ে উর্ধ্বতন এমন কোন অথরিটি (Authority) নেই যার অনুমোদন গ্রহণ বা যার দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজন পড়তে পারে।[২]

এভাবে মওদূদী সাহেব বোঝাতে চেয়েছেন যে, 'ইলাহ' পরিভাষাটি শাসক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 'ইলাহ'-এর অর্থ "মা'বূদ" গ্রহণ করার পর আদেশ নিষেধ করার ও বিধান দেয়ার বিষয়কে মা'বূদের গুণ হিসাবে গ্রহণ করলে তাতে ইলাহের অর্থে কি কোন ত্রুটি এসে পড়ে? মা'বূদ অর্থ কি এমন কোন সত্তা যার কোন আদেশ নিষেধ করার বা বিধান দেয়ার ক্ষমতা নেই? ইলাহ পরিভাষাটি ব্যবহারের সঙ্গে আদেশ-নিষেধ প্রদান ও বিধান প্রদানজ্ঞাপক কোন বক্তব্য থাকলেই যদি 'ইলাহ'-এর অর্থ শাসক করতে হয়, তাহলে এক আয়াতে 'ইলাহ'-এর সঙ্গে সৃষ্টি বিষয়ক কথার উল্লেখ রয়েছে, সে হিসাবে 'ইলাহ'-এর অর্থ করতে হবে খালেক বা সৃষ্টিকর্তা। যেমন বলা হয়েছে,

وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـئًا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَ. الآية.

---

১. ١٩٧٢ تفہیمات، حصہ اول، صفحہ/٧٧، اسلامک پبلیکشنز لمیٹیڈ، لاہور (پاکستان) অনুবাদ গ্রন্থ: নির্বাচিত রচনাবলী ১ম (প্রথম ভাগ) আধুনিক প্রকাশনী, নভেম্বর-১৯৯১, পৃ. ৭৫।

২. কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, পৃ. ২১, ৮ম প্রকাশ জুন-২০০২, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন সব ইলাহদের গ্রহণ করেছে, যারা কোনো কিছু সৃষ্টি করে না বরং তারাই সৃষ্ট। (সূরা: ২৫-ফুরকান: ৩)

সামান্য চিন্তা করলেই বুঝা যায় এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে- যারা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না তারা মা'বূদ আখ্যায়িত হতে পারে না। অতএব 'ইলাহ'-এর অর্থ শাসক করা সংগত নয়, কারণ কোন শাসক সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। 'ইলাহ'-এর মধ্যে যে সৃষ্টি করার ক্ষমতাটি অন্তর্ভুক্ত, শাসকের মধ্যে সেটি অনুপস্থিত।

মওদূদী সাহেব এভাবে আরও বহু আয়াত উল্লেখ করার পর ইলাহ শব্দের সঙ্গে উল্লেখিত অভাব পূরণ, আশ্রয় দান, সাহায্য করা ইত্যাদি আল্লাহ্‌র বিভিন্ন গুণবাচক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেছেন, "ইলাহিয়াত ও ক্ষমতা অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত-ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্পিরিট ও তাৎপর্যের দিক থেকে উভয়ই এক জিনিস। যার ক্ষমতা নেই, সে ইলাহ হতে পারে না- ইলাহ হওয়া উচিত নয় তার। যার ক্ষমতা আছে, কেবল সে-ই ইলাহ হতে পারে।"[১]

কিন্তু আবারও বলতে হয় অভাব পূরণ, আশ্রয় দান, সাহায্য করা ইত্যাদি বিষয়কে মা'বূদের গুণ হিসাবে গ্রহণ করলে তাতে ইলাহের অর্থে কি কোন ত্রুটি এসে পড়ে? মা'বূদ অর্থ কি এমন কোন সত্তা, যার এগুলো করার কোন ক্ষমতা নেই?

মওদূদী সাহেব "রব" শব্দের অর্থও যা করেছেন সেটাও প্রায় 'ইলাহ'-এর অর্থের কাছাকাছি। তিনি "রব"-এর অর্থের মধ্যে নেতা, ক্ষমতাশালী কর্তাব্যক্তি, কর্তৃত্বের অধিকারী, যিনি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন, যিনি হস্তক্ষেপ ও বল প্রয়োগের অধিকার রাখেন ইত্যাদি অর্থ অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করেছেন[২] এবং এখানেও তিনি তার দাঁড় করানো এসব অর্থের পক্ষে একক কোনো দলীল দিতে না পেরে পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত 'রব' শব্দের সঙ্গে উল্লেখিত আনুসঙ্গিক বিষয়াদির সমন্বয়ে উপরোক্ত অর্থ দাঁড় করেছেন। যদিও সেসব স্থানে 'রব' শব্দের প্রতিপালক অর্থ গ্রহণ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। তদুপরি তিনি 'রব' শব্দের উপরোক্ত অর্থে প্রযোজ্য ব্যবহার দেখাতে গিয়ে যেসব আয়াত উল্লেখ করেছেন সেগুলোর মধ্যে 'রব' শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্য প্রয়োগ হয়নি। অথচ এসব অর্থে 'রব' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন আল্লাহ্‌র যে পরিচয় "রব", তাও উপরোক্ত অর্থেই প্রযোজ্য। আর এসব অর্থে 'রব' তথা আল্লাহ্‌কে মেনে নিলে মওদূদী সাহেবের কাংখিত বাসনা অনুযায়ী ধর্মের মৌলিক বিষয় রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। যেমন তিনি নেতা, ক্ষমতাশালী কর্তাব্যক্তি, কর্তৃত্বের অধিকারী, যিনি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন, যিনি হস্তক্ষেপ ও

১. কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, পৃ. ২৯, ৮ম প্রকাশ জুন-২০০২, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
২. কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, পৃ. ৩৫, ৮ম প্রকাশ জুন-২০০২, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

বল প্রয়োগের অধিকার রাখেন ইত্যাদি অর্থে 'রব' শব্দের ব্যবহারের প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন[১] ৪ টি আয়াত। যথা:-

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, তারা (ইয়াহুদী নাসারাগণ) আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগী-দেরকে তাদের 'রব' রূপে গ্রহণ করেছে। (সূরা: ৯-তওবা: ৩১)

وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ব্যতীত 'রব' রূপে গ্রহণ না করি। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৬৪)

اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِىْ رَبَّه خَمْرًا.... وَ قَالَ لِلَّذِىْ ظَنَّ اَنَّه نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ فَاَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّه.

অর্থাৎ, সে তার রবকে (প্রভূ/সম্রাটকে) মদ্য পান করাবে ... আর সে (ইউসুফ) তাদের (দুই কয়েদীর) মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করল, তাকে বলল, তোমার রবের (প্রভুর) কাছে (অর্থাৎ, সম্রাটের কাছে) আমার কথা বলো। কিন্তু শয়তান তাকে তার প্রভুর নিকট তার বিষয় বলার কথা ভুলিয়ে দিল। (সূরা: ১২-ইউসুফ: ৪১-৪২)

فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِىْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ.

অর্থাৎ, অতঃপর যখন তার (ইউসুফের) নিকট (সম্রাটের) দূত আসল, তখন সে বলল, তুমি তোমার রব-এর (প্রভুর/সম্রাটের) নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর, যে নারীগণ হাত কেটে ফেলেছিল, তাদের অবস্থা কী! (সূরা: ১২-ইউসুফ: ৫০)

পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন এ সবগুলো আয়াতেই "রব" শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্য প্রয়োগ হয়নি। বরং মানুষের জন্য প্রয়োগ হয়েছে। অতএব এ দ্বারা কীভাবে প্রমাণ করা যায় যে, আল্লাহ্‌র জন্য যে পরিভাষা "রব" ব্যবহৃত হয়েছে, তাও উপরোক্ত অর্থেই প্রযোজ্য?

মওদূদী সাহেব "দ্বীন" পরিভাষাটির অর্থ করেছেন 'রাষ্ট্র সরকার'। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। "দ্বীন" শব্দের অভিধানিক অর্থ দেখে এবং বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত দ্বীন শব্দে সেসব অর্থের প্রয়োগ করে তিনি তার কথিত বক্তব্য প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার শুধু অভিধান দেখেই কুরআনের ব্যাখ্যা করা যায় না। কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হক্কানী উলামায়ে কেরামের সর্বজনস্বীকৃত নীতি হল কুরআনের ব্যাখ্যা প্রথম হবে কুরআন দ্বারা, তারপর হাদীছ দ্বারা, তারপর সাহাবাদের বক্তব্য দ্বারা, তারপর তাবিয়ীদের বক্তব্য দ্বারা, তারপর আরবদের ভাষা তথা অভিধান দ্বারা, তারপর সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা। এভাবে অনেক পরে গিয়ে অভিধান দেখে ব্যাখ্যা করার পর্যায়। আর পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।

ঈমান, আমল (তথা নামায রোযা, হজ্জ, যাকাত) এবং ইহ্ছান তথা তাসাওউফ-এই সবকিছুর সমন্বিত নাম হল দ্বীন তথা ধর্ম। যেমন: প্রসিদ্ধ হাদীছে জিব্রীলে হযরত জিব্রীল (আ.) ঈমান, ইসলাম তথা নামায, রোযা, হজ্জ যাকাত এবং ইহ্ছান তথা তাসাওউফ সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সেগুলোর উত্তর শুনে চলে যাওয়ার পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন,

أتا كم يعلمكم دينكم.

অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে "দ্বীন" শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। (বোখারী ও মুসলিম)

এ হাদীছ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা গেল যে, ঈমান, আমল (তথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত) এবং ইহ্ছান তথা তাসাওউফ এই সবকিছুকে "দ্বীন" বলা হয়। সহীহ হাদীছে বর্ণিত "দ্বীন" পরিভাষাটির এই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা সত্ত্বেও মওদূদী সাহেব তা উপেক্ষা করে নিজস্ব একটা স্বতন্ত্র মতবাদ (ইসলামের রাজনৈতিক করণ মতবাদ) দাঁড় করানে-ার জন্য "দ্বীন" পরিভাষাটির অর্থ করেছেন 'রাষ্ট্র সরকার'।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে- মওদূদী সাহেব "ইবাদত" পরিভাষাটির অর্থ করেছেন "আইন মান্য করা"। "কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা" গ্রন্থে তিনি সরাসরি এরূপ বক্তব্য দেননি বরং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে তার স্বপক্ষে দলীল প্রদানের চেষ্টা করেছেন। তাই ঘুরানো ফিরানো সে বক্তব্য খণ্ডনের পশ্চাতে পড়ে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা থেকে বিরত থাকা গেল।

(৫) কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ উভয়ের সুসমন্বয় জরুরী-এ প্রসঙ্গ

মূলত মওদূদী সাহেবের সব বিভ্রান্তির মূলে হল তিনি পূর্বসূরী মনীষী তথা রিজালু-ল্লাহকে উপেক্ষা করে এবং রিজালুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব মন-মস্তিস্ক থেকে কুরআন হাদীছ অনুধাবন করতে গিয়েছেন। তিনি হেদায়েতের উপর থাকার জন্য রিজালুল্লাহকে জরুরী মনে করেননি। ফলে তিনি হক্কানী উলামায়ে কেরাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, হেদায়েত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন।

কুরআনে কারীমে সূরা ফাতেহায় "সিরাতে মুস্তাকীম" (الصراط المستقيم)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে "অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পথ" (صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) কথাটা বলে বোঝানো হয়েছে যে, রিজালুল্লাহকে বাদ দিয়ে শুধু কিতাবুল্লাহ দ্বারা হক পথ নির্ণয় করা সম্ভব নয় এবং এরূপ নীতি বিধিবদ্ধও নয়। হেদায়েতের জন্য কিতাবুল্লাহ এবং রিজালুল্লাহ উভয়টিই জরুরী। কিতাবুল্লাহ এবং রিজালুল্লাহ এই দুটো হল হেদায়েতের দুই বাহু। হক অনুধাবন ও হেদায়েতের জন্য শুধু কিতাবুল্লাহ যথেষ্ট হলে নবী রসূলদের প্রেরণের প্রয়োজন হত না। বরং আসমান থেকে লিখিত আকারে আল্লাহ্র বিধি-বিধান সম্বলিত কিতাব প্রেরণ করে দেয়াই যথেষ্ট হত।

"অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ" তথা রিজালূল্লাহ্ কারা তাদের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে–

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَاۤءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا.

অর্থাৎ, যারা আনুগত্য করবে আল্লাহ্র ও রসূলের, তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকবে অর্থাৎ, আম্বিয়া, সিদ্দীকীন, শুহাদা ও সালিহীনের সঙ্গে। আর বন্ধু হিসাবে তাঁরা কত উত্তম। (সূরা: ৪-নিসা: ৬৯)

উপরোক্ত আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী নবী, সিদ্দীকীন, শুহাদা, সালিহীন তথা উম্মাতের হক্বপন্থী সমস্ত পূর্বসূরী হলেন রিজালুল্লাহ্-র অন্তর্ভুক্ত। উম্মতের সাহাবা, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন, আইম্মা, মুজতাহিদীন সকলেই এই রিজালুল্লাহ্-র জামাআতে-তর অংশ। সাহাবায়ে কেরাম হলেন এই জামাআতের প্রথম ও প্রধান দিকপাল।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআনে কারীমে ঈমান আমল সবকিছুর ক্ষেত্রে সাহাবীদের ঈমান আমলকে নমুনা ও মাপকাঠি হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। এভাবে ঈমান আমল সবক্ষেত্রে রিজালুল্লাহ্র প্রয়োজন ব্যক্ত করা হয়েছে। বোঝানো হয়েছে যে, রিজালুল্লাহ্ ব্যতীত ঈমান আমল কোনটির সঠিকতায় পৌঁছা সম্ভব নয়। রিজালুল্লাহ ব্যতীত দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করাও সম্ভব নয়। রিজালুল্লাহ হল দ্বীনের সনদ। এজন্যই প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আব্দুল্লাহ ইব্নে মুবারক বলেছেন,

الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ماشاء. (مقدمہ مسلم)

অর্থাৎ, সনদ দ্বীনের অংশ। যদি সনদের নিয়ম না রাখা হত তাহলে যার যেমন ইচ্ছা তেমন বলে যেত।

এ ছাড়াও নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে রিজালুল্লাহ্-র অনুসরণ ও আনুগত্যের তাগীদ প্রদান করা হয়েছে।

(١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যপন্থীদের সঙ্গে থাক। (সূরা: ৯-তাওবা: ১১৯)

(٢) وَّ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ .

অর্থাৎ, যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তুমি তার পথ অনুসরণ কর। (সূরা: ৩১-লুকমান: ১৫)

(٣) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ.

অর্থাৎ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রসূলের ও তোমাদের মধ্যকার কর্তৃত্বের অধিকারীদের। (সূরা: ৪-নিসা: ৫৯)

এই রিজালুল্লাহ তথা পূর্বসূরী মনীষীদের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই মওদূদী সাহেবের গোমরাহীর মূল কারণ। কুরআন-হাদীছ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কীভাবে তিনি রিজালুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন তার বিবরণ পূর্বে "তাফসীর প্রসঙ্গ" উপ শিরোনাম-এর অধীনে আলোচনা করা হয়েছে।

সারকথা-মওদূদী সাহেব ও তার অনুসারী জামাআত শিবিরের মতবাদ ও চিন্তাধারা ঈমান-আকীদা, ইবাদত-বন্দেগী থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত মৌলিক বিষয়ে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চিন্তা-চেতনা থেকে বিচ্যুত। তারা সমগ্র উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব মস্তিস্ক ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভংগী থেকে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারা ইসলাম ও মুসলমানের পরিচয়ও পাল্টে দিয়েছেন, ইবাদত-বন্দেগীর পরিচয়ও পাল্টে দিয়েছেন, দ্বীন ধর্মের এবং শরীআতের পরিচয়ও পাল্টে দিয়েছেন। এমনকি পাল্টে দিয়েছেন ইলাহ বা মা'বূদের পরিচয়ও, যে সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলামের এসব প্রধান মৌলিক বিষয়গুলোর পরিচয় ও স্বরূপ পাল্টে দেয়ার ফলে মওদূদী সাহেব ও তার অনুসারীদের পেশকৃত ইসলাম আর সেই ইসলাম থাকেনি, ইসলাম বলতে আজ পর্যন্ত যে ধর্মকে বুঝে আসা হচ্ছে। অতএব বলা যায়, মওদূদী সাহেব এক নতুন ধর্মের উদ্ভব ঘটিয়েছেন আর তার অনুসারীগণ সেই নতুন ধর্মই অনুসরণ করে চলেছেন।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা
তাঁদের আদালত ও সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রসঙ্গ

পরবর্তী সকলের চেয়ে সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠ হওয়া প্রসঙ্গ

জমহুর এ বিষয়ে একমত যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) পরবর্তীকালের সকলের চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামান্য সান্নিধ্যের সমান মর্যাদাপূর্ণ অন্য কোনো আমল নেই। সেই সান্নিধ্যের মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছেন সাহাবায়ে কেরাম। তদুপরি মর্যাদা বিচার করে পাওয়ার বিষয় নয়, এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তিনি যাকে খুশি দান করেন। সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার বিষয়টি কুরআন সুন্নাহ্ ও ইজ্মা দ্বারা প্রমাণিত।[১]

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্য থাকা প্রসঙ্গ

কোন সাহাবীকে অন্য কোন সাহাবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া যাবে কি না এ বিষয়টি বিতর্কিত। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের কয়েকটি মত দেখা যায়। যথা:-

১. একদল মনে করেন- কোন সাহাবীকে অন্য কোন সাহাবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া যাবে না। বরং এ থেকে বিরত থাকতে হবে।
২. জমহুর শ্রেষ্ঠত্বদানের পক্ষে। তবে শ্রেষ্ঠত্বদানের ক্ষেত্রেও তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

---
১. شرح النووي وغيره

(১) আহ্লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাআতের এক ফিরকার অভিমত হল সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত ওমর (রা.)।
(২) খাত্তাবিয়্যাহ্ ফিরকার অভিমত হল, সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত ওমর (রা.)।
(৩) শীআ সম্প্রদায় মনে করেন সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আলী (রা.)।
(৪) আর আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐক্যমত্য হল, সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), তারপর ওমর (রা.)।

জমহুর আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে হযরত ওমর (রা.)-এর পর হযরত উছমান (রা.), তারপর হযরত আলী (রা.)। অবশ্য আহ্লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কেউ কেউ বলেছেন, হযরত আলী (রা.) হযরত উছমান (রা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে, হযরত উছমান (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আবূ মানছুর বাগদাদী (রহ.) বলেছেন, আমাদের ইমামগণ এ বিষয়ে একমত যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে চার খলীফা-ই উল্লেখিত তারতীব ও বিন্যাসসহ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁদের পর অবশিষ্ট আশারায়ে মুবাশ্শারা, তারপর আহ্লে বদর, তারপর ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, তারপর বায়আতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ। আর আনসারদের মধ্যে উভয় আকাবায় যারা শরীক ছিলেন তাঁদেরও বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। অনুরূপভাবে মর্যাদা রয়েছে তাঁদেরও, যারা ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী (السابقون الأولون) ছিলেন। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবসহ অনেকের মতেই এই অগ্রণীগণ (السابقون الأولون) হলেন তাঁরা, যারা বাইতুল মুকাদ্দাস ও মক্কা মুকাররমা উভয় কিলামুখী হয়ে নামায আদায় করেছেন। হযরত শা'বী (রহ.)-এর মতে তাঁরা হলেন বাইআতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ। হযরত 'আতা ও হযরত মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহ.)-এর মতে অগ্রণীগণ হলেন আহ্লে বদর। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইব্‌ন আব্দুল বার (রহ.)সহ একদল আলিমের মতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশায় যেসব সাহাবী ওফাত বরণ করেন তাঁরা তাঁদের পরবর্তীগণের চেয়ে উত্তম। কিন্তু ইমাম নববী (রহ.) এই মতকে অস্বীকার করে বলেছেন, এটা অসুন্দর ও অগ্রহণযোগ্য মত। অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত খাদীজা (রা.)-এর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ- এ নিয়েও গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রা.) শ্রেষ্ঠ না হযরত ফাতিমা (রা.)- এ বিষয়টিও।[১]

উল্লেখিত শ্রেষ্ঠত্বগত পার্থক্য সম্বলিত উক্তিগুলো কি অকাট্য?

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মধ্যকার পরস্পর শ্রেষ্ঠত্বমূলক উল্লেখিত উক্তিগুলো কি অকাট্য (قطعي) না ধারণামূলক (ظني)-এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহ.)-এর মতে এগুলো সবই অকাট্য। তাঁর মতে ইমাম ও খেলাফতের বিন্যাসটাই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিন্যাস।

---
১. شرح النووي والمرقاة

অর্থাৎ, খেলাফতের ক্ষেত্রে যিনি অগ্রণী মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রেও তিনিই অগ্রণী। আবূ বকর ইবনুল বাকিল্লানী (রহ.) বলেছেন, উল্লেখিত উক্তিগুলো ইজতিহাদী ও ধারণাপ্রসূত। অনুরূপভাবে উল্লেখিত শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি কি জাহেরী দৃষ্টিকোণ থেকে না জাহেরী-বাতেনী উভয় বিচারে– এ বিষয়েও উলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে। যেমনটি উল্লেখ করেছেন ইবনুল বাকিল্লানী (রহ.)।[১]

আদালতে সাহাবা ও সাহাবীদের সমালোচনা প্রসঙ্গ

"আদালত" বলা হয়–

العدالة فيي اللغة الاستقامة، وعند أهل الشرع هي الانزجار عن محظورات دينية، (كشاف اصطلاحات الفنون ج/٣)

অর্থাৎ, আদালত (العدالة)-এর আভিধানিক অর্থ হল অটল থাকা। আর শরীআতের পরিভাষায় আদালত বলা হয় ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা তথা পাপ থেকে বিরত থাকা।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদায় সকল সাহাবী আদিল বা নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়নিষ্ঠ। অতএব তাঁরা সমালোচনার উর্ধ্বে। সাহাবীদের সমালোচনা করা এবং তাঁদের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা রাখা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নীতি। সাহাবীদের প্রতি মহব্বত ও ভক্তি শ্রদ্ধা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্যতম শিআর বা প্রতীক। সাহাবায়ে কেরামকে ভালবাসা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই ভালবাসা। আকীদার প্রসিদ্ধ কিতাব "মুসামারা"তে বলা হয়েছে,

اعتقاد اهل السنة الجماعة تزكية جميع الصحابة رضـ وجوبا باثبات العدالة لكل منهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم (المسامرة)

অর্থাৎ, আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল- সকল সাহাবীর আদালত তথা ন্যায়নিষ্ঠতা প্রমাণিত করে তাঁদের সকলের পবিত্রতা বর্ণনা করা এবং তাঁদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকা আর তাঁদের প্রশংসা করা।

আবূ বকর ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেছেন, আদালতে সাহাবার বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অবিসংবাদিত বিষয়। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাঁদের ন্যায়নিষ্ঠতা, আত্মিক- আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও তাঁদের নির্বাচিত চয়িত হওয়ার কথা পবিত্র কুরআনে আলোচিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত নিম্নরূপ-

١. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ.

অর্থাৎ, তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ১১০)

٢. وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

অর্থাৎ, এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে বানিয়েছি মধ্যপন্থী (শ্রেষ্ঠ) উম্মত, যাতে তোমরা হতে পার মানুষের সাক্ষী, আর রসূল তোমাদের সাক্ষী। (সূরা: ২-বাকারা: ১৪৩)

---

১. شرح النووي لمسلم

٣. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ. الآية.

অর্থাৎ, মুমিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বাইআত গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাঁদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন। (সূরা: ৪৮-ফাত্‌হ: ১৮)

٤. وَ السّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ.

অর্থাৎ, আর অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তাঁরাই নৈকট্যপ্রাপ্ত, নেআমত সমৃদ্ধ জান্নাতে। (সূরা: ৫৬-ওয়াকিয়া: ১০-১২)

٥. وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ.

অর্থাৎ, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাঁদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও তাতে সন্তুষ্ট। (সূরা: ৯-তাওবা: ১০০)

٦. يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ, হে নবী! তোমার জন্য যথেষ্ট আল্লাহ এবং যেসব মু'মিনরা তোমার অনুসরণ করেছে। (সূরা: ৮-আনফাল: ৬৪)

٧. لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَه اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَ الْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ.الآية.

অর্থাৎ, (এই সম্পদ) অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে। তাঁরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাহায্য করে। তাঁরাই তো সত্যপন্থী। মুহাজির আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বাস করে আসছে এবং ঈমান আনয়ন করেছে তাঁরা (অর্থাৎ, আন্‌সারীগণ) মুহাজিরদেরকে ভালবাসে ...। (সূরা: ৫৯-হাশ্‌র: ৮-৯)

অনুরূপভাবে হযরত রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁদের প্রশংসা করেছেন। তাঁদের সম্মান তা'যীম ও স্তুতি বর্ণনায় সুদীর্ঘ বাণী প্রদান করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও প্রশংসায় বর্ণিত বহু হাদীছের মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ-

١. حديث عبد الله بن مسعود رضـ مرفوعا : خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث. (رواه الترمذي في أبواب المناقب– باب ما جاء فضل من رأي النبي صلى الله عليه و سلم، وقال : هذا حديث حسن صحيح.)

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম আমার যুগের লোকেরা, তারপর যারা তাঁদের লাগোয়া (অর্থাৎ, তাবিয়ীন), তারপর যারা তাঁদের লাগোয়া (অর্থাৎ, তাবে তাবিয়ীন)। ...। (তিরমিযী)

২. وحديث أبي سعيد الخدري رضـ مرفوعا : لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو ان أحدكم أنفق مثل أُحُدٍ ذهبا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه. (رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم– باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لوكنت متخذا خليلا، ورواه مسلم في باب تحريم سب الصحابة رضى الله عنهم، ورواه أبو داود في كتاب السنة– باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم، ورواه الترمذي في أبواب المناقب. باب في من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ للترمذي)

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদের সমালোচনা কর না। ঐ সত্তার কছম যার হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করে, তবুও সে তাঁদের এক মুদ বা তার অর্ধ পরিমাণও পৌঁছতে পারবে না। (বোখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

হাফিয আবূ বকর ইবনুল খতীব আল-বাগদাদী (রহ.) العواصم من القواصم গ্রন্থে বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কিত হাদীছ প্রচুর। এর প্রতিটিই কুরআনে কারীমের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। এর প্রতিটিই একথা প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ছিলেন আত্মিক পবিত্রতায় উন্নীত, অকাট্য ন্যায়পরায়ণতা ও উন্নত চরিত্রে ভাস্বর। সুতরাং যে আল্লাহ তাঁদের অন্তর জগত সম্পর্কে সম্যক অবগত, সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে তা'দীল তথা ন্যায়পরায়ণতার সনদ প্রদানের পরও কি তাঁদের কারও সম্পর্কে অন্য কোনো মাখলুকের সত্যায়নের কোনো প্রয়োজন আছে? তাছাড়া তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ ও তদীয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত যেসব সত্যায়ন ও প্রশংসা বাণী আমরা উল্লেখ করেছি, সেগুলো যদি অবতীর্ণ ও বর্ণিত না-ও হত, তবুও তাঁদের অবস্থা, তাঁদের গুণাবলী, তাঁদের যাপিত জীবন– হিজরত, দ্বীনের সাহায্য, উদারপ্রাণে সম্পদ বিসর্জন, মাতা-পিতা ও সন্তানদেরে বিসর্জন, দ্বীনের ক্ষেত্রে কল্যাণকামিতা, ঈমান-একীনের শক্তি ও দৃঢ়তার বিচারেও সন্দেহাতীতভাবেই একথাই বলতে হত যে, তাঁরা ন্যায়পরায়ণ, তাঁরা পবিত্র নিষ্কলূষ এক মানব গোষ্ঠী। তাঁরা তাঁদের পরবর্তীকালে আগত অনাগত সকল কালের সকল ন্যায়পরায়ণ আত্মিক পবিত্রতা ও উৎকর্ষতায় উন্নীতজনদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন, হকপন্থী আলিমগণ এবং ইজ্‌মার ক্ষেত্রে যাদের মত গ্রহণযোগ্য তাঁদের সকলেই সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষ্য, তাঁদের রেওয়ায়াত গ্রহণ এবং তাঁদের পূর্ণাঙ্গ আদালতের বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন।[১]

এসব দলীলাদির ভিত্তিতে আহলে হকের অভিমত হল– الصحابة كلهم عدول

অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সকলেই আদিল তথা ন্যায়পরায়ণ। অতএব তাঁরা সমালোচনার উর্ধ্বে।

১. شرح النووي لمسلم

সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা প্রসঙ্গ

সাহাবীদের সমালোচনা করা নিষেধ। কুরআন-হাদীছের আলোকে আহলে হক্কের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী এটা নিষিদ্ধ। এ সম্বন্ধে পূর্বে অনেকগুলো আয়াত ও হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সাহাবীদের সমালোচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা ইরশাদ করেছেন, তার মধ্যে দুটো হাদীছ উল্লেখ করা হল।

(১) عن أبي سعيد الخدري رضـ مرفوعا : الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي احبهم، ومن ابغضهم فببغضي أبغضهم. الحديث. (رواه الترمذي في أبواب المناقب– باب في من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و قال : حديث غريب، قلت : هذا حال الإسناد، وأما معناه فصحيح مؤيد بأحاديث صحيحة.)

অর্থাৎ, তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আমার পর তোমরা তাঁদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিও না। বস্তুত যে তাঁদেরকে ভালবাসল, সে আমার প্রতি ভালবাসার কারণেই তাঁদেরকে ভালবাসল। আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল। (তিরমিযী)

(২) عن أبي سعيد الخدري رضـ مرفوعا : لاتسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن احدكم أنفق مثل أُحُد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. (رواه البخاري في كتاب فضائل رحـ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لو كنت متخذا خليلا، ورواه مسلم في باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، ورواه أبو داود في كتاب السنة، باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه الترمذي في أبواب المناقب– باب في من سب أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم، واللفظ للترمذي)

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদের সমালোচনা কর না। ঐ সত্তার কছম, যার হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করে, তবুও সে তাঁদের এক মুদ বা তার অর্ধ পরিমাণও পৌঁছতে পারবে না। (বোখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

সুতরাং কুরআনে কারীমের আয়াত ও হাদীছসমূহের আলোকে সন্দেহাতীতভাবেই একথা বলা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সমালোচনার উর্ধ্বে। তাঁদের সমালোচনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাই সাহাবীদের সমালোচনা না করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নীতি। আকীদাতুত্তাহাবীর শরাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে,

ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان.

অর্থাৎ, আমরা তাঁদের ভাল বৈ মন্দ চর্চা করি না। তাঁদের প্রতি ভালবাসা দ্বীন, ঈমান ও ইহ্‌ছান।

অতএব যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলার কৃত প্রশংসাবাণী ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত অনুসৃত নীতির বাইরে গিয়ে সাহাবীদের সমালোচনায় লিপ্ত হবে সে গোমরাহ্, পথভ্রষ্ট ও অন্যদেরকে পথভ্রষ্টকারী।

ইমাম আবূ যুরআহ্ (রহ.) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তিকে দেখবে সে কোন সাহাবীর সমালোচনা করছে, তাহলে নির্ঘাত মনে করবে সে যিনদীক-ধর্মত্যাগী। কারণ, আমাদের দৃষ্টিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হক, কুরআন হক। আর এই কুরআন ও হাদীছ সাহাবায়ে কেরাম-ই আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। তারা চায় আমাদের এই সূত্র- পরম্পরাকে বিক্ষত করতে- যাতে পরিণামে পুরো কুরআন-সুন্নাহ-ই বাতিল বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং এরাই সমালোচনার অধিক উপযুক্ত। কারণ, এরা যিনদীক, ধর্মত্যাগী।[১]

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে আছে, সাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলা[২] জঘন্যতম হারামের অন্তর্ভুক্ত। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেছেন, যেকোন একজন সাহাবীকে মন্দ বলাও গোনাহে কবীরার অন্তর্ভুক্ত। জমহুরের মাযহাব হল– এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে না তবে তা'যীর করা (দণ্ড প্রদান করা) হবে। আর মালেকী মাযহাবের কোন কোন ফকীহ বলেছেন, এমন ব্যক্তির শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড।

মোল্লা আলী কারী (রহ.) মিরকাতে লিখেছেন, আমাদের কোন কোন আলিম স্পষ্টতই বলেছেন, যে ব্যক্তি হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রাঃ)কে মন্দ বলবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। যাইন ইব্‌ন নুজাইম (রহঃ) কৃত الأشباه والنظائر গ্রন্থের 'سير' অধ্যায়ে আছে– যেকোনো কাফের যদি তওবা করে, দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানেই তার তওবা কবূল হবে। তবে সেই কাফের দলের তওবা কবূল হবে না যারা কাফের প্রমাণিত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মন্দ বলার কারণে, শাইখাইন (আবূ বকর ও উমর [রা.]) কে মন্দ বলার কারণে কিংবা তাঁদের যেকোন একজনকে মন্দ বলার কারণে। অথবা যাদু কিংবা নাস্তিকতার কারণে যারা কাফের হয়েছে, তাদের তওবা কবূল হবে না। যদি তওবার পূর্বেই তারা পাকড়াও হয়- এমনকি নারী হলেও- তার তওবা কবূল হবে না। তিনি আরও বলেছেন, শাইখাইনকে মন্দ বলা ও অভিসম্পাত করা কুফ্‌রী।

সাহাবায়ে কেরামের পরস্পর দ্বন্দ্ব-লড়াই ও তার জবাব

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখে অনেকে সাহাবায়ে কেরামের আদালতের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়েন। ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন, সাহাবায়ে

১. العواصم من القواصم

২. (السب)-এর অনুবাদ করা হয়েছে "মন্দ বলা"। এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। গাল মন্দ থেকে শুরু করে সব রকমের সমালোচনা ও মন্দ আলোচনাই এর শামিল। ইবরাহীম আল-হারবী বলেছেন, কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনার উদ্দেশ্যে তার মধ্যে আছে বা নেই এমন সব ধরনের দোষ বর্ণনাই 'السب' -এর শামিল। فتحا الملهم ج/١

কেরাম (রা.)-এর মধ্যে পরস্পরে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক দলেরই এমন কিছু ধারণা ছিল যার আলোকে তাঁরা নিজেদেরকে সত্য ও হক বলে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁরা সকলেই উদূল বা ন্যায়পরায়ণ। তাঁদের পরস্পরে দ্বন্দ্ব-লড়াইয়ের বিষয়টা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ এবং এ কারণে তাঁদের কাউকে আদালতের সীমানা থেকে সরিয়ে ফেলা যাবে না। কারণ তাঁরা সকলেই মুজতাহিদ ছিলেন। আর ইজতিহাদযোগ্য মাসাইলের ক্ষেত্রেই তাঁরা ইজতিহাদ করেছেন। যেমন তাঁদের পরবর্তী-কালের মুজতাহিদগণের মধ্যেও মতবিরোধ হয়েছে রক্তপণ ইত্যাকার বিষয়ের ক্ষেত্রে। আর এতে করে কাউকেই ছোট বা হেয় করে দেখা যায় না।

তবে মনে রাখতে হবে- এসব যুদ্ধেরও কিছু কারণ ছিল।ল সেখানে এমন কিছু বিষয় ছিল যা অস্পষ্ট। আর ঘোরতর অস্পষ্টতার কারণেই তাঁদের ইজতিহাদগত বিরোলধ দেখা দিয়েছে। ফলে তারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন।

১. এক শ্রেণীর ইজতিহাদ তাঁদেরকে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, এই পক্ষ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের বিরোধীরা বিদ্রোহী। সুতরাং তাঁদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে হক পক্ষকে সাহায্য করা ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আর এটা ছিল তাদের স্পষ্ট বিশ্বাস ও আকীদা। তাই এক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে ইমামে আদেল তথা হক পক্ষকে অসহযোগিতা করা তাঁদের জন্য বৈধও ছিল না।

২. দ্বিতীয় শ্রেণীটি প্রথম শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইজতিহাদের আলোকে তাঁদের কাছে মনে হয়েছে দ্বিতীয় পক্ষ হক। সুতরাং এই হক পক্ষকে সহযোগিতা করা ও তার বিপক্ষ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা তাঁদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩. তৃতীয় শ্রেণীটির কাছে মূল বিষয়টি ধাঁধাঁপূর্ণ মনে হয়েছে। তারা সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে রয়েছেন। দুই পক্ষের কোন পক্ষের মতকেই তারা প্রাধান্য দিতে পারেননি। ফলে তারা উভয় পক্ষ থেকে পৃথক থেকেছেন। আর এই পৃথক থাকাটাই তাঁদের কর্তব্য ছিল। কারণ, কোন মুসলমান যুদ্ধযোগ্য অপরাধী বলে প্রমাণিত না হলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ নয়। তবে দুই পক্ষের কোন এক পক্ষের প্রাধান্যতার বিষয়টা যদি তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠত তাহলে আর তাদেরকে সহযোগিতাদান ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা থেকে বিরত থাকা তাঁদের জন্যও বৈধ হত না। সুতরাং তাঁরা সকলেই ছিলেন মা'যূর। তাই ইজমার ক্ষেত্রে যাদের মত গ্রহণযোগ্য এমন সকল আহ্‌লে হকই মনে করেন সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষ্য, তাঁদের বর্ণনা ও তাঁদের পূর্ণ আদালত গ্রহণযোগ্যতা স্বকীয় বিভায় উজ্জ্বল। রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। (شرح النووي لمسلم)

সাহাবায়ে কেরামের মি'য়ারে হক তথা সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রসঙ্গ

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সকল সাহাবী-ই ঈমান, আমল, আখলাক, আদর্শ সকল ক্ষেত্রেই সত্যের মাপকাঠি ও মি'য়ারে হকের দণ্ডে উত্তীর্ণ। ঈমানের ক্ষেত্রে তাঁরা

সত্যের মাপকাঠি- তার দলীল হল কুরআনের আয়াত–

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ. الآية.

অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হয়, এই লোকেরা যেমন ঈমান এনেছে, তোমরাও তদ্রূপ ঈমান আন। ...। (সূরা: ২-বাকারা: ১৩)

মুফতীয়ে আ'যম মুহাম্মাদ শফী (রহ.) তদীয় বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ মা'আরিফুল কুরআনে লিখেছেন– মুফাসসিরগণ এ বিষয়ে একমত যে, বক্ষমান আয়াতটিতে 'الناس' বলে সাহাবায়ে কেরামকেই বোঝানো হয়েছে। কারণ, কুরআন অবতরণকালে কেবল তাঁরাই ছিলেন ঈমানদার। আর এ আয়াতে ঘোষিত হয়েছে, আল্লাহ্‌র দরবারে ঈমান সেটাই গ্রহণযোগ্য যেটা সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের অনুরূপ। প্রমাণিত হল, সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ঈমানের মাপকাঠি। উম্মতের অন্য সকলের ঈমানকে মাপা হবে তাঁদের (রা.)ই ঈমানের নিক্তিতে। যার ঈমান সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের মাপে উত্তীর্ণ হবে সে-ই হবে যথার্থ ঈমানদার। আর যার ঈমান এই মাপে উত্তীর্ণ হবে না তার ঈমানও যথার্থ বলে বিবেচিত হবে না।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন,

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ.

অর্থাৎ, যদি তারা ঈমান আনে যেমন তোমরা ঈমান এনেছ, তাহলে তারা হেদায়েত পেল, আর যদি বিমুখ হয়ে যায়, তাহলে তারা সুদূর বিরোধে রয়েছে। (সূরা: ২-বাকারা: ১৩৭)

আমলের ক্ষেত্রেও সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি তার প্রমাণ হল-

وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا.

অর্থাৎ, যে তার কাছে হেদায়েত স্পষ্ট হওয়ার পর এই রসূলের বিরোধিতা করবে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি ফিরিয়ে দিব যেদিকে সে ফিরে যায়, আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব। কত নিকৃষ্ট ঠিকানা সেটা! (সূরা: ৪-নিসা: ১১৫)

আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী (রহ.) তদীয় عصمت انبیاء وحرمت صحابہ পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতটিতে উল্লেখিত 'المؤمنين' (মুমিনীন) শব্দের প্রথম মিসদাক হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। আর আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের মত ও পথকেই মত ও পথের মাপকাঠিরূপে নির্বাচন করেছেন। আর তাঁদের মত ও পথের বিরুদ্ধাচরণকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধাচরণ বলে সাব্যস্ত করেছেন। অবশেষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণের পথের যারা বিরোধী তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের ভয় দেখিয়েছেন।

সুতরাং যখন এটাই প্রমাণিত হল যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ঈমান, আমল ও আদর্শের 'মাপকাঠি' তখন এটা প্রতিভাত হল যে, সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি। কেননা, সত্য ঈমান আমলের বাইরে অন্য কিছু নয়।

এখানে আরও একটি কথা উল্লেখ্য যে, "সত্যের মাপকাঠি" বা মি'য়ারে হক কথাটি পূর্বসূরী মনীষীগণের পরিভাষা নয়। এটি জামাআতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আবুল আ'লা মওদূদী সাহেবের সৃষ্ট। তিনিই সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সত্যের মাপকাঠি হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। 'دستور جماعت اسلامی' (জামাআতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র) তে তিনি লিখেছেন– "আল্লাহ্‌র রাসূল ছাড়া আর কেউ সত্যের মাপকাঠি নয় এবং কেউ সমালোচনার উর্ধ্বে নয়।" তার এই বক্তব্য সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে সমালোচনার পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছে। মুফাসসিরীনে কেরাম, ফোকাহায়ে কেরাম, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ পবিত্র ইসলামের অন্যসব মনীষীদের বিরুদ্ধেও সমালোচনার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। মওদূদী সাহেব নিজেও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন। তার কঠিন সমালোচনার শিকার হয়েছেন হযরত উছমান ইব্‌নে আফফান (রা.), হযরত মু'আবিয়া ইব্‌নে আবূ সুফিয়ান (রা.)সহ আরও অনেকেই। এমনকি তিনি ওহুদ যুদ্ধের সাময়িক পতনকে উপলক্ষ করে প্রথম সারির মুহাজির ও আনসারগণেরও কঠোর সমালোচনা করেছেন।

আল্লামা বিন্নৌরী (রহ.) তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থে- "الأستاذ المودودي وشيء من أفكاره" লিখেছেন– সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সম্পর্কে মওদূদী সাহেব বেশি জানেন, না আল্লাহ তাআলা? আল্লাহ তো সুক্ষ্মময় সর্বজ্ঞানের অধিকারী! মওদূদী সাহেব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীদের সম্পর্কে কি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর চেয়েও বেশি জানেন? আর যদি সাহাবায়ে কেরাম-ই সত্যের মাপকাঠি ও ইসলামের মানদণ্ড না হন, তাহলে আর কে সত্যের মাপকাঠি ও ইসলামের মানদণ্ড হবে?

তিনি তাঁর গ্রন্থের অন্যত্র এ-ও বলেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মওদূদী সাহেব তার এসব কদর্যপূর্ণ কুৎসিত মন্তব্য ও অপবাদসমূহের দ্বারা আল্লাহ এবং আল্লাহ্‌র রসূলকে কষ্ট দিয়েছেন। তিনি সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সম্পর্কে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের উচ্ছসিত প্রশংসাবাণীর প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ করেননি। আমাদের সর্দার প্রিয়তম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি একথা বলেননি,

الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبه ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. (رواه الترمذي ج/٢)

অর্থাৎ, তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আমার পর তোমরা তাঁদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিও না। বস্তুত যে তাঁদেরকে ভালবাসল, সে আমার প্রতি ভালবাসার কারণেই তাঁদেরকে ভালবাসল। আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল। (তিরমিযী)

এই জাতীয় হাদীছ তো আরও অনেক, হাদীছ গ্রন্থগুলোর পাতায় পাতায় যা জ্বলজ্বল করছে। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের আলোকিত ভাষ্যাবলীই তো যে কারও জন্য যথেষ্ট! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা যা বলেন সত্য-ই বলেন। তিনিই সত্য পথের দিশারী।

ইস্‌মতে আম্বিয়া প্রসঙ্গ

ইস্‌মত (عصمت) শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

ইস্‌মত (عصمت) শব্দের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, পাপমুক্তি, সতীত্ব রক্ষা, হেফাজত, সংরক্ষণ ইত্যাদি। পরিভাষায় ইস্‌মত বলা হয়:

১. আশআরীদের নিকট ইস্‌মত (عصمت) শব্দের ব্যাখ্যা হল–

العصمة عند الأشاعرة أن لايخلق الله في العبد ذنبا. وقيل : العصمة عند الأشاعرة هي خلق قدرة الطاعة. (كشاف اصطلاحات الفنون ج/٣)

অর্থাৎ, আশআরীদের নিকট আল্লাহ বান্দার মধ্যে কোন পাপ সৃষ্টি করবেন না- এটাকেই বলা হয় ইস্‌মত। অথবা আশআরীদের নিকট ইস্‌মত বলা হয় (কারও মধ্যে) আনুগত্যের শক্তি সৃষ্টি করে দেয়াকে।

২. ইমাম আবূ মানসূর মাতুরিদী বলেন, ইসমত আল্লাহ তাআলার এমন একটি নেয়ামত ও অনুগ্রহকে বলা হয় যা নবী রসূলগণকে সর্বদা আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ পালনে প্রস্তুত রাখে এবং সামান্যতম পাপ থেকেও দূরে রাখে।[১]

উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী "নবী রসূলগণ মা'সূম"-এর সার অর্থ হল- তাঁরা পাপমুক্ত, তাঁদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আনুগত্যের শক্তি সৃষ্টি করে দেন এবং তাঁদেরকে এমন অনুগ্রহ দান করেন যার ফলে তাঁরা সর্বদা আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ পালনে ব্যাপৃত ও সব ধরনের পাপ (পালন) থেকে নিবৃত্ত থাকেন। হযরত মাও. ইদ্রীস কান্দেহ্‌লভী (রহ.) এই সার কথাটিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন- মা'সূম বা নিষ্পাপ বলা হয় এমন সত্তাকে যিনি আকীদা-বিশ্বাস, নিয়ত-ইচ্ছা, অবস্থান, স্বভাব-চরিত্র, ইবাদত-বন্দেগী, লেন-দেন, কথা ও কাজ ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে পাপ ও পাপের উৎস নফ্‌স শয়তানের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকেন।[২]

ইসমত (عصمت) সম্পর্কে মাযহাব

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে ও নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে সগীরা এবং কবীরা সব ধরনের গোনাহ থেকে পবিত্র। শরহে ফেক্‌হে আকবার গ্রন্থে বলা হয়েছে,

والأنبياء عليهم الصلوة السلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبا ئح يعني قبل النبوة وبعدها. (شرح الفقه الأكبر لأبي المنتهي صفحه/١٦)

১. كذا في ترجمان السنة ج/٣ نقلا عن نسيم الرياض ج/٣

২. معارف القرآن ادريسى ج/١

অর্থাৎ, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) সকলেই নবুওয়াতের আগে ও পরে সগীরা এবং কবীরা সব ধরনের গোনাহ থেকে পবিত্র। উক্ত গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে,

ولم يرتكب (النبي صلى الله عليه وسلم) صغيرة ولا كبيرة قط يعني قبل النبوة وبعدها.

অর্থাৎ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াতের আগে ও পরে সগীরা এবং কবীরা কোনো ধরনের গোনাহ করেননি। মোল্লা আলী কারী (রহ.) মেরকাত শরহে মেশকাত গ্রন্থে বলেন,

عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدها. (المرقاة ج/١ تحت حديث رقم ٨١ في باب الإيمان بالقدر)

অর্থাৎ, নবুওয়াতের আগে ও পরে নবীগণ সগীরা কবীরা সব ধরনের গোনাহ থেকে পবিত্র।

ফখরুদ্দীন রাযী عصمة الأنبياء গ্রন্থে, আব্দুল কাহের বাগদাদী الفرق بين الفرق গ্রন্থে এবং আরও কেউ কেউ বিভিন্ন গ্রন্থে নবুওয়াতের পূর্বে সগীরা ও কবীরা ভুলবশত হতে পারে বলে (কারও কারও বা অনেকের) মত বর্ণনা করেছেন। অনেকে এগুলো দেখে বিভিন্ন কিতাবে ইস্‌মত সম্পর্কে মাযহাব এভাবেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আল্লামা ইব্‌নে হাজার আসকালানী (রহ.) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর কবীরা বা সগীরা তো নয়ই, এমনকি নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে সগীরা পর্যন্ত প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয় বলে মত ব্যক্ত করেছেন এবং এটাকেই সঠিক মত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন,

فلم يمكن صدوره (صدور الذنب) منه ولو صغيرة قبل النبوة على الصواب. (نقله ا لقاري في المرقاة ج/١ تحت حديث رقم ٤١٥ في باب الاعتصام بالكتاب السنة)

অর্থাৎ, সঠিক মতানুসারে নবুওয়াতের আগেও নবী থেকে গোনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয় চাই সগীরা গোনাহ হোক না কেন।

মুফতী শফী সাহেব লিখেছেন, চার ইমামসহ উম্মতের সম্মিলিত অভিমতেও নবীগণ ছোটবড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।[১]

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, পূর্বোল্লেখিত যেসব কিতাবে নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ভুলবশত সগীরা ও কবীরা পাপ সংঘটিত হতে পারে বলে মতামত বর্ণনা করা হয়েছে, এতে মূলত পাপ সংঘটিত না হওয়ার কথাই বলা হয়েছে। কেননা পাপ বা মা'সিয়াত বলা হয় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করাকে। অনিচ্ছাকৃত বা ভুলবশত কোন হুকুম অমান্য করাকে পাপ বা মা'সিয়াত বলা হয় না। এ হিসাবে নবুওয়াত প্রাপ্তির পর নবী রসূলগণ থেকে কোনো ধরনের পাপ সংঘটিত না হওয়ার ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই।

ইসমতের দলীল

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী "ইসমাতুল আম্বিয়া" গ্রন্থে ইসমতের ১৫টি দলীল বর্ণনা করেছেন। হযরতুল আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (রহ.) তাঁর মাআরিফুল কুরআন ১ম খণ্ডে

১. معارف القرآن ج/١

১৯টি আয়াত দ্বারা ইস্‌মতের পক্ষে দলীল পেশ করেছেন। অন্যান্য আরও অনেকে আরও বহু দলীল বয়ান করেছেন। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি দলীল নিম্নে প্রদান করা হল–

(১) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ। (সূরা: ৩৩-আহ্‌যাব: ২১)

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ বা اسوة حسنة থাকার কথা বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য- এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর গোটা জীবনকেই আদর্শ আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর দোষ-ত্রুটি ও পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত না হলে তাঁকে এরূপ আদর্শ ব্যক্তিত্ব আখ্যায়িত করা যেত না।

(২) وَ اَطِيْعُوا اللهَ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং রসূলের, আশা করা যায় তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ১৩২)

(৩) مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ.

অর্থাৎ, যে রসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। (সূরা: ৪-নিসা: ৮০)

এ দুই আয়াতে রসূলের যে অনুগত্যের কথা বলা হয়েছে তা দ্ব্যর্থহীন। রসূল নিষ্পাপ না হলে এরূপ আনুগত্যের কথা বলা যেত না।

(৪) عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا ۙ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ.

অর্থাৎ, তিনি অদৃশ্য বিষয়ে অবগত। তিনি তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত আর কারও কাছে গায়েবের বিষয় ব্যক্ত করেন না। (সূরা: ৭২-জিন: ২৬)

(৫) وَ اِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ.

অর্থাৎ, তাঁরা (নবীগণ) অবশ্যই আমার নিকট মনোনীত সন্তোষভাজন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা: ৩৮-সাদ: ৪৭)

এ দুই আয়াতে রসূলগণকে আল্লাহ্‌র সন্তোষভাজন এবং মনোনীত ও নির্বাচিত বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর অবশ্যই তাঁরা সব দিক থেকেই সন্তোষভাজন ও মনোনীত এটাই এখানে বোঝানো হয়েছে। অন্যথায় আংশিক সন্তোষভাজন তো নবী ছাড়া অন্যরাও। অতএব বুঝা গেল- নবীগণ নিষ্পাপ। কেননা কারও দ্বারা পাপ সংঘটিত হলে সে সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র সন্তোষভাজন হতে পারে না। নবীদের দ্বারা পাপ হয় বললে আল্লাহ্‌র নির্বাচন সঠিক হয়নি বলতে হবে।

(৬) قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ.

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৩১)

এ আয়াতে রসূলের অনুসরণকে আল্লাহ তাআলার ভালবাসা অর্জন ও ক্ষমা লাভের মাপকাঠি স্থির করা হয়েছে। অতএব রসূল থেকে পাপ হলে বলতে হবে পাপীর অনুসরণকে আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জন ও ক্ষমা প্রাপ্তির মাপকাঠি বানানো হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ !

৭. শরীআত ও সাধারণ পরিভাষায় পাপীকে বলা হয় জালেম। নবী থেকে পাপ হতে পারে বললে নবীকে জালেম বলা যাবে। অথচ কোন জালেমকে নবুওয়াত দান করা হয় না।

لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থাৎ, আমার প্রতিশ্রুতি জালেমদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। (সূরা: ২-বাকারা: ১২৪)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল- নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও কোনো নবী থেকে পাপ সংঘটিত হয় না। কেননা পাপ হলে তারা জালেম সাব্যস্ত হয় আর জালেম নবুওয়াতের প্রতিশ্রুতি লাভের যোগ্য নয়।[১]

৮. হযরত মুফতী শফী সাহেব (রহ.) বলেন, নবীগণ (আ.)কে গোটা মানব জাতির অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছিল। যদি তাঁদের দ্বারা ছোট বড় কোন পাপ কাজ সম্পন্ন হয় তাহলে নবীদের কথা ও কাজের ওপর থেকে বিশ্বাস উঠে যাবে এবং তাঁরা আস্থাভাজন থাকবেন না। আর যদি তাঁদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস না থাকে, তাহলে দ্বীন ও শরীআতের স্থান কোথায়? (معارف القرآن)

নবীগণের ইস্‌মত সম্বন্ধে একটা সংশয় ও তা নিরসন

কুরআনে কারীমের কয়েকটি আয়াত থেকে বাহ্যত অনুমিত হয় যে, নবীগণ থেকে পাপ সংঘটিত হয়েছে। যেমন: হযরত আদম (আ.) প্রসঙ্গে এসেছে–

(١) فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ, অতঃপর আদম তাঁর প্রতিপালক থেকে কয়েকটি কথা অর্জন করলেন, অনন্তর তিনি তাঁর তওবা কবূল করলেন। (সূরা: ২-বাকারা: ৩৭)

(٢) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থাৎ, তাঁরা (আদম ও হাওয়া) বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং আমাদেরকে রহম না কর, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। (সূরা: ৭-আ'রাফ: ২৩)

(٣) وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى.

অর্থাৎ, আদম তাঁর প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হল। (সূরা: ২০- তাহা: ১২১)

হযরত মূসা (আ.) প্রসঙ্গে এসেছে–

(١) وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ.

---

১. اقول : وفيه رد على ما قاله التفتاز اني : أما قبل الوحي فلادليل على امتناع صدور الكبيرة

অর্থাৎ, আমার বিরুদ্ধে তাদের একটা পাপ (অভিযোগ) রয়েছে; আমি আশংকা করছি তারা আমাকে হত্যা করে দিবে। (সূরা: ২৬-শুআরা: ১৪)

(২) رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ فَغَفَرَ لَه.

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার নিজের প্রতি অবিচার করেছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। অতঃপর তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। (সূরা: ২৮-কাসাস: ১৬)

হযরত ইউনুস (আ.) সম্পর্কে এসেছে– তিনি বলেছিলেন,

(১) لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ.

অর্থাৎ, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তুমি পবিত্র। আমি অবশ্যই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা: ২১-আম্বিয়া: ৮৭)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রসঙ্গে এসেছে–

(১) وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ.

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার পাপের জন্য এবং মু'মিন নর-নারীদের পাপের জন্য। (সূরা: ৪৭-মুহাম্মাদ: ১৯)

অন্য এক আয়াতে এসেছে–

(২) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ اِنَّه كَانَ تَوَّابًا.

অর্থাৎ, তুমি তোমার প্রতিপালকের স্ব-প্রশংস তাসবীহ পাঠ কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনিতো তওবা কবূলকারী। (সূরা: ১১০-নাস্‌র: ৩)

হাদীছ শরীফেও আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) থেকে পাপ সংঘটিত হওয়ার সংশয় উদ্রেককারী কিছু বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন:–

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রসঙ্গে এসেছে–

غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّرَ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর অতীত ও ভবিষ্যতের সব গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

বাহ্যিকভাবে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) থেকে পাপ সংঘটিত হয়েছে বলে সংশয় উদ্রেককারী এসব আয়াত ও হাদীছের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে সর্বসম্মতভাবে অনেক জওয়াব দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি জওয়াব নিম্নরূপ:

১. কোন ভুল বুঝাবুঝি বা অনিচ্ছাকৃত[১] কারণে বা ভূলে[২] নবীদের থেকে কিছু কাজ সংঘটিত হয়েছে; কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবারে নবীদের মাকাম ও মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ

১. যেমন হযরত মূসা (আ.) শাসনের জন্য থাপ্পড় দিয়েছেন কিন্তু লোকটি মারা গেছে। فوكزه موسى فقضى عليه۔ এটা ছিল অনিচ্ছাকৃত।

২. যেমন হযরত আদম কর্তৃক নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ ভুলে হয়েছিল এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে, فنسى ولم نجد له عزما۔ অর্থাৎ, সে (আদম) ভুলে গিয়েছিল, আর আমি তাঁর সংকল্প পাইনি।

এবং মহান ব্যক্তিবর্গ থেকে ক্ষুদ্র ত্রুটি-বিচ্যুতি হলেও সেটাকে বড় বলে ধরা হয়।[১] এ হিসাবে নবীদের সেসব কাজকে পাপ (ذنب/معصيت) ও অপরাধ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যদিও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো পাপই নয়।[২]

২. নবীগণ কর্তৃক সর্বোত্তম পর্যায়ের আমল/কাজ বর্জন করাকেই পাপ বলে আখ্যায়িত করত তার জন্য তাঁদের তিরস্কার করা হয়েছে। যদিও তাঁরা যেটা করেছেন সেটা উত্তম, তবে সর্বোত্তম নয়। আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁদের অতি নৈকট্যের সম্পর্কের কারণে তাঁদের দ্বারা সর্বোত্তমটা বর্জন করা যেন অন্যের দ্বারা ওয়াজিব বর্জন করার মত। شرح الفقه الأكبر গ্রন্থে এ কথাই বলা হয়েছে,

فعلوا الفاضل وتركاالأفضل فعوتبوا عليه، لأن ترك الأفضل منهم بمنزلة ترك الواجب من الغير. (شرح الفقه الأكبر لأبي المنتهي)

হযরত মাওলানা ইদ্রীছ কান্ধলবী বলেন,

حضرات انبیاء کے حق میں ترک اولی ایسا ہے جیسا کہ دوسروں کے حق میں خطاء۔ (معارف القرآن ادریسی از حاشیہ ملاعبد الحکیم علی الخیالی)

অর্থাৎ, নবীদের ক্ষেত্রে খেলাফে আওলা এমন, অন্যদের ক্ষেত্রে পাপ যেমন।

৩. নবীদের ইজতিহাদগত বিচ্যুতিকেই শব্দে "পাপ", "অপরাধ" ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এছাড়া উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছসমূহের সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীন ও মুহাদ্দিছীনে কেরামের বিস্তারিত আলোচনা দেখে নেয়া যেতে পারে।

মাহ্‌দবিয়া সম্প্রদায়

মাহ্‌দবী ফিরকা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপুরী (৮৭৪-৯১০ হি.)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপুরী এই ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী হওয়ার দাবীদার ছিলেন বিধায় তার এই দলকে মাহ্‌দবিয়া সম্প্রদায় বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই সম্প্রদায়ের আরও বিভিন্ন নাম রয়েছে, যথা: দায়েরাওয়ালা, মুসাদ্দিক, দাইয়াহ (داعیہ), ত্বাইয়াহ (طاعیہ), যিক্‌রিয়াহ (ذکریہ)।[৩]

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপূরী আল কাজেমী আল হোসাইনী ১৪ জুমাদাল উলা সোমবার ৮৪৭ হিজরী, মোতাবেক ১০ ইং সেপ্টেম্বর ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের জৌনপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বংশ-পরিক্রমায় বারতম পুরুষ মূসা কাযেম পর্যন্ত যেয়ে পৌছে। তার পিতার মূল নাম ইব্‌নে সাইয়্যেদ খান। বুড উয়াইসী নামে খ্যাত। তার মায়ের মূল নাম আগা মালিক। প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী হওয়ার দাবী করার পূর্বে তিনি

১. যেমন বলা হয়, حسنات الأبرار سيئات المقربين. قاله أبو سعيد الخراز. كذا في لمقاصد الحسنة۔

২. از معارف القرآن. مفتی شفیع ومباحثہ شاہجہان پور. قاسم نانتوی

৩. بدائع الكلام و احسن الفتاوي – مهدوي تحريك صفحه/٥

তার পিতার নাম পরিবর্তন করে রাখেন সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ এবং মায়ের নাম পরিবর্তন করে রাখেন আমীনা খাতুন ওরফে আগা মালিক। এই নাম পরিবর্তনের কারণ স্পষ্টতই অনুমিত হয় যে, মাহ্‌দী হওয়ার দাবী করলে যেন সে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঐ হাদীছের বর্ণনা তার ব্যাপারে প্রযোজ্য দেখাতে পারে, যাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিশ্রুত মাহ্‌দীর ব্যাপারে বলেছেন, তার পিতার নাম হবে আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম হবে আমীনা।

সিন্ধুর জনগণ সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপূরীকে 'মীরাঁ সায়েঁ' (میراں سائیں) এবং মাকরান, কিল্লাত ও ইরানের যিক্‌রীরা 'নূরে পাক' উপাধিতে তার আলোচনা করে থাকেন।

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপুরী জুমাদাল উলা, ৮৮৭ হিজরীতে জৌনপুর ছেড়ে বিভিন্ন এলাকা হয়ে মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌঁছেন। ৯ মাস মক্কা মুয়াজ্জমায় অবস্থান করেন। শায়খ মুহাম্মাদ আকরাম-এর "রোদে কাউসার" (رود کوثر) নামক গ্রন্থের বর্ণনা মোতাবেক ৯০১ হিজরীতে মক্কা মুয়াজ্জমায় থাকা অবস্থায় তিনি মাহ্‌দী হওয়ার দাবী করেন। বায়তুল্লাহ্‌র রোকন এবং মাকামে ইব্রাহীমের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন, আমার সত্তাই সেটি, যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও পূর্ববর্তী নবীগণ যার আগমনের সংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমার সত্তাই আখেরী জমানার মাহ্‌দী।[১]

এরপর হিন্দুস্তান ফিরে আসেন। সর্বপ্রথম আহমদাবাদ (গুজরাট) প্রবেশ করেন। ৯০৫ হিজরীতে তিনি বর্তমান পাকিস্তানের ঠাঠ এলাকায় প্রায় ছয় মাস অবস্থান করেন। ঠাঠ থেকে তিনি এসে বেলুচিস্তানের অনাবাদী ও দুর্গম পথ অতিক্রম করে স্বীয় বিশাল অনুসারী দলবল সঙ্গে নিয়ে কান্দাহার পৌঁছেন। কান্দাহার থেকে ফারাহ (যেটি তৎকালীন সময়ে ইরানের অন্তর্ভুক্ত ছিল, বর্তমানে আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) আগমন করেন।[২]

তিনি বারলী (গুজরাট) থেকে ৯০৫ হিজরীতে প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী হওয়ার দাবী করে বিভিন্ন আমীর-উমরা, রাজা-বাদশাহ ও খানদের নামে পত্র জারি করেছিলেন। এরূপ একটি পত্রের বিবরণ নিম্নরূপ:

'হে লোক সকল! তোমরা বুঝে নাও, আমি মুহাম্মাদ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমনামী। আল্লাহ তাআলা আমাকে বেলায়েতে মুহাম্মাদিয়ার মোহর এবং স্বীয় নবীর মহান উম্মতের খলীফা বানিয়েছেন। আমি সেই ব্যক্তি, যাকে আখেরী জমানায় প্রেরণ করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আমি সেই ব্যক্তি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার সংবাদ দিয়েছেন। আমি সেই ব্যক্তি, পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের সহীফাসমূহে যার আলোচনা করা হয়েছে। আমি সেই ব্যক্তি,

১. احسن الفتاوى ج/١، از تحريك مهدويت صفحه/٤٤

২. المصدر السابق

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দলগুলো যার প্রশংসা করেছে। আমি সেই ব্যক্তি, যাকে রাহ্‌মানী খিলাফত দান করা হয়েছে। আমি অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করে আল্লাহ্‌র হুকুমে আল্লাহ্‌র দিকে মাখলূককে আহ্বান করছি। আমি এই দাবীর সময় নেশাগ্রস্ত নই, বরং সম্পূর্ণ হুঁশ অবস্থায় আছি। আমাকে হুঁশে কিংবা চেতনায় আনার প্রয়োজন নেই। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পবিত্র রিযিক লাভ করে থাকি। আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। আমি রাজত্ব ও রাষ্ট্রের প্রত্যাশী নই। রাষ্ট্র, নেতৃত্ব, রাজত্ব কায়েম করার খাহেশও আমার নেই। নেতৃত্ব, রাষ্ট্র ও রাজত্বকে আমি অপবিত্র মনে করি। দুনিয়ার মহব্বত থেকে মুক্ত করা আমার কাজ।

আমার এই দাওয়াতের কারণ একমাত্র এটাই যে, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই দাওয়াত প্রদানের ব্যাপারে আদিষ্ট। তাগীদ সহকারে তোমাদের নিকট আমি এই দাওয়াত পৌঁছাচ্ছি। সাথে সাথে সতর্কও করে দিচ্ছি। আল্লাহ্‌ আমার আনুগত্য করা ফরয করে দিয়েছেন। আমি সমস্ত জিন ইনসানের নিকট আমার এই দাওয়াত পৌঁছাচ্ছি যে, আমি বেলায়েতে মুহাম্মাদিয়া সমাপনকারী। আমি আল্লাহ তাআলার খলীফা। যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। আর যে আমার থেকে বিমুখ হয়ে গেল, সে যেন আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলা থেকে বিমুখ হল। হে লোক সকল! আমার প্রতি ঈমান আন, যাতে তোমাদের মুক্তি নসিব হয়। আমার কথা শোন এবং দ্রুত আমার আনুগত্য কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। যে আমাকে অস্বীকার করবে, আমার বিধি-বিধান অমান্য করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করবেন। ... সংক্ষেপিত।[১]

জৌনপুরীর দাবী ও বক্তব্য খণ্ডন

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপূরীর পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং তার মায়ের নাম আমীনা ছিল না। বরং যখন তিনি প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার দাবী করতে মনস্থ করলেন, তখন তিনি মাহ্‌দীর ব্যাপারে কৃত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী নিজের ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে এভাবে স্বীয় মাতা-পিতার নাম পরিবর্তন করে দিলেন। যখন তাদের পরিবর্তিত নামগুলো প্রসিদ্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি মাহ্‌দী হওয়ার দাবী করলেন। সমকালীন লেখকদের কেউ তার পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম আমীনা লেখেন না। আলী শের কানে' কৃত 'তুহফাতুল কিরাম' এবং খাইরুদ্দীন ইলাহাবাদী কৃত জৌনপুরনামা-তে তার মাতাপিতার নাম অনুরূপ লেখা হলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এগুলো পরবর্তীকালে লিখিত হয়েছে। সমকালীন উৎসগুলোর কোথাও তার মাতা-পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং আমীনা বলে উল্লেখ নেই।[২]

১. احسن الفتاوی ج ۱/ از مہدوی تحریک بحوالہ قول المحمود

২. دائرۂ معارف اسلامیہ اردو ج/۷ صفحہ/ ۵۲۱ - دانشگاہ پنجاب لاہور

পূর্বে বলা হয়েছে তার মায়ের প্রকৃত নাম আগা মালিক। এবং তার পিতার নাম ইউসুফ। আল্লামা আব্দুল হাই ইব্‌নে ফখরুদ্দীন আল হুসাইনী তার খ্যাতনামা গ্রন্থ নুযহাতুল খাওয়াতির (نزهة الخواطر)-এর ৪র্থ খণ্ড ধারা নং ৩২৪ ও ৪৮৬- তে তার পিতার নাম ইউসুফ বলে উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তীতে তার পিতা-মাতার নাম পরিবর্তনের কথাও উল্লেখ করেছেন।

মোল্লা আব্দুল কাদির বাদায়ূনীর ফারসী ইতিহাস মুন্তাখাবুত্ তাওয়ারীখ (منتخب التواريخ)-এর অনুবাদক মাহ্‌মূদ আহমদ ফারূকীও উক্ত গ্রন্থের টীকায় তার পিতার নাম ইউসুফ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

মোটকথা, সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপুরীর পিতার নাম ইউসুফ হোক কিংবা সাইয়্যেদ খান কিংবা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ ইউসুফ খান, এতটুকু বিষয় প্রমাণিত যে, তার পিতার নাম আব্দুল্লাহ ছিল না এবং তার মাতার নামও আমীনা ছিল না বরং ছিল আগা মালিক। মাহ্‌দী হওয়ার আগ্রহ জাগার পরেই সে তার পিতার নাম পরিবর্তন করে রাখে আব্দুল্লাহ এবং মায়ের নাম রাখে আমীনা। এভাবে নাম পরিবর্তন করে প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী কেন নাউযুবিল্লাহ আখেরী নবীও সাজা যেতে পারে। মক্কার কেউ যদি নিজের নাম এবং মাতা-পিতার নাম পরিবর্তন করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুরূপ রেখে শেষ নবী হওয়ার দাবী করে বসে, তাহলে কি সে আখেরী নবী হয়ে যাবে? তাকে যেমন সকলে জাল নবী আখ্যায়িত করবে, তদ্রূপ এই মাহ্‌দী দাবীদারকেও জাল মাহ্‌দী বলা ছাড়া আর কী বলা হবে?

তদুপরি তার বক্তব্যে সে বলেছে, "আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই দাওয়াত প্রদানের ব্যাপারে আদিষ্ট।" আরও বলেছে, "আল্লাহ্ আমার আনুগত্য করা ফরয করে দিয়েছেন।" সে আরও বলেছে, "হে লোক সকল! তোমরা আমার প্রতি ঈমান আন, যাতে তোমাদের মুক্তি নসিব হয়।" সে আরও বলেছে, "যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল।" এ জাতীয় কথা একমাত্র কোন নবী রসূলই বলতে পারেন। বস্তুত এসব বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকারান্তরে সে নবুওয়াতের দাবী করেছে। মাহ্‌দবী সম্প্রদায়ের শাখা যিক্‌রী সম্প্রদায় জৌনপূরীকে নবী মনে করত। এ থেকেও স্পষ্ট হয় যে, জৌনপূরী মূলত নবুওয়াতেরই দাবী করেছিল। আর আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর আর কেউ নবুওয়াতের দাবী করলে সে কাফের।

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপূরী ১৯ জিলক্বদ ৯১০ হিজরীতে সোমবার দিন বর্তমান আফগানিস্তানের ফারাহে ইন্তেকাল করেন।

---

৩. احسن الفتاوی جلد اول

যিক্‌রী সম্প্রদায়

যিকরী সম্প্রদায় মূলত মাহ্‌দবী সম্প্রদায়ের একটা শাখা। তারা নামাযকে অস্বীকার করত। নামাযের পরিবর্তে তারা পাঁচ ওয়াক্ত যিকির করত। সম্ভবত এ কারণেই তাদের নাম যিক্‌রী হয়ে থাকবে। আবূ সাঈদ বালিদীর মাধ্যমে মাকরানে এই ফিতনার সূচনা হয়। সে সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপুরীর হাতে বাইআত ছিল। এটা ১৫০০ শতাব্দীর কথা। যখন মাকরান অঞ্চলে বালিদীর রাজত্ব ছিল।

যিক্‌রী সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাস ও নিয়ম-নীতি

১. তারা বলত, সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপূরী আখেরী জমানার মাহ্‌দী।

খণ্ডন: এই দাবীর খণ্ডন পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

২. তারা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপূরীকে রসূলও মনে করত।

তারা স্বীয় পয়গম্বরকে সাধারণত মুহাম্মাদ মাহ্‌দী আটকী বলে। "মুহাম্মাদ মাহ্‌দী আটকী" বলে তারা মুহাম্মাদ জৌনপূরীকেই বোঝাত। তাদের ধারণা, তাদের পয়গম্বর (মুহাম্মাদ মাহ্‌দী জৌনপূরী) আটক (পাঞ্জাব) থেকে মাকরান এসেছেন। তিনি ছিলেন একটি জ্যোতি। যিনি প্রকাশিত হয়ে তাদের বড়দেরকে দ্বীনের পথ নির্দেশ করে আত্মগোপন করেছেন।[১]

খণ্ডন: তাদের এই ধারণা ভ্রান্ত। সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপূরীর গমন কখনও মাকরান এলাকায় হয়নি; বরং তিনি যখন পাঞ্জাব (ভারত) থেকে বেরিয়েছেন, তখন বেলুচিস্তানের সে রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করেছেন যেটি কান্দাহার গিয়েছে। প্রথমে কান্দাহার অতঃপর ফারাহ চলে গেছেন এবং ফারাহতেই তার ইন্তেকাল হয়েছে। এ কারণে মাকরানে তার আগমনের প্রশ্নই আসে না।

৩. তাদের কালিমা ছিল ভিন্ন, যা মুসলমানদের কালিমার পরিপন্থী। তাদের কালিমা ছিল নিম্নরূপ:[২]

প্রথমত তারা কালিমায়ে তায়্যিবাকে এভাবে পড়ত:[৩]

لاأله إلا الله محمد مهدي رسول الله.

পরবর্তীতে তারা কালিমার মধ্যে نورپاك শব্দটি সংযুক্ত করে এভাবে কালিমা পড়ত:[৪]

لاأله إلاالله نور پاك محمد مهدي مراد الله.

উল্লেখ্য যে, তারা রসূলুল্লাহ্‌র স্থলে امر الله অথবা مراد الله (আল্লাহর হুকুম বা তার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি)ও বলে।

---

১. احسن الفتاوی از ملت بیضاء صفحه/۲۷

২. সূত্র: আহ্‌সানুল ফাতাওয়া- বেলুচিস্তান গেজেটার, ৭ম খণ্ড, আরহিউজ বেলার ১৯৭০ ইং, মাকরান পৃষ্ঠা- ১১৬।

৩. عمدة الوسائل ص ١٢

৪. সূত্র: ملة بيضاء صفحه/ ١٠

তারা তাদের পাঞ্জেগানা তাসবীহাতে নিম্নোক্ত কালিমা পাঠ করত–

لا إله إلا الله الملك الحق المبين نور محمد مهدي رسول الله صادق الوعد الأمين.

অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি রাজা, তিনি বরহক, তিনি প্রকাশ-মান। নূর মুহাম্মাদ মাহদী আল্লাহ তাআলার রসূল। যার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তিনি আমানতদার।[১]

খণ্ডন: এভাবে তারা মুহাম্মাদ জৌনপূরীকে নবী মেনে নেয়ায় কুফ্‌রীতে লিপ্ত হয়েছে।

৪. তারা নামাযকে অস্বীকার করত। নামাযের পরিবর্তে তারা পাঁচ ওয়াক্ত যিকির করত।[২]

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে অস্বীকার করার পশ্চাতে তাদের যুক্তি ছিল নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্তে নামায আদায় করার কোনো প্রমাণ নেই। বরং আল্লাহ তাআলা নামাযের ধারে কাছেও যেতে নিষেধ করেছেন। কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে,

يَاۤيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ.

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নামাযের ধারে কাছেও যেও না।[৩] (সূরা: ৪-নিসা: ৪৩)

খণ্ডন: নামায শরীআতের বদীহী বিষয় (ضروريات دين)-এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব নামায অস্বীকার করা কুফ্‌রী। لاتقربوا الصلوة -এর সাথেই উক্ত আয়াতে وان تم سکاری কথাটা (যার অর্থ: নেশাগ্রস্ত অবস্থায়। পুরো আয়াতের অর্থ হবে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হুশ ফেরার আগ পর্যন্ত নামায পড়া যাবে না) উহ্য রেখে শুধু لاتقربوا الصلوة-এর অর্থ করা জেনে বুঝে বিভ্রান্তি ছড়ানো ব্যতীত আর কিছু নয়। তাছাড়া বহুসংখ্যক আয়াতে যে নামাযের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে তারা কী বক্তব্য দিতে চায়?

৫. তারা রমযানের রোযা অস্বীকার করত।

তারা রমযানের রোযা ফরয হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করত। তারা বলত, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا.

অর্থাৎ, তোমরা খাও এবং পান কর। (সূরা: ২-বাকারা: ৬০)

তারা বলত, আল্লাহ তাআলা রমযানের মধ্যে যেসব আমলের কথা বলেছেন আমরা তাই করি। আল্লাহ তাআলা খাওয়া এবং পান করার কথা বলেছেন। রমযান মাসে সেসবই আমরা করি।[৪] তারা রমযানের পরিবর্তে অন্যান্য দিনে তিন মাস আট দিন রোযা রাখার প্রবক্তা। অর্থাৎ প্রতি সোমবার, আইয়ামে বীয তথা ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে এবং যিলহজ্জের ৮ দিন। সর্বমোট তিন মাস ৮ দিন।

১. সূত্র: ذکرتوحید ومہدوی تحریک
২. সূত্র: میں ذکری ہوں صفحہ ۷
৩. عمدة الوسائل. مولانا محمد موسی صفحہ ۲۰
৪. عمدة الوسائل. مولانا محمد موسی صفحہ ۲۸

খণ্ডন: রমযানের রোযাও শরীআতের জরূরী ও বদীহী বিষয় (ضروريات دين)-এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব রমযানের রোযা অস্বীকার করাও কুফ্‌রী। কুরআনে পানাহ-ারের নির্দেশ তাদের নজরে পড়ল, কিন্তু রোযা রাখার নির্দেশটি তাদের চোখে পড়ল না কেন?

৬. তারা বাইতুল্লাহর হজ্জকে অস্বীকার করত।

তারা বাইতুল্লাহর হজ্জকে অস্বীকার করে। কা'বা ঘরকে কিবলা মনে করে না। বাইতুল্লাহর হজ্জের পরিবর্তে "কোহে মুরাদ"-এ যেয়ে হজ্জ করে। যেটি তুরবত (জেলা মাকরান) থেকে এক মাইল দূরবর্তী একটি পাহাড়।[১]

খণ্ডন: হজ্জ করাও শরী'আতের বদীহী বিষয় (ضروريات دين)-এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব হজ্জ ফরয হওয়াকে অস্বীকার করাও কুফ্‌রী।

৭. তারা কা'বা শরীফকে কিবলা বলে স্বীকার করে না।

মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা 'উমদাতুল ওয়াসাইল' কিতাবে লিখেছেন– তারা ইবাদতের উদ্দেশ্যে কা'বাকে সামনে নেয়া প্রয়োজন মনে করে না। তাদের মোল্লাই বলে।

فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

অর্থাৎ, তুমি যেদিকেই ফের না কেন, সেখানেই আল্লাহর সত্তা আছে। অতএব তারা কা'বার দিকে ফেরার প্রয়োজন মনে করে না।[২] (সূরা: ২-বাকারা: ১১৫)

খণ্ডন: কা'বা শরীফ কেবলা হওয়া কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। অতএব এটা অস্বীকার করা কুরআনকেই অস্বীকার করা।

৮. তারা চৌগান নামক এক ধরনের নাচের প্রবক্তা।

চৌগান এক ধরনের সামাজিক নাচ, যাকে ধর্মীয় রূপ দেয়া হয়েছে। এই চৌগান চাঁদনী রাতে এবং পবিত্র রাতগুলোতে সাধারণতঃ খোলা ময়দানে হয়ে থাকে। যুবক, শিশু বৃদ্ধ সবাই তাতে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করে। চৌগানে অংশগ্রহণক-ারীরা একটি বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়। আর মাঝখানে কোন সুকণ্ঠের অধিকারী পুরুষ বা নারী –যে চৌগানের পা এবং অঙ্গ সঞ্চালন সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল– দাঁড়িয়ে মাহ্দীর গুণগান এবং আল্লাহ্‌র স্তুতিমূলক কাব্য পাঠ করতে থাকে এবং সমস্ত অংশগ্রহণকারী– যাদেরকে জওয়াবী বলা হয়– কবির মুখ থেকে নিঃসৃত শব্দাব-লীর ঝংকারে আন্দোলিত হতে থাকে। কাব্যের শেষ চরণে এলে সবাই সমস্বরে সেটার কোরাশ টানতে শুরু করে। যখন চৌগানের কথা বলা হয়, তখন তারা নাচের ন্যায় গোল গণ্ডির ভিতরে থেকে উপর নিচে লাফায় এবং সম্মুখ ও পশ্চাতে আগ পিছ করতে থাকে।

১. مہدوی تحریک صفحہ ۱۷
২. عمدة الوسائل. ضفحه/ ۳۱

যিক্‌রী সম্প্রদায়ের মতে এই নাচের অনেক বড় ছওয়াব রয়েছে। তাদের মতে এতে যারা অংশগ্রহণ করে, তারা অনেক বড় ছওয়াবের অধিকারী হয়- এত ছওয়াব যে, তার কল্পনাই করা যায় না।[১]

খণ্ডন: নারী পুরুষের পর্দাহীন সম্মিলন ও নাচ-গান শরীআতে হারাম। আর হারাম কাজে ছওয়াব আছে মনে করা শরীআতের বিধানের সঙ্গে চরম উপহাসের শামিল, যা কুফ্‌রী।

৯. যিকরীগণ সহবাস ও স্বপ্নদোষের পর গোসলে বিশ্বাসী নয়। তারা শুধু দুআ করে, যা যিকিরখানায় করা হয়।[২]

খণ্ডন: সহবাস ও স্বপ্নদোষের পর কোন শরীআতসম্মত ওজর না থাকলে গোসল করা ফরয। আর কোন ফরয কাজের ফরযিয়্যাতকে অস্বীকার করা কুফ্‌রী।

১০. ইবাদত সম্পর্কে অদ্ভুত যিক্‌রী ধারণা

তাদের ইবাদত হল আল্লাহর যিক্‌র পাঁচ ওয়াক্ত। রুকু আর সিজদা তিন ওয়াক্ত। আর রোযা বছরে ৩ মাস ৮ দিন।[৩]

একটা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য

যিকরীগণ একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তন করলেও তারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য একটা অদ্ভুত ব্যাখ্যা দেয় যে, আমাদের সকল মুসলমানের দ্বীন বা ধর্ম একটি। তা হল ইসলাম। ধর্মে আমাদের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান। কিন্তু মাযহাব ভিন্ন। যেমন- হানাফী, হাম্বলী, মালিকী, শাফিয়ী, জাফরী, শশ ইমামী, যিক্‌রী, আহলে হাদীছ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের এবং তাদের সবার ধর্ম ইসলাম। আর যে ইসলাম থেকে খারেজ সে কাফের।

এ এক অদ্ভুত ইসলামী ঐক্য যে, তাদের কালিমা মুসলমানদের থেকে ভিন্ন, নামায, রোযা, হজ্জের ন্যায় ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীকে অস্বীকার, তবুও মুসলমান!

যিক্‌রী সম্প্রদায় সম্পর্কে শরয়ী ফতওয়া

যিক্‌রী সম্প্রদায় যেহেতু মুহাম্মাদ জৌনপূরীকে রসূল বলে মানে, তার নামের কালিমাও পাঠ করে এবং ইসলামের মূলনীতি- নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদিকে অস্বীক-ার করে, অন্যান্য আরও অনেক ফরয ও দ্বীনের জরূরী ও বদীহী বিষয় (ضروریات دین) কে অস্বীকার করে, এজন্য তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।[৪]

---

১. مہدوی تحریک
২. میں ذکری ہوں ج/۱ صفحہ /۴۵
৩. میں ذکری ہوں ج/۱ صفحہ /۲
৪. যিক্‌রী সম্প্রদায় সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য (খণ্ডন ব্যতীত) احسن الفتاوی جلد اول থেকে গৃহীত।

আহ্‌লে হাদীছ বা গায়রে মুকাল্লিদীন

"গায়রে মুকাল্লিদ" বলতে বোঝায় যারা তাক্‌লীদ বা আইম্মায়ে মুজ্‌তাহিদীনের অনুসরণ করার গুরুত্ব অস্বীকার করেন। তারা বলতে চান, সরাসরি কুরআন-হাদীছ থেকেই মাসআলা-মাসায়েল চয়ন করে আমল করতে হবে। কোনো ইমামের তাক্‌লীদ করা যাবে না। তারা নিজেদেরকে "আহ্‌লে হাদীছ" বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, ইসলামের চতুর্থ বুনিয়াদ হল কিয়াস। অর্থাৎ, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের কিয়াস। তাদের কিয়াস মানার অর্থ তাদের তাকলীদ করা। তাক্‌লীদের সারকথা হল কোন বুযুর্গ ও বিজ্ঞ আলেম ব্যক্তির হক্কানিয়্যাতের প্রতি আস্থা রেখে –যে, তিনি কুরআন ও হাদীছ থেকে কিয়াস করে যে উক্তি করেছেন এবং সে মোতাবেক নিজেও এ কাজটি করেছেন– তাঁর সেই কথা ও কাজের অনুসরণ করা। আর কিয়াস বলা হয়,

القياس في اللغة عبارة عن التقدير، يقال : "قست النعل بالنعل" إذا قدَّرتَه وسوَّيتَه. وعند الأ صوليين هو تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة. (قواعد الفقه)

অর্থাৎ, আভিধানিক অর্থে কিয়াস বলা হয় পরিমাপ করাকে। যেমন বলা হয়,

قست النعل بالنعل.

অর্থাৎ, একটা জুতো থেকে আর একটা জুতোর পরিমাপ করেছি।

আর শরীআতের পরিভাষায় কিয়াস বলা হয় হুকুম ও কারণের ক্ষেত্রে কোন শাখাগত বিষয়কে মূল বিষয়ের অনুরূপ করে দেয়া।

কিয়াসকে অস্বীকার করে গায়রে মুকাল্লিদগণ মূলত শরীআতের একটি বুনিয়াদকেই অস্বীকার করেছে। তদুপরি গায়রে মুকাল্লিদগণ উম্মতের এমনকি সাহাবায়ে কেরামের ইজ্‌মাকেও কার্যত অস্বীকার করেন। তারা তারাবীহ বিশ রাকআত হওয়ার বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের যে ইজ্‌মা হয়েছে, তা অস্বীকার করেন। তিন তালাকে এক তালাক নয় বরং তিন তালাক হওয়ার বিষয়ে সমস্ত আইম্মায়ে কেরামের যে ঐক্যমত্য রয়েছেও তাও অস্বীকার করেন। এভাবে ইজ্‌মাকে অস্বীকার করে তারা শরীআতের আরও একটি বুনিয়াদকে অস্বীকারকারী হলেন। শরীআতের এই দলীলদ্বয়-কিয়াস ও ইজ্‌মাকে অমান্য করার বিষয়টি নিয়েই মৌলিকভাবে গায়রে মুকাল্লিদদের সঙ্গে অন্যদের বিরোধ।

যারা কিয়াসকে সনদ মনে করেন না অর্থাৎ, কিয়াসকে দলীল হিসাবে মানেন না এবং আইম্মায়ে কেরামের তাকলীদে বিশ্বাস করেন না, তাদেরকে বলা হয় জাহিরিয়্যা, যাদের সর্দার হলেন দাউদ জাহিরী। গায়রে মুকাল্লিদগণ এই জাহিরিয়্যা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইব্‌নে হাজ্‌ম এবং আল্লামা শওকানীও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি গায়রে মুকাল্লিদ বা আহ্‌লে হাদীছ বলে যারা পরিচিত, তারা মুখে তাকলীদের বিরুদ্ধে বললেও কার্যত উপরোক্ত উলামাদের তাক্‌লীদ করে থাকেন।

পরবর্তিতে তাক্‌লীদের প্রয়োজন সম্বন্ধে কুরআন-হাদীছের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

গায়রে মুকাল্লিদী মতবাদের সূচনা

মাজাহেরে হক (مظاہر حق) গ্রন্থকার নওয়াব কুতুবুদ্দীন সাহেবের বর্ণনামতে ১২৪৬ হিজরীর পর হিন্দুস্তানে গায়রে মুকাল্লিদ ফিরকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর অগ্রণী ছিলেন মওলভী আব্দুল হক বেনারসী। তাকেই গায়রে মুকাল্লিদী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য করা হয়। সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.) তার এই তাক্‌লীদ বিরোধী ভূমিকা বনাম ফ্যাসাদের পথ গ্রহণের কারণে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করে দেন। তিনি আইম্মায়ে দ্বীনের তাক্‌লীদ করার প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন। তিনি ফোকাহায়ে কেরামের বিরুদ্ধে বিশেষত হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর বিরুদ্ধে জনমনে বিদ্বেষের বীজ বপন করেন। এ মর্মে হারামাইনের উলামায়ে কেরাম থেকে ফতওয়া চাওয়া হলে সেখানকার চার মাযহাবেরই মুফতিয়ানে কেরাম এবং আবেদ সিন্ধীর ন্যায় অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এরূপ লোকদেরকে গোমরাহ ও অন্যকে গোমরাহকারী আখ্যায়িত করে ফতওয়া প্রদান করেন। পরবর্তিতে ১২৫৪ হিজরীতে শাহ ইসহাক দেহলভীর নিকট এ মর্মে আবার ফতওয়া তলব করা হয়। তিনিও তার জওয়াবে নির্দিষ্ট ইমামের তাক্‌লীদকে ওয়াজিব (واجب مخیّر) এবং তা অস্বীকারকারীকে গোমরাহ আখ্যায়িত করেন। দেশের অন্যান্য বহু উলামা তাতে স্বাক্ষর করেন। অতপর হারামাইনের উলামা কর্তৃক প্রদত্ত ফতওয়ার সঙ্গে এই ফতওয়াকে একত্র আকারে تنبیہ الضالین (তামবীহুদ দাল্লীন) নামে প্রকাশ করা হয়।[1]

গায়রে মুকাল্লিদী মতবাদ সৃষ্টির পশ্চাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদের বিরোধিতা পূর্বক এবং মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি পূর্বক ইংরেজদের মনস্তুষ্টি সাধন একটা বড় কারণ ছিল বলে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ মুহাম্মাদ মুবারক বলেন,

جماعت غرباء اہل حدیث (اہل حدیث کی ایک شاخ) کی بنیاد محدثین کی مخالفت پر رکھی گئی تھی صرف یہی مقصد نہیں بلکہ تحریک مجاہدین یعنی سیداحمد کی تحریک کی مخالفت کرکے انگریز کو خوش کرنے کا مقصد پنہاتھا۔ (روغیر مقلدیت. بحوالہ علماء احناف اور تحریک مجاہدین صفحہ/۴۸)

অর্থাৎ, জামাআতে গুরাবায়ে আহ্‌লে হাদীছ (আহ্‌লে হাদীছের একটা শাখা)-এর বুনিয়াদ রাখা হয়েছিল মুহাদ্দিছীনে কেরামের বিরোধিতার ওপর। শুধু এতটুকুই উদ্দেশ্য নয়, মুজাহিদ আন্দোলন অর্থাৎ, সাইয়্যেদ আহমদ শহীদের আন্দোলনের বিরোধিতা করে ইংরেজদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যও প্রচ্ছন্ন ছিল।

গায়রে মুকাল্লিদগণের মুরব্বী ও সেরপোরস্ত নওয়াব সিদ্দীক হাসান সাহেবের স্বীকৃতি নিম্নরূপ:

---
১. تنبیہ الضالین بحوالہٴ طائفہ منصورہ وتحفۃ العرب والعجم بحوالہٴ النجاۃ الکاملۃ۔

یہ آزادگی ہماری مذاہب جدیدہ سے (یعنی تحریک اہل حدیث، ناقل) عین مراد قانون انگلیشہ ہے۔ (ردغیر مقلدیت بحالہٴ ترجمان وہابیہ مصنفہ نواب صاحب)

অর্থাৎ, ধর্ম থেকে এই স্বাধীনতা বনাম আমাদের নতুন ধর্ম ইংরেজ শাসনের উদ্দেশ্যের সমার্থবোধক।

نیز فرماتے ہیں : فرمان رواں بھوپال کو ہمیشہ آزادگی مذہب (یعنی عدم تقلید) میں کوشش رہی ہے جوخاص منشاگور نمنٹ انڈیا کاہے۔ (ردغیر مقلدیت بحوالہٴ مذکور)

অর্থাৎ, ভূপালের শাসকও সর্বদা ধর্মীয় স্বাধীনতা (অর্থাৎ, তাক্‌লীদ না করা)-এর ব্যাপারে স্বচেষ্ট ছিলেন, যা ইণ্ডিয়ান গভর্নমেন্টের খাস উদ্দেশ্য ছিল।

গায়র মুকাল্লিদগণের সকলের শায়খ (شیخ الکل فی الکل) মিয়াঁ নযীর হুসাইনের খাস শাগরেদ মওলভী মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী –যাকে আহ্‌লে হাদীছদের ওকীল বলা হত– তার স্বীকৃতি নিম্নরূপ:

اس گردہ اہل حدیث کے خیر خواہ وفادار رعایا، برٹش گورنمنٹ ہونے پر ایک بڑی روشن اورقوی دلیل ہے کہ یہ لوگ برٹش گور نمنٹ کے زیر حمایت رہنے کو اسلام سلطنتوں کے زیر سایہ رہنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ (رد غیر مقلدیت. بحالہٴ الحیاۃ بعد الممات صفحہ/۹۳)

অর্থাৎ, প্রজাহিতৈষী বৃটিশ সরকার যে এই আহ্‌লে হাদীছ দলের শুভাকাংখী, তার একটা বড় এবং জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ হল এরা বৃটিশ গভর্নমেন্টের ছায়াতলে থাকাকে ইসলামী শাসনের ছায়াতলে থাকার চেয়েও ভাল মনে করে।

মওলভী হুসাইন বাটালবী ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ না করার মর্মে যে কিতাব লিখেছিলেন, তার জন্য ইংরেজদের পক্ষ থেকে তাকে জায়গীর প্রদান করা হয়েছিল।[1]

নামকরণ প্রসঙ্গ

গায়রে মুকাল্লিদগণের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব নওয়াব সিদ্দীক হাসান সাহেবের যুগ পর্যন্ত গায়রে মুকাল্লিদগণ নিজেদেরকে "মুওয়াহ্‌হিদীন" (موحدین/তাওহীদপন্থী) বলে পরিচয় দিতেন। কখনও তারা নিজেদেরকে "মুহাম্মাদী" বলে পরিচয় দিতেন। এই পরিচয় গ্রহণের পশ্চাতে একটা কারণ এও ছিল যে, বিরুদ্ধবাদীরা তাদেরকে ওহাবী বলে পরিচয় দিত। তখন তারা নিজেদেরকে মুহাম্মাদী বা মুওয়াহ্‌হিদীন বলে পরিচয় দিতে শুরু করেন। ১৮১৮ সনে সর্বপ্রথম তারা নিজেদেরকে "আহ্‌লে হাদীছ" নামে পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু এরপরও অনেকে তাদেরকে ওহাবী বলে আখ্যায়িত করা অব্যাহত রাখায় সরকারীভাবে তারা "আহ্‌লে হাদীছ" নামটিকে নিজেদের জন্য রেজিষ্ট্রেশন করে নেন। ১৮৮৬ সনে "এশাআতুস সুন্নাহ" পত্রিকার সম্পাদক প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ ব্যক্তিত্ব আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ লাহোরী তৎকালীন ইংরেজ গভর্নমেন্টের

---
১. ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک. مسعود عالم ندوی

কাছে তার পত্রিকার মাধ্যমে এই মর্মে আবেদন করেন যে, ওহাবী শব্দটি আহ্‌লে হাদীছ নামে খ্যাত দলটির ব্যাপারে –যারা সর্বদা ইংরেজ সরকারের নেমক হালাল এবং কল্যাণকামী এবং এ বিষয়টা সুপ্রমাণিত এবং সরকারী কাগজ পত্রেও স্বীকৃত– সংগত নয়। সেমর্মে এই দলের লোকজন অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সঙ্গে গভর্নমেন্টের নিকট আবেদন করছে যে, সরকারীভাবে তাদের জন্য ওহাবী শব্দটি বর্জন পূর্বক তাদের জন্য "আহ্‌লে হাদীছ" শব্দটি ব্যবহার করা হোক। এই বিষয়টা আবেদন আকারে মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের নিকট পেশ করেন এবং তখনকার পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর সে আবেদনকে মঞ্জুর করেন, অতঃপর মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী-কে অবগত করেন যে, আপনাদের জন্য এই নামের এ্যালটমেন্ট দেয়া গেল।[১]

তাক্‌লীদ প্রসঙ্গ

তাক্‌লীদ (تقليد)-এর আভিধানিক অর্থ গলায় হার পরিধান করানো। তাক্‌লীদের পারিভাষিক সংজ্ঞা হল–

التقلبد اتباعُ الإنسان غيرَه فيما يقول أو يفعل مُعتقِدا للحقية من غير نظر إلى الدليل، كأنَّ هذا المتَّبعَ جعل قولَ الغير أو فعلَه قلادةً في عنقه من غير مطالبة دليل.

অর্থাৎ, পরিভাষায় তাক্‌লীদ বলা হয় অন্যের কোন উক্তি বা কর্ম সঠিক- এরূপ সুধারণা-র ভিত্তিতে কোন দলীল-প্রমাণ না দেখে তার অনুসরণ করা। যেন এই অনুসরণকারী ব্যক্তি অন্যের কথা বা কাজকে প্রমাণ তলব করা ছাড়া নিজের গলার হার বানিয়ে নিল।[২]

তাক্‌লীদের সারকথা হল, কোন বুযুর্গ ও বিজ্ঞ আলেম ব্যক্তির হক্কানিয়্যাতের প্রতি আস্থা রেখে –যে, তিনি কুরআন ও হাদীছ মোতাবেক এ উক্তিটি করেছেন এবং সে মোতাবেক তিনি এ কাজটি করেছেন– তাঁর কথা ও কাজের অনুসরণ করা। আর এই অনুসরণকে সংশ্লিষ্ট কথা ও কাজের দলীল-প্রমাণ জানার উপর ঝুলন্ত না রাখা। কিন্তু তার দলীল-প্রমাণ যদি তখন জানা হয় অথবা পরবর্তীতে জানা যায়, তাহলে এটি তাক্‌লীদের পরিপন্থী নয়। মোটকথা, তাক্‌লীদে দলীল-প্রমাণ অন্বেষণ অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে দলীল-প্রমাণ জানা এর পরিপন্থী নয়।[৩]

---

১. رد غیر مقلدیت مولانا محمد راشد صاحب ا عظمی استاذ فقہ دار العلوم دیوبند. بحوالہ اشاعت السنۃ شمارہ نمبر ۲، جلد ॥ صفحہ ۳۹/۳۲-۳۲۔

২. كشاف اصطلاحات الفنون থেকে গৃহীত।

৩. কাশশাফু ইস্‌তিলাহাতিল ফুনূন, শরহে হুসামী ও শরহে মানার প্রভৃতি গ্রন্থে "তাকলীদ"-এর এরূপ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এখন যদি কেউ নিজে নিজেই তাকলীদের এমন সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন যা আমাদের তাক্‌লীদপন্থীদের বিরূদ্ধে আপত্তি হিসাবে দাঁড় হয়, তাহলে তা হবে তাদের নিজস্ব পরিভাষা, যা আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ নয়। পরিভাষায় কোন বিতর্ক নেই। এতে করে মওলভী সানাউল্লাহ অমৃতসরীর ঐই প্রশ্নেরও উত্তর হয়ে গেল, যা তিনি স্বীয় গ্রন্থ 'তাকলীদে শখ্‌সী ও সলফী' পৃষ্ঠা ৫১-৫২ তে উত্থাপন করেছেন যে, তাকলীদের অর্থ দলীলসূত্রে জানার পরিপন্থী। অতএব তাকলীদের জন্য অজ্ঞতা আবশ্যক। احسن الفتوى ج/۱

তাক্‌লীদের প্রয়োজন

১. প্রত্যেক মুসলমানের উপর মূলত আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য ও অনুসরণ করা ফরয। কুরআন এবং হাদীছের অনুসরণের মাধ্যমেই এ ফরয আদায় হবে। কিন্তু সরাসরি যারা কুরআন-হাদীছের ভাষা– আরবী বোঝেন না, কিংবা আরবী ভাষা বুঝলেও কুরআন-হাদীছ যথাযথভাবে অনুধাবন ও তা থেকে মাসআলা-মাসায়েল চয়ন ও ইজতিহাদ করার জন্য আরবী ব্যাকরণ, আরবী অলংকার, আরবী সাহিত্য, উসূলে ফেক্‌হ, উসূলে হাদীছ, উসূলে তাফসীর ইত্যাদি যেসব আনুসঙ্গিক শাস্ত্রগুলো বোঝার প্রয়োজন নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেগুলো পাঠ করেননি বা পাঠ করলেও গভীরভাবে এসব বিদ্যায় পারদর্শী হতে পারেননি, তাদের পক্ষে সরাসরি সব মাসআলা-মাসায়েল কুরআন হাদীছ থেকে চয়ন ও ইজতিহাদ (গবেষণা) করে বের করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি তা নিরাপদও নয়, বরং গভীর বুৎপত্তি ও দক্ষতার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর শিকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই স্বাভাবিক। এ কারণেই উম্মতের বড় বড় আলেম, মুহাদ্দিছ যেমন ইমাম গাযালী (রহ.) ইমাম রাযী, তিরমিযী, তাহাবী, মুযানী, ইব্‌নে হুমাম, ইব্‌নে কুদামা প্রমুখ পূর্ব যুগের ও পরবর্তী যুগের হাজার হাজার আলেম আরবী ইল্‌মে, শরীআতের ইল্‌মে পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের ইজতিহাদযে-াগ্য মাসায়েলের মধ্যে সর্বদা আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের তাকলীদের প্রবক্তা রয়েছেন এবং তাঁদের পাবন্দী করেছেন। মুজতাহিদীনের খেলাফ নিজেদের মতে কোন ফতওয়া দেয়া জায়েয মনে করেননি। সাধারণ শ্রেণীর লোকদের জন্য বিস্তারিত মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধানের জন্য এমন কোন বিজ্ঞ আলেমের স্মরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই, যিনি উপরোক্ত বিদ্যাসমূহে পারদর্শী ও দক্ষ হওয়ার ফলে সরাসরি সব মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধান কুরআন হাদীছ থেকে চয়ন ও ইজতিহাদ করে বের করতে সক্ষম। এরূপ বিজ্ঞ ও ইজতিহাদের ক্ষমতাসম্পন্ন আলেম তথা মুজতাহিদ ইমামের স্মরণাপন্ন হওয়া এবং তিনি কুরআন-হাদীছ থেকে চয়ন ও ইজতিহাদ করে সব মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধান যেভাবে বলেন তার অনুসরণ করাকেই বলা হয় উক্ত ইমামের তাকলীদ করা বা উক্ত ইমামের মাযহাব অনুসরণ করা।

২. আমলী যিন্দেগীর প্রয়োজনীয় সকল মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধানের জন্য সরাসরি কুরআনের আয়াত বা হাদীছ পাওয়া কঠিন। এ কারণেই ইজ্‌তিহাদের তথা ইজ্‌তিহাদকৃত ফেকাহ্‌ শাস্ত্রের প্রয়োজন হয়। আর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এত পরিমাণ ইল্‌ম হয় না যে, সে নিজের প্রয়োজনীয় সব মাসআলা-মাসায়েল কুরআ-ন-হাদীছ থেকে সরাসরি ইজ্‌তিহাদ করে বের করতে পারেন। এ কারণে বড় আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করতে হয় এবং তারা যেভাবে মাসআলা-মাসায়েল বলেন সেভাবে আমল করতে হয়। এটাকেই তাক্‌লীদ বলা হয়। কুরআনে কারীমে

না জানা লোকদেরকে জানা লোকদের থেকে জিজ্ঞাসা করে আমল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা যদি না জান তবে যারা জানে তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। (সূরা: ১৬-নাহ্ল: ৪৩)

যদিও এই আয়াত কোন বিশিষ্ট বিষয় সম্পর্কে এসেছে কিন্তু এর শব্দ ব্যাপক, যা সমস্ত কাজ-কারবার, আচার-ব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করছে।

৩. এমন অনেক আহকাম ও মাসায়েল রয়েছে যে সম্পর্কিত কুরআন এবং হাদীছের রেওয়ায়েত বাহ্যত পরস্পর-বিরোধী দৃষ্ট হয়, কিংবা যাতে সাহাবা ও তাবেঈনের মধ্যে অর্থ এবং উদ্দেশ্য নির্ণয় করা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এসব আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন মুজ্‌তাহিদের তাক্‌লীদ করা বৈ গত্যন্তর নেই। কেননা নিজের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকার কারণে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত মতের উপর ভরসা করে কোন এক আয়াত কিংবা কোন রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়ে এবং অন্য আয়াত কিংবা রেওয়ায়েতকে অপ্রাধান্য প্রদান করে তা ত্যাগ করতে পারছেন না এবং সেটা তাদের জন্য জায়েযও নেই। একমাত্র বিজ্ঞ মুজ্‌তাহিদ আলেমই তার যোগ্যতা থাকার কারণে কোন এক আয়াত কিংবা কোন রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দেয়া এবং অন্য আয়াত কিংবা রেওয়ায়েতকে অপ্রাধান্য প্রদান করার কাজ আঞ্জাম দিতে পারেন।

তাক্‌লীদের প্রকার

১. তাক্‌লীদে গায়রে শখ্‌সী। অর্থাৎ, নিদৃষ্ট কোন ইমামের তাক্‌লীদ না করে যে মাসআলায় যে ইমামের তাক্‌লীদ করতে মনে চায় সেটা করা।

২. তাক্‌লীদে শখ্‌সী। অর্থাৎ, সবক্ষেত্রে নির্দিষ্ট যেকোনো একজন ইমামের তাক্‌লীদ করা। তবে অন্যান্য ইমামকেও সে সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় মনে করবে, তাঁদের মতকেও সঠিক মনে করবে। কিন্তু বিবিধ দ্বীনী ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য অনুসরণ শুধু একজনেরই করবে।

তাক্‌লীদের হুকুম

তাক্‌লীদ করা সাধারণ লোকদের জন্য ওয়াজিব। সাধারণ লোক বলতে বোঝায় যারা একেবারেই আরবী ও ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে ওয়কিফহাল নয়, চাই অন্য শাস্ত্র সম্বন্ধে যতই পণ্ডিত হোক না কেন, কিংবা আরবী ভাষা সম্বন্ধে অবগত কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইমলামী শিক্ষা অর্জন করেননি। অথবা নামকা-ওয়াস্তে ইসলামী শিক্ষা অর্জন করলেও গভীর পাণ্ডিত্য এবং দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। এই সকল শ্রেণীর লোকই সাধারণ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। তাদের উপর সর্বাবস্থায় তাক্‌লীদ করা ওয়াজিব।

সাধারণ লোকদেরকে নির্দিষ্ট কোন সাহাবীর তাকলীদ করা থেকে বাধা দেয়ার ব্যাপারে মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের ইজ্‌মা' বা ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বরং সাধারণ লোকদের উপর আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের অনুসরণ করা ওয়াজিব।[1]

তাক্‌লীদ যে ইমামেরই হোক যেকোনো এক জনেরই তাকলীদ করা ওয়াজিব। এক এক মাসআলায় এক এক জনের অনুসরণ করার অবকাশ নেই এবং সেরূপ করা জায়েযও নয়, কারণ তাতে সুবিধাবাদ ও খাহেশাতের অনুসরণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তার ফলে গোমরাহীর পথ উন্মুক্ত হয়।

ইতিহাসে মুজতাহিদ ইমাম অনেকেই অতিবাহিত হয়েছেন। তবে তন্মধ্যে বিশেষভাবে চার জন ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছেন এবং তাদের চয়ন ও ইজতিহাদকৃত মাসআলা-মাসায়েল তথা তাঁদের মাযহাব ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে। উক্ত চার জন ইমাম হলেন হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.), হযরত ইমাম শাফিয়ী (রহ.), হযরত ইমাম মালেক (রহ.) ও হযরত ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল (রহ.)। তাঁদের মাযহাবকেই যথাক্রমে হানাফী মাযহাব, শাফিয়ী মাযহাব, মালেকী মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাব বলা হয়ে থাকে। উপমহাদেশের মুসলমানসহ পৃথিবীর অধিকসংখ্যক মুসলমান হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর তথা হানাফী মাযহাব-এর অনুসারী।

চার ইমামের তাকলীদ করার ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারও কারও ভিন্ন মত পোষণ এই ঐক্যমত্যের পরিপন্থী নয়। সম্প্রতি চার ইমামের (ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল)-এর অনুসরণ করার মধ্যে হক্কানিয়্যাত সীমাবদ্ধ। তাই অন্য কোন ইমামের অনুসরণ করাকে বাধা দেয়া হবে। কারণ অন্য কোন ইমামের মায্‌হাব সম্পর্কিত রেওয়ায়েত সংরক্ষিত নেই।[1]

قال ابن الهمام في "فتح القدير" : انعقد الإجماع على عدم العمل بالمذاهب الأربعة المخالفة للأيمة الأربعة.

অর্থাৎ, ইব্‌নে হুমাম "ফাতহুল কাদীর" গ্রন্থে বলেন, চার ইমাম বিরোধী চার মাযহাবের বিপরীত কোন আমল না করার ব্যাপারে ইজ্‌মা সংঘটিত হয়েছে।

وقال ابن حجر المكي في "فتح المبين" : أمافي زماننا فقل أيمتنا : لايجوز تقليد غير الأيمة الأربعة : الشافعي ومالك و أبي حنفة وأحمد بن حنبل.

অর্থাৎ, ইব্‌নে হাজার মক্কী "ফাতহুল মুবীন" গ্রন্থে বলেন ঃ আমাদের ইমামগণ বলেন, এই যুগে শাফিঈ, মালেক, আবূ হানীফা ও আহমদ ইব্‌নে হাম্বাল-এই চার ইমাম ব্যতীত অন্যের তাক্‌লীদ করা জায়েয নয়।

---

১. بدائع الكلام. مولانا المفتي يوسف التاؤلوي থেকে গৃহীত।
২. بدائع الكلام. مولانا المفتي يوسف التاؤلوي থেকে গৃহীত।

وقال ملا جيون في "التفسيرات الأحمدية" : والإنصاف أن انحصار المذاهب في الأربع فضل إلهي وقبولية من عند الله تعالى، لامجال فيها للتوجيهات. والأدلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : اتبعوا السواد الأعظم. وأيضا قال : من شذ شذ في النار. واتباع السواد الأعظم في تقليد الأيمة الأربعة. وهلك كثير من المتفردين ونزعوا ربقة الإسلام كما ادعاه مولانا محمد حسين البتالوي إمام غير المقلدين في إشاعة لسنة في شتى المواضع. وهذا التفرد من البعض غير خارق للإجماع لأنه لاعتداد بهم.

অর্থাৎ, তাফ্সীরাতে আহমাদিয়াতে আছে– ইনসাফের কথা হল চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া আল্লাহ্‌র এক অনুগ্রহ এবং আল্লাহ্‌র কবূলিয়্যাত। এর মধ্যে কোন ব্যাখ্যা ও দলীল-প্রমাণের অবকাশ নেই। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা বৃহৎ দলের অনুসরণ কর। তিনি আরও বলেছেন, যে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হল সে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাহান্নামে পতিত হল। বলা বাহুল্য- চার ইমামের তাক্লী-দের মধ্যেই বৃহৎ দলের অনুসরণ। এই বৃহৎ দল থেকে বিচ্ছিন্ন বহু লোক ধ্বংস হয়েছে এবং ইসলামের রজ্জু থেকে ছুটে গেছে। যেমন গায়রে মুকাল্লিদগণের ইমাম মাওলানা হুসাইন বাটালবী "ইশাআতুস সুন্নাহ" গ্রন্থের বহুস্থানে এ কথা ব্যক্ত করেছেন। আর এই গুটিকতক লোকের বৃহৎ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ইজ্মার পরিপন্থী হয় না। কেননা, তারা গ্রহণযোগ্য নয়।

সাধারণভাবে তাক্লীদের দলীল

তাক্লীদের ব্যাপারে কুরআন, হাদীছ, ইজ্মা ও কিয়াস চার ধরনের দলীল বিদ্যমান। দেখুন–

কুরআন থেকে দলীল

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা যদি না জান তাহলে যারা জানে তাদের থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও। (সূরা: ১৬-নাহ্ল: ৪৩)

আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে সাধারণ তাকলীদকে ফরয করে দিয়েছেন। এই তাকলীদের দুটো অংশ রয়েছে। একটি শখ্সী, অপরটি গায়রে শখ্সী। আয়াত কোন বিশেষ ধরনের তাক্লীদকে খাস করে উল্লেখ করেনি। ফলে এ আয়াত দ্বারা উভয় প্রকার তাক্লীদই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট এবং ফরয বলে প্রমাণিত হয়। অতএব যে ব্যক্তি তাকলীদে শখ্সীকে শিরক অথবা বিদআত বলবে সে অজ্ঞ ও গোমরাহ। কারণ, সে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক ফরযকৃত বিষয়কে শির্ক বলে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট কোন বিষয়কে বিদআত অথবা শির্ক বলা জঘন্য ধরনের পাপ।

২. সূরা নিসা-র মধ্যে বলা হয়েছে,

وَ اِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ وَ لَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَ اِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ.

অর্থাৎ, যখন তাদের কাছে ভয় বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোন সংবাদ পৌঁছে, তখন তারা তা (হুট করে) প্রচার করে দেয়। যদি তারা তা রসূল ও মুমিনদের মধ্যকার কর্তাব্যক্তিদের কাছে পৌঁছাত, তাহলে তাদের মধ্যে যারা তথ্যানুসন্ধানী তারা সেটাকে ভালভাবে জেনে নিত (এবং জেনে নিয়ে সংগত মনে করলে তা প্রচার করত, অন্যথায় তা প্রচার থেকে বিরত থাকত)। (সূরা: ৪-নিসা: ৮৩)

এ আয়াতের প্রেক্ষাপট হল– যুদ্ধকালীন কোন সংবাদ শোনামাত্রই তাহ্কীক তদন্ত না করে মুনাফিকরা তা প্রচার করত এবং সরলপ্রাণ মুসলমান তাতে বিশ্বাস করে সর্বত্র তা ছড়িয়ে দিত, ফলে রাষ্ট্রীয় ও যুদ্ধ সংক্রান্ত শৃংখলায় ব্যাঘাত ঘটত। আয়াতে এটা নিষেধ করে বলা হয়েছে এরূপ না করে তাদের উচিত ছিল ফকীহ বা সমঝদার সাহাবীদের কাছে সে সংবাদ পৌঁছে দেয়া। তাহলে তারা যথাযথ তদন্ত পূর্বক যেটা সংগত তাই করত। আয়াতটি যদিও যুদ্ধ প্রসঙ্গে, তবে তাফসীরের স্বতসিদ্ধ নীতি হল প্রেক্ষাপট বিশেষ বিষয়ের হলেও তা ধর্তব্য নয় বরং ধর্তব্য হল শব্দের ব্যাপকতা। অতএব শব্দের ব্যাপকতা থেকে এ আয়াত দ্বারা তাক্লীদের বৈধতা প্রমাণিত হয়। ইমাম রাযী তাফসীরে কবীরে, ইমাম আবূ বকর জাস্সাস আহ্কামুল কুরআনে এ আয়াত দ্বারা তাক্লীদের নীতি প্রমাণ করেছেন। স্বয়ং গায়রে মুকাল্লিদগণের সর্বজনমান্য ব্যক্তি নওয়াব সিদ্দীক খান তাফসীরে ফাতহুল বয়ানে এ আয়াত দ্বারা কিয়াস দলীল-এই নীতি প্রমাণ করেছেন। এ আয়াত দ্বারা কিয়াস-এর নীতি প্রমাণ করা যদি দূরের বিষয় না হয়, তাহলে তাক্লীদ-এর নীতি প্রমাণ করাও দূরের বিষয় হওয়ার কথা নয়।[১]

হাদীছ থেকে দলীল

১. তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে–

عن حذيفة رضـ قال : قال رسول الله عليه و سلم : اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر.

(رواه الترمذي في مناقب أبي بكر الصديق وقال : هذا حديث حسن.)

অর্থাৎ, হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা আবূ বকর ও ওমরের ইক্তিদা (অনুসরণ) করবে।

এখানে আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর ইক্তেদা করার কথা বলা হয়েছে। আর বলা বাহুল্য- ইক্তেদা বলা হয় দ্বীনী বিষয়ে আনুগত্য করাকে। এটাই তো তাক্লীদ।[২]

---

১. درس ترمذی تقی عثمانی

২. أيضا

২. বোখারী শরীফের হাদীছে আছে–

ائتموا بي وليأتم بكم من بعد كم. (رواه البخاري في باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالماموم)

অর্থাৎ, তোমরা আমার ইক্তেদা করবে এবং তোমাদের পরবর্তীরা তোমাদের ইক্তেদা করবে। হাফেজ ইব্নে হাজার আসকলানী (রহ.) ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেন,

وقيل : معناه تعلموا مني أحكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدكم وكذالك أتباعهم إلى انقراض الدنيا.

অর্থাৎ, এর অর্থ এরূপও বলা হয় যে, তোমরা আমার থেকে শরীআতের আহকাম শিক্ষা করবে এবং তোমাদের পরবর্তী তাবীঈগণ তোমাদের থেকে শিক্ষা করবে। এভাবে তাদের অনুসারীগণ কেয়ামত পর্যন্ত শিক্ষা করতে থাকবে।

ইজ্‌মা' থেকে দলীল

সাহাবায়ে কেরামের যুগে যেসব সাহাবী সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইজ্‌তিহাদ করতে সক্ষম ছিলেন না, তাঁরা ফকীহ সাহাবী থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা পূর্বক আমল করতেন। প্রত্যেক ফকীহ সাহাবী নিজ নিজ হালকায় ফতওয়া প্রদান করতেন। এরকম সাহাবী সংখ্যায় অনেক ছিলেন। আল্লামা ইব্‌নে কাইয়্যেম إعلام المُوَقَّعِيْن গ্রন্থে লিখেছেন–

والذين حفظت عنهم الفتوي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مأة ونيف وثلثون نفسا ما بين رجل وامرأة.

অর্থাৎ, "এরকম যেসব সাহাবী থেকে ফতওয়া সংরক্ষিত আছে তাঁদের সংখ্যা একশত তিরিশের উর্ধ্বে।" সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক এরূপ ফতওয়া প্রদান এবং অন্যদের তা মান্য করা তাক্‌লীদ বৈ আর কি? এ ব্যাপারে কোন সাহাবী বিরোধ করেননি তাই এটাকেও তাক্‌লীদ বিষয়ে সাহাবাদের এক প্রকারের ইজ্‌মা বলা হবে।

কিয়াস থেকে দলীল

পূর্বে বলা হয়েছে, কুরআন-হাদীছ মান্য করা জরূরী। কিন্তু যারা সরাসরি কুরআন হাদীছ থেকে মাসআলা চয়ন করতে সক্ষম নন, তাদের জন্য তাক্‌লীদ ব্যতীত কুরআন হাদীছ মান্য করা সম্ভব নয়। তাই তাক্‌লীদ করা জরূরী সাব্যস্ত হল।

বিশেষভাবে তাক্‌লীদে শখ্‌সীর দলীল

তাক্‌লীদে শখ্‌সী-র ব্যাপারেও কুরআন, তা'আমুলে সাহাবা, ইজ্‌মা ও কিয়াস- এই চার ধরনের দলীল বিদমান। দেখুন–

কুরআন থেকে দলীল

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ, অতএব যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও, যদি তোমরা না জান। (সূরা: ১৬-নাহ্‌ল: ৪৩)

এ দলীলটি সাধারণ তাক্‌লীদ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ স্বরূপ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা যদি না জান তাহলে যারা জানে তাদের থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে সাধারণ তাক্‌লীদকে ফরয করে দিয়েছেন। এই তাকলীদের দু'টি অংশ রয়েছে। একটি শখ্‌সী (ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদ), অপরটি গায়রে শখ্‌সী (ব্যক্তি নির্বিশেষে তাকলীদ)। আয়াতে কোন বিশেষ ধরনের তাক্‌লীদকে খাস করে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে এ আয়াত দ্বারা উভয় প্রকার তাক্‌লীদই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট এবং ফরয বলে প্রমাণিত হয়। কোন দলীল আম (عام) হলে সেই আম-এর অংশ- খাস (خاص)-এর জন্যও সেটাকে দলীল গণ্য করা হয়। অতএব এ আয়াত তাক্‌লীদে শখ্‌সীর ব্যাপারেও দলীল।

তা'আমুলে সাহাবা থেকে দলীল

মদীনাবাসী সাহাবীগণ তাক্‌লীদে শখ্‌সী করতেন। দলীল বোখারী শরীফের নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত–

عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم : تنفر. قالوا : لانأخذ بقولك وندع قول زيد (إلى قوله) رواه خالد وقتادة عن عكرمة. (رواه البخاري في باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت) قال الحافظ رحمه الله تعالى: زاد الثقفي فقالوا : لانبالي أفتيتنا أولم تفتنا، زيد بن ثابت يقول : لاتنفر. وفي رواية قتادة فقال الأنصار : لانتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا.

অর্থাৎ, হযরত ইকরামা বলেন যে, (একবার) মদীনাবাসীরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)কে জিজ্ঞাসা করল, কোন মহিলার ফরয তওয়াফ সম্পন্ন করার পর হায়েয এসে গেলে সে বিদায়ী তওয়াফ ব্যতীত মক্কা ত্যাগ করতে পারবে কি না? তিনি বললেন, হাঁ সে (বিদায়ী তওয়াফ ব্যতীত) মক্কা ত্যাগ করতে পারবে। তারা বলল, আমরা (এ ব্যাপারে) যায়েদ ইবনে ছাবিত-এর কথা (ফতোয়া) বর্জন করে আপনার কথা গ্রহণ করব না। (উল্লেখ্য, যায়েদ ইবনে ছাবিতের ফতোয়া ছিল সেরূপ মহিলা বিদায়ী তওয়াফ ব্যতীত মক্কা ত্যাগ করবে না।)

এই রেওয়ায়েত দ্বারা যেরূপভাবে প্রমাণিত হল যে, মদীনাবাসী বিশেষভাবে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)-এর অনুসরণ করতেন এবং তার বিপরীতে কারও কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এরূপভাবে এটাও জানা গেল যে, হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) অথবা অন্য কোন সাহাবী সেসব মুকাল্লিদদের উপর শির্‌ক অথবা কবীরা গুনাহে লিপ্ততার ফতওয়া দেননি।

হাফিজ ইব্নুল কায়্যিম (রহ.) রচিত إعلام الموقعين গ্রন্থে এবং সুনানে দারিমী-তে বর্ণিত আছে- হযরত ওমর (রা.) এই মূলনীতি নির্ধারণ করেছিলেন যে, যে মাসআলায় কোন হাদীছ পাওয়া যাবে না, তাতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ফতওয়ার উপর আমল করা হবে। যদি তার ফতওয়া না পাওয়া যায়, তাহলে উলামায়ে কেরামের পরামর্শে যে সিদ্ধান্ত হবে তার উপর আমল করা হবে। এতে স্পষ্টতই দেখা গেল হযরত ওমর (রা.) একজন মুহাদ্দিছ, ফকীহ্ এবং মুজতাহিদ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর তাকলীদকে আবশ্যক করে নিয়েছেন এবং সারা জীবন তিনি তাঁর ফতওয়া মোতাবেক নির্দেশ দিয়ে গেছেন।[১]

ইজ্‌মা থেকে দলীল

তাক্‌লীদে শখ্‌সীর উপর সাহাবীদের ইজ্‌মা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাহাবীগণ সকলেই তাক্‌লীদে শখ্‌সী করতেন। এভাবে তাকলীদে শখ্‌সীর উপর সাহাবীদের ইজ্‌মা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ (রহ.) إزالة الخفاء নামক গ্রন্থে (مقصد دوم-য়ে) তাক্‌লীদে শখ্‌সীর উপর সাহাবাদের ইজ্‌মা-এর প্রমাণ এভাবে দিয়েছেন যে, তখন ইজ্‌তিহাদের অবকাশ আছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাদীছ আছে কি না তা তালাশ করার সুযোগ আছে- সত্ত্বেও সে জাতীয় বিষয়ে খলীফা কোন দৃঢ় সংকল্প করলে তারপর আর কেউ সে ব্যাপারে কোনো বিরোধ করতেন না। কারও বিরোধিতার অবকাশ ছিল না। খলীফার রায় জানার পূর্বে কোন কাজে তারা সংকল্পও করতেন না। সবাই তখন এক মাযহাবের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। একই মত ও পথে সমবেত ছিলেন। আর তা হল খলীফার মাযহাব এবং তার মত ও পথ।[২]

এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রা.)-এর নির্ধারিত কানূন এবং আদর্শ যুগে মদীনাবাসীর আমল (تعامل مدينه) কেও প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যায়। এই কানূন ও আমলের উপর কোনো সাহাবীর কোনো অভিযোগ ছিল না। এটা (একই সঙ্গে সাধারণ তাক্‌লীদ ও) তাক্‌লীদে শখ্‌সীর ব্যাপারে সাহাবীদের ইজ্‌মার সুস্পষ্ট প্রমাণ।[৩]

কিয়াস থেকে দলীল

তাক্‌লীদে শখ্‌সী বর্জন করলে বহুবিধ ক্ষতি ও ফিত্‌না দেখা দিবে। এই ক্ষতি ও ফিত্‌না থেকে বাঁচার জন্য তাক্‌লীদে শখ্‌সী আবশ্যক। যেমন ফিত্‌নার আশংকায় হযরত উছমান (রা.) কুরআন সংকলন করার সময় সাত লোগাত বাদ দিয়ে এক লোগাত অর্থাৎ, কুরাইশদের লোগাতের উপর কুরআন সংকলন করেছিলেন এবং সর্বত্র একমাত্র সেটিই চালু করেছিলেন।

দুটো প্রশ্ন ও তার উত্তর

(১) এখন একটা প্রশ্ন হল কুরআন-হাদীছে খাস করে তাক্‌লীদে শখ্‌সী ওয়াজিব এ কথা কোথাও বলা হয়নি। তাহলে আমরা কীভাবে তাক্‌লীদে শখ্‌সীকে ওয়াজিব

১. احسن الفتاوى ج/১ থেকে গৃহীত। ২. প্রাগুক্ত। ৩. প্রাগুক্ত।

বলতে পারি? কুরআন-হাদীছে যেটাকে ওয়াজিব বলা হয়নি সেটাকে ওয়াজিব আখ্যায়িত করা যায় কি?

এ প্রশ্নের জওয়াব হল– ওয়াজিব দুই প্রকার- লিআইনিহী, লিগাইরিহী। ওয়াজিব লিগাইরিহী অর্থ স্বয়ং সে কাজটির তাগিদ শরীআত দেয়নি, কিন্তু শরীআত যেসব জিনিসকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে, সেগুলোর বাস্তবায়ন এটি ছাড়া স্বভাবত অসম্ভব। এজন্য এ বিষয়টিও ওয়াজিব হয়ে যাবে। কারণ, ওয়াজিবের ভূমিকাও ওয়াজিব। যেমন: কুরআন ও হাদীছের সংকলন এবং লিপিবদ্ধ করণের তাগিদ শরীআতের কোথাও নেই। তা সত্ত্বেও এটাকে ওয়াজিব বলা হয়। এরূপভাবে তাক্‌লীদে শখ্‌সী হল ওয়াজিব লিগাইরিহী। কারণ, তাক্‌লীদে শখ্‌সী বর্জন করাতে এরূপ কিছু অনিষ্ট রয়েছে যেগুলো থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব। মোটকথ,া ওয়াজিবের ভূমিকাও ওয়াজিব হয়ে থাকে।

তাক্‌লীদে শখ্‌সী বর্জন করায় যে ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু তাকলী-দে শখসী এ ক্ষতি থেকে হেফাজতের জন্য ভূমিকা আর এরূপ ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব, এজন্য তাক্‌লীদে শখ্‌সীও 'ওয়াজিবের ভূমিকা ওয়াজিব'-মূলনীতি অনুসারে ওয়াজিব হয়ে যাবে।

'ওয়াজিবের ভূমিকা ওয়াজিব'-মূলনীতিটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। হাদীছে এসেছে–

عن عقبة بن عامر رضـ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من علم الرمي ثم تركه فليس منا أوقد عصى. (رواه مسلم في كتاب الإمارة– باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শেখে তারপর তা ছেড়ে দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। অথবা তিনি বলেছেন, সে নাফরমানী করল। (মুসলিম)

প্রকাশ থাকে যে, তীরন্দাজী দ্বীনে কোন উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্‌র কালিমাকে বুলন্দ করা ওয়াজিব এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে তীরন্দাজী এর জন্য ভূমিকার মর্যাদা রাখে, এজন্য এটাকেও ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এটা শিখে যে ভুলে ফেলবে তাকে অবাধ্য বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তাকলীদ বর্জনে ধর্মীয় ব্যাপারে আশংকার নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও এটা থেকে বিরত থাকা নাফরমানীর অন্তর্ভুক্ত, যা এর চেয়েও মারাত্মক নাফরমানীর দিকে নিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এ থেকে হেফাজতে রাখুন।

(২) দ্বিতীয় প্রশ্ন হল– যে কোন ইমামের তাক্‌লীদ করা জায়েয ছিল এখন এক ইমাম বাদে অন্য ইমামের তাক্‌লীদ করাকে না-জায়েয সাব্যস্ত করা হলে তা কি শরীঅ-াতের জায়েয জিনিসকে না জায়েয সাব্যস্ত করার ন্যায় অপরাধ নয়?

এ প্রশ্নের জওয়াব হল– অবস্থার তাগিদে এরূপ করা খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে প্রমাণিত আছে। অতএব এটা খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের অনুসরণ। যেমন– হযরত উছমান (রা.) সাহাবীগণের ঐক্যমতে কুরআনের সপ্ত গোত্রীয় ভাষা থেকে শুধু

এক (কোরাইশী) ভাষাকে কুরআনে পাকের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যদিও সপ্ত গোত্রীয় ভাষা কুরআনেরই ভাষা ছিল, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের মারফত হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাহেশ ও মনের আকাংক্ষা অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু কুরআনে কারীম যখন আরব দেশ ছেড়ে অন্যান্য অনারব দেশে বিস্তার লাভ করল এবং বিভিন্ন গোত্রীয় ভাষায় পড়া হলে কোরআনের রদ-বদলের আশংকা দেখা দিল, তখন সাহাবীদের ঐক্যমতে সকল মুসলমানের জন্য অবধারিত করে দেয়া হল যে, এখন থেকে একমাত্র কোরাইশী ভাষায় কুরআনে কারীম লিখতে এবং পড়তে হবে। হযরত উছমান গনী (রা.) ঐ একই ভাষা অনুযায়ী সমস্ত কুরআন লিখে জগতের দিকে দিকে পাঠিয়ে দিলেন এবং আজ পর্যন্ত সমগ্র উম্মত তারই পাবন্দী করছে। এর অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য গোত্রীয় ভাষাগুলো হক ছিল না। বরং দ্বীনের নেযাম ও শৃংখলা এবং রদ-বদল থেকে কুরআনের হেফাজত ও সংরক্ষণের জন্য শুধু এক ভাষাকে অবলম্বন করা হয়েছে।

তাক্লীদে শখ্সীর প্রবর্তন কখন কীভাবে হয়?

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জমানা থেকে নিয়ে দ্বিতীয় হিজরীর শেষ পর্যন্ত তাকলীদে গায়রে শখ্সীর প্রচলন ছিল। যেহেতু তখন পর্যন্ত মুজতাহিদদের মূলনীতিগুলো সুসংবদ্ধ আকারে রূপ নেয়নি, ফলে কোন সুনির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদে জটিলতাও ছিল। তাছাড়া সে যুগে অনুসারীদের মধ্যে তাক্ওয়া এবং ইখ্লাসের আগ্রহ পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকায় একাধিক মুজতাহিদের উক্তি গ্রহণ করার মধ্যে নফ্সের ধোঁকারও কোন লেশ ছিল না।

অবশেষে হিজ্রী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে হক্কানী উলামায়ে কেরাম মূল ও শাখাগত মাসায়েলগুলোর সংকলন আরম্ভ করেন এবং তাদের যোগ্য শিষ্যরা এ ধারার আরও সংকলন সংস্কার করেন। আর তৃতীয় শতাব্দীর অধিকাংশ লোক তাকলীদে শখসী রূপে তাদেরকে গ্রহণ করেন। মূল ও শাখাগত বিষয়গুলো কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে সংকলন করা হয়েছে এবং এগুলোকে পরখ করার মত এ রকম উলামায়ে রব্বানী এবং মুজতাহিদীন ছিলেন যাদের জ্ঞান এবং নির্ভরযোগ্যতা ছিল স্বীকৃত ও সর্বজন বিদিত। তাদের এই সংকলিত মাসায়েলগুলো সহজলভ্য হওয়ায় লোকজনের জন্য তার অনুসরণ অনেক সহজ হয়ে যায়।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত চার মাযহাব ছাড়া অন্যান্য মুজতাহিদেরও অনুসরণ করা হত। কিন্তু অন্যান্য মুজতাহিদের মাযহাবগুলো এরূপে সংরক্ষিত হয়নি, যার ফলে সেগুলো অনেক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সংকলিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। ফলে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পর চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন মাযহাব অবশিষ্ট থাকেনি। আর আল্লাহ্‌র রহমতে এই মাযহাব চতুষ্টয়ে তাকলীদে শখ্সী সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।[১]

১. احسن الفتاوي ج/١ من الإنصاف و عقد الجيد للشاه ولي الله الدهلوي

তাক্লীদে শখ্সী সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন ও তার উত্তর

১. আমলের জন্য নির্দিষ্ট কোন এক ইমামের তাক্লীদকে নির্ধারণ করার অর্থ হল- সে যে ইমামের তাক্লীদ করছে, সে ইমাম ব্যতীত অন্য কোন ইমাম তার নিকট তাক্লীদের যোগ্য নন কিংবা অন্যান্য ইমাম তার ইমামের ন্যায় সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় নন। এতে করে অন্যান্য ইমামকে অযোগ্য আখ্যায়িত করা হয় এবং অন্যান্য ইমামকে হেয় করা হয়।

জওয়াব

আমল করার জন্য নির্দিষ্ট কোন এক ইমামের তাক্লীদ তথা নির্দিষ্ট কোন এক মুজতাহিদকে নির্ধারণ করার অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, সে যে নির্ধারিত ইমামকে গ্রহণ করল, সে ইমাম ব্যতীত অন্য কোন ইমাম তার নিকট তাকলীদের যোগ্য নন। বরং নিজের মতে যে ইমামকে সে সঠিক এবং যার তাকলীদ করাকে সে নিজের জন্য ভাল মনে করেছে তাঁকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু অন্যান্য ইমামকেও সে সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় মনে করছে। এটা হুবহু এমন, যেমন কোন এক রুগ্ন ব্যক্তি নিজের চিকিৎসার জন্য শহরের নাম করা হেকিম- ডাক্তারের মধ্য থেকে কোন একজন হেকিম বা ডাক্তারকে নির্ধারিত করা প্রয়োজনীয় মনে করল। কেননা রোগী যদি নিজের মতে এক সময় এক ডাক্তার অন্য সময় অন্য ডাক্তারের নিকট জিজ্ঞাসা করে করে ওষুধ ব্যবহার করতে থাকে, তাহলে সেটা তার জীবন নাশের কারণ হতে পারে। তাই সে নির্দিষ্ট কোন একজন হেকিম বা ডাক্তারকে নিজের চিকিৎসার জন্য নির্বাচন করল। কিন্তু তার অর্থ কিছুতেই এ নয় যে, অন্য হেকিম বা ডাক্তার অভিজ্ঞ নয়, কিংবা তাদের মধ্যে চিকিৎসা করার যোগ্যতা নেই।[১]

২. নির্দিষ্ট কোন এক ইমামের তাক্লীদ তথা নির্দিষ্ট কোন এক মুজতাহিদকে নির্ধারণ করার ফলে অন্যান্য ইমামের অনুসারীদের সঙ্গে তার আমলগত বিরোধ দেখা দেয় এবং এর ফলে অনেক সময় দলাদলী, ফির্কাবন্দী ও ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত ঘটে। যার ফলে তর্ক, বাহাছ ও মুনাযারাও হতে দেখা যায়।

জওয়াব

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে নির্দিষ্ট কোন এক ইমামের তাক্লীদ তথা নির্দিষ্ট কোন এক মুজতাহিদকে নির্ধারণ করার অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, অন্য কোন ইমাম তাক্লীদের যোগ্য নন বা সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় নন। হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী সব মাযহাবকেই হক বলে ফতওয়া দেয়া হয়েছে এবং সব ইমামকেই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে বলা হয়েছে। এসত্ত্বেও এসব মাযহাবের নামে যে বিভক্তি উম্মতের মধ্যে কায়েম হয়েছে এবং এটা নিয়ে যে দলাদলী, ফির্কাবন্দী এবং পরস্পর ঝগড়া-বিবাদের তুফান ছুটানো হয়েছে, তা কাম্য নয় এবং সুধী আলেমগণ কখনও সেটাকে ভাল মনে করেননি।

১. মা'আরিফুল কুরআন, ৫ম খণ্ড থেকে সংক্ষেপিত।

কোন কোন অজ্ঞ অতি উৎসাহী লোক কর্তৃক অন্য মাযহাবের লোকদেরকে ভ্রান্ত আখ্যায়িত করার ফলে এ নিয়ে ইল্‌মী আলোচনা এবং সত্য ও হক উদঘাটনের নিমিত্তে তর্ক-বাহাছ ও মুনাযারার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং এসব ইল্‌মী আলোচনা এবং সত্য ও হক উদঘাটনের নিমিত্তে পরিচালিত এসব আলোচনাই তর্ক-বাহাছ ও মুনাযার-ার রূপ ধারণ করেছে এবং পরে একে অপরের প্রতি ধিক্কার-তিরস্কারের ঘটনার উদ্ভব হয়েছে।[১]

ওয়াহ্‌হাবী বা সালাফীগণ

"ওয়াহ্‌হাবী" মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল ওয়াহ্‌হাব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামী সম্প্রদায়ের নাম। আরবস্থ এ দলটি নিজেদেরকে "সালাফিয়া" পরিচয় দিতে পছন্দ করেন।

মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল ওয়াহ্‌হাব ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে "উয়ায়না"-তে তামীম গোত্রের শাখা গোত্র বনূ সিনান বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ৮৯ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি বসরা, বাগদাদ ও কুর্দিস্তানে বহু বৎসর বসবাস করেছেন। নাদির শাহের শাসনামলে (১১৪৮/১৭৩৬) ইসফাহানে গমন করেন এবং এরিস্টোটি-লয় দর্শন, ইশরাকিয়া মতবাদ ও সুফিতত্ত্ব চর্চা করেন। সেখান থেকে কুম গমন করেন। এখানে তিনি হাম্বলী মাযহাবের উৎসাহী সমর্থকে পরিণত হন। এখান থেকে তিনি তার জন্মস্থান উয়ায়নায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং তার রচিত "কিতাবুত তাওহীদ"-এ লিপিবদ্ধ মতবাদ প্রচার শুরু করেন। এতে তিনি কিঞ্চিত সাফল্য অর্জন করলেও প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হন। বিরোধীদের মধ্যে তার ভাই সুলাইমান এবং চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ হুসাইন-এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক বর্ণনা অনুসারে চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে তার এই বিবাদের সূত্র ধরে শেষ পর্যন্ত ইয়ামামা-র তামীম গোত্রের মধ্যে খুনাখুনি পর্যন্ত শুরু হয়। অবশেষে উক্ত অঞ্চলের গভর্নরের নিকট তার নির্বাসে-নর দাবী উত্থাপিত হয়। ফলে তিনি পরিবার পরিজনসহ সেখান থেকে বিদায় নিয়ে দারইয়ায় গমন করেন। সেখানকার সর্দার মুহাম্মাদ ইব্‌নে সউদ তার চিন্তাধারা গ্রহণ করেন এবং তার সংরক্ষণ ও প্রচারের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। এভাবে উক্ত অঞ্চলের শাসন কর্তৃত্ব ইব্‌নে সউদের হাতে থাকলেও মুহাম্মাদ ইব্‌নে আবদিল ওয়াহ্‌হাব ধর্মীয় ব্যাপারে নেতৃত্বের অবস্থানে চলে আসেন। ১৭৬৫ সালে ইবনে সউদের ইন্তেকালের পর তার পুত্র আব্দুল আযীযও মুহাম্মাদ ইব্‌নে আবদিল ওয়াহ্‌হাবকে ধর্মীয় নেতারূপে বহাল রাখেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌নে আবদিল ওয়াহ্‌হাব শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষাও দিতে আরম্ভ করেন। এভাবে গড়ে তোলা তার প্রশিক্ষিত অনুসারী দলটি রিয়াদ দখলের জন্য ১৭৪৭ সনে রিয়াদের শায়খ দাহ্‌হামের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আবদুল আযীয এই যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ করার পর ১৭৭৩

১. মা'আরিফুল কুরআন, ৫ম খণ্ড থেকে সংক্ষেপিত।

সালে আব্দুল আযীয রিয়াদ দখল করেন। ১৮০৩ সালে এই ওয়াহ্‌হাবী নেতা (প্রথম আব্দুল আযীয) নিহন হন। তার পুত্র সউদ পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক পিতার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হন। গালেব পাশা মক্কা ত্যাগের (১৮০৩ সাল) পর এই সউদ বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন। ১৮০৪ সালে তিনি মদীনা এবং ১৮০৬ সালে জেদ্দা দখল করেন। ১৮১৪ সালে সউদের ইন্তেকাল হয়। তার পুত্র আব্দুল্লাহ তার স্থলাভিষিক্ত হন। পরবর্তীতে ইব্রাহীম পাশার নেতৃত্বে এই আব্দুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল আব্দুল্লাহ আত্মসমর্পন করেন। এভাবে ওয়াহ্‌হাবী রাজ্যের পতন হয়। পরবর্তীতে সউদের তুর্কী বামীয় এক চাচাতো ভাই বিদ্রোহ পরিচা-লনা পূর্বক আবার ওয়াহ্‌হাবী রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সামান্য কিছু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ওয়াহ্‌হাবী রাজ্য চলতে থাকে। অবশেষে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আব্দুল আযীয পুনরায় নাজদের আধিপত্য অর্জনে সক্ষম হন এবং তারই বংশে অদ্যাবধি সউদী শাসন করায়ত্ব রয়েছে। এই রাজকীয় ফ্যামিলী কর্তৃক মদদপুষ্ট ও আনুকূল্য প্রাপ্ত হয়ে ওয়াহ্‌হাবী বনাম সালাফী মতবাদ অগ্রসর হয়ে চলেছে।

মিসর, ইরাক, আফগানিস্তান, হিন্দুস্তান প্রভৃতি দেশের কিছু আলেমও তাদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হন। মুহাম্মাদ আব্দুহু মিসরী, জামাল উদ্দীন আফগানী, খায়রুদ্দীন তিউনিসী, সিদ্দীক হাছান খান ভূপালী (ভারত), আমীর আলী (কলিকাতা) প্রমুখ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

এই ওয়াহ্‌হাবী বা সালাফী মতবাদের সূচনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব বিদআত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। সেকালে ইসলামে যে সব বিদআত অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল যেমন ওলি-আল্লাহদের কবরে সৌধ নির্মাণ করা, কবরকে সাজদার স্থানে পরিণত করা, ইত্যাদির বিরুদ্ধে তিনি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। এতটুকু পদক্ষেপকে জমহুরে উম্মত প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেন।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি ও তার অনুসারীগণ বেশ কিছু বাড়াবাড়ি করে ফেলেন যা জমহুরে উম্মত মেনে নেননি। যেমনঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহকেই সমূলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা, এসব স্থান থেকে কোনোরূপ বরকত লাভ করা (تبرک بالمکان)-এর ধারণাকে সমূলে অস্বীকার করা, পীর মুরীদীর বাড়াবাড়িকে প্রতিহত করতে যেয়ে সমূলে আধ্যাত্মিক সাধনার সিলসিলাকেই অস্বীকার করে বসা, বুযুর্গদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে নাজায়েয সাব্যস্ত করা, তাকলীদকে খারাপ মনে করা এবং চার মাযহাবের বাইরে ইজতিহাদ করাকে আলেমদের কর্তব্য বলে সাব্যস্ত করা ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখ্য যে, বৃটিশ ভারতের রায়বেরেলী জেলার অধিবাসী হযরত সাইয়্যেদ আহমদ (রহ.) যে সংস্কার ও আযাদী আন্দোলন পরিচালনা করেন আরব দেশীয় উপরোক্ত ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলনের সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তাঁর এই আযাদী আন্দোলনকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার এটাকে ওয়াহ্‌হ-

াবী আন্দোলন নামে অভিহিত করে। পরবর্তীতে এই সূরে সূর মিলিয়ে যে কোন বিদআত ও কুসংস্কারবিরোধী উলামাকে ওয়াহ্হাবী বলে আখ্যায়িত করার একটা অপপ্রয়াস এই উপমহাদেশে পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। যদিও বিদআত ও কুসংস্কার-বিরোধী এই উলামা হযারাত আরব দেশীয় ওয়াহ্হাবীদের সঙ্গে কোনোভাবেই জাড়িত নন এবং তাদের বাড়াবাড়ি ও জমহুর উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা পোষণের সঙ্গেও আদৌ একমত নন। নাচ-গান ও মদপন্থী বেশরা লোকেরাও সুন্নী লোকদেরকে ওহাবী বলে গালী দিত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ذخیرۂ کرامت- গ্রন্থের বর্ণনামতে হিন্দুস্তানের এক শহরে ওহাবী অভিযোগে গ্রেফতার হওয়ার পর তার সম্পর্কে আর একজন তাড়ী পান করতে দেখেছে বলে সাক্ষী দেয়ার পর তাকে ওহাবী অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার কথা এবং অন্য একজনের ব্যাপারে তাকে নাচ দেখতে দেখা গেছে সাক্ষী দেয়ার পর তাকে ওহাবী অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

ওয়াহ্হাবী বা সালাফীগণ জমহুরে উম্মতের চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন যেসব চিন্তাধারা পোষণ করেন তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল। (এখানে উল্লেখ্য যে, সালাফীদেরকে আমরা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে বহির্ভূত মনে করি না। তবে তাদের মধ্যে কেউ ইজমাকে অস্বীকার করলে তার কথা ভিন্ন। যাহোক তাদের সঙ্গে জমহুরে উম্মতের বেশ কিছু বিষয়ে বিরোধ রয়েছে। সেগুলো উল্লেখ করার জন্য এ কিতাবে তাদের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।)

ওয়াহ্হাবী বা সালাফীগণ প্রধানত ৬টা বিষয়ে জমহুরে উম্মতের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। যথা:-

১. তাক্লীদ প্রসঙ্গ
২. তাসাওউফ প্রসঙ্গ
৩. দুআর মধ্যে ওসীলা প্রসঙ্গ
৪. তাবীজ-কবচ প্রসঙ্গ
৫. تبرک بالمکان বা বুযুর্গানে দ্বীন ও অলী-আউলিয়াদের স্মৃতিবিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ প্রসঙ্গ
৬. রওযায়ে আতহার যিয়ারতে যাওয়ার নিয়ত প্রসঙ্গ

এ ৬টা বিষয়ের মধ্যে পূর্বে তাক্লীদ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তাসাওউফ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা হবে। অবশিষ্ট চারটা বিষয়ের প্রত্যেকটা সম্বন্ধে নিম্নে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা পেশ করা হল।

দুআর মধ্যে ওসীলা প্রসঙ্গ

দুআর মধ্যে ওসীলা কয়েক ধরনের হতে পারে। যথা:

১. কোন নেক আমলের ওসীলা দিয়ে দুআ করা। চাই নিজের আমলের দ্বারা হোক, অথবা অন্যের আমলের দ্বারা। অর্থাৎ, দুআর মধ্যে এভাবে বলা যে, হে আল্লাহ! আমার অথবা অন্যের অমুক নেক আমল, যে আমলকে আপনি পছন্দ করেন, তার

ওসীলায় আমার দুআকে কবূল করুন।

২. কোন জীবিত নেককার মকবূল বান্দার (নবী হোক বা ওলী) ওসীলা দিয়ে দুআ করা যে, হে আল্লাহ! অমুক মকবূল বান্দার ওসীলায় অর্থাৎ, তাঁর উপর তোমার যে রহমত রয়েছে তার ওসীলায় দুআ করি।

৩. কোন মৃত নেককার মকবূল বান্দার (নবী হোক বা ওলী) ওসীলা দিয়ে দুআ করা।

এর মধ্যে প্রথম দুই প্রকার ওসীলা জায়েয বরং মুস্তাহাব- তা নিয়ে কোনো মতবিরোধ নেই। তৃতীয় প্রকার ওসীলা নিয়ে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। নিম্নে ৩ প্রকার ওসীলার দলীল উল্লেখ করা হল।

প্রথম প্রকার ওসীলা-এর দলীল

নেক আমলের ওসীলা দিয়ে দুআ করা জায়েয- এ বিষয়ে দলীল হল বোখারী ও মুসলিম শরীফের প্রসিদ্ধ ঐ হাদীছ, যাতে তিন ব্যক্তির এক গুহায় আটক হওয়া এবং তিন জনের বিশেষ তিনটি নেক আমল (পিতা-মাতার খেদমত করা, যেনা থেকে বেঁচে থাকা ও মজদূরের পাওনা সঠিকভাবে আদায় করা)-এর ওসীলা দিয়ে দুআ করার পর দুআ কবূল হওয়া এবং গুহার মুখ থেকে পাথর সরে যাওয়ার কথা বর্ণিত আছে।[১]

দ্বিতীয় প্রকার ওসীলা-এর দলীল

(এক) এক অন্ধ ব্যক্তিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তাঁর ওসীলা দিয়ে দুআ করতে শিক্ষা দেন এবং সেভাবে দুআ করায় তার চোখ ভাল হয়ে যায়। হাদীছটি এই-

عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : ادع الله أن يعافيني. قال : إن شئتَ دعوتُ وإن شئتَ صبرتَ فهو خير لك. قال : فادعه. قال : فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه. ويدعو بهذا الدعاء اللهم أني اسألك واتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي. اللهم فشفعه في. (رواه الترمذي في أبواب الدعوات- باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذه في دبر كل صلوة. حديث رقم ٣٥٧٨ وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب. اهـ قال صاحب إنجاح الحاجة : والحديث أخرجه النسائي الترمذي وقال الترمذي : حسن صحيح وصححه البيهقي وزاد وقد أبصر. وفي رواية ففعل الرجل فيرى.)

অর্থাৎ, হযরত উছমান ইবনে হানীফ থেকে বর্ণিত যে, এক অন্ধ ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে আবেদন করল, আমার জন্য দুআ করুন আল্লাহ যেন আমার চোখ ভাল করে দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি চাইলে দুআ করে দিব আর চাইলে সবর করতে পার, সেটাই তোমার

---

১. رواه البخاري في كتاب الأنبياء- باب حديث الغار، ورواه مسلم في كتاب الذكر- باب قصة أصحاب الغار-

জন্য উত্তম। সে বলল, আপনি দুআ করে দিন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন সে যেন ভাল করে উযূ করে নেয় এবং এই দুআ করে যে,

اللهم أني اسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم فشفعه فيَّ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আবেদন করছি। তোমার নবী, রহমতের নবী মুহাম্মাদের ওসীলা দিয়ে তোমার প্রতি মনোযোগী হচ্ছি। (হে নবী) তোমার ওসীলা দিয়ে আমার প্রতিপালকের নিকট আমার এই প্রয়োজনের ব্যাপারে দুআ করছি যাতে আমার প্রয়োজন পূর্ণ হয়। (তিরমিযী)

(দুই) বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে– অনাবৃষ্টি দেখা দিলে হযরত ওমর (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর ওসীলা দিয়ে বৃষ্টি কামনা করতেন এবং এটা ছিল হযরত আব্বাস (রা.)-এর জীবিত থাকাকালী-ন। রেওয়ায়েতের আরবী ইবারত নিম্নরূপ।

عن أنس رض. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال : فيسقون. (رواه البخاري في أبواب الاستسقاء– باب سوال الناس الإمامَ الاستسقاء إذا قحطوا)

গায়রে মুকাল্লিদদের ইমাম শাওকানী (রহ.) উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন,

ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة.

(نيل الأوطار ج/٤ صفحه/٩ وعمدة القاري ج/٣ صفحه/٤٣٧ وفتح الباري ج/٢ صفحه/٣٧٧)

অর্থাৎ, হযরত আব্বাস (রা.)-এর ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়, নবী পরিবার ও নেককার বুযুর্গদের ওসীলায় সুপারিশ অন্বেষণ করা মুস্তাহাব।

তৃতীয় প্রকার ওসীলা তথা
মৃতদের দ্বারা ওসীলা জায়েয হওয়ার দলীল

তৃতীয় প্রকার ওসীলা জায়েয কি না এ বিষয়েও কোন মতবিরোধ ছিল না। সর্বপ্রথম ইব্‌নে তাইমিয়া (রহ.) এ বিষয়ে মতবিরোধের সূচনা করেন। তিনি মৃত এবং জীবিতদের ওসীলার মধ্যে পার্থক্য করেন এবং বলেন, জীবিত নবী বা ওলীর ওসীলা প্রদান জায়েয, তবে মৃত নবী বা ওলীর ওসীলা প্রদান জায়েয নয়। ইব্‌নে তাইমিয়া (রহ.)-এর পূর্বে ওসীলার ক্ষেত্রে জীবিত ও মৃতদের মাঝে পার্থক্য করার এই নীতি উম্মতের কেউ গ্রহণ করেননি। তিনিই সর্বপ্রথম এই পার্থক্য সৃষ্টি করে এ বিষয়ে উম্মতের মাঝে বিভেদের সূচনা করেন। এবং বর্তমানে ইব্‌নে তাইমিয়ার ভক্ত সালাফি-য়া ও গায়রে মুকাল্লিদগণ এ মতটার সপক্ষে প্রচার করছেন এবং এরূপ ওসীলা জায়েয

হওয়ার প্রবক্তা জমহুরে উম্মতকে এ কারণে মুশরিকদের পর্যায়ভুক্ত সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। তারা বলতে চান, ওসীলা জায়েয হওয়া সম্পর্কিত উক্ত রেওয়ায়েতসমূহ জীবিতদের দ্বারা ওসীলা গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মৃতদের দ্বারা ওসীলা গ্রহণ করা হয়েছে-এমন কোনো স্পষ্ট রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না এবং মৃতদের দ্বারা ওসীলা জায়েয হওয়ার কোনো দলীল নেই। অথচ তাদের এ বক্তব্য অজ্ঞতার পরিচায়ক। কারণ, এ ব্যাপারে জমহুরে উম্মতের মতের পক্ষে কুরআন, হাদীছ ও কিয়াস- এই তিন ধরনের দলীল রয়েছে। নিম্নে দলীলসমূহ দেখুন।

কুরআন থেকে দলীল

وَ لَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا. الآية.

অর্থাৎ, আর যখন তাদের কাছে আসল তাদের নিকটস্থ কিতাবের সত্যায়নকারী কিতাব, (তারা তা প্রত্যাখ্যান করল) যদিও তারা পূর্বে কাফেরদের বিরুদ্ধে (তার ওসীলায়) বিজয় কামনা করত। (সূরা: ২-বাকারা: ৮৯)

এ আয়াতে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণ করার পূর্বে ইয়াহূদীরা তাঁর ওসীলায় মুশরিকদের বিরুদ্ধে সফলতা ও সাহায্য লাভের দুআ করত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম এ পদ্ধতিকে অস্বীকার করেনি। যার দ্বারা বুঝা যায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওসীলায় দুআ করার বিষয়টি শুধু তাঁর জীবদ্দশার সাথেই খাস নয়।

হাদীছ থেকে দলীল

عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في حاجة له، فكان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف : ائت الميضاة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قال : اللهم إني اسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني اتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك ورح إلى حين اروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم أتى باب عثمان، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال : حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال له : ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، وقال : ما كانت لك من حاجة فائتنا. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له : جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. فقال عثمان بن حنيف : والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أو تصبر ؟ فقال : يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق عليَّ. فقال له النبي صلى

الله عليه وسلم : ائت الميضاة وتوضأ . ثم صلى ركعتين ثم ادع بهذو الكلمات. فقال عثمان بن حنيف. فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل عليه الرجل كأنه لم يكن به ضرر قط. (قال الهيشمي في مجمع الزوائد [ج/٢ صفحه/٢٧٩] : قلت : روي الترمذي وابن ماجة طرفا من آخره خاليا عن القصة وقد قال الطبراني عقبه : الحديث صحيح بعد ذكر طرقه التي رُوِي بها.)

এ হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যুর পর সাহাবী হযরত উছমান ইব্‌নে হানীফ (রা.)-এর শেখানো মোতাবেক জনৈক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওসীলা দিয়ে দুআ করায় তাঁর দুআ কবূল হওয়ার কথা স্পষ্টত বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এই হযরত উছমান ইব্‌নে হানীফ সেই সাহাবী যার সামনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক অন্ধকে নিজের (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) ওসীলা দিয়ে দুআ করার কথা শিক্ষা দিয়েছিলেন। (যে রেওয়ায়েত পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।) হযরত উছমান ইব্‌নে হানীফ (রা.) তা থেকে বুঝেছিলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলায় দুআ করার বিষয়টি শুধু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশার সাথেই খাস নয়। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর তিনি হাদীছে উল্লেখিত ব্যক্তিকে অনুরূপ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওসীলা দিয়ে দুআ করার শিক্ষা দিলেন।

কিয়াস থেকে দলীল

মৃতদের দ্বারা ওসীলা গ্রহণকে জীবিতদের দ্বারা ওসীলা গ্রহণের উপর কিয়াস করা যায়। বস্তুত ওসীলা চাই জীবিতদের দ্বারাই হোক, অথবা মৃতদের দ্বারা, সত্তার দ্বারা হোক, অথবা আমলের দ্বারা, নিজের আমলের দ্বারা হোক, অথবা অন্যের আমলের দ্বারা সর্বাবস্থায় এর হাকীকত এক। সবগুলো পদ্ধতির মূলকথা হল আল্লাহ তাআলার রহমতের ওসীলা ধারণ করা এভাবে যে, অমুক মাকবূল বান্দার উপর যে রহমত রয়েছে তার ওসীলায় দুআ করি। এ ক্ষেত্রে মৃত ও জীবিতদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকার কথা নয়।

সালাফীগণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক হযরত আব্বাস (রা.)-এর ওসীলা অবলম্বন থেকে বলেছেন যে, ওসীলা জীবিতদের সাথে খাস বা বিশেষিত। নতুবা হযরত ওমর (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলা বাদ দিয়ে আব্বাস (রা.)-এর ওসীলা দিতে গেলেন কেন? এ বক্তব্যের জবাবে প্রথমত কথা হল হাদীছ দ্বারা যখন জীবিত মৃত উভয় দ্বারা ওসীলা ধারণ করা বৈধ সাব্যস্ত হল, তখন এই যুক্তির বৈধতা কোথায়? দ্বিতীয়ত হযরত ওমর (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবর্তে হযরত আব্বাস (রা.)-এর দ্বারা কেন ওসীলা গ্রহণ করলেন তারও কয়েকটি উপযুক্ত কারণ ও ব্যাখ্যা হতে পারে। যথা:–[১]

১. احسن الفتاوي ج/١ – থেকে গৃহীত।

১. এ ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য ছিল যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলা ধারণ করার দু'টি পদ্ধতি। প্রথমত তাঁর সত্তার ওসীলা ধারণ করা, দ্বিতীয়ত তাঁর নিকটাত্মীয়ের ওসীলা ধারণ করা।
২. এটা বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম ছাড়া ওলী-আউলিয়া এবং নেক্কারদেরকেও ওসীলা বানিয়ে দুআ করা যায়, তাঁদের ওসীলাও বরকতের কারণ ও রহমত-আকর্ষক।

সালাফী এবং গায়রে মুকাল্লিদগণ এরপরও যদি জীবিত এবং মৃতদের মাঝে পার্থক্য করতে চান, তাহলে আমরা বলব, যদি জীবিত এবং মৃতদের মাঝে কিছু পার্থক্য করতেই হয় তাহলে মৃতদের ওসীলা গ্রহণের বিষয়টি বেশি গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। কারণ, জীবিত মানুষ অবস্থার পরিবর্তন থেকে নিরাপদ নয়। এ জন্য হাদীছ শরীফে আছে, যদি কারও অনুসরণ করতে চাও তাহলে মৃতদের অনুসরণ কর। হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে–

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه (قال) : من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحيَّ لاتؤمن عليه الفتنة. الحديث. رواه رزين. (مشكوة المصابيح)

অর্থাৎ, কেউ যদি কারও আদর্শ অনুসরণ করতে চায়, তাহলে সে যেন মৃতদের আদর্শের অনুসরণ করে। কারণ, জীবিত ব্যক্তি ফিতনা থেকে নিরাপদ নয়। (মিশকাত)

সারকথা, নেক আমল দ্বারা এবং জীবিতদের দ্বারা ওসীলা গ্রহণের মত মৃতদের দ্বারাও ওসীলা গ্রহণ কুরআন, হাদীছ ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। এমনকি বলা যায় সাহাবীদের ঐক্যমত্য দ্বারা জীবিতদের ওসীলা ধারণ করা মুস্তাহাব বলে প্রমাণিত। কারণ, হযরত উছমান ইব্‌নে হানীফের আমলের ব্যাপারে কোনো সাহাবীর বিরোধিতা (نكير) বর্ণিত হয়নি। অতএব মৃত নেককার ওলী-আউলিয়া এবং নবীগণের ওসীলা ধারণ করা উত্তমরূপে মুস্তাহাব হবে।

ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ-কবচ প্রসঙ্গ

এখানে দুটো বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। যথা:–

১. ঝাড়-ফুঁকের বিষয়

কুরআনের আয়াত, আল্লাহর নাম ও দুআয়ে মাছূরা (যেসব দুআ হাদীছে বর্ণিত আছে) দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। বহু সহীহ হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম ঝাড়-ফুঁক করতেন বলে প্রমাণ রয়েছে। এসব ঝাড়-ফুঁক ছিল কুরআন ও আসমায়ে হুসনা দ্বারা। এ কারণে এরূপ ঝাড়-ফুঁক সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। "লুমআতঃ কিতাবে বলা হয়েছে,

وهى جائزه بالقرآن الأسماء الإلهية وما في معنا ها بالاتفاق. (اللمعات)

অর্থাৎ, কুরআন, আল্লাহ্‌র আসমায়ে হুছনা ও অনুরূপ অর্থ বিশিষ্ট কিছু দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয।

তবে পাঁচ ধরনের ঝাড়-ফুঁক জায়েয নয়।

১. যে কালামের অর্থ জানা যায় না (অবোধগম্য ভাষা) তার দ্বারা।

২. আরবী ছাড়া অন্য ভাষায়।

৩. কুরআনের আয়াত, আল্লাহর নাম ও সিফাত এবং দুআয়ে মাছূরা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা।

৪. শিরকযুক্ত কালাম দ্বারা।

৫. ঝাড়-ফুঁকের মধ্যে নিজস্ব ক্ষমতা আছে (موثر بالذات) মনে করে তার উপর ভরসা করলে।

(উল্লেখ্য, কুরআন হাদীছের বাক্যাবলীর সাহায্যে হলেও যদি তা অবৈধ উদ্দেশ্য হাছিলে ব্যবহার করা হয়, তবে তা জায়েয নয়। যেমন: কাউকে ক্ষতি করার জন্য তাবিজ করা বা অজীফা পাঠ করা। –কাজীখান ও শামী)

যেসব হাদীছে ঝাড়-ফুঁককে নিষেধ করা হয়েছে বা ঝাড়-ফুঁককে শিরক বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য উপরোক্ত পাঁচ ধরনের ঝাড়-ফুঁক, সব ধরনের ঝাড়-ফুঁক নয়। যেমন আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছে–

إن الرُّقَى التَّمَائِمَ والتِّوَلَةَ شِرْكٌ. (رواه أبو داود في باب في تعليق التمائم)

অর্থাৎ, ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ স্ত্রীকে স্বামীর কাছে প্রিয় করার যাদু হল শির্ক।

২. তাবিজ-কবচের বিষয়

বর্তমান যুগের গায়রে মুকাল্লিদ ও সালাফীগণ তাবীজ কবচকে নিষিদ্ধ এমনকি শিরক বলে আখ্যায়িত করেন। পক্ষান্তরে অন্য সকলের নিকট তাবীজ-কবচ ও ঝাড়-ফুঁকের হুকুম একই রকম। যে ধরনের কালাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক জায়েয নয়, সেগুলো লিখে তাবীজ-কবচ ব্যবহার করাও জায়েয নয়। পক্ষান্তরে যে ধরনের কালাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক জায়েয সে ধরনের কালাম বা তার নকশা[1] দ্বারা তাবীজও জায়েয। সব শ্রেণীর উলামায়ে কেরাম এ ধরনের তাবীজ-কবচকে জায়েয বলেছেন। এমনকি সালাফীগণ পদে পদে যার তাক্লীদ করেন সেই ইব্নে তাইমিয়া (রহ.)ও বলেছেন,

ويجوز أن يكتب للمُصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله وذكه بالمداد المباح ويغسل ويسقى. (فتاوي ابن تيمية ج/١٩ صفحه/٦٤)

অর্থাৎ, অসুস্থ প্রমুখ বিপদগ্রস্ত লোকদের জন্য কালি দ্বারা আল্লাহ্র কিতাব, আল্লাহ্র যিক্র লিখে দেয়া এবং ধুয়ে পান করানো জায়েয।

গায়রে মুকাল্লিদগণ যে আল্লামা শাওকানীকে ইমাম হিসাবে মান্য করেন, তিনিও বলেছেন, সমস্ত ফকীহের নিকট এ ধরনের তাবীজ জায়েয।[2]

---

১. ابجد-এর হিসাবে তাবীজ লেখাও জায়েয। এটাও এক ধরনের বোধগম্য ভাষা। (احسن الفتوى ج/٨)

২. نيل الأوطار.

তাবীজ জায়েয হওয়ার পক্ষে জমহুরের দলীল

(١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فزع أحدكم في نومه فليقل : بسم الله ، أعوذ بكلمات الله التامات من ومن شر غضبه وسوء عقابه ومن شر عباده ومن شر الشياطين وما يحضرون. فكان عبد الله (يعنى بن عمرو رضـ) يعلمها ولدَه من أدرك منهم، ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه . (أخرجه ابن أبى شيبه في مصنفه برقم ٢٦٠١٣. وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار)

এ হাদীছে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আমর ইব্নুল আস (রা.) কর্তৃক তাঁর অবুঝ বাচ্চাদের জন্য তাবীজ লিখে দেয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা)

(٣) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. (أخرجه أبو داود في الطب – باب كيف الرقى؟)

এ হাদীছেও হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আমর ইব্নুল আস (রা.) কর্তৃক তাঁর অবুঝ বাচ্চাদের জন্য তাবীজ লিখে দেয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। (আবূ দাউদ)

(٣) عن مجاهد أنه كان يكتب الناس التعويذ فيعلقه عليهم. وأخرج عن أبي جعفر ومحمد بن سيرين وعبيد الله بن عبد الله بن عمر والضحاك ما يدل على أنهم كانوا يبيحون كتابة التعويذ وتعليقه أو ربطه بالعضد و نحوه. (اخرجها ابن ابى شيبه في مصنفه. انظر روايات ارقام ٢٤٠١١، ٢٤٠١٤، ٢٤٠١٦، ٢٤٠١٧)

এ রেওয়ায়েতসমূহে হযরত মুজাহিদ (রহ.), মুহাম্মাদ ইব্নে সীরীন (রহ.), উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও জাহ্হাক প্রমুখ কর্তৃক অন্যদেরকে তাবীজ লিখে দেয়ার কথা, তাবীজ হাতে বা গলায় বাঁধা ও তাবীজ লেখা বৈধ হওয়ার মর্মে তাদের অনুকূল মত বর্ণিত হয়েছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা)

(٤) قال عبد الله بن أحمد : قرأت على أبي ثنايعلي بن عبيد ثنا سفيان عن محمد بن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إذا عسر على المراة ولا دتها فليكتب بسم الله لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها)، (كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفسقون.)

এ রেওয়ায়েতে হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বাচ্চা প্রসবের সময় প্রসূতীর প্রসব বেদনা লাঘব করা ও সহজে প্রসব হওয়ার জন্য বিশেষ তাবীজ শিক্ষা দেয়ার কথা

বর্ণিত হয়েছে। এ রেওয়ায়েতটি সালাফী ও গায়রে মুকাল্লিদগণের সর্বজনমান্য ব্যক্তিত্ব ইব্‌নে তাইমিয়া (রহ.) তাঁর ফাতাওয়াতে উল্লেখ করেছেন।[১]

সালাফী ও গায়রে মুকাল্লিদগণের দলীল ও তার জওয়াব

দলীল

সালাফীগণ তাবীজ-কবচ নাজায়েয হওয়া সম্পর্কে পুস্তক-পুস্তিকাও প্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে একটি পুস্তিকা হল التمائم في ميزان العقيدة. د. علي بن نفيع العلياني অনুবাদ: "আকীদার মানদণ্ডে তা'বীজ"। এর মধ্যে লেখক প্রধানত যে দলীলগুলো পেশ করেছেন নিম্নে জওয়াবসহ সেগুলো তুলে ধরা হল।

১. তাদের একটা দলীল হল কুরআনের ঐ সব আয়াত, যার মধ্যে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ দূর করাকে আল্লাহ্‌র শান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন:

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ وَ اِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত কেউ তা হটানোর নেই। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। (সূরা: ১০-ইউনুস: ১০৭)

জওয়াব

তাবীজ গ্রহণ করা এ আয়াতের পরিপন্থী হবে যদি তাবীজের মধ্যে নিজস্ব প্রভাব আছে বলে মনে করা হয় অর্থাৎ, এ বিশ্বাস করা হয় যে, তাবীজই সবকিছু করে। এরূপ মনে না করলে তাবীজ এ আয়াতের পরিপন্থী হবে না। নতুবা বলতে হবে বৈধ পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণ করাও এ আয়াতের পরিপন্থী। এ আয়াত দ্বারা তাবীজ নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল দেয়া অনেকটা শিশুসুলভ ও ভাসা জ্ঞানের পরিচায়ক।

২. তাদের আরেকটা দলীল কুরআনের ঐ সব আয়াত ও হাদীছ যাতে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। যেমন:

(١) وَ عَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌রই উপর তোমরা ভরসা কর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। (সূরা: ৫-মায়িদা: ২৩)

(٢) وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

অর্থাৎ, মুমিনগণ যেন আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা করে। (সূরা: ১৪-ইবরাহীম: ১১)

(٣) ومن تعلق شيئا وكل إليه. (رواه أحمد وبن ماجه الحاكم)

অর্থাৎ, যে কোন কিছু লটকায়, তার দিকে তাকে অর্পন করা হয়।

জওয়াব

তাবীজ গ্রহণ করা এ আয়াতের পরিপন্থী হত যদি তাবীজ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাবীজের উপরই ভরসা করা হত। কিন্তু যদি ভরসা আল্লাহ্‌র উপর থাকে এবং

১. দ্র: فتاوي ابن تيمه ج/١٩ صفحه/٦٤

তাবীজকে শুধু ওসীলা হিসাবে গ্রহণ করা হয় যেমনটি করা হয় ঔষধ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে, তাহলে আদৌ তা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী হবে না। নতুবা বলতে হবে বৈধ পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণ করাও এ আয়াতের পরিপন্থী। এ জাতীয় আয়াত দ্বারাও তাবীজ নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল দেয়া অনেকটা শিশুসুলভ ও ভাসা জ্ঞানের পরিচায়ক।

৩. তাদের আরেকটা দলীল ঐসব আয়াত, যাতে শিরকের নিন্দাবাদ করা হয়েছে। যেমন:

(١) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ .

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শির্‌ক করাকে ক্ষমা করবেন না। অন্য গোনাহ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সূরা: ৪-নিছা: ১১৬)

(٢) وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ.

অর্থাৎ, যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ে, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে। (সূরা: ২২-হজ্জ: ৩১)

জওয়াব

তাবীজের মধ্যে নিজস্ব প্রভাব আছে (অর্থাৎ, তাবীজ مؤثر بالذات -এরূপ) মনে করলেই শির্‌কের প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এরূপ মনে না করলে তাবীজ কেন শির্‌ক হবে তা কোনোভাবেই বোধগম্য নয়। অথচ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, যে ধরনের তাবীজ গ্রহণ করা জায়েয, তাও কিছু শর্ত সাপেক্ষে, আর সেই শর্তের মধ্যে রয়েছে তাবীজের মধ্যে নিজস্ব ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস না থাকা।

৪. তাদের আরও দলীল ঐ সব হাদীছ, যাতে ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজকে শির্‌ক বলা হয়েছে। যেমন:–

(١) من علق تميمة فقد أشرك. (رواه أحمد والحاكم)

(٢) إن الرُّقٰى والتَّمَائِمَ شرك. (أبو داؤد وابن ماجة)

(٣) إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا : يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال : إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال : من علق تميمة فقد أشرك. (مسند أحمد والحاكم)

তর্জমা:

(১) যে তাবীজ লটকালো, সে শির্‌ক করল।

(২) অবশ্যই ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ[১] ও স্ত্রীকে স্বামীর কাছে প্রিয় করার জাদু হল শির্‌ক।

১. تمائم শব্দের আর একটা অর্থ হল পুঁতি। এ অর্থ গ্রহণ করলে এ হাদীছ দ্বারা তাবীজ নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল দেয়া যাবে না।

(৩) এ হাদীছে বলা হয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে একদল লোক উপস্থিত হল। অতঃপর তিনি নয় জনকে বাইআত করালেন এবং একজনকে বাইআত করালেন না। তারা বলল ইয়া রসূলাল্লাহ"! নয় জনকে বাইআত করালেন আর একজনকে বাদ রাখলেন? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তার সাথে একটি তাবীজ রয়েছে। তখন তার হাত ভিতরে ঢুকালেন এবং সেটা ছিড়ে ফেললেন। অতঃপর তাকেও বাইআত করালেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তাবীজ ব্যবহার করল সে শির্ক করল।

জওয়াব

এখানে প্রথম হাদীছদ্বয়ে যে তাবীজের কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা শির্কপূর্ণ তাবীজ উদ্দেশ্য। তার প্রমাণ হল এখানে উল্লেখিত দ্বিতীয় হাদীছে ঝাড়-ফুঁককেও শির্ক বলা হয়েছে, অথচ সব ঝাড়-ফুঁক শির্ক নয়; স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামও ঝাড়-ফুঁক করতেন, যা পূর্বে সহীহ হাদীছের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব এখানে ঝাড়-ফুঁকের ক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যা দেয়া হবে তাবীজের ক্ষেত্রেও সেই ব্যাখ্যাই দেয়া হবে। বিশেষত এ ব্যাখ্যা দিতে আমরা বাধ্য এ কারণেও যে, সহীহ হাদীছে সাহাবা ও তাবিয়ীগণ কর্তৃক তাবীজ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় হাদীছে তাবীজ থাকার কারণে যে ব্যক্তির বাইআত না করা এবং তার তাবীজ খুলে ফেলার কথা বর্ণিত হয়েছে, এ দ্বারা কোনোভাবেই সব রকম তাবীজ নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল দেয়া যায় না। কারণ, সে লোকটা ইসলাম গ্রহণের জন্যই এসেছিল, অতএব মুসলমান হওয়ার পূর্বে সে যে তাবীজ লাগিয়েছিল তা নিশ্চিতই শির্কপূর্ণ তাবীজ ছিল। আর এই শির্কপূর্ণ হওয়ার কারণেই সে তাবীজ নিষিদ্ধ ছিল।

বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী-আল্লাহ্দের নিদর্শন থেকে বরকত লাভের প্রসঙ্গ

বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের নিদর্শন থেকে বরকত লাভ تبرک بآثار الصالحين। এটা দুইভাবে হয়ে থাকে।

১. তাঁদের স্মৃতি-বিজড়িত বস্তু দ্বারা বরকত লাভ। এটাকে বলা হয় تبرک بالاشیاء। যেমন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চুল মুবারক, তাঁর জুব্বা মুবারক, ইত্যাদি। এমনিভাবে ওলী-আউলিয়ার এ জাতীয় কোন বস্তু।

২. তাঁদের স্মৃতি-বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ। এটাকে বলা হয় تبرک بالمکان। যেমন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মস্থান, তাঁর উপর প্রথম ওহী আগমন ও তাঁর সুদীর্ঘ ধ্যানমগ্ন থাকার স্থান হেরা গুহা, হাজার বার ওহী আগমনের স্থান খাদীজা (রা.)-এর গৃহ, হিজরতের সময় তাঁর আত্মগোপন থাকার স্থান গারে ছাওর, দারে আরকাম, আবূ বকর ওমর প্রমুখ সাহাবীদের গৃহ ইত্যাদি।

প্রথম প্রকার অর্থাৎ, বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের স্মৃতি-বিজড়িত বস্তু দ্বারা বরকত লাভ (تبرک بالاشیاء)-এর বিষয়ে উম্মতের কারও কোনো মতবিরোধ নেই। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চুল মুবারক কাটার পর তা সাহাবাদের মধ্যে বণ্টনের কথা এবং তাঁর উযূর পানি সাহাবাগণের গায়ে মাখানোর কথা সহীহ হাদীছের বর্ণনায় বিদ্যমান। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, তাঁদের স্মৃতি-বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان) -এর বিষয়েও উম্মতের মাঝে অতীতে কোনো মতবিরোধ ছিল না। সর্বপ্রথম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ও তার শাগরেদ ইবনে কাইয়্যেম (রহ.) এ বিষয়ে মতবিরোধের সূচনা করেন। তার পর সালাফিয়াগণ এ বিষয়টা প্রচারে তৎপর ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। বর্তমানের সৌদি কর্তৃপক্ষ অনুরূপ মতপোষণ ও প্রচার করছে। তাদের মতে নবী ও ওলী-আউলিয়ার স্মৃতি-বিজড়িত বস্তু দ্বারা বরকত লাভের বিষয়টি সহীহ, তবে তাঁদের স্মৃতি-বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভের বিষয়টি সহীহ নয় বরং বিদআত।

বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের স্মৃতি-বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان)-এ বিষয়টি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে আমাদের জমহুরের মতের পক্ষে কুরআন, হাদীছ, ইজমা' ও কিয়াস-এই সব প্রকার দলীল বিদ্যমান। এতসব দলীল থাকা সত্ত্বেও যারা একে অস্বীকার করেন এবং নিজেদের মতে গোঁ ধরেন, তাদেরকে শরীআত-প্রিয় বলা কঠিন। নিম্নে জমহুরের মতের পক্ষে কুরআন, হাদীছ, ইজমা' ও কিয়াস-এই চার প্রকার দলীল পেশ করা হল।

কুরআন থেকে দলীল

سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ.

অর্থাৎ, মহান ঐ সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণে নিয়ে যান মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার আশ-পাশকে আমি বরকতময় করেছি। (সূরা: ১৭-বানী ইসরাঈল: ১)

وَ نَجَّیْنٰهُ وَ لُوْطًا اِلَی الْاَرْضِ الَّتِیْ بٰرَكْنَا فِیْهَا لِلْعٰلَمِیْنَ.

অর্থাৎ, আর আমি লূতকে উদ্ধার করে এমন এলাকায় নিয়ে যাই, যাতে জগৎবাসীর জন্য আমি বরকত রেখেছি। (সূরা: ২১-আম্বিয়া: ৭১)

এই উভয় আয়াতে শাম ও বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকাকে রবকতময় এলাকা বলে অভিহিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ এলাকা বহুসংখ্যক নবী রসূলের আগমনের এলাকা হওয়ার কারণেই সেটিকে বরকতময় এলাকা হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। এ আয়াতদ্বয়ই বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের স্মৃতি-বিজড়িত স্থান বরকতময় হওয়ার দলীল হিসাবে যথেষ্ট। এর থেকে تبرک بالمکان এর নীতিটি সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়।

হাদীছ থেকে দলীল

১. বোখারী শরীফের হাদীছে এসেছে–

عن عتبان بن مالك أنه أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال : قد أنكر بصري وأنا اصلي لقومي، فإذا كانت ا لأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم استطع أن أتي مسجدهم فاصلي، و وددت يا رسول الله إنك تاتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى. قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : سافعل إن شاء الله. قال عتبان : فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار ... فصلى ركعتين. الحديث. (رواه البخاري في باب المساجد في البيوت)

অর্থাৎ, হযরত ইত্‌বান ইব্‌নে মালেক (রা.) একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি খারাপ হয়ে গেছে। আমি আমার গোত্রের লোকদের সঙ্গে নামায পড়তাম। বৃষ্টি হলে সেখানে যাওয়ার পথ পানিতে সয়লাব হয়ে যায়। যার ফলে আমি তাদের মসজিদে নামায পড়তে যেতে পারি না। ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার আন্তরিক কামনা- আপনি আমার গৃহে তাশরীফ এনে (এক জায়গায়) নামায পড়বেন, সেই স্থানকে আমি আমার নামাযের স্থান বানাব। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অচিরেই আমি তা করব। হযরত ইত্‌বান ইব্‌নে মালেক (রা.) বলেন, পরের দিন সকাল বেলা আলো পরিষ্কার হতেই আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)কে সঙ্গে নিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার গৃহে তাশরীফ আনলেন এবং দুই রাকআত নামায আদায় করলেন ... ।

এ রেওয়ায়েত থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামায পড়া স্থানে নামায পড়ে বরকত লাভ করার জন্যই তিনি এমন আবেদন করেছিলেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তা সমর্থন পূর্বক তাকে সেরূপ বরকত লাভ করার সুযোগ দিয়েছিলেন।

২. বোখারী শরীফের হাদীছে আরও এসেছে–

হযরত ইব্‌নে উমার (রা.) মক্কা মদীনার পথে সফরকালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়া সাল্লাম যেসব স্থানে নামায পড়েছেন সেসব স্থান খুঁজে খুঁজে সেসব স্থানে নামায পড়তেন।[১] বলা বাহুল্য, বরকত লাভ করা ছাড়া এরূপ করার পিছনে ইব্‌নে উমার (রা.)-এর আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

৩. নাসায়ী শরীফের হাদীছে এসেছে–

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أُتِيْتُ بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها، فركبت ومعي جبرئيل عليه السلام، فسرت فقال : انزل فصل. ففعليت. فقال : أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر. ثم قال : انزل

১. صحيح البخاري. باب المساجد في طريق مكة و المدينة

فصل. فصليت. فقال : أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى عليه السلام. ثم قال : انزل فصل. فصليت. فقال : أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. ثم دخلت إلي بيت المقدس. الحديث. (رواه النسائي في أول كتاب الصلوة)

এ হাদীছে মে'রাজের রাতে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস যাওয়ার পথে হযরত জিব্রাঈল (আ.) কর্তৃক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তূর পর্বতে আল্লাহ তাআলা যেখানে মূসা (আ.)-এর সঙ্গে কথা বলেছিলেন সেখানে এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মস্থান বাইতে লাহামে (বেতেলহামে) বোরাক থেকে অবতরণ করিয়ে নামায পড়ানোর উল্লেখ এসেছে। এটা স্পষ্টতই এসব স্থানের বরকতের কারণে। অতএব এটা স্থানের বরকতময় হওয়ার (تبرک بالمکان)-এর স্পষ্ট দলীল।

মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্‌মীরী (রহ.) বলেছেন, এ হাদীছটি নাসাঈ শরীফ ছাড়াও ১০টি হাদীছের কিতাবে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে। তার মধ্যে রয়েছে বায্‌যার, ইব্‌নে আবী হাতিম, তাবারানী, বায়হাকী প্রভৃতি। আল্লামা সুয়ূতীর খাসায়েসে কুব্‌রা, ঝুর্‌কানীর মাওয়াহেব প্রভৃতিতেও হাদীছটি উল্লেখিত হয়েছে।[১] এসত্ত্বেও ইব্‌নে কাইয়্যেম যাদুল মা'আদ গ্রন্থে বলেছেন, বেতেলহামে নেমে নামায পড়ার রেওয়ায়েত মোটেই সহীহ নয়। তিনি কি নাসাঈ শরীফের সনদকেও অনির্ভরযোগ্য বলতে চান যা উম্মতের কেউ বলেননি? বরং নাসাঈ শরীফের কোন কোন সনদকে সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে বোখারী শরীফ থেকেও উপরের স্বীকার করা হয়েছে।

ইজমা' থেকে দলীল

ইব্‌নে তাইমিয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা' তথা ঐক্যমত্য চলে আসছিল। অতঃপর তিনি এবং পরবর্তীতে তাঁর শাগরেদ ইব্‌নে কাইয়্যেম এ বিষয়ে নতুন মতের সূচনা করেন। এভাবে এক দু'জনের বিরোধ উম্মতের ইজমা'কে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। তদুপরি তাঁদের মত কোন শক্তিশালী দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হচ্ছে।

কিয়াস থেকে দলীল

স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان)-এর বিষয়কে বস্তু দ্বারা বরকত লাভ (تبرک بالاشیاء)-এর উপর কিয়াস করা হবে। বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্‌দের স্মৃতি-বিজড়িত হওয়ার কারণে বস্তু যদি বরকতময় হতে পারে, তাহলে তাঁদের স্মৃতি-বিজড়িত হওয়ার কারণে স্থান কেন বরকতময় হতে পারবে না? তদুপরি শরীঅ-াতে স্থান বরকতময় হওয়ার নমুনাও রয়েছে। হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশমীরী (রহ.) বলেন,[২] হজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানগুলো আম্বিয়া ও সুলাহাদের

১. ملفوظات محدث کشمیری ২. প্রাগুক্ত।

স্মৃতি-বিজড়িত হওয়ার কারণেই সেগুলো আজমত ও মর্যাদার স্থান পেয়েছে। নতুবা এ স্থানগুলোর পবিত্রতা ও মর্যাদার আর কী কারণ থাকতে পারে? এটাকে স্থানের মর্যাদাপূর্ণ হওয়া ও স্থান থেকে বরকত লাভ করা ছাড়া আর কী বলা যায়? এ কারণেই সমস্ত আকাবিরে উম্মত ফয়সালা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু সমগ্র মাখলূকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই তাঁর চির শায়িত থাকার পবিত্র স্থানটিও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান। অথচ ইবনে তাইমিয়া (রহ.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমগ্র মাখলুকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁর চির শায়িত থাকার স্থানটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হিসাবে স্বীকার করেননি। বরং তিনি সমূলে কোন স্থানের বরকতময় হওয়াকেই অস্বীকার করে বসেছেন। আর আফসূস সালাফী ও গায়রে মুকাল্লিদগণও এই মতবাদ পোষণ করে চলেছেন।

স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان)-এর বিষয়কে অস্বীকারকারী সালাফীদের দলীল ও তার জওয়াব

১৯২৪ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩৪৪ হিজরীতে মক্কা মোআজ্জমায় বাদশাহ আব্দুল আযীয কর্তৃক আহুত মু'তামারে আলমে ইসলামী-এর আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে এসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। সেই কনফারেন্সে উপস্থিত আমাদের উলামায়ে কেরাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ ওছমানী প্রমুখ সালাফী ও নজদী উলামায়ে কেরামের সামনে সম্মেলনে এবং পরবর্তীতে এ বিষয়ে উপরোক্ত দলীলসমূহ তুলে ধরেন। তাঁরা এসব দলীলের কোন উত্তর না দিয়ে শুধু তাবাকাতে ইবনে সা'দ-এর একটি রেওয়ায়েত পেশ করেন, যে রেওয়ায়েতে এসেছে যে, হযরত ওমর (রা.) বাইয়াতুর রেদওয়ান (بيعة الرضوان) যে বৃক্ষের নিচে হয়েছিল সে বৃক্ষ কেটে ফেলেছিলেন। অথচ এ রেওয়ায়েতের অনেকগুলো জওয়াব রয়েছে। যথা:–

১. রেওয়ায়েতটি মুন্‌কাতি' (منقطع) কেননা এর সনদে হযরত নাফে' হযরত ইব্‌নে উমার থেকে বর্ণনা করেছেন, অথচ হযরত ইব্‌নে উমারের সঙ্গে হযরত নাফে'-এর সাক্ষাৎ হয়নি।[১]
২. এটি মারফূ' (مرفوع) হাদীছের পর্যায়ভুক্ত নয়। মারফূ' হাদীছের মোকাবিলায় এটি দলীল হতে পারে না।
৩. হযরত ওমর (রা.) এ কারণে বৃক্ষটি কেটে দেননি যে, স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان) জায়েয নয়, বরং তিনি এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি রোধ করার জন্য এটা করেছেন। স্বয়ং ইব্‌নে কাইয়্যেমও স্বীকার করেছেন যে, ওমর (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা করা। (زاد المعاد ج/١) হযরত ওমর (রা.)-এর উপরোক্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সমর্থন পাওয়া যায় এর থেকে যে, হযরত ওমর (রা.) স্বয়ং স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان)-এর প্রবক্তা ছিলেন। তার প্রমাণ হল

১. كذا في التهذيب

যখন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছিলেন, তখন কা'বে আহ্‌বারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কোথায় নামায পড়ব? কা'বে আহ্‌বার বলেছিলেন, বড় পাথর (صخرہ)-এর কাছে পড়ুন। তখন হযরত ওমর (রা.) বলেছিলেন, না, আমি তো সেখানে পড়ব যেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েছিলেন।

৪. হযরত আনওয়ার শাহ কাশমীরী (রহ.) বলেছেন, হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক বৃক্ষ কর্তনের মূল কারণ ছিল সে বৃক্ষ নির্দিষ্ট কোন্‌টি তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। এমনকি দুজন সাহাবীও সে ব্যাপারে একমত ছিলেন না। এমতাবস্থায় প্রশ্ন ছিল যে বৃক্ষটি বরকতময় নয় সেটিকে বরকতময় মনে করা হয়ে যায় কি না। তাই তিনি সেখানকার বৃক্ষ কেটে ফেলেন। কারণ নির্দিষ্ট ঐতিহ্যবাহী পবিত্র স্থানকে যেমন মর্যাদা ও গুরুত্ব না দেয়া ঠিক নয়, তদ্রূপ অনির্দিষ্ট স্থানকেও ঐতিহ্যবাহী পবিত্র স্থানের মত মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করা ঠিক নয়।

অতএব হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক বৃক্ষ কর্তনের ঘটনার এতসব জওয়াব থাকা সত্ত্বেও যদি সালাফীগণ কর্তৃক উপরোক্ত আয়াত, হাদীছ ও কিয়াসকে বর্জন করে শুধু হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক বৃক্ষ কর্তনের দুর্বল ও ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ হাদীছের (ঘটনার) ভিত্তিতে স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان)-এর বিষয়কে অস্বীকার করার উপর হটকারিতা প্রদর্শন করা হয়। উপরন্তু স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان)-এর প্রবক্তা জমহুর উম্মতের মাসলাককে বিদআত বা আরও আগে বেড়ে শিরক পর্যন্ত বলা হয়, তাহলে তা হবে অবশ্যই বাড়াবাড়ি, সেটা কোনোক্রমেই হক সন্ধানী মনোবৃত্তির পরিচায়ক হবে না।

রওযায়ে আতহার যিয়ারতে যাওয়ার নিয়ত প্রসঙ্গ

কেউ যখন মদীনা মুনাওয়ারা গমন করেন, তখন তিনি মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়তে নয় বরং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযায়ে আতহার যিয়ারতের নিয়তেই গমন করে থাকেন। এ বিষয়ে উম্মতের মধ্যে কোনো মতবিরোধ ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি সালাফীগণ নতুন বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। তারা বলছেন, কেউ যখন মদীনা মুনাওয়ারা গমন করবেন, তখন তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযায়ে আতহার যিয়ারতের নিয়ত করবেন না বরং মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়তে গমন করবেন।

সর্বপ্রথম হযরত কাজী ইয়াজ মালিকী (রহ.) নিম্নোক্ত হাদীছের আলোকে বলেন যে, কোনো কবর যিয়ারতের জন্য সফর করা জায়েয নয়।

عن أبي هريرة رضـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجدِ الحرام ومسجدِ الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. (متفق عليه. رواه البخاري في باب فضل الصلوة في مسجد مكة و المدينة، ورواه مسلم في باب لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وللفظ لمسلم)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মসজিদে হারাম, রসূলের মসজিদ (মসজিদে নববী) ও মসজিদে আকসা– এই তিন মসজিদের উদ্দেশ্য ব্যতীত সফর করা যাবে না। (বোখারী ও মুসলিম)

ইব্‌নে তাইমিয়া (রহ.) এ বিষয়ে আরও অতিরঞ্জন করেছেন এবং বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযায়ে আত্‌হার যিয়ারতের উদ্দেশ্যেও সফর করা জায়েয নয়। তিনি বলেন, মসজিদে নববীর যিয়ারতের নিয়তে সফর করবে, তারপর আনুষঙ্গিকভাবে রওযায়ে আত্‌হারেরও যিয়ারত করে নিবে। অথচ চিন্তা করার বিষয় হল- তাহলে হাজীগণ মক্কার মসজিদে হারামের এক লক্ষগুণ ছওয়াব ছেড়ে মসজিদে নববীর এক হাজার (এক জয়ীফ হাদীছের বর্ণনামতে পঞ্চাশ হাজারগুণ ছওয়াব)-এর জন্য কেন মদীনা গমন করবেন? ইব্‌নে তাইমিয়া (রহ.) বলতে চান, হাদীছের অর্থ হল– মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা– এই তিন মসজিদ ব্যতীত 'অন্য কোনোকিছুর উদ্দেশ্যে' সফর করা যাবে না। কিন্তু জমহুর উম্মত ইব্‌নে তাইমিয়া (রহ.)-এর এই অভিমতকে গ্রহণ করেননি। বরং তার তারদীদ (খণ্ডন) করেছেন, এমনকি আল্লামা তাকিউদ্দীন সুবকী (রহ.) তাঁর বক্তব্যের খণ্ডনে شفاء السقام নামক একখানা বিশদ গ্রন্থও রচনা করেছেন।

জমহুর এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে বলা হয়েছে মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা– এই তিন মসজিদ ব্যতীত 'অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে' সফর করা যাবে না। কেননা অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করার মধ্যে কোন অতিরিক্ত ফায়দা নেই। তবে হ্যাঁ এই তিন মসজিদের ছওয়াব বেশি থাকায় এই তিন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করার মধ্যে অতিরিক্ত ফায়দা অর্জনের দিক রয়েছে। ইব্‌নে তাইমিয়া (রহ.) যে অর্থ করেছেন যে, এ তিন মসজিদ ব্যতীত 'অন্য কোনোকিছুর উদ্দেশ্যে' সফর করা যাবে না– এ অর্থ গ্রহণ করা হলে ইল্‌ম তলব করার উদ্দেশ্যে সফর, জিহাদের উদ্দেশ্যে সফর, কোন আলেমের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফর- এগুলো সবই নিষিদ্ধ হয়ে যায়, অথচ তা নিষিদ্ধ নয়। সারকথা, এখানে উহ্য مستثنى منه টি الى شيء নয় বরং الى مسجد। এ বক্তব্যের অনুকূলে পাওয়া যায় হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত মুসনাদে আহমদের নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত–

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاينبغي للمَطِيِّ أن تشد رحاله الى مسجد ينبغي فيه الصلوة غير المسجد الحرام المسجد الأقصى ومسجدي هذا. الحديث.

অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার মসজিদ (মসজিদে নববী) ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদে নামায পাঠের উদ্দেশ্যে সফর করা কোন মুসাফিরের জন্য সংগত নয়। (মুসনাদে আহমদ)

আল্লামা আইনী عمده القاري গ্রন্থে (جـ/٣)এবং হাফিজ ইব্‌নে হাজার আসকালানী فتح الباري গ্রন্থে (جـ/٣)এ হাদীছ দ্বারা জমহুরের মতের স্বপক্ষে দলীল পেশ (استدلال) করেছেন। এ হাদীছের বর্ণনাকারীদের মধ্যে শাহ্‌র ইব্‌নে হাওশাব রয়েছেন, যার সম্পর্কে কিছুটা দুর্বলতার অভিযোগ রয়েছে। তবে আল্লামা আইনী তার সম্পর্কে বলেছেন,

وشهر بن حوشب وثقه جماعة من الأيمة.

অর্থাৎ, ইমামদের এক জামাআত শাহ্‌র ইব্‌নে হাওশাবকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। ইব্‌নে হাজার তার সম্পর্কে বলেছেন,

وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف. (فتح الباري جـ/٣ تحت باب لاتشد الرحال– باب فضل الصلوة في مسجد مكة والمدينة)

অর্থাৎ, শাহ্‌র ইব্‌নে হাওশাব-এর মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও তিনি حسن পর্যায়ের রাবী।

জমহুরের মাসলাকের পক্ষে আরও দলীল হল নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত–

عن أبي الدرداء رضـ قال : إن بلالا رأي في منامه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له : ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا وَجِلا خائفا، فركب راحلته وقصد المدينة، فاتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه. الحديث. (آثار السنن للنيموي صفحـ/٥٤٧–٥٤٦ باب في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم [وذالك أخر باب من كتابه]. وقال : رواه ابن عساكر، وقال التقي السبكي : إسناده جيد.)

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত- হযরত বেলাল (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি বেলালকে বলছেন, হে বেলাল! এ কী অবিচার! বেলাল! এখনওকি সময় হয়নি যে, তুমি আমার যিয়ারতে আসবে? অতঃপর বেলাল (রা.) চিন্তিত ও ভীত-সন্তস্ত্র অবস্থায় জাগ্রত হলেন। তিনি সওয়ারী নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। অবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরে এসে রোদন করতে থাকলেন এবং চেহারায় ধূলি মারতে লাগলেন ...।

এখানে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হযরত বেলাল (রা.)-এর সফর ছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে তথা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযায়ে আত্‌হার যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে।

এছাড়া নিম্নোক্ত হাদীছসমূহও জমহুরের মতের স্বপক্ষে দলীল। যদিও এ হাদীছগুলোর কোনটা কোনটা ضعيف তবে এ হাদীছগুলোতে যিয়ারতের নেছবত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে করা থেকে অন্তত এগুলো দ্বারা এতটুকু استدلال অবশ্যই করা যায় যে, যিয়ারতের নিয়ত একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়। হাদীছগুলো এই–

من زار قبري وجبت له شفاعتي. (قال النيموي في آثار السنن : رواه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني والبيهقي وآخرون وإسناده حسن. واجاب النيموي عن الاعتراضات الواردة علي إسناد هذه الرواية جوابا شافيا.)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল, তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে গেল।

من حج ولم يزرني فقد جفاني.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি হজ্জ করল আর আমার যিয়ারত করল না, সে আমার প্রতি জুলুম (অবিচার) করল।

من زار قبري– أو من زارني – كنت له شهيدا وشفيعا. الحديث. (المطالب العالية ج/١ حديث رقم ١٢٥٣)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল, (অথবা যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত করল), আমি তার জন্য সুফারিশকারী হব।

শেষোক্ত হাদীছটি ইবনে হাজার আছকালানী (রহ.) আবূ দাউদ তায়ালিছী-র বরাতে **المطالب العالية** গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার তাহ্কীক করতে গিয়ে মুহাদ্দিছে কাবীর হাবীবুর রহমান আজমী সাহেব বলেছেন,

وله شاهد عند أبي يعلى والطبراني بسند صحيح.

অর্থাৎ, মুসনাদে আবী ইয়া'লা ও তাবারানী গ্রন্থে সহীহ সনদে এ হাদীছের অর্থের অনুকূলে বর্ণনা (شاهد) পাওয়া যায়। (যা এ হাদীছকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।)

ন্যাচারিয়া দল

(স্যার সৈয়দ আহমাদ ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ)

ফিরকার নাম

এ দলের নাম "ফিরকায়ে ন্যাচারিয়া" বা প্রকৃতি-পূজারী দল। এখানে "ফিরকায়ে ন্যাচারিয়া" বলে "ফিরকায়ে দাহ্‌রিয়াহ" বা নাস্তিকদেরকে বোঝানো হয়নি, যাদের ধ্যান- ধারণা ও আকীদা এই যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে এবং যা কিছু হয় তা সবই প্রাকৃতিক- ভাবেই আপনা আপনি হয়, এর পিছনে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো দখল নেই এবং এ দৃশ্যমান জগতের কোনো স্রষ্টা নেই, বরং প্রাকৃতিকভাবেই এ জগত সংসার তৈরি হয়েছে ও চলছে।

এখানে "ফিরকায়ে ন্যাচারিয়া" দ্বারা বোঝানো হয়েছে ঐ দলকে, যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করে শরীআতের প্রতিটি হুকুম আহকামকে গ্রহণ করা বা বর্জন করার ব্যাপারে নিজেদের সীমিত মেধা ও খোঁড়া যুক্তিকে মাপকাঠি হিসাবে নির্ধারণ করেছে এবং পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতিকে সত্য-অসত্য ও ভাল-মন্দ বিচারের কষ্টিপাথর বানিয়েছে। অর্থাৎ শরীআতের যে সমস্ত

বিধান তাদের সীমিত বুদ্ধি-বিবেক ও খোঁড়া যুক্তিসম্মত হয়, সেগুলোকে তারা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেয়। অন্যথায় সেগুলোকে তারা মিথ্যা, অকার্যকর ও অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। এমনিভাবে ইসলামী শরীআতের যে সমস্ত বিষয় ইউরোপীয় সভ্যতার পরিপন্থী বা বিরোধী ও ইউরোপীয় গোষ্ঠীর নিকট অপছন্দনীয় বা মনঃপুত নয় সেগুলোও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত নয়। যদিও বা কুরআন-হাদীছ দ্বারা তা প্রমাণিত হয়।

ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা

এ ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন সাইয়্যেদ আহ্‌মদ ইব্‌নে মুত্তাকী কাশ্মীরী (ছুম্মা আলীগড়ি) [মৃ. ১৩১৫ হি.]। তিনি স্যার সৈয়দ আহমাদ খান নামে প্রসিদ্ধ। তিনি মূলত কাশ্মিরী বংশোদ্ভূত। এক সময় তিনি ভারতের রাজধানী দিল্লীতে বসবাস করতেন বিধায় তাকে সাইয়্যেদ আহ্‌মদ দেহ্‌লবীও বলা হয়।

প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

এই উম্মতের মাঝে আল্লাহ তাআলার নীতি চালু রয়েছে যে, প্রতি শতাব্দীতে একজন ধর্মীয় সংস্কারক (মুজাদ্দিদে মিল্লাত) আগমন করবেন, যিনি ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কার, সামাজিক রুছূম-প্রথাকে মূলোৎপাটন করে তদস্থলে ধর্মীয় বিধান প্রতিষ্ঠা করবেন। এই নীতির আওতায় এই উম্মতের মাঝে সর্বপ্রথম মুজাদ্দিদ হিসাবে হিজরী প্রথম শতাব্দীতে আগমন ঘটে হযরত ওমর ইব্‌নে আব্দুল আযীয (র.)-এর এবং হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে আগমন ঘটে হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর। এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন করে মুজাদ্দিদ এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও ধারাবাহিকভাবে আসতে থাকবেন।

ঠিক এর বিপরীত ধারাও চালু রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক শতাব্দীতে এমন একজন বিখ্যাত জালেম-ফাসেক ব্যক্তির আগমন ঘটবে যে দ্বীনের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। এ ধারার প্রথম ব্যক্তি হিসাবে হিজরী প্রথম শতাব্দীতে আগমন ঘটে জগদ্বিখ্যাত জালেম শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ-এর। যার জুলুম-নির্যাতনের কাহিনী সকলেরই জানা আছে।

হিজরী দ্বিতীয় শতকে আগমন ঘটে বাদশাহ মামুনুর রশীদের। তিনি আলেমদের উপর এমন অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন যা শোনামাত্রই গা শিউরে ওঠে। এই বিপরীত ধারারই একজন স্যার সৈয়দ আহমদ। যিনি বিগত হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে পাক ভারত উপমহাদেশে ফিরকায়ে ন্যাচারিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এবং তার অনুসারীবৃন্দ সমস্ত উলামায়ে কেরামের সুচিন্তিত মতামত ও সিদ্ধান্তকে ভুল হিসাবে আখ্যায়িত করলেন। শরীআতের মৌলিক ও আনুষঙ্গিক (اصول و فروع) নীতিমালাকে দুমড়ে মুচড়ে নিশ্চিহ্ন করতে শুরু করলেন এবং ইসলামী শরীআতের নির্ভেজাল হুকুম-আহকামকে মিথ্যা ও মনগড়া ব্যাখ্যার সাথে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ইসলামের আসল রূপকে বিকৃত করে দিতে লাগলেন। সর্বোপরি কুরআন ও হাদীছবিশারদ মুফাসসিরীন

ও মুহাদ্দিছীনে কেরামের সরাসরি অযৌক্তিক সমালোচনা শুরু করে দিলেন। আর এ জাতীয় জঘন্য কাজকেই তাঁরা ভাল কাজ মনে করতে লাগলেন।

নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত সূত্রমতে এই ফিরকার আত্মপ্রকাশের ইতিহাস এরূপ। এই ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমাদ মূলত কাশ্মীরী বংশোদ্ভূত। তিনি এমন এক সময়ে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে বসবাস শুরু করেন, যখন দিল্লীতে আহলে হাদীছের প্রভাব ছিল। তাদের সঙ্গ পেয়ে তিনিও মুজতাহিদ বনে গেলেন। ধর্মীয় বিষয়ে নিজেই মতামত পেশ করতে লাগলেন।

এরই মাঝে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমানরা বিদ্রোহ করে বসল। তখন স্যার সৈয়দ আহমদ ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বিজনৌর জেলায় ইংরেজদের অধীনে কর্মরত ছিলেন। কিছু দিন পর বিদ্রোহের দাবানল স্তিমিত হয়ে পড়ল ও ইংরেজ শাসকরা মুসলমানদের ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়ল। স্যার সৈয়দ আহমদ এটাকে ইংরেজদের আস্থাভাজন হওয়ার মোক্ষম সুযোগ মনে করে তাদেরকে খুশি করার মানসে একটা গ্রন্থ লিখলেন। যার মাঝে বিদ্রোহ দমনের কিছু প্রস্তাব, শাসকদের প্রতি জনগণের আনুগত্য ও বিদ্রোহীদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করার কথাসহ ইংরেজদের খুশি করার বহু কথা লিখলেন। এই গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তাঁর প্রতি ইংরেজদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন। ইংরেজরা তার সেই গ্রন্থ থেকে কিছু প্রস্তাব বাস্তবায়ন করে তার যথার্থ মূল্যায়ন করল। এতে তার আসন পাকাপোক্ত হল এবং মর্যাদাও বৃদ্ধি পেল।

এরপর তিনি ইংরেজদের খুশি করার জন্য মুসলমানদেরকে ইংরেজদের আনুগত্য করায় উৎসাহ দিতে লাগলেন এবং মুসলমানদের চোখে ইংরেজদের যে সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক দোষ-ত্রুটি ধরা পড়ছিল, সেগুলোর সাফাই গাইতে শুরু করলেন। তিনি বাইবেলের অনুবাদ করে প্রচার করলেন। কুরআনের মাঝে তথাকথিত সংশোধন শুরু করে দিলেন। তাঁর এ সমস্ত কাজের কুফল এই দাঁড়াল যে, মুসলমানদের ঈমান-আকীদা দুর্বল হয়ে পড়ল। তারা ইংরেজদের ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কৃতির দিকে ঝুকে পড়ল। বহু মুসলমান সঠিক আকীদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হতে লাগল। স্যার সৈয়দ আহমদের এ সমস্ত পদক্ষেপের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের খুশি করা।

কিন্তু! আল্লাহর রসূলের বাণীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত না হয়ে পারে না। من تشبه بقوم فهو منهم-অর্থাৎ, যে ব্যক্তি যে জাতির (দলের) সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে সেই জাতির (দলের) অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। স্যার সৈয়দ আহমদের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি ধীরে ধীরে ইংরেজদের রং গ্রহণ করতে শুরু করলেন এবং এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ বিপথগামী হয়ে গেলেন।

হাদীছের বাণী তাঁর বেলায় এভাবে সত্য প্রমাণিত হয় যে, তিনি ছেলেকে ব্যারিষ্টার বানানোর মানসে ইংরেজ মুলুকে (লন্ডন) পাঠান। এই সুবাদে তারও লন্ডন যাওয়ার সুযোগ হল। লন্ডনে পূর্ব থেকেই বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদের হাওয়া জোরেসোরে বইছিল। সেখানকার ইংরেজদের সঙ্গে কিছুদিন মেলামেশার দরুন তাঁর

স্বাধীন ও মুক্ত-বুদ্ধির এতটা উন্নতি সাধিত হল যে, তিনি ধর্মীয় প্রভাব ও বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত ফিরকায়ে ন্যাচারিয়ার দাওয়াত প্রকাশ্যভাবে দিতে শুরু করলেন। তিনি নিজস্ব উদ্ভট ও বাতিল ধ্যান-ধারণা এবং ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি-এতদুভয়ের সমন্বয়ে একটা গ্রন্থ রচনা করলেন, যার নাম দিলেন- "علوم واقعیہ و تحقیقات نفس الامارية وتهذیب الاخلاق" সংক্ষেপে "তাহযীবে আখলাক"। এ গ্রন্থকেই ফিরকায়ে ন্যাচারিয়ার আকীদা-বিশ্বাসের মুখপত্র সাব্যস্ত করলেন এবং শরীআতের বিধানসমূহ গ্রহণ করা বা না করার মাপকাঠি হিসাবে এই গ্রন্থকে নির্ধারণ করলেন। শরীআতের কোন বিধান এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী সঠিক প্রমাণিত হলে তা গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিতেন, অন্যথায় তা প্রত্যাখ্যান করতেন। মোটকথা, তিনি কুরআন, হাদীছ, ইজমা, কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত শরীআতের হুকুম-আহকামকে স্বীয় বল্গাহীন চিন্তা-চেতনা, ও ইউরোপীয় সভ্যতার নিরিখে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। কোথাও এর ব্যতিক্রম হলে সেটাকে মিথ্যা, বানোয়াট, অমূলক ইত্যাদি অজুহাত দেখিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। দুর্বল আকীদার মুসলমান তার উদ্ভাবিত মতাদর্শ ও ধ্যান-ধারণাকে মনে প্রাণে মেনে নিয়ে তার ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে পড়ল এবং ধীরে ধীরে তাদের একটা বৃহৎ দল দাঁড় হয়ে গেল।

নিম্নে এই ফিরকার কিছু মৌলিক ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস তাদের লিখিত গ্রন্থ ও বক্তব্যের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হল। সাথে সাথে তার খণ্ডনও পেশ করা হল।

ফিরকায়ে ন্যাচারিয়ার মৌলিক ধ্যান-ধারণা, আকীদা-বিশ্বাস ও তার খণ্ডন

১. ফেরেশতা ও শয়তান এবং জান্নাতের বৃক্ষকে অস্বীকার।

খণ্ডন

সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে এ সবের অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে,

(١) وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا. الآية. (সূরা: ২-বাকারা: ৩৫)

(٢) وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ. (সূরা: ২-বাকারা: ৩৫)

২. কবর আযাবকে অস্বীকার।

খণ্ডন

কুরআন ও অসংখ্য হাদীছ দ্বারা কবরের আযাব প্রমাণিত। যেমন:-

(١) اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّ عَشِيًّا. (সূরা: ৪০-মু'মিন: ৪৬)

(٢) إذا قبر الميت أتاه ملكان. الحديث. (مسلم)

৩. পৃথিবীর মানচিত্রে জান্নাতের অবস্থান না থাকার অজুহাতে জান্নাতকে অস্বীকার।

খণ্ডন

জান্নাতের অস্তিত্বের কথা কুরআনের বহু আয়াতে আলোচিত হয়েছে। একটি আয়াত-

(١) وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ. (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ১৩৩)

৪. কেয়ামত সংঘটিত হওয়া ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার।

খণ্ডন

এ দুটো বিষয়ও সরাসরি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। দুটো আয়াত–

(১) اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا. (সূরা: ৪০-মু'মিন: ৫৯)

(২) ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ. (সূরা: ২৩-মু'মিনুন: ১৬)

৫. জান্নাতের হুর ও গিলমানকে অস্বীকার।

খণ্ডন

এ দুটো বিষয়ও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত সত্য। দুটো আয়াত–

(১) حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ. (সূরা: ৫৫-আর-রাহমান: ৭২)

(২) وَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ. (সূরা: ৭৬-দাহর: ১৯)

৬. তাকদীরকে অস্বীকার।

খণ্ডন

এটাও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত সত্য বিষয়। একটি আয়াত–

(১) وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ. (সূরা: ৮১-তাকবীর: ২৯)

৭. আম্বিয়ায়ে কিরামের মু'জিযা ও আওলিয়ায়ে কেরামের কারামতকে অস্বীকার।

খণ্ডন

এ দুটো বিষয়ও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত সত্য বিষয়। দুটো আয়াত–

(১) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ. (সূরা: ৫৭-হাদীদ: ২৫)

(২) اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৩৭)

৮. পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থে (ইঞ্জীল ও তাওরাত) অর্থগত পরিবর্তন হয়েছে। কোন শব্দগত পরিবর্তন হয়নি।

খণ্ডন

এ কথা কুরআন-হাদীছ বিরোধী। কুরআন দ্বারা এ বিষয়টা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থগুলোতে শব্দগত পরিবর্তনও হয়েছে। যেমন তিনটি আয়াত–

(১) يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِه. (সূরা: ৫-মায়িদা: ১৩)

(২) يَلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ. (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৭৮)

(৩) يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. (সূরা: ২-বাকারা: ৭৯)

৯. ইসলামে দাস প্রথা বলতে কোন কিছু নেই।

খণ্ডন

বহু আয়াত ও হাদীছ দ্বারা এ বিষয়টা প্রমাণিত। দেখুন একটি আয়াত–

(১) وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآئِكُمْ (সূরা: ২৪-নূর: ৩২)

১০. আসমানসমূহের কোন অস্তিত্ব নেই!

খণ্ডন

এ বিষয়টাও সরাসরি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। দেখুন দুটো আয়াত–

(১) وَ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. (সূরা: ৮-নাবা: ১২)

(২) ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰهَا. (সূরা: ৭৯-নাযি'আত: ২৭)

১১. "ইজমায়ে উম্মত" কোন শরঈ দলীল নয়।

খণ্ডন

"ইজমায়ে উম্মত" শরঈ দলীল হওয়াও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। যেমন:

(১) وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّه مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِه جَهَنَّمَ. (সূরা: ৪-নিসা: ১১৫)

১২. কুরআনের কোন হুকুম রহিত (نسخ) হয়নি।

খণ্ডন

এ ধারণা-বিশ্বাসও সরাসরি কুরআন-বিরোধী। কুরআন দ্বারা نسخ সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। দেখুন দুটো আয়াত–

(১) وَ اِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ. (সূরা: ১৬-নাহল: ১০১)

(২) مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا. (সূরা: ২-বাকারা: ১০৬)

১৩. প্রাণীর ছবি আকা জায়েয।

খণ্ডন

প্রাণীর ছবি আকা হারাম হওয়ার বিষয়টি বহু হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। যথা:–

(১) أشد الناس عذابا عند الله المصورون. (متفق عليه)

(২) لايدخل الملئكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. (متفق عليه)

(৩) قال ابن عباس رض : فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه.

১৪. মদ পান করা ও শুকরের গোশত খাওয়া হালাল।

খণ্ডন

মদ ও শুকর হারাম হওয়া কুরআনী আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। যথা:

(১) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ. (সূরা: ৫-মায়িদা: ৩)

(২) اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ. (সূরা: ৫-মায়িদা: ৯০)

১৫. ঢালাওভাবে সহীহ হাদীছকে অস্বীকার করা।

খণ্ডন

যদি কোন হাদীছ সহীহ না হত, তাহলে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের কী অর্থ?

(১) وَ مَا اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ. (সূরা: ৫৯-হাশ্‌র: ৭)

১৬. আবরাহা বাদশাহর হস্তি বাহিনীকে প্রস্তরাঘাতে ধ্বংস করাকে অস্বীকার করা।

খণ্ডন

এ ঘটনাটাও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত সত্য। দেখুন–

(১) تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ. (সূরা: ১০৫-ফীল: ৪)

১৭. জিন জাতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা।

খণ্ডন

জিন জাতির অস্তিত্বও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত সত্য। যেমন একটি আয়াত–

(১) وَ الْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ. (সূরা: ১৫-হিজ্‌র: ২৭)

১৮. হযরত ঈসা (আ.)কে স্বশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেয়াকে অস্বীকার করা এবং তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে বিশ্বাস করা।

খণ্ডন

তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া এবং তাঁর জীবিত থাকা– উভয়টা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। দেখুন দুটো আয়াত–

(১) وَ مَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ. (সূরা: ৪-নিসা: ১৫৭-১৫৮)

(২) اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ. الآية. (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৫৫)

১৯. হযরত ঈসা (আ.)-এর বিনা বাপে জন্ম হওয়াকে অস্বীকার করা।

খণ্ডন

তাঁর বিনা বাপে জন্ম লাভের বিষয়টাও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত সত্য। দেখুন–

(১) اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ. (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৫৯)

(২) لَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّ لَمْ اَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ. (সূরা: ১৯-মারয়াম: ২০-২১)

২০. নামাযের ভিতর উর্দূ ও অন্যান্য ভাষায় কুরআন পড়া উত্তম।

খণ্ডন

আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় কুরআনের তরজমা পাঠ করলে নামাযই হবে না। কারণ নামাযের মাঝে কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর কুরআন বলা হয় শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টিকে। অবশ্য শব্দের মাঝে অর্থ আপনা-আপনিই পাওয়া যায় কিন্তু অর্থের মাঝে শব্দ পাওয়া যায় না। অতএব অন্য ভাষায় কুরআন পাঠ করলে নামায হবে না। আরবীতেই পাঠ করতে হবে। এটাও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। দেখুন ৩টি আয়াত–

(১) فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ. (সূরা: ৭৩-মুয্‌যাম্মিল: ২০)

(২) اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا. (সূরা: ১২-ইউসুফ: ২)

(৩) لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّ هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ. (সূরা: ১৬-নাহ্‌ল: ১০৩)

২১. কাফেরদের সাদৃশ্য (تشبہ بلكفار) অবলম্বন করা জায়েয।

খণ্ডন

বহু হাদীছ দ্বারা কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা নাজায়েয প্রমাণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ হাদীছ হল– হযরত ইবনে উমার (রা.) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বয়ান করেন,

من تشبه بقوم فهو منهم. (رواه أبو داود في كتاب اللباس – باب في لبس الشهرة)

অর্থাৎ, যে কোন জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। (আবূ দাউদ)

একটি ঘটনা- হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) ফিরকায়ে ন্যাচারিয়ার জনৈক অনুসারীকে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীর কাপড় পরিধান করে এ মজলিসে এসে বস। হযরতের কথা শুনে সে ব্যক্তি হতবাক হয়ে গেল। তখন হযরত বললেন, আমার কাছে তোমাদের এ বিষয়টা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক মনে হয়- তোমাদের কাছে একজন মুমিন নারীর লেবাস পরিধান করা লজ্জার বিষয় ও অবৈধ, অথচ কাফেরদের লেবাস পরিধান করা গৌরবের ও বৈধ!

২২. যে ব্যক্তি রসূল (সা.)-এর বক্ষবিদারণের ঘটনাকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলবে, সে সঠিক মুসলমান।

খণ্ডন

বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা ইমাম বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী (রহ.) প্রমুখ মুহাদ্দিছসহ বহু মুহাদ্দিছ বর্ণনা করেছেন।

২৩. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মে'রাজ স্বপ্নযোগে ঘুমন্ত অবস্থায় হয়েছিল। স্ব-শরীরে ও জাগ্রত অবস্থায় হয়নি।

খণ্ডন

রসূল (সা.)-এর মে'রাজ স্বশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল। এটা মশহুর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত সত্য ও সঠিক। এর অস্বীকারকারী পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ।

২৪. একজনের নেক আমলের ছওয়াব অন্য কোন ব্যক্তি পায় না।

খণ্ডন

হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, একজনের নেক আমলের ছওয়াব অন্যজন পায়। যেমনঃ

(১) عن سعيد بن عبادة قال : يارسول الله! إن أُمَّ سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال : الماء. فحفر بئرا و قال : هذه لأُمِّ سعد. (رواه أبو داود في كتاب الزكوة– باب في فضل سقي الماء)

অর্থাৎ, সা'দ ইব্‌নে উবাদাহ থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন ইয়া রসূলাল্লাহ্! উম্মে সা'দ মৃত্যুবরণ করেছে, (তার জন্য) কোন্ সদকা উত্তম? তিনি বললেন, পানি। সেমতে তিনি একটা কূঁয়া খনন করে বললেন, এটা উম্মে সা'দের জন্য।

তাদের মৌলিক কিছু ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে কয়েকটা তুলে ধরা হল। এ ছাড়াও তাদের আরো বহু বাতিল ও ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা রয়েছে। যা তাদের লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করলে জানা যাবে!

এই ফিরকা সম্বন্ধে উলামাদের ফতওয়া ও সিদ্ধান্ত

এ সম্পর্কিত ফতওয়া বোঝার পূর্বে স্যার সৈয়দ আহমাদের চিন্তাধারা ও মতবাদে মৌলিকভাবে কী কী দোষ পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে বুঝে নেয়া সংগত। স্যার সৈয়দ আহমদের চিন্তাধারা ও মতবাদে মৌলিকভাবে নিম্নোক্ত ৬টা বিষয় পাওয়া যায়।

১. কুরআন দ্বারা স্বীকৃত বিষয়কে অস্বীকার করা বা কুরআনের মাঝে অস্বীকৃত বিষয়কে স্বীকার ও সমর্থন করা।

২. কুরআনে বর্ণিত বিষয়ে সংশয় সন্দেহ পোষণ করে এমন কথা বলা বা এমন উক্তি করা যার দ্বারা আল্লাহ অথবা রসূলকে অস্বীকার করা বোঝায় অথবা রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা বোঝায়।

৩. শরীআতের সুস্পষ্ট বিধান সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্রূপ করা।

৪. জরুরিয়াতে দ্বীনকে অস্বীকার করা।

৫. উম্মতের ইজমাকে অস্বীকার করা।

৬. বিধর্মীদের সঙ্গে সাদৃশ্য গড়ে তোলা।

এখন আমরা নিম্নের কয়েকটি ফতওয়ার এবারত লক্ষ্য করি।

(১) كتاب الإعلام بقواطع الإسلام গ্রন্থে আছে –

من كذب بشيء مما صرح به في القرآن من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذالك أوشك في شيء من ذالك كفر.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে কুরআনে বর্ণিত সুস্পষ্ট কোন বিধান বা খবরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথবা কুরআন দ্বারা স্বীকৃত বিষয়কে অস্বীকার বা কুরআনের মাঝে অস্বীকৃত বিষয়কে স্বীকার করে কিংবা এ বিষয়ে সংশয় সন্দেহ পোষণ করে, নিঃসন্দেহে সে কাফের হয়ে যায়।

(২) حجة الله البالغه গ্রন্থে আছে–

وتثبت الردة بقول يدل على نفي الصانع أو الرسل أو تكذيب رسول أو فعل تعمد به استهزاء صريحا بالدين وكذا إنكار ضروريات الدين.

অর্থাৎ, এমন কথা বলা বা উক্তি করা যার দ্বারা আল্লাহ অথবা রাসূলকে অস্বীকার করা বুঝায় অথবা রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা বোঝায়, অথবা শরীআতের সুস্পষ্ট বিধান সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্রূপ করা, এমনিভাবে শরীআতের জরুরী বিষয়াদিকে অস্বীকার করা, এ সবের দরুন সে ব্যক্তি মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যাবে।

(৩) فتاوى ظهيريه গ্রন্থে আছে

إن الأخبار المروية من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلث : متواتر، فمن أنكره كفر. ومشهور، فمن أنكره كفر إلا عند عيسى بن أبان فإنه يضلل ولا يكفر. وخبر الواحد، فلا يكفر جاحده غير أنه يأثم بترك القبول. ومن سمع حديثا فقال : "سمعناه كثيرا" بطريق الاستخفاف كفر.

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীছ তিন প্রকার। যথা:–

(এক) মুতাওয়াতির: এ প্রকার হাদীছকে অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যাবে।

(দুই) মাশহুর: অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে এ প্রকার হাদীছ অস্বীকারকারীও কাফের হয়ে যাবে। তবে হযরত ঈসা ইব্‌নে আবান (রহ.) তাকে কাফের বলেন না বরং তাকে গোমরাহ বলেন।

(তিন) খবরে ওয়াহেদ: এ প্রকার হাদীছকে অস্বীকারকারী কাফের হবে না বটে, তবে হাদীছকে গ্রহণ না করার অপরাধে সে অবশ্যই গোনাহগার হবে। আর যে ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন হাদীছ শোনার পর তাচ্ছিল্যভরে বলবে যে, আমি অনেক শুনেছি সেও কাফের হয়ে যাবে।

(৪) আল্লামা ইব্‌নে হুমাম (রহ.) বলেন,

انكار حكم الإجماع القطعي يكفر عند الحنفية و طائفة.

অর্থাৎ, হানাফী মতাবলম্বীদের নিটক অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইজমার হুকুমকে অস্বীকার কারী কাফের।

(৫) আল্লামা সুবকী (রহ.) তার جمع الجوامع গ্রন্থে লিখেছেন–

جاحح المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر مطلقا.

অর্থাৎ, জরুরিয়াতে দ্বীন[১] যার উপর সকলের ইজমা হয়েছে, তার অস্বীকারকারী এক বাক্যে কাফের।

উপরের মতামতসমূহ দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, স্যার সৈয়দ আহমদ ও তার অনুসারীদের কিছু আকীদা কুফ্‌রী এবং কিছু বিদআত বা ভ্রান্ত আকীদা।

অবশ্য তাদের ব্যাপারে কারও সংশয় দেখা দিতে পারে এ কারণে যে, কুরআন হাদীছের যেসব ভাষ্য অস্বীকার পূর্বক যে ধ্যান-ধারণা তারা পোষণ করেছে তা শরঈ বিধানের মাঝে তাবীল বা ব্যাখ্যা-সাপেক্ষে করেছে, আর কুরআন-হাদীছের কোন ভাষ্যের অস্বীকৃতি যদি ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ হয়, তাহলে তাকে কুফরী বলা যায় না। নিদেন-পক্ষে সেটাকে মুজতাহিদ ব্যক্তির ইজতিহাদী ভুল বলে গণ্য করা যেতে পারে।

এ ধরনের সংশয় পোষণ করা ঠিক হবে না এ কারণে যে, প্রথমত তাদের অনেকেই কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই বেধড়ক কুরআন-হাদীছের ভাষ্যকে অস্বীকার পূর্বক মনগড়া

১. জরুরিয়াতে দ্বীন একটি পরিভাষা। এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন ২১৪ পৃষ্ঠা।

মতামত ব্যক্ত করেছে। দ্বিতীয়ত তাদের মধ্যে যারা শরঈ হুকুমের মাঝে ব্যাখ্যামূলক মতামত (تاویل) দিয়েছে তাও আবার (تاویل)-এর নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে দেয়নি। সুতরাং তারা যে ব্যাখ্যা (تاویل)-এর আলোকে নিজেদের ধ্যান-ধারণা পোষণ করেছে তা শরীআতের নীতি মাফিক না হওয়াতে তারা কুফ্রীতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এ কারণেই যখন মৌলভী বখশ সাহেব এই ফিরকার কিছু আক্বীদা তাদের ব্যাখ্যা (تاویل)সহ মক্কা মদীনার উলামায়ে কেরামের নিকট উপস্থাপন করে ফতওয়া তলব করেন, তখন মক্কা মদীনার উলামায়ে কেরাম তার উত্তরে লিখেছিলেন–

اعتقاده فاسد، واليهود النصاري أهون حالا منه، ضالٌّ مُضِلٌّ، هو خليفة إبليس اللعين، ويكفر هذا الاعتقاد.

অর্থাৎ, "তাদের এ ধরনের আকীদা পোষণ করা শরীআত-বিরোধী। ইয়াহুদ নাছারাও আকীদাগত দিক থেকে তাদের তুলনায় কম জঘন্ন। তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে। তারা অভিশপ্ত ইবলীছের খলীফা। এ ধরনের আকীদা পোষণের ফলে তারা কাফের হয়ে যাবে।" এই ফতওয়ায় মক্কা মদীনার উলামায়ে কেরামের স্বাক্ষর আছে।

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, উপরোক্ত উলামায়ে কেরামের মতামতের ব্যাপারে আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তবুও যেহেতু কারও উপর কুফ্রীর হুকুম আরোপ করা খুবই জটিল ও কঠিন বিষয়, তাই আমি নিজে তাদেরকে জঘন্য ও নিকৃষ্ট "বিদআতী" ও "গোমরাহ" আখ্যায়িত করি এবং তাদের ব্যাপারে কুফ্রী শব্দ প্রয়োগ করা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছি।[১]

১. উল্লেখ্য, এই ফিরকার আকীদা-বিশ্বাসসমূহ ইমদাদুল ফাতাওয়া ৬ষ্ঠ খণ্ড থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। হযরত থানবী (রহ.) সার সাইয়্যেদ আহমদের লিখিত কিতাব ও পত্রিকার বরাত উল্লেখ পূর্বক তার আকীদা-বিশ্বাসসমূহ উল্লেখ করেছেন। অবশিষ্ট তথ্যসূত্র:

(১) عقائد الإسلام. مولنا ادريس كاندهلوي

(২) شرح العقائد النسفية. تفتازانى

তৃতীয় অধ্যায়

(দেশীয় বাতিল ফিরকা বিষয়ক)

সুরেশ্বরী

(সুরেশ্বরী পীরের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা)

"সুরেশ্বর" বৃহত্তর ফরিদপুরের শরীয়তপুর জেলার অন্তর্গত নড়িয়া থানার একটি গ্রাম। এখানকার শাহ সূফী সৈয়্যেদ আহম্মদ আলী ওরফে হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ জান্ শরীফ শাহ "সুরেশ্বরী" পীর নামে খ্যাত। তিনি ২ অগ্রহায়ণ, ১২৬৩ বাংলা, মোতাবেক ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শরীফ শাহ মেহেরউল্লাহ। ৯ বৎসর বয়সের সময় তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১০ বৎসর বয়সে তিনি পীর শাহ সূফী সৈয়দ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী-এর নিকট বাইআত গ্রহণ করেন। ১৭ বৎসর বয়সে ফতেহ্ আলী ওয়াইসী তাকে খেলাফত দান করেন এবং বলেন, "হে বাবা জান্ শরীফ! আমি দেখিতেছি, আরশে মুয়াল্লায় আপনার নাম শাহ্ আহম্মদ আলী লেখা হইয়াছে। আজ হইতে আপনাকে এই লক্ব প্রদান করা হইল। আপনাকে কুতবুল এরশাদের নেসবত দান করা হইল। আপনার লেখায় যে আহম্মদী ভাব ও নূরী ধর্মের বিকাশ ঘটিবে, তাহা আপনার বংশ পরম্পরায় আপনার আওলাদগণ কর্তৃক আপনি শেষ যামানার হযরত ইমাম মেহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের সম্পূর্ণ অধিকারী এবং সুবিকাশী হইবেন।"[১]

১. তথ্যসূত্রধ ভূমিকা-ছফিনায়ে ছফর, সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে সৈয়দ শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯।

সুরেশ্বরী পীর সাহেব ১৮৯২-১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় হেড মোদাররেছ পদে চাকরি করেন। তিনি ৯ খানা পুস্তক রচনা করেন। সেগুলোর নাম হল:

১. সিররে হক জামে নূর। ২. নূরে হক গঞ্জে নূর।
৩. লতায়েফে সাফিয়া ৪. মাতলাউল উলূম।
৫. ছফিনায়ে ছফর। ৬. কৌলুল কেরাম।
৭. সরহে সদর। ৮. আইনাইন।
৯. মদীনা কল্‌কি অবতারের ছফিনা।

এ পুস্তকগুলোর বেশ কয়েকখানা সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে সৈয়দ শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে সুরেশ্বরীর অধস্তন উত্তরাধীকারীগণ কর্তৃক "খানকায়ে সুরেশ্বরী" ৩৮৫/সি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা-১২১৭ থেকে "সুরেশ্বর" নামে একটা মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়ে থাকে।

সুরেশ্বরী পীরের লিখিত উপরোল্লেখিত পুস্তকাদি ও মাসিক সুরেশ্বর থেকে সুরেশ্বরী পীর ও তাদের অনুসারীদের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে যা জানা যায় নিম্নে তা খণ্ডনসহ উল্লেখ করা হল।

১. তাদের মতে সামা, নাচ, গান-বাদ্য সবই জায়েয। সুরেশ্বরী পীরের অনুসারীগণ বলেন, সুরেশ্বরী সূরকে ভালবাসতেন। সুরের মূর্ছনায় তিনি পরমাত্মার মাঝে লীন হয়ে যেতেন। সুরের প্রতি তার ভালবাসার কারণে সকলেই তাকে সুরের ঈশ্বর বা সুরেশ্বর নামে অভিহিত করেন।[১] মাসিক সুরেশ্বরে গান-বাদ্যের উপর একটা প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। তার শেষে লেখা হয়েছে– গান, সামা, বাজনা, হাতের তালি বাজানো ও নৃত্য সবই বৈধ।[২]

খণ্ডন

নাচ গান শরীআতে হারাম। এ সম্পর্কে এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে "গান-বাদ্য প্রসঙ্গ" শিরোনামে প্রতিপক্ষের দলীলাদি খণ্ডনসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. তারা সেজদায়ে তাহিয়্যা (সম্মানের সাজদা)-এর প্রবক্তা।

খণ্ডন

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে সাজদা করা হারাম। চাই ইবাদতের উদ্দেশ্যে সাজদা হোক বা সম্মানের উদ্দেশ্যে হোক। এ মাসআলাটি এতই সুবিদিত যে, তার জন্য বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করছি।

৩. তারা মাযারে গিলাফ, ফুল, আগরবাতি, মোমবাতি ও গোলাপ জল দেয়ার প্রবক্তা।

খণ্ডন

এগুলো বিদআত। দেখুন এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষ দিকে।

---

১. তথ্যসূত্র: ভূমিকা-ছফিনায়ে ছফর, সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে সৈয়দ শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯। মদিনা কলকী অবতারের ছফিনা, সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে সৈয়দ শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৮।
২. মাসিক সুরেশ্বর, পৃষ্ঠা ৩৪, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, এপ্রিল, ২০০৩।

৪. সুরেশ্বরী লিখেছেন– কবরের মাটি নরম কিংবা সময় গতিকে তাহাতে জল কাদা থাকিলে তাহাতে বিছান কিংবা খাট দেওয়া কর্তব্য। নেক লোকের কবরে খাট দিলেও কোন দোষ নেই।[১]

খণ্ডন

কুরআন-হাদীছ ও পূর্বসূরীদের থেকে এর কোনো প্রমাণ নেই।

৬. সুরেশ্বরী লিখেছেন– মরণের পর যে কয়েকদিন রূহ দোয়া দানের জন্যে আসে তাহার নাম তিজা, চাহারম, সপ্তমী, দশই, সাতাইশা, চল্লিশা, ছমাসি ও সাল্‌ইয়ানা।[২]

খণ্ডন

চাহারাম ইত্যাদি দিনে মৃতের রূহ দুনিয়াতে আসা সম্পর্কে হযরত থানবী (রহ.) লিখেছেন– কোন কোন লোকের আকীদা হল শবে বরাত ইত্যাদিতে মৃতের রূহ ঘরে আগমন করে ... এ জাতীয় বিষয় কোন نقل (কুরআন হাদীছের বর্ণনাজাত) দলীল ব্যতীত অন্য কোনভাবে প্রমাণিত হতে পারে না। আর এ জাতীয় বিষয়ে কোনো দলীল নেই। কারও কারও আকীদা হল এ রাতে কেউ মুরদাদেরকে ছওয়াব বখশে না দিলে মৃতগণ তাকে অভিশাপ দেন- এগুলো ভিত্তিহীন।[৩]

৫. তাদের আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হল:

(১) সুরেশ্বরী লিখেছেন– পীরের নিকট দীক্ষিত না হইলে কোনো বন্দেগী কবুল হয় না।[৪]

খণ্ডন

এখানে বাইআত হওয়াকে ইবাদত-বন্দেগীর জন্য শর্ত তথা ফরয সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ কোন কিছুকে ফরয সাব্যস্ত করতে হলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত দ্ব্যর্থহীন ভাষ্য (نص قطعي) থাকা আবশ্যক। যা এখানে অনুপস্থিত। বাইআত হওয়াকে উলামায়ে কেরাম সুন্নাত বলেছেন। বাইআত হওয়া বা পীর ধরাকে ফরয বলা শরীআতের মধ্যে কোনো দলীল ছাড়া অতিরঞ্জন ঘটানো। যা শরীআত বিকৃত করার ন্যায় জঘন্য অপরাধ। তবে এসলাহে বাতিন বা আধ্যাত্মিক সংশোধন ফরয। সেটা স্বতন্ত্র কথা।

(২) সুরেশ্বরীর মতে কামেল ওলীর কোন ইবাদত-বন্দেগীর প্রয়োজন হয় না। সুরেশ্বরী লিখেছেন–

---

১. ছফিনায়ে ছফর, পৃষ্ঠা ৮৫, সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে সৈয়দ শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ (মাহবুবে খোদা) ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯।
২. ছফিনায়ে ছফর, পৃষ্ঠা ৮৭, সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে সৈয়দ শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ (মাহবুবে খোদা) ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯।
৩. اغلاط العوام
৪. নুরে হক গঞ্জে নুর, পৃষ্ঠা ২৫, সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে সৈয়দ শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ (মাহবুবে খোদা) ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ ১৯৯৮।

মালামতি দেখ যারে, রোযা নামায নাহি পড়ে,
আওয়ারেফে দেখ বন্ধুগণ ॥[১]

মাসিক সুরেশ্বরে সুরেশ্বরী রচিত "মাতলাউল উলুম" গ্রন্থ থেকে (অনুবাদক-মাওলানা ফরীদ উদ্দিন আত্তার) উদ্ধৃত করে এ সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার করে লেখা হয়েছে– "আহ্‌লুল্লাহ-যাঁরা পুরাপুরিভাবে মহান আল্লাহ পাকের একত্ববাদের সাথে মিশে গেছেন, তাঁদের নিকট তো ফরজ বলতে কিছু নেই। এমতাবস্থায় যাহেরী শরিঅ-াতের কোন বালাই থাকে না।" পত্রিকাটিতে আরও লেখা হয়েছে– আউলিয়া দুই ধরনের। (১) তাসাউফ চর্চাকারী, সূফী- তারা যাহেরী শরিআতের সাধারণত খিলাফ কোন কাজ করেন না, তবে সময় সময় ...। (২) মুলামাতিয়াহ্- তাঁরা সাধারণ মানুষের তিরস্কার পছন্দ করেন। তাঁরা যাহেরী শরিয়তের খিলাফ কাজকাম করেন। পোশাক-আশাক, খাদ্য-খোরাকী, বাসস্থান- অবস্থান কোন ব্যাপারেই তাদের শরিয়ে-তর পাবন্দী দেখা যায় না। অথচ, তাঁদের মধ্যেই অধিকাংশ গাউস, কুতুব, আবদাল, আখইয়ার হয়ে থাকেন।[২]

খণ্ডন

ইবাদত-বন্দেগী করা মানুষের আমরণ দায়িত্ব। মানুষ কামালিয়াতের যে কোন স্তরেই উপনীত হোক না কেন এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে না। দলীল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত–

وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ.

অর্থাৎ, মৃত্যু পর্যন্ত তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। (সূরা: ১৫-হিজ্‌র: ৯৯)

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, হযারাতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে অধিক ইয়াক্বীন-বিশ্বাস আর কারও হতে পারে না। তবুও তাঁদের উপর আমরণ শরীআত পালনের দায়িত্ব ছিল। এবং তাঁরা আমরণ ইবাদত-বন্দেগী পালন করে গিয়েছেন। যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি আমরণ ইবাদত-বন্দেগীর নির্দেশ ছিল মর্মে কুরআনে মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰىنِيَ الْكِتٰبَ وَ جَعَلَنِيْ نَبِيًّا وَّ جَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَ اَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.

অর্থাৎ, সে বলল, আমি (ঈসা) আল্লাহ তাআলার দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে যতদিন জীবিত থাকি ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা: ১৯-মারইয়াম: ৩০)

১. ৪. নূরে হক গঞ্জে নূর, পৃষ্ঠা ১৩৩, সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে সৈয়দ শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ (মাহবুবে খোদা) ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ ১৯৯৮।
২. মাসিক সুরেশ্বর, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-২০০৩ পৃষ্ঠা ১৭।

মোটকথা, আল্লাহ্‌র নবীর সমান ইয়াকীন-বিশ্বাস অর্জন করা কোনো উম্মতীর পক্ষে সম্ভব নয়। তদুপরি নবীকে আজীবন শরীআতের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। সেখানে একজন উম্মতী এই ক্ষমতা ও স্বাধীনতা কোত্থেকে পেল যে, সে শরীআতের বিধান থেকে মুক্ত, স্বাধীন?[১]

● তাদের মতবাদ অনুসারে বলতে হবে, সাহাবায়ে কেরাম ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুযুর্গির উচ্চস্তরে উন্নীত হননি, নতুবা তাঁরা কেন ইবাদত করতেন? যদি তারা মেনে নেন এবং অন্তত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ক্ষেত্রে তারা অবশ্যই বলতে বাধ্য হবেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুযুর্গির উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছিলেন, তাহলে তিনি এই স্তরে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও ইবাদত করে পা মোবারক ফোলাতে গেলেন কেন?

সূফীকুল শিরোমণি হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.)কে কোন একজন লোক জিজ্ঞাসা করেছিল, কেউ কেউ বলে থাকে, আমরা তো পৌঁছে গেছি। এখন আর আমাদের শরীআতের অনুসরণের প্রয়োজন নেই। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, وَصَلُوْا ولكن إلى سقر অর্থাৎ, 'হ্যাঁ, তারা পৌঁছে গেছে, তবে জাহান্নামে।'[২]

তিনি একথাও বলেছিলেন যে, "এমনটা বলা যিনা ব্যভিচার, চুরি ও মদ্যপান অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।"[৩] কেননা, এসব কাজ গোনাহ এবং মস্তবড় অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও কুফরী তো নয়। পক্ষান্তরে পূর্বোক্ত মতবাদটা সরাসরি কুফরী ও ধর্মহীনতা।[৪]

হযরত ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বিশদ ব্যাখ্যাসহ যুক্তির নিরিখে মাজমূউল ফাতাওয়ায় আলোচ্য আকীদা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যারা বলে, আমাদের অন্তর পরিষ্কার হয়ে গেছে, এখন আমরা যে কাজই করব তাতে কোনো অসুবিধা নেই অথবা এ কথা বলে যে, আমাদের এখন আর নামাযের প্রয়োজন নেই। কেননা, আমরা মূল লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। অথবা এরূপ বুলি ছাড়ে যে, আমাদের এখন আর হজ্জ করার দরকার নেই। কেননা, স্বয়ং কা'বা আমাদের তওয়াফ করে থাকে। কিংবা এমন বলে থাকে যে, আমাদের এখন রোযার প্রয়োজন নেই। কেননা, আমাদের এর কোনো দরকার নেই কিংবা এ ধরনের উক্তি করে যে, আমাদের জন্য মদ্যপান বৈধ। এটা কেবল সাধারণ লোকদের জন্য হারাম। এ ধরনের কথাবার্তা যারা বলে অথবা এ ধরনের আকীদা যারা পোষণ করে, তারা সকল ইমামের মতে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের, মুরতাদ। তাদেরকে তওবা করতে বলা হবে। যদি তওবা করে তাহলে তো ভালই,

১. তাসাওউফ: তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী ও মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, ১৬৮ পৃ.।
২. তাসাওউফ: তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, বরাত- শরহু হাদীছিল ইলম, ইবনে রজব (রহ.): ১৬, সিরাতুল মুসতারশিদীন: ৮৩ টীকা।
৩. মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া: ১১/৪২০।
৪. প্রাগুক্ত।

অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করা হবে। আর যদি এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস অন্তরে লুকিয়ে রাখে, তাহলে সে হবে মুনাফিক ও যিন্দিক। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে একবার এ আকীদা প্রমাণের পর তওবার সুযোগ দেয়া ছাড়াই হত্যা করে দেয়া হবে। তবে কেউ কেউ তওবার সুযোগ দেয়ার পর হত্যা করার অভিমতও ব্যক্ত করেছেন।'[১]

ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন,

من زعم أن له مع الله تعالي حالا أَسْقَط عنه نحوَ الصلوة أو تحريم شرب الخمر وجب قتله، وإن كان في كان في الحكم بخلوده نظر، وقتلُ مثله أفضل من قتل مأة كافر، لأن ضرره أكثر.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কোন বিশেষ অবস্থা বা সম্পর্কের দাবী করে ও বলে যে, এ অবস্থায় তার জন্য নামাযের বিধান এবং শুরাপান হারামের বিধান রহিত হয়ে গেছে, তাহলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যদিও তার চিরকাল জাহান্নামে থাকার ব্যাপারে কিছু কথা আছে। উপরোক্ত মতাবলম্বী লোককে হত্যা করা শত কাফেরকে হত্যা করার চেয়েও উত্তম। কেননা, এ ধরনের লোক দ্বারা প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে।[২]

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (রহ.) ইমাম গাযালী (রহ.)-এর উক্ত উক্তিটি উল্লেখ পূর্বক বলেন,

ولا نظر في خلوده لأنه مرتد، لاستحلاله ما علمت حرمته أو نفيه وجوب ما علم وجوبه ضرورة فيهما، ومن ثم جزم في "الأنوار" بخلوده.

অর্থাৎ, এ ধরনের ব্যক্তির জাহান্নামে চিরকাল থাকার ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, সে মুরতাদ ও ধর্মত্যাগী। তার কারণ হল সে এমন বস্তুকে হালাল মনে করেছে যার হারাম হওয়া শরীআতে অকাট্য ও অতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আর এমন বিষয় ফরয হওয়ার কথা অস্বীকার করেছে, যা ফরয হওয়াও শরীআতে অকাট্য এবং অতি সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাত। তাই 'কিতাবুল আনওয়ার'-এ দৃঢ়তার সঙ্গে লেখা হয়েছে যে, এরূপ ব্যক্তি জাহান্নামে চিরকাল থাকবে।[৩]

* পূর্বে বলা হয়েছে, তাদের মতবাদ মেনে নিলে বলতে হবে সাহাবায়ে কেরাম ও রসূল (সা.) বুযুর্গির উচ্চস্তরে উন্নীত হননি। নতুবা বলতে হবে, তাঁরা বুযুর্গির উচ্চস্তরে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও ইবাদত করে কুফ্‌রীতে লিপ্ত হয়েছিলেন। আর যে উক্তি দ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামকে কাফের বলা অপরিহার্য

১. মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া: ১১/৪০১-৪০৩।
২. রুহুল মাআনী: ১৬/১৯।
৩. তাসাওউফ: তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী ও মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, বরাত -রুহুল মাআনী: ১৬/১৯।

হয়ে দাঁড়ায়, নিঃসন্দেহে সেটা কুফ্‌রী উক্তি। আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত আকীদা হল- আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর মর্যাদা সকলের উর্ধ্বে। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সকল উম্মতের উর্ধ্বে এবং সকল সাহাবী জান্নাতী।

একটা ভ্রান্তির অপনোদন

বাতিলপন্থীরা কামেল ও বুযুর্গ হয়ে গেলে ইবাদত লাগে না- এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা তাদের ভ্রান্ত মতবাদের পক্ষে দলীল দিয়ে থাকে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ﴾

অর্থাৎ, তোমরা মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদত করতে থাক। (সূরা: ১৫-হিজর: ৯৯)

তারা এ আয়াতের অপব্যাখ্যা করে বলে থাকে যে, এখানে "ইয়াকীন" (يقين) শব্দটি পরিচিতি ও বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেমতে আয়াতের অর্থ হল তোমরা মারেফত বা পরিচিতি অর্জন হওয়া পর্যন্ত ইবাদত কর। অতএব খোদার সঙ্গে গভীর পরিচিতি লাভ হওয়ার পর আর ইবাদতের প্রয়োজন থাকে না।

তাদের এ অপব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরে ইব্‌নে কাছীরে বলা হয়েছে,

ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليفين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبدَ وأكثرَ الناس عبادةً ومواظبة على فعل الخيرات حين الوفاة. وإنما المراد باليقين ههنا الموت. (تفسير ابن كثير ج/٢. صفحه/٥٦٠، سورة حجر)

অর্থাৎ, এ আয়াত দ্বারা কাফেরদের ভ্রান্ত আকীদা খণ্ডন করা হয়েছে, যারা বলে যে, ইয়াক্বীন অর্থ মা'রেফত (পরিচিতি)। তাদের মতে কারও মা'রেফত হাসিল হলে তার ইবাদত মওকূফ হয়ে যায়। তাদের এ আকীদা কুফ্‌র, পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতা। কারণ নিশ্চয়ই নবী (আ.)গণ এবং তাঁদের সাহাবাগণ আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। আল্লাহ তাআলার হক, তাঁর ছিফাত এবং তাযীমের মুস্তাহিক হওয়ার মা'রেফাত তাঁদের সবচেয়ে বেশি ছিল। এসত্ত্বেও তাঁরা মৃত্যু পর্যন্ত সকলের চেয়ে বেশি ইবাদতকারী ছিলেন, সর্বদা নেক কাজ করে গেছেন। বস্তুত এখানে 'ইয়াক্বীন' অর্থ "মৃত্যু" ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে,

﴿حتى يأتيك اليقين﴾ أي الموت كما روي عن ابن عمر والحسن وقتادة وابن زيد .... فليس المراد به ما زعمه بعض الملحدين مما يسمونه بالكشف والشهود وقالوا : إ ن العبد متى حصل له ذالك سقط عنه التكليف بالعبادة، وهي ليست إلا للمحجوبين، ولقد مرقوا بذالك من الدين وخرجوا من ربقة الإسلام وجماعة المسلمين. (روح المعاني ٨ : ٨٧)

অর্থাৎ, حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ বাক্যে ইয়াক্বীন অর্থ যে মৃত্যু, একথা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), হাসান বসরী (রহ.), কাতাদাহ (রহ.) ও ইব্‌নে যায়েদ থেকে বর্ণিত আছে। এখানে ইয়াক্বীনের ঐ অর্থ নয় যা কাফেররা (মুলহিদরা) বলে থাকে; অর্থাৎ কাশ্‌ফ ও মোশাহাদা। তারা বলে যে, বান্দার যখন কাশ্‌ফ ও মোশাহাদা হাসিল হয়, তখন আর তার কোন ইবাদত লাগে না। ইবাদত হল কাশ্‌ফ মোশাহাদা যাদের নেই তাদের জন্য। তারা এ আকীদার দরুন ইসলাম ধর্ম থেকে বের হয়ে গেছে।

তারা এ কথা বুঝতে পারেনি যে, উক্ত আয়াতে প্রথমত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ, আপনি ইয়াকীন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত স্বীয় প্রভুর ইবাদত করতে থাকুন। এখন যদি ইয়াকীন দ্বারা মারেফাতের কোন নির্দিষ্ট স্তর বোঝানো হত, তাহলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে স্তর হাছিল ছিলই। তদুপরি তিনি ওফাত পর্যন্ত ইবাদতে অটল ছিলেন এবং কঠিন রোগেও নামাযের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন।

আর যদি (নাউযুবিল্লাহ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে স্তর হাসিল না থেকে থাকে, তাহলে সে স্তর কোন উম্মতের হাসিল হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, কোন উম্মত আল্লাহ তাআলার ঐ মারেফাত ও বিলায়াত স্তরে পৌছতে পারে না, যে স্তরে নবী-রসূলগণ পৌছেছেন!। বুঝা গেল- এখানে ইয়াক্বীন দ্বারা মা'রেফাতের কোন স্তর উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব নয়, বরং ইয়াক্বীন দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হল মৃত্যু; যা হাদীছ ও উম্মতের ইজ্‌মা' দ্বারা প্রমাণিত।[১]

এ আয়াত দ্বারা তারা দলীল দিতে পারে না বরং আহ্‌লে হক এ আয়াত দ্বারা দলীল দিতে পারেন এবং দিয়ে থাকেন। তাদের মতে এ আয়াতই প্রকৃষ্ট দলীল যে, মানুষ আমরণ আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মুকাল্লাফ (আদিষ্ট)। কারণ উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, উক্ত আয়াতে ইয়াক্বীন শব্দটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনটি সূরা মুদ্দাছ্‌ছিরে (আয়াত- ৪৭) ইয়াকীন শব্দটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, প্রত্যক্ষ ইয়াক্বীন তথা বিশ্বাস মৃত্যুর পরই হাসিল হয়ে থাকে। স্বয়ং মৃত্যুই এমন এক বিশ্বাস্য বস্তু, যার ব্যাপারে মানুষের সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয় নেই।

তারা যাহেরী শরীআত ও বাতেনি শরীআত বলে দু'ধরনের শরীআত দাঁড় করেছেন। এর কোনো দলীল কুরআন-হাদীছে নেই। তদুপরি শরীআত থেকে তরীকতকে পৃথক করে নিলে শরীআত তথা শরীআতের বিধি-বিধানকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়, যা শরীআতকে রহিত সাব্যস্ত করার নামান্তর। এ ধরনের বিকৃতিসাধনকারী লোকদেরকে বলা হয় মুলহিদ বা যিন্দিক।

এ প্রসঙ্গে সহীহ মুসলিম-এর ব্যাখ্যাকার ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী (রহ.)-এর একটি যুক্তিপুর্ণ বিশদ আলোচনার সারাংশ সামান্য ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হল। তিনি বলেন,

১. মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ১১/৪১৮-৪২০, শরহুল ফিক্‌হিল আকবার- মোল্লা আলী কারী , ১২২, তাফসীরে ইবনে কাসীর. ২/৬১৭, রূহুল মা'আনী, ১৪/ ৮৭-৮৮।

"যিন্‌দীকদের একটা দল এমন তাসাওউফের কথা বলে, যার ফলে শরীআতের বিধানাবলীকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়। তারা বলে, "শরীআতের এসব বিধান নির্বোধ ও সাধারণ লোকদের জন্য। আওলিয়ায়ে কেরাম ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ শরীআতের এসব বিধানের মুখাপেক্ষী নন। (বরং তারা এসব কিছুর উর্ধ্বে) কারণ তাঁদের অন্তঃকরণ স্বচ্ছ ও নির্মল। তাই তাদের অন্তরে যা কিছুর উদ্রেক হয়, তাই তাঁদের থেকে কাম্য- এটা সম্পূর্ণ ইসলাম-বিরোধী কুফ্‌রী কথা। এ ধরনের কথাবার্তা যারা বলে, তাদেরকে হত্যা করে দিতে হবে। তওবাও তলব করা হবে না। কেননা, এ মতবাদের মধ্যে শরীআতের একটা সুস্পষ্ট ও অকাট্য আকীদার অস্বীকৃতি পাওয়া যায়। সে আকীদাটা হল- আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অবগতির কোন উপায় নেই। আর শরীআতের কোন সুস্পষ্ট ও অকাট্য আকীদার অস্বীকৃতি পরিষ্কার কুফ্‌র।"[১]

যা হোক, শরীআত ও তরীকতের মধ্যে ব্যবধানকারী, শরীআত-পরিপন্থী কোন তরীকত অবলম্বনকারী দ্বীন থেকে খারেজ।

(৩) দেওয়ানবাগী, চন্দ্রপুরী ও মাইজভাণ্ডারীদের ন্যায় এক শ্রেণীর লোক আছেন যারা মনে করেন আল্লাহ ও রসূলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, সুরেশ্বরীর বক্তব্য থেকেও বুঝা যায় তিনি অনুরূপ আকীদা পোষণ করেন। তিনি "সিররে হক্ব জামে নুর" গ্রন্থে লিখেছেন– "আহাদ ও আহমাদ-এর মীমের মধ্যে পার্থক্য কেবল হাম্‌দ ও নাতের জন্য।"[২]

খণ্ডন

আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে পার্থক্য না করার ব্যাখ্যা যদি এই হয় যে, তাঁদের সত্তা এক ও অভিন্ন, তাহলে এটা নিঃসন্দেহে কুফ্‌রী আকীদা। আর যদি এর ব্যাখ্যা হয়ে থাকে এই যে, আল্লাহ্ রসূলের মধ্যে অবতারিত হন বা আত্মপ্রকাশিত হন, অর্থাৎ, রসূলগণ হয়েছেন আল্লাহ্‌র প্রকাশ বা আল্লাহ্‌র অবতার, তাহলে এটাকে বলা হয় حلول-এর আকীদা। এই আকীদাও কুফ্‌রী।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল আল্লাহ্‌র সত্তা কারও সত্তার মধ্যে মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হন না বা প্রবেশ (حلول) হন না এবং তাঁর সত্তার মধ্যেও কেউ মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হয় না। খৃষ্টানদের ধারণায় আল্লাহ্ তাআলা হযরত ঈসা (আ.)-এর মধ্যে প্রবেশ حلول করেছিলেন অর্থাৎ, অবতারিত হয়েছিলেন। হিন্দুদের বিশ্বাসমতে ঈশ্বর মানুষ, প্রাণী, বৃক্ষ, পাথর সবকিছুর মধ্যে প্রবেশ (حلول) করেন অর্থাৎ, অবতারিত হন। এরূপ বিশ্বাস পোষণকারীদেরকে হুলূলিয়া (حلوليه) বলা হয়। এরূপ বিশ্বাস কুফ্‌রী। মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী বলেন, যেসব মূর্খ লোক বলে,

১. القرطبى ج/١١. صفحه.٢٩-٢٨، فتح البارى ج/١. صفحه/٢٦٧.

২. তথ্যসূত্রঃ মাসিক সুরেশ্বর, পৃষ্ঠা ২৭, ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, মার্চ ২০০৩।

আল্লাহ্‌র খাস ওলীগণ আল্লাহ্‌র সত্তার মধ্যে এমনভাবে লীন হয়ে যান, যেমন বরফ পানির মধ্যে এবং বিন্দু দরিয়ার মধ্যে লীন হয়ে যায়, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং স্পষ্ট কুফ্‌র।[১] কাযী ইয়ায (রহ.) الشفا بمعرفة حقوق المصطفى কিতাবে বলেছেন, "সকল মুসলমানের ইজমা যে, যারা হুলূলের প্রবক্তা তারা কাফের।"

উল্লেখ্য, যারা আল্লাহ ও রসূলের মধ্যে পার্থক্য না করার মত পোষণ করেন, বা মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রবেশ করার মত পোষণ করেন, তারা এ বিষয়ে সাধারণ وحدة الوجود বা "সর্বেশ্বরবাদ"-দর্শনের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এটা করে থাকেন। এ সম্পর্কে পরবর্তিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন তৃতীয় অধ্যায় "সর্বেশ্বরবাদ/ সর্বখোদাবাদ" শীর্ষক আলোচনা।

(৪) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইল্‌মে গায়েবের অধিকারী। মাসিক সুরেশ্বরে লেখা হয়েছে– সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব বিষয়ই তাঁর মোবারক নয়নের সামনে বিদ্যমান। তিনি এল্‌মে গায়েবের অধিকারী।[২]

খণ্ডন

এ সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ে "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গায়েব জানা প্রসঙ্গ" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সারকথা– সুরেশ্বরী পীর একাধিক কুফরী আকীদা পোষণকারী। যা পূর্বের আলোচ-নায় স্পষ্ট করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

এনায়েতপুরী

(এনায়েতপুরী পীর ও তার অনুসারীদের আকীদা-বিশ্বাস)

"এনায়েতপুরী" বলতে বোঝানো হয়েছে সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরের পীর মাওলানা শাহ ছূফী মোহাম্মাদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরীকে। তার পিতার নাম মাওলানা শাহ ছূফী আবদুল করীম। তিনি ১৩০০ হিজরীর ১১ জিলহজ্জ মোতাবেক ২১ কার্ত্তিক ১২৯৩ সাল সিরাজগঞ্জ (সাবেক পাবনা) জেলার চৌহালী থানার এনায়েতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ৫ জুমাদাস সানী ১৩৭১ হিজরী মোতাবেক ১৮ ফাল্গুন ১৩৫৮ সাল ইন্তেকাল করেন। তিনি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (কলিকাতা)-এর মুরীদ ও খলীফা ছিলেন।[৩]

এনায়েতপুরীদের মতে হযরত মাওলানা শাহ সুফী মোহাম্মাদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী ১৩০০ হিজ্‌রীর মোজাদ্দেদ।[৪]

---

১. عقائد الاسلام . عبد الحق حقانی
২. মাসিক সুরেশ্বর, পৃষ্ঠা ৮, ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০০৩।
৩. তথ্যসূত্র: "ওজিফা ও উপদেশ", সম্পাদক- পীরজাদা মৌঃ খাজা কামাল উদ্দীন- সাজ্জাদনসীন এনায়েতপুর ও "খাজা ইউনুসিয়া নকসেবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার ওজিফা", সম্পাদনায়- এম মাকবূল হোসেন- খাদেম খাজাবাবা এনায়েতপূরী।
৪."ওজিফা ও উপদেশ", সম্পাদক- পীরজাদা মৌঃ খাজা কামাল উদ্দীন- সাজ্জাদনসীন এনায়েতপুর, পৃ. ৯।

নিম্নে এনায়েতপুরের পীর মাওলানা শাহ ছূফী মোহাম্মাদ ইউনুছ আলী এনায়েত-পুরী ও তার অনুসারীদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও বিদআত-কুসংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কিছুটা বিবরণ প্রদান করা গেল।

১. এনায়েতপুরী সাহেব মনে করেন তার বংশের সকলেই মাদারজাত ওলী। এনায়েত-পুরী সাহেব ইন্তেকালের কয়েকদিন পূর্বে বলেছেন, "আমার বংশের তেফেল শিশু বাচ্চাকেও যদি তোমরা পাও, তাহাকে মাদারজাত ওলি মনে করিও।"[১]

২. কিছু কিছু বাতিল ফিরকার ভ্রান্ত ধারণা হল আল্লাহ ও রসূলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহ হলেন "আহাদ" আর রসূল হলেন "আহমদ"। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল একটা "মীম" হরফের। এনায়েতপুরীদের ধারণাও অনুরূপ বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের রচিত নিম্নোক্ত কবিতা তার প্রমাণ:

বানাইয়া নূর নবী দেখাইলেন আপনা ছবি
সেই নবীজীর চরণ বিনে নাইগো পরিত্রাণ।
আহাদে আহম্মদ বানাইয়ে, মিমকা পদ মাঝে দিয়ে
খেলতিয়াছেন পাক বারি হইয়া বে-নিশান।[২]

খণ্ডন

নবী রসূলদের সম্বন্ধে সহীহ ঈমান হল তাঁরা মানুষ, তাঁরা খোদা নন বা খোদার পুত্র নন বা খোদার রূপান্তর (অবতার) নন বরং তাঁরা খোদার প্রতিনিধি ও নায়েব-আল্লাহর বাণী অনুসারে জিন ও মানুষ জাতিকে হেদায়েতের জন্য তাঁরা দুনিয়াতে প্রেরিত হন। অতএব উপরোক্ত ধারণা ঈমান-পরিপন্থী ধারণা।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র মাখলূক। তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে মাখলূকের অভিন্নতার মত পোষণ করে মাখলূককে খালেক সাব্যস্ত করেছে। আর খোদার কোন মাখলূককে খোদা সাব্যস্ত করা কুফ্‌রী। তাছাড়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত ধারণা জরূরিয়াতে দ্বীন (ضروریات دین)-এর[৩] অন্তর্ভুক্ত। হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলবী বলেন, এ ধরনের ক্ষেত্রে কোন ভিন্নতর ব্যাখ্যা প্রদান (تاویل) এটাকে অস্বীকার করার নামান্তর। আর এ ধরনের বিষয়কে অস্বীকার করা কুফ্‌রী।[৪]

রসূল আর খোদার ভিতর কোনো পার্থক্য নেই বললে আল্লাহ্‌র স্ত্রী ও সন্তানাদি আছে বলতে হবে। কেননা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী ও সন্তানাদি তখন আল্লাহ্‌র স্ত্রী ও সন্তানাদি বলে আখ্যায়িত হবে। নাউযুবিল্লাহ"

---

১. "খাজা ইউনুসিয়া নকসেবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার ওজিফা", সম্পাদনায়- এম মাকবুল হোসেন - খাদেম খাজাবাবা এনায়েতপুরী, ২য় সংস্করণ, অক্টোবর-২০০২ পৃ. ২৫।
২. পুষ্পহার, মৌ. মো. আব্দুর রহমান মোজাদ্দেদী, মোয়াজ্জেম- দরবার শরীফ এনায়েতপুর, পৃ. ৩৬, ১২তম সংস্করণ, বাং ১৪০৮।
৩. এটি একটি পরিভাষা, এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন ১৯৪ পৃষ্ঠা।
৪. عقائد الاسلام . عبد الحق حقانی

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল আল্লাহ্র সত্তা কারও সত্তার মধ্যে মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হন না বা প্রবেশ (حلول) করেন না এবং তাঁর সত্তার মধ্যেও কেউ মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হয় না। খৃষ্টানদের ধারণায় আল্লাহ্ তাআলা হযরত ঈসা (আ.)-এর মধ্যে প্রবেশ حلول করেছিলেন অর্থাৎ, অবতারিত হয়েছিলেন। হিন্দুদের বিশ্বাসমতে ঈশ্বর মানুষ, প্রাণী, বৃক্ষ পাথর সবকিছুর মধ্যে প্রবেশ (حلول) করেন অর্থাৎ, অবতারিত হন। এরূপ বিশ্বাস পোষণকারীদেরকে হুলুলিয়া (حلوليه) বলা হয়। এরূপ বিশ্বাস কুফ্রী। হুলূল বা অবতারিত হওয়ার আকীদা-বিশ্বাস যে কুফরী সে সম্বন্ধে ৪৮৮ পৃষ্ঠায় মনীষীদের কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পূর্বেও বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ ও রসূলের মধ্যে পার্থক্য না করার মত পোষণ করেন, বা মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র প্রবেশ করার মত পোষণ করেন, তারা এ বিষয়ে সাধারণত وحدة الوجود বা "সর্বেশ্বরবাদ"-দর্শনের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এটা করে থাকেন। এ সম্পর্কে পরবর্তীতে "সর্বেশ্বরবাদ/সর্বখোদাবাদ" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

৩. এনায়েতপুরীদের আর একটা বিভ্রান্তি হল– "একশত ত্রিশ ফরয" শিরোনামে লেখা হয়েছে, হযরত মোহাম্মদ (ছ.)-এর ৪ কুরছি জানা ৪ ফরয। চার কুরছীর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে রাসূল পিতৃ পুরুষ ৪জন।

১। মোহাম্মদ (ছ.) আব্দুল্লাহর পুত্র।
২। আব্দুল্লাহ আব্দুল মোতালেবের পুত্র।
৩। আব্দুল মোতালেব হাসেমের পুত্র।
৪। হাসেম আব্দুল মন্নাফের পুত্র।

আরও লেখা হয়েছে- চার মাজহাব মানা ৪ ফরয।[১]

উপরোক্ত নামগুলো জানাকে তারা ফরয সাব্যস্ত করেছেন। অথচ অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও দ্ব্যর্থহীন ভাষ্য ছাড়া কোনো কিছুকে ফরয বলে সাব্যস্ত করা যায় না। আর এ ব্যাপারে তেমন কোন ভাষ্য নেই। এটা শরীআত সম্পর্কে তাদের চরম অজ্ঞ থাকার প্রমাণ। যেটা ফরয নয় সেটাকে ফরয সাব্যস্ত করা শরীআতে বিকৃতি সাধনের অপরাধ। আর মাযহাব মান্য করা তথা তাক্লীদ করাকে আইম্মায়ে কেরাম ওয়াজিব বলেছেন। যে ইমামেরই হোক যেকোন একজনেরই তাকলীদ করা ওয়াজিব। এটাকেও ফরয সাব্যস্ত করা তদুপরি চার ইমামের তাক্লীদকে চার ফরয সাব্যস্ত করা শরীআত সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ থাকার প্রমাণ।

৪. তারা পীর সম্বন্ধে অতিরঞ্জনের শিকার। যেমন:

---

১. শরীয়তের আলো, খাজা বাবা এনায়েতপুরী (র.)-এর অনুমোদন ক্রমে মওলানা মো. মকিম উদ্দিন প্রণীত। প্রকাশক পীরজাদা মৌ. খাজা কামাল উদ্দিন (নূহ মিয়া) পুন. মুদ্রণ: ১৪০৭ সাল, পৃ. ৩৮-৩৯।

(১) তাদের মতে পীর ধরা ফরয। অথচ অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও দ্ব্যর্থহীন ভাষ্য ছাড়া কোন কিছুকে ফরয বলে সাব্যস্ত করা যায় না। এনায়েতপুরী বলেন, "পীর ধরা সবার জন্য ফরয।"[১]

"পীরের অছিলা ধরার বয়ান" শিরোনামে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা পীর ধরার স্বপক্ষে তারা দলীল পেশ করেছেন:

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ.﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনরা, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁর ওছীলা অর্থাৎ, নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর। (সূরা: ৫-মায়িদা: ৩৫)

কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও পীর ধরা ফরয এ মর্মে দলীল পেশ করেছেন:

﴿وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَه وَلِيًّا مُّرْشِدًا.﴾

অর্থাৎ, তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার কোন মুরশিদ (পথপ্রদর্শনকারী) পাবে না। (সূরা: ১৮-কাহ্ফ: ১৭)

তারা বলেন, পবিত্র কালামে মাজীদের এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাহার কোন কামেল মোরশেদ নাই, সে নিশ্চয়ই পথভ্রষ্ট।[২]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে কোন কোন সাহাবী কর্তৃক জিহাদ করা, চুরি, যেনা না করা প্রভৃতি বিষয়ের উপর বাইআতের কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে উলামায়ে কেরাম বাইআতে সুলূক তথা পীর-মুরীদির বাইআত প্রমাণিত করেছেন। অতএব পীর গ্রহণ করাকে সুন্নাত বলা যেতে পারে। কিন্তু কোনক্রমেই ফরয নয়। পীর ধরাকে ফরয বলা শরীআতে বাড়াবাড়ি বৈ কিছু নয়। পূর্বোক্ত আয়াতে যে الوسيلة শব্দটি এসেছে, সাধারণভাবে মুফাসসিরীনে কেরাম তার দ্বারা ইবাদত-বন্দেগী উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কোন কোন মুফাস্সির তার মধ্যে শায়খ গ্রহণের বিষয়টিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায় মর্মে মত দিয়েছেন। এর অর্থ হল শব্দটি পীর ধরার ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন নয়। আর দ্ব্যর্থহীন অর্থ বিশিষ্ট কোন ভাষ্য ছাড়া কোন ফরয প্রমাণিত করা যায় না। আর দ্বিতীয় আয়াতের সঙ্গে মুর্শিদ ধরার বিষয়টি কোনোভাবেই সম্পর্কিত নয়।

(২) এনায়েতপুরীগণ পীরের মধ্যে তাওয়াজ্জুহ দিয়ে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন এনে দেয়ার ক্ষমতার প্রবক্তা। তাদের মতে এনায়েতপুরী পীর সাহেবের মধ্যে "তাওয়াজ্জুহে ইত্তেহাদী"-র ক্ষমতা ছিল। এ সম্বন্ধে তারা লিখেছেন– "তাওয়াজ্জুহে এত্তেহাদীর শক্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক। যে সে পীরে তাওয়াজ্জুহ্ দিতে পারে না। যাঁহাকে আল্লাহ এত্তেহাদী তাওয়াজ্জুহ্ দানের ক্ষমতা দিয়াছেন, তিনি যদি ঐ তাওয়াজ্জুহ্ কাহাকেও

---

১. তরিকতের ওজিফা শিক্ষা, মৌ. মো. আবদুর রহমান মধুপুরী, মোয়াজ্জেম দরবার শরীফ এনায়েতপুর, প্রকাশনায় লেখক, ৭ম সংস্করণ, ১৪০৫ সন, পৃ. ২৬।

২. গাঞ্জে আছরার বা মা'রেফাত তত্ত্ব, খাজাবাবা এনায়েতপুরী (রঃ)-এর অনুমোদন ক্রমে মো. মকিম উদ্দীন প্রণীত, প্রকাশক পীরজাদা মৌ. খাজা কামাল উদ্দিন (নূহ মিয়া) ১০ম সংস্করণ, ১৪০৯ সাল, প. ৪৩।

দান করেন, তবে প্রবল অগ্নির ন্যায় মুহূর্তের মধ্যে তাহার দেলের যাবতীয় ময়লা জ্বালাইয়া দিয়া তাহার দেল পাক ও ছাফ করিয়া দেয়। তখন লতীফা আল্লাহ আল্লাহ নামে হেলিতে (নড়া চড়া করিতে) থাকে।[১]

তার মধ্যে এমন ক্ষমতা থাকলে দুনিয়ার সকলকে তিনি পাক ছাফ করে দিলেন না কেন? এরূপ ক্ষমতা কি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছিল? থাকলে তিনি কেন সকলকে হেদায়েত করতে পারলেন না? কেন আল্লাহ তাআলা বললেন, তুমি চাইলেই কাউকে হেদায়েত করতে পার না বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়েত করেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لٰكِنَّ اللهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ.﴾

অর্থাৎ, তুমি যাকে চাও হেদায়েত করতে পার না বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়েত করেন। (সূরা: ২৮-কাসাস: ৫৬)

(৩) এক শ্রেণীর ভ্রান্ত লোক আছেন যারা মনে করেন আল্লাহ তাআলা পীর বুযুর্গদেরকে সন্তান দান করা, ব্যবসা-বাণিজ্যে আয়-উন্নতি দান করা, মানুষের মাকসূদ পূর্ণ করা ইত্যাদির ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন। পীর সাহেবদের কাছে চাইলে তারা মানুষের এসব মাকসূদ পূর্ণ করে দিতে পারেন। ভাল-মন্দের ক্ষমতা পীরের হাতে আছে। এনায়েত-পুরীগণও অনুরূপ ধারণা রাখেন বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের নিম্নোক্ত কবিতা তার প্রমাণ। পীর সাহেব এনায়েতপূরীর উদ্দেশে তার সাহেবজাদা লিখেছেন–

খাজা তোমার দরবারে কেউ ফিরে না খালি হাতে
খাজা তোমার পাক রওজায় এসে যদি কেউ কিছু চায়
চাইতে জানলে রয়না কাঙ্গাল অফুরন্ত ভাণ্ডারে।[২]

এনায়েতপুরীর মুরীদ ও খলীফা আটরশির পীর সাহেব বলেছেন, এনায়েতপুরী (কু.) ছাহেব তিরোধানের পূর্বে আমাকে বলিয়া গিয়াছেন, "বাবা, তোর ভাল-মন্দ উভয়টাই আমার হাতে রইল। তোর কোন চিন্তা নাই।"[৩]

খণ্ডন

এটা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা পরিপন্থী। এটা কুরআন ও সহীহ্ হাদীছে পরিষ্কারভাবে যা বলা হয়েছে, তার বিরোধী। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا.﴾

২. গাঞ্জে আছরার বা মা'রেফাত তত্ত্ব, খাজাবাবা এনায়েতপুরী (র.)-এর অনুমোদন ক্রমে মো. মকিম উদ্দীন প্রণীত, প্রকাশক পীরজাদা মৌ. খাজা কামাল উদ্দিন (নূহ মিয়া) ১০ম সংস্করণ, ১৪০৯ সাল, পৃ. ৭৯।
১. পুষ্পাদ্যান, পীর জাদা খাযা কামাল উদ্দিন (নূহ মিয়া) লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ৭৬।
২. শাহসূফী হযরত ফরিদপুরী (মা. জি. আ.) ছাহেবের নসিহত, ক্রমিক নং ৩, পৃ. ১১১, প্রকাশক–পীরজাদা মোস্তফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেদী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর, ৩য় মুদ্রণ, ১লা মে -১৯৯৯।

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, সবকিছুই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। এই সম্প্রদায়ের কী হল যে, এরা কোন কথা বুঝতেই পারে না। (সূরা: ৪-নিসা: ৭৮)

এক হাদীছে বলা হয়েছে,

والخير والشر كله بيديك

অর্থাৎ, ভাল-মন্দ সবই তোমার (আল্লাহ্‌র) হাতে।

অতএব সকলের ভাল-মন্দ আল্লাহ্‌র হাতে, কোন মানুষের হাতে নয়।

(৪) তারা এনায়েতপূরী পীরকে প্রায় নবীর সমমর্যাদা সম্পন্ন মনে করেন। তাদের ধারণায় যে ব্যক্তি এনায়েতপুরীর সাক্ষাৎ পেয়েছে, সে জান্নাতী। তাদের রচিত নিম্নোক্ত কবিতা তার প্রমাণ–

গৌছল আজম খাজা তুমি আউলিয়া ছরদার
তোমাকে দিয়াছেন আল্লাহ রহমতের ভাণ্ডার।
পাইলে তোমার দেখা জান্নাত নছীব তার।[১]

৫. তাদের মতে সামা জায়েয।[২] সামা সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ে "সামা প্রসঙ্গ" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৬. তারা ওরস-এর প্রবক্তা। শুধু প্রবক্তাই নয়, ওরস সম্পর্কিত ধারণার ব্যাপারে তাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি রয়েছে। আটরশির পীর সাহেব এনায়েতপুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ওরস শরীফ কাজা করিলে পরবর্তী এক বছরের জন্য বহু দুর্ভোগ পোহাইতে হয়। যাবতীয় আয়-উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়।"[৩]

৭. এনায়েতপুরী সাহেব বলেছেন, এই তরিকায় মৌখিক যেকের বা উচ্চস্বরে যেকের করার নিয়ম নাই।[৪]

এই বক্তব্য অবশ্যই কুরআন হাদীছ বিরোধী। কারণ কুরআন হাদীছে যে যিক্‌র করার কথা এসেছে, তার মধ্যে অবশ্যই মৌখিক যিক্‌র অন্তর্ভুক্ত।

আটরশি

(আটরশির পীর ও তার অনুসারীদের আকীদা-বিশ্বাস)

"আটরশির পীর" বলতে ফরিদপুর শহরের নিকটস্থ আটরশি বিশ্বজাকের মঞ্জিল -এর প্রতিষ্ঠাতা শাহসুফী হাশমত উল্লাহকে বোঝানো হয়েছে। তিনি এনায়েতপুরের পীর

১. পুষ্পহার, মৌ. মো. আব্দুর রহমান মোজাদ্দেদী, মোয়াজ্জেম- দরবার শরীফ এনায়েতপুর, ১২তম সংস্করণ, বাং ১৪০৮, পৃ. ৩৭।
২. গাঞ্জে আছরার বা মা'রেফাত তত্ত্ব, খাজাবাবা এনায়েতপুরী (র.)-এর অনুমোদন ক্রমে মো. মকিম উদ্দীন প্রণীত, প্রকাশক পীরজাদা মৌ. খাজা কামাল উদ্দিন (নূহ মিয়া) ১০ম সংস্করণ, ১৪০৯ সাল, পৃ. ৯৮।
৩. সাহসূফী হযরত ফদিরপূরী (মা. জি. আ.) ছাহেবের নসিহত" প্রকাশক. পীরজাদা মোস্তফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেদী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপূর, খণ্ড ২১, পৃ. ৪৯, সংস্করণ ৩য়, ৫ জুন-২০০১।
৪. "ওজিফা ও উপদেশ", সম্পাদক-পীরজাদা মৌ. খাজা কামাল উদ্দীন -সাজ্জাদনসীন এনায়েত-পুর, পৃ. ৩৬।

শাহসুফী মুহাম্মদ ইউনুস আলী এনায়েতপুরীর মুরীদ ও খলীফা। জনাব হাশমত উল্লাহ সাহেব জামালপুর জেলার অন্তর্গত শেরপুর থানার পাকুরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শাহ আলীম উদ্দীন। জনাব হাশমত উল্লাহ সাহেবের বয়স যখন পাঁচ/ছয় বৎসর, তখন নোয়াখালীর মাওলানা শরাফত আলী সাহেবের নিকট আরবী, ফার্সীর প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এতটুকুই তার নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়ার ইতিহাস পাওয়া যায়। দশ বৎসর বয়সের সময় তার পিতা তাকে এনায়েতপুরীর পীর শাহ সুফী ইউনুস আলীর খেদমতে অর্পন করেন। ত্রিশ বৎসর যাবত তিনি এনায়েতপুরী সাহেবের কাছে থাকেন। অতপর এনায়েতপুরী সাহেবের নির্দেশে ফরীদপুরে এসে "জাকের ক্যাম্প" নামে একটি ক্যাম্প স্থাপন করেন। পরবর্তিকালে এটারই নাম দেয়া হয় "বিশ্ব জাকের মঞ্জিল"।[১]

আটরশির পীর জনাব হাশমত উল্লাহ সাহেব কর্তৃক লিখিত একটা বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। সেটা হল "বিশ্বজাকের মঞ্জিলের পরিচালনা পদ্ধতি"। এ ছাড়া বিশ্ব জাকের মঞ্জিল কর্তৃক "শাহ সুফী হযরত ফরিদপুরী (মাঃ জিঃ আঃ) ছাহেবের নসিহত" নামে তার বয়ান ও নসিহতসমূহের সংকলন বের করা হয়েছে ২২ খণ্ডে। এই খণ্ডসমূহের আলোচনার সিংহভাগই মা'রেফাত সংক্রান্ত মাকাম, লতীফা, ছায়ের, উরূয ইত্যাদি তাসাওউফের নানান পরিভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে এবং অনেকটা অবোধগম্য আলোচনায় ভরা। যেসব বিষয় সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে স্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। যেগুলো কোন কোন বুযুর্গের কাশ্ফ এবং অনেকের কল্পনার সমষ্টি, যা অন্য কারও জন্য দলীল নয়। তদুপরি এসব বক্তব্যকে সমর্থিত করার জন্য তিনি কুরআন-হাদীছ থেকে যেসব দলীলের অবতারণা করেছেন, তার মধ্যে বহু সংখ্যক মওযূ' বা জাল হাদীছ বিদ্যমান। আবার রয়েছে বাতিনী সুফীদের ন্যায় অগ্রহণযোগ্য তাবীল বা অপব্যাখ্যা। তার এসব নসিহতের বইতে বিদ্যমান জাল হাদীছের কয়েকটা নিম্নে উল্লেখ করা হল, যেগুলো হাদীছ নয় বরং প্রচলিত কথা বা কোন ব্যক্তি বা কোন সূফীর কথা; অথচ তিনি সেগুলোকে অবলিলায় হাদীছ বলে চালিয়ে দিয়েছেন। কুরআন-হাদীছ সম্পর্কে জ্ঞান-স্বল্পতাই এর অন্যতম কারণ। যেমন:–

(١) موتوا قبل أن تموتوا. قال ابن حجر : إنه ليس بثابت، وقال القاري : من كلام الصوفية. (كذا في المقاصد الحسنة وكشف الخفاء ومزيل الإلباس)

(٢) من عرف نفسه فقد عرف ربه. قال النووي : إنه ليس بثابت. وقيل : هو قول يحيى ان معاذ الرازي . وقال ابن تيمية : موضوع. (كذا في المقاصد الحسنة وكشف الخفاء ومزيل الإلباس)

(٣) كنت كنزا لا اعرف فأحببت أن اعرف فخلقت خلقا. الحديث. قال ابن تيمية : إنه ليس من كلام النبي صلى الهل عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف. وكذا قال ابن حجر والزر كشي. (كذا في اللآلي المصنوعة للسيوطي والمقاصد الحسنة للسخاري وكشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني)

১. তথ্যসূত্র: বিশ্বজাকের মঞ্জিলের পরিচালনা পদ্ধতি, শাহ সুফী ফরিদপুরী, ও সংক্ষিপ্ত ওজিফা, মাহ্ফুযুল হক, প্রকাশনায় বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, ২০তম সংস্করণ।

(٤) قلوب المؤمنين عرش الله. قال الصغاني : موضوع. (كشف الخفاء و مزيل الإلباس للعجلوني)

(٥) لو لاك لما خلقت الأفلاك. قال الصغاني. موصوع. (أيضا)

এ ধরনের বহু জাল হাদীছ তার বক্তব্যের সর্বত্র বিদ্যমান।

তার এসব বই এবং বিশ্ব জাকের মঞ্জিল থেকে প্রকাশিত অন্য কয়েকটা বই থেকে তার ও তার অনুসারীদের আকীদা-বিশ্বাস সম্বন্ধে যা জানা যায় তা নিম্নরূপ।

১. পীর সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা

পীর সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা তাদের একটা প্রধান বিভ্রান্তি। যেমন:

(এক) ভাল-মন্দ পীরের হাতে।

আটরশির পীর সাহেব বলেছেন, "এনায়েতপুরী (কুঃ) ছাহেব তিরোধানের পূর্বে আমাকে বলিয়া গিয়াছেন, "বাবা, তোর ভাল ও মন্দ- উভয়টাই আমার হাতে রইল। তোর কোন চিন্তা নেই।"[১]

খণ্ডন

এনায়েতপুরী সাহেবের আকীদাও অনুরূপ ছিল। পূর্বে এনায়েতপুরী সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এটা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা পরিপন্থী। এটা কুরআন ও সহীহ্ হাদীছে পরিষ্কারভাবে যা বলা হয়েছে, তার বিরোধী। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا.﴾ (সূরা: ৪-নিসা: ৭৮)

হাদীছে বলা হয়েছে,

والخير الشر كله بيديك.

এ আয়াত ও হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সকলের ভাল-মন্দ আল্লাহ্র হাতে, কোন মানুষের হাতে নয়।

উল্লেখ্য, এ শ্রেণীর লোকেরা পীরকে খোদার স্তরে পৌঁছে দিয়ে পীরের মধ্যে খোদায়ী গুণ আরোপ করেছে। তাই ভাল-মন্দ সম্পাদন করার খোদায়ী গুণ পীরের

১. "সাহসূফী হযরত ফদিরপূরী (মা. জি. আ.) ছাহেবের নসিহত" খণ্ড নং ৩, পৃ. ১১১ প্রকাশক- পীরজাদা মোস্তফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেদী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপূর, ৩য় মুদ্রণ ১লা মে-১৯৯৯।

মধ্যে থাকাকে সাব্যস্ত করেছে। আর পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, যারা আল্লাহ ও রসূলের মধ্যে পার্থক্য না করার মত পোষণ করে, বা মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রবেশ করার মত পোষণ করে, বা পীর মাশায়েখকে খোদার স্তরে পৌঁছে দিয়েছে, তারা এ বিষয়ে সাধারণত وحدة الوجود বা "সর্বেশ্বরবাদ" দর্শন-এর অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এটা করে থাকে। এ সম্পর্কে এ অধ্যায়ের শেষভাগে "সর্বেশ্বরবাদ/সর্বখোদাবাদ" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। গভীর মনোযোগ সহকারে বিষয়টি পড়ে নিন।

(দুই) পীর পরকালে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবে।

আটরশির পীর সাহেব বলেন, "দুনিয়াতে থাকাবস্থায় তোমরা খোদা-প্রাপ্তির পথে যে যতটুকুই অগ্রসর হও না কেন, তোমাদের ছায়ের-ছুলূক যদি জীবৎকালে সম্পন্ন নাও হয়, তবুও ভয় নাই। মৃত্যুর পরে কবরের মধ্যে দুই পূণ্যাত্মা (অর্থাৎ, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আপন পীর) তোমাকে প্রশিক্ষণ দিবেন। মা'রেফাতের তালিম দিবেন; ফলে হাশরের মাঠে সকলেই আল্লাহ্‌র অলী হইয়া উঠিবেন। এই করণেই বলা হয় -এই তরিকায় যিনি দাখিল হন, তিনি আর বঞ্চিত হন না।"[১]

পীর-মাশায়েখ মুরীদদের পাপের বোঝা বহন করে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন এমন হবে না। এ ধারণাটা খৃষ্টানদের "প্রায়শ্চিত্যের আকীদা" (عقيدة كفاره)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ আকীদা কুফরী আকীদা। খৃষ্টান সম্প্রদায় মনে করে যে, হযরত ঈসা (আ.) নিজের প্রাণ দিয়ে তার অনুসারীদের মুক্তির ব্যবস্থা করে গেছেন। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

﴿وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى﴾

অর্থাৎ, কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না। (সূরা: ৬-আন্‌আম: ১৬৪)

কাজেই পীর ধরলে মুক্তি হবে এমন আকীদা চরম গোমরাহীমূলক আকীদা। তবে হ্যাঁ, হক্কানী পীর মাশায়েখের হেদায়েত মেনে চললে তার ফায়দা অবশ্যই রয়েছে সেটা স্বতন্ত্র কথা।

পীর তালীম দিয়ে বা কোনভাবে মুরীদের নাজাতের ব্যবস্থা করতে পারবে- এ ধারণা ভ্রান্ত। কেউ নিজে আমল করে নিজের নাজাতের ব্যবস্থা না করলে কোনো পীর তাকে নাজাত দিতে পারবে না। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গোত্রের লোক বনু হাশিম, বনু মুত্তালিবসহ নিজ কন্যা ফাতেমাকে পর্যন্ত আহবান করে বলেছেন, তোমরা নিজেদের নাজাতের ব্যবস্থা নিজেরা কর, আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারব না। ইরশাদ করেছেন,

১. "সাহসূফী হযরত ফদিরপূরী (মা. জি. আ.) ছাহেবের নসিহত" খণ্ড নং ৪, পৃ. ৯৩ প্রকাশক- পীরজাদা মোস্তফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেদী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপুর, ৪র্থ মুদ্রণ, ৮ই এপ্রিল ১৯৯৮ ইং পৃ. ৯৩।

يا بني هاشم! أَنْقِذُوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب! أنقذوا أَنفسكم من النار، فإ ني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة! أنقذي نفسكِ من النار، فإني لاأغني عنكِ من الله شيئا. الحديث. (متفق عليه. رواه البخاري في كتاب المناقب- باب من انتسب آبائه في الإسلام الجاهلية، وراه مسلم في كتاب الإيمان)

অর্থাৎ, হে বনী হাশেম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, আমি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না। হে বনূ আব্দিল মুত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, আমি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না। হে ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, আমি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না। ...। (বোখারী ও মুসলিম)

(তিন) পীর দুনিয়াতে সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন।

আটরশির পীর সাহেব বলেন, মুর্শিদে কামেল তদীয় মুরীদ পৃথিবীর যে স্থানেই থাকুক না কেন সেই স্থানেই তাহাকে কুওতে এলাহিয়ার হেফাজতে রাখিতে পারেন। মুর্শিদে কামেলকে আল্লাহ এইরূপ ক্ষমতা দান করেন। শুধু মুরীদকেই নয় মুরীদের আত্মীয়-স্বজন, মাল-সামানা, বাড়ী-ঘর যাহা কিছুই খেয়াল করুক, তাহার সবকিছুই আল্লাহ তাআলার কুওতের কেল্লায় বন্দী করিয়া দেন।[১]

এ ধারণা স্পষ্টত কুরআন-বিরোধী ধারণা। আল্লাহ পাক কারও কোন বিপদের ফয়সালা করলে কেউ তাকে তা থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ﴾

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ তোমার কোন অকল্যাণ ঘটান, তাহলে তা হটানোর কেউ নেই। (সূরা: ১০-ইউনুস: ১০৭)

পীর তার মুরীদ এবং মুরীদের আত্মীয়-স্বজনকে সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করতে পারলে আটরশী সাহেবের মুরীদ ও তাদের আত্মীয়-স্বজন কেন পথে-ঘাটে দুর্ঘটনার শিকার হন? কেন তারা আততায়ীর হাতে নিহত হন? কেন তাদের বাড়ি-ঘরে চুরি ডাকাতি হয়?

২. পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আবশ্যকতা নেই।

আটরশির পীর সাহেব বলেন, "হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানগণ নিজ নিজ ধর্মের আলোকেই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে পারে এবং তাহলেই কেবল

১. "সাহসূফী হযরত ফদিরপূরী (মাঃ জিঃ আঃ) ছাহেবের নসিহত" প্রকাশকঃ পীরজাদা মোস্তফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেদী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপূর, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৭ই জুলাই-১৯৯৭ ইং।

বিশ্বে শান্তি আসতে পারে। (আটরশির কাফেলা সংকলনে মাহফুযুল হক, আটরশির দরবার থেকে প্রকাশিত, পৃঃ ৮৯, সংস্করণ-১৯৮৪-)[১]

খণ্ডন

﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ১৯)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى الْأٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.﴾

অর্থাৎ, কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করলে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। এমন ব্যক্তি পরকালে চির হতভাগাদের দলে থাকবে। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৮৫)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيًّا ما وسعه إلا أن يتبعني. (رواه أحمد برقم ١٥٠٩٤ وإسناده حسن)

অর্থাৎ, কছম ঐ সত্তার, যার হাতে আমার জীবন! হযরত মূসা নবীও যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ না করে তাঁরও কোনো উপায় থাকত না। (মুসনাদে আহমদ)

৩. চার মাযহাব ও ইমামগণ সম্বন্ধে কটূক্তি

আটরশির দরবার থেকে প্রকাশিত বহু গ্রন্থের প্রণেতা এবং আটরশির প্রসিদ্ধ তাত্ত্বিক লেখক মাহফুযুল হক সাহেব লিখেছেন, "ইসলামী আইন ব্যবস্থার বর্তমান অব্যবস্থা ও অবক্ষয়ের জন্য আইনের বিধানসমূহ বা রীতিসমূহ দায়ী নহে; বরং এই অবক্ষয়ের মূল কারণ আইন প্রণেতাগণের (ইমামগণের) অনমনীয় নীতি। এই অনমনীয় নীতি অবলম্বনের দ্বারাই ইসলামী আইন প্রণেতাগণ কালক্রমে ইসলামী আইনের মৌলিক কাঠামোর মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া আইনকে একটি অনমনীয় ও বাস্তবতার সহিত সামঞ্জস্যহীন শাস্ত্রে পরিণত করেন।[২]

এখানে সব মাযহাবের ইমামগণকে মনগড়া ব্যাখ্যাদানকারী ও সমস্ত মাযহাবের ফেকাহশাস্ত্রকে অবাস্তব শাস্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এভাবে সমস্ত মাযহাবের সমস্ত মুসলমানকে শাস্ত্রহীন তথা ধর্মহীন আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা খুব কম বাতিলপন্থীই বলেছে।

১. তাসাওউফ, তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, পৃঃ ১৪৭ প্রকাশকাল-২০০০ খৃঃ ১৪২১ হি.।
২."ইসলামের রূপরেখা" লেখক, মাহফুযুল হক, দ্বিতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর- ১৯৮২, প্রকাশনায়: ইসলামী গবেষণা ও সংস্কৃতি পরিষদ, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, পৃষ্ঠা নং ২৪।

৪. ওরস সম্বন্ধে তাদের বাড়াবাড়ি

ওরস সম্পর্কে তাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি রয়েছে। আটরশির পীর সাহেব এনায়েতপুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ওরস শরীফ কাজা করিলে পরবর্তী এক বছরের জন্য বহু দুর্ভোগ পোহাইতে হয়। যাবতীয় আয়-উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়।"[১]

বি. দ্র. : ওরস অবৈধ হওয়া সম্বন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে "ওরস প্রসঙ্গ" শিরোনামে দলীল প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

চন্দ্রপুরী

(চন্দ্রপাড়ার পীর আবুল ফযল-এর চিন্তাধারা)

চন্দ্রপাড়া ফরীদপুর জেলা শহর থেকে অদূরে একটি গ্রাম। এখানকার অধিবাসী মৌঃ সায়্যিদ আবুল ফযল সুলতান আহমদ (মৃত ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দ) চন্দ্রপাড়া পীর নামে খ্যাত। তিনি শাহ সূফী ইউনুস আলী এনায়েতপুরীর শিষ্য। তিনি দেওয়ানবাগী পীর মাহবুব-এ খোদার পীর ও শ্বশুর।

চন্দ্রপাড়ার পীর আবুল ফযল সুলতান আহমদ-এর ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যে রয়েছে–

১. কোন লোক বড় বুযুর্গ হলে তার আর ইবাদত লাগে না। স্বয়ং আবুল ফযল কর্তৃক লিখিত "হাক্কুল ইয়াক্বীন" পুস্তকের ২৯ পৃষ্ঠায় আছে–

"কোন লোক যখন মাকামে ছুদুর, নশোর, শামসী, নূরী, কুরবে মাকিনের মোকাম অতিক্রম করিয়া নফ্সীর[২] মোকামে গিয়ে পৌঁছে, তখন তাঁহার কোন ইবাদত থাকে না। জয্‌বার অবস্থায়ও কোন লোক যখন ফানার শেষ দরজায় গিয়ে পৌঁছে, তখনও তাহার কোন ইবাদত থাকে না। এমনকি তখন ইবাদত করিলে কুফ্‌রী হইবে। তাসাওউফের বহু কিতাবে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে।"[৩]

খণ্ডন

* সুরেশ্বরী পীরের আকীদাও অনুরূপ ছিল। পূর্বে "সুরেশ্বরী" পীর-এর আকীদা-বিশ্বাস আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ এ আকীদার খণ্ডন পেশ করা হয়েছে। তবে সুরেশ্বরী পীর এত আগে বেড়ে বলেননি যে, কামেল লোকদের জন্য ইবাদত করা কুফ্‌রী, যেমনটা চন্দ্রপাড়ার পীর বলেছেন।

* চন্দ্রপাড়া পীরের মতবাদ অনুসারে বলতে হবে সাহাবায়ে কেরাম ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুযুর্গির উচ্চস্তরে উন্নীত হননি নতুবা তাঁরা কেন

১. সাহসূফী হযরত ফদিরপূরী (মাঃ জিঃ আঃ) ছাহেবের নসিহত" প্রকাশকঃ পীরজাদা মোস্তফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেদী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপূর, খণ্ড ২১, পৃ. ৪৯, সংস্করণ ৩য়, ৫ই জুন-২০০১।
২. দেওয়ানবাগী মাহবূবে খোদা "আল্লাহ কোন পথে" বইয়ে (২য় সংস্করণ) লিখেছেন- কলবে ৭টি স্তরের মধ্যে নফসীর মর্যাদা সবার উর্দ্ধে। (পৃ. ৯০) এ থেকে বুঝা গেল চন্দ্রপাড়ার পীরের মতবাদ হল বড় বুযুর্গ হলে তার কোন ইবাদত থাকে না। এমনকি তার জন্য তখন ইবাদত করা কুফরী।
৩. হাক্‌কুল ইয়াকীন (অনুভবলব্ধ জ্ঞান) দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৭৮, পৃ. ২৯।

ইবাদত করতেন? যদি তারা মেনে নেন এবং অন্তত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ক্ষেত্রে তারা অবশ্যই বলতে বাধ্য হবেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুযুর্গির উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছিলেন, তাহলে নাউযুবিল্লাহ বলতে হবে তিনি এই স্তরে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও ইবাদত করে কুফ্রীতে লিপ্ত হয়েছিলেন। এমন আকীদার কুফ্রী হওয়ার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই।

২. চন্দ্রপাড়ার পীরের দ্বিতীয় ভ্রান্ত মতবাদ হল জিব্রাঈল এবং আল্লাহ এক ও অভিন্ন। চন্দ্রপাড়া পীরের জামাতা দেওয়ানবাগী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "সুফী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ" থেকে প্রকাশিত মাসিক "আত্মার বাণী" (৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) পত্রিকায় আছে– সুলতানিয়া মুজাদ্দেদিয়া তরীকার ইমাম চন্দ্রপুরী ফরমান, জিব্রাঈল বলতে অন্য কেহ নন স্বয়ং হাকীকতে আল্লাহ।[১]

খণ্ডন

জিব্রাঈল (আ.) একজন ফেরেশতা। ফেরেশতা আল্লাহ্‌র মাখলূক ও আল্লাহ্‌র দাস। অতএব হযরত জিব্রাঈল (আ.) আল্লাহ্‌র মাখলূক ও তাঁর দাস। খালেক আর মাখলূক এক নয়।

ফেরেশতাগণ যে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি তার প্রমাণ হল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত–

﴿اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰئِكَةَ اِنَاثًا وَّ هُمْ شٰهِدُوْنَ.﴾

অর্থঃ অথবা আমি কি ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম আর তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? (সূরা: ৩৭-সাফ্ফাত: ১৫০)

আর ফেরেশতাগণ যে আল্লাহর দাস অর্থাৎ, তাঁর দাসত্ব করাই ফেরেশতাদের কাজ, তা প্রমাণিত হয় নিম্নোক্ত আয়াত থেকে–

﴿وَ جَعَلُوا الْمَلٰئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا.﴾

অর্থাৎ, তারা দয়াময় আল্লাহ্‌র বান্দা ফেরেশতাদেরকে নারী গণ্য করেছে। (সূরা: ৪৩-যুখরূফ: ১৯)

৩. আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে।

দেওয়ানবাগ হতে প্রকাশিত আত্মারবাণী ৫ম বর্ষ ৬ষ্ট সংখ্যার ২৫ নং পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে- ১৪/১১/৮২ ইং এশার সময় জনৈক মুরিদ জিজ্ঞাসা করিল "বাবাজান ইবলিছের গলায় পায়গম্বরী হার হইল কেন?" এর জবাবে চন্দ্রপাড়ার পীর মৌঃ সুলতান আহমাদ বলিলেন, "ইবলিছের অধীনে অসংখ্য ফেরেশতা কাজ করতেছে। চন্দ্রপুরী বলেন, ইবলিছ তার অধীনে যে ফেরেশতা আছে তাদের বলতেছে, এই ফেরেশতা তুই এই কর। বিভিন্ন নাম আছে তো, তুমি এইডা বানাও, তুমি ঐডা বানাও। এরে চোর বানাও। ওরে চোট্টা বানাও। ওরে সাধু বানাও। সে হুকুম করতেছে তারা (ফেরেশতারা) বানাইতেছে। (২৬ পৃ.)[২]

২. বাতিল পীরের পরিচয়, মুফতী মুহাম্মাদ শাসছুল হক, পৃ. ২২। ২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

একথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, চন্দ্রপুরীর মতে আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে।

খণ্ডন

আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা সর্বদা আল্লাহ্‌র হুকুমের তাবেদারীতে লিপ্ত। তাঁর ইবাদতে লিপ্ত। তাঁরা কখনও আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে না, আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন,

﴿لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয় তারা তা-ই করেন। (সূরা: ৬৬-তাহ্‌রীম: ৬)

৪. চন্দ্রপাড়ার পীর পুনর্জন্মবাদের প্রবক্তা। মাসিক আত্মার বাণী ৫ম বর্ষ ৬ষ্ট সংখ্যা ২৬ পৃষ্ঠায়[১] লেখা হয়েছে- চন্দ্রপুরী ফরমাইলেন, "পুনর্জন্ম সম্বন্ধে কুরআনেই আছে-

﴿كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, কীভাবে তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কুফ্‌রী কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, অনন্তর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন, তারপর তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে। (সূরা: ২- বাকারা: ২৮)

চন্দ্রপুরীর মতে এখানে ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ -এর অর্থ পৃথিবীতে পুনরায় জন্মলাভ করা।

খণ্ডন

জমহুরের মতে এখানে ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ -এর অর্থ হাশরে পুনরায় জীবিত অবস্থায় উত্থিত হওয়া। আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করা কুফ্‌রী।[২] পুনর্জন্মবাদ সম্পর্কে এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ১৩১ নং পৃষ্ঠায় আলোচনা দেখুন।

চন্দ্রপুরী কাফের না গোমরাহ- এ প্রসঙ্গ

* শরঈ উযর বা কারণ ব্যতীত ইবাদত ফরয না হওয়ার আকীদা-বিশ্বাস একটা কুফ্‌রী আকীদা। আর তিনি ইবাদত করাকেই কুফ্‌রী বলেছেন! তদুপরি একটি ফরয কাজকে কুফরী আখ্যায়িত করাও কুফ্‌রী। শরহে আকাইদ গ্রন্থে আছে-

ولا يصل العبد ما دام عاقلا بالغا إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي..... وهذا كفر وضلال.

অর্থাৎ, বান্দা যতক্ষণ সুস্থ মস্তিষ্ক বালেগ থাকে ততক্ষণ যত বড় আবেদ হোক না কেন তার উপর থেকে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ রহিত হয় না। রহিত হওয়ার আকিদা কুফ্‌র ও পথভ্রষ্টতা।

১. বাতিল পীরের পরিচয়, মুফতী মুহাম্মাদ শাসছুল হক, পৃ. ২২।
২. كشاف اصطلاحات الفنون

* তারা আল্লাহ্‌র মাখলূক ফেরেশতাকে আল্লাহ্ থেকে অভিন্নতার মত পোষণ করে মাখলূককে খালেক সাব্যস্ত করেছে। আর খোদার কোন মাখলূককে খোদা সাব্যস্ত করা কুফ্‌রী। তাছাড়া জিব্রাঈল (আ.) সম্পর্কিত ধারণা জরূরিয়াতে দ্বীন (ضروریات دین)-এর[১] অন্তর্ভুক্ত। হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলবী বলেন, এ ধরনের ক্ষেত্রে কোন ভিন্নতর ব্যাখ্যা প্রদান (تاویل) এটাকে অস্বীকার করার নামান্তর। আর এ ধরনের বিষয়কে অস্বীকার করা কুফ্‌রী।[২]

দেওয়ানবাগী

(দেওয়ানবাগী পীর ও তার চিন্তাধারা)

তার নাম মাহবূবে খোদা। ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ সালে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আশুগঞ্জ থানাধীন বাহাদুরপুর গ্রামে তার জন্ম। তার পিতা সৈয়দ আবদুর রশীদ সরকার। প্রাথমিক স্কুল শিক্ষার পর তিনি তালশহর করিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। স্বাধীনতার পর সেনাবাহিনীতে রিলিজিয়াস টিচার পদে চাকরি করেন। ফরিদপুরস্থ চন্দ্রপাড়া দরবারের প্রতিষ্ঠাতা মৃত আবুল ফযল সুলতান আহমদ (চন্দ্রপাড়ার পীর) ছিলেন তার পীর এবং শ্বশুর। মাহবূবে খোদা নিজে এবং তার ভক্তবৃন্দ তাকে "সূফী সম্রাট" হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

তিনি ঢাকার অদূরে দেওয়ানবাগ নামক স্থানে একটা এবং ১৪৭ আরামবাগ ঢাকা-১০০০ তে 'বাবে রহমত' নামে আরেকটা দরবার স্থাপন করেছেন। তিনি সূফী ফাউণ্ডেশন নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যা উপরোক্ত আরামবাগের ঠিকানায় অবস্থিত। উক্ত ফাউণ্ডেশন থেকে তার তত্ত্বাবধানে এবং নির্দেশে বেশ কয়েকটা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে–

১. সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী অবদান আল্লাহ কোন্ পথে ?
২. সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কার
৩. স্রষ্টার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সূফী সম্রাট ঃ আল্লাহ্‌কে সত্যিই কি দেখা যায় না?
৪. বিশ্ব নবীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সূফী সম্রাট ঃ রাসূল (সঃ) কি সত্যিই গরীব ছিলেন?
৫. মুক্তি কোন্ পথে?
৬. শান্তি কোন্ পথে?
৭. ওয়াজিফা
৮. মানতের নির্দেশিকা
৯. এজিদের চক্রান্তে মোহাম্মাদী ইসলাম

---

১. এটি একটি পরিভাষা, এর অর্থ হল অকাট্য দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এমন বিষয় যা সকলের কাছে সুবিদিত, আম খাস নির্বিশেষে সকলেই সে সম্বন্ধে অবগত।
২. علم الکلام

১০. সুলতানিয়া খাবনামা প্রভৃতি। এ ছাড়া উক্ত ফাউণ্ডেশন কর্তৃক 'মাসিক আত্মার বাণী' ও 'সাপ্তাহিক দেওয়ানবাগ' নামে দুটো পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এসব গ্রন্থ ও পত্রিকার বর্ণনা থেকে দেওয়ানবাগী সাহেবের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে যা জানা যায়, তা নিম্নরূপ।

দেওয়ানবাগী সাহেবের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা

১. মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা জরূরী নয়। যেমন 'আল্লাহ কোন পথে' গ্রন্থে লেখা হয়েছে- যে কোন ধর্মের লোক তার নিজস্ব অবস্থায় থেকে আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পন করে তাঁর বিধানমত নিজেকে পরিচালিত করতে পারে। তাহলে নামধারী কোন মুসলমানের চেয়েও সে উত্তম। মোটকথা, ইসলাম বা মুসলিম কোন ব্যক্তির নাম নয়, এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দিষ্ট বিধান এবং বিধান পালনকারীর নাম। যে কোন অবস্থায় থেকে এই বিধান পালন করতে পারলেই তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা যায়। আর যে কোন কুলে থেকেই এই চরিত্র অর্জন করতে পারলে তার মুক্তি হওয়া সম্ভব। (অর্থাৎ, স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ জরূরী নয়।)[১]

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ দেওয়ানবাগী বলেন, আমার এখানে এক ব্যক্তি আসে। সে ভিন ধর্মের অনুসারী। তার ধর্মে থেকেই ওজীফা আমলের নিয়ম তাকে বলে দিলাম। কিছুদিন পর লোকটা এসে আমাকে জানালো- হুজুর একরাত্রে স্বপ্নে আমার রাসূল (সঃ)-এর রওযা শরীফে যাওয়ার খোশ নসীব হয়। সেখানে গিয়ে উনার কদম মোবারকে সালাম দিয়ে জানালাম যে, শাহ দেওয়ানবাগী হুজুর কেবলার দরবার শরীফ থেকে এসেছি। নবীজি শায়িত ছিলেন। তিনি দয়া করে উঠে বসলেন। নবীজি তাঁর হাত মোবারক বাড়িয়ে আমার সাথে মোসাফা করলেন। মোসাফা করার পর থেকে আমার সারা শরীরে জিকির অনুভব করতে পারি। ... এখন আমার অবস্থা এই যে, যখন যা কিছু করতে চাই তখন আমার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংবাদ চলে আসে- তুমি এভাবে চল।[২]

খণ্ডন

কুরআনে কারীমের এক আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ১৯)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.﴾

---

১. সূত্র: 'আল্লাহ কোন পথে? ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, পৃ. ১১৩-১১৪ ও ১২৫-১২৬।
২. 'মানতের নির্দেশিকা' পৃ. ৩১, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন-২০০১।

অর্থাৎ, কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করলে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। এমন ব্যক্তি পরকালে চির হতভাগাদের দলে থাকবে। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৮৫)

হাদীছে এসেছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيًّا ما وسعه إلا أن يتبعني. (رواه أحمد برقم ١٥٠٩٤ وإسناده حسن)

অর্থাৎ, কছম ঐ সত্তার, যার হাতে আমার জীবন! হযরত মূসা নবীও যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ না করে তাঁরও কোন উপায় থাকত না। (মুসনাদে আহমদ)

২. তিনি জান্নাত, জাহান্নাম, হাশর, মীযান, পুলসিরাত, কিরামান কাতেবীন, মুনকার নাকীর, ফেরেশতা, হুর, তাকদীর, আমলনামা ইত্যাদি ঈমান-আকীদা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়কে অস্বীকার করেছেন। অর্থাৎ, এগুলোর তিনি এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা এগুলো অস্বীকার করার নামান্তর। 'আল্লাহ কোন্ পথে?' গ্রন্থে সে ব্যাখ্যাগুলো বিদ্যমান। উক্ত গ্রন্থে প্রথমে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত এসব বিষয়ে যে আকীদা-বিশ্বাস রাখেন সেগুলোকে প্রচলিত ধারণা[১] বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তারপর আল্লাহপ্রাপ্ত সাধক-গণের বরাত দিয়ে সেগুলোর এমন অর্থ বলা হয়েছে যা এগুলোকে অস্বীকার করার নামান্তর। যেমন: বলা হয়েছে, প্রচলিত ধারণামতে 'হুর' বলতে বেহেশতবাসীর জন্য নির্ধারিত সুন্দরী রমণীকে বুঝানো হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, আল্লাহপ্রাপ্ত সাধকগণ বলেন, 'হুর' বলতে মানুষের জীবাত্মা বা নফসকে বোঝায়। এভাবে ঈমান-আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হল। যেমন:

● **জান্নাত** সম্পর্কে বলা হয়েছে, "প্রভুর সাথে পুনরায় মিলনে আত্মার যে প্রশান্তি ও আনন্দ লাভ হয় উহাই শ্রেষ্ঠ সুখ। এ মহামিলনের নামই প্রকৃত জান্নাত।"[২] এখানে জান্নাতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং জান্নাত বলতে আত্মিক সুখকে বোঝানো হয়েছে।

● জান্নাতের **হুর** সম্পর্কে বলা হয়েছে, হুর বলতে মানুষের জীবাত্মা বা নফসকে বুঝায়।[৩]

● **জাহান্নাম** সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আত্মার চিরস্থায়ী যন্ত্রনাদায়ক অবস্থাকেই জাহান্নাম বলে।"[৪] এখানে জাহান্নামের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং আত্মার যন্ত্রণাকে জাহান্নাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

১. প্রচলিত ধারণা তাদের মতে প্রকৃত ধারণা নয়, অর্থাৎ, এটা ভুল -এ কথা 'আল্লাহ কোন্ পথে?' গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে।
২. 'আল্লাহ্ কোন্ পথে? ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, পৃ. ৪০।
৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১২। ৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪।

● **হাশর** বা পুনরুত্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে, "সূফী সাধকগণের দৃষ্টিতে মানুষের হাশর পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হয়ে থাকে। মানুষকে তার কর্মের প্রতিফল সঙ্গে সঙ্গেই প্রদান করা হয়। অর্থাৎ, কর্ম সম্পাদনের সাথে সাথে পরিণতি হিসেবে মানুষের উন্নতি বা অবনতি লাভ হয়।"[১] এখানে মৃত্যুর পর স্বশরীরে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা হয়েছে।

উক্ত গ্রন্থে অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় মৃত্যুর পর স্বশরীরে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে বলা হয়েছে, "প্রকৃতপক্ষে (মৃত্যুর পর) মৃত ব্যক্তির দেহের কোন ক্রিয়া থাকে না, তার আত্মার উপরেই সবকিছু হয়ে থাকে। আর এ আত্মাকে পরিত্যক্ত দেহে আর কখনো প্রবেশ করানো হয় না।[২]

● **পুলসিরাত** সম্পর্কে বলা হয়েছে, "পুলসিরাত পার হওয়া বলতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর কায়েম থাকা এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করাকে বুঝায়।"[৩]

● **মীযান** সম্পর্কে বলা হয়েছে, "মিযান বলতে মানুষের ষড়রিপুমুক্ত পরিশুদ্ধ বিবেককে বুঝায়।"[৪]

● **মুনকার-নাকীর** সম্পর্কে বলা হয়েছে, "মুনকার ও নাকীর বলতে কোন ব্যক্তির ভাল ও মন্দ কর্ম বিবরণীকে বুঝায়।"[৫]

● **কিরামান কাতেবীন** সম্পর্কে বলা হয়েছে, "পরমাত্মায় বিদ্যমান সূক্ষ্ম শক্তি যা ফেরেশতার ন্যায় ক্রিয়াশীল উহাই আলাদা আলাদা ভাবে পাপ এবং পূণ্যের বিবরণী লিপিবদ্ধ করে অর্থাৎ, তা পরমাত্মার স্মৃতিফলকে সংরক্ষিত হয়।"[৬]

● **আমলনামা** সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আমলনামা বলতে মানুষের সৎ কর্মের দ্বারা আত্মার উন্নতি এবং অপকর্মের দ্বারা আত্মার অবনতিকে বুঝায়।"[৭]

● **ফেরেশতা** সম্পর্কে বলা হয়েছে, "ফেরেশতা আলমে আমর বা সূক্ষাতিসূক্ষ্ম জগতের বস্তু, যা ষড়রিপুমুক্ত পুতঃপবিত্র আত্মাবিশেষ। মানুষের মাঝে ২টি আত্মা রয়েছে। একটি জীবাত্মা এবং অপরটি পরমাত্মা। পরমাত্মার ২টি অংশ। যথা: মানবাত্মা ও ফেরেশতার আত্মা। এই ফেরেশতার আত্মাই মানুষের দেহের ভিতরে ফেরেশতার কাজ করে থাকে।"[৮]

● দেওয়ানবাগীর বিশ্বাস হল **আল্লাহ ও জিব্রাঈল এক ও অভিন্ন**। "আত্মার বাণী" (৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) পত্রিকায় আছে[৯]– "সুলতানিয়া মুজাদ্দেদিয়া তরীকার ইমাম চন্দ্রপুরী ফরমান, জিব্রাঈল বলতে অন্য কেহ নন স্বয়ং হাকীকতে আল্লাহ।" উল্লেখ্য- এ পত্রিকার সম্পাদক- মণ্ডলীর সভাপতি হলেন মাহবূবে খোদা দেওয়ানবাগী স্বয়ং নিজে।

● তাক্দীর সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তাক্দীর বলতে মানুষের কর্মফলকে বুঝায়। অর্থাৎ, মানুষের কর্মের দ্বারা অর্জিত উন্নতি অবনতির সংরক্ষিত হিসাব-নিকাশকে বুঝায়।

১. 'আল্লাহ্ কোন্ পথে ? ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, পৃ. ৫৪। ২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯। ৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬০। ৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৭। ৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৯। ৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৮। ৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৮। ৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৩। ৯. বাতিল পীরের পরিচয়, মুফতী মুহাম্মাদ শাসছুল হক, পৃ. ২২।

সৃষ্টির আদি হতে অদ্যাবধি এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের আত্মা বিভিন্ন বাহনে আরোহণ পূর্বক কর্মের যে স্মরণীয় স্মৃতিশক্তি আত্মার মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে উহাকেই মূলতঃ তাকদীর বলে।"[১]

এভাবে ঈমান-আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে এমন ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে যা উক্ত বিষয়গুলোকে অস্বীকার করার নামান্তর। অথচ এ বিষয়গুলো জরূরিয়াতে দ্বীন[২]-এর অন্তর্ভুক্ত। আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট এর যে প্রতিষ্ঠিত ও চিরন্তন অর্থ এবং ব্যাখ্যা, তার উপর সকলের ইজ্‌মা বা ঐক্যমত্য রয়েছে। আর এ ধরনের জরূরিয়াতে দ্বীনকে অস্বীকার করা কুফ্‌রী। আল্লামা সুবকী (রহ.) তার جمع الجوامع গ্রন্থে লিখেছেন–

جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر مطلقا.

অর্থাৎ, জরূরিয়াতে দ্বীন -যার উপর ইজমা সংঘটিত আছে- তার অস্বীকারকারী এক বাক্যে কাফের।

তবে এ ধরনের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, প্রথমত যদি তারা কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই বেধড়ক কুরআন হাদীছের ভাষ্যকে অস্বীকার পূর্বক মনগড়া মতামত ব্যক্ত করে। কিংবা শরঈ হুকুমের মাঝে যে ব্যাখ্যামূলক মতামত (تاویل) তারা দেয়, তা (تاویل)-এর নিয়ম নীতি অনুসরণ করে দেয় না, তাহলে তারা যে ব্যাখ্যা (تاویل)-এর আলোকে নিজেদের ধ্যান-ধারণা পোষণ করেছে তা শরীআতের নীতি মাফিক না হওয়াতে তারা কুফ্‌রীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

হযরত মাওলানা ইদ্রীছ কান্ধলভী লিখেছেন– কোন জরূরিয়াতে দ্বীনের যদি এমন ব্যাখ্যা দেয়া হয় যা তার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থের বিপরীত, তাহলে এটা সে বিষয়কে অস্বীকার করারই নামান্তর।[৩]

উপরোক্ত ঈমান-আকীদা সংক্রান্ত বিষয়াদির বাইরে আমলগত বিভিন্ন বিষয়েও তিনি মারাত্মক বিভ্রান্তিকর ও গোমরাহীমূলক ধ্যান-ধারণা পোষণ করেন। যেমন:–

১. দেওয়ানবাগী পুনর্জন্মবাদের প্রবক্তা। পূর্বে চন্দ্রপাড়া পীরের আকীদা বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি পুনর্জন্মবাদের প্রবক্তা ছিলেন। চন্দ্রপাড়ার পীর পুনর্জন্মবাদের প্রবক্তা। মাসিক আত্মার বাণী ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ২৬ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে– চন্দ্রপুরী ফরমাইলেন, পুনর্জন্ম সম্বন্ধে কুরআনেই আছে-

﴿كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.﴾

১. 'আল্লাহ্ কোন্ পথে? ৩য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৩০।

২. এটা একটি পরিভাষা, এর অর্থ হল তা এমন বিষয় যা সকলের কাছে সুবিদিত, আম খাস নির্বিশেষে সকলেই সে সম্বন্ধে অবগত।

৩. علم الكلام

অর্থাৎ, কীভাবে তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কুফ্‌রী কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন, অনন্তর তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে। (সূরা: ২-বাকারা: ২৮)

চন্দ্রপুরীর মতে এখানে ثم يحييكم-এর অর্থ পৃথিবীতে পুনরায় জন্মলাভ করা। উল্লেখ্য, দেওয়ানবাগী উক্ত পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি এবং চন্দ্রপাড়ার পীর তার পীর ও শশুর। সূতরাং বুঝা যায় দেওয়ানবাগীর আকীদাও অনুরূপ। 'আল্লাহ কোন পথে' গ্রন্থেও পুনর্জন্মবাদের স্বপক্ষে বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, জমহুরের মতে এখানে ثم يحييكم-এর অর্থ হাশরে পুনরায় জীবিত অবস্থায় উত্থিত হওয়া। আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করা কুফ্‌রী।[১]

২. তিনি নিজে হজ্জ করেননি। এ বিষয়ে তার আল্লাহ্ কোন্ পথে? গ্রন্থে লেখা হয়েছে, তার জনৈক ভক্ত আহমদ উল্লাহ দেওয়ানবাগী সাহেব কেন হজ্জ করেননি- এটা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে যান। স্বপ্নে দেখেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নির্মিত মক্কার কা'বা ঘর এবং স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাবে রহমতে হাজির হয়েছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "তুমি যে ধারণা করতেছ যে, শাহ দেওয়ানবাগী হজ্জ করেননি, আসলে এটা ভুল। আমি স্বয়ং আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর সাথে আছি এবং সর্বক্ষণ থাকি। আর ক্বা'বা ঘরও তাঁর সম্মুখে উপস্থিত আছে। আমার মুহাম্মাদী ইসলাম শাহ দেওয়ানবাগী প্রচার করতেছেন। তাঁর হজ্জ করার কোন প্রয়োজন নেই"।[২]

এখানে মক্কাস্থিত বাইতুল্লাহ শরীফ গিয়ে হজ্জ পালন করার ফরযিয়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে। আর হজ্জ হল ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের একটি। এটাকে অস্বীকার করা সন্দেহাতীতভাবে কুফ্‌রী।

এসব কুফ্‌রী আকীদা-বিশ্বাস ছাড়াও তিনি কুরআন-হাদীছের বহু বক্তব্যকে চরমভাবে বিকৃত করেছেন। যেমন: কুরআনে বর্ণিত হযরত আদম ও হাওয়া কর্তৃক নিষিদ্ধ ফল খাওয়া সম্বন্ধে তার বক্তব্য হল, এই ফল দ্বারা যদি গন্দম ফল ধরা হয়, তাহলে অর্থ হবে গমের আকৃতির ন্যায় নারীদের গোপন অংগ এবং আঙ্গির ফল ধরা হলে তার অর্থ হবে সদ্য যৌবনপ্রাপ্তা নারীর বক্ষযুগল। অতএব আদম হাওয়ার নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ অর্থ তাদের যৌন মিলন।[৩]

জমহুরে উম্মতের নিকট গৃহীত পরিস্কার ব্যাখ্যার বিপরীত এরূপ ব্যাখ্যা প্রদানকারীকে বলা হয় যিন্দীক ও মুলহিদ। এ সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা গিয়েছে।

১. كشاف اصطلاحات الفنون

২. আল্লাহ কোন্ পথে? দ্বিতীয় সংস্করণ, মে/১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৩। উল্লেখ্য– এ বইয়ের তৃতীয় সংস্করণে নিরবে এ বিষয়টির উল্লেখ পরিত্যাগ করা হয়েছে।

৩. 'আল্লাহ্ কোন্ পথে? ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, পৃ. ৯৮।

উপরোল্লেখিত বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন আকাইদগত বিষয় ও বিভিন্ন মাসায়েলের ক্ষেত্রে তিনি জমহুরের মতামতের বিপরীত এবং অদ্ভুত ধরনের কিছু বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন:

১. আল্লাহ ও রসূলকে স্বচক্ষে না দেখে কালিমা পড়ে সাক্ষ্য দেয়ার ও বিশ্বাস করার কোনো অর্থ হয় না।

২. কুরআন, কিতাব, হাদীছ, তাফসীর পড়ে আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায় না। একমাত্র মুরশিদের সাহায্য নিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা করেই আল্লাহ্‌কে পাওয়া সম্ভব, এমনকি দুনিয়াতেই স্বচক্ষে দেখা যায়।

৩. আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগ সবই ক্বালবেই (অন্তরে) হয়ে থাকে। অন্যভাবে হাজার ইবাদত করেও আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায় না।

৪. সাধনার দ্বারা আল্লাহ্‌কে নিজের ভিতরেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব, বাইরে কোথাও নয়। কঠিন সাধনার মাধ্যমে আমিত্বকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারী সাধকের সাথে আল্লাহ্‌ এমনভাবে মিশে যান, যেমন চিনি দুধের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। তখন ঐ বান্দাকে আল্লাহ থেকে আলাদা করা মুশকিল।

৫. এরূপ ধ্যান করবেন, আদমের জীরেকদম (পায়ের নিচে) ক্বালব। এই কালবে আল্লাহ ও রাসূল থাকেন।

৬. কোরআনে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে এই ধারণা দিচ্ছেন যে, তিনি আমাদের ভিতরে এবং অতি নিকটে অবস্থান করেন কিন্তু আমরা এতই মূর্খ যে, তাঁর অবস্থান সাত আসমানের উপর বলে মনে করে থাকি।

৭. গত ১৯৯৮ সালে বিশ্ব আশেকে রাসূল সম্মেলনে আল্লাহ ও রসূল স্বয়ং দেওয়ানবাগে এসেছিলেন। আল্লাহ ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলেন উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত সমস্ত আশেকদের তালিকা তৈরী করতে। ঐ তালিকাভুক্ত সবাই বেহেশতে চলে যাবে।[১]

৮. সূর্যোদয় পর্যন্ত সেহরী খাওয়ার সময়। সুবহে সাদেক অর্থ প্রভাতকাল। হুজুরেরা ঘুমানোর জন্য তাড়াতাড়ি আযান দিয়ে দেয়। আপনি কিন্তু খাবার বন্ধ করবেন না। আযান দিয়েছে নামাযের জন্য। খাবার বন্ধের জন্য আযান দেয়া হয় না।[২]

৯. দেওয়ানবাগী ও তার অনুসারীগণ প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানের উপর অত্যন্ত জোর প্রদান করে থাকেন। তাদের শ্লোগান হল "ঘরে ঘরে মীলাদ দাও রাসূলের শাফাআত নাও"।

এ ধরনের যিন্দীক ও মুলহিদসুলভ এবং কুফ্‌রী আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও দেওয়ানবাগী সাহেবের দাবী হল–

(১) তিনি আসল ইসলামের প্রচারক। তিনি তার প্রচারিত উপরোক্ত ধ্যান-ধারণা সম্বলিত মতবাদের নাম দিয়েছেন মোহাম্মাদী ইসলাম।৩ তার বক্তব্য হল- তার

১. সূত্র: মাসিক আত্মার বাণী, সংখ্যা-নভেম্বর-৯৯, পৃ. ১০। ২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।
৩. তার প্রায় প্রত্যেকটা বইয়ের প্রচ্ছদে মোহাম্মাদী ইসলাম লেখা আছে এবং এই ইসলামের বিশেষ পতাকা দেখানো হয়েছে।

মতবাদের বাইরে সারা বিশ্বে যে ইসলাম চালু রয়েছে এটা আসল ইসলাম নয়, এজিদী ইসলাম, এজিদী চক্রান্তের ফসল।

(২) আল্লাহ্‌ই তাকে গোটা বিশ্বে খাঁটি মোহাম্মাদী ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে নূরে মোহাম্মাদীর ধারক ও বাহক রূপে পাঠিয়েছেন। তার সাপ্তাহিক পত্রিকায় লেখা হয়েছে– আল্লাহ্‌, রাসূল (সাঃ)সহ সমগ্র নবী রাসূল, ফেরেশতা এবং দেওয়ানবাগী ও তার মোর্শেদ চন্দ্রপাড়ার মৃত আবুল ফজলের উপস্থিতিতে সমস্ত ওলী আউলিয়াগণ এক বিশাল ময়দানে সমবেত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে দেওয়ানবাগীকে মোহাম্মদী ইসলাম-এর প্রচারক নির্বাচিত করেন। অতঃপর সবাইকে নিয়ে আল্লাহ এক বিশাল মিছিল বের করেন। আল্লাহ, রাসূল দেওয়ানবাগী ও তার পীর-এই ৪জনের হাতে মোহাম্মদী ইসলামের পতাকা। আল্লাহ্‌, দেওয়ানবাগী ও তার পীর-এই ৩জন সামনের সারিতে। সমস্ত নবী রাসূলসহ বাকীরা পেছনে। মিছিলে আল্লাহ্‌ নিজেই শ্লোগান দিচ্ছিলেন- মোহাম্মাদী ইসলামের আলো, ঘরে ঘরে জ্বালো।[১]

৪. তিনি বর্তমান জমানার মোজাদ্দেদ, মহান সংস্কারক, শ্রেষ্ঠতম ওলী-আল্লাহ।[২]

তার সম্পর্কে উপরোক্ত দাবী ও তার বুযুর্গী প্রমাণে তার ও তার ভক্তদের বিভিন্ন স্বপ্নের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: তিনি খাবে দেখেছেন যে, ঢাকা ও ফরিদপুরের মধ্যখানে একটি বাগানে নবীজির প্রাণহীন দেহ খালি গায়ে পড়ে আছে। অতঃপর দেওয়ানবাগীর হাতের স্পর্শে নবীজির মৃতদেহে প্রাণ ফিরে এসেছে, সুন্দর পোষাক এসেছে, চেহারায় নূর এসেছে, নবীজি তাকে বলেছেন- হে ধর্মের পুনর্জীবনদানকারী! সবশেষে নবীজি দেওয়ান- বাগীর সাথে হেঁটে হেঁটে চলে এসেছেন।[৩]

আরও স্বপ্ন বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নযোগে তাকে "ইসলাম ধর্মের পুনর্জীবনদানকারী" খেতাবে ভূষিত করেছেন।[৪]

এভাবে তার সূফী ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বইগুলোর বিভিন্ন স্থানে তার নিজের এবং তার ভক্তবৃন্দের বিভিন্ন স্বপ্ন বর্ণিত হয়েছে, যা দ্বারা তার বুযুর্গী প্রমাণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। অথচ স্বপ্ন কোন দলীল নয়। কাযী ইয়ায বলেন, "স্বপ্নের দ্বারা কোনো নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয় না। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা' রয়েছে।" আল্লামা নববী বলেন, "তদ্রূপ স্বপ্নের দ্বারা কোন হুকুমের পরিবর্তন ঘটানো যায় না। এ ব্যাপারে ইত্তেফাক বা সর্বসম্মত মত রয়েছে। যদিও হাদীছে বলা হয়েছে,

من رآني في المنام فقد رأى الحق. (رواه مسلم في كتاب الرؤيا)

অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে দেখল সে সত্য দেখল। (মুসলিম)

১. সাপ্তাহিক দেওয়ানবাগ পত্রিকা, সংখ্যা-১২/৩/৯৯ শুক্রবার।
২. আল্লাহ কোন পথে? গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা, ১৩৭ পৃষ্ঠা, 'রাসূল সত্যিই কি গরীব ছিলেন?' পৃষ্ঠা নং- ১২ (ভূমিকা)।
৩. 'রাসূল সত্যিই কি গরীব ছিলেন?' পৃষ্ঠা নং- ১২ (ভূমিকা), চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০১।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখা মিথ্যা হতে পারে না। কেননা শয়তান রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আকৃতি ধারণ করতে পারে না। তবে স্বপ্নে সে যা শুনেছে তা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে এবং তা সঠিকভাবে মনে রাখতে পেরেছে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই স্বপ্ন কোনো দলীল হতে পারে না। এ ব্যাপারে আল্লামা নববী তার দীর্ঘ ইবারতে যা বলেছেন, সংক্ষিপ্তভাবে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হল–

قال القاضي عياض : ..... لا يقطع بأمر المنام ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت ولا تثبت به سنة لم تثبت، وهذا بإجماع العلماء. هذا كلام القاضي. وكذا قاله غيره من أصحابنا وغير هم، فنقلوا الاتفاق على أنه لايغير به بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع.

এ সম্পর্কে এ খণ্ডের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ২০৫-২০৭।

কিছু লোক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) কর্তৃক স্বপ্নে আযানের শব্দগুলো শুনেছিলেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে অনুযায়ী আযান প্রবর্তন করেছিলেন- এ দ্বারা স্বপ্ন দলীল বলে প্রমাণ পেশ করে থাকেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা সেখানে স্বপ্নটি সঠিক বলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

إن هذه لرؤيا حق. (رواه الترمذي في كتاب الصلوة– باب ما جاء في بدأ الأذان)

অর্থাৎ, এটা অবশ্যই সত্য স্বপ্ন। (তিরমিযী)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ সত্যায়ন না করলে শুধু ঐ সাহাবীর স্বপ্নের ভিত্তিতে আযান প্রচলিত হত না। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর কারও স্বপ্ন সত্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়ার যেহেতু কেউ থাকেনি, তাই এখন কারও স্বপ্নকে দলীল হিসাবে দাঁড় করানো যাবে না। এখানে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে- হযরত ওমর (রা.) এর ২০ দিন পূর্বে আযানের এরূপ শব্দ স্বপ্নে দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি সে স্বপ্নের ভিত্তিতে সেভাবে আযান দেয়া শুরু করেননি।

স্বপ্ন দ্বারা কোন কিছুর দলীল দাঁড় করানো যায় না। বুযুর্গী স্বপ্ন দ্বারা প্রমাণিত হয় না; বুযুর্গী প্রমাণিত হয় সহীহ ঈমান-আকীদা ও সহীহ আমল দ্বারা। অতএব যতই স্বপ্ন বর্ণনা করা হোক দেওয়ানবাগীর ন্যায় যিন্দীক, মুলহিদ ও কুফ্‌রী আকীদা পোষণকারী ব্যক্তি (এসব আকীদা পরিত্যাগ করা ব্যতীত) কস্মিনকালেও বুযুর্গ হতে পারে না।

রাজারবাগী

(রাজারবাগী পীর দিল্লুর রহমান ও তার চিন্তাধারা)

রাজারবাগী পীরের নাম দিল্লুর রহমান। ৫ নং আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা-১২১৭ মুহম্মাদীয়া জামিয়া শরীফ ও সুন্নতী জামে মসজিদ তার

দরবার। তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানাধীন প্রভাকরদী গ্রামের তাঁতী ও সূতা ব্যবসায়ী[1] মরহুম জনাব মোখলেছুর রহমান মিঞার ৩য় পুত্র। তিনি নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়া করা কোন আলেম নন, একজন কলেজ শিক্ষিত ব্যক্তি। তবে তিনি দাবী করেন যে, তাকে ইল্‌মে লাদুন্নী দান করা হয়েছে এবং তিনি "বাহ্‌রুল উলূম" বা জ্ঞানের সমুদ্র। তার দাবী হল– তিনি সাধারণ পীর নন বরং গাউছুল আজম এবং আমীরুল মু'মিনীন ফিত্ তাসাওউফ অর্থাৎ, তাসাওউফ শাস্ত্রের সর্বোচ্চ নেতা। তার মুরীদগণের বর্ণনামতে বড়পীর আব্দুল কাদের জীলানীর চেয়েও তার মাকাম অনেক উর্ধ্বে।[2] তিনি কোন পীর থেকে খেলাফত লাভ করেননি। তবে তিনি বলেন স্বয়ং আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খেলাফত দান করেছেন।

তিনি নিজের বুযুর্গী প্রমাণ করার জন্য ৩ ধরনের পন্থা গ্রহণ করেছেন।

১. নিজের নামের আগে পিছে প্রায় ৫২টি উচ্চ অর্থ সম্পন্ন খেতাব সংযুক্ত করেছেন। আজ পর্যন্ত উম্মতের কেউ এমন খেতাবের বিশাল বহর নিজের নামের সাথে যোগ করেননি।[3] তিনি বলেন, এর অনেকগুলো খেতাব তাকে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ,

---

১. জনাব দিল্লুর রহমান সাহেবের পিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি 'তাঁতী ও সূতা ব্যবসায়ী'। আমি (লেখক মাওঃ মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন) দিল্লুর রহমান সাহেবের গ্রামের এক মসজিদের ইমাম সাহেব থেকে এ তথ্য জেনেছিলাম যে, দিল্লুর রহমান সাহেবের পিতা দিল্লুর রহমান সাহেবের এক ভাইয়ের পাওয়ার লুম-এর তত্ত্বাবধান করতেন। এর ভিত্তিতেই শুধু তার ব্যবসায়িক পরিচয় তুলে ধরার জন্যই তাকে তাঁতী ও সূতা ব্যবসায়ী বলে উল্লেখ করেছি। কিন্তু পরে জানতে পেরেছি এতে দিল্লুর রহমান সাহেব মনে কষ্ট পেয়েছেন এই ভেবে যে, এভাবে তাকে জোলার পুত্র বলে তাকে অপমান করা হয়েছে। অবশ্য এভাবে তাকে অপমানিত করা আমার মোটেও উদ্দেশ্য ছিল না। এখানে যা কিছু লিখেছি তা শুধু তার দ্বীনী চিন্তাধারার অবস্থান তুলে ধরার জন্যই লিখেছি। ব্যক্তিগত কোন বিষয় তুলে ধরে আক্রমণ করার জন্য নয়। তার পিতা যদি প্রকৃতই তাঁতী না হয়ে থাকেন তাহলে আমার এই 'তাঁতী' শব্দ ব্যবহারের জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। (টীকাটি পঞ্চম সংস্করণে সংযোজিত)

২. মাসিক আল-বাইয়্যিনাত, ৭৩ তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৪৬ -এ লেখা হয়েছে, উল্লেখ্য- রাজারবাগ শরীফের হযরত পীর সাহেব ক্বিবলা মুদ্দাজিল্লুহুল আলী-এর নামের পূর্বে যেসব লক্বব রয়েছে, উনি তারও উর্ধ্বে। এমনকি কথিত গাউছুল আযম লক্ববেরও উর্ধ্বে।

৩. মাসিক আল-বাইয়্যিনাত ও আঞ্জুমানে আল-বাইয়্যিনাত এর পক্ষ থেকে এর জবাবে একাধিক প্রচারপত্র ছাপা হয়েছে। যার মধ্যে বলা হয়েছে, "মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের লকব ছিল প্রায় ৬১টি। এমনিভাবে ইমাম আবূ হানীফার ৪৮টি, বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানীর ৫১টি, ইমাম বোখারীর ২৮টি ইত্যাদি। কিন্তু রাজারবাগী সাহেব সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবেই এ বিষয়টি চেপে গেছেন যে, এসব লকব তাদের নিজেদের দেয়া নয়। বিভিন্ন জন তাদের প্রশংসায় যে শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন, তা গণনা করলে হয়তবা এরকম সংখ্যা দেখানো যাবে, কিন্তু তারা নিজেরা কখনও আত্মপ্রচারের জন্য এসব খেতাব চয়ন করে করে নিজেদের নামের সাথে জুড়ে দেননি। তদুপরি তারা রাজারবাগী সাহেবের ন্যায় নামের আগে পিছে এরকম খেতাবের বহর জুড়ে দেয়াকে সুন্নাত মনে করেননি। বরং পূর্বসূরীদের অনেকে এটা অপছন্দ করতেন, তার বহু প্রমাণ রয়েছে। অতএব এসব জারিজুরি করে জনগণকে ধোঁকা দেয়া ঠিক হবে না।

কতকগুলো দিয়েছেন হযরত রাসূল (সাঃ) ও বাকীগুলি দিয়েছেন তরীকতের ইমাম বা পীর আউলিয়াগণ।[১] তার খেতাবের মধ্যে রয়েছে- মুফতিয়ুল আজম, বাহ্রুল উলূম ওয়াল হিকাম, হাফিজুল হাদীছ, হাকিমুল হাদীছ, হুজ্জাতুল ইসলাম ফিল আলামীন, তাজুল মুফাস্সিরীন, রঈসুল মুহাদ্দিছীন, আমীরুল মু'মিনীন ফী উলূমিল ফিক্হে ওয়াত তাসাওউফ, মাখ্যানুল মা'রেফাত, ইমামুস সিদ্দীকীন, গাউছুল আজম, কুতবুল আলম, সাইয়্যিদুল আউলিয়া, আফজালুল আউলিয়া, সুলতানুল আরিফীন, শাইখুশ শুয়ূখ ওয়াল মাশায়েখ, মুজাদ্দিদ ফিদ্দীন, সাইয়্যিদুল মুজ্তাহিদীন, কাইউমুয্ যামান, হাবীবুল্লাহ প্রভৃতি।[২]

খণ্ডন

(এক) তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক, রসূল (সা.) কর্তৃক ও আউলিয়াগণ কর্তৃক এসব খেতাব লাভ করেছেন বলে দাবী করেন, অথচ স্বপ্ন শরীআতে হুজ্জাত বা দলীল নয়। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বপ্ন দলীল হওয়ার ব্যাপারে কিছু লোক যে প্রমাণ পেশ করে থাকে পূর্বের পরিচ্ছেদে তার খণ্ডনও পেশ করা হয়েছে।

(দুই) তদুপরি তার ব্যবহৃত এসব খেতাবের মধ্যে আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা বহির্ভূত অনেক দাবীও এসে গেছে। যেমন: "ইমামুস সিদ্দীকীন" বা সিদ্দীকগণের ইমাম। এই সিদ্দীকীনদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)ও, যার মর্যাদা উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উর্ধ্বে। এ ব্যাপারে আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্যে কারও কোন বিরোধ নেই। অথচ তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে দাবী করলেন, তিনি "ইমামুস সিদ্দীকীন" বা সিদ্দীকগণের ইমাম। আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে সাহাবী নন এমন কোন ব্যক্তি কখনও সাহাবীর মর্যাদায় উপনীত হতে পারেন না।[৩] কিন্তু দিল্লু সাহেব এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। যেমন: তার আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকায় লেখা হয়েছে– হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) বলেছেন, "আমি উরূয করতে করতে সিদ্দীকে আকবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মাকাম অতিক্রম করলাম।" (নাউযুবিল্লাহ!) এরপর পত্রিকাটিতে মন্তব্য করা হয়েছে যে, দৃশ্যতঃ এখানেও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর চেয়ে তার মর্যাদা বেশী প্রকাশ পায়।[৪]

মন্তব্য: হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) এমন কথা বলেছিলেন কি না তা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়। বস্তুত এসব বুযুর্গদের সম্পর্কে অতি ভক্তদের দ্বারা এমন

১. তথ্যসূত্র: দিল্লুর রহমান সাহেবের বয়ানের ক্যাসেট। এ ক্যাসেট আমার (লেখকের) কাছে (২০০৪ সাল) সংরক্ষিত আছে।

২. তথ্যসূত্র: তাদের প্রচারিত বিভিন্ন মাহ্ফীলের হ্যান্ডবিল ও আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

৩. "সাহাবীদের সম্বন্ধে আকীদা" শিরোনামে প্রথম খণ্ডে এ সম্পর্কে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৪.আল-বাইয়্যিনাত, ৭৩ তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ ইং, ৪৫ পৃ.।

অনেক কিছু রটানো হয়েছে যাকে সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না, তবে এ ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করার দ্বারা রাজারবাগী সাহেবের আকীদা যে এরূপ তা অবশ্যই প্রমাণিত হয়েছে।

(তিন) তার খেতাবের মধ্যে জঘন্য বেয়াদবীসূচক খেতাবও রয়েছে। যেমন: তিনি "হাবীবুল্লাহ" খেতাব ব্যবহার করেছেন। অথচ হাবীবুল্লাহ বলতে একমাত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই সকলে বুঝে থাকেন। এখন নিজের জন্য এই খেতাব ব্যবহারকে হয় জঘন্য বেয়াদবী বলতে হবে নতুবা বলতে হবে তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমান মাকাম বা মর্যাদার দাবী করছেন, যা হবে কুফ্রীর পর্যায়ভুক্ত। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা।

(চার) তার খেতাবসমূহের মধ্যে কুফ্রীজ্ঞাপক খেতাবও রয়েছে। যেমন: "কাইউমুয্ যামান" খেতাবটি। কাইউম শব্দটি আল্লাহ তাআলার একটি ছিফাতী নাম, যার অর্থ জগতের ধারক ও রক্ষক। অতএব কাইউমুয্ যামান অর্থ হবে যামানার ধারক ও রক্ষক। এ কথাটি একমাত্র আল্লাহ তাআলার ব্যাপারেই প্রযোজ্য, অন্য কারও ব্যাপারে নয়। কোন মাখ্লূক কাইউম হতে পারে না বরং আব্দুল কাইউম বা কাইউমের গোলাম হতে পারে। কোন মানুষের হাতে (নাউযুবিল্লাহ) জগত পরিচালনার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকতে পারে না। সুতরাং কোন মানুষের ব্যাপারে এ উপাধি ব্যবহার নিঃসন্দেহে কুফ্রীজ্ঞাপক।[১]

এ ছাড়া তার উপাধিসমূহ যে অতিরঞ্জনে ভরা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

১. আঞ্জুমানে আল-বাইয়্যিনাত এর পক্ষ থেকে এর জবাবে প্রচারিত একটা পত্রে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী, তার ছেলে হযরত ইমাম মাছুম, তার ছেলে হুজ্জাতুল্লাহ নক্শবন্দ, তার ছেলে আবুল উলা প্রমুখকে "কাইউম" লকব দিয়েছিলেন। এখানে "কাইউমুয যামান" কথাটার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অর্থ করতে হবে। ইত্যাদি। এখানেও রাজারবাগী সাহেব প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা এই খেতাব ব্যবহার করে থাকলেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রূপক অর্থেই ব্যবহার করে থাকবেন। কিন্তু রাজারবাগী সাহেব ও তার অনুসারীগণ তো প্রকৃত অর্থেই ব্যবহার করছেন। তার প্রমাণ হল তার পকিকায় গাওসুল আযম বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে, গাওসুল আযম, সাইয়্যিদুল আওলিয়া, মুহিউদ্দীন, বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) বলেছেন, "কোন চাঁদ উদিত হয় না, কোন সূর্য অস্ত যায় না আমার অনুমতি ব্যতীত।" (নাউযুবিল্লাহ!) অতঃপর একটু সামনে গিয়ে রাজারবাগী সাহেবও এরূপ ক্ষমতা রাখেন সেদিকে ইংগিত করে পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছে- "উল্লেখ্য, এ ধরনের আখাসসুল খাছ মর্যাদা-মর্তবার ওলী আল্লাহ্র ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সমাসীন ইমামুল আইম্মা, কুতবুল আলম, মুজাদ্দিদে যামান, আওলাদে রাসূল, ঢাকা রাজারবাগ শরীফের হযরত পীর সাহেব ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী।" (আল-বাইয়্যিনাত, ৭১ সংখ্যা, জুলাই, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১৩৯) এভাবে বোঝানো হয়েছে যে, রাজারবাগী সাহেব সত্যিকার অর্থেই কাইউমুয যামান। তার হাতেও (নাউযুবিল্লাহ) জগত পরিচালনার ক্ষমতা ন্যস্ত। তাহলে একবার তিনি জনসমক্ষে সূর্যের উদয় অস্তের একটু ব্যতিক্রম ঘটিয়ে দেখিয়ে তার ক্ষমতা প্রদর্শন করলেই তার বুযুর্গী প্রমাণ করা নিয়ে আর এত কসরৎ করতে হত না।

২. দিল্লুর রহমান সাহেব নিজের বুযুর্গী প্রমাণ করার জন্য দ্বিতীয় যে পন্থা গ্রহণ করেছেন তা হল- তিনি তার নিজের মর্যাদার ব্যাপারে এবং তার মাসিক পত্রিকা "আল-বাইয়্যিনাত"-এর মর্যাদা ও গুরুত্বের ব্যাপারে নিজের ও বিভিন্ন জনের স্বপ্ন বর্ণনা করে থাকেন। যেমন: নিজের ব্যাপারে তিনি বলেন,

(১) তিনি স্বপ্নে দেখলেন- একটি কাঁচের ঘর, যাতে কোনো দরজা জানালা কিছুই ছিল না। সেই ঘরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ৪ জন ওলীকে বসানোর জন্য ৪ কোণে ৪ খানা আসন রাখা হল। সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ আউলিয়া ঐ ঘরের চারপাশে ঘুরাঘুরি করছিলেন। সবাই বলাবলি করছিলেন, এই ৪টি আসনে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারজন ওলীকে বসানো হবে। সকলে ভাবছেন কাকে বসানো হয়। এ অবস্থায় হযরত বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (রহ.), খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) ও হযরত মুজাদ্দেদে আল্ফে সানী (রহ.) একে একে ৩টি আসনে বসে পড়লেন। এবার লক্ষ লক্ষ আউলিয়ার মধ্যে বলাবলি হচ্ছিল যে, চতুর্থ আসনটিতে চার তরীকার চারজন ইমামের অবশিষ্ট মহামানব হযরত শায়েখ বাহাউদ্দীন নক্শবন্দী (রহ.) এসে বসবেন। কিন্তু দেখা গেল একজন ফেরেশতা এসে আমাকে (দিল্লু সাহেবকে) টেনে নিয়ে ঐ আসনে বসিয়ে দিলেন। এ চারজন ছাড়া আর কাউকেই ভিতরে ঢুকতে দেয়া হয়নি।[১]

(২) তিনি বলেন, তার এক মুরীদ ভাই তাকে বলেছেন, তিনি রসূল (সা,)কে স্বপ্নে দেখেছেন। তিনি নবীজি (সা,)কে চার তালিওয়ালা টুপি[২] পরিহিত দেখে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, হুজুর! টুপি নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলছে, কোন্টা আপনার খাস সুন্নাত? উত্তরে নবী (সা.) বলেছেন, টুপি, সুন্নাত, মাসলা-মাসায়েল যা কিছু জানতে হয় রাজারবাগের দিল্লুর কাছ থেকে জেনে নিও।[৩]

খণ্ডন

এখানেও তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে টুপি সম্পর্কে তার ধারণা ও তার বুযুর্গির স্বপক্ষে দলীল দেয়ার চেষ্টা করেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে স্বপ্ন কোন দলীল নয়। একমাত্র আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর স্বপ্নই দলীল, অন্য কারও স্বপ্ন দলীল নয়। তবে কোন স্বপ্ন কুরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের অনুকূলে হলে সেটাকে সহযোগিতা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এ ব্যাপারে পূর্বে "দেওয়ানবাগী" শিরোনামের অধীনে কিছু এবং এ খণ্ডের শুরুতে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(৩) শুনেছি স্বপ্নে স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাকি তাকে বলেছেন, তিনি আওলাদে রসূল। এরপর থেকে তিনি নিজেকে আওলাদে রাসূল পরিচয় দিয়ে থাকেন।

১. তথ্যসূত্র: প্রাগুক্ত ক্যাসেট।
২. দিল্লুর রহমান সাহেবের মতে চারতালিওয়ালা টুপি নবীজির খাস সুন্নাত।
৩. প্রাগুক্ত ক্যাসেট।

খণ্ডন

যদি সত্যিকারই তার কাছে আওলাদে রসূল হওয়ার সনদ থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। নতুবা শুধু স্বপ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নিজেকে আওলাদে রসূল বলে পরিচয় দেয়া যায় না। কেননা স্বপ্ন দলীল নয়। কেউ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলে সেটা সত্য, কেননা শয়তান রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রূপ ধরতে পারে না। কিন্তু স্বপ্নে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা বলতে শুনেছে, সেটা সঠিক মনে রাখতে পেরেছে, তার নিশ্চয়তা নেই। হতে পারে তার মনের মধ্যে শয়তান কোন কথার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দিয়েছে। এ কারণেই উলামায়ে কেরাম বলেছেন, শরীআতে প্রমাণ নেই-এমন কোন ব্যাপারে যদি কারও মনে হয় যে, স্বপ্নে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাই বলেছিলেন, তাহলে সেই সপ্ন অনুযায়ী সে তা করতে পারবে না। স্বপ্ন যে দলীল নয়, এ সম্পর্কে এ খণ্ডের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তার মাসিক পত্রিকা "আল-বাইয়্যিনাত"-এর মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রমাণ করার ব্যাপারেও তিনি বিভিন্ন স্বপ্ন বর্ণনা করে থাকেন। যেমন: তিনি বলেছেন,

(১) তিনি স্বপ্নে দেখেছেন ফুরফুরার হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীক (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা রুহুল আমীন (রহ.) এক মাহফিলে ওয়াজ করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখ আমি আগে মাসিক বাইয়্যিনাত পড়তাম না। আমাকে সর্বপ্রথম এটা পড়তে বললেন হাদীছের বিখ্যাত ইমাম আল্লামা দাইলামী (রহ.)। তারপর বললেন খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্তী (রহ.)। অতঃপর আমি এক বন্ধুসহ গেলাম মদীনায় প্রিয় নবীজি (সা.)-এর যিয়ারতে, নবীজিও আমাকে বললেন বাইয়্যিনাত পড়তে। এরপর থেকে আমি বাইয়্যিনাত পড়ে থাকি। তিনি আরও বললেন দেখ যারা বাইয়্যিনাত-এর বিরোধিতা করবে, তারা হালাক, ধ্বংস হয়ে যাবে, তারা ঈমান হারা হয়ে মারা যাবে।

মাসিক আল-বাইয়্যিনাত সম্পর্কে তিনি এত বাড়াবাড়ি করেছেন যে, আল-বাইয়্যিনাত, জুলাই ১৯৯৯ সংখ্যার ১৪৩ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে– আল্লামা রূমী (রহ.)-এর মছনবী শরীফকে যেমন ফার্সী ভাষায় 'কোরআন শরীফ' বলা হয়, তদ্রূপ আল-বাইয়্যিনাতও যেন "বাংলা ভাষার কোরআন শরীফ"।

খণ্ডন

(১) মৃত্যুর পর আম্বিয়ায়ে কেরাম কবরে নামায পড়েন বলে হাদীছে প্রমাণ রয়েছে। এ ছাড়া কবরে কোন ব্যক্তি পত্র-পত্রিকা তো দূরের কথা কুরআন কিতাব পাঠ করে এমন কোন প্রমাণও কুরআন হাদীছের কোথাও নেই।

(২) একদিকে তিনি আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকাকে কুরআন বলে আখ্যায়িত করছেন, আবার আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকার বিরোধিতা করলে ঈমান হারা হয়ে যাওয়ার ধারণা প্রদান করছেন। এর অর্থ হল তিনি এই পত্রিকাকে প্রকৃত অর্থেই কুরআনের

সমতুল্য আখ্যায়িত করতে চান। তাই এর বিরোধিতাকে ঈমান হারা হওয়ার কারণ বলে আখ্যায়িত করছেন। কেননা কুরআনকে অস্বীকার করলে ঈমান হারা হবে বৈ কি? মনে রাখা ভাল কুরআন নয় এমন কিছুকে যদি প্রকৃত অর্থেই কুরআনের সমতুল্য আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা হবে কুফ্‌রী কথা। তিনি যদি এই পত্রিকাকে প্রকৃত অর্থেই কুরআনের সমতুল্য আখ্যায়িত করতে না চান, তাহলে কারও লেখা একটা পত্রিকার বিরোধিতা করলে ঈমান হারা হওয়ার প্রশ্নই অবান্তর। মছনবী-এর উদাহরণ টানা হল একটা প্রতারণা মাত্র। নতুবা কেউ কখনও মছনবী শরীফকে প্রকৃত পক্ষেই কুরআন আখ্যায়িত করেননি এবং মছনবী শরীফের বিরোধিতা করলে ঈমান হারা হতে হবে এমন কথাও কেউ বলেননি।

(৩) রূপক অর্থেও আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকাকে কুরআন আখ্যায়িত করা কুরআনের সঙ্গে জঘন্য ধরনের উপহাস। কেননা এই আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকার বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে আলোচনায় না যেয়েও শুধু তার মধ্যে দিল্লু সাহেব ও তার চিন্তাধারার প্রতিপক্ষকে যেসব অকথ্য গালিগালাজ লেখা হয়, তার সাথে কুরআনের ভাষা ও বর্ণনাকে তুলনা করলে নিঃসন্দেহে কুরআনের সাথে উপহাস করা হবে। এমন একটা পত্রিকাকে কুরআন আখ্যায়িত করা কুরআনের অবমাননার শামিল।

আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকায় উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে এমন সব গালিগালাজ লেখা হয় যা কোন ভদ্রতা ও শালীনতার আওতায় পড়ে না। উক্ত পত্রিকায় শাইখুল হাদীস আজিজুল হক সাহেব, মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেব, চরমোনাইয়ের পীর সাহেব, হাটহাজারী মাদ্রাসার মোহ্‌তামেম সাহেব প্রমুখ দেশ-বরেণ্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় নায়েবে রসূলগণকে যেসব কুৎসিত গালি দেয়া হয়েছে, তার কয়েকটা নিম্নরূপ: উম্মতে মোহাম্মাদী হতে খারিজ, মাওসেতুং ও গান্ধীর ভাবশিষ্য, শয়তানের পোষ্যপুত্র, মুশরিক, মুনাফেক, ধোঁকাবাজ, ভণ্ড, জাহেল, গোমরাহ, কাজ্জাব, কমীনা, জেনাখোর, নফ্‌সের পূজারী, মালউন, ইত্যাদি।[১]

খণ্ডন

(১) গালিগালাজ করা ফাসেকী ও হারাম। হাদীছে বলা হয়েছে,

سباب المسلم فسوق. (متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الإيمان –باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لايشعر، ورواه مسلم في كتاب الإيمان– باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)

অর্থাৎ, মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী। (বোখারী ও মুসলিম)

(২) কাউকে মুনাফিক আখ্যায়িত করা সম্ভব নয়। কেননা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম-এর ইন্তেকালের পর ওহীর দরজা বন্দ হয়ে যাওয়ার পর কার্ অন্তরে

১. তথ্যসূত্র: মাসিক আল বাইয়্যিনাত, সংখ্যা- ৬৪, ডিসেম্বর ১৯৯৮; পৃষ্ঠা ৪০-৪২ ও ৪৪, সংখ্যা- ৭০ জুন ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৪৫ এবং রাজারবাগীর বয়ানের উক্ত ক্যাসেট।

মুনাফিকী আছে তা জানার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। আর আমলী মুনাফিকীর ভিত্তিতে কাউকে মুনাফিক আখ্যায়িত করা জায়েয নয়।

(৩) কুরআনে কারীম আমাদেরকে বিরোধী প্রতিপক্ষের সমালোচনার ক্ষেত্রেও শালীনতার শিক্ষা দিয়েছে। অশালীন ভাষায় প্রতিপক্ষের সমালোচনা করা কুরআনের আদর্শ বিরোধী। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَ لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদেরকে তারা আহবান করে, তোমরা তাদেরকে গালি দিও না। তাহলে তারাও অজ্ঞানতাবশতঃ সীমালংঘন করে আল্লাহ্‌কে গালি দিবে। (সূরা আনআম: ১০৮)

৩. দিল্লুর রহমান সাহেব নিজের বুযুর্গী প্রমাণ করার জন্য তৃতীয় যে পন্থা গ্রহণ করেছেন তা হল– তিনি বিভিন্ন বুযুর্গ সম্পর্কে অতি উচ্চ মাত্রায় বাড়াবাড়ি করে কিছু প্রশংসা করেছেন তারপর বলেছেন, জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। অর্থাৎ, এভাবে বলে তিনি নিজের দিকে ইশারা করেছেন যে, আমার মধ্যেও এসব বুযুর্গী রয়েছে। যেমন: তিনি বলেছেন,

(১) "কেউ যদি মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর লিখিত মাকতুবাত শরীফ পড়ে, (পড়াকালীন সময়ে) যদিও সে নবী নয়, তবুও নবীদের দফতরে তার নাম থাকে।" অতঃপর (দিল্লু সাহেব ও তার পত্রিকা বাইয়্যিনাত-এর অনুরূপ মর্যাদার প্রতি ইংগিত দিয়ে) বলা হয়েছে, আকলমন্দের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।[১]

(২) রাজারবাগী সাহেব নিজেকে "গাওছুল আযম" দাবী করেছেন। আর তার পত্রিকায় গাওছুল আযম বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে, গাওছুল আযম, সাইয়্যিদুল আওলিয়া, মুহিউদ্দীন, বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহ.) বলেছেন, "কোন চাঁদ উদিত হয় না, কোন সূর্য অস্ত যায় না আমার অনুমতি ব্যতীত।" (নাউযুবিল্লাহ!) অতঃপর একটু সামনে গিয়ে রাজারবাগী সাহেবও এরূপ ক্ষমতা রাখেন সেদিকে ইংগিত করে পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছে, "উল্লেখ্য, এ ধরনের আখাসসুল খাছ মর্যাদা-মর্তবার ওলী আল্লাহ্‌র ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সমাসীন ইমামুল আইম্মা, কুতবুল আলম, মুজাদ্দিদে যামান, আওলাদে রাসূল, ঢাকা রাজারবাগ শরীফের হযরত পীর সাহেব ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী।"[২]

খণ্ডন

চাঁদ, সূর্য অস্ত যাওয়া, উদিত হওয়ার মত প্রাকৃতিক পরিচালনা (تصرفات عالم) কোন মানুষের অনুমতি বা ইচ্ছায় সংঘটিত হয় বলে কেউ বিশ্বাস করলে সে নিশ্চিত কাফের হয়ে যায়। আলোচ্য সূর্যের ব্যাপারে তো স্পষ্টত হাদীছে এসেছে যে, সূর্য

১. বাইয়্যিনাত, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন-১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৬।
২. আল-বাইয়্যিনাত, ৭১ সংখ্যা, জুলাই, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১৩৯।

আল্লাহ্র আরশের নিচে সাজদায় পড়ে আল্লাহ্র কাছ থেকে অনুমতি প্রার্থনা করে অনুমতি লাভ হলে সে উদিত হয়। বোখারী শরীফে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি নিম্নরূপ:

عن أبي ذر رضـ : قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس : أتدري أين تذهب؟ قلت : الله ورسوله أعلم. قال : فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها : ارجعي من حيث جئتِ، فتطلع من مغربها. فذالك قوله تعالى : ﴿والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم﴾ (رواه البخارى في كتاب بدأ الخلق– باب صفه الشمس والقمر بحسبان)

হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহ.) উপরোক্ত কথা বলেছিলেন কি না তা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়। আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি যে, বস্তুত বুযুর্গদের সম্পর্কে অতি ভক্তদের দ্বারা এমন অনেক কিছু রটানো হয়েছে যাকে সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না,[১] তবে এ ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করা দ্বারা রাজারবাগীরা যে এরূপ আকীদা-বিশ্বাস রাখেন তা নিশ্চিতই প্রমাণিত হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে কুফ্রী আকীদা। কিছু গালী শীআদের ধারণা ছিল আল্লাহ তাআলা জগত পরিচালনার দায়িত্ব হযরত আলী (রা.)-এর উপর ন্যাস্ত করেছেন। এভাবে তারা হযরত আলী (রা.)কে দ্বিতীয় খালেক (সৃষ্টিকর্তা) বানিয়ে রেখেছিল।[২] এ ধরনের গালী শীআদেরকে উম্মত কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে।

উল্লেখ্য, রাজারবাগীর পীর সাহেব জমহুরে উম্মতের খেলাফ অনেক মাসায়েলও উদ্ভাবন করেছেন। যেমন:

১. চার কল্লী টুপি পরিধান করা নবীজির খাস সুন্নাত।

২. মুসলমানদের উপর চরম ধরনের বিপদাপদ আসলে ফজরের নামাযে কুনূতে নাযিলা পাঠ করা জায়েয নয়, এরূপ কুনূতে নাযিলা পাঠ করা হলে নামায ফাসেদ হয়ে যায়।

৩. নামের শুরুতে বহু খেতাব ব্যবহার করা সুন্নাত।

---

১. যেমন: হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহ.) সম্পর্কে তার একটি জীবনী গ্রন্থে এমন ঘটনাও বর্ণিত আছে যে, একবার এক বৃদ্ধার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু ঘটায় বৃদ্ধা কাঁদছিলেন। অবশেষে বৃদ্ধার অনুরোধে আব্দুল কাদের জীলানী (রহ.) আযরাঈলকে সন্ধান করে বের করেন এবং বৃদ্ধার পুত্রের রূহকে ছেড়ে দিতে বলেন। আযরাঈল সেটা অস্বীকার করায় আব্দুল কাদের জীলানী আযরাঈলের হাত থেকে থলেটি ছিনিয়ে নিয়ে উপুড় করে দেন। ঐ থলের মধ্যে ঐ দিনের কব্য করা সব রূহ ছিল। ফলে ঐ দিনে যারা মৃত্যুবরণ করেছিল তারা সকলে জিন্দা হয়ে যায়। নাউযুবিল্লাহ! এ ঘটনা বিশ্বাস করলে কারও ঈমান থাকবে না। এরূপ ঈমান বিরোধী অনেক ঘটনাই বুযুর্গদের দিকে সম্পৃক্ত কোন কোন কিতাবে পাওয়া যায়। এগুলো অতি ভক্তদের মিথ্যা উদ্ভাবন। কুরআন হাদীছ ও শরীয়তের মূলনীতি বিরুদ্ধ এরূপ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার অবকাশ নেই।

২. الفرق بين الفرق. عند القاهر البغدادي

৪. ১২ রবিউল আউয়াল মুসলমানদের জন্য বড় ঈদ। ইত্যাদি।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, রাজারবাগীরা এসব বিষয়ে যে দলীলাদি প্রদান করে থাকে, শুধু এসব বিষয়েই নয় তাদের পেশকৃত বহু বিষয়ের দলীলে বহু ধরনের জালিয়াতী ও ফাঁক-ফোকড় বিদ্যমান থাকে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে যা আঁচ করা দুঃসাধ্য পর্যায়ের। এতসব আলোচনা করে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করারও প্রয়োজন মনে করছি না। উদাহরণ স্বরূপ মীলাদ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তাদের পেশকৃত দলীলের ব্যাপারে সামান্য কিছু কথা পেশ করছি, তাতেই পাঠকবৃন্দ তাদের পেশকৃত দলীল-প্রমাণ ও বক্তব্যের জালিয়াতী ও মিথ্যাচারিতা সম্বন্ধে ধারণা নিতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ।

মীলাদ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে রাজারবাগীদের দলীলের জালিয়াতি

প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানের ফযীলত সম্বন্ধে দিল্লুর রহমান সাহেবের "আল-বাইয়্যিনাত" পত্রিকার জুন–২০০০ ইং সংখ্যায় হাদীছ নামে কতগুলো জাল কথা পেশ করা হয়েছে। এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ইবনে হাজার মক্কী রচিত "আননি'মাতুল কুবরা আলাল আলাম" নামক যে কিতাবের বরাত দেয়া হয়েছে তাতেও রয়েছে জালিয়াতি। জালালুদ্দীন সুয়ূতীর নামে যে কিতাবের বরাত দেয়া হয়েছে তাতেও রয়েছে জালিয়াতি। মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-র হাদীছ বিভাগের পরিচালক মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব মিসর দারুল কুতুবিল মিছরিয়্যা থেকে এ কিতাবের পাণ্ডুলিপির ফটোকপি সংগ্রহ করে বিষয়টি উদঘাটন করেন। তিনি মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-র মুখপত্র "মাসিক আল কাউসার"–এর মার্চ-২০০৭ সংখ্যায় "মওলুদখানী: হক্ব আদায়ের না-হক পন্থা" শিরোনামের একটি প্রবন্ধে বিষয়টি সম্বন্ধে সম্যক আলোকপাত করেন। পাঠকদের অবগতির জন্য নিম্নে উক্ত প্রবন্ধ থেকে কিয়দাংশ তুলে ধরা হল।

"দিল্লুর রহমানের মাসিক 'আল-বাইয়্যিনাত' –যার উদ্দেশ্যই হল হককে বাতিল এবং বাতিলকে হক্ব সাজানো– তার জুন-২০০০ ইং সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রলাপগুলো 'লা হাওলা' সহযোগে পড়ুন।

১. আবু বকর সিদ্দীক রা. বলেন, যে ব্যক্তি মওলুদখানীর জন্য একটি দিরহাম খরচ করবে সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।

২. উসমান রা. বলেন, যে ব্যক্তি মওলুদখানীর জন্য একটি দিরহাম খরচ করবে সে যেন বদর ও হুনাইন যুদ্ধে অংশ নিল।

৩. হাসান বসরী রহ. বলেন, হায়! আমার যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকত, তাহলে আমি তা মওলুদখানীর জন্য খরচ করতাম!

৪. ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি মওলুদখানীর জন্য তার বন্ধুবর্গকে একত্র করে, খাবারের আয়োজন করে, একটি স্থান শূন্য রাখে, ইহসানের সঙ্গে আমল করে এবং

এই মওলুদখানীর ব্যবস্থা করে, তাকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সিদ্দীকীন, শুহাদা ও ছালেহীনদের সঙ্গে হাশর করাবেন এবং তাকে জান্নাতুন নায়ীমে অবস্থান করাবেন।

৫. জালালুদ্দীন সুয়ূতী তার রচিত 'আলওয়াসাইল ফী শরহিশ শামাইল' গ্রন্থে লিখেন যে, যে গৃহ, মসজিদ বা মহল্লায় মওলুদখানী হয় সেই গৃহ, মসজিদ ও মহল্লাকে ফেরেশতাগণ ফিরে ফেলে এবং তাদের জন্য দুআ করে, আর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মাফ করে দেন। আর যারা নূর দ্বারা পরিবেষ্টিত অর্থাৎ, জিব্রাইল মীকাইল, ইসরাফীল ও আজরাইল, তাঁরা ওইসব মওলুদখানীর ব্যবস্থাকারীদের জন্য দুআ করতে থাকেন। (এ পর্যন্ত আল-বাইয়্যিনাতের বক্তব্য শেষ হল।)

এগুলো একেবারেই ভিত্তিহীন বর্ণনা। যাদের নামে এগুলো চালানো হয়েছে, তাদের সঙ্গে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই।

এগুলোর ভিত্তিহীনতা তো একেবারেই স্পষ্ট। কারণ, যদি এগুলোর কোনো ভিত্তি থাকত, তাহলে তো মীলাদকে পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত বিদআত বলে স্বীকার করার প্রয়োজন হত না। বরং সহজেই মীলাদকে সাহাবাদের আমল বলে প্রমাণ করা যেত। আসলে মওলুদখানীর প্রচলনের আরও অনেক পরে কোন বে-ইলম ব্যক্তি এগুলোকে ঘরে বসে তৈরি করেছে।

রাজারবাগীরা এই জাল বর্ণনাগুলোর সমর্থনে আননি'মাতুল কুবরা আলাল আলম- এর উদ্ধৃতি দিয়েছে। অথচ তাতে এগুলোর চিহ্নমাত্র নেই। এই কিতাবটির মাখতুতাহ (পাণ্ডুলিপি) দারুল কুতুবিল মিছরিয়্যি কায়রোতে (ইতিহাস ২৫০৮/১৯২১) সংরক্ষিত রয়েছে এবং আমাদের কাছে তার ফটোকপি রয়েছে। আমরা তা আদ্যোপান্ত পড়েছি।

এর বিপরীতে আননি'মাতুল কুবরা কিতাবে ইবনে হাজার মক্কী রহ. মীলাদকে ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দির অনেক পরের উদ্ভাবিত বিষয় বলেছেন এবং মীলাদের তথাকথিত বর্ণনাগুলো খণ্ডন করে বলেছেন যে, মানুষকে এগুলো থেকে দূরে রাখা ওয়াজিব। – আননি'মাতুল কুবরা ২-৩ (পাণ্ডুলিপি)।

রাজারবাগীরা মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য একটা নকল আননি'মাতুল কুবরা'র হাওলা দিয়েছে, যা ইস্তাম্বুলের মাকতাবাতুল হাকীকাহ (দারুল শাফকাহ ফাতিহ, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক)-এর ছাপা। তুরস্কের এই প্রকাশনীটি কট্টর বিদআতপন্থীদের। এরা বিভিন্ন প্রচলিত শিরক ও বিদআতের সমর্থনে কিতাবপত্র প্রকাশ করে থাকে। এমনকি কখনো কখনো কোন বিদআতপন্থী লেখকের বাজে কিতাব হাজির করে কিতাবের বা লেখকের নাম পরিবর্তন করে পূর্ববর্তী কোনো সর্বজনস্বীকৃত আলিমের নামে চালিয়ে দেয়। এরপর কিতাবটির এমন একটি নাম নির্বাচন করে, যে নামে উক্ত মনীষীর কোন কিতাব ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা মুদ্রিত নেই। এখানেও মাকতাবাতুল হাকীকাহ ওয়ালারা এ কারসাজিই করেছে।

সুয়ূতী রহ.-এর নামে এমন কিতাব জুড়ে দিয়েছে, যে নামে তার কোনো রচনাই নেই। সুয়ূতী রহ. নিজে তাঁর রচনাবলীর তালিকা লিখে গেছেন এবং তাঁর পরের আলেমগণও তাঁর রচনাগুলো গণনা করেছেন, যা মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু 'আলওয়াসাইল ফী শরহিশ শামাইল' নামে তাতে কিছু নেই। দেখুন ড. আব্দুল আলীম চিশতী কৃত তাযকিরায়ে জালালুদ্দীন সুয়ূতী ১১৭–৩৮০।

তদুপরি সুয়ূতী রহ. নিজে তার কিতাব আলহাভী ১/২৫১–২৫২ তে মীলাদ অনুষ্ঠানকে নব উদ্ভাবিত বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাহলে তিনি কীভাবে এর উক্ত ফযীলত বয়ান করতে পারেন?

রাজারবাগীরা যদি এই সব ইতিহাস জানা সত্ত্বেও সাধারণ মুসলিম জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য এই সকল জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনার উপর 'আননি'মাতুল কুবরা'র উদ্ধৃতি ব্যবহার করে থাকে, তাহলে এটি হবে তাদের পক্ষ থেকে অন্যকে বিপথগামী করার একটা নতুন দৃষ্টান্ত। অবশ্য এমন নজির তাদের আরও আছে। আর যদি অজ্ঞতা-বশত তারা এরূপ করে থাকে –এই সম্ভাবনা অবশ্য খুবই ক্ষীণ–, তাহলে বাস্তব বিষয়টি জানার পর এখন তাদের তওবা করা উচিত এবং সাধারণ মানুষকে প্রকৃত বিষয়ে অবগত করার জন্য সংশোধনী প্রকাশ করা জরুরী। আল্লাহ তাআলা তাদের হিদায়াত দান করুন। আমীন!"

মাইজভাণ্ডারী

(মাইজভাণ্ডারী পীর ও তার অনুসারীদের মতবাদ)

"মাইজভাণ্ডারী পীর" বলতে চট্টগ্রাম মাইজভাণ্ডার দরবার-এর প্রতিষ্ঠাতা শাহ ছূফী মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী-কে বোঝানো হয়েছে। তার পিতার নাম মৌলভী সৈয়দ মতিউল্লাহ। তার মাতার নাম খায়রুন্নেছা। তিনি ১২৪৪ হিজরী মোতাবেক ১২৩৩ বাংলা, ১৮২৬ ইংরেজী ১লা মাঘ রোজ বুধবার জন্মগ্রহণ করেন। চার বৎসর বয়স পার হওয়ার পর তাকে গ্রাম্য মক্তবে আরবী ও বাংলা শিক্ষা দেয়া হয়। ১২৬০ হিজরীতে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ৮ বৎসর লেখাপড়া করার পর ১২৬৮ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। তারপর এক বৎসর যশোর জেলার বিচার বিভাগে কাজী পদে দায়িত্ব পালন করেন। তার পীর হযরত ছূফী সৈয়দ মোহাম্মাদ ছালেহ লাহোরী। মাইজভাণ্ডারী পীর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে হিজরী ১৩২৩ সনে বাংলা ১৩১৩ সালে ১০ই মাঘ মোতাবেক ২৭ জিলকৃদ সোমবার ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের পর তার পৌত্র মাওলানা শাহ ছূফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন তার স্থলাভিষিক্ত হন।[১]

---

১. তথ্যসূত্র: গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত, সংকলন সংগ্রাহক: মাওলানা শাহ ছূফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন (মাইজভাণ্ডারী), পঞ্চদশ প্রকাশ জুলাই-২০০২।

মাইজভাণ্ডারী পীর ও তার অনুসারীদের আকীদা-বিশ্বাস

মাইজভাণ্ডার গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ থেকে বেশ কিছু বই-পত্র প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে মাইজভাণ্ডারী পীরের পৌত্র মাওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন কর্তৃক রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ হল "বেলায়তে মোতলাকা", "মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার", "মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া" এবং মাইজভাণ্ডারী পীরের জীবনী-গ্রন্থ "মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত"। আরও রয়েছে শাহজাদা সৈয়দ মুনিরুল হক, মোনতাজেম গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ কর্তৃক প্রকাশিত মাইজভাণ্ডারী গানের সংকলন- "রত্ন ভাণ্ডার", "আয়েনায়ে বারী ও ফয়জিয়াতে গাউছে মাইজভাণ্ডারী" প্রভৃতি। এসব পুস্তক-পুস্তিকার আলোকে মাইজভাণ্ডারী পীর ও তার অনুসারীদের আকীদা-বিশ্বাস সম্বন্ধে যা জানা যায় তা হল।

১. ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ

এই "ধর্মনিরপেক্ষতা" কথাটা প্রচলিত রাজনৈতিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। বরং এ মতবাদ অনুসারে যেকোনো ধর্মের লোককেই তার স্বধর্মে রেখে তাকে মুরীদ বানানো হয় এবং এটাকেই তার মুক্তির জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়। মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আবশ্যকতা আছে বলে মনে করা হয় না। বরং মনে করা হয় হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান যেকোনো ধর্মের লোক নিজ নিজ ধর্মে থেকে সাধনা করে মুক্তি পেতে পারে।

"মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত" গ্রন্থে "হযরতের ধর্ম নিরপেক্ষতা: বৌদ্ধ ধননজয়কে স্বধর্মে রাখিয়া শিক্ষা" শিরোনামে লেখা হয়েছে- একদিন সকালে নাস্তার সময় নিশ্চিন্তাপুর নিবাসী বৌদ্ধ ধননজয় নামক এক ব্যক্তি আসিয়া হযরতের নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য বারবার অনুরোধ করতে লাগিলেন। ... হযরত তাহাকে বলিলেন, "মিঞা! তুমি তোমার ধর্মে থাক। আমি তোমাকে মুসলমান করিলাম।" ইহার পরও তিনি বসিয়া রহিলেন। হযরতের খাদেম মৌলভী আহমদ ছফা কাঞ্চননগরী সাহেব তাহাকে পিছন হইতে ইশারা করিয়া ডাকিয়া নিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহাকে হাকিকত্বে মুসলমান করা হইয়াছে। এ গ্রন্থেই আর এক পৃষ্ঠা পরে জনৈক হিন্দু মুন্সেফ অভয়চরণকে স্বধর্মে রেখে দীক্ষা ও উপদেশ দানের কথা বর্ণিত হয়েছে।[১]

তারা এই ধর্মনিরপেক্ষতার আর এক নাম দিয়েছে "তাওহীদে আদ্‌ইয়ান" তথা সর্বধর্মের ঐক্য। তাদের বক্তব্য হল যেকোনো ধর্ম গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকলে ধর্ম-বিরোধ মিটে যায় এবং জনগণকে ধর্ম-ঘৃণা থেকে বিমুখ করে তোলা যায়। এভাবে সব ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। মাইজভাণ্ডারী সিলসিলার দ্বিতীয় পীর শাহ

১. মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত, সংকলন সংগ্রাহকঃ মাওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন (মাইজভাণ্ডারী), পঞ্চদশ প্রকাশ ঃ জুলাই- ২০০২, পৃষ্ঠা. ১৫১-১৫২।

ছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন (মৃত ১৯৮২ ইং) কর্তৃক রচিত "বেলায়তে মোতলাকা" নামক গ্রন্থে "বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগ বিকাশ" শিরোনামের অধীনে "পরিবর্তিত বেলায়তে মোতলাকা যুগ" উপশিরোনামে লেখা হয়েছে−

"সময়ের ব্যবধান ও ইসলামী হুকুমতের অবসানের ফলে ইসলামী ধর্মজগতে নানা এখ্‌তেলাফ বা মতানৈক্য দেখা দেয়। তখন পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা তাঁহার বাতেনী শাসন পদ্ধতির প্রথানুযায়ী সমুচিত হেদায়েত ও উপযুক্ত শক্তিশালী ত্বরীকতের প্রভাবে জগৎবাসীকে অন্ধকার হইতে সহজতমভাবে উদ্ধার মানসে বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মাদীকে "বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদী" রূপে পরিবর্তিত করেন। ... ইহা বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদকে নীতিগতভাবে একই দৃষ্টিতে দেখে। কারণ ইহা মনে করে যে, বিভিন্ন মতবাদের "মত ও পথ" বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেকের গন্তব্যস্থল এক।"[১] তারপর এই কথিত তৌহীদে আদ্‌ইয়ান বা ধর্ম-ঐক্যের প্রমাণ স্বরূপ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করা হয়েছে,

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ النَّصٰرٰى وَ الصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ صٰلِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, যারা মুমিন, যারা ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান ও সাবিঈন- (এদের মধ্যে) যারাই আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা: ২-বাকারা: ৬২)

অথচ এ আয়াতে যেকোনো ধর্মের লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ঈমান আনলে এবং নেক কাজ করলে তারা পরকালে মুক্তি পাবে। আর একথা স্পষ্ট যে, ইসলাম ধর্ম আগমনের পর রসূল (সা.)কে আখেরী নবী না মানলে তার ঈমান পূর্ণ হবে না। আর রসূল (সা.)কে আখেরী নবী মানলে অন্যান্য সব ধর্মের বিধানকে রহিত মানতে হয়। তাহলে অন্য কোন ধর্মে থেকে মুক্তির অবকাশ রইল কোথায়?

উক্ত গ্রন্থে আরও লেখা হয়েছে, "মানবের রুচী অনুযায়ী ধর্মমত গ্রহণের এখতেয়ার বা অধিকার প্রত্যেকের আছে। ইহার নাম ধর্ম-স্বাধীনতা। এই বিষয়ে তৌহীদে আদ্‌য়্যান প্রবন্ধে আলোচনা আছে। ইহা বেলায়তে মোতলাকার যুগোপযোগী ব্যবস্থা যাহা জনগণকে ধর্ম-ঘৃণা বিমুখ করে।"[২]

১. বেলায়তে মোতলাকা, আলহাজ্জ শাহ সুফী সৈয়দ মুনিরুল হক মোনতাজেম দরবারে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক প্রকাশিত, ৮ম সংস্করণ, এপ্রিল-২০০১, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭।

২. বেলায়তে মোতলাকা, আলহাজ্জ শাহ সুফী সৈয়দ মুনিরুল হক মোনতাজেম দরবারে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক প্রকাশিত, ৮ম সংস্করণ, এপ্রিল-২০০১, পৃষ্ঠা ১২৯।

খণ্ডন

আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র ইসলাম ধর্মই গ্রহণযোগ্য। অতএব ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে কুরআনে কারীমের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ১৯)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.﴾

অর্থাৎ, কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করলে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। এমন ব্যক্তি পরকালে চির হতভাগাদের দলে থাকবে। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৮৫)

মুসলিম শরীফের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصر اني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرْسِلْتُ به إلا كان من أصحاب النار. (رواه مسلم في كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته)

অর্থাৎ, ঐ সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, এই উম্মতের ইয়াহুদী, নাসরানী যে কেউ আমার কথা শুনবে অতঃপর আমাকে যাসহ প্রেরণ করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। (মুসলিম)

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেছেন,

وإنما ذكر اليهود والنصارى تنبيها على من سواهما. لأن اليهود والنصاري لهم كتاب. فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغير هم ممن لا كتاب لهم أولى. (ج/١. صفحه/٨٦)

অর্থাৎ, এখানে ইয়াহুদ, নাসারাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অন্যদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে। কেননা, ইয়াহুদ নাসারাদের নিকট আসমানী কিতাব রয়েছে, এসত্ত্বেও তাদের যখন এই অবস্থা (যে, তাদের মুক্তিও শেষ নবীকে মান্য করার উপর নির্ভরশীল) তখন অন্য যাদের নিকট আসমানী কিতাব নেই তাদের অবস্থা তো অবশ্যই এমন হবে।

অন্য এক হাদীছে এসেছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيًّا ما وسعه إلا أن يتبعني. (رواه أحمد برقم ١٥٠٩٤ وإسناده حسن)

অর্থাৎ, কছম ঐ সত্তার, যার হাতে আমার জীবন! হযরত মূসা নবীও যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ না করে তাঁরও কোনো উপায় থাকত না। (মুসনাদে আহমদ)

২. বিশেষ স্তরে শরীআতের বিধান শিথিল হওয়ার মতবাদ

উক্ত "বেলায়তে মোতলাকা" গ্রন্থে লেখা হয়েছে–

"শরীয়ত নাছুত বা দৃশ্যমান জগতের অবস্থার সহিত সম্পর্কযুক্ত। এবং এই স্তরের লোকদের জন্য অবতীর্ণ।" অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতের দিকে ইংগিত করে লেখা হয়েছে যে, "যদি কেহ বেকারার বা অস্থির বা বাধ্য হয় তাহার জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য নহে।" যাহা অবস্থাভেদে ব্যবস্থার পরিপোষক বুঝা যায় এবং ইহা খোদার অনুগ্রহ ও ক্ষমার পর্যায়ভুক্ত।[১]

আয়াতটি এই–

﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.﴾

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেআমতকে সম্পূর্ণ করলাম আর ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম। (সূরা: ৫-মায়িদা: ৩)

উক্ত গ্রন্থে "বিধান শিথিল অবস্থা" উপশিরোনামে আরও লেখা হয়েছে–

"ইসলামী শরীয়তী আইন-কানুন মোয়ামেলাত শিথিল যুগে ইহা হুকুমতের হুকুমের সংঙ্গে যুক্ত হইতে বাধ্য। এবাদাতে মোতনাফিয়া আচরণে ছুফীয়ায়ে কেরাম-গণ গোঁড়া সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে এবং উসকানিদাতা মতলববাজ "আলেম" নামধারী লোকদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিতে না পারিয়া বহুদিন পূর্ব হইতে মোশাহেদা, মোরাকেবা ইত্যাদি ভিন্ন পন্থাও অবলম্বন করিয়াছিলেন। যেহেতু তূরীকত পন্থা শরীয়ত পন্থার পরবর্তী বিধায় লাওয়ামা বা অনুতাপকারী স্তর হইতে আরম্ভ হয়। তাই উপরোক্ত বহির্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের দৃষ্টির ভঙ্গির সঙ্গে ইহার তফাত দেখা যায়। এই কারণে জিক্‌রে জবানীকে নাছূতী এবং জিক্‌রে কল্‌বীকে মলকূতী বলা হয়।

তারপর "ছূফী ধ্যান-ধারণা" উপশিরোনামে লেখা হয়েছে–

"ছূফীয়ায়ে কেরামগণ আত্মশুদ্ধকামী দ্বিতীয় স্তরের "লাওয়ামা" বা অনুতাপকারী চিন্তাশীল জনগণ হন বিধায় তাহারা তূরীকতপন্থী। তাহারা এখতেলাফ পরিহার করেন; অলীয়ে কামেলের জ্ঞান জ্যোতিঃ অনুসরণ করেন। বিধান ধর্মের উপর নৈতিক ধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং এবাদত বা উপাসনার উপর "এতায়াত" বা আনুগত্যকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন, যাহা উপাসনার উদ্দেশ্য।"[২]

---

১. বেলায়তে মোতলাকা, আলহাজ্জ শাহ সুফী সৈয়দ মুনিরুল হক মোনতাজেম দরবারে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক প্রকাশিত, ৮ম সংস্করণ, এপ্রিল-২০০১, পৃষ্ঠা ১৬।

২. বেলায়তে মোতলাকা, আলহাজ্জ শাহ সুফী সৈয়দ মুনিরুল হক মোনতাজেম দরবারে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক প্রকাশিত, ৮ম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০১, পৃষ্ঠা ১১৮।

এসব কথার দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, বিশেষ কামেল স্তরের ব্যক্তিবর্গের জন্য নামায, রোযা ইত্যাদি বিধান শিথিল হয়ে যায়। বস্তুত এ কারণেই অনেক ভাণ্ডারীকে বাতিনী নামাযের নামে নামায থেকে বিরত থাকতে দেখা যায়।

তাদের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে তাদের আরও একটা মতবাদ আছে বলে প্রমাণিত হয়। তা হল–

৩. শরীআত ও তরীকত ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার মতবাদ

এই মতবাদের ভিত্তিতেই মনে করা হয় যে, শরীআত সাধারণ স্তরের মানুষের জন্য। কামেল স্তরের মানুষের জন্য শরীআতের বিধি-বিধান পালনের বাধ্যবাধকতা থাকে না। শরীআতে অনেক কিছু জরূরী যা তুরীকতে জরূরী নয়। উল্লেখ্য, সুরেশ্বরী পীর ও তার অনুসারীদের আকীদাও অনুরূপ ছিল যে, শরীআত ও তরীকত ভিন্ন ভিন্ন এবং কামেল ও বুযুর্গ হওয়ার পর তাদের আর ইবাদতের প্রয়োজন থাকে না। পূর্বে সূরেশ্বরীদের মতবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে দলীল-প্রমাণসহ খণ্ডন পেশ করা হয়েছে। এবং এসব বাতিল পন্থীরা কামেল ও বুযুর্গ হয়ে গেলে ইবাদত লাগে না- এ মর্মে যে আয়াত দ্বারা দলীল প্রদান করে থাকে, সে সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা ও খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।

৪. পীরের মধ্যে খোদায়িত্ব আরোপ করার মতবাদ

তারা তাদের বিভিন্ন বইতে এমন সব কথা লিখেছেন যাতে বুঝা যায় তাদের ধারণামতে পীরের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ, তাদের পীর আল্লাহ্‌র প্রকাশ বা আল্লাহ্‌র অবতার। এমনকি স্বয়ং খোদা। যেমন: তারা বলেছে,

গাউছ বেশ ধৈরে ভবে খেলিতেছে নিরঞ্জনে।
তানে ভাবে যেবা ভিন, পাবে না সে প্রভু চিন।[১]

এ কবিতায় মাইজভাণ্ডারীকে খোদার প্রকাশ হওয়ার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। তারা আরও বলেছেন, আগে কি জানিতাম আমি তুমি হে জগৎ স্বামী

তোমা কৃপা গুণে সব জীবের জীবন।
জানতেম কি অরুণ শশী দেবমান স্বর্গবাসী।
তব গুণে গুণী তব নূরের সৃজন
ছাপে ছিলে মানব ছলে হাদী প্রেমে পর পৈলে
গাউছ বেশ ধরি কোথা পালাবে এখন।[২]

এ কবিতায় মাইজভাণ্ডারীকে খোদার প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে তার খোদা হওয়ার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ ধারণা কুফ্‌রী। দেখুন পৃ. ৫৯।

১. রত্নভাণ্ডার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা -২১, প্রকাশক সৈয়দ মুনিরুল হক, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭।
২. রত্নভাণ্ডার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা -১১, প্রকাশক সৈয়দ মুনিরুল হক, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭।

আরও বলা হয়েছে,

সে আজলী সে আবদী সে এবতেদা, সে এন্তেহা।
সে আওয়ালে সে আখেরে সে জাহেরে সে বাতেনে।[১]

আরও বলা হয়েছে,

আউয়াল আখের তুমি জাহের বাতেন তুমি।
তুমি হে নূরের ছটা সারা ভুবন মোহন ॥
ওহে কর্ত্তা জগরক্ষা ভিক্ষুকের দেও ভিক্ষা
কর হাদীর প্রাণ রক্ষা প্রিয়া গাউছ ধন ॥[২]

এ সব কবিতায় খোদার জন্য যেসব সিফাত প্রযোজ্য সেসব মাইজভাণ্ডারীর জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। এভাবে তাকে খোদার স্তরে পৌঁছে দেয়া হয়েছে, যা চরম গোমরাহী।

আরও বলা হয়েছে,

আহ্‌মদে বেমিম তুজহে কাহতা হোঁ ওয়াল্লাহ।
মিমকি পর্দ্দা কো মের ভিতু উঠা দাও॥[৩]

এ কবিতায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আল্লাহ হলেন আহাদ। আর মাইজভাণ্ডারী হলেন আহমদ। এই আহাদ ও আহমদের মধ্যে পার্থক্য কেবল একটা মীম হরফের। নতুবা আল্লাহ ও মাইজভাণ্ডারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

৫. হায়াত-মওতের ব্যাপারে পীরের নিয়ন্ত্রণ

মাইজভাণ্ডারীগণ মনে করেন- তাদের পীরের মধ্যে মানুষের হায়াত-মওতের ব্যাপারেও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা রয়েছে। জীবনী ও কারামত গ্রন্থে "হযরতের বেলায়তী ক্ষমতায় আজরাঈল হইতে রক্ষা ও মৃত্যু সময় পরিবর্তন" শিরোনামে মাইজভাণ্ডারী সাহেবের জনৈক ভক্ত মৌলভী আবদুল গনি সাহেব সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে, তিনি একবার অসুস্থ হওয়ার পর একদিন হঠাৎ বেহুশ হয়ে পড়লে দেখতে পান যে, আজরাইল কদাকার ভীষণ আকৃতিতে একখানা অসি নিয়ে তার বুকের উপর বসে তার গলায় চালাতে উদ্যত। এমনি সময় গাউসুল আজম (মাইজভাণ্ডারী সাহেব) সেখানে হাজির হলেন। তিনি তার অসি ছিনিয়ে নিলেন এবং তাকে বললেন,

"তুমি এখনই ফিরিয়া যাও। আমি তাহাকে এক সপ্তাহের সময় দিলাম। তাহার সাথে আমার দরকারী কাজ আছে। তখন আজরাইল হযরতকে কিছু বলিতে চাহিলে তিনি অতিশয় নারাজ ও জালাল হইয়া বলিয়া উঠিলেনঃ এখনই যাও। তোমার খোদাকে আমার কথা বলিও। আমি সময় দিয়াছি।" তখন আজরাইল চলিয়া গেল। তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিলেন।[৪]

১. প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১।
২. রত্নভাণ্ডার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা -১১, প্রকাশক সৈয়দ মুনিরুল হক, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭।
৩. রত্নভাণ্ডার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা -২, প্রকাশক সৈয়দ মুনিরুল হক, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭।
৪. মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত, সংকলন সংগ্রাহকঃ মাওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন (মাইজভাণ্ডারী), পঞ্চদশ প্রকাশ: জুলাই- ২০০২, পৃষ্ঠা ১২৯।

পীর সম্বন্ধে এমন আকীদা হায়াত-মওত সম্পর্কিত আকীদার পরিপন্থী। তদুপরি কোন মানুষ আল্লাহ ও ফেরেশতার উপর এমন মাতবরী দেখাতে পারে তা বিশ্বাস করা ঈমান বিরোধী।

উল্লেখ্য, এ শ্রেণীর লোকেরা পীরকে খোদার স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। তার পীরের মধ্যে খোদায়ী গুণ আরোপ করেছে। পীর খোদার প্রকাশ, পীরের মধ্যে প্রাণ রক্ষা করার ক্ষমতা, হায়াত-মওত পীরের হাতে থাকা ইত্যাদি খোদায়ী গুণ থাকাকে সাব্যস্ত করেছে। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, যারা আল্লাহ ও রসূলের মধ্যে পার্থক্য না করার মত পোষণ করেন, বা মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রবেশ করার মত পোষণ করেন, বা পীর মাশায়েখকে খোদার স্তরে পৌঁছে দেয়, পীরকে খোদার প্রকাশ বলে, বা পীরের মধ্যে খোদায়ী গুণ আরোপ করে, তারা এ বিষয়ে সাধারণত وحدة الوجود বা "সর্বেশ্বরবাদ"-দর্শনের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এটা করে থাকেন। এ সম্পর্কে পরবর্তীতে "সর্বেশ্বরবাদ/সর্বখোদাবাদ" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

৬. পীর কর্তৃক পরকালে মুক্তি পাওয়ার মতবাদ

মাইজভাণ্ডারীদের মতবাদ হল পীর মৃত্যুকালে কষ্ট থেকে মুক্তি দিবেন, কবরে আরামের ব্যবস্থা করবেন, হাশরে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবেন। আমলে ত্রুটি থাকলে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করবেন। যেমন: বলা হয়েছে,

দাসগণের প্রাণ হরিতে - ভয় নাহি দূত সমনে।
ফুল দেখাই প্রাণ হরিবে - নিজ হাতে গাউছ ধন।
মন্‌কির নকিরের ডর - কবরে নাহিক মোর।
আদবের চাবুক মেরে - হাঁকাইবেন গাউছ ধন।
কবর কোশাদা হবে- পুষ্পসয্যা বিছাইবে।
সামনে বসি হাল্‌কা বন্দি- করাইবেন গাউছ ধনে
হীন দাস হাদী কয়- হাশরেতে নাহি ভয়।
পিছে পিছে দাসগণ - ফিরাইবেন গাউছ ধন।[১]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

গাউছজি, মাওলাজি ডাকছি তোমারে
নাছুতী সঙ্কটে উদ্ধারিত মোরে
দিন দুনিয়ার ছোওয়াব গুনা...
মিজানের পাল্লাখানা, পোলছেরাতের ভাবাগোনা
রেহাই দেও মোরে।[২]

১. রত্নভাণ্ডার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা -১৭, প্রকাশক সৈয়দ মুনিরুল হক, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭।
২. রত্নভাণ্ডার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা -২৭, প্রকাশক সৈয়দ মুনিরুল হক, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭।

উল্লেখ্য, আটরশী পীরের মতবাদও অনুরূপ ছিল। তাদের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।[১]

৭. পীর কর্তৃক কামনা-বাসনা পূরণ হওয়ার মতবাদ

এ প্রসঙ্গে তাদের নিম্নোক্ত কবিতাটি তুলে ধরা যায়–

ভাণ্ডারীকে যে পাইল- খোদা রসূল সে চিনিল।
গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী পূর্ণ করেন বাসনা।[২]

উল্লেখ্য, এনায়েতপুরী ও আটরশী পীরের মতবাদও অনুরূপ ছিল। তাদের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।[৩]

৮. গান-বাদ্য জায়েয হওয়ার মতবাদ

তারা লিখেছেন– "যাহারা ছেমায় আসক্ত, ছেমা বা গান বাদ্য জনিত জিকির বা জিকরী মাহফিল করিতে চাহেন, তাহাদের জন্য বাদ্যযন্ত্র সহকারে জিকির বা জিকরী মাহফিল করিবার অনুমতি ও অনুমোদন আছে।[৪]

উল্লেখ্য, গান-বাদ্য ও সামা অবৈধ হওয়া প্রসঙ্গে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। দেখুন "গান-বাদ্য" শীর্ষক আলোচনা।

রেজবী বা রেজাখানী

"রেজবী" বা "রেজাখানী" বলতে বোঝানো হয়েছে আহমদ রেজাখান বেরেলভীর মতবাদ অনুসারীদেরকে। তাদেরকে "বেরেলভী"ও বলা হয়। আহমদ রেজা খান ১০ শাওয়াল, ১২৭২ হিজরী মোতাবেক ১৪ জুন, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রসিদ্ধ শহর বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মগত নাম মুহাম্মাদ ওরফে আহমদ রেজা। তিনি নিজের নাম রাখেন আব্দুল মুস্তফা। তার ভক্তবৃন্দরা তাকে "আ'লা হযরত" নামে স্মরণ করে থাকেন। তার পিতার নাম ছিল নাকী আলী। দাদার নাম রেজা আলী।

আহমদ রেজা খান সাহেব তার পিতা ও দাদার অনুসরণে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভাই মির্জা গোলাম কাদের বেগ-এর নিকট। তারপর পিতার নিকট থেকে অধিকাংশ বিদ্যা অর্জন করেন। পারিবারিকভাবে স্বচ্ছল থাকায় লেখাপড়া থেকে ফারেগ হয়েই তিনি লেখার অঙ্গনে পদচারণা শুরু করেন।[৫]

আহমদ রেজাখান সাহেব অত্যন্ত পরমত-অসহিষ্ণু মেজাযের মানুষ ছিলেন। তার কলম ছিল অত্যন্ত বে-পরোয়া এবং গালী প্রদানে পারঙ্গম। সারা জীবন তিনি নদওয়া

১. দেখুন "আটরশি" শিরোনামের আলোচনা (উপশিরোনাম– পীর পরকালে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবে।)।
২. রত্নভাণ্ডার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা -৩৩, প্রকাশক সৈয়দ মুনিরুল হক, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭।
৩. দেখুন এনায়েতপুরী ও আটরশি ("পীর সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা" ও "পীর দুনিয়াতে সব ধরনের বিপদ–আপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন" উপশিরোনাম) শীর্ষক আলোচনা।
৪. "মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া" মাইজভাণ্ডারীর দ্বিতীয় পীর- শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন কর্তৃক সম্পাদিত, ১১শ সংস্করণ, জুন ২০০২, পৃষ্ঠা ৪।
৫. তথ্যসূত্র: رضاخانیت. مولانا مفتی محمد امین صاحب پالنپوری. استاذ حدیث وفقہ دارالعلوم دیوبند

এবং দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে লেগে ছিলেন। তাদেরকে কাফের বলে ফতওয়া দেয়াই ছিল তার জীবনের প্রধান কাজ। এই ফতওয়াবাজীর কারণেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৩১১ হিজরী থেকে লাগাতর প্রায় দশ বছর তিনি নদওয়ার উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে ফতওয়াবাজীতে লিপ্ত থাকেন। মক্কা মদীনার উলামায়ে কেরাম থেকেও তিনি তাদের তাক্‌ফীরের ফতওয়া সংগ্রহ করেন এবং ফাতাওয়াল হারামাইন বিরজফি নাদওয়াতিলমাইন (فتاوي الحرمين برجف ندوة المين) নামে[১] হাজার হাজার সংখ্যায় সেটা প্রচার করতে থাকেন। এ ছাড়াও এ মর্মে অসংখ্য পুস্তিকা ও প্রচারপত্র তৈরি করে অবিরাম তা বৃষ্টির মত ছড়াতে থাকেন। তার এই বিরামহীন অহেতুক ফতওয়াবাজীর বিরুদ্ধে নদওয়ার উলামায়ে কেরাম চুপ থাকা এবং তার কোন উত্তর দিতে প্রবৃত্ত না হওয়াই সংগত মনে করেন। এ চুপ থাকাকেও রেজবী দল দুর্বলতা গণ্য করে থাকে।

ইতিমধ্যে দ্বীন ও মিল্লাতের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে দারুল উলূম দেওবন্দ মাকবূলিয়্যাত অর্জন করে এবং স্বল্পকালের মধ্যেই দারুল উলূম দেওবন্দ হিন্দুস্তানের দ্বীনী মারকাজ ও দ্বীনের কেল্লা হিসাবে পরিগণিত হতে শুরু করে। তখন আহমদ রেজাখান সাহেবের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হয়। ১৩২০ হিজরীতে তিনি "আল-মু'তামাদ আল-মুসতানাদ" (المعتمد المستند) নামে একখানা পুস্তক প্রকাশ করেন, যার মধ্যে প্রথমবার জামাআতে দেওবন্দের আকাবির হযারাত মাওলানা কাসেম নানতুবী ও হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহীকে কাফের বলে ফতওয়া দেয়া হয়। তিনি লেখেন- "এরা এমন কাফের যে, তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে যে সন্দেহ করবে সেও নিশ্চিত কাফের ও জাহান্নামী।"

তার এই পুস্তকখানা আরবীতে রচিত হওয়ার কারণে হিন্দুস্তানের সাধারণ জনগণের মধ্যে বিষয়টা তেমন জানাজানি ও প্রচার না হওয়ায় অবশেষে তিনি ১৩২৩ হিজরীর শেষ দিকে মক্কা মদীনায় সফর করেন এবং দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন উর্দূ কিতাবের ইবারতকে গড়বড় করে বা কাঁট-ছাঁট করে তার ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে তারা কাফের হয়ে গিয়েছেন এই মর্মে একটা জাল ফতওয়া দাঁড় করে হারামাইনের উলামায়ে কেরামের সামনে পেশ করেন যে, দেওবন্দের উলামায়ে কেরাম খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করেন, রসূল (সা.)-এর অবমাননা ও সমালোচনা করেন। অতএব তাদের তাক্‌ফীর করা প্রয়োজন। হারামাইনের উলামায়ে কেরাম উর্দূ পড়তে পারতেন না। উলামায়ে দেওবন্দের রচিত উর্দূ কিতাবাদি সম্বন্ধে তারা বে-খবর ছিলেন। তারা আহমদ রেজাখানের উপস্থাপনায় বিশ্বাস স্থাপন করে সেই ফতওয়ায় স্বাক্ষর করে দেন। আহমদ রেজাখান এই ফতওয়া حسام الحرمين ("হুছামুল হারামাইন" তথা হারামাইনের ধারালো তলোয়ার) নামে উর্দূ ভাষায় দেশব্যাপী প্রচার করেন।

১. এ নামের অর্থ হয় এরূপ– মিথ্যুক দলের ভিত কাঁপানো হারামাইনের (মক্কা মদীনার) ফতোয়া।

এই ফতওয়ায় দেওবন্দের প্রসিদ্ধ চার জন আলেমের (হযরত মাওলানা কাসেম নানুত-বী, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী, হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারান-পূরী ও হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী)-এর নাম উল্লেখ পূর্বক বিভিন্ন উদ্ধৃতি সহকারে যা বলা হয়, তার সারকথা হল- তারা এমন কাফের ও মুরতাদ যে, তাদের কাফের ও জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারে যে সন্দেহ করবে সেও কাফের ও জাহান্নামী।[১]

এটা ১৩২৫ হিজরীর ঘটনা। এতদিন যাবত যারা আহমদ রেজাখানের ফতওয়াবাজীতে কর্ণপাত করছিলেন না, তারাও এখন হারামাইনের উলামায়ে কেরা-মের স্বাক্ষর দেখে বিচলিত হয়ে গেলেন এবং আরও অনেকে এই ফিতনায় জড়িয়ে পড়লেন। তখন উপরোক্ত চার জনের মধ্যে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ও হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপূরী জীবিত ছিলেন। তারা দুজন তখনই নিজ নিজ সাফাই পেশ করেন এবং পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেন যে, حسام الحرمين (হুছামুল হারামাইন) গ্রন্থে আমাদের দিকে যে আকীদা ও বিষয়বস্তু সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অপবাদ ও মিথ্যা। এরূপ আকীদা পোষণকারীদেরকে আমরাও ইসলাম থেকে বহির্ভূত মনে করি। তাদের
বক্তব্য তখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর বক্তব্য بسط البنان (বাসতুল বানান) নামে স্বতন্ত্রভাবেও প্রকাশিত হয়। কিন্তু আহমদ রেজাখান ও তার অনুসারীদের প্রচারণা প্রপাগাণ্ডা চলতেই থাকে।

এদিকে আহমদ রেজাখান কর্তৃক হারামাইনের উলামায়ে কেরাম থেকে উক্ত ফতওয়ায় স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক হিন্দুস্তান প্রত্যাবর্তনের পর উক্ত ফতওয়ায় স্বাক্ষর প্রদানক-ারী হারামাইনের কতিপয় আলেম এ মর্মে অবগত হন যে, আহমদ রেজাখান নামক উক্ত হিন্দুস্তানী মৌলভী প্রতিপক্ষের আকীদা-বিশ্বাস বর্ণনার ব্যাপারে মিথ্যা ও প্রতারণ-ার আশ্রয় নিয়েছেন। বস্তুত তাদের আকীদা-বিশ্বাস এরূপ নয়। তখন তারা আহমদ রেজাখান কর্তৃক বর্ণিত বিষয়াবলী ছাড়াও মৌখিকভাবে তাদের নিকট উলামায়ে দেওবন্দ সম্বন্ধে আরও যেসব আকীদাগত অমূলক বিভ্রান্তির কথা পৌঁছেছিল এরকম ২৬টা বিষয় উল্লেখ পূর্বক উলামায়ে দেওবন্দের নিকট সেসব ব্যাপারে তাদের কি আকীদা তা জানার জন্য প্রেরণ করেন। হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপূরী তার বিস্তারিত জওয়াব লিখে হারামাইনের উলামায়ে কেরামের নিকট প্রেরণ করেন। তারা সে উত্তরগুলো দেখে এতমিনান প্রকাশ করেন এবং স্পষ্টত লেখেন যে, আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা-বিশ্বাসও অনুরূপ। এর মধ্যে কোনটিই আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাস্‌লাক বিরোধী নয়। এসব প্রশ্ন ও জওয়াব হিন্দুস্তান এবং হারামাইনের উলামায়ে কেরামের সত্যায়নসহ উর্দূ ভাষায়

১. حسام الحرمين على منحر الكفر والمين قادری کتاب گھر بریلی شریف سال طباعت ۱۲ ربیع الاول ۱۴۱۸ھ ص/۳۲-۱۲

কিতাব আকারে المهنّد على المُفَنَّد المعروف بالتصديقات لدفع التلبيسات (আল-মুহ-ান্নাদ আলাল মুফান্নাদ) নামে প্রকাশ ও প্রচার করা হয়। তার উর্দূ অংশ "আকাইদে উলামায়ে দেওবন্দ" (عقائد علماء دیوبند) নামে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়। যার ফলে তখনকার মত এই ফিতনা অনেকটা নির্বাপিত হয়। পরবর্তিতে হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী ও হযরত মাওলানা মুর্তজা হাছান চান্দপূরী "হুছামুল হারামাইন" গ্রন্থের বিস্তারিত জওয়াব লেখেন এবং এক এক করে প্রমাণ করে দেখান যে, এ গ্রন্থে আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের দিকে যেসব আকীদা সম্পৃক্ত করে দেখানো হয়েছে, তা সম্পূর্ণ জালিয়াত ও মিথ্যা। হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) লিখিত সে গ্রন্থখানির নাম "আশ-শিহাবুছ ছাক্বিব" (الشهاب الثاقب) আর মুর্তজা হাছান চান্দপূরী লিখিত গ্রন্থের নাম "আস্‌সাহাবুল মিদ্‌রার" (السحاب المدرار)। তারা এ গ্রন্থদ্বয়ে প্রমাণ করে দেখান যে, আহমদ রেজাখান কীভাবে আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের বিভিন্ন ইবারত কাঁট-ছাঁট করে তার ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে কুফ্‌রীর ফতওয়া দাঁড় করেছেন এবং মানুষকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আহমদ রেজাখান ও তার অনুসারীদের প্রচারণা প্রপাগাণ্ডা তারপরও অব্যাহত থাকে এবং এখনও রয়েছে।

আহমদ রেজাখান সাহেব উলামায়ে দেওবন্দের বিভিন্ন উর্দূ কিতাবের ইবারতকে কীভাবে গড়বড় করে বা কাঁট-ছাঁট করে তার ভিত্তিতে তাঁদের বিরুদ্ধে কুফ্‌রীর জাল ফতওয়া দাঁড় করেছিলেন তা জানার জন্য উপরোক্ত কিতাবসমূহ (بسط البنان, السحاب المدرار ,الشهاب الثاقب ,عقائد علماء ديوبند , المُهنّد على المُفَنَّد প্রভৃতি) পাঠ করলেই বিষয়টা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে উঠবে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটা বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হল।

১. হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহীর فتاوی رشیدیہ-এর বরাত দিয়ে বলা হয় যে, তিনি তাতে বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা মিথ্যা বলতে পারেন।" অথচ হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গোহী (রহ.)-এর ইবারত নিম্নরূপ:

بیشک اللہ تعالی اس سے منزہ ہے کہ کذب کے ساتھ متصف ہوا سکے کلام میں ہرگز کذب کا شائبہ بھی نہیں جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے : ومن اصدق من الله قيلا– اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے یازبان سے نکالے کہ اللہ تعالی جھوٹ بولتا ہے وہ کافر وقطعی ملعون ہے۔ اور کتاب و سنت واجماع امت کا مخالف ہے۔ ہاں اہل ایمان کایہ عقیدہ ضرور ہے حق تعالی نے قرآن میں فرعون وہامان و ابولہب کے متعلق جو یہ فرمایا ہے کہ وہ دوزخی ہیں تویہ حکم قطعی ہے اس کے خلاف کبھی نہ کریگا لیکن اللہ ان کو جنت میں داخل کرنے پر ضرور قادر ہے عاجز نہیں ہاں البتہ اپنے اختیار سے ایسا کریگا نہیں الخ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত হবেন– এ থেকে অবশ্যই তিনি পবিত্র। তাঁর কথায় আদৌ মিথ্যার কোনো লেশ মাত্র নেই। যেমন: কুরআনে নিজেই তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, "আল্লাহর চেয়ে কার কথা অধিক সত্য?" যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস রাখে বা মুখে তা উচ্চারণ করে যে, আল্লাহ তাআলা মিথ্যা বলেন, সে কাফের ও নিশ্চিত মালউন–অভিশপ্ত এবং কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমা-বিরোধী। তবে হাঁ ঈমানদারদের এই বিশ্বাস অবশ্যই আছে যে, আল্লাহ তাআলা কুরআনে ফেরআউন, হামান ও আবূ লাহাবের ব্যাপারে জাহান্নামী হওয়ার যে ঘোষণা দিয়েছেন, এটা অকাট্য ঘোষণা– এর বিপরীত আদৌ তিনি করবেন না। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ক্ষমতা রাখেন– অক্ষম নন। তবে হাঁ, তিনি অবশ্যই তা করবেন না, নিজের ইচ্ছাতেই তা করবেন না।

এখানে গঙ্গোহী (রহ.) আল্লাহ্‌র কুদরত বর্ণনা করতে গিয়ে لیکن اللہ ان کو جنت میں داخل کرنے پر ضرور قادرہے عاجز نہیں -এই বাক্য ব্যবহার করেছেন, (যার অর্থ হল–কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ক্ষমতা রাখেন– অক্ষম নন।) এ থেকেই আহমদ রেজা খান সাহেব এই কথা বের করেছেন যে, গঙ্গোহীর মতে "আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন।" কী অদ্ভূত বিকৃতিমূলক আবিষ্কার!

২. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি "হিফজুল ঈমান" (حفظ الايمان) গ্রন্থে বলেছেন, "রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গায়েবের যেমন জ্ঞান রয়েছে তেমন জ্ঞান একটা শিশু, পাগল এমনকি জানোয়ারেরও রয়েছে। এভাবে তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবমাননা করেছেন। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবমাননা করা কুফ্‌রী।" অথচ থানবী (রহ.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "আলেমুল গায়েব" বা "গায়েবের জ্ঞানের অধিকারী" বলা ঠিক নয় এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যেয়ে নিম্নোক্ত ইবারত ব্যবহার করেছেন–

آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یاکل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ؐ کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو زید عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حوانات و بہائم کیلئے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتاہے جودوسرے شخص سے مخفی رہے تو چاہئے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے الخ (بسط البنان صفحہ/۱۵)

৩. হযরত খলীল আহমদ আম্বিটবী সাহারানপূরী রচিত "বারাহীনে ক্বাতি'আ" (عقائد علماء دیوبند) গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে (হুছামুল হারামাইন পৃঃ ২৭) যে, তাতে আছে– "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এল্‌মের চেয়ে তার (রশীদ আহমদ গঙ্গোহী/ সাহারানপূরীর) পীর ইবলীছের এল্‌ম বেশি।" অথচ এটা সম্পূর্ণ

বিভ্রান্তিকর। উক্ত গ্রন্থে দীর্ঘ ইবারতে যা বলা হয়েছে "আক্বাইদে উলামায়ে দেওবন্দ" (عقائد علماء دیوبند) গ্রন্থের বর্ণনামতে তার সারকথা এরূপ–

کسی جزئی حادثہ کا حضرت کا اس لئے معلوم نہ ہونا کہ آپ نے اس کی جانب توجہ نہیں فرمائی آپ کے اعلم ہونے میں کسی قسم کا نقصان پیدا نہیں کرسکتا جبکہ ثابت ہوچکا کہ آپ ان شریف علوم میں جوآپ کے منصب اعلی کے مناسب ہیں ساری مخلوق سے ب ڑھے ہوئے ہیں جیسا کہ شیطان کو بہتیرے حقیر حادثوں کی شدت التفات کے سبب اطلاع ملجانے سے اس مردود میں کوئی شرافت اور علمی کمال حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ انپر افضل و کمال کا مدار نہیں ہے. الخ۔

৪. হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) সম্পর্কে "তাহযীরুন্নাস" (تحذیر الناس) গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি তাতে খতমে নবূওয়াতের অস্বীকার করে বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরও আরও নবী হতে পারে। এ কথাটাও কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর কথার বিকৃতি।[১] আমি "তাহযীরুন্নাস" গ্রন্থ আগাগোড়া পাঠ করে কোথাও এমন কথা দেখিনি। হয়ত কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর সুদীর্ঘ বক্তব্যকে কাটছাঁট ও বিকৃত করেই এমনটা করা হয়েছে।

আহমদ রেজা খান সাহেব কেন এরূপ অহেতুক ও বিভ্রান্তিমূলক ফতওয়াবাজী করে উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মিশন গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রকৃত রহস্য আল্লাহ তাআলাই অবগত আছেন। তবে এর পিছনে ইংরেজদের মিশন সফল করার কোন যোগসূত্র ছিল বলে অনেকের ধারণা। তার কারণ কয়েকটি। যথা:–

১. আহমদ রেজা খান সাহেবের শিক্ষক ছিলেন মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভাই মির্জা গোলাম কাদের বেগ। আর এই মির্জা পরিবারটা যে ইংরেজদের ক্রিড়নক ও তল্পিবাহক ছিল তা সর্বজনবিদিত।[২] এভাবে এই পরিবারের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ইংরেজ পরিকল্পনার সঙ্গে আহমদ রেজাখান সাহেবের যোগসূত্র গড়ে উঠতে পারে।

২. ইংরেজগণ ভারতবর্ষ দখল করার পর এক সময় শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) ভারতবর্ষকে দারুল হরব ঘোষণা দেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহবান জানান। এ ঘোষণার সঙ্গে সর্বস্তরের উলামায়ে কেরাম একাত্মতা পোষণ করেন এবং একে একে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বহু জিহাদ পরিচালিত হয়। সর্বশেষ ১৮৫৭ সালে হিন্দু মুসলিম সম্মিলিতভাবে দেশ স্বাধীন করার জন্য সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে। সে সংগ্রামও ব্যর্থ হয়। ভারতবর্ষের উপর ইংরেজ আধিপত্য পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতকিছু সত্ত্বেও আহমদ রেজা খান সাহেব তার "ই'লামুল আ'লাম বিআন্না

১. দেখুন عقائد علماء دیوبند ও تحذیر الناس গ্রন্থদ্বয়।
২. দেখুন "কাদিয়ানী মতবাদ" শীর্ষক আলোচনা।

হিন্দুস্তানা দারুল ইসলাম" إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإسلام নামক গ্রন্থ লিখে তাতে ভারতবর্ষকে দারুল ইসলাম বলে ফতওয়া প্রকাশ করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লেখেন– "আমাদের ইমাম আজম (আবূ হানীফা) বরং তিন ইমামের মাযহাব অনুযায়ী হিন্দুস্তান দারুল হরব নয় বরং দারুল ইসলাম।"

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল– একদিকে তিনি ইংরেজদের চরম বিরোধী উলামায়ে কেরামকে অযথা কাফের আখ্যায়িত করে মুসলমানদেরকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছেন, অপরদিকে বৃটিশ সরকার যখন একে একে ইসলাম ও মুসলমানদের সব নিশানা নিশ্চিহ্ন করে চলেছে সেই মুহূর্তে তিনি ভারতবর্ষকে দারুল ইসলাম আখ্যায়িত করে ইংরেজদের আনুকূল্য প্রদান করেছেন। এটাকে ইংরেজদের ইশারাঘটিত মনে করা হলে তা অস্বাভাবিক আখ্যায়িত হওয়ার কথা নয়।

৩. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন হিন্দুস্তানে খেলাফত আন্দোলন চলতে থাকে এবং ভারতবর্ষের শতকরা ৯০জন আলেম তাদের মাসলাকগত মতবিরোধকে পিছনে ফেলে ইসলামের পবিত্র ভূমি রক্ষা ও ইসলামী খেলাফতের হেফাজতের জন্য এই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে একই প্লাটফরমে একত্র হন, তখনও আহমদ রেজা খান সাহেব খেলাফত আন্দোলনে শরীক সমস্ত উলামায়ে কেরামকে গান্ধি ফিরকা (فرقہ گاندھویہ) নামে আখ্যায়িত করেন এবং তার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে লেখা ও প্রচারণা যুদ্ধ শুরু করেন।

১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ১৯২১ সালে আহমদ রেজা খান সাহেব ইন্তেকাল করেন। কিন্তু তার ইন্তেকালের পরও তার মিশন চলতে থাকে। মৌলভী নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, মৌলভী আমজাদ আলী আজমগড়ী, মৌলভী হাশমত আলী পীলীভীতী ও মুফতী আহমদ ইয়ার খান প্রমুখ তার মিশনকে অব্যাহত গতিতে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন।

এই রেজভী বা বেরেলী মিশনের কাজ প্রধানত দুটো। যথা:–

১. আম্বিয়া ও আওলিয়ার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা।

২. রসম ও বিদআতসমূহকে জয়ীফ এমনকি মওজূ' হাদীছের আশ্রয় নিয়ে সেগুলোকে জায়েয বরং মুস্তাহ্ছান (উত্তম) প্রতিপন্ন করা। সেই সাথে সাথে রসম ও বিদআত বিরোধী প্রতিপক্ষীয় উলামায়ে কেরামকে কথায় কথায় কাফের বলে ফতওয়া দেয়ার ঐতিহ্যবাহী আমলটা তো রয়েছেই। তারা কথায় কথায় তাক্ফীর করায় এত বেশি তৎপর যে, তাদেরকে "তাক্ফীর পার্টি" বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আমাদের দেশে রেজভী নামে যে গ্রুপটা দেখা যায়, তারাও উক্ত আহমদ রেজা খানের অনুসারী। তারাও কথায় কথায় উম্মতের হক্কানী উলামায়ে কেরামকে তাক্ফীর করার রেজাখানী ঐতিহ্যকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে চর্চা করে যাচ্ছেন। তারাও হুছামুল হারামাইন –এর সেই সব ভিত্তিহীন কথাগুলো এখনও আওড়ে যাচ্ছেন এবং তার ভিত্তিতে উলামায়ে দেওবন্দ ও তাদের অনুসারীদেরসহ বিদআত কুসংস্কার বিরোধী

হক্কানী উলামায়ে কেরামকে অত্যন্ত লাগামহীনভাবে তাক্‌ফীর করে চলেছেন। উদাহরণ স্বরূপ মাওলানা আকবার আলী রেজভী কর্তৃক প্রকাশিত একটা পুস্তিকা থেকে সামান্য কিছু অংশ তুলে ধরা হল।

"১২০০ হিজরী সনে নজ্‌দ দেশে এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইব্‌নে আবদুল ওয়াহ্‌হাব নামে দেশে দেশে কালিমা ও নামাযের তাবলীগ চালাইয়া মুসলমানদিগকে ফাঁকি দিয়া দলভুক্ত করিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং সাহাবায়ে কেরামের আকায়েদের বিপরীত আকীদা শিক্ষা দিয়া একটি বেঈমান শয়তানের দল গঠন করিয়াছে। সেই দলের নাম হইল 'ওহাবী' দল। এবং ওহাবী ধর্মের একটি কেতাব লিখিয়াছেন। যাহার নাম হইল "কিতাবুত তাওহীদ"। সেই কেতাব অনুযায়ী সমস্ত "উম্মতে মোহাম্মাদীকে" মুশরেক বানাইয়াছে। ... এবং "কিতাবুত্ তৌহিদ" নামক কিতাবখানা দিল্লীতে পাঠাইয়াছে। এই কেতাব মৌলভী ইসমাইল দেহ্‌লভী দেখিয়া ওহাবী ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। এবং 'কিতাবুত্ তৌহিদ' অনুযায়ী উর্দু ভাষায় একখানা কেতাব লিখিয়াছে। সেই কেতাবের নাম 'তাকবিয়াতুল' ঈমান। মৌলভী ইসমাইলের দ্বারা হিন্দুস্তানে ওহাবী ধর্ম প্রচার হইয়াছে। অবশেষে ওহাবী ধর্মের কেন্দ্র দেওবন্দ মাদ্রাসা কায়েম হইয়াছে। তারপর হিন্দুস্তানে এবং পাকিস্তানে দেওবন্দের শাখা প্রশাখা শত শত ওহাবী মাদ্রাসা কায়েম হইয়াছে। দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়িয়া মৌলভী ইলিয়াস নামে একজন বাহির হইয়াছে। তারপর "তাবলীগ জামাত" নাম দিয়া মুহাম্মাদ ইব্‌নে আব্দুল ওহাব নজদীর মত ওহাবী দল গঠন করিয়াছে এবং কলেমা ও নামায শিক্ষার বাহানা করিয়া হাজার হাজার সুন্নী মুসলমানকে মিথ্যা শুনাইয়া দলভুক্ত করিয়া ওহাবী বানইয়াছে। এবং আজ পর্যন্ত প্রায় ৫০ বৎসরের মধ্যে হাজার হাজার সুন্নী মুসলমান তাবলীগ জামাতের দলভুক্ত হইয়া "ওহাবী" জাহান্নামী হইয়াছে। সামান্য শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকদিগকে প্রলোভন দিয়া মিথ্যা মিথ্যা ছওয়াবের কথা শুনাইয়া দলভুক্ত করিতেছে। আমীর বানাইতেছে এবং এই লক্ষ লক্ষ টাকার খরচ তাহাদিগকে সৌদী গভর্ণর অর্থাৎ, ওহাবী গভর্ণর গোপনে দিয়াছে। বর্তমানে "তাবলীগ জামাতের" প্রধান কেন্দ্র নজ্‌দ দেশে আছে এবং দ্বিতীয় কেন্দ্র দেওবন্দ মাদ্রাসা। তৃতীয় কেন্দ্র হইল নয়াদিল্লী মৌলভী ইলিয়াসের বাড়ীতে। ইহাই হইল তাহাদের মূল হাকীকত ইতিহাস। তাহাদের হুকুম সম্বন্ধে কিতাব "হেদায়াতে মাক্কীয়া জওয়াব কেতাবুত তৌহিদ" এবং ফতুয়া হুচ্ছামূল হারামাইনের মধ্যে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের চারি মুজহাবের সমস্ত আলেমগণ এবং ফতুয়া আল কাওকাবাতুস সাহাবীয়ায় ইমামে আহ্‌লূস সুন্নাত মোজাদ্দেদে জামান হযরত আল্লামা আহাম্মাদ রেজা খান সাহেব বেরলভী এবং কেতাব "আচ্ছারে মূল হিন্দিয়ার" মধ্যে হিন্দুস্তানের এবং পাকিস্তানের হাজার হাজার সুন্নী আলেমগণ একমত হইয়া ফতুয়া দিয়াছেন যে, ওহাবী দল বিশেষ করিয়া ওহাবী দলের নেতাগণ যথা:- মুহাম্মদ ইব্‌নে আব্দুল ওয়াহাব নজদী, মৌলভী ইসমাইল দেহলভী, মৌলভী কাসেম নানুতোবী বানিয়ে মাদ্রাসা দেওবন্দ, মৌলভী রশীদ আহ্‌ম্মদ গঙ্গুহী,

মৌলভী খলিল আহম্মদ আমবটী এবং মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সমস্ত কাফের মুরতাদ্ এবং হিন্দুস্তানের ওহাবীগণের নেতা মৌলভী ইসমাইল দেহলভী যার উপর ৭০ কুফূরী ফতুয়া আছে। আল-কাওকাবাতুশ শাহাবিয়া নামক কিতাবে প্রমাণ আছে। তার সম্বন্ধে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের আলেমগণ ফতুয়া দিয়াছেন যে তাকবীয়াতুল ঈমানের আকীদা অনুযায়ী কাফের ও দাজ্জাল এবং ইসমাইলের সমস্ত সমর্থনকারী দাজ্জালের লস্কর। দেখুন কিতাব আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত।

মূল কথা হইল এই যে, "ওহাবী সম্প্রদায় ও তাবলীগি জামাতের মধ্যে সামিল হওয়া, তাহাদিগকে সাহায্য করা, তাদের পিছনে নামায পড়া, তাদের জানাযার নামায পড়া, তাদের সঙ্গে বিবাহ-শাদী করা, তাহাদেরকে সালাম দেওয়া, তাহাদিগকে সম্মান করা, তাহাদের সহিত মোছাফা করা, তাহাদিগকে মসজিদে স্থান দেওয়া, তাদের মাদ্রাসায় সাহায্য করা, তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করা, তাদের সঙ্গে সমাজ কায়েম করা সমস্ত হারাম ও শক্ত গোনাহ বরং কুফুরী। কোরান শরীফ, হাদীছ শরীফ এবং ফেকা ও আকায়েদের কেতাবাদীর দ্বারা প্রমাণিত আছে। তাদের আকীদা সম্বন্ধে "ফতুয়ায়ে আল কাওকাবাতুশ শাহাবিয়া" এবং সাইফুল জব্বার ও কেতাব আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত দেখুন।

বিঃ দ্রঃ যাহারা সুন্নী মুসলমান তাবলীগ জামাতের আকীদাগুলি না জানিয়া মিথ্যা কথার উপর বিশ্বাস করিয়া দলভুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের জন্য তাবলীগ জামাত ত্যাগ করিয়া তওবা করা ফরয।"[১]

এরপর তিনি হুছামুল হারামাইনের সেই সব অভিযোগ তুলে ধরেছেন যে, ওহাবী ও তাবলীগী ওহাবীদের আকীদাগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. আল্লাহ মিথ্যা বলিয়াছেন। (ফতুয়া রশীদ আহমদ গঙ্গোহী)

২. নবী (দঃ) এর এলেম হইতে শয়তানের এলেম বেশী। (বারাহিনে কাতেয়া) ইত্যাদি।

অথচ এসব অভিযোগ যে ভিত্তিহীন তা বহু কিতাবে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যার কিছুটা বিবরণ ইতিপূর্বে উল্লেখও করা হয়েছে। তিনি এর চেয়ে আরও ভিত্তিহীন বক্তব্যও তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি "তাহযীরুন্নাস" গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলেছেন যে, তাতে আছে কাসেম নানুতবী বলেছেন "খাতামুন্নাবিয়্যানের" অর্থ শেষ নবী নয় বরং আফজল নবী। এই কারণে যদি হুজুরের পরে অন্য কোন নবী আসে তবুও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম খাতামুন্নাবিয়্যানে থাকিবেন। "খাতেমুন্নাবিয়্যান" অর্থ শেষ নবী- এই অর্থ করা মূর্খ লোকের কাজ।"

আকবর আলী রেজভী সাহেব কর্তৃক "তাহযীরুন্নাস" গ্রন্থের উপরোক্ত বরাত দেখে বিষয়টি যাচাই করার জন্য আমি আবার আগাগোড়া উক্ত গ্রন্থ খুঁটে খুঁটে দেখলাম।

---

১. বর্তমান প্রচলিত তাবলীগের ইতিহাস, প্রকাশক- মাওলানা আকবর আলী রেজভী ছুন্নী আল-কাদ্‌রী, ঠাকুরাকোণা, মোমেনশাহী।

কিন্তু উক্ত গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করেও কোথাও এমন কথা দেখতে পেলাম না। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত করুন।

বে-শরা পীর-ফকীর

"বে-শরা পীর-ফকীর" বলতে বোঝানো হচ্ছে যারা নিজেদেরকে পীর ফকীর বলে দাবী করে অথচ শরীআত মেনে চলে না। যেমন: নামায পড়ে না, গান-বাদ্য করে, মদ গাঁজা খায়, শরীআতের পর্দা মেনে চলে না, নারী পুরুষ অবাধে পর্দাহীনভাবে একত্রে জিক্‌রের আসর বসিয়ে ঢলাঢলি করে। এদের অনেকে জটা রাখে, অনেকে উলঙ্গ থাকে, অনেকে রঙ-বেরংয়ের তালি লাগানো কিম্ভূত কিমাকার কাপড়-চোপড় পরিধান করে নিজেদের বুযুর্গী প্রকাশের প্রয়াস পায় ইত্যাদি। এরা নিজেদেরকে মা'রেফাতপন্থী বলে দাবী করে। তাদের দাবী হল শরীআত ও মারেফাত ভিন্ন ভিন্ন। শরীআত হল জাহিরী বিধি-বিধান আর মারেফাত হল বাতিনী বিধি-বিধান। জাহিরী শরীআতে যা নাজায়েয মারেফাতের পন্থায় তা জায়েয। অনেকে এ ধরনের পীর-ফকীরকে "ন্যাড়ার ফকীর" বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

এ জাতীয় পীর-ফকীরদের শরীআত পরিপন্থী আকীদা-বিশ্বাস প্রচুর। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটা উল্লেখ ও সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত খণ্ডন পেশ করা হল।

বে-শরা পীর-ফকীরদের মতবাদ

১. শরীআত ও মারেফাত ভিন্ন ভিন্ন। শরীআত হল যাহিরী বিধি-বিধান আর মারেফাত হল বাতিনী বিধি-বিধান। যাহিরী শরীআতে যা নাজায়েয মারেফাতের পন্থায় তা জায়েয। তারা বলে, আমরা যাহিরী শরীআতের উপর নয় বরং বাতিনী শরী'আতের উপর আমল করি।

খণ্ডন

তারা যাহেরী শরীআত ও বাতেনি শরীআত বলে দুটো শরীআত দাঁড় করেছেন, পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, এর কোনো দলীল কুরআন-হাদীছে নেই। তদুপরি শরীআত থেকে তরীকতকে পৃথক করে নিলে শরীআত তথা শরীআতের বিধি-বিধানকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হয়, যা শরীআতকে রহিত সাব্যস্ত করার ন্যায়। এ ধরনের বিকৃতি সাধনকারী লোকদেরকে বলা হয় মুল্‌হিদ বা যিন্দীক।

নিম্নে সহীহ মুসলিম-এর ব্যাখ্যাকার ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী (রহ.)-এর একটি যুক্তিপূর্ণ বিশদ আলোচনার সারাংশ সামান্য বাখ্যাসহ তুলে ধরা হল। তিনি বলেন,

"যিন্দীকদের একটি গ্রুপ এমন তাসাওউফের কথা বলে, যার ফলে শরীআতের বিধানাবলীকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়। তারা বলে, 'শরীআতের এসব বিধি- বিধান নির্বোধ ও সাধারণ লোকদের জন্য। আউলিয়ায়ে কেরাম ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ শরীআতের এসব বিধানাবলীর মুখাপেক্ষী নন। (বরং তারা এ সবকিছুর উর্ধ্বে) কারণ তাঁদের অন্তঃকরণ স্বচ্ছ ও নির্মল। তাই তাদের অন্তরে যা কিছুর উদ্রেক

হয়, তাই তাঁদের থেকে কাম্য' -এটা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কুফ্‌রী কথা। এ ধরনের কথাবার্তা যারা বলে, তাদেরকে কতল করে দিতে হবে। তওবাও তলব করা হবে না। কেননা, এ মতবাদের মধ্যে শরীআতের একটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য আকীদার অস্বীকৃতি পাওয়া যায়। সে আকীদাটি হল, 'আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অবগতির কোনো উপায় নেই।' আর শরীআতের কোন সুস্পষ্ট ও অকাট্য আকীদার অস্বীকৃতি পরিষ্কার কুফর।"[১]

২. এজন্য তারা বাতিনী নামাযের প্রবক্তা। তাদের অনেকে বলে, আমরা বাতিনী নামায পড়ি।

খণ্ডন

পূর্বে আলোচনা করা হল যে, এটা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কুফ্‌রী কথা। যারা এ ধরনের আকীদা রাখে বা এ ধরনের কথাবার্তা যারা বলে, তারা যিন্দীক ও কাফের। বাতিনী নামায নামায নয় বরং বলা যায় সেটা নামাযের কল্পনা। শরীআতে নামায আদায় করতে বলা হয়েছে, নামাযের কল্পনা করতে বলা হয়নি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সশরীরে নামায আদায় করে নামায কীভাবে আদায় করতে হবে তা দেখিয়ে গেছেন। সুতরাং কূলব দ্বারা নামায নয় বরং সশরীরেই নামায আদায় করতে হবে।

৩. তারা বলে, কূলব ঠিক থাকলে সব ঠিক। কূলব ঠিক থাকলে যাহিরী ইবাদত-বন্দেগীর প্রয়োজন পড়ে না। অর্থাৎ, ইয়াক্বীন অর্জন হয়ে যাওয়ার পর আর ইবাদত-বন্দেগীর প্রয়োজন থাকে না।

খণ্ডন

এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে কিছু খণ্ডন পেশ করা হয়েছে। সুরেশ্বরী, আটরশি ও মাইজ-ভাণ্ডারীদের অনুরূপ আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে। পূর্বে সুরেশ্বরী, আটরশি ও মাইজভাণ্ডারী-দের আকীদা-বিশ্বাস পর্যালোচনার প্রাক্কালে এসম্পর্কিত বিবরণ ও তার বিস্তারিত খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।

৪. তারা বলে, কুরআনের ত্রিশ পারা যাহির আর দশ পারা বাতিন। এই বাতিনী দশ পারা বাতিনী পীর-ফকীরদের সিনায় সিনায় চলে আসছে। তাদের কেউ কেউ এমনও বলেন যে, মেরাজে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৯০ হাজার কালাম লাভ করেছিলেন। উলামায়ে কেরাম কেবল ৩০ হাজার কালাম জানেন। অবশিষ্ট ৬০ হাজার কালাম এসব সূফী ফকীরদের নিকটই রয়েছে। যা তারা সিনা পরম্পরায় লাভ করে থাকেন।

---

১. تفسير القرطبي. ج/١١. صفحـ/٢٩-٢٨، فتح الباري ج/١، صفحـ/٢٦٧

খণ্ডন

সিনায় সিনায় চলে আসা এসব বিদ্যা তারা কীভাবে লাভ করলেন? কে কাকে কখন কীভাবে শিক্ষা দিল? তার সনদ কী? সনদ ছাড়া দ্বীনের কোনো কথা গ্রহণযোগ্য নয়। এর সনদ তারা কোনো দিন দিতে সক্ষম হবে না। সনদ ছাড়া দ্বীনের কথা গ্রহণযে-াগ্য হলে যে যা ইচ্ছা তা দ্বীনের নামে চালিয়ে দিতে পারবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুবারক (রহ.) তাই বলেছেন,

الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. (مقدمۂ مسلم)

অর্থাৎ, সনদ দ্বীনের অংশ। সনদ না থাকলে যার যেমন ইচ্ছা তেমন বলে যেত।

এ ধরনের চিন্তাধারা শীআদের থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সাবা শীআদের মধ্যে এই ধারণা ছড়িয়ে ছিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহ্‌লে বাইতকে বিশেষত হযরত আলী (রা.)কে কিছু বিশেষ গোপন তথ্য শিক্ষা দিয়েছিলেন, যা সাধারণ্যে ফাঁস করা হয়নি। তারপর সে মনগড়া একটা তথ্য ব্যক্ত করে সেটাকে সেই গোপন তথ্যের নামে চালিয়ে দিয়ে উম্মতের একটা বিরাট গোষ্টিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের কোনো কথা গোপন রাখেননি। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনি যা প্রাপ্ত হয়েছেন, তা সবই উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কুরআন ও হাদীছ দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه.﴾

অর্থাৎ, হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা তোমার নিকট প্রেরিত হয়েছে, তা পৌঁছে দাও। অন্যথায় তোমার রেছালাতের বিষয় পৌঁছালে না। (সূরা: ৫–মায়িদা: ৬৭)

বিদায় হজ্জের ভাষণে লক্ষাধিক সাহাবীর সম্মুখে তিনি তিনবার বলেছিলেন,

ألاهل بلغت؟ ألاهل بلغت؟ ألاهل بلغت؟

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি? তিনবার তিনি এভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। সমবেত সাহাবীগণ উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি আল্লাহ্‌কে এ মর্মে স্বাক্ষী রেখে বলেছিলেন,

اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।

৫. তারা গায়রে মাহ্‌রাম নারী-পুরুষের পর্দাহীনভাবে যিকির ও ঢলাঢলিকে বৈধ বলে কার্যত গায়রে মাহ্‌রাম নারী-পুরুষের মধ্যে পর্দা ফরয- এই বিধানকে অস্বীকার করে।

খণ্ডন

গায়রে মাহ্‌রাম নারী-পুরুষের মধ্যকার পর্দার বিধান ফরয। এটা نصوص قطعيہ দ্বারা প্রমাণিত। এরূপ বিষয়কে অস্বীকার করা কুফ্‌রী। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ.﴾ (সূরা: ২৪-নূর: ৩১)

৬. তাদের মতে যেকোনো পুরুষ যেকোনো নারীকে ভোগ করতে পারে।

এ জাতীয় ফকীরদের অনেকে অবাধ যৌন মিলনকে সিদ্ধি লাভের সহায়ক মনে করে।[১] তারা মনে করে পঞ্চ রসই শক্তির আধার। পঞ্চ রস হল: মল, মূত্র, বীর্য, ঋতুর রক্ত ও শ্লেষ্মা। তারা নিজ স্ত্রীর বা পরস্ত্রীর মিলনে যে রস নিঃসৃত হয়, তা সেবনকে 'রতি সেবন' বলে। কেউ কেউ 'লাল সাধন' কেউ কেউ 'গুটি সাধন'ও বলে। তারা একে অপরের স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনে অসন্তোষ প্রকাশ করে না। এই অসন্তোষ প্রকাশ না করা তাদের মতে আত্মশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ। তারা বলে, নারীগণ হল বহতা নদীর মত। নদীর মধ্যে যে কোন ময়লা-আবর্জনা পড়লে যেমন নদী নাপাক হয় না, তেমনি নারীর যোনীতে পর পুরুষের বীর্য পড়লে তা নাপাক হয় না। তারা আরও বলে, নারীগণ গঙ্গা স্বরূপ আর তাদের মিলন প্রত্যাশী পুরুষগণ হল স্নানার্থী তীর্থ যাত্রী স্বরূপ। আর গঙ্গা স্নানে তথা যৌন মিলনে কারও কোনো আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না।

তারা বলে, দলে দলে একত্রে স্ত্রী পুরুষ মিলে নাচ গান করলে কামরিপু দমন হয়। যেমন একে অপরের স্ত্রীকে ব্যবহার করলে হিংসা রিপু দমন হয়। তারা অবাধ যৌনাচারিতায় যে বীর্যপাত হয় তা ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে রুটি বানিয়ে ভক্ষণ করে। এটাকে তারা নাম দিয়েছে "প্রেমভাজা"। (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা)

খণ্ডন

এসব কথার মাধ্যমে তারা যেনাকে বৈধ করেছে। যেনা কুরআন হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য অনুসারে হারাম। আর যেনা হারাম হওয়ার বিষয়টা একটা বদীহী বা সর্বজন-বিদিত বিষয়। এরূপ বিষয়কে অস্বীকার করা কুফ্‌রী। অতীতে মুরজিয়া নামক একটা গোমরাহ ফিরকার অনুরূপ আকীদা ছিল। তারা বলত, নারীগণ বাগানের ফুলের ন্যায়। যে ইচ্ছা সে ভোগ করতে পারে- বিবাহ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই।[২] এ আকীদা উম্মতের সর্বসম্মত মতে কুফ্‌রী।

৭. তাদের মতে গান-বাদ্য করা বৈধ।

খণ্ডন

গান-বাদ্য হারাম। কোন হারামকে হালাল মনে করা কুফ্‌রী। গান-বাদ্য হারাম এ সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৮. তাদের মতে মদ গাঁজা খাওয়া বৈধ।

তারা শুধু মদ গাঁজা নয়, হায়েয, নেফাস, বীর্য, মল, মুত্র ইত্যাদিও ভক্ষণ করে। তারা বলে, এগুলো ভক্ষণ দ্বারা রিপু দমন হয়।

১. এটাকে শয়তানিয়্যাত সিদ্ধি বলা হলেই যথার্থ হবে।

২. كذافي مقدمة عقيدة الطحاوي

খণ্ডন

মদ গাঁজা সম্পূর্ণ হারাম। এটা শয়তানী কর্ম। এটা نصوص قطعيه দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ.﴾

অর্থাৎ, মদ, জুয়া, বেদী ও তীর (নিক্ষেপের মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ) এগুলো শয়তানের কাজ। অতএব তা থেকে বিরত থাক। (সূরা: ৫-মায়িদা: ৯০)

এমনিভাবে হায়েয, নেফাসের রক্ত, বীর্য, মল, মুত্রও হারাম। কুরআন হাদীছের বহু ভাষ্য দ্বারা এগুলো হারাম হওয়া প্রমাণিত। আর কোন হারামকে হালাল মনে করা কুফ্‌রী।

৯. তারা পীর ফকীরদের মধ্যে আল্লাহ্‌র হুলূলের আকীদা রাখে অর্থাৎ, তারা মনে করে পীর-ফকীরদের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রকাশ ঘটে। তারা শিক্ষা দেয়, "যেই মুরশিদ সেহি খোদা"। এভাবে তারা পীর-মুরীদির অন্তরালে শির্কের শিক্ষা প্রদান করে। তারা পীর ফকীরদের মধ্যে আল্লাহ্‌র হুলূলের আকীদা রাখে-এ প্রসঙ্গে তাদের বহু গান বা কবিতার কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন:

লাল মামুদ গেয়েছে,
আল্লাহ নবী দুই অবতার
এক নূরেতে দুই মিশকাত কর
এ নূরে সাধিলে নিরঞ্জনকে
অমনি তাকে যাবে ধরা।

আরও উল্লেখ করা যায়,

মন পাগলরে গুরু ভজনা
গুরু বিনে মুক্তি পাবি না
গুরু নামে আছে শুধা,
যিনি গুরু তিনিই খোদা,
মন পাগলরে গুরু ভজনা।

খণ্ডন

পূর্বে সুরেশ্বরী পীরের আকীদা-বিশ্বাস পর্যালোচনা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে যে, হুলূলের আকীদা শিরক। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল আল্লাহ্‌র সত্তা কারও সত্তার মধ্যে মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হয় না বা প্রবেশ (حلول) হয় না এবং তাঁর সত্তার মধ্যেও কেউ মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হয় না। খৃষ্টানদের ধারণায় আল্লাহ্ তাআলা হযরত ঈসা (আ.)-এর মধ্যে প্রবেশ حلول করেছিলেন অর্থাৎ, অবতারিত হয়েছিলেন। হিন্দুদের বিশ্বাস মতে ঈশ্বর মানুষ, প্রাণী, বৃক্ষ পাথর সবকিছুর মধ্যে প্রবেশ (حلول) করেন অর্থাৎ, অবতারিত হন। রূপ বিশ্বাস পোষণকারীদেরকে হুলূলিয়া (حلوليه) বলা

হয়। এরূপ বিশ্বাস কুফ্‌রী। মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী বলেন, যেসব মূর্খ লোক বলে, আল্লাহ্‌র খাস ওলীগণ আল্লাহ্‌র সত্তার মধ্যে এমনভাবে লীন হয়ে যান, যেমন বরফ পানির মধ্যে এবং বিন্দু দরিয়ার মধ্যে লীন হয়ে যায়, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং স্পষ্ট কুফ্‌র।[১] কাযী ইয়ায (রহ.) الشفا بمعرفة حقوق المصطفى কিতাবে বলেছেন, "সকল মুসলমানের ইজমা যে, যারা হুলূলের প্রবক্তা তারা কাফের।"

১০. তারা পীর-ফকীরদেরকে খোদার স্তরে নয় বরং খোদার চেয়ে উপরে তুলে নিয়ে যায়। তাদের মুখ থেকে বের হয়,

খোদার ধন রাসূলকে দিয়া
খোদা গেছেন খালি হইয়া
রাসূলের ধন খাজাকে দিয়া
রাসূল গেছেন খালি হইয়া
.... ইত্যাদি।

খণ্ডন

এরূপ আকীদা বিশ্বাস যে কুফ্‌রী তার বিশদ বিবরণ প্রদান নিষ্প্রয়োজনীয়। কারণ, এখানে রসূলকে আল্লাহর স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং আল্লাহকে নিষ্ক্রীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এ ছাড়াও এসব বে-শরা পীর-ফকীররা পীর বা পীরের কবরকে সাজদা করে, তারা মহিলা মুরিদদের থেকে খেদমত নেয়, মেয়েলোক নিয়ে জিকির করে, ঢলাঢলি করে। ইত্যাদি বহু শরীআত-বিরুদ্ধ আকীদা ও আমলের অনুসারী তারা।

বাউল সম্প্রদায়

"বাউল" শব্দের উৎপত্তি

"বাউল" শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ লক্ষ করা যায়। কেউ কেউ বলেছেন, বাউল শব্দটি আরবী "আউয়াল" শব্দ থেকে উদ্ভূত এবং তা থেকে বাউল। কেউ কেউ বলেন, বাউল্যা থেকে বাউলা ও বাউলা থেকে বাউল আর "আউলিয়া" থেকে আউল্যা, আউল্যা থেকে আউলা ও আউলা থেকে আউল। আউল এবং বাউল শব্দদ্বয় সমার্থবোধক। কেউ কেউ বলেন, ফারসী "বা" প্রত্যয় অর্থের সাথে গ্রাম্য "উল" (যার অর্থ সন্ধান) যোগ হয়ে বাউল হয়েছে। এখন বাউল শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি সন্ধানের সাথে বা মনের মানুষের সন্ধানে বর্তমান। যেমন মুসলিম সাধকগণ নিজেদেরকে তালিবুল মাওলা বলেন, তেমনি বাউলগণ নিজেদেরকে বাউল বা তালিবুল মাওলা বলেন। কেউ কেউ বলেন, সংস্কৃত "বাতুল" (অর্থ উন্মাদ) শব্দের প্রাকৃত রূপ "বাউর" ও হিন্দী শব্দ "বাউরা" (অর্থ পাগলা) থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি। তাদের ব্যাখ্যামতে বাউলগণ পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহারে অন্যদের

---

১. عقائد الاسلام. عبد الحق حقانی

থেকে স্বতন্ত্র ও আপনভাবে মশগুল ও উন্মাদ প্রকৃতির হয়ে থাকে বিধায় তাদেরকে বাউল বলা হয়।

বাউলদের নাম

বাংলাদেশে ও পশ্চিম বঙ্গে লালন ও তার অনুসারী ফকীরদেরকে বাউল, বে-শরা ফকীর, নেড়ার ফকীর ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। কদাচিৎ বাউল নামেও তারা পরিচিত।

বাউলদের শ্রেণী ভাগ

মোটামুটিভাবে বাউলদের দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হয়। যথা:–

১. হিন্দু জাতির বাউল তথা বৈষ্ণব, বৈষ্ণব-বাউল, বাউল-মোহান্ত, বৈষ্ণব-রসিক প্রভৃতি।

২. মুসলমান জাতির বাউল তথা পীর, কুতুব, সাঁই, ফকীর প্রভৃতি।

বাউল মতের প্রবর্তক ও এই মতের উদ্ভবকাল

বাউল মতের উদ্ভবকাল ও এ মতের প্রবর্তক কে এ সম্পর্কেও পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ লক্ষ করা যায়। বাউল গবেষক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, মুসলমান নেড়া বা বে-শরা ফকীরই বাউল ধর্ম সাধনার আদি প্রবর্তক। কেউ কেউ বলেন, বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের আদি গুরু চৈতন্যদেব।[১] বাউল গবেষক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এই শ্রেণীর সকল সাধকই বাউল। কেউ কেউ বলেন, বাউল মতের আদি প্রবর্তক বলে খ্যাত ব্যক্তির নাম হল আউল চাঁদ। বাউল গবেষকদের অনেকের মতে মুসলমান মাধব বিবি ও আউল চাঁদই এ মতের প্রবর্তক। মোটামুটিভাবে ১৭ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকেই বাউল মতের উন্মেষ।

বাউলদের কতিপয় দর্শন ও রীতি-নীতি

বিস্তারিত অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাউলগণ নির্দিষ্টভাবে হিন্দু বা মুসলিম কোন সম্প্রদায়েরই আচার-আচরণ বা দর্শনের অনুসারী নয়।[২] বরং বাউলদের অনেকগুলো নিজস্য বিশেষ দর্শন রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটা দর্শন ও ইসলামের দৃষ্টিতে সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করা হল।

---

১. চৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮০ ও মৃত্যু ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে। তিনিই বাংলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক। গৌড়ীয় বাউল সম্প্রদায় তাকেই আদি বাউল বলেন।

২. কোন কোন বাউল গবেষক বাউলদেরকে মুসলমান আখ্যায়িত না করলে নাখোশ হন, এমনকি বাউলদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাত লালন শাহকে বে-শরা ফকীর বললেও তারা নাখোশ হন। তাদের যুক্তি হল লালন শাহ তার গানে বহু স্থানে আল্লাহ, রসূল, নামায, আখেরাত ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব তাকে বে-শরা আখ্যায়িত করা অযৌক্তিক। কিন্তু এসব গবেষক সম্ভবত জানেন না যে, শুধু আল্লাহ, রসূল ইত্যাদি মুখে বললেই বা স্বীকার করলেই (পরবর্তি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

১. চারচন্দ্র ভেদতত্ত্ব

"চারচন্দ্র" বলতে বোঝায় শুক্র, রজঃ, বিষ্ঠা ও মুত্র। বাউলদের মতে সিদ্ধি অর্জন করার জন্য এই চারচন্দ্র সাধনার গুরুত্ব অপরিসীম। বাউলদের দাবী হল চারচন্দ্র সাধনায় কামজয় হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা যোগে বাউলগণ প্রকৃতি আশ্রয়ী হয়ে সাধনা করতে গিয়ে তারা পানক্রিয়া অনুষ্ঠান করে এ সব পান করে থাকে।

এই চারচন্দ্র-ভেদ সাধনার জন্য বাউলরা হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে সকলের কাছে অত্যন্ত নিন্দিত; যদিও বাউল সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকে তা খুবই প্রশংসনীয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মল, মুত্র, মনী বা বীর্য ও ঋতু স্রাব- এসব ভক্ষণ করা হারাম। অতএব হারামকে যারা হালাল মনে করে তাদের ঈমান থাকে না। আর হারাম উপায়েকৃত কোন সাধনা ইসলামে স্বীকৃত ও কাম্য নয়।

উল্লেখ্য, বাউলগণ শুক্র বা বীজকে ঈশ্বর আখ্যায়িত করে থাকেন। তাই সিদ্ধি অর্জনের জন্য শুক্র বা বীজ ভক্ষণ তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হওয়ারই কথা। বাউল গবেষক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লালন শাহ তথা বাউল সম্প্রদায়ের ধর্মমত সম্পর্কে বলেন, "বাউলগণ পুরুষদের বীজরূপী সত্তাকে ঈশ্বর বলেন। বাউলদের মতে এই বীজসত্তা বা ঈশ্বর রস-ভোক্তা, লীলাময় ও কাম-ক্রীড়াশীল।"

বীজকে ঈশ্বর আখ্যায়িত করার কারণে অনেকে বাউলদেরকে বীজেশ্বরবাদী বলে অভিহিত করে থাকেন। এই বাউলদের অনেকে বলে থাকেন, "বীজমে আল্লাহ"।

উল্লেখ্য, বীজকে ঈশ্বর আখ্যায়িত করে বাউলগণ আল্লাহর পরিচয়কে বিকৃত করেছেন। এরূপ ব্যাখ্যা ও পরিচয়ে আল্লাহকে বিশ্বাস করা অবিশ্বাস করারই নামান্তর। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বাউল দর্শন একটা ইসলাম বিবর্জিত ও ঈমান পরিপন্থী দর্শন।

২. মনের মানুষ তত্ত্ব

বাউলগণ আল্লাহ, অচিন পাখী, মনের মানুষ, আলেক সাঁই ইত্যাদিকে সমার্থবোধক মনে করে থাকেন। আত্মসন্ধানের মাধ্যমে তাদের এই কথিত "মনের মানুষ"

(পূর্ববর্তি পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা)

সে শরীআতপন্থী হয়ে যায় না, যদি না তার আকীদা-বিশ্বাস শরীআতের বিচারে যথার্থ ও সহীহ বলে বিবেচিত হয়। তিনি আল্লাহ, রসূল ও দ্বীন ধর্মকে ইসলাম-বর্ণিত ব্যাখ্যায় ও ইসলামপন্থীদের মত করে বিশ্বাস করেননি বরং নিজস্য ব্যাখ্যা অনুসারে বিশ্বাস করেছেন, যা ঈমানের সংজ্ঞায় যথার্থ বলে বিবেচিত নয়। তদুপরি বাউলদের শরীআত পরিপন্থী দর্শনসমূহ বিচার করলেও বাউলদেরকে বে-শরা আখ্যায়িত করা বৈ গত্যন্তর থাকে না। শরীআতের আলোকে বাউলদের দর্শনকে বিচার করলে কোনোক্রমেই তাদেরকে শরীআত অনুসারী বলে স্বীকৃতি দেয়ার অবকাশ থাকে না। উল্লেখ্য, লালন শাহও চারচন্দ্র সাধনার প্রবক্তা ছিলেন। এমনকি তিনি গৌর, হরি, রাম, নারায়ণ প্রমুখকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার হিসাবে বিবেচনা করতেন, যা সন্দেহাতীতভাবে একটা কুফ্‌রী আকীদা। এ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৫৯। এমন হারাম ভক্ষণকারী ও কুফ্‌রী আকীদা পোষণকারীকে বে-শরা বললে যদি কেউ অসন্তুষ্ট হন, তাহলে সে অসন্তুষ্টি দূর করার দায় দায়িত্ব একমাত্র তারই থেকে যায়।

তথা খোদাকে সন্ধানই তাদের প্রধান লক্ষ্য। তাদের কথিত "মনের মানুষ"-এর কি অর্থ তা নিয়ে বাউল গবেষকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল অন্তরস্থিত নূর, যে নূর দ্বারা মুহাম্মাদকে তৈরি করা হয়েছিল অর্থাৎ, এর দ্বারা নূরে মোহাম্মাদীকে বোঝানো হয়েছে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী মনের মানুষকে সন্ধান করা আল্লাহ্কে সন্ধান করার নামান্তর নয়। কেউ কেউ বলেন, "মনের মানুষ" দ্বারা আল্লাহকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ মানুষের অন্তরে সমাহিত হয়ে থাকেন। যাহোক এভাবে বাউলগণ আল্লাহ্র পরিচয়কে অস্পষ্ট করে তুলেছেন। ইসলামী আকীদামতে নূরে মুহাম্মাদী আর আল্লাহ সমার্থবোধক নয়। তাছাড়া আল্লাহ কোনো মনের মানুষ নন। তিনি সমস্ত উত্তম গুণাবলীর আধার এক সত্তা। তাঁর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিদ্যমান। তিনি কোনো মানুষের অন্তরে অবস্থান গ্রহণ করেন না। তিনি স্থান ও কালের উর্ধ্বে। অতএব বাউল কথিত মনের মানুষকে সন্ধান করা আদৌ আল্লাহ্কে সন্ধান করার সমান্তরাল নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাউলদের ধারণায় আল্লাহ ও রসূলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যিনি আল্লাহ তিনিই রসুল। তাই তাদের কথিত মনের মানুষের ব্যাখ্যা আল্লাহ ও রসূল উভয়ই হতে পারে তাতে কোন বৈপরিত্য নেই।

৩. আল্লাহ ও রসূল এক হওয়ার তত্ত্ব

কেবলই বলা হল বাউলদের ধারণায় আল্লাহ ও রসূলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যিনি আল্লাহ তিনিই রসূল। এ প্রসঙ্গে বাউলশ্রেষ্ঠ লালন বলেন,

আছে আল্লাহ আছে রাসূল
এতে কোন ভুল নাই,
আল্লাহ স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা,
এই এক 'সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করে সার,
যে নিরঞ্জন সেই নূর নবী নামটি ধরে,
কে পারে সে মকরউল্লার মকর বুঝিতে,
আহাদে আহামদ নাম হয় জগতে,
আত্মতত্ত্বে ফাজিল যে জনা,
জানতে পায় নিগূঢ় কারখানা,
হল রসূল রূপে প্রকাশ রব্বানা।

উল্লেখ্য, আহাদ ও আহমদের মধ্যে শুধু একটি মীম হরফের পার্থক্য এছাড়া আহাদ তথা আল্লাহ ও আহমদ তথা নবীর মধ্যে আর কোনো পার্থক্য নেই- এরূপ দর্শন মাইজ- ভাণ্ডারীগণও পোষণ করে থাকেন। এনায়েতপুরীদের মতবাদ পর্যালোচনা প্রসঙ্গে এ মতবাদটার কুফরী মতবাদ হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪. মুরশিদ তত্ত্ব

বাউলদের একটা প্রসিদ্ধ তত্ত্ব হল মুরশিদ তত্ত্ব। একে পীরতত্ত্ব বা গুরুতত্ত্বও বলা হয়। তারা আল্লাহ ও রসূলের মধ্যে যেমন পার্থক্য করে না, তদ্রূপ আল্লাহ ও মুর্শিদের মধ্যেও কোনো পার্থক্য করে না। এ প্রসঙ্গে তাদের প্রসিদ্ধ উক্তিটা উল্লেখ্য- "যেহি মুরশিদ সেহি খোদা"। লালন (মুর্শিদকে লক্ষ করে) বলেন,

আপনি খোদা আপনি নবী
আপনি সেই আদম ছবি
অনন্ত রূপ ধরে ধারণ
কে বোঝে তার নিরাকারণ
নিরাকার হাকিম নিরঞ্জন
মুর্শিদ রূপ ভজন পথে।

তিনি আরও বলেন,

মোরশেদ বিনে কি মন ধন আর আছে রে এ জগতে
মোরশেদের চরণ সুধা
পান করলে হবে ক্ষুধা
করনা আর দেলে দ্বিধা
যেহি মোরশেদ সেহি খোদা।

উল্লেখ্য, পীরকে খোদা আখ্যায়িতকারী ফকীরগণ ফানা ফিল্লাহ্র অজুহাত দেখিয়ে পীর ও খোদার মধ্যে পার্থক্য না থাকার কথা বলে থাকেন। তারা মানসূর হাল্লাজ প্রমুখ মজযূবের জযবার হালাতে উক্ত কিছু বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে মতলব উদ্ধারের চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু প্রথমত কথা হল ফানা ফিল্লাহ্র অর্থ সবকিছু আল্লাহ হয়ে যাওয়া নয় বরং সবকিছু আল্লাহ্র জন্য হয়ে যাওয়া। সবকিছু আল্লাহ হয়ে যাওয়া এবং সবকিছু আল্লাহ্র জন্য হয়ে যাওয়া- এ দুটোর মধ্যে বহু ব্যবধান। দ্বিতীয়ত কোন মাজযূবের জযবার হালাতের কোন কথা দলীল নয়। দলীল হল কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রসূল।

৫. সর্বধর্ম সমন্বয়ের দর্শন

"বাংলার বাউল দর্শন" গ্রন্থে বলা হয়েছে, বাউল ধর্মের লক্ষ্য হল সর্বধর্মের সার সমন্বয় সাধন। সর্বধর্মের মূল লক্ষ্য আত্মার মুক্তি। আত্মার মুক্তি বা মোক্ষলাভের মূল বাণীসমূহ ও মতাদর্শের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে বাউল মতবাদ।

এই সর্বধর্ম সমন্বয় দর্শনের কারণেই বাউলগণ একদিকে খোদা রসূলে বিশ্বাসের কথাও বলেন আবার রাম, নারায়ণ প্রমুখকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার হিসাবেও স্বীকার করেন। একই কারণে স্পষ্টত মুসলমানদের পরিভাষায় আল্লাহ ও রসূলের পরিচয় প্রদান ও আল্লাহকে সন্ধানের সোজা ইসলামী তরীকা থেকে বিচ্যুত হয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। এই একই কারণে বাউল রচিত সঙ্গিত বা গানে হিন্দু ও মুসলমান

উভয় ধর্মের মতবাদই প্রাধান্য পেতে থাকে।[১] "বাংলার বাউল দর্শন" গ্রন্থে বলা হয়েছে, হিন্দু বাউল যেমন সূফী ভাবধারাকে মেনে নেয়, তেমনি হিন্দু, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব মতবাদকেও মুসলমান জাতির বাউল তথা ফকীর, দরবেশ প্রভৃতি সম্প্রদায় এড়িয়ে থাকেনি।

আল্লাহ্‌র নিকট ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.﴾

অর্থাৎ, ইসলাম ব্যতীত যে অন্য ধর্ম সন্ধান করবে, আদৌ তার থেকে তা কবূল করা হবে না। এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ৮৫)

অতএব সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা একটা কুফ্‌রী প্রচেষ্টা। আকবারের দ্বীনে ইলাহী এবং এনায়েতপুরী ও মাউজভাণ্ডারী প্রমুখের মতবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৬. ওহী ভিত্তিক কোন ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার

বাউলরা ঐশী শাস্ত্র বা জিব্রাঈল মারফত কোন নবীর উপর প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রভিত্তিক কোন ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা মানে না। কারণ এ সবের ভিত্তি হল চেতনা। বাউলরা সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও দল চেতনা স্বীকার করে না। তারা দেশ জাত-বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে কেবল মানুষকে জানতে, মানতে ও শ্রদ্ধা জানাতে চায়। মানুষের ভিতর মনের মানুষকে খুঁজে পেতে চায়।[২]

বাউলগণ তাদের কথিত সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা থেকেই ওহী ভিত্তিক ধর্মকে অস্বীকার করেছেন। এরূপ আকীদা-বিশ্বাস সন্দেহাতীতভাবেই কুফ্‌রী।

৭. সংসার ত্যাগ

বাউলগণ সংসার বিরাগী হয়ে থাকেন। নিষ্ক্রিয়তা, জীবন-বিমুখতা ও আত্মসন্ধানের মাধ্যমে তাদের কথিত "মনের মানুষ"-কে সন্ধানই তাদের প্রধান লক্ষ্য। ইসলাম এরূপ বৈরাগ্যকে সমর্থন করে না। হাদীছে এসেছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ياعثمان! إن الرهبانية لم تكتب علينا، أمالك فيَّ أُسْوَةٌ حسنة. (رواه أحمد برقم ٢٥٧٦٩ واسناده صحيح، وراه ابن حبان في صحيح برقم٩)

অর্থাৎ, হে উছমান, আমাদেরকে সন্নাসবাদের বিধান দেয়া হয়নি। তোমার জন্য কি আমার মধ্যে উত্তম আদর্শ নেই? (মুসনাদে আহমদ ও সহীহ ইবনে হিব্বান)

১. বাংলার বাউল দর্শন, মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, প্রকাশনায়: বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর-১৯৯২, পৃষ্ঠা ১৯১-১৯২।

২. বাংলার বাউল দর্শন, মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, প্রকাশনায়: বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর-১৯৯২, পৃষ্ঠা ১৯৫।

অতএব ইসলামে কোন সন্যাসবাদ নেই। বরং ইবাদতও করতে হবে, সেই সাথে সাথে ঘর সংসার এবং সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক সামঞ্জস্যও রাখতে হবে। আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য মেহনত-সাধনাও করতে হবে, আবার বিবি বাচ্চার খোঁজ-খবরও রাখতে হবে, তাদের ব্যাপারে ইসলাম যে দায়িত্ব অর্পন করেছে তাও পালন করতে হবে।

৮. সঙ্গীত সাধনা

সঙ্গীত বাউলদের সাধনার প্রধান অঙ্গ। বাউলদের গানগুলো "মারফতী" বা "মুর্শিদা" গান নামে অভিহিত হয়। উত্তর বঙ্গে 'বাউল গান" সাধারণত "দেহ তত্ত্বের গান" নামে এবং পশ্চিম বঙ্গে 'বাউল গান' নামে পরিচিত। এসব গানের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব[১] প্রভৃতি সব ধর্মের মতবাদই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কারণ, তারা নির্দিষ্ট কোন ধর্মের অনুসারী নয় বরং তারা সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রবক্তা।

বাউলদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাত ব্যক্তি লালন (ফকীর) শাহ তার লালন গীতের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। অন্যান্য প্রসিদ্ধ বাউল কবিদের মধ্যে ছিলেন উত্তর বঙ্গের গঙ্গারাম, জগাকৈবর্ত পদ্মলোচন, শিখা ভুইমালী, কাঙ্গালী ও সিরাজসাঁই, সিলেটের মুনীরুদ্দীন ফকীর ও কুষ্টিয়া কুমারখালীর হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ)। রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাউলের রীতি অনুসরণ করে বহু গান লিখেছেন।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত দর্শনসমূহ ছাড়াও বাউলদের 'প্রেমতত্ত্ব', 'রূপ-স্বরূপ তত্ত্ব' আত্মিক-বিবর্তনবাদ' প্রভৃতি দর্শন রয়েছে।[২]

সর্বেশ্বরবাদ/সর্বখোদাবাদ

(وحدة الوجود/Pantheism)

"সর্বেশ্বরবাদ"[৩] বা "সর্বখোদাবাদ" বলতে বোঝায় 'সবকিছুই খোদা'-এই মতবাদ।[৪] ইংরেজিতে একে বলা হয় Pantheism (প্যান্‌থিইজ্‌ম Pan=all [সব] theo=God [ঈশ্বর]) আর আরবীতে বলা হয় وحدة الوجود (ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ)। কিংবা বলা যায় এটা এমন এক মতবাদ যাতে সমগ্র মহাবিশ্বই খোদা–এই মত পোষণ করা হয়।

১. বৈষ্ণব: হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর উপাসকগণ বৈষ্ণব নামে পরিচিত। ৭ম শতাব্দিতে রামানুজ দাক্ষিণাত্যে হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথা ও কঠোরতা থেকে মুক্ত এই বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করেন। ১৪শ শতাব্দিতে রামানন্দ এর রূপায়ন করেন। ১৬শ শতাব্দিতে চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে এই ধর্মের বিস্তৃতি ঘটান।

২. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য "বাংলার বাউল দর্শন", লেখক: মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, প্রকাশনায়: বাংলা একাডেমী।

৩. "সর্বেশ্বরবাদ" শব্দটি সম্ভবত হিন্দুদের মধ্যে যারা অদ্বৈতবাদ–এর সমান্তরাল হিসাবে সর্বেশ্বরবাদকে ব্যবহার করেন, তাদের সৃষ্টি। নতুবা মুসলমানগণ ঈশ্বর শব্দকে খোদা ও আল্লাহ শব্দের সমান্তরালে ব্যবহার করেন না। তারা وحدة الوجود -এর প্রতি পরিভাষা হিসাবে "সর্বখোদাবাদ" শব্দ ব্যবহার করতে পারেন।

৪. ইংরেজিতে বলা হয়, the doctrine that the whole universe is god

এ মতানুসারে স্রষ্টার বাইরে সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকাকে অস্বীকার করা হয় এবং বলা হয় তিনিই (আল্লাহই) সবকিছু। এ মতবাদে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে ঐক্য প্রকাশ করা হয় এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির অস্তিত্বে অভেদত্ব প্রকাশ করা হয় বিধায় একে বলা হয় وحدة الوجود। আরবী একথাটার অর্থ হল অস্তিত্বের ঐক্য। সূফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় “তাওহীদ”, “আইনিয়্যত” এবং “মাজহারিয়্যাত” ইত্যাদিও এই মাসআলারই বিভিন্ন শিরোনাম।

মুসলিম মনীষীদের মধ্যে সর্বপ্রথম শায়খে আকবার ইবনুল আরাবী এই মতবাদটা উদ্ভাবন করেন এবং তার অনুসারীগণ এর প্রচার-প্রসার ঘটান।[১] ইবনুল আরাবী এই মতবাদটা ব্যক্ত করতে যেয়ে বলেন, وجود المخلوقات عين وجود الخالق অর্থাৎ, সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব হুবহু আল্লাহ্র অস্তিত্ব। এখানে তিনি عینیت বা হুবহুতা বলে এই وحدة الوجود তথা স্রষ্টা ও সৃষ্টির অস্তিত্বের ঐক্য ও অভেদতত্ত্বকেই বুঝিয়েছেন। ফারসী কবি ফরীদুদ্দীন আত্তার, সাদরুদ্দীন, নাবলূসী প্রমুখ তাদের লেখাতে ইবনুল আরাবীর এই وحدة الوجود মতবাদটা তুলে ধরেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন। নাবলূসী এর ব্যাখ্যা করে বলেন, আল্লাহ্ই একমাত্র অস্তিত্ববান সত্তা, এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তিনি সার্বিক-সমগ্র (کلی), অন্যের দ্বারা তিনি অস্তিত্ববান (قائم بالغير) নন বরং তিনি স্বকীয় সত্তায় অস্তিত্ববান (قائم بالذات)। নাবলূসী এই وحدة الوجود –এর আলোকে প্রদত্ত কালিমার ব্যাখ্যাকেই বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করেছেন। তবে আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উলামায়ে কেরাম তার অভিমতকে মেনে নেননি।

এই পরিভাষার পাশাপাশি হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.) আর একটি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। সেটি হল وحدة الشهود (ওয়াহ্দাতুশ শুহূদ)। এর অর্থ হল সমস্ত অস্তিত্ববান জিনিসের মধ্যে শুহুদ তথা দৃষ্টিপাত শুধু একটি সত্তার প্রতি।

এই وحدة الوجود (ওয়াহ্দাতুল উজূদ) কথাটার সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম বলেছেন, এর দ্বারা প্রকৃত ও শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয় বরং এটা হল এক ধরনের রূপক কথা। রূপকভাবে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের পূর্ণাঙ্গতার বিপরীতে অন্যান্য সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বকে নেতিবাচ্যতার পর্যায়ে ধরে নেয়া হয়েছে। আহছানুল ফাতাওয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, কেননা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব পূর্ণাঙ্গ এবং তাঁর বিপরীতে অন্যান্য সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব এতই অপূর্ণ যে, তা প্রায় নেতিবাচ্যতার পর্যায়ভুক্ত। সাধারণ বাগধারায় পূর্ণাঙ্গের বিপরীতে অপূর্ণাঙ্গকে অস্তিত্বহীন বলা হয়। যেমন: কোন বড় জবরদস্ত আল্লামার বিপরীতে সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিকে অথবা কোন প্রসিদ্ধ বীর পাহলোয়ানের বিপরীতে সাধারণ ব্যক্তিকে বলা হয়, ‘এ তো তার সামনে কিছুই নয়’। অথচ ঐ সাধারণ ব্যক্তিটা অস্তিত্বহীন তা নয় বরং তার স্বতন্ত্র সত্তা ও গুণাবলী বিদ্যমান। কিন্তু পূর্ণাঙ্গের বিপরীতে তাকে ‘নাস্তি’ সাব্যস্ত করা হয়। কিংবা

১. অমুসলিমদের মধ্যে এথেন্সের দার্শনিক জেনো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্টোয়িক দর্শনে সর্বদেবত্ববাদ তথা Pantheism ছিল বলে জানা যায়। দ্রঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত “গ্রিক দর্শন প্রজ্ঞা ও প্রসার” মে-১৯৯৪ সংস্করণ, পৃ. ১৫৩।

যেমন কোন সম্রাটের দরবারে কেউ আবেদন পেশ করলে সম্রাট তাকে কোন ছোট অধীনস্ত শাসকদের শরণাপন্ন হতে পরামর্শ দেন। আর লোকটা প্রতি উত্তরে বলে, হুজুর! আপনিই সবকিছু। তখন এর অর্থ এই হয় না যে, সমস্ত অধীনস্ত শাসক সম্রাটের সঙ্গে একাকার এবং অন্যান্য শাসকদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নেই, বরং “আপনিই সবকিছু” কথাটার উদ্দেশ্য হল- আপনার সামনে সমস্ত অধীনস্থ শাসক নাস্তির পর্যায়ে। অনুরূপভাবে (রূপক অর্থে) সুফিয়ায়ে কিরাম আল্লাহ তাআলার পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্বের সামনে সমস্ত মাখলূকের অস্তিত্বকে ‘নেই’ সাব্যস্ত করেন। হযরত শেখ সাদী (রহ.) দুটো উদাহরণের মধ্যে এর খুব সুন্দর বিবরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন,

১ নং উদাহরণ: তুমি দেখে থাকবে মাঠে-ময়দানে রাতের বেলায় চেরাগের ন্যায় জোনাকী পোকা জ্বলে। একজন জিজ্ঞাসা করল, হে রাতকে আলোকোজ্জ্বলকারী জোনাকী পোকা! কী ব্যাপার? তোমাকে দিনের বেলায় দেখা যায় না কেন? জোনাকী উত্তর দিল- আমি তো দিবারাত্র মাঠে-ময়দানেই থাকি। মাঠ-ময়দান ছাড়া কোথাও থাকি না, তবে সূর্যের সামনে আমি প্রকাশিত হতে পারি না।' (অর্থাৎ, সূর্যের সামনে আমি যেন অস্তিত্বহীন, তাই আমাকে দেখা যায় না।)।

২ নং উদাহরণ: বৈশাখে এক ফোঁটা বৃষ্টির পানি সমুদ্রের অভ্যন্তরে পড়ে সমুদ্রের বিশালতা দেখে লজ্জিত হয়ে যায়। বৃষ্টির ফোটাটি তখন বলে, “যেখানে সমুদ্র, সেখানে আমি এক ফোঁটা বৃষ্টি আর কী? বাস্তবে যদি এর অস্তিত্ব থাকে, তবে আমি তো অস্তিত্বহীন।

এরূপ রূপক অর্থেই যতকিছু অস্তিত্ববান, আল্লাহ্র অস্তিত্বের সামনে তাকে ‘অস্তিত্বহীন’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর এটারই পরিভাষা হল এই وحدة الوجود (ওয়াহ্দাতুল উজূদ)।

অনুরূপ عینیت (আইনিয়্যত) শব্দটিও সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় রূপকভাবে মুখাপেক্ষিতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে সমস্ত মাখলূক হুবহু স্রষ্টা। অর্থাৎ, তাঁর মুখাপেক্ষী। তবে সুফিয়ায়ে কেরাম “আইনিয়্যত” শব্দটি ব্যবহারের জন্য এই শর্তারোপ করেছেন যে, এই মুখাপেক্ষিতার জ্ঞান (মা'রেফত)ও যেন থাকে। সেমতে শুধুমাত্র আরিফ ব্যক্তির পক্ষেই এ শব্দটি ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছেন। কোন কোন সময় এ শব্দটি ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত আরেকটি শর্তও সংযুক্ত করেছেন যে, এ শব্দটি ব্যবহারকারী ব্যক্তির মা'রফাতে এ পরিমাণ বিভোরতা থাকতে হবে যে, সমস্ত মাখলূক এমনকি তার নিজের সত্তার দিকেও তার দৃষ্টি থাকবে না। এ অর্থেই আরিফ রূমী (রহ.) বলেছেন,

آں یکے راروئے اوشد سوئے دوست + ویں یکے راروئے اوخودروئے دوست

অর্থাৎ, ঐ একজনের চেহারা হল প্রেমাস্পদমুখী, আর এই একজনের চেহারাই হল স্বয়ং প্রেমাস্পদের চেহারা।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) তাঁর فیصلہ وحدۃ الوجود والشہود গ্রন্থে বলেন, "ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ" ও "ওয়াহ্‌দাতুশ শুহূদ" পরিভাষা দুটি দুই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

(এক) কখনও কখনও এ পরিভাষা দুটি আল্লাহ্‌র পথে সায়েরকারী তথা সালেকের দুটো মাকাম বা অবস্থা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং বলা হয়, এই সালেকের মাকাম হল ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ এবং ঐ সালেকের মাকাম হল ওয়াহ্‌দাতুশ শুহূদ। এখানে 'ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ' বলে বোঝানো হয় হাকীকত বা তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধানে এমন মহা নিমগ্নতাকে, যা ভাল-মন্দ নির্ণয়ের ভিত্তিরূপ শরীআত ও বিবেক-বিবৃত পার্থক্য জ্ঞানকে রহিত করে দেয়। কোন কোন সালেক এই স্তরে নিপতিত হয়ে থাকেন, যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন। আর যদি সালেকের সমন্বয় ও পার্থক্য জ্ঞান বহাল থাকে তাহলে সে জানতে পারে সমস্ত কিছু কোন এক দৃষ্টিভংগিতে এক হলেও অন্য বহু প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন, তাহলে সালেকের এই স্তরকে বলা হয় 'ওয়াহদাতুশ শুহুদ'। এই দ্বিতীয় মাকামটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ও নির্ঝঞ্ঝাট।

(দুই) কখনও কখনও এ পরিভাষা দুটো বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞান অর্জন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই জ্ঞান অর্জন করতে যেয়ে অনিত্য (قدیم) ও নিত্য (حادث)- এর মাঝে সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রশ্নে কেউ কেউ মনে করেছেন জগতের সবকিছুই আপতন বা অপ্রধান বিষয় (عرض/accident), যা আপনা আপনি স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায় না বরং একটি সত্তায় কেন্দ্রিভূত হয়। যেমন: মোম দিয়ে যদি মানুষ, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদির আকৃতি বানানো হয়, তাহলে মোমের অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোনটার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই এবং ঐ আকৃতিগুলো প্রকৃত মানুষ, ঘোড়া, গাধাও নয়। তবে মোমের অস্তিত্ব ঐ সব আকৃতি ছাড়াও বিদ্যমান। আবার বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞান অর্জন করতে যেয়ে কেউ কেউ মনে করেছেন গোটা জগত হল আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী (اسماء وصفات)-এর প্রতিবিম্ব, যা ঐ নাম ও গুণাবলীর বিপরীত নাস্তির আয়নায় প্রতিবিম্বিত। যেমন ক্ষমতার বিপরীত হল অক্ষমতা। এ ক্ষেত্রে অক্ষমতার আয়নায় ক্ষমতার আলো প্রতিবিম্বিত হয়। আল্লাহ্‌র সমস্ত গুণাবলীর বিষয়টিই এমন। অস্তিত্বের বিষয়টিও অনুরূপ।[১] যাহোক প্রথমোক্ত শ্রেণীর মতবাদ হল 'ওয়াহদাতুল উজূদ' আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মতবাদ হল 'ওয়াহদাতুশ শুহুদ'।

এই হল وحدۃ الوجود (ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ)-এর মুহাক্কিক উলামা ও মাশায়েখে কেরামকৃত সঠিক ব্যাখ্যা। এর বিপরীত কিছু কিছু অজ্ঞ সূফী ও তাদের অনুসারীগণ وحدۃ الوجود (ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ) কথাটিকে প্রকৃত ও আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করে কোন কোন পীর সাহেবকে খোদার স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন এবং পীর ও সূফীকে খোদায়ী গুণে

১. অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব হল নাস্তির পর্যায়ভুক্ত। সেই নাস্তির আয়নায় আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ফলে দৃষ্টিপাত কালে একই অস্তিত্বের প্রতিই দৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

গুণান্বিত বলে ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছেন। যেমন মাইজভাণ্ডারী, এনায়েতপুরী ও আটরশি প্রমুখ পীরদের আকীদা-বিশ্বাস বর্ণনা প্রসঙ্গে কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে।

জাহেল সূফী ও তথাকথিত দার্শনিকদের ফিতনা থেকে উম্মতকে হেফাজত করার জন্য আহ্‌লে ইরশাদ তথা মাশায়েখে কেরাম وحدۃ الوجود (ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ)-এর পরিভাষা ব্যবহারের পরিবর্তে وحدۃ الشہود পরিভাষা ব্যবহার করাকে নিরাপদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতে ফিতনার আশংকা নেই। কারণ, এতে অন্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়নি। বরং এর অর্থ হল সমস্ত অস্তিত্ববান জিনিসের মধ্যে শুহূদ তথা দৃষ্টিপাত শুধু একটি সত্তার প্রতি নিবদ্ধ থাকবে।

কোন কোন ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম দর্শন শাস্ত্রবিদ وحدۃ الوجود (ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ)-এর মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামকৃত সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এরূপ মন্তব্যও করেছেন যে, একেশ্বরবাদ নয় বরং সর্বেশ্বরবাদ (তথা ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ)ই হল ইসলামের সূফী দর্শন।[১] এ ধরনের লোকেরা সর্বেশ্বরবাদকে ইসলামের একত্ববাদের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করেন না। কিন্তু সর্বেশ্বরবাদ কোনোক্রমেই একত্ববাদ নয়। কারণ,

১. একত্ববাদে স্রষ্টার অস্তিত্বকে সৃষ্টির অস্তিত্ব থেকে আলাদা করে দেখা হয়। পক্ষান্তরে সর্বেশ্বরবাদে অন্য সবকিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। অথচ মানুষ ইত্যাদি অনেক কিছুরই অস্তিত্ব পঞ্চইন্দ্রীয় দ্বারা প্রমাণিত।
২. একত্ববাদে স্রষ্টাকে সৃষ্টির অস্তিত্ব থেকে আলাদা করে দেখা হয়। পক্ষান্তরে সর্বেশ্বরবাদে খোদা ছাড়া অন্য কিছুই নেই। কিন্তু স্রষ্টা আর সৃষ্টি কখনও এক হতে পারে না। অন্যথায় সৃষ্টিকে স্রষ্টা বলতে হয়। মানুষকেও খোদা বলতে হয়। তাহলে আমি আপনি কি? আমি আপনি কি খোদা? (নাউযু বিল্লাহ!) আমরা তো অসহায়, আল্লাহ্ তো আমাদের মত অসহায় হতে পারেন না।
৩. একত্ববাদে স্রষ্টার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়। পক্ষান্তরে সর্বেশ্বরবাদে অন্য সবকিছুর স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় এবং মহাবিশ্বের সবকিছুকে খোদার মধ্যে লীন করে দেয়া হয়। ফলে খোদা হয়ে যান নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। আর নৈর্ব্যক্তিক সত্তার স্বতন্ত্র কোন ইচ্ছা, প্রজ্ঞা, প্রেম ইত্যাদি কিছুই থাকে না। অথচ ইসলাম ইচ্ছা, প্রজ্ঞা ইত্যাদি সবকিছুর ক্ষেত্রে খোদার একচ্ছত্রতা প্রমাণিত করেছে।

অতএব সর্বেশ্বরবাদ কোনোক্রমেই ইসলামের মতবাদ হতে পারে না। সুফিয়ায়ে কেরাম যারা وحدۃ الوجود (ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ) পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, তারা সেই শুদ্ধ ও রূপক অর্থেই তা করেছেন, যার ব্যাখ্যা আমরা পূর্বে প্রদান করেছি।

কেউ কেউ وحدۃ الوجود, সর্বেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদকে সমান্তরাল মনে করেছেন। "প্যানথিইজম"-এর অনুবাদ সর্বেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদ দেখে এরূপ ভ্রান্তি হয়ে থাকবার

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রফেসর ড. আমিনুল ইসলাম কর্তৃক রচিত "মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি" নামক গ্রন্থে এমন ধারণা পেশ করা হয়েছে।

সম্ভাবনা রয়েছে। কোন কোন হিন্দু মনে করে 'বিশ্বই ব্রহ্ম'। এ রকমের মতবাদকে বলা হয় "অদ্বৈতবাদ"। যদিও হিন্দু ধর্মে 'ব্রহ্ম'ই যে আসল প্রভু কি না তা স্পষ্ট নয়। 'বিষ্ণু', 'মহেশ্বর' দেবতাও ব্রহ্ম-র প্রতিদ্বন্দ্বী। অতএব وحدة الوجود ও অদ্বৈতবাদ এক কথা নয়।

এন, জি, ও

'এনজিও' (N, G, O) কথাটি একটি দীর্ঘ কথার শব্দ সংক্ষেপ। পুরো কথাটি হল Non government Organization অর্থাৎ, বেসরকারী সংস্থা। সংক্ষেপে N, G, O (এন, জি, ও) বলা হয়।

শাব্দিক অর্থ হিসাবে সব ধরনের বেসরকারী সংস্থাগুলোকেই এন, জি, ও বলা যায়। কিন্তু সাংবিধানিক অর্থে এনজিও বলা হয়- মুনাফার উদ্দেশ্য ছাড়া শুধু সেবার উদ্দেশ্যে গঠিত বেসরকারী সংস্থাকে। অর্থাৎ, যে সংস্থাগুলো বেসরকারীভাবে অর্থ সংগ্রহ করত তা নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্ব-কর্মসংস্থান, শিশু ও মাতৃসেবা দান, সমাজ উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেবা প্রদান ও ঋণ বিতরণ ইত্যাদি সেবামূলক কাজে ব্যয় করে।

এ সকল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই মূলত বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য দেশের মত দেশী-বিদেশী এনজিওগুলোকে এদেশে কাজ করার অনুমতি প্রদান করেছে। কিন্তু অনুমোদন লাভের পর এনজিওগুলো প্রতিশ্রুতি মোতাবেক শুধু সেবামূলক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তারা (বিশেষভাবে খৃস্টান এন, জি, ও গুলো) সেবার নামে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কৃষ্টি কালচার, রীতিনীতি ও ধর্মীয় অনুভূতিতে চরমভাবে আঘাত হানছে। গ্রাম বাংলার পারিবারিক ও সমাজ ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে বিনষ্ট করছে, শুধু এতটুকুই নয়, এমনকি জাতীয় অর্থনীতি এবং রাজনীতিতেও হস্তক্ষেপ শুরু করেছে।

বিভিন্ন তথ্য সূত্রে পাওয়া যায় বর্তমানে রেজিস্ট্রীকৃত অরেজিস্ট্রীকৃত দেশী-বিদেশী ইসলামী ও অনৈসলামিক সব মিলে ত্রিশ হাজার এন, জি, ও বাংলাদেশে কার্যরত রয়েছে। তবে এর মধ্যে ২২/১১/০৩ ইং সন পর্যন্ত রেজিষ্ট্রীকৃত বিদেশী এন, জি, ও-র সংখ্যা ১৮০ টি আর দেশী এন, জি, ও-র সংখ্যা ১৬৪৩টি। সর্বমোট ১৮২৩টি।

নিম্নে উল্লেখযোগ্য কতিপয় দেশী-বিদেশী এনজিও এর তালিকা প্রদান করা হল।

বিদেশী	দেশী
(১) কেয়ার (CARE)	(১) ব্রাক (BRAC)
(২) আর, ডি, আর এস (RDRS)	(২) প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র।
(৩) এম, সি, সি (MCC)	(৩) কারিতাস।
(৪) এডরা (ADRA)	(৪) সি, সি, ডি, বি।
(৫) কনসার্ন (CONCERN)	(৫) নিজেরা করি।

বিদেশী	দেশী
(৬) ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ।	(৬) গন স্বাস্থ্য কেন্দ্র
(৭) সেভ দি চিলড্রেন ফান্ড (ইউ কে)	(৭) হীড বাংলাদেশ
(৮) সেভ দি চিলড্রেন ফান্ড (ইউ, এস, এ)	(৮) কুমিল্লা প্রশিকা
(৯) ডিয়া কোনিয়া	(৯) আশা
(১০) অক্সফাম (OXFAM)	(১০) ডি এইচ এস এস
(১১) এ্যাকশন এইড	(১১) বি, এ, ভি এস
(১২) সুইডিশ ফ্রি মিশন	(১২) এডাব
(১৩) আইডিয়াস ইন্টারন্যাশনাল	(১৩) ইউসেফ
(১৪) সাউথ এশিয়া পার্টনারশীপ	(১৪) সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর
(১৫) ইউ, এস, সি সি, বি	(১৫) বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি
(১৬) ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন	(১৬) ওয়াই, এস, সি এ
(১৭) অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি	(১৭) বাঁচতে শেখা
(১৮) ই, ডি এস	(১৮) উন্নয়ন সহযোগী টীম
(১৯) টি, ডি, এইচ (T, D, H) সুইজারল্যান্ড	(১৯) সি, ডি, এস
(২০) রাড্ডা বারনেন।	

এছাড়া উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ইসলামী সেবা সংস্থাও রয়েছে। তবে এখানে পাশ্চাত্য ভাবধারার বিদেশী এনজিও এবং পাশ্চাত্যের মদদপুষ্ট দেশীয় এনজিও যেগুলো সেবার ছদ্মাবরণে অর্থনৈতিক শোষণ, ধর্মান্তরীতকরণ এবং সমাজ বিনষ্ট করণের মত নেতিবাচক কাজেও লিপ্ত শুধু সে সব এনজিও সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোক-পাত করা হচ্ছে।

এনজিওদের আগমনের পেক্ষাপট

১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু দীর্ঘদিন যুদ্ধের ফলে গোটাদেশ একটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। নূন্যতম মানবিক চাহিদা সামগ্রি তথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসার চরম সংকট দেখা দেয়। অভাব-অনটনে চতুর্দিকে হাহাকার পড়ে যায়। দেশের এহেন সংকটপূর্ণ মুহূর্তে মানুষের দরিদ্রতা ও দুরাবস্থার অজুহাতে ধূর্ত ও ফন্দিবাজ এনজিওগুলো গায়ে সেবার আকর্ষণীয় লেবেল এঁটে বাংলার বুকে আগমন করে।

এমনিভাবে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময়, ১৯৮৮ সালে সর্বনাশা বন্যার সময়, ১৯৯১ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণি ঝড়ের সময়, ১৯৯৮ সালের দীর্ঘস্থায়ী সর্বগ্রাসী বন্যার সময় তথা দেশের চরম দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে এনজিওদের সরব আগমন ঘটেছে। কিন্তু আগমনের কিছুদিন যেতে না যেতেই তাদের আসল স্বরূপ জাতির উলামা ও সচেতন মহলের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তখন থেকেই উলামায়ে কেরাম এবং সচেতন মহল দেশের সরকার ও জাতিকে এনজিওদের অপতৎপরতার ব্যাপারে অবগত করে আসছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে কার্যরত ত্রিশ হাজার এনজিওর প্রায় সবগুলো খৃষ্টান-বিশ্ব ও খৃষ্টান মিশনারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে। এ হিসাবে বলতে গেলে খৃষ্টান মিশনারীগণ ১৫১৭ সালে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের লীলা ভূমি সুজলা সুফলা শষ্য শ্যামলা এ বাংলার বুকে সর্বপ্রথম আগমন করে। এর একশত তেত্রিশ বছর পর তারা তাদের স্বজাতি খৃষ্টান বণিকদেরকে এদেশে নিয়ে আসে। এর পর তারা দুদলে মিলে বাংলার হিন্দু, মুসলমানের মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ধরনের শোষণ ও লুণ্ঠন চালায়। ১৭৫৭ সালে এসে আমাদের সার্বভৌম সত্তাকে পদদলিত করে। দীর্ঘদিন দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ থাকার পর একটি বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্টি ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৬১ ও ১৯৭০ সালে সেই খৃষ্টান মিশনারীগণ বাংলার হিন্দু মুসলমানকে খৃষ্টান বানানোর দুরভিসন্ধি নিয়ে এনজিওদের হাতে হাত কাধে কাধ মিলিয়ে আবার এদেশে আগমন করে। তাই সার্বিক দিক বিবেচনায় দেখা যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে এনজিওদের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। শ্লোগান শুধু ভিন্ন, কিন্তু অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

নিম্নে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে এনজিওদের অপতৎপরতার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল।

সামাজিক ক্ষেত্রে এনজিওদের অপতৎপরতা

দীর্ঘদিন ইসলামী অনুশাসনে চলে আসা আমাদের গ্রাম বাংলার পারিবারিক এবং দাম্পত্য জীবন এনজিওদের দুরভিসন্ধি তথা খৃষ্টান বানানোর ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। তাই এনজিওরা আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থা এবং দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। লক্ষ লক্ষ পুরুষ বেকার ও কর্মহীন থাকা সত্ত্বেও নারী জাতিকে সাবলম্বী করার ভাওতা দিয়ে আমাদের কোমল মতি নারীদেরকে কর্ম সংস্থানের জন্য স্বামী ঘরের আরাম থেকে বের করে মাঠে গঞ্জে বাজারে হাড় ভাঙ্গা খাটুনির কাজে লাগাচ্ছে। তাও আবার অল্প মজুরীর কর্মে। আবার অনেক এনজিও সংস্থা আমাদের অবলা রমণীদেরকে শ্বেত চামড়ার এনজিও কর্মকর্তাদের সেবা ও মনতুষ্টির মত হীন কাজে ব্যবহার করছে। এভাবে এনজিওগুলো মহিলাদেরকে স্বামী থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। অনেক এলাকাতে আবার এনজিওদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে স্ত্রীরা স্বামীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অফিসে গিয়ে এনজিও কর্মকর্তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও ফস্টি নষ্টি করে। এতে স্বামী স্ত্রীর মাঝে অন্তঃকলহ সৃষ্টি হয়। উপরন্তু এনজিও সংস্থাগুলি মহিলাদেরকে 'কিসের বর কিসের ঘর' 'ঘরের ভিতর থাকব না স্বামীর কথা মানব না', 'আমার মন আমার দেহ, যাকে খুশি তাকে দেব'-এরূপ বিভিন্ন উদ্ধত ও যৌন উচ্ছৃখলা উদ্দীপক শ্লোগান শিক্ষা দিয়ে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করছে এবং অবাধ যৌনাচারিতার দিকে নারী সমাজকে অগ্রসর করছে। তারা 'স্বামী স্ত্রীকে লাঠি দিয়ে প্রহার করছে' এ ধরনের উদ্ভট চিত্র সম্বলিত পোষ্টার, ফেস্টুন দেখিয়ে এবং নারী

নির্যাতনের কল্প-কাহিনী শুনিয়ে মহিলাদেরকে স্বামীদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছে। এর অনিবার্য পরিণাম স্বরূপ বিবাহ বিচ্ছেদের মাধ্যমে অসংখ্য সুখের সংসার ভেঙ্গে ছার খার হয়ে যাচ্ছে। এভাবে আমাদের সামাজিক ভারসাম্য মারাত্মকভাবে বিনষ্ট হচ্ছে। এদিকে এনজিওরা তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদেরকে 'ফ্রি লিগেল এইড' দিয়ে থাকেন। যার ফলে তারা স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে ভয় পাচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে এ সকল নারী খৃষ্টানদের খপ্পরে পড়ে খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে। অনেকে নিজেদেরকে পশ্চিমা জীবন ধারায় পরিচালিত করছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এনজিওদের অপতৎপরতা

এনজিও সংস্থাগুলো অর্থনৈতিক সাহায্যের নামে অর্থনৈতিক শোষণ চালাচ্ছে। তারা ২০% থেকে ৬০% কোন কোন সংস্থা ২২৬% ও ২০০% এরূপ উচ্চ সুদের হারে অর্থ লগ্নী করে। এ সুদ তারা দৈনিক ও সাপ্তাহিক উশুল পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করে। আর এই সর্বনাশা ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে অনেক পরিবার ভিটে-বাড়ী ছাড়া হয়েছে। অনেকে এনজিওদের অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে রাগে ক্ষোভে বিষ পানে আত্মহত্যা করেছে। এনজিওদের চাপে নিরুপায় হয়ে কোলের সন্তান বিক্রি করে অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে– এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। এভাবে আমাদের সমাজ জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। তাই বিভিন্ন সমীক্ষার রিপোর্ট অনুসারে দারিদ্র বিমোচনের পরিবর্তে এনজিওগুলোর কারণে উল্টো দরিদ্রতা সমাজকে আরও চরমভাবে গ্রাস করে নিচ্ছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এনজিওদের অপতৎপরতা

এনজিওগুলো সাহায্য-সহযোগিতার নামে অনুমোদন লাভ করে থাকে। কোন রূপ রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা গঠনতান্ত্রিকভাবে তাদের জন্য বিধিবদ্ধ নয়। কিন্তু বিদেশী খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত এনজিওগুলো শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে এনজিওগুলো রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে তাদের স্বার্থ রক্ষাকারী প্রার্থীকে বেআইনিভাবে প্রচুর অর্থ প্রদান করে এবং ভোট প্রদানের জন্য টার্গেট গ্রুপকে নির্দেশ দেয়। বলা বাহুল্য, এভাবে যথেষ্ট সংখ্যক এনজিও সমর্থক প্রার্থী বিভিন্ন সময় শীর্ষস্থানীয় তিনটি দলের টিকিটে সংসদ সদস্য হয়েছেন। এছাড়াও বিদেশী এনজিওগুলো তৃণমূল পর্যায়ে শতকরা ৪৪ ভাগ গ্রামে তাদের সংগঠন কায়েম করেছে। উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে তারা প্রকাশ্যে অংশ গ্রহণ করছে। তারা ৪০০ প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল। তার মাঝে ১০ জন চেয়ারম্যান নির্বাচিতও হয়েছেন। এছাড়াও এনজিও নিয়ন্ত্রিত ভূমিহীন সমিতির অনেক মহিলা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর নির্বাচিত হয়েছেন। এনজিওগুলো শুধু নির্বাচনকালেই সক্রিয় থাকে এমন নয়, বরং প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ইস্যুতেই তারা কোন না কোনভাবে নগ্ন হস্তক্ষেপ করে থাকে। যা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য চরম হুমকি স্বরূপ।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে এনজিওদের অপতৎপরতা

এনজিওগুলো অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় ধর্মীয় ক্ষেত্রেও মারাত্মকভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। মুসলমানদেরকে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্যে তারা হরেক রকমের অপকৌশল অবলম্বন করছে। শিক্ষা প্রদানের নামে এনজিও পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা কোমলমতি শিশুদের মগজ ধোলাই করছে। 'ইসলাম' ও 'আল্লাহ্' সম্পর্কে বিভ্রান্তির বীজ তাদের মনে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এভাবে আমাদের আগামী প্রজন্মকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিচ্ছে। এমনিভাবে এনজিও সংস্থাগুলো শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জোরেসোরে সারা বাংলায় ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে ন্যাক্কারজনক প্রোপাগান্ডা ও তথ্য সন্ত্রাস চালাচ্ছে। তারা গ্রাম বাংলার সরলপ্রাণ মুসলমান ভাইদের কাছে বলছে, 'মুসলমান মানেই দরিদ্র আর খৃষ্টান মানেই ধনবান'। তারা মানুষকে ধর্ম-বিমূখ ও ধর্মহীন করার জন্য নানা কৌশলে শুক্রবারের নামাযসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায না পড়ার জন্য উপদেশ প্রদান করে। তারা পর্দা ব্যবস্থার ঘোর বিরোধিতা করে, পর্দা অগ্রগতির অন্তরায় বলে মেয়েদের শিক্ষা দেয়। (দৈনিক ইনকিলাব)

তারা আরও বলে, "মুহাম্মাদের চাইতে ঈসা বড়।" "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়া সাল্লাম)-এর শাফাআত করার অধিকার নেই।" 'ইসলামের ইতিহাস হত্যা ও ধ্বংসের কাহিনী' ইত্যাদি।

এছাড়াও খৃষ্টান মিশনারী নেটওয়ার্ক ইসলামের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের বিকৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত বইপত্র দেশের আনাচে-কানাচে বিনামূল্যে বিতরণ করছে। এসব পুস্তকের মুল বক্তব্য হল– "ইসলামের নবী শান্তির দূত নন বরং তিনি একজন যোদ্ধা। ইসলাম মানবতার মুক্তি দিতে পারে না। পরকালেরও কোনো গ্যারান্টি দিতে পারে না। পক্ষান্তরে খৃষ্টধর্ম দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ বিধান করে।" এভাবে স্বরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে ও বিভ্রান্ত করে খৃষ্টান বানানোর সকল অপকৌশল অবলম্বন করছে। তাই অনেক স্বরলপ্রাণ নিষ্ঠাবান মুসলমানও ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছেন।[১]

ধর্মীয় ক্ষেত্রে এনজিওদের অনাসৃষ্টির একটা উদাহরণ হল তারা "জজ মেজিস্ট্রেট থাকে ঘরে মোল্লা এখন বিচার করে"– এ ধরনের কটুক্তিমূলক চরম আপত্তিকর শ্লোগান সম্বলিত পোষ্টার, প্লাকার্ড ব্যানার দিয়ে মহিলাদেরকে আলেম সমাজের বিরুদ্ধে মাঠে নামিয়েছে। এভাবে এনজিওগুলো সমাজকে মারাত্মক সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দেয়ার মত চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে। বাস্তব হল এনজিওদের কার্যক্রম গোটা দেশব্যাপী। এক সমীক্ষায় দেখা যায় ২.৫৫ গ্রামে একটি করে এন, জি, ও। তাই তাদের দুস্কৃতি ও অপত-ৎপরতার পরিধিও অত্যন্ত ব্যাপক। যা এ অল্প পরিসরে লিখে শেষ করা সম্ভব নয়।[২]

১. উল্লেখ্য খৃষ্টান এনজিও মিশনারীদের বিশ বছরের প্রচেষ্টায় ১৯৯২ সন পর্যন্ত খৃষ্টান জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে পঞ্চাশ লাখে উন্নীত হয়েছে। তাদের টার্গেট ছিল ২০০০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা এক কোটিতে উন্নীত করা, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগ জনক।

২. তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ এনজিও উপনিবেশবাদের দুর্ভেদ্য জালে, লেখক মুহাম্মাদ নূরুযযামান ও এনজিওদের ষড়যন্ত্রের কবলে বাংলাদেশ, লেখক মুহাম্মদ এনামুল হক জালালাবাদী।

চতুর্থ অধ্যায়

(আধ্যাত্মিক মতবাদ ও বিদআত সংক্রান্ত বিষয়ক)

অত্র অধ্যায়ে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বা আধ্যাত্মিকতার নামে যেসব বিদআত প্রচলিত রয়েছে, সেগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে। এজন্য প্রথমে বিদআত সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভের উদ্দেশ্যে বিদআত সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ পেশ করা হল।

বিদআত প্রসঙ্গ

বিদআতের আভিধানিক অর্থ

বিদআত (البدعة) শব্দটি (ب د ع) ধাতুমূল থেকে গঠিত। এর মূল (مادة)-এর অর্থ কোন পূর্বনমূনা বিহীন সৃষ্টি করা। যেমন: بَدَعَ الشَّيْءَ (بَابٌ فَتَحَ) অর্থাৎ, অনুপম-ভাবে সৃষ্টি করেছে। এ থেকেই আল্লাহ তাআলার আসমায়ে হুছনার একটি البديع। আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীতে উল্লেখিত البديع শব্দটিও উক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে– بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোনরূপ পূর্বনমূনা ছাড়াই সৃষ্টিকারী। এ শব্দটি যখন كرم يكرم থেকে ব্যবহৃত হয়, তখন তার অর্থ দাঁড়ায় উপমাহীন, অভিনব। আর এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত بدعا শব্দটি-

قُلْ مَاكُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তদীয় বান্দাদের প্রতি আমিই সর্বপ্রথম রিসালাত নিয়ে আগমন করেছি তা তো নয়। বরং আমার পূর্বে আরও অনেক রসূল এসেছেন। (সূরা: ৪৬–আহকাফ: ৯)

তাছাড়া যার কোন নমূনা বা তুলনা হয় না- এমন কোন অতি সুন্দর জিনিসকেও أَمْرٌ بَدِيْعٌ বলা হয়। যার অর্থ অভিনব, অনুপম। আর ابتدع فلانٌ بِدْعَةً –এর অর্থ হল সে এমন পথের সূচনা করেছে, যা ইতিপূর্বে কেউ করেনি। تَبَدَّعَ শব্দের অর্থ অনুপম হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানী আবুল ফাত্হ নাসির ইব্নে আব্দুস সাইয়্যেদ আল-মুতার্‌রিযী 'المغرب' গ্রন্থে লিখেছেনথ الخلفة শব্দটি যেমন الختلاف থেকে উদগত ইস্‌ম, الرفعة যেমন الرتفاع থেকে উদগত ইস্‌ম, অনুরূপভাবে البدعة শব্দটিও ابتدع الأمر থেকে উদগত ইস্‌ম। যার অর্থ অভিনব।

এ হল বিদআতের আভিধানিক অর্থ। যার সারকথা হল নতুন সৃষ্টি, অভিনব আবিষ্কার। আলেমগণ এরই আলোকে বিদআতের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। যেমন:

* ঈমাম নববী (রহ.) বলেছেন,

البدعة كل شيئ عُمِلَ على غير مثال سابق.

অর্থাৎ, কোন পূর্বনমূনা বা উপমার অনুসরণ ব্যতীত কৃত যেকোনো বিষয়কেই বিদআত বলা হয়।

* ইমাম শাতিবী (রহ.) বলেছেন,

وأصل مادة "بدع" للا ختراع على غير مثال سابق. اه.

অর্থাৎ, بدع ধাতুটির মূল ব্যবহার অভিনব আবিষ্কারের অর্থে।

* হাফিয ইব্নে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেছেন,

البدعة أصلها ما أُحْدِثَ على غير مثال سابق.

অর্থাৎ, কোন পূর্বনমূনা বা উপমার অনুসরণ ব্যতীত সৃষ্ট বিষয়কেই বিদআত বলা হয়।[১]

সারকথা- বিদআত শব্দের আভিধানিক অর্থ হল কোন পূর্বনমূনা বা উপমার অনুসরণ ব্যতীত সৃষ্টি করা। চাই সেটা ইবাদত জাতীয় হোক, আচার-আচরণ জাতীয় হোক কিংবা নির্বাহের স্বার্থে ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি হোক- সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

বিদআতের পারিভাষিক অর্থ

বিদআতের পারিভাষিক অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের ভাষ্য বিভিন্ন হলেও সকল বক্তব্যের মূল মর্ম এক ও অভিন্ন। যেমন:

১. 'উম্‌দাতুল কারী' গ্রন্থে আল্লামা আইনী (রহ.) বলেছেন,

البدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.

অর্থাৎ, মূলতঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জমানায় ছিল না- এমন কোন কিছু সৃষ্টি করাকেই বিদআত বলে। আল্লামা নববীও অনুরূপ অর্থ বলেছেন।

১. ইমাম শাতিবী (রহ.)কৃত আল ই'তিসাম, আল-মুনজিদ, মিরকাত, ফাত্হুল বারী ও আল-মিন-হাজুল ওয়াযিহ্ প্রভৃতি গ্রন্থ অনুসরণে।

২. হাফিয ইব্নে হাজার আসকালানী (রহ.) 'ফাতহুল বারী'তে বলেছেন,

البدعة أصلها ما أُحْدِثَ وليس له أصل في الشرع، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة.

অর্থাৎ, বিদআতের মূল কথা হল শরীআতে যার কোনো ভিত্তি নেই-এমন কিছু আবিষ্কার করা। কিন্তু শরীআতে যার ভিত্তি আছে এমন কোনো বিষয় বিদআত নয়।

৩. ইমাম রাগিব ইস্‌পাহানী (রহ.) 'المفردات في غريب القرآن' গ্রন্থে লিখেছেন–

البدعة في المذهب إيراد قولٍ لم يستن قائلها أو فاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثِلِها وأصولها المتقنة.

অর্থাৎ, মাযহাব বা ধর্মের ক্ষেত্রে বিদআত হল, সাহেবে শরীআত (নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]) বা শরীআতের প্রতিষ্ঠিত নীতিমালার অনুসরণ ব্যতীত কোন কথা আবিষ্কার কিংবা যুক্ত করা।

৪. আল্লামা মাজদুদ্দীন 'القاموس المحيط' গ্রন্থে লিখেছেন–

البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال أو ما سيحدث بعد النبي صلى الله عليه و سلم من الأهواء و الأعمال.

অর্থাৎ, বিদআত হল দ্বীন পূর্ণতা লাভের পর তাতে নতুন কিছু আবিষ্কার করা কিংবা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের পর যা আবিস্কৃত হবে।

৫. আল্লামা শাতিবী (রহ.) الاعتصام (আল-ই'তিসাম) গ্রন্থে লিখেছেন–

البدعة الطريقة في الدين تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه.

অর্থাৎ, বিদআত হল দ্বীনের মধ্যে এমন এক পন্থা যা ব্যহ্যত শরীআতের মতই, যা অবলম্বন করা হয় আল্লাহ তাআলার দাসত্বের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে।

৬. হাফেয ইব্নে রজব হাম্বলী (রহ.) 'جامع العلوم و الحكم' (জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম) গ্রন্থে লিখেছেন–

المراد بالبدعة ما أُحْدِثَ مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدع عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة.

অর্থাৎ, শরীআতে ভিত্তি নেই এমন কোন বিষয় আবিষ্কার করাকেই বিদআত বলে। কিন্তু শরীআতে ভিত্তি আছে এমন কোনো বিষয়কে ইসলামের পরিভাষায় বিদআত বলা যাবে না- সেটা আভিধানিক ভাষায় বিদআত বিবেচিত হলেও।

৭. تاج العروس (তাজুল উরূস) গ্রন্থে আল্লামা মুরতাযা যাবীদী (রহ.) লিখেছেন–

(البدعة) ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة.

অর্থাৎ, শরীআতের নীতিমালা-বিরোধী এবং সুন্নাত-পরিপন্থী যা তাই বিদআত।

৮. আল্লামা ইব্‌নে কাছীর (রহ.) তদীয় তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন–

كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدم فيه متقدِّمٌ، فإن العرب تسميه مبتدعا.

অর্থাৎ, প্রত্যেক এমন কাজ বা কথা যা ইতিপূর্বে কোন ব্যক্তি করেনি আরবরা তাকেই 'বিদআত' বলে।

৯. আল্লামা বিরিক্‌লী (البركلي) (রহ.) 'الطريقة المحمدية' (আত-তরীকাতুল মুহাম্মাদিয়্যাহ) গ্রন্থে লিখেছেন–

وهي زيادة في الدين أو النقصانُ منه الحادثان بعد الصحابة بغير إذن الشارع به لا قولا ولا فعلا ولا صريحا ولا إشارة. اهـ

অর্থাৎ, বিদআত হল ইসলামের মধ্যে কম বা বেশি করা, যা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যুগের পর শারে' (شارع [আ.])-এর পক্ষ থেকে কথা, কাজ, স্পষ্ট বক্তব্য কিংবা ইংগিত- মূলক কোন প্রমাণের অনুমোদন ছাড়াই আবিস্কৃত ও সংযোজিত হয়েছে।

নাবলূসী (রহ.) এই সংজ্ঞায় বিরিক্‌লী (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত بعد الصحابة (তথা সাহাবায়ে কেরামের যুগের পর) কথাটির পর "তাবিঈন ও তাবে তাবিঈন-এর যুগের পর" কথাটিকে বৃদ্ধি করেছেন।

১০. আল্লামা শাব্বীর আহমদ উছমানী (রহ.) লিখেছেন–

البدعة ما لاأصل لها في الكتاب والسنة والقرون المشهود لها بالخير، ويرتكبونها قصدا للثواب وعلى ظن أنها من الأمور الدينية.

অর্থাৎ, বিদআত বলা হয় কুরআন সুন্নাহ ও কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত যুগে (القرون المشهودة لها بالخير) যার কোনো ভিত্তি ও প্রমাণ নেই– এমন কোন বিষয় যাকে মানুষ ছওয়াবের আশায় পালন করে এবং মনে করে যে, এটা দ্বীনী বিষয়। মাওলানা সরফরায আহমদ খান সফদর (রহ.)ও 'المنهاج الواضح' (আল-মিনহাজুল ওয়াযি/রাহে সুন্নাত) গ্রন্থে অনুরূপই বলেছেন।

এতক্ষণ বিদআতের পারিভাষিক অর্থ বা শরয়ী পরিচয় সম্পর্কে উলামায়ে কেরা-মের ভাষ্যাবলীর কয়েকটি উদ্বৃত করা হল। যার সারমর্ম আরবীতে এভাবে পেশ করা যায়– শরীআতের পরিভাষায় বিদআত বলা হয়–

كل ما أُحْدِثَ في الدين من الأقوال أو الأفعال بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعيهم، ولم يكن لها ثبوب في القرآن والسنة ولا في القرون المشهود لها بالخير لا قولا ولا فعلا ولا صراحة ولاإشارة، ويرتكبونها قصدا للثواب وعلى ظن أنها من الأمور الدينية.

অর্থাৎ, প্রত্যেক এমন কথা বা কাজ, যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম (রা.), তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের যুগের পর ইসলামের মধ্যে সৃষ্টি

করা হয়েছে, সংযোজিত হয়েছে, অথচ কুরআন, সুন্নাহ্ কিংবা খায়রুল কুরূন (কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত অতীত কাল)-এর কোথাও কথা, কাজ, স্পষ্ট বা ইংগিতমূলক কোনো প্রকার দলীলেই তার প্রমাণ নেই। মানুষ ছওয়াবের বাসনায় এর উপর আমল করে, আবার ভাবে এটা একটা দ্বীনী বিষয়।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বিদআতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের মাঝে عموم خصوص مطلق-এর নিসবত। পারিভাষিক বিদআত খাস (عام) আর আভিধানিক বিদআত আম (خاص)।

বিদআতের পারিভাষিক সংজ্ঞার উৎস

বিদআত-এর শরয়ী সংজ্ঞার ভিত্তি হল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্নোক্ত হাদীছ–

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (متفق عليه. رواه البخار في كتاب الصلح– باب قوله : أن يصالحا بينهما صلحا، ورواه مسلم في كتاب الأقضية– باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور واللفظ للبخاري)

অর্থাৎ, যে আমাদের এই দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভব ঘটাবে –যা তার অংশ নয়– সেটা প্রত্যাখ্যাত। (বোখারী ও মুসলিম)

এ হাদীছে ব্যবহৃত "أمر" শব্দ দ্বারা 'দ্বীন'কে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং একমাত্র দ্বীনের ক্ষেত্রে 'নব আবিস্কৃত বিষয়' ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে এই "বিদ'আত" শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না। সুতরাং যে কোন নব আবিস্কৃত উদ্ভাবিত বিষয়কেই বিদআত বলা যাবে না। এর দ্বারা বিদআতের আওতা থেকে খানা-পিনা, বাহন-উপকরণসহ বৈধ নানাবিধ বিষয়ে আধুনিক রূপসমূহ আলাদা হয়ে গেছে। এমনিভাবে বিদআতের আওতা থেকে আলাদা হয়ে গেছে সেসব রসম রেওয়াজও, যেগুলো মানুষ ছওয়াবের নিয়তে করে না। যদিও আভিধানিক অর্থে সেগুলিকেও বিদআত বলা যায়। কেননা, সেগুলো যারা করে তারা সেগুলোকে দ্বীন মনে করে করে না কিংবা ছওয়াবের আশায় করে না। সুতরাং সেগুলো দ্বীনের মধ্যে আবিষ্কার বা সংযোজন নয়।

অনুরূপভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইরশাদ "ماليس منه" দ্বারাও একথাই প্রমাণিত হয় যে, যেসব বিষয় সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ'র স্পষ্ট কিংবা ইংগিতমূলক কোন ভিত্তি রয়েছে সেগুলোকে বিদআত বলা যাবে না। এর দ্বারা বিদআ-তের আওতা থেকে احكام منصوصة ও احكام مستنبطة من النصوص আলাদা হয়ে গেছে। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের তা'আমুলও আলাদা হয়ে গেছে। কারণ, শরীআতে এর ভিত্তি আছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. (رواه أبو داود في كتاب السنة– باب لزوم السنة، ورواه الترمذي في أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم– باب الأخذ بالسنة واجتناب

البدعة وقال : هذا حديث حسن صحيح. واللفظ لأبي داود)

অর্থাৎ, তোমরা আমার তরীকা ও খোলাফায়ে রাশেদীন –যারা হেদায়েত প্রাপ্ত–এর তরীকাকে দৃঢ়ভাবে আকঁড়ে থাক। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন,

خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. (متفق عليه. رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم– باب فضائل أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم، وراه مسلم في كتاب الفضائل– باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)

অর্থাৎ, আমার উম্মতের মধ্যে উত্তম হল আমার যুগের লোক, তারপর যারা তাঁদের সঙ্গে যুক্ত, তারপর যারা তাঁদের সঙ্গে যুক্ত। (বোখারী ও মুসলিম)

এই তিন হাদীছের ভাষ্য স্পষ্টভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের আমল, আচরণ, লেন-দেন দ্বীনের অংশ। সুতরাং সেগুলে-ার উপর "বিদআত" কথাটা প্রযোজ্য হবে না।

'বিদআত'-এর সংজ্ঞার فوائد قيود

বিদআত-এর সংজ্ঞায় ব্যবহৃত إحداث فى الدين-অর্থাৎ, "দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করা"-এর কথা বলা হয়েছে। তাই কেউ যদি পার্থিব লক্ষ্যে কোন কিছু আবিষ্কার করে, যেমন– নানা রকমের পোশাক, খাবার, দ্বীনী যোগাযোগের উপকরণ, যন্ত্রপাতি, নব নব সমরাস্ত্র ইত্যাদি– এর কোনটিই দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি ও সংযুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং এগুলো হল দুনিয়া ও পার্থিব বিষয়ে নতুন সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। তাই এগুলোকে 'বিদআত' অর্থাৎ, শরীআতের পরিভাষায় বিদআত বলা যাবে না। এই সংজ্ঞা অনুসারে বর্তমান কালের দ্বীনী মাদ্‌রাসা ও মকতবসমূহে যে ইল্‌মে নাহু, ইল্‌মে সর্‌ফ, ইল্‌মে আদব, ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হয় এগুলো রচনা ও সংকলন এবং শিক্ষাদান ও এরূপ দ্বীনী মাদ্‌রাসা ও মকতব তৈরি করা ইত্যাদি বিদআতের সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে যায়। কারণ, এগুলো যদিও নব সৃষ্টি, কিন্তু দ্বীনের জন্য (للدين), দ্বীনের মধ্যে (في الدين) নয়। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, এগুলো এমন বিষয় যার উপর শরীআতের আদেশ-নিষেধ (المأمور به) পালন করাও নির্ভরশীল।[1]
কেউ কেউ বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন- এ বিষয়গুলো সরাসরি দ্বীনী বিষয় না হলেও تبعا তথা পরোক্ষভাবে দ্বীনী বিষয়। অনুরূপভাবে পরোক্ষভাবে দ্বীনী বিষয়

১. مامور به বলতে উদ্দেশ্য হল শরীআতের পক্ষ থেকে আদিষ্ট বিষয় সেটা ওয়াজিবও হতে পারে, মুস্তাহাবও হতে পারে। যেমন: দ্বীনের হেফাজত, দ্বীনী উলূম হাসিল করা, দ্বীনী উলূমে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করা, তার প্রচার করা, দ্বীনের সাহায্য করা, দীনের প্রতিরক্ষা করা ইত্যাদি যা এই আধুনিক-কালে এসে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, অথচ পূর্বসূরী মনীষীদের জন্য বিশেষ অবস্থার কারণে এগুলো অপরিহার্য ছিল না। আর সে কারণ ও অবস্থা তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর উসূল তথা মূলনীতি হল, যেটা ব্যতীত ওয়াজিব পূর্ণ হয় না সেটাও ওয়াজিব। مامور به যার উপর নির্ভরশীল সেটাও حكما - مامور به সেটাও দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। বিদআত নয়।

বলে বিবেচিত মানতেক ও দর্শনশাস্ত্র যার দ্বারা গোমরাহ মতবাদের মোকাবিলা করা হয়, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতি যার দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা হয়, তাছাড়া আত্মশুদ্ধির বিভিন্ন পন্থা, আওরাদ-আযকার যেগুলো সুফিয়ায়ে কেরাম প্রবর্তিত করেছেন- এর কোনটিই বিদআত নয় বরং দ্বীনী বিষয়। তবে প্রত্যক্ষভাবে নয়-পরোক্ষভাবে। আর আমাদের পূর্বসূরী মনীষীগণের কালে যেহেতু এগুলোর প্রয়োজন দেখা দেয়নি, তাই তারা এগুলোর দ্বারস্থ হননি। বরং এগুলোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে পরবর্তীকালে।

বিদআতের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

بعد عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم إلخ.

অর্থাৎ, "যা আবিস্কৃত হয়েছে সাহাবা, তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের জমানার পর।" সুতরাং এর দ্বারা বিদআতের আওতা থেকে ঐসব বিষয় বের হয়ে গেছে, যেগুলো তাদের কালেই অস্তিত্ব লাভ করেছে –যে কাল সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কল্যাণের সাক্ষ্য দিয়েছেন– এবং সেসব বিষয় সেকালে অস্তিত্ব লাভ করার পর সমকালীন সকলেই তা কবূলও করে নিয়েছেন। যেমন: কুরআনে কারীমের সংকলন, মদ্যপায়ীর জন্য ৮০ দোররা 'হদ' নির্ধারণ, খোলাফায়ে রাশেদার ফয়সালার ভিত্তিতে কারিগরের উপর ভর্তুকি চাপানো এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যুগেই জামাআতের সাথে পূর্ণ গুরুত্বসহ তারাবীহ নামায আদায় করার বিধান ইত্যাদি। আর তাবে তাবিঈনের যুগে হাদীছ সংকলণ হওয়ায় সেটাও বিদআতের সংজ্ঞা থেকে আলাদা হয়ে গেছে। কেননা, বিদআতের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

ولم يكن لها ثبوت في القرور المسشهود لها بالخير.

অর্থাৎ, বিদআত কেবল এমন বিষয়কেই বলা যাবে খায়রুল কুরূনে (কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত তিন কালের কোনো কালেই) যার অস্তিত্ব ছিল না।

বিদআতের সংজ্ঞায় আরও বলা হয়েছে,

ولم يكن لها ثبوت من القرآن والسنة.

অর্থাৎ, "কুরআন সুন্নায় যার কোনো প্রমাণ নেই।" এর দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহর নুসূস থেকে উদ্ভাবিত বিধানাবলী (الأحكام المستنبطة/আহকামে মুস্তামবাতা) বিদআতের সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে গেছে। কারণ, কুরআন-সুন্নায় আহ্‌কামে মুস্তাম্‌বাতার ভিত্তি আছে।

বিদআতের সংজ্ঞায় আরও বলা হয়েছে,

وير تكبونها قصدا للثواث و على ظن أنها من الأمور الدينية.

অর্থাৎ, "বিদআতের অনুসারীরা যে বিদআতটাকে ছওয়াবের আশায় এবং দ্বীনী বিষয় মনে করেই করে থাকে।" এর দ্বারা বিদআত থেকে ঐসব বিষয় বেরিয়ে গেছে, যেগুলো মানুষ অভ্যাসবশত করে এবং সেগুলোকে আদৌ দ্বীনী বিষয় মনে করে না।

তাছাড়া প্রচলিত রেওয়াজ ও প্রথাবলী –যেমন: বিয়ে ইত্যাদি উৎসবে পালিত বিভিন্ন রকমের রেওয়াজ– এগুলো যদিও পাপের বিষয়, তবে শরীআতের পরিভাষায় বিদআত নয়। কারণ, মানুষ এসব উৎসব শুধু প্রথা হিসাবে, চক্ষু লজ্জার খাতিরে, লোক দেখানে-ার মানসে, সুনামের নেশায় করে থাকে। এগুলো কেউ ছওয়াবের উদ্দেশ্যে করে না। অনুরূপভাবে এগুলোকে দ্বীনী বিষয়ও মনে করে না। এটা হল বিদআত ও রুসূমের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য।

বিদআতের প্রকার: হাসানাহ্ ও সায়্যিআহ্ প্রসঙ্গ

জমহুর মুহাককিকীনের মত হল- বিদআতে হাসানাহ্ (উত্তম বিদআত) ও বিদআতে সায়্যিআহ্ (মন্দ বিদআত) বলে কোনো ভাগ নেই। তবে কোন কোন ব্যাখ্যাকারের ভাষ্য থেকে বিদআত হাসানাহ ও সায়্যিআহ্ হিসাবে বিভক্ত হওয়াটা প্রতিভাত হয়। তাই যদি এই বিভক্তিটা আভিধানিক অর্থ হিসাবে হয় তাহলে সেটা ঠিক আছে। কারণ, আভিধানিকভাবে সকল অভিনব-নতুন আবিস্কৃত বিষয়কেই বিদআত বলা যায়। চাই সেটা ভাল হোক বা মন্দ হোক। আর যদি এই বিভক্তিটা পারিভাষিক অর্থে হয় তাহলে যথার্থ হবে না। কারণ, শরীআতের পরিভাষায় বিদআত বলে প্রমাণিত সবটাই গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার শামিল। এর মধ্যে এমন কোনো অংশ বা বিষয় নেই যেটাকে حسنہ বা উত্তম বলা যাবে। তবে কোন কোন شارح ও ব্যাখ্যাকারের কাছে মূল বিষয়টা ঘুলিয়ে গেছে। তাই তারা পারিভাষিক বিদআতকেই হাসানাহ ও সায়্যিআহ হিসাবে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন, যেমন শায়েখ ইয্যুদ্দীন ইব্নে আবদুস সালাম ও যুরকানী প্রমুখ।

বিদআত দুই প্রকার-এই বক্তব্যপন্থীদের দলীল

যারা বিদআতকে হাসানাহ্ ও সায়্যিআহ্– এই দুইভাগে বিভক্ত করেছেন তাদের প্রমাণ হল:

১. জামাআতের সাথে পূর্ণ গুরুত্বসহ তারাবীহ্ আদায় করা সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) বলেছেন, نعم البدعة هذه (কত উত্তম বিদআত এটি।) এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন কোন বিদআত প্রশংসার্হ্য ও উত্তম (حسنہ) বলে বিবেচিত।

এর উত্তর হল- এখানে হযরত ওমর (রা.) বিদআত শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করেছেন, পারিভাষিক অর্থে নয়। কারণ, তরাবীহ্কে শরীআতের পরিভাষায় বিদআত বলা যায় না! কেননা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগেই তরাবীহ্ নামায মাশরূ' (مشروع) বা শরীআত নির্দেশিত ছিল, তবে তার জামাআতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হত না। পরবর্তীকালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষার আলোকেই সেটা করা হয়েছে। জামাআতসহ এই বাহ্যিক রূপটির যেহেতু নতুনভাবে প্রচলন ঘটেছে, সে অর্থেই (অর্থাৎ, আভিধানিক অর্থেই) হযরত ওমর (রা.) তাকে উত্তম বিদআত আখ্যা দিয়ে বলেছেন,

نعم البدعة هذه. (رواه البخاري في كتاب الصوم– باب فضل من قام رمضان)

অর্থাৎ, কত উত্তম বিদআত এটি। (বোখারী)

২. বিদআত দুই প্রকার– এই বক্তব্যপন্থীদের আরেকটি দলীল হল নিম্নোক্ত হাদীছ–

من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجور هم شيئ ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقصمن أوزار هم شيئ. (رواه مسلم في كتاب العلم –باب من سن سنة حسنة أو سيئة الخ)

এর উত্তর হল-এ হাদীসে ব্যবহৃত سن শব্দের অর্থ সুন্নাতে নববী অনুযায়ী যে ব্যক্তি আমল করল। এর অর্থ اختراع বা নতুন সৃষ্টি করা নয়- যেমনটি তারা ধারণা করেছেন। (মুসলিম)

৩. বিদআত দুই প্রকার- এই বক্তব্য পন্থীদের আরেকটি দলীল হল তিরমিযী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীছ–

من ابتدع بدعة ضلالة لايرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها. إلخ. (أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم– باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة وقال : هذا حديث حسن)

এ হাদীছের আলোকে তারা মনে করেছেন এক বাক্যে সব বিদআত মূলত গোনাহের ও নিন্দনীয় নয়। বরং সেটা যদি পথভ্রষ্টতা (ضلاله) ও গোমরাহীর কারণ হয় তবেই সেটা গোনাহের বিষয় এবং তা নিন্দনীয়। এতে বুঝা যায় কিছু বিদআত এমনও আছে যা ضلاله বা গোমরাহীর কারণ নয়। জবাব হল- ضلاله শব্দটি হাদীছ শরীফে قيد اتفاقی হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে قيد احترازی হিসাবে নয়। যেমনটি কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত স্থানে হয়েছে–

﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً.﴾

অর্থাৎ, তোমরা বহুগুণে বৃদ্ধি করে সূদ ভক্ষণ কর না। (সূরা: ৩-আলি-ইমরান: ১৩০)

বিদআতের কোনো ভাগ নেই-এর প্রমাণ

১. বিদআতের নিন্দাবাদে বর্ণিত সবগুলো ভাষ্য (نص)ই 'আম' বা ব্যাপক অর্থবো-ধক। যা সকল প্রকার বিদআতের-ই নিন্দা জ্ঞাপন করে। যেমন: মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীছে আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. (رواه مسلم في كتاب الجمعة)

অর্থাৎ, সববিষয়ের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হল নতুনসৃষ্ট বিষয়। আর সব নতুনসৃষ্ট বিষয় হল বিদআত। (মুসলিম)

হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.)-এর হাদীছে আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إياكم المحدثات، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. (رواه أبو داود في كتاب السنة– باب لزوم السنة، ورواه الترمذي في أبواب العلم– باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة وقال : هذا حديث حسن صحيح. واللفظ لأبي داود)

অর্থাৎ, সাবধান নতুন সৃষ্ট বিষয় থেকে বেঁচে থাক। কেননা, নিশ্চয়ই প্রত্যেকটা নতুনসৃষ্ট বিষয় হল বিদ'আত। আর সব বিদ'আত হল গোমরাহী। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

২. সকল বিদ'আতই মন্দ ও নিন্দনীয়-এ ব্যাপারে সাহাবা, তাবিঈন ও তাঁদের পরবর্তী সালাফে সালিহীনের ইজ্মা রয়েছে। এতে কোনো রূপ বিভক্তি ও তাখসীস নেই। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সকল বিদআত-ই মন্দ (سيئة) সকল বিদআত-ই নিন্দাযোগ্য।

যারা বিদআতকে নানাভাগে ভাগ করেন তাদের দৃষ্টিতে বিদআতের প্রকারসমূহ

উল্লেখ্য যে, যাঁরা বিদআতকে হাসানাহ ও সায়্যিআহ্'-এই দুই ভাগ করেছেন তারা বিদআতকে কেবল দুই প্রকারের মধ্যেই সীমিত রাখেননি, বরং তাঁরা শরীআতের পাঁচ প্রকার হুকুমের ভিত্তিতে বিদআতকেও পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার কোনটি ওয়াজিব, কোনটি মুস্তাহাব, কোনটি মুবাহ কোনটি মাকরূহ।

আয-যুজাজাহ্ গ্রন্থে আছে, ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আবদুল আযীয ইবনে আবদুস সালাম কিতাবুল কাওয়াইদ (كتاب القواعد)-এর শেষে উল্লেখ করেছেন, বিদআত মোট পাঁচ প্রকার। যথা:–

১. ওয়াজিব। যেমন ইল্মে নাহু শিক্ষা করা- যার দ্বারা আল্লাহ ও আল্লাহ্র রসূলের কালাম বুঝা যায়। কেননা, শরীআতের সংরক্ষণ হল ওয়াজিব। আর সেটা শরীআত বুঝা ব্যতীত সম্ভব নয়। এসব ওয়াজিব যার উপর নির্ভরশীল, সেটাও ওয়াজিব হয়ে থাকবে। অনুরূপভাবে কিতাব ও সুন্নাহ-র গরীব শব্দাবলী মুখস্থ করা, ফিক্হের উসূল সংকলন করা, জারহ্ ও তা'দীলের আলোচনায় (صحيح سقيم) শুদ্ধ-অশুদ্ধের পার্থক্য নির্ণয় করা ইত্যাদিও ফরয।

২. হারাম। যেমন– কাদরিয়া, জাবরিয়া, মুরজিয়া, মুজাস্সিমা ইত্যাদি ফিরকা। আর এগুলোর প্রতিরোধ করা হল ওয়াজিব বিদআত। কারণ, এ জাতীয় বিদআত থেকে শরীআতকে হেফাজত করা ফরযে কিফায়াহ্।

৩. মানদূব। যেমন– নানা রকম যোগাযোগ ব্যবস্থা, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যেক এমন নেক কাজ যা ইসলামের প্রথম যুগে ছিল না। যেমন: তারাবীহ।[১]

১. অর্থাৎ, জামাআতসহ। (المرقاة شرح مشكوة)

অনুরূপভাবে সুফিয়ায়ে কেরামের জটিল ও তাত্ত্বিক বিষয়াবলীর আলোচনা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মাসাইলের ক্ষেত্রে দলীল-প্রমাণ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বৈঠক ও মাহ্ফিলের আয়োজন করা।

৪. মাকরূহ। মসজিদে সাজ-সজ্জা করা, কুরআন শরীফে নকশা করণ ইত্যাদি।[১]

৫. মুবাহ্। যেমন: আসর ও ফজর নামাযের পর মুসাফাহা করা।[২] খানা-পিনার স্বাদে বৈচিত্র আনয়ন, পোশাক ও নিবাসে প্রশস্ততা ও জামার আস্তীন বড় ও প্রশস্ত করা। অবশ্য মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেছেন, এর কোন কোনটার মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করেছেন।[৩]

বিদআতের নিন্দনীয় হওয়ার কারণসমূহ

১. বিদআত সৃষ্টির অর্থই হল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে জাহালাত বা মূর্খতার নিসবত করা। যেন এই কথার-ই দাবী করা যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আবিষ্কৃত পদ্ধতিটি জানতেন না। অথচ এটা একটা দ্বীনী বিষয় (বিদআতীদের ধারণা মতে।)!

২. অথবা তিনি জানতেন। তবে মানুষের কাছে সেটা পৌঁছাননি। এর অর্থ হল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেয়ানত করেছেন। বিদআতী ব্যক্তি যেন একথাই বলতে চান যে, (নাউযুবিল্লাহ) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেয়ানত করেছেন, তিনি তাঁর রিসালাতকে যথাযথভাবে পৌঁছে দেননি।

৩. বিদআত আবিষ্কারের অর্থ হল এ কথার দাবী করা যে, দ্বীন এখনো পরিপূর্ণ হয়নি। অথচ আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে মুকাম্মাল করে দিয়েছেন। এ মর্মে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا. الآية.﴾

অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (সূরা: ৫-মায়িদা: ৩)

৪. বিদআতী পরোক্ষভাবে নিজেকে শরীআত প্রবর্তক (شارع)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ারই দাবী করে।

৫. বিদআত সৃষ্টি করার অর্থ সুন্নাতকে মিটিয়ে দেয়া। হাদীছ শরীফে আছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

১. এটা শাফিঈ মাযহাবের মত। হানাফীদের মতে এটা বৈধ-মুবাহ্। –প্রাগুক্ত। ২. এটা শাফিঈদের মত। হানাফীদের মতে মাকরূহ। –প্রাগুক্ত। ৩. ইমাম শাতিবী (রহ.) 'আল-ই'তিসাম' গ্রন্থে আযযুদ্দীন (রহ.)-এর বক্তব্য সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আযযুদ্দীন (রহ.) যেসব বিধি-বিধানের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি তার কোন কোনটির জবাবও দিয়েছেন। বিস্তারিত জানতে হলে 'الاعتصام' দেখুন।

"ما أَحْدَثَ قوم بدعة إلا رُفِعَ مثلُها من السنة" فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. (رواه أحمد في مسنده حديث رقم ١٦٩٠٧. والحديث حسّنه ابن حجر العسقلاني ولاسيوطي وخالفه المناوي)

অর্থাৎ, "কোন সম্প্রদায় কোন বিদআত আবিষ্কার করলে অনুরূপ সুন্নাত উঠে যায়।" (বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন,) অতএব কোন বিদআত আবিষ্কার করার চেয়ে সুন্নাতকে আঁকড়ে থাকাই উত্তম। (মুসনাদে আহমদ)

অন্য একটি বর্ণনায় আছে–

ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلَها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة.

(رواه الدارمي عن حسان موقوفا برقم ٩٨. وإسناده صحيح كذا في هامشه)

অর্থাৎ, কোন সম্প্রদায় তাদের ধর্মে কোন বিদআত আবিষ্কার করলে আল্লাহ অনুরূপ সুন্নাত তুলে নেন। অনন্তর কেয়ামত পর্যন্ত আর সে সুন্নাতকে প্রত্যানীত করেন না। (সুনানে দারিমী)

৬. বিদআত আবিস্কার করার অর্থই দ্বীনকে বিকৃত করা। এক হাদীছে এসেছে– কেয়ামতের দিন কিছু বিদআতী লোককে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মুখে হাওযে কাউছারের নিকট আসতে বাধা দেয়া হবে। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাধা দেয়ার কারণ জানতে চাইলে তাঁকে বলা হবে,

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فاقول : سحقا سحقا لمن غير بعدي. (رواه البخاري في كتاب الحوض)

অর্থাৎ, তুমি জান না তোমার পরে তারা দ্বীনের মধ্যে কী নতুন সৃষ্টি করেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন আমি বলব, যারা আমার পর বিকৃতি সাধন করেছে তাদেরকে হাঁকিয়ে দেয়া হোক, তাদেরকে হাঁকিয়ে দেয়া হোক। (বোখারী)

৭. বিদআতী বিদআতের পাপ থেকে তওবা করার সুযোগ লাভ করে না। কারণ, সে পাপটাকেই দ্বীন মনে করছে। তাই সে এ কারণে লজ্জিত হয় না। আর তওবার জন্য লজ্জিত হওয়াও একটি শর্ত। তাই বিদআত বর্জন না করা পর্যন্ত তওবার সুযোগ হয়ে ওঠে না। হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. (رواه الطبراني وإسناده حسن. كذا في الترغيب والترهيب)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা বিদআত বর্জন না করা পর্যন্ত প্রত্যেকটা বিদআতীর তওবা আটকে রাখেন। (তাবারানী)

যেসব কারণে বিদআতের উদ্ভব ঘটে

১. বিদআত সৃষ্টির প্রথম কারণ হল মূর্খতা। এর ব্যাখ্যা হল– বিদআতের মধ্যে কিছু বাহ্যিক আকর্ষণ আছে। যা দেখে মানুষ সহজেই ধোঁকায় পড়ে যায় এবং তার উপর আমল করতে শুরু করে। ফলে কার্যত তারা ব্যর্থ হয়। তাই পার্থিব জগতে তাদের সাধনা বৃথা যায়। অথচ তারা ভাবে যে, তারা কত উত্তম কাজ-ই না করছে।

২. দ্বিতীয় কারণ হল শয়তানের প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা। শয়তান বিদআতকে তাদের সামনে সুশোভিত করে পেশ করে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ.﴾

অর্থাৎ, শয়তান তাদের সামনে তাদের আমলসমূহকে সুশোভিত করে তুলেছে, অতঃপর তাদেরকে সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। (সূরা: ২৭-নামল: ২৪)

আরও ইরশাদ হয়েছে,

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ اَمْلٰى لَهُمْ.﴾

অর্থাৎ, যারা নিজেদের নিকট হেদায়েত সুস্পষ্ট হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে, শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। (সূরা: ৪৭-মুহ-াম্মাদ: ২৫)

৩. বিদআত উদ্ভাবনের আরেকটা কারণ হল অমুসলমানদের অনুকরণ-অনুসরণ। বিশেষত এ কারণেই আমাদের এই উপমহাদেশে মুসলমানদের মধ্যে নানান রকম রসম ও বিদআতের উদ্ভব ঘটেছে। এগুলোর সিংহভাগের উদ্ভব ঘটেছে হিন্দুদের অনুকরণ– অনুসরণে।

৪. বিদআত সৃষ্টির আরেকটা কারণ হল আধুনিকতা-প্রীতি ও পদমর্যাদার লোভ। এটা একটা ব্যাপক ব্যাধি। এ থেকে কথা, কর্ম ও চিন্তায় নতুনত্ব ও আধুনিকতা সৃষ্টির চেতনা জাগ্রত হয়। ফলে তারা নতুন নতুন কথা ও কাজের অবতারণা করে। এরূপ লোকদের সম্পর্কে হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أبائكم، فإياكم وإياهم، لايُضِلُّونكم ولايفتنونكم. (رواه مسلم في مقدية صحيحه)

অর্থাৎ, শেষ জমানায় প্রতারক মিথ্যুকদের আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের নিকট এমন সব হাদীছ উপস্থিত করবে, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ শোননি। অতএব সাবধান তারা যেন তোমাদেরকে গোমরাহ করতে না পারে, তোমাদেরকে ফিতনায় ফেলতে না পারে। (মুসলিম)

বিদআত চেনার মৌলিক নীতিমালা

১. শরীআত যেখানে কোন একটা বিষয়ের বিশেষ একটি সময় নির্ধারিত করে দিয়েছে, সেখানে আমরা যদি তার জন্যে ভিন্ন একটি সময় নির্ধারণ করি, তাহলেই সেটা বিদআত হয়ে যাবে। এর উপমা হল নামাযের পর মুসাহাফা করা। কারণ, শরীআত সালাম-মুসাফাহাকে নির্ধারণ করেছে সাক্ষাৎ ও বিদায়ের সময়। এখন কোন কোন স্থানে যে নামাযের পর মুসাফাহার রেওয়াজ তৈরি হয়েছে এটা বিদআত- ভিন্ন সময়ের সাথে নির্ধারিত করার কারণে।

আল্লামা ইব্নে আবিদীন শামীতে (রদ্দুল মুহ্তারে) লিখেছেন– আমাদের আলেমগণ ও অন্যান্য আলেমগণ নামাযের পর রেওয়াজী মুসাফাহাকে সময়ের তাখ্সীসের কারণে বিদআত বলেছেন। যদিও মুসাফাহা করা সুন্নাত। মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন– এ কারণেই আমাদের কোন কোন আলেম স্পষ্ট করে বলেছেন, এটা মাকরূহ, এটা নিন্দনীয় বিদআত। শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহ্লভী (রহ.) আশি'আতুল লুম'আত-য়ে বলেছেন, মানুষের মধ্যে নামাযের পর কিংবা জুমুআর পর মুসাফাহার যে রেওয়াজ রয়েছে এর কোনো ভিত্তি নেই। বিশেষ সময়ের সাথে খাস করার কারণে এটা বিদআত।' এর উপমা হল কবরের উপর আযান দেয়া, নামাযের প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর দুরূদ শরীফ পড়া ইত্যাদি।

২. শরীআত যে বিষয়টিকে মুতলাক (শর্ত-বন্ধনহীন) রেখেছে, নিজেদের পক্ষ থেকে قيود (শর্ত-বন্ধন) যোগ করে সেটাকে مقيد (শর্ত-বন্ধনযুক্ত) করা। এর উপমা হল- কবর যিয়ারতের জন্য কোন দিবস নির্ধারণ করা। হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছে দেহ্লভী (রহ.)কে কবর যিয়ারতের জন্যে দিন-তারিখ নির্ধারণ ও বিশেষ দিবসে পালিত ওরসে গমন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি এর উত্তরে বলেছিলেন, কবর যিয়ারত তো জায়েয কিন্তু তার জন্য দিবস ও তারিখ নির্ধারণ করা বিদআত। সালাফে সালেহীনের মধ্যে এ জাতীয় দিন নির্ধারণ করার কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং এটা এমন একটা বিদআত যার মূল জায়েয, শুধু সময় নির্ধারণ করার কারণে সেটা বিদআতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। যেমন তূরান দেশে আসর নামাযের পর মুসাফাহা করার রেওয়াজ প্রচলিত আছে।[১]

এই নীতির আলোকে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, মৃত্যু দিবস পালন, বিশেষ দিবসে ঈসালে ছওয়াবের অনুষ্ঠান যথা মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে, চল্লিশতম দিবসে- এসবই বিদআত। কারণ, এসব ক্ষেত্রেই বিশেষ দিবসের সাথে দুআর আমলকে খাস করা হয়। নিয়ম হল- শরীআত যে আমলকে যেভাবে করতে বলেছে, সেটা ঠিক সেভাবেই আমল করতে হয়। এর মধ্যে পরিবর্তন সাধন হারাম ও বিদআত। এ কারণে সির্‌রী নামাযে জিহ্‌রী কেরাত ও তার বিপরীত করা হারাম ও বিদআত।

---

১. فتاوي عزيزيه ج/١

৪. অনুরূপভাবে যেসব ইবাদতকে শরীআত ইনফিরাদী বা আলাদা আলাদাভাবে করাকে বিধিবদ্ধ ও নির্ধারিত করেছে, সেগুলো জামাআতের সাথে আদায় করা বিদআত। এ কারণেই ফকীহগণ বলেছেন, জামাআতের সাথে নফল নামায পড়া মাকরূহ ও বিদআত।

আল্লামা শামী (রহ.) রদ্দুল মুহ্তার কিতাবে (২য় খণ্ড) বলেছেন, এ কারণেই ফকীহগণ জামাআতবদ্ধ হয়ে "সালাতুর রাগাইব" (صلوة الرغائب) পড়তে নিষেধ করেছেন -যা কিনা লৌকিক কিছু আবেদের সৃষ্টি। কারণ, নির্দিষ্ট ঐ রাতগুলোতে কথিত পদ্ধতিতে এসব নামায পড়ার বিধান শরীআতে বর্ণিত নেই- যদিও নামায একটি পরিপূর্ণ উত্তম আমল।[১]

তাসাওউফ বা সুফিবাদ সম্পর্কে ইফরাত/তাফরীত

নামায, রোযা, প্রভৃতি শরীআতের জাহিরী বিধানের উপর আমল করা যেমন জরূরী, তেমনি এখ্লাস, তাক্ওয়া, সবর, শোক্র প্রভৃতি অন্তরের গুণাবলী অর্জন এবং রিয়া, তাকাব্বুর প্রভৃতি অন্তরের ব্যাধি দূর করা তথা শরীআতের বাতিনী বিধানাবলীর উপর আমল করাও ওয়াজিব। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ﴾

অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিবেন কিতাব ও হিক্মত এবং তাদের তায্কিয়া (تزكيه) তথা আত্মশুদ্ধি করবেন। (সূরা: ২-বাকারা: ১২৯)

আর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا﴾

অর্থাৎ, সফলকাম হবে সে, যে নিজের তায্কিয়া (تزكيه) তথা আত্মশুদ্ধি করবে। (সূরা: ৯১-শাম্স: ৯)

আর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى﴾

অর্থাৎ, সে-ই সেই সফলকাম হবে, যে নিজের তায্কিয়া (تزكيه) তথা আত্মশুদ্ধি করবে এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করবে ও নামায আদায় করবে। (সূরা: ৮৭-আ'লা: ১৪)

এভাবে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছে বাতিনী বিধানাবলীর উপর আমল করার কথা বলা হয়েছে।

এই বাতিনী বিধানাবলীর উপর আমল করাকে বলা হয় তায্কিয়ায়ে নফ্স (تزكيه نفس) বা আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধির এই সাধনাকে বলা হয় আধ্যাত্মিক সাধনা। আর এই শাস্ত্রকে বলা হয় তাসাওউফ বা সূফীবাদ। তবে উলামায়ে কেরাম তাসাওউফ শব্দটিই ব্যবহার করে থাকেন, তাঁরা সূফীবাদ শব্দটি ব্যবহার করেন না।

---

১. বিদআত চেনার এই ষষ্ট মূলনীতি কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে اختلاف امت اور صراط مستقيم গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

কুরআন-হাদীছে তাসাওউফ শব্দটি উল্লেখিত হয়নি।[২] তবে ইহ্সান (احسان) শব্দটি প্রসিদ্ধ হাদীছে জিব্রীলে এসেছে। হযরত জিব্রীল (আ.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন–

ما الإحسان؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. (متفق عليه)

অর্থাৎ, "ইহ্সান" কি? তিনি (নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এমনভাবে যেন তুমি আল্লাহ্‌কে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে না দেখ, তিনি তো তোমাকে দেখছেন। (বোখারী ও মুসলিম)

আহ্‌লে হক কুরআনের আয়াতে বর্ণিত তায্‌কিয়া (تزكيه) এবং উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত ইহ্সান (احسان)-এর ব্যাখ্যার আলোকে তাসাওউফকে জরূরী মনে করেন। তাসাওউফ-এর মামূলাত এই ইহ্সান-এর মাকাম অর্জনের উদ্দেশ্যেই পালন করা হয়। অতএব এটাও কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত বলতে হবে। বস্তুত ইহ্সান (احسان) হল ফযীলতের স্তর। আর তাসাওউফ এই ফযীলতের স্তর অর্জন করার ওসীলা বা মাধ্যম। অতএব ইহ্সানের ন্যায় তাসাওউফ অর্জন করাও কাম্য।

আহ্‌লে হক তাসাওউফের ব্যাপারে বাড়াবাড়িও করেন না, ছাড়াছাড়িও করেন না। যারা মনে করেন পীর না ধরলে মুক্তি নেই তারা বাড়াবাড়িতে আছেন। পীর ধরা ফরয /ওয়াজিব নয়, পীরের হাতে বাইআত হওয়া ফরয/ওয়াজিব নয়, এটাকে সুন্নাত বলা হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে অনেক সাহাবী বাইআত হয়েছেন এই মর্মে যে, আমরা শির্‌ক করব না, যিনা করব না, চুরি করব না, কোন পাপ কাজ করব না, ভাল কাজ করব ইত্যাদি। এটাকে বাইআতে সুলূক বলা যায়। কোন কোন সাহাবী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে এরূপ বাইআত হয়েছেন আবার অনেকে হননি। বাই'আত হওয়া ফরয/ওয়াজিব হলে সব সাহাবীই বাইআত হতেন।

কেউ যদি মনে করেন পীর ধরলে পীর-মাশায়েখগণ মুরীদদের পাপের বোঝা বহন করে বা কবরে হাশরে মুরীদদেরকে তা'লীম ও তাল্‌কীন দিয়ে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন, এটা কুরআন হাদীছ বিরোধী কথা। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

﴿وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى﴾

অর্থাৎ, কেউ কারও কোন পাপের বোঝা বহন করবে না। (সূরাঃ ৬-আনআমঃ ১৬৪)

কেউ নিজে আমল করে নিজের নাজাতের ব্যবস্থা না করলে কোন পীর তাকে নাজাত দিতে পারবে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বড় তো আর কোন পীর হতে

২. কেউ কেউ বলেন, তাসাওউফ (تصوف) শব্দটির অর্থ সূফ বা রেশমী পোশাক পরিধান করা। এর থেকেই এসেছে সূফী শব্দটি। প্রাচীন যুগে সূফী দরবেশগণ রেশমী পোশাক (মোটাসোটা পোশাক) পরিধান করতেন বিধায় ইসলামী পরিভাষায় এই শাস্ত্রের নাম তাসাওউফ হয়ে থাকবে। তবে সূফীসুলভ জীবন-যাপন ও এই বিশেষ ধরনের বস্ত্র পরিধানের পারস্পরিক সম্বন্ধ এতই অগভীর ও অপ্রয়োজনীয় যে, তার দ্বারা ইসলামের সকল তাসাওউফপন্থী সূফী-দরবেশদের জন্য ব্যাপকভাবে তাসাওউফ বা সূফী শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ার সুস্পষ্ট যুক্তি নির্ণয় করা যায় না।

পারে না। স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গোত্র বনূ হাশেম, বনূ মুত্তালিব এবং নিজ কন্যা ফাতেমাকে ডেকে নিজেদের নাজাতের ব্যবস্থা নিজেদেরকে করতে বলেছেন। ইরশাদ করেছেন,

يا بني هاشم! أنقِذُوا أنفسكم من النار، يابني عبد المطلب! انقذوا انفسكم من النار، يافطمة! انقذي نفسكِ من النار، فإني لا املك لكم من الله شيئا. الحديث. (رواه مسلم في كتاب الإيمان– باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين)

অর্থাৎ, হে বনী হাশেম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, (আমি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না।) হে বনূ আব্দিল মুত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, (আমি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না।) হে ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, আমি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না। (মুসলিম)

আবার যারা মনে করেন পীর-মাশায়েখদের কাছে যাওয়ার কোনো দরকারই নেই, অর্থাৎ, যারা তাসাওউফকে ইসলামের বহির্ভূত সাব্যস্ত করেন, তারা ছাড়াছাড়িতে রয়েছেন। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত যথার্থ তাসাওউফকে কখনও ইসলামের বহির্ভূত সাব্যস্ত করেননি।

যারা প্রচলিত তাসাওউফকে অস্বীকার করেন, তারা প্রধানত চারটা সন্দেহের ভিত্তিতে তা করে থাকেন।

১. তারা মনে করেন প্রচলিত তাসাওউফের যিক্‌র, শোগল, মোরাকাবা ইত্যাদি বিদআত, কেননা, এটা ইসলামের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন, কুরআন-হাদীছে যার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এর জওয়াব হল– একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যায় এটা বিদআতের সংজ্ঞায় পড়ে না। কেননা বিদআত বলা হয় ইবাদত এবং ছওয়াব মনে করে ইসলামের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করা। পক্ষান্তরে প্রচলিত তাসাওউফের যিক্‌র, শোগল, মোরাকাবা ইত্যাদিকে ইবাদত এবং ছওয়াব মনে করে করা হয় না। বরং এগুলো করা হয় মাধ্যম ও ওসীলা হিসাবে। মূল উদ্দেশ্য হল তায্‌কিয়া বা আত্মিকগুণাবলী অর্জন করা, যে সম্পর্কে কুরআন-হাদীছের বহুস্থানে তাগীদ এসেছে। এই যিক্‌র শোগলগুলো সেই আত্মিক গুণাবলী অর্জনের ওসীলা বা মাধ্যম হয়ে থাকে। যেমন: প্রচলিত মাদ্রাসা ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠান রসূল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ছিল না। কিন্তু দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজনে পরবর্তীতে এগুলোকে ওসীলা বা মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে মূল উদ্দেশ্য হল দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা দেয়া, যার গুরুত্ব কুরআন-হাদীছে এসেছে। তাসাওউফের যিক্‌র শোগলগুলোও অনুরূপ।

২. যারা প্রচলিত তাসাওউফকে অস্বীকার করেন, তাদের দ্বিতীয় সন্দেহ হল তাযকিয়া বা আত্মিকগুণাবলী অর্জন করার জন্য এসব মাধ্যম গ্রহণের প্রয়োজন থাকলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে কেন এরূপ করা হয়নি?

এর জওয়াব হল– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সোহবত এতখানি কার্যকর ছিল যে, শুধু তাঁর সোহবতেই মানুষের মধ্যে খাওফ, খাশিয়্যাত, আল্লাহর মহব্বত, ফিক্রে আখিরাত, এখ্লাস ইত্যাদি আত্মিক গুণাবলী অর্জিত হয়ে যেত। এ সবের জন্য অন্য আর কোন মেহনত-মোজাহাদার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকত না। যেমন: শুধু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সোহবতই তা'লীমের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাওয়ায় স্বতন্ত্র কোন মাদ্রাসা বা দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন তখন দেখা দেয়নি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সোহবতপ্রাপ্ত সাহাবীদের অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। পরবর্তীতে পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা ও মানুষের মন–মানসিকতার অবনতি ঘটায় শুধু সোলাহাদের সোহবতই এর জন্য যথেষ্ট না হওয়ায় এসব আত্মিক গুণাবলী অর্জন করার জন্য স্বতন্ত্র মেহনত- মোজাহাদার প্রয়োজনে বুযুর্গানে দ্বীন এসব তরীকাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং হাজার হাজার বুযুর্গের অভিজ্ঞতায় এগুলোর কার্যকারিতা সুপ্রমাণিত হয়েছে।

৩. যারা প্রচলিত তাসাওউফকে অস্বীকার করেন, তাদের তৃতীয় সন্দেহ হল- যদি প্রচলিত তাসাওউফের যিক্র, শোগল, মোরাকাবা ইত্যাদি মাধ্যমগুলো এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকত, তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলো সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়ে যেতেন। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব ব্যাপারে কোনো দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাননি।

এর জওয়াব হল- যিক্র, শোগল, মোরাকাবা ইত্যাদি মাধ্যমগুলো যুগকাল ও ব্যক্তির মেজায এবং স্বভাব অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে, পীর মুরশিদগণ তাদের সব ধরনের মুরীদকে একই ব্যবস্থাপত্র দেন না বরং সালেকের মেজায এবং স্বভাব অনুসারে তার জন্য ব্যবস্থাপত্র নির্ধারণ করে থাকেন। এসব ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে এরূপ ব্যাপকতার অবকাশ রাখার জন্যই হয়তো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরীকা খাস করে দিয়ে যাননি।

৪. যারা প্রচলিত তাসাওউফকে অস্বীকার করেন, তাদের চতুর্থ সন্দেহ হল- তাসাওউফের প্রচলিত যিক্র, শোগল, মোরাকাবা ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ার কারণে মানুষ কর্মতৎপরতা থেকে বিচ্যুত ও বিমুখ হয়ে পড়ে।

এই সন্দেহ নিরসনের জন্য তাসাওউফ শাস্ত্রের ইমাম- শাহ ওয়ালীউল্লাহ, মোজাদ্দিদে আল্ফে ছানী, সাইয়্যেদ আহ্মদ বেরেলভী প্রমুখ মনীষীদের জীবনী দেখা যেতে পারে। তাঁরা একদিকে তাসাওউফের যিক্র, শোগল ও পীর-মুরীদীর কাজেও তৎপর ছিলেন আবার তাঁরা এক এক ব্যক্তি জীবনে এমন কাজ করে গেছেন যা এখন কোন বিরাট সংস্থা সংগঠনও করে দেখাতে পারছে না।

ইল্হাম, কাশ্ফ ও কারামত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

এ সম্পর্কে ১ম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন ১৭২–১৭৫ পৃষ্ঠা।

ওলী, আবদাল, গাউছ, কুতুব ইত্যাদি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

এ সম্পর্কে ১ম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন ১৭৫–১৭৬ পৃষ্ঠা।

মাযার, কবর যিয়ারাত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

এ সম্পর্কে ১ম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন ১৭৬ পৃষ্ঠা।

গান-বাদ্য প্রসঙ্গ

গানের সংজ্ঞা

গানের আরবী শব্দ হল غناء (গিনা)। শব্দটি আভিধানিকভাবে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা:–

(১) বড় আওয়াজ বা আরবী লাহান, যে লাহানে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় এবং আরবী কবিতা পাঠ করা হয়।

(২) দ্বিতীয় অর্থ হল গান। "গান"-এর আভিধানিক অর্থ হল সঙ্গীত/কণ্ঠসঙ্গীত। আর পরিভাষায় গান বলা হয় এমন সঙ্গিতকে যা অন্তরে কামোদ্দীপনা জাগ্রত করে ও যৌন সুড়সুড়িমূলক আবেদন সৃষ্টি করে। এ কারণেই গানকে যেনার মন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়। আল্লামা তাহের পাটনী বলেন, এ কারণেই বলা হয়,

الغناء رقية الزنا. (مجمع بحار الأنوار ج/٤)

অর্থাৎ, গান হল যেনার মন্ত্র।

তবে সাধারণত গান বাদ্যযন্ত্র সহকারে হয়ে থাকে বিধায় বাদ্যযন্ত্র সমন্বিত সুর-সঙ্গীতকে গান বলা হয়। যেমন বলা হয়েছে,

وسماع آواز را گویندکه ب آلات (مزامير و معازف) باشد وغناء مع آلات ست (بوادر النوادر از در المعارف)

অর্থাৎ, সামা' বলা হয় বাদ্যযন্ত্র ও বাশীবিহীন সুর-সঙ্গীতকে, আর গান বলা হয় বাদ্যযন্ত্র সমন্বিত সুর-সঙ্গীতকে।

কবিতা পাঠের শরয়ী বিধান

খুশির অনুষ্ঠানে তিন শর্তে غناء তথা সুর করে কবিতা পাঠ সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। শর্তত্রয় হল–

(১) কবিতা পাঠের সাথে দুফ (دف) ব্যতীত অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত না হতে হবে।

(২) কবিতার কথা ও বিষয়বস্তু অশালীন ও অশ্লিল না হতে হবে।

(৩) কবিতাটি সঙ্গিতের সুর-ধারা (وزن موسیقی) মোতাবেক না হতে হবে।

এ ছাড়া কবিতা আবৃত্তিকারী বেগানা নারী না হওয়ারও শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

গান ও বাদ্যের শরয়ী বিধান

শরীআতে গান-বাদ্য হারাম। গান হারাম হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের কোন মতবিরোধ নেই। দুররুল মা'আরিফ গ্রন্থে বলা হয়েছে,

اختلاف ہیچ یکے از علماء بحرمت غنا نیست۔(بوادر النوادر از در المعارف)

অর্থাৎ, (পারিভাষিক) গান হারাম হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মাঝে কোনো মতানৈক্য নেই। অবশ্য বাদ্যের ব্যাপারে সামান্য ব্যাখ্যা রয়েছে। বাদ্য তিন প্রকার–

(১) ঐ সমস্ত বাদ্য যেগুলোকে ঘোষণা ইত্যাদির জন্য বানানো হয়েছে, যেগুলো দ্বারা আনন্দ-ফুর্তি, ক্রিড়া-কৌতুক উদ্দেশ্য নয়। যেমন: ঘণ্টা, দামামা, নাকাড়া। এ সবের ব্যবহার জায়েয।

(২) ঐ সকল বাদ্যযন্ত্র যেগুলো আনন্দ-ফুর্তি, আমোদ-প্রমোদ ও ক্রিড়া-কৌতুকের উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে এবং সেগুলো ফাসেক ফুজ্জারদের প্রতীক (شعار)। যেমন: একতারা, দোতারা, সেতারা, হারমোনিয়াম, গিটার, সারিন্দা ইত্যাদি। এগুলোর ব্যবহার সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

(৩) ঐ সকল বাদ্যযন্ত্র, যেগুলো আমোদ-প্রমোদ ও ক্রিড়া-কৌতুকের জন্য বানানো হয়েছে। তবে সেগুলো ফাসেক ফুজ্জারদের প্রতীক নয়। যেমন: বড় ঢোল। এগুলোর ব্যাপারে ইমাম গাযালী (রহ.) এবং কতক সূফীয়ায়ে কেরাম বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছেন। শর্তগুলো নিম্নরূপ।

(ক) শুনানেওয়ালা শ্মশ্রুবিহীন বালক না হতে হবে অথবা গায়র মাহরাম নারী না হতে হবে।

(খ) পঠিত কবিতার বিষয়বস্তু শরীআত-পরিপন্থী না হতে হবে।

(গ) এর দ্বারা শুধু প্রাণবন্ততা সৃষ্টি উদ্দেশ্য হবে, আমোদ-প্রমোদ ও ক্রিড়া কৌতুকের উদ্দেশ্যে না হতে হবে।

কিন্তু সমস্ত ফকীহ (ফেকাহ বিশারদ)-এর নিকট আমোদ-প্রমোদ ও ক্রিড়া-কৌতুকের উদ্দেশ্যে নির্মিত সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হারাম ও নিষিদ্ধ।

গান-বাদ্য হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল

কুরআন থেকে দলীল

১. কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ.﴾

অর্থাৎ, আর কতক লোক এমন রয়েছে যারা অজ্ঞতাবশত মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে ভ্রষ্ট বা ভ্রান্ত করার জন্য গান-বাদ্যকে ক্রয়/অবলম্বন করে। (সূরা: ৩১-লুকমান: ৬)

এ আয়াতে 'لهو الحديث' দ্বারা উদ্দেশ্য হল 'গান-বাদ্য'। এ সম্পর্কে মুস্তাদরকে হাকিম গ্রন্থে সহীহ সনদে আবুস সাহ্বা (ابو الصهباء) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

قال : سألت عبد الله بن مسعود رضـ من قوله تعالى : ﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ

الْحَدِيْثِ﴾ قال : هو والله الغناء. (رواه الحاكم في المستدرك برقم ٣٥٩٣ وقال : حديث صحيح الإ سناد وأقره عليه الذهبي في التلخيص : صحيح)

অর্থাৎ, আবুস সাহ্বা বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা.)কে কুরআনের এ আয়াত 'ومن الناس من يشترى لهو الحديث' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি (আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ [রা.]) উত্তরে বলেছেন, আল্লাহ্র কসম, গান-বাদ্যই হল لهو الحديث।

এ সম্পর্কে ইব্‌নে আবী শাইবা, ইব্‌নে আবিদ্দুনিয়া, ইব্‌নে জারীর, ইবনুল মুনযির এবং বায়হাকীও সহীহ সনদে আবুস সাহ্বা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (المعانى جـ/١١ صـ٦٧) হযরত জাবের (রা.), ইকরমা, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, মুজাহিদ, মাকহূল প্রমুখেরও এই মত। (تفسير ابن كثير جـ/٣)

উক্ত আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রা.)ও করেছেন। তিনি বলেছেন, 'لهو الحديث' হল গান ও গান জাতীয় ক্রিড়া-কৌতুক। (تفسير روح المعانى جـ/١١ صـ ٦٧) সুতরাং এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, গান-বাদ্য হারাম।

২. আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমের অন্য স্থানে ইরশাদ করেছেন,

﴿وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ.﴾

অর্থাৎ, (আল্লাহ তাআলা শয়তানকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,) 'তুমি তাদের মধ্য থেকে যাকে পার "তোমার আওয়াজ" দ্বারা সত্যচ্যুত কর।' (সূরা: ১৭-বানী ইসরাঈল: ৬৪)

বিশিষ্ট তাফসীরকারক আল্লামা মুজাহিদ (রহ.) "শয়তানের আওয়াজ"-এর ব্যাখ্যা করেছেন গান-বাদ্য ও অনর্থক ক্রিড়া-কৌতুক দ্বারা। (تفسير روح المعانى حـ/٨ صـ ٦٧) সুতরাং যে গান-বাদ্য শয়তানের আওয়াজ তা কক্ষণো শরীআতে বৈধ হতে পারে না।

৩. কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَ تَضْحَكُوْنَ وَ لَا تَبْكُوْنَ وَ اَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, তোমরা কি এই বিষয়ে (কুরআনে কারীমে) আশ্চর্যবোধ করছ? (অস্বীকার করছ?) এবং হাসছ (ঠাট্টা স্বরূপ), ক্রন্দন করছ না (নিজেদের সীমা লংঘনের কারণে)? আর তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছ? (তথা গান-বাদ্য বাজিয়ে মানুষকে কুরআন থেকে বিমূখ করছ?) [সূরা: ৫৩-নাজ্‌ম: ৫৯-৬১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবূ উবায়দা বলেন,

السُّمُود الغناء بلغة حِمْيَر. (تفسير روح لمعاني جـ/١٤ صـ ٦٧)

অর্থাৎ, হিময়ারীদের পরিভাষা অনুযায়ী السمود হল গান-বাদ্য। যেমন তারা বলে থাকে - يا جارية أُسْمُدي لنا অর্থাৎ, غنى لنا – হে খুকি! গান শুনাও তো।

ইবনে আব্বাস (রা.)ও سمود -এর অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, هو الغناء باليمانية অর্থাৎ, ইয়ামানী ভাষায় এর অর্থ হল গান করা। (اخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح. كذا في مجمع الزوائد ج/٧. صفحه/١١٦)

উপরোক্ত আয়াতে গান-বাদ্য বাজিয়ে মানুষকে কুরআন থেকে বিমুখ করার দরুন আল্লাহ তাআলা কর্তৃক কড়া ধমক প্রদত্ত হয়েছে, যা গান-বাদ্য নিষিদ্ধ হওয়াকেই বোঝায়।

সুতরাং পুর্বোল্লেখিত আয়াতত্রয় দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, গান-বাদ্য হারাম। সূফী সম্রাট শায়খ সোহরওয়ার্দী (রহ.)ও স্বরচিত "আওয়ারিফুল মাআরিফ" (عوارف المعارف) গ্রন্থে উপরোক্ত আয়াতত্রয় দ্বারা গানের নিষিদ্ধতার ওপর প্রমাণ পেশ করেছেন।

হাদীছ থেকে দলীল

গান-বাদ্যের নিষিদ্ধতা ও অসারতার উপর অসংখ্য হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হাদীছ নিম্নে প্রদান করা হল।

১. হযরত আবূ মালিক/আবূ আমের আশআরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحديث. (رواه البخاري في كتاب الأشربة– باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. ج/٢ ص ٨٣٧)

অর্থাৎ, আমার উম্মতের মাঝে এমন সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ এবং বাদ্যযন্ত্রকে (গান-বাদ্যকে) হালাল মনে করবে।[১] (বোখারী)

২. সুনানের মাঝে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে–

الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. (قال العراقي : ورفعه غير صحيح. قال صاحب روح المعاني : وفيه إشارة إلى إن وقفه على ابن مسعود صحيح، وهو في حكم المرفوع إذ مثله لايقال من قبل الرأى. تفسير روح المعاني ج/١١ ص ٦٧)

অর্থাৎ, গান-বাদ্য মানুষের অন্তরে নেফাক বা কপটতা উৎপন্ন করে, যেমনিভাবে পানি জমিনে শষ্যাদি উৎপন্ন করে। (রূহুল মাআনী)

৩. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে,

إن النبي صلى الله عليه و سلم قال : صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ورنّة عند مصيبة. (قال الهيثمي رواه البزار ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ج/٣ صفحه/١٣)

১. এ হাদীছকে ইবনে হাযম জাহিরী "মুনকাতি" আখ্যায়িত করে বাদ্যযন্ত্র হারাম হওয়ার পক্ষে এ হাদীছ দলীল হওয়ার অযোগ্য সাব্যস্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারগণ বিশেষভাবে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী ইবনে হাযম জাহিরীর বক্তব্যের উপযুক্ত খণ্ডন পেশ করেছেন। অনেকে এ বিষয়ে ইবনে হাযম জাহিরীর খণ্ডনে কিতাবও লিখেছেন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মুফতী শফী সাহেব (রহ.) কৃত اسلام اور موسیقی গ্রন্থ।

অর্থাৎ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুই ধরনের আওয়াজ এমন রয়েছে যার উপর দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতে লানত হয়। এক হল আনন্দের সময় বাঁশীর (বাদ্যযন্ত্রের) আওয়াজ আর এক হল বিপদ-মুসীবতের সময় হা-হুতাশ ও বিলাপ করে রোদনের আওয়াজ। (মুসনাদে বায্যার)

৪. হযরত ইমরান ইব্নে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত–

إن النبي صلى الله عليه و سلم قال : في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله! ومتى ذلك؟ قال : إذا ظهرت القيان والمعازف وشرب الخمور. (رواه الترمذي في ابواب الفتن – باب ماجاء قول النبي صلى الله عليه و سلم : بعثت أنا والساعة كهاتين، وقال : هذا حديث غريب اهـ. والحديث وإن قال الترمذي بعد إخراجه : "غريب" لكن ذكره المنذري في الترغيب والترهيب [برقم ٣٥٢٢] و وكلامه هنال يُشْعِرُ بأن الحديث عنده قوي وقابل للا ستدلال)

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এ উম্মতের মাঝে ভূমিধস, চেহারার বিকৃতি ও প্রস্তর বর্ষণ হবে। তখন জনৈক সাহাবা প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর রসূল! কখন এমনটা হবে? উত্তরে তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যখন তাদের মাঝে গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের বিস্তার ঘটবে এবং মদ্যপানের প্রবর্তন ঘটবে। (তিরমিযী)

৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আমর (রা.) বর্ণনা করেন,

إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال : كل مسكر حرام. (رواه أبو داود في كتاب الأشربة– باب ما جاء في السكر)

অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরাব, জুয়া, তবলা/বীণা ও চীনা/চাউল নির্মিত নবীয (মাদক জাতীয় পানি) থেকে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, সমস্ত নেশা দ্রব্য হারাম। (আবূ দাউদ)

ফেকাহর কিতাব থেকে দলীল

গান-বাদ্যের নিষিদ্ধতা সম্বন্ধে ফেকাহর কিতাবেও প্রচুর স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। প্রসিদ্ধ ফতোয়ার কিতাব শামীতে আছে–

وقد نقل في البزازية عن القرطبي إجاع الأيمة علي حرمة هذا الغناء وضرب القضيب والرقص. (رد المحتار ج/٦ مطلب في مستحل الرقص)

অর্থাৎ, বায্যাযিয়া গ্রন্থে কুরতুবী থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই গান-বাদ্য, কযীব (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ) ও নাচ হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের ইজমা (ঐক্যমত্য) রয়েছে।

গানবাদ্যের বৈধতার দাবিদার বিদআতীদের কতিপয় দলীল/প্রমাণ ও তার উত্তর

১ ম দলীল

عن الربيع بنت معوذ بن عفراء (قالت) : جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليَّ حين بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر ، إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال : دعي هذه وقولي بالذي كنتِ تقولين. (رواه البخاري في كتاب النكاح- باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، ورواه أبو داود في الغنى واللفظ للبخاري)

অর্থাৎ, রুবাইয়্যি' বিন্‌তে মুআওয়্যিয ইবনে আফরা' (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, স্বামীর ঘরে আমার প্রবেশের দিবসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলেন এবং আমার বিছানার উপর এমনভাবে বসলেন যেমন তুমি আমার কাছে বসেছ। তখন আমাদের গোত্রের ছোট ছোট মেয়েরা দুফ বাজাচ্ছিল আর বদর যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী আমাদের পূর্ব পুরুষদের সৌর্য-বীর্য সম্বলিত কাব্য পাঠ করছিল। এক পর্যায়ে তাদের একজন বলে উঠল, আমাদের মাঝে এমন একজন নবী রয়েছেন যিনি ভবিষ্যতের খবর জানেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "এমন কথা বলো না বরং পূর্বে যেকথা বলছিলে তা-ই বলতে থাক"। (বোখারী ও আবূ দাউদ)

খণ্ডন

এ হাদীছে বিবাহের অনুষ্ঠানে দুফ বা তাম্বুরা বাজিয়ে পূর্বসূরীদের শৌর্য-বীর্য মূলক কবিতা আবৃতির কথা এসেছে। এটা প্রচলিত গান নয়। আর শরীআতে খুশির অনুষ্ঠানে দুফ বাজানোর অনুমতি রয়েছে। তবে শর্ত হল দুফের মাঝে ঝাঁঝ না থাকতে হবে।

এ হাদীছে বর্ণিত দুফের ব্যাপারে মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন,

المراد الدف الذي كان في زمان المتقدمين، وأما ما عليه الجلاجل فينبغي أن يكون مكروها بالاتفاق.

অর্থাৎ, উপরোক্ত হাদীছে দুফ দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুতাকাদ্দিমীনের (পূর্ববর্তী যুগের) দুফ (যাতে ঝাঁঝ ছিল না)। আর যে দুফের মাঝে ঝাঁঝ রয়েছে তা ব্যবহার করা সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ বা অপছন্দনীয়।

সুতরাং কবিতা পাঠের শর্তত্রয় যথাযথ রেয়ায়েত করার পর শুধু আনন্দ খুশীর অনুষ্ঠানে ঝাঁঝ-বিহীন দুফ বাজিয়ে কবিতা পাঠ করা জায়েয আছে বিধায় উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা বাদ্যযন্ত্র ও গানের বৈধতার উপর প্রমাণ পেশের কোনো অবকাশ নেই।

২য় দলীল

গান-বাদ্যের বৈধতার স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীছটি দ্বারাও প্রমাণ পেশ করা হয়ে থাকে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত-

قالت : دخل عليَّ النبي صلى الله عليه و سلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحوَّل وجهه، ودخل أبو بكر رض فانتهر ني وقال : مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد. الحديث. (رواه البخاري في كتاب القيدين- باب الحرب والدرق يوم العيد ج/١ صـ١٣٠)

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আসলেন। তখন ছোট ছোট দুই বালিকা আমার নিকট বু'আছের যুদ্ধ সম্বলিত গান (কবিতা) পাঠ করছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আর চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। এমন সময় আবূ বকর (রা.) আসলেন এবং (মেয়েদের এ কবিতা পাঠের দরুন) আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট শয়তানের বাঁশী? তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) কে লক্ষ্য করে বললেন, এদেরকে ছেড়ে দিন। অতঃপর যখন তিনি অন্যমনা হলেন, তখন আমি মেয়েদেরকে বেরিয়ে যেতে ইশারা করলাম। আর সেদিনটি ছিল ঈদের দিন। (বোখারী)

খণ্ডন

এখানে খুশির দিবসে মেয়ে দুটি বাদ্য-যন্ত্র বিহীন কিংবা দুফ (ঝাঁঝ বিহীন) বাজিয়ে কবিতা পাঠ করছিল, যা শরীআতে বৈধ। (দ্রঃ পূর্বের হাদীছের জওয়াব) হাদীছে বর্ণিত بغناء بعاث (বু'আছের যুদ্ধ সম্বলিত গান) শব্দ থেকেও পরিষ্কার বুঝা যায় এটা কোন প্রচলিত গান ছিল না, বরং এটা ছিল 'বু'আছ'-যুদ্ধ সংক্রান্ত স্বপক্ষের কীর্তিগাথা ও প্রতিপক্ষের নিন্দা কাব্য। এ হাদীছে উক্ত বালিকাদ্বয় যে প্রচলিত গান করছিল না- তার প্রমাণ উক্ত হাদীছের একটু পরেই পরবর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটি-

عن عائشة قالت : دخل عليَّ أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت : وليسنا بمغنيتين. الحديث. (رواه البخاري في كتاب النكاح- باب سنة القيدين لأهل الإسلام ج/١ صفحه/١٣٠)

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমার নিকট আবূ বকর আসলেন। তখন আনসারী গোত্রের ছোট ছোট দুই বালিকা আমার নিকট বু'আছের যুদ্ধে আনসাররা পরস্পরে যা বলাবলি করত তা গাইছিল। আয়েশা বলেন, মেয়ে দু'টি গায়িকা ছিল না। (বোখারী)

এ হাদীছে বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) تغنيان (গাইছিল) শব্দ থেকে উদ্ভূত সন্দেহ দূর করে দিয়েছেন। তিনি মেয়ে দুটির ব্যাপারে বলেছেন, 'وليستا بمغنيتين' অর্থাৎ, মেয়ে দুটি গায়িকা ছিল না। অর্থাৎ, তারা গান করা জানত না, তাই তারা যা পাঠ করছিল তা গান ছিল না বরং তা ছিল কবিতা পাঠ, যাকে রূপকার্থে تغنيان (গাইছিল) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। তদুপরি তিনি বলেছেন, "বু'আছের যুদ্ধে আনসাররা পরস্পরে যা বলাবলি করত তা গাইছিল।" এ থেকেও স্পষ্ট যে, তা প্রচলিত গান নয় বরং তা হল যুদ্ধ সংক্রান্ত স্বপক্ষের কীর্তিগাথা ও প্রতিপক্ষের নিন্দাকাব্য। শুধু "গাওয়া" শব্দ থেকেই গান গাওয়া বুঝে নেয়াটা ভুল হবে। গাওয়া (غناء) শব্দটি সুন্দর করে, সুর করে পাঠ করার ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন হাদীছে কুরআন পাঠের ব্যাপারে এ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

অনুরূপভাবে হাদীছের যত স্থানে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে يغني - غني শব্দের ব্যবহার হয়েছে সে সকল স্থানে غناء -এর প্রথম অর্থ– 'কবিতা পাঠ করা' উদ্দেশ্য। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু হাদীছে গান-বাদ্য নিষিদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও গান-বাদ্যকে চরমভাবে ঘৃণা করতেন। তবে কখনো তাঁরা বাদ্যযন্ত্র বিহীন বৈধ কবিতা পাঠ করতেন এবং শুনতেন। আর সাহাবায়ে কেরামের এ কাজটিকেই সাহাবায়ে কেরাম গান করতেন ও শুনতেন বলে বাতিলপন্থীরা অপপ্রচার করে গান-বাদ্যের স্বপক্ষে দলীল দাঁড় করানোর অপপ্রয়াস চালিয়েছেন।

৩য় দলীল

তারা নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারাও দলীল পেশ করে থাকেন।

عن عائشة رضـ أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عئشة! ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. (رواه البخاري في كتاب النكاح– باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها. ج/٢ صـ ٧٧٥)

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক দুলহানকে তার আনসারী স্বামীর ঘরে পাঠালেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! তোমাদের কি বিনোদনমূলক কবিতা পাঠক ছিল না? আনসাররা প্রমোদ ও বিনোদনমূলক কবিতা ভালবাসে। (বোখারী)

বাতিলপন্থীরা দাবী করে যে, এ হাদীছে ব্যবহৃত لهو শব্দটি ব্যাপক। সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র ও গান এর অন্তর্ভুক্ত।

খণ্ডন

বাতিলপন্থীদের এ দাবীর উত্তর হল– এখানে لهو দ্বারা বাদ্যযন্ত্রবিহীন প্রমোদ ও বিনোদনমূলক কবিতা (গযল) পাঠ উদ্দেশ্য। যা বুঝা যায় 'ইব্‌নে মাজা' শরীফের ১৩৭ নং পৃষ্ঠার বর্ণনা থেকে। বর্ণনাটি নিম্নরূপ–

أرسلتم معها من يغني؟ قالت : لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إ ن الأنصار قوم غزل فلو بعثتم معها من يقول : أتيناكم أتيناكم + فحيانا وحيا كم. (رواه ابن ماجة في كتاب النكاح– باب الغناء والدف)

অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা কি কনের সাথে এমন কাউকে প্রেরণ করেছ যে গাইবে? কেননা আনসাররা গযলপ্রিয়, যদি এমন কাউকে পাঠাতে যে গিয়ে গাইত,

أتيناكم أتيناكم + فحيانا وحياكم.

অর্থাৎ, এসেছি আমরা এসেছি; তিনি দীর্ঘজীবী করেন আমাদেরকে এবং দীর্ঘজীবী করেন তোমাদেরকে।

এ হাদীছে স্পষ্টত "গযল" শব্দের উল্লেখ রয়েছে। অতএব বুঝা গেল যেসব হাদীছে غناء (গাওয়া) শব্দের ব্যবহার হয়েছে তা দ্বারা প্রচলিত গান গাওয়া নয়, বরং এই গযল গাওয়াই বোঝানো হয়েছে। আর "গযল" বলতে বোঝায় বাদ্যযন্ত্রবিহীন ভাল অর্থপূর্ণ প্রমোদমূলক ও বিনোদনমূলক কবিতা। সুতরাং পূর্বোল্লেখিত হাদীছ দ্বারা শুধু বৈধ কবিতা পাঠের প্রমাণ পাওয়া যায়। অথবা বেশির থেকে বেশি দুফ বাজিয়ে কবিতা পাঠ করার প্রমাণ পেশ করা যায়, যা শরীআতে অনুমোদিত। কিন্তু উক্ত হাদীছ দ্বারা গান-বাদ্যের স্বপক্ষে দলীল পেশ করার কোনো অবকাশ নেই।

বস্তুত বাতিলপন্থীরা যেসকল হাদীছ, আছার ও আইম্মায়ে কেরামের উক্তি দ্বারা গান-বাদ্যের স্বপক্ষে দলীল পেশ করেছেন, সেগুলোতে তারা হয় জলজ্যান্ত মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, নয়তো অপব্যাখ্যা ও মনগড়া ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, কিংবা ভুল ব্যাখ্যার শিকার হয়েছেন।

সামা' (سماع) প্রসঙ্গ

সামা'র পরিচয়

সামা' (سماع)-এর আভিধানিক অর্থ শ্রবণ করা, গান, ধর্ম-সঙ্গীত। পরিভাষায় সামা' বলা হয়,

كل ما التذبه الأُذُنُ من صوت حسن. (قواعد الفقه)

ঐ শ্রুতি মধুর আওয়াজ, যা দ্বারা কর্ণ পুলক অনুভব করে।

سماع-এর সংজ্ঞা এভাবেও দেয়া হয়েছে–

وسماع آوازے را گویند کہ بے آلات (مزامیر و معازف) باشد۔ (بوادر النوادر ازور المعارف)

অর্থাৎ, সামা' বলা হয় বাদ্যযন্ত্র ও বাঁশিবিহীন সুর-সঙ্গীতকে।

সামা'-র হুকুম

হযরত ইমাম গাযালী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, কাজী আবুত্ তায়্যিব (রহ.) সামা'র ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ও

ইমাম সুফিয়ান (রহ.) থেকে এমন শব্দ বর্ণনা করেছেন যা থেকে বুঝা যায় এসব ইমামের নিকট সামা' হারাম। (حق السماع ص ٣)

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) কৃত بوادر النوادر (বাওয়াদিরুন নাওয়াদির) নামক গ্রন্থে সামা' সম্পর্কে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর ব্যাপক অর্থবোধক ছোট একটি উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে। তাহল-

مبتدی را نقصان است ومنتہی را حاجت نیست

অর্থাৎ, সুলূকের লাইনে প্রাথমিক পর্যায়ের যারা, সামা' তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। আর যারা এ লাইনে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে, তাদের জন্য নিস্প্রয়োজনীয়।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে-

أنه سئل عن السماع فقال : هو ضلال للمبتدي المنتهي لا يحتاج أليه. (بفسير روح المعاني ج/١١ ص ٧٢)

অর্থাৎ, তাঁকে সামা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সুলূকের লাইনে প্রাথমিক পর্যায়ের যারা, সামা' তাদের জন্য অত্যন্ত গোমরাহী। আর যারা এ লাইনে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে, তাদের জন্য নিস্প্রয়োজনীয়।

ইমাম গাযালী (রহ.) إحياء علوم الدين গ্রন্থে পাঁচটি শর্ত পূরণ করা এবং পাঁচটা অন্তরায় থেকে বেঁচে থাকার শর্তে সামা'কে মুবাহ বলেছেন।[১] যে পাঁচটি শর্ত পূরণ করতে হবে তা হল–

১. সঙ্গী, স্থান ও কাল- এই তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। স্থানের প্রতি লক্ষ রাখার অর্থ হল সামা' এমন স্থানে হতে হবে যাতে লোক চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে এবং হট্টগোল না হয়। আর কাল বা সময়ের প্রতি লক্ষ রাখার অর্থ হল এমন সময়ে সামা' না করা যাতে শরঈ বা তবয়ী কোন কাজের ব্যাঘাত ঘটে।
২. এমন মুরীদের সম্মুখে সামা' শোনা যাবে না, যাদের জন্য সামা' ক্ষতিকর। এমন মুরীদ তিন প্রকার। (বিস্তারিত জানার জন্য দ্রঃ حق السماع)
৩. অত্যন্ত মনোযোগিতার সাথে কান লাগিয়ে শুনতে হবে। এদিক সেদিক দৃষ্টি দেয়া যাবে না। এমনকি সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের দিকেও দৃষ্টি দেয়া যাবে না।
৪. দাঁড়িয়ে জোর আওয়াজে চিৎকার করতে পারবে না।
৫. যদি কোন সাদিকুলহাল ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে সকলে তার অনুসরণ করবে।

আর যে পাঁচটা অন্তরায় থেকে বেঁচে থাকতে হবে তা হল–

১. যে শোনাবে সে গায়রে মাহ্‌রাম মহিলা না হতে হবে এবং দাড়িবিহীন বালক না হতে হবে।

১. ভণ্ড পীর-ফকীরগণ ইমাম গাযালী (রহ.) সামা'কে জায়েয বলেছেন- এ কথাটি অত্যন্ত ফলাও করে প্রচার করে থাকেন, কিন্তু তিনি যেসব শর্ত বলেছেন, সেগুলোর উল্লেখ তারা করেন না। বস্তুত তিনি যেসব শর্ত আরোপ করেছেন, তার আলোকে ঐসব ভণ্ড পীর-ফকীরদের আচরিত সামা'কে কোনোক্রমেই বৈধ বলা যায় না।

২. যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র এবং মদ ইত্যাদি না থাকতে হবে।[১]
৩. সামা'র বিষয়বস্তু অশালীন, কামোদ্দীপক ও শিরক-মিশ্রিত হতে পারবে না।
৪. যৌবনের প্রাবল্য না থাকা। সুতরাং যার মাঝে যৌবনের তেজ এবং যৌন উত্তেজনার প্রাবল্য বিদ্যমান, তার জন্য সর্বাবস্থায় সামা' হারাম।
৫. সামা' শ্রবণকারী ব্যক্তি দ্বীনী জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ মানুষ (عوام الناس) না হতে হবে।

শায়খ আবূ আব্দির রহমান সুলামী বলেন, আমি আমার দাদাকে বলতে শুনেছি- সামা' শ্রবণকারীর কলব বা অন্তরকে জিন্দা আর নফ্‌স তথা প্রবৃত্তিকে মৃত করে নিবে। এর বিপরীত ঘটলে সামা' শ্রবণ করা হারাম। আর কলব জিন্দা হয় কলবের গুণাবলী উজ্জীবিত করা দ্বারা এবং নফ্‌সের মৃত্যু হয় নফ্‌সের স্বভাবজাত চাহিদাগুলো দমন করা দ্বারা। কলবের গুণাবলী হল– ইল্‌ম, ইয়াকীন, শোক্‌র, যিক্‌র, খাশিয়্যাত বা খোদাভীতি, খোদাপ্রেম প্রভৃতি। আর নফসের স্বভাবজাত চাহিদা হল কাম, ক্রোধ, অহংকার, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, সম্মানপ্রীতি প্রভৃতি।

বলা বাহুল্য, বর্তমান জমানার বে-শরা ফকীরদের মাঝে পূর্বোল্লেখিত পূরণ করতে হবে এমন ৫টি শর্তের একটিও পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে সামা'র অন্তরায় ৫টা বিষয়ের সবগুলোই তাদের মাঝে পাওয়া যায়। তাই রদ্দুল মুহ্‌তারে (শামীতে) বলা হয়েছে,

وما يفعله متصوفة زمانتا حرام لايجوز القصد الجلوس اليه ومن قبلهم لم يفعل كذالك.

অর্থাৎ, আমাদের জমানার বে-শরা ফকীররা যা করে থাকে তা সম্পূর্ণ হারাম। তাদের অনুষ্ঠানে যাওয়ার ইচ্ছা করা এবং সেখানে বসা জায়েয নেই। আর (তারা পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীন গান-বাদ্য করেছেন বলে যে বরাত দিয়ে থাকেন তা সঠিক নয়।) পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীন কখনও তাদের মত গান-বাদ্য করেননি।

ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম হুলওয়ানী (রহ.)কে স্বঘোষিত মা'রেফতী ফকীরদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এই উত্তরই প্রদান করেছেন।[২]

আল্লামা ইবনুস সালাহ তার ফতওয়ায় দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন,

فإذن هذا السماع حرام بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين. (تفسير روح المعاني ج/١١. ص/٦٩)

অর্থাৎ, মুসলমানদের সকল ইমামের সর্বসম্মত মতে এই সামা' হারাম।

১. আল্লামা তাহের পাটনীও অনুরূপ বলেছেন,

وما أحدثه المتصوفة من السماع بالآت فلا خلاف في تحريمه. (مجمع بحار الأنوار ج/٤. ص/٧١)

অর্থাৎ, তথাকথিত সূফীগণ বাদ্য-যন্ত্র সহকারে যে সামা'-র উদ্ভব ঘটিয়েছেন, তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই।

২. عالمگیری ج/٤ ص ١١٠

"ফতওয়ায়ে শামীতে 'সামা'র' শর্তসমূহ বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে,

والحاصل أنه لارخصة في السماع في زماننا لأن الجنيد رحـ تاب عن السماع في زمانه.

(رد المحتار جـ/٥. صـ/٢٣٠)

অর্থাৎ, মোটকথা, আমাদের জমানায় সামা'র কোনো অনুমতি নেই। যেহেতু হযরত জুনাইদ (রহ.) তার যুগে সামা' থেকে তওবা করেছেন।

সারকথা, সামা' মুবাহ হওয়ার ক্ষেত্রেই মতানৈক্য রয়েছে। বহু মনীষী সমূলেই সামা'কে নাজায়েয বলেছেন। যারা সামা'কে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে মুবাহ বলেছেন, তারা এমন সব শর্তারোপ করেছেন যা এ জমানায় পালিত হচ্ছে না। সম্প্রতি বাস্তব অবস্থা হল বে-শরা ফকীররা গান-বাদ্য ও নারী সমন্বিত নাচ-গানের আসরকে বুযুর্গানে দ্বীন কর্তৃক চর্চিত সামা' বলে চালিয়ে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এবং এই সামা'কে তারা ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় বলে মনে করছে। এভাবে তারা একদিকে বুযুর্গদের প্রতি মিথ্যা নেছবত প্রদান করে চলেছে, অপরদিকে তারা দ্বিগুণ পাপে জর্জরিত হচ্ছে। প্রথমত হারাম করার কাজ করার পাপ, দ্বিতীয়ত সেই হারাম কাজকে ইবাদত মনে করার পাপ। সুতরাং বর্তমান যুগে প্রচলিত সামা' সর্বশ্রেণীর উলামায়ে কেরামের মতে সন্দেহাতীতভাবেই হারাম ও কবীরা গুনাহ।

মীলাদ মাহফিল প্রসঙ্গ

মীলাদ বা মীলাদ-মাহ্ফিলের অর্থ

মীলাদ (میلاد)-এর আভিধানিক অর্থ জন্ম, জন্মকাল ও জন্মতারিখ। পরিভাষায় মীলাদ বা মীলাদ-মাহ্ফিল বলতে বোঝায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা বা জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনার মজলিস। তবে আমাদের দেশের প্রচলিত মীলাদ মাহ্ফিল বলতে সাধারণত বোঝায় ঐ সব অনুষ্ঠান, যেখানে মওজূ' রেওয়ায়েত সম্বলিত তাওয়ালুদ[1] পাঠ করা হয়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রশংসামূলক বিভিন্ন কসীদা পাঠ করা হয় ও সমস্বরে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয়। অনেক স্থানে দুরূদ পাঠ করার সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিসে হাজির-নাজির হয়ে যান– এই বিশ্বাসে কেয়ামও করা হয়। এসব করা হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা হোক বা না হোক সেটাকে মীলাদ মাহফিল মনে করা হয়। আর এসব না হলে অর্থাৎ, তাওয়ালুদ পাঠ না হলে, সমস্বরে দুরূদ পাঠ না হলে সেটাকে মীলাদ মনে করা হয় না, চাই সে মজলিসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে যতই আলোচনা

১. "তাওয়ালুদ" বলতে বোঝায় ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقوال المرضية. إلخ পাঠ করা। এর বক্তব্য সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। এটি বা এ জাতীয় আরও যেসব মীলাদনামা মওলুদখানীর মজলিসে পড়া হয় এগুলো হাদীছ ও সীরাতের কিতাবাদি তো দূরের কথা, খাইরুল কুরূনও নয় তার পরবর্তী শত বছরেও এগুলোর নাম নিশানা ছিল না।

করা হোক না কেন। তাই প্রচলিত মীলাদ-মাহফিল আর সত্যিকার পারিভাষিক মীলাদ-মাহ্ফিল তথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনার মাহফিল আমাদের সমাজে দুটো ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

মীলাদ-মাহ্ফিলের হুকুম

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমাদের দেশে প্রচলিত মীলাদ মাহফিল আর প্রকৃত মীলাদ-মাহ্ফিল তথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বরকতময় জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা দুটো ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। সেমতে প্রচলিত মীলাদ মাহফিল বিদআত আর প্রকৃত মীলাদ-মাহ্ফিল তথা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বরকতময় জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনার মাহফিল মুস্তাহাব।

এ ব্যাপারে ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়্যার কিতাবুল বিদআতে উল্লেখ করা হয়েছে,

مجلس مولود مجلس خیر و برکت ہے در صورتیکہ ان قیودات مذکورہ سے خالی ہوفقط بلا قیدوقت تعین و بلا قیام و بغیر روایت موضوع مجلس خیر و برکت ہے صورت موجودہ جومروج ہے بالکل خلاف شرع ہے اور بدعت ضلالہ ہے۔ (فتاوی رشیدیہ)

অর্থাৎ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা সভা অত্যন্ত পূণ্য ও বরকতময় যখন সেটা সব ধরনের প্রচলিত শর্ত-বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। অর্থাৎ, সব ধরনের শর্ত-বন্ধন তথা সময় নির্দিষ্ট করণ, কেয়াম ও জাল রেওয়ায়েত বর্ণনা করণ ইত্যাদি ছাড়া শুধু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম বিষয়ক আলোচনা কল্যাণ ও পূণ্যময়। কিন্তু বর্তমান প্রচলিত মীলাদ সম্পূর্ণ শরীআত-বিরোধী এবং বিদআত ও গোমরাহী।

একটা সন্দেহ-নিরসন

যারা প্রচলিত মীলাদ-মাহফিলের বিরোধিতা করেন, প্রচলিত মীলাদপন্থীদের পক্ষ থেকে তাদের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মহব্বত-ভালবাসা তথা নবী প্রেম কম থাকার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়ে থাকে। অতএব এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, নিঃসন্দেহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা পোষণ করা প্রকৃত ঈমানের দাবী। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রের সঠিক বিবরণ এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিটি কথা ও কাজকে বর্ণনা করা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মহান উপায়। তাই জীবনের এমন কোন মুহূর্ত নেই যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করা নিষেধ। কিন্তু প্রচলিত মীলাদ-মাহফিলের বৈধতার জন্য দুটো বিষয় দেখার রয়েছে। যথা:–

১. দেখতে হবে প্রচলিত মীলাদ-মাহফিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং খাইরুল কুরূনের কারও থেকে প্রমাণিত কি না? যদি

প্রমাণিত হয়, তাহলে মুসলমানদের এতে কুণ্ঠাবোধ করার কোনো অবকাশ নেই। কেননা, তারা যা কিছু করেছেন সেটাই দ্বীন। আর যদি প্রমাণিত না হয়, তাহলে তা দ্বীনী কাজ নয় বরং দ্বীন-বহির্ভূত গর্হিত কাজ। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর দীর্ঘ ২৩ বৎসর, খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের সুদীর্ঘ কাল অতঃপর তাবিঈন, তাবে তাবিঈনের সময়কাল সবমিলে ছিল প্রায় ৪০০ বৎসর। নবী-প্রেম ছিল তাঁদের মাঝে চরম পর্যায়ের। নবীর প্রতি তাঁদের চেয়ে বেশি ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন আর কেউ করতে পারবে না। এসত্ত্বেও খাইরুল কুরূনের এ সুদীর্ঘ সময়টিতে প্রচলিত মীলাদ-মাহফীল করার কোনোই প্রমাণ নেই। এখন প্রশ্ন হল- তাঁদের মাঝে নবী-প্রেম চূড়ান্ত পর্যায়ের থাকা সত্ত্বেও বিদআতীদের কথিত ও আচরিত বরকতময় অসীম পূণ্যের এ কাজটা তাঁরা কেন করেননি? নিশ্চয়ই তাঁরা এটাকে পূণ্যের কাজ মনে করেননি। সুতরাং খাইরুল কুরূনে যেটা পূণ্যের কাজ ছিল না সেটা এতদিন পর এসে পূণ্যের কাজ হতে পারে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খাইরুল কুরূণ-এর পূণ্যবান ব্যক্তিগণ যা বলেছেন এবং যা করেছেন তা-ই দ্বীন আর যা তাঁরা বর্জন করেছেন তা দ্বীন-বহির্ভূত।

২. প্রচলিত মীলাদ-মাহফিল না করাকে নবী-প্রেম না থাকার সমান্তরাল আখ্যায়িত করা ভুল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসা বা নবী-প্রেমের পদ্ধতি কি তাও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আর তা হল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতকে ভালবাসা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবাকে ভালবাসা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দেশের মানুষকে ভালবাসা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা ভালবেসেছেন তাই ভালবাসা ইত্যাদি। হাদীছে এগুলোকে ভালবাসাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মীলাদ-মাহফিলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত কোন সাহাবী, তাবিঈন, তাবে-তাবিঈন, মুহাদ্দিছীন কিংবা কোনো ফকীহ ও বুযুর্গ এই মীলাদের প্রচলন করেননি। বরং মুসেল শহরের অপচয়ী ও ধর্মীয় ব্যাপারে উদাসীন বাদশাহ্ মুজাফফরুদ্দীন কুকরী ইব্‌নে ইরবিল (৫৪৯-৬৩০ হি.)-এর নির্দেশে সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরীতে এই মীলাদ-মাহ্ফিলের সূচনা হয়। এ ব্যাপারে মীলাদের স্বপক্ষে দলীলাদি সম্বলিত কিতাব রচনা করে বাদশাহকে সহযোগিতা করেন দুনিয়ালোভী দরবারী মৌলভী উমার ইব্‌নে হাছান ইব্‌নে দেহ্ইয়া আবুল খাত্তাব। (راہ سنت)

এই বাদশার চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইমাম আহমদ ইব্‌নে মুহাম্মাদ মিসরী মালেকী উল্লেখ করেন,

كان مَلِكا مُسرفا يأمر علماء زمانه أن يعملوا باستنباطهم واجتهادهم وأن لايتبعوا لمذهب غير هم حتى مالت إليه جماعة من العلماء وطائفة من الفضلاء، ويحتفل لمولد النبي صلى الله عليه و سلم في الربيع الأول. وهو أول من أحدث من الملوك هذا العمل. (راہ سنت از القول المعتمد في عمل المولد)

অর্থাৎ, সে ছিল একজন অপচয়ী বাদশাহ। সে তার সময়কার উলামায়ে কেরামকে অন্যের মাযহাব অনুসরণ বর্জন করে নিজ নিজ ইজতিহাদ ও গবেষণা অনুসারে চলার নির্দেশ দিত। আর এতে দুনিয়াপূজারী উলামা ও ফুযালার একটা দল তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। সে রবিউল আওয়াল মাসে মীলাদ-মাহফিলের আয়োজন করত। বাদ্শাহদের মাঝে এ-ই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি এই বিদআতের (মীলাদ মাহফিলের) প্রচলন করে।

এ অপচয়ী বাদশাহ প্রজাদের অন্তরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত রাখার জন্য এই বিদআত উৎসবের আয়োজন করত, আর তাতে জাতির বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ অকাতরে অপচয় করত। এ অপচয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লামা যাহাবী (রহ.) বলেন,

كان يُنْفِقُ كل سنة على مولد النبي صلى الله عليه و سلم نحو ثلاث مأة ألف. (دول الإسلام ج/ ٢ صـ ١٠٣)

অর্থাৎ, সে প্রতি বৎসর মীলাদ-মাহফিলে প্রায় তিন লাখ (দেরহাম/দীনার) ব্যয় করত।

দুনিয়ালোভী, দরবারী মৌলভী উমার ইব্‌নে হাছান ইব্‌নে দেহ্ইয়া আবুল খাত্তাব যিনি মীলাদ মাহফিল ও জশনে জুলুসের স্বপক্ষে দলীল-প্রমাণ সম্বলিত কিতাব রচনা করে বাদশাহর কাছ থেকে প্রচুর অর্থ কড়ি হাতিয়ে নিয়েছেন, তার ব্যাপারে হাফেজ ইব্‌নে হাজার আসকলানী (রহ.) বর্ণনা করেন,

كان ظاهري المذهب، كثيرَ الوقيقة في الأيمة وفي السلف من العلماء، خبيثَ اللسان، أحمقَ، شديدَ المكر، قليلَ النظر في أمور الدين، متهاونا. (لسان الميزان ج/٥ صـ ٢٨٧)

অর্থাৎ, সে ছিল জাহিরী মাযহাবের অনুসারী, আইম্মায়ে দ্বীন এবং পূর্বসূরী উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে অত্যন্ত আপত্তিকর ও গালিগালাজ মূলক কথাবার্তা বলা লোক। সে ছিল দুষ্টভাষী, আহমক ও চরম ধোঁকাবাজ। আর ধর্মীয় ব্যাপারে ছিল চরম উদাসীন। (লিসানুল মীযান)

হাফিজ ইবনে হাজার আসকলানী আরও বর্ণনা করেন,

قال ابن النجار : رأيت الناس مجتمعين على كذبه وضعفه. (لسان الميزان ج/٥ صـ٢٨٦)

অর্থাৎ, ইব্‌নুন নাজ্জার (রহ.) বলেন, আমি মানুষদেরকে তার (উমার ইবনে ইবনে হাছান ইবনে দেহ্ইয়া আবুল খাত্তাব-এর) মিথ্যা ও অবিশ্বাসযোগ্যতার উপর ঐক্যবদ্ধ বা একমত পেয়েছি। (লিসানুল মীযান)

সুতরাং উপরোক্ত বিবরণ থেকে বুঝা গেল যে, মীলাদ-মাহফিল প্রচলনকারীদের একজন হলেন প্রতারক, ধূর্তবাজ বাদশাহ, আরেকজন হলেন স্বার্থান্বেষী দুনিয়ালোভী মৌলভী। আর তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন ঐ সকল পীর, সূফী যারা ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতায় পৌঁছেননি। এ তিন দলের সমন্বিত প্রয়াস ও অপপ্রচারে সাধারণ জনগণ হয়েছেন বিভ্রান্ত।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) যথার্থই বলেছেন,

وهل أَفْسد الدينَ إلا الملوكُ + وأحبارُ سوء ورهبانُها

অর্থাৎ, রাজা বাদশাহ আর অসৎ পণ্ডিত ও সাধুরাই ধর্মকে নষ্ট করে থাকে।

প্রচলিত মীলাদ-মাহ্‌ফিল সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের উক্তি

তাই সর্বযুগের হক পন্থীরা এবং সর্বস্তরের উলামায়ে কেরাম কঠোর ভাবে এর (মীলাদ মাহফিলের) বিরোধিতা করেছেন এবং বাতিল পন্থীদের সমস্ত ভ্রান্ত যুক্তি খণ্ডন করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইব্‌নে তাইমিয়া হাম্বলী (রহঃ) (তার ফাতাওয়ার ১ম খণ্ডের ৩১২ নং পৃষ্ঠায়), ইমাম নাসিরুদ্দিন শাফিয়ী رشاد الأخيار গ্রন্থে, মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহ.) مكتوبات
(রহ.) সুস্পষ্ট রূপে বিশদ বিশ্লেষণের সাথে এর খণ্ডন করেছেন। আল্লামা ইবনে আমীরুল হাজ্ব মালেকী বর্ণনা করেছেন,

ومن جملة ما أحدثوا من البدع مع اعتقاد هم أن ذلك من أكبر العبادات وأظهار الشعائر ما يفعلونه في الشهر الربيع الأول من المولد، وقد احتوى ذلك على بدع ومحرمات إلى أن قال : وهذه المفاسد مترتبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع، فإن خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكرُه فهو بدعة بنفس نيته فقط، لأن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولى.

(مدخل ابن الحاج مطبوعہ مطبوعہ مصر ج/١ صہ ٨٥)

আল্লামা আব্দুর রহমান মাগরীবী তার ফাতাওয়ায় উল্লেখ করেন,

إن عمل المولد بدعة لم يقل به ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والأيمة.

(كذا في الشرعة الإلهية)

অর্থাৎ, মীলাদকর্ম বিদ'আত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন ও ইমামগণ কেউ এ ব্যাপারে বলেননি এবং তা করেননি।

আল্লামা আহ্‌মদ ইব্‌নে মুহাম্মাদ মিসরী মালেকী (রহ.) লেখেন–

قد اتفق علماء المذاهب الأربعة بذم هذا العمل. (راہ سنت از القول المعتمد فى عمل المولد)

অর্থাৎ, মাযহাব চতুষ্ঠয়ের উলামায়ে কেরাম এই কাজ (মীলাদ) নিন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ।

প্রচলিত মীলাদ-পন্থীদের দলীল-প্রমাণ ও তার খণ্ডন

পূর্বের বক্তব্যে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, খাইরুল কুরূনে এই মীলাদ-মাহফিলের সূচনা হয়নি। বরং ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পর এর সূচনা হয়েছে। সূচনাকারীদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে যে, তৎকালীন এক বদকার বাদশাহ এর পৃষ্টপোষকতা করেছেন। আর সম্রাটের গৃহীত এই নীতির ফলে সর্বসাধারণের মাঝে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। এমনকি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিও এই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছেন।

এত কিছুর পর মীলাদের স্বপক্ষে গ্রহণযোগ্য যুক্তি-প্রমাণ না দিতে পেরে প্রসিদ্ধ বিদআতী মৌলভী আব্দুস সামাদ সাহেব ও আরো অনেকে নিজেদের আত্ম-প্রশান্তি ও অনুসারীদের সান্ত্বনা প্রদানের জন্য তিহাত্তরজন মনীষীর তালিকা পেশ করেছেন, যারা মীলাদ অনুষ্ঠানকে পছন্দ করতেন।[১]

কিন্তু এ তালিকায় সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছীনে কেরামের নাম নেই। যাদের নাম আছে তাদের অধিকাংশই সূফীয়ায়ে কেরাম, মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর কথা (عمل صوفیہ در حل وحرمت سند نیست-অর্থাৎ, হালাল-হারামের ব্যাপারে সূফীদের কথা সনদ নয়।) অনুযায়ী যাদের আমল গ্রহণযোগ্য নয়। আর যে কয়েকজন দার্শনিক আলেম রয়েছেন তারা ভ্রান্ত কিয়াসের শিকার হয়েছেন। আবার অনেকেই শুধু জন্ম-বৃত্তান্তের আলোচনাকে মুস্তাহাব বা উত্তম বলেছেন, যেটাকে কেউ অস্বীকার করেন না। প্রচলিত মীলাদের কথা তারা বলেননি।

মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেব মীলাদের স্বপক্ষে একটা দলীল পেশ করেছেন যে, হারামাইন শরীফাইনে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পবিত্র মীলাদ-মাহফিলের আয়োজন করা হয় এবং যে রাষ্ট্রেই যাবে সেখানেই মুসলমানদের মাঝে এ কাজটি পাবে। বুযুর্গানে দ্বীন (اولیاء اللہ) এবং উলামায়ে কেরাম এর বড় বড় ফায়দা ও বরকত বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, সবযুগেই সবস্থানেই উলামায়ে কেরাম, মাশায়েখ ও সাধারণ মুসলমান একে মুস্তাহাব জেনে আসছেন এবং করে আসছেন। তাই পবিত্র মীলাদ-মাহফিল মুস্তাহাব।[২] তিনি আরো লিখেছেন- "মুস্তাহাব হওয়া-এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, মুসলমান কাজটিকে ভাল জানে।"[৩]

খণ্ডন

এই দলীলের উত্তর হল- তখন এই হারামাইন শারীফাইনও ছিল, সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, তাবে-তাবিঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন তাঁরাও ছিলেন। তাঁরা কি মীলাদ মাহফিলের বরকত ও ফযীলত সম্পর্কে অবগত ছিলেন না? তবে কেন তাঁরা

---

১. راہ سنت از انوار ساطعہ صہ ٢٤٨–٢٥٠

২. جاء الحق ج/١. صفحہ/٢٢٤. مبین بک ڈپواردوبازار جامع مسجد دہلی

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৭।

করেননি? সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, তাবে-তাবিঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন সকলেই এমন একটা উত্তম কাজ পরিত্যাগ করেছেন তা কি মেনে নেয়া যায়?

আর শর'আতের ভাষ্যসমূহ (نُصوص)-এর মাঝে হারামাইন শরীফাইনের অনেক ফযীলত ও মর্যাদার কথা এসেছে, তবে হারামাইন শরীফাইন তথা সেখানকার আমল শরীআতের কোন দলীল নয়। সেখানে শরীআত-পরিপন্থী কাজের প্রচলনও হয়ে পড়তে পারে। শরীআতের দলীল মাত্র চারটি তথা কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও কিয়াস। তাই হারামাইন শরীফাইনে যদি কোন ভাল কাজ হয় তাহলে ভাল نور على نور। অন্যথায় কক্ষণো তা দলীল হতে পারে না। হারামাইনেও মাঝে মধ্যে অন্যায়কর্ম সংঘটিত হয়েছে তার প্রমাণ রয়েছে। মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এক সময়কার হারাম-াইন শরীফাইনের অবস্থার বিবরণ দিয়ে বলেছেন,

في الحرمين الشريفين من شيوع الظلم وكثرة الجهل وقلة العلم وظهرر المنكرات وفشو البدع والسيئات وأكل الحرم والشبهات. (المرقات ج/٥ ص ٦١٤ تحت حديث رقم ٢٧٢٥)

অর্থাৎ, হারামাইন শারীফাইনের মাঝে অন্যায় অত্যাচার ব্যাপকতা লাভ করেছে, অজ্ঞতা বেড়ে গেছে, ইল্‌ম কমে গেছে, অপ্রীতিকর কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে, বিদআত প্রসার লাভ করেছে, হারাম ও সন্দেহপূর্ণ জিনিস খাওয়া বেড়ে গেছে। (মিরকাত শরহে মিশকাত)

অতএব হারামাইন শরীফাইন দলীল হতে পারে না। আর মুফতী আহ্‌মদ ইয়ার খান সাহেব যে বলেছেন, "মুস্তাহাব হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, মুসলমান সেটাকে ভাল জানে।" এ ব্যাপারে কথা হল মুস্তাহাবও শরীআতের একটি হুকুম, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বা কাজ ছাড়া ثابت (প্রমাণিত) হয় না।

এ ব্যাপারে আল্লামা শামী (রহ.) লিখেছেন,

الندب حكم شعي لا بدله من دليل. (رد المحتار)

অর্থাৎ, استحباب (মুস্তাহাব হওয়া) শরীআতের একটি হুকুম। তাই তার জন্য দলীলের প্রয়োজন রয়েছে। (রদ্দুল মুহতার)

সারকথা– উপরের এই সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হল যে, প্রচলিত মীলাদ-মাহফিল বিদআত এবং দ্বীন-বহির্ভূত বিষয়। তবে রসূল সসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় জন্ম-বৃত্তান্ত এবং তাঁর আদর্শ আলোচনার মজলিস নিঃসন্দেহে মোস্তাহাব ও উত্তম।

মীলাদে কেয়াম করা প্রসংঙ্গ

কেয়াম কাকে বলে

"কেয়াম" (قيام) শব্দের আভিধানিক অর্থ দাঁড়ানো। আর মুআশারা তথা সমাজ-সামাজিকতার পরিভাষায় "কেয়াম" বলতে বোঝায় কারও আগমনে দাঁড়ানো। আর মীলাদ প্রসঙ্গে উল্লেখিত "কেয়াম" দ্বারা বোঝানো হয় বিশেষ ধরনের কসীদা ও দুরূদ পাঠ করার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিসে হাজির হয়ে গেছেন ধারণায় "ইয়া নবী ..." বলার সময় দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুরূদ শরীফ পাঠ করা।

সমাজ-সামাজিকতায় কেয়াম-এর হুকুম

কোন বুযুর্গ তথা সম্মানী ব্যক্তি যখন স্বশরীরে আগমন করেন, তখন কোন কোন মুহূর্তে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি ছাড়া ক্বেয়াম করা (আগন্তুক ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়া) বৈধ। এ ব্যাপারে ইমাম নববী (রহঃ) 'قوموا إلى سيدكم' (অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের নেতার কাছে গিয়ে দাঁড়াও।) হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এভাবে যে, হযরত সাআদ ইবনে মুআয (রা.) আঘাতপ্রাপ্ত ছিলেন। নবী করীম (সা.) তাঁকে গাধার পিঠ থেকে নামানোর জন্য সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন। সেমতে তাঁরা তাঁকে গাধার পিঠ থেকে নামানোর জন্য মজলিস থেকে উঠেছিলেন। এটা কোন সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে দাঁড়ানো নয়। এ ব্যাপারে মুসনাদে আহমদের বিবরণ নিম্নরূপ–

قوموا إلى سيد كم فأنزلوه من الحمار. (رواه أحمد حديث رقم ١١١١١ و ١١٦٢٠ وإسناده صحيح، كذا في هامشه)

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের নেতার কাছে গিয়ে দাঁড়াও তাঁকে গাধার পিঠ থেকে নামাও। এজন্যই إلى سيد كم "তোমাদের নেতার কাছে" কথাটা বলেছেন- 'لسيدكم' "নেতার জন্য" কথাটা বলেননি। (মুসনাদে আহমদ)

যাহোক উপরোক্ত হাদীছ অকাট্য অর্থবোধক না হওয়ায় এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের আমল কি ছিল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন আমলটিকে পছন্দ করতেন, তা দেখা দরকার এবং সেটাই হবে আমাদের আমল। আর এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে জানা যায় হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা–

عن أنس قال : لم يكن شخص احب إليهم من رسول الله صلى عليه و سلم، وكانوا إذارأوه لم يقوموا لِمَا يعلمون من كراهيته لذلك. (رواه الترمذي في أبواب الاستيذان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم– باب ماجاء في كراهية قيام الرجل للرجل وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب. ورواه أحمد حديث رقم ١٢٢٨٥ وإسناده صحيح كذا في هامشه)

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের কাছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জাত মোবারকের চেয়ে বড় সম্মানের ও প্রিয় এ দুনিয়াতে আর কোনো কিছুই ছিল না, এসত্বেও তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলে ক্বেয়াম করতেন না। যেহেতু তারা জানতেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজটাকে (তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়া/কেয়াম করাকে) অপছন্দ করেন। (তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদ)

মীলাদে কেয়াম-এর হুকুম

পূর্বে উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য কেয়াম করাকে অপছন্দ করতেন। তাই সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি চরম ভালবাসা ও মহব্বত পোষণ করা সত্ত্বেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন স্বশরীরে উপস্থিত হতেন তখন তাঁকে দেখতে পেয়েও তাঁরা দাঁড়াতেন না। তাই মীলাদ-মাহফিলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম আসলে যদি মেনে নেয়া হয় যে, তিনি হাজির হয়ে যান তবুও কেয়াম করা যাবে না। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশায়ও তাঁর জন্য কেয়াম করা হত না এবং তিনি তাঁর উদ্দেশে কেয়াম করা তথা দাঁড়িয়ে যাওয়াকে পছন্দও করতেন না। তদুপরি মীলাদ মাহফিলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম আসলে সেখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমন ঘটে এটা শরীআতের কোনো দলীল দ্বারাও প্রমাণিত নয়। বরং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশে দুরূদ পাঠ করা হলে তিনি সেখানে হাজির হন না বরং নির্ধারিত ফেরেশ্তা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে সে দুরূদ পৌঁছে দেন- এ কথা স্পষ্টত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

عن أبي هريرة رضـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صلى عليَّ عند قبري سمعته ومن صلى عليَّ نائيا أُبْلغته. (رواه البيهقي في شعب الإيمان في باب في تعظيم النبي صلى الله عليه و سلم وإجلاله و توقيره. حديث رقم ١٥٨٣. وللحديث شواهد ساقها لسخاوي في القول البديع)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আমার কবরের নিকট এসে আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে আমি তা সরাসরি শুনব, আর যে দূরে থেকে আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে তা আমার নিকট পৌঁছানো হবে। (শুআবুল ঈমান)

অন্য এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

عن عبد اله بن مسعود رضـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن له ملئكة سيًا حين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. (رواه الدارمي في كتاب الرقاق– باب في فضل الصلاة

على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم ٢٧٧٤. وإسناده صحيح كذا في هامشه. وراه النسائي في كتاب الافتتاح– باب التسليم على النبى صلى الله عليه وسلم. وراه ابن حبان في صحيحه حديث رقم ٩٠٢. واللفظ للدارمي)

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসঊদ (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর কতক ফেরেশতা রয়েছেন, যারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন এবং আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছান। (নাসায়ী, দারিমী ও ইব্‌নে হিব্বান)

কেয়াম সম্বন্ধে বিদআতীদের বক্তব্য ও তার খণ্ডন

বিদআতীদের বক্তব্য হল মীলাদ-মাহ্‌ফিলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম আসলে তিনি মজলিসে হাজির হয়ে যান। তাই তাঁর সম্মানার্থে কেয়াম করতে হবে অর্থাৎ, দাঁড়িয়ে যেতে হবে। বিদআতীগণ এই কেয়াম করাকে জায়েয এবং মুস্তাহাব হিসাবে গণ্য করেন। এমনকি তারা এটাকে ওয়াজিব ও ফরয বলেও আখ্যায়িত করেন। আর কেয়াম না করনেওয়ালাদেরকে কাফের পর্যন্ত বলা হয়। (এ কথার বরাত একটু পরেই উল্লেখ করছি।)

খণ্ডন

পূর্বোল্লিখিত হাদীছে স্পষ্টত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, তাঁর কাছে দুরূদ সালাম পৌঁছে দেয়া হয়, তিনি হাজির হন না। অথচ বিদআতীগণ বলছেন তার বিপরীত। হাদীছে বর্ণিত আকীদার বিপরীত কোন বিষয় কীভাবে মুস্তাহাব এমনকি ফরয হয়ে যায় তা বোধগম্য নয়। আর যারা হাদীছে বর্ণিত আকীদা মোতাবেক মীলাদের মজলিসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাজির না হওয়ার আকীদা রাখেন, তারা কীভাবে কাফের হয়ে যান তা আরও অবোধগম্য বৈ কি? যারা কুরআন-হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক আকীদা পোষণ করেন তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা, পক্ষান্তরে যারা কুরআন-হাদীছের বর্ণনার বিপরীত আকীদা পোষণ করেন তাদেরকে খাঁটি মুসলমান মনে করাটা কি কুফ্‌রী নয়?

একটা অপকৌশল প্রসঙ্গ

মীলাদ-মাহ্‌ফিলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাজির হওয়ার বিষয় অস্বীকারকারী আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকদেরকে কাফের আখ্যা দেয়ার অপরাধকে ঢাকা দেয়ার জন্য প্রসিদ্ধ বিদআতী আলেম মুফতী আহমদ ইয়ার খান সহেব বলেছেন যে, 'মুসলমান মীলাদের মাঝে কেয়াম করাকে ওয়াজিব মনে করে'- এ কথাটি মুসলমানদের উপর অপবাদ মাত্র। কেননা, কোন আলেমে দ্বীন একথা লেখে-নওনি বলেনওনি যে, কেয়াম করা ওয়াজিব। বরং সর্ব সাধারণও এ ধারণাই পোষণ করে যে, কেয়াম, মীলাদ এগুলো পূণ্যের কাজ।

মুফতী সাহেবের এ দাবী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অবাস্তব সম্মত। কেননা, মৌলভী আব্দুস সামী' নিজের দাবীর স্বপক্ষে মুহাম্মাদ ইব্‌নে ইয়াহ্‌ইয়া- মুফতীয়ে হানাবেলা থেকে বর্ণনা করেন,

يحب القيام عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم. (راه سنت از انوار ساطعه ص ٢٥٠)

অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম বিষয়র আলোচনার সময় কেয়াম করা ওয়াজিব। (রাহে সুন্নাত বরাত আনওয়ারে ছাতেআ)

অনুরূপভাবে বিদআতীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়ার কিতাব "মাজমুআ ফাতাওয়া" অর্থাৎ, غاية المرام -এর ৫৫-৫৬-৬৭-৭১ নং পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

حضور علیہ السلام ہر محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں، تعظیم کیواسطے کھڑا ہونا فرض ہے، قیام نہ کرنے والا کافر ہے۔

অর্থাৎ, প্রত্যেক মীলাদ-মাহফিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হন এবং তাঁর সম্মানে কেয়াম করা ফরয। কেয়াম না করনেওয়ালা কফের।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গায়েব জানা প্রসঙ্গ

গায়েব (غيب)-এর পরিচয়

"গায়েব"-এর আভিধানিক অর্থ হল কোন জিনিস গোপন থাকা।[১] যে জিনিস আমাদের থেকে গোপন রয়েছে তাকেও গায়েব (غيب) বলা হয়। আর শরীআতের পরিভাষায় "গায়েব" বলা হয় যা নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট।

ইবনে কাছীর (রহ.) সুদ্দী ও মুররা হামাদানীর সূত্রে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) ও হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন,

أما الغيب : فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وماذكر في القرآن. (تفسير ابن كثير. ج١/ ص٤٢)

অর্থাৎ, "গায়েব" হল ঐ জিনিস, জান্নাত জাহান্নামের অবস্থাসমূহ এবং কুরআনে কারীমে বর্ণিত বিষয়াবলীর মধ্যে যা বান্দা থেকে গোপন রয়েছে।

আইম্মায়ে আহ্‌নাফের প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ 'মাদারেক'–য়ে বলা হয়েছে,

والغيب : هو ما لم يقم عليه دليل ولا اطلع عليه مخلوق.

অর্থাৎ, ঐ জিনিসকে গায়েব বলা হয়, যার উপর কোনো প্রমাণ বিদ্যমান নেই এবং কোনো মাখলূক সে বিষয়ে অবগত নয়।

১. غيب এবং مغيب উভয়টা (ض) غاب يغيب এর মাসদার। غاب الشي عن فلان অর্থ হল গোপন হওয়া। আবার যে সকল বিষয় গোপন থাকে তাকেও গায়েব বলা হয়। এ অর্থে غيب -এর বহুবচন হল غيب। আর غيوب এর বহুবচন হল مغيبات।

"গায়েব"-এর স্তর/প্রকারভেদ

গায়েব জানার মৌলিক স্তর/প্রকার প্রথমত ২টি। যথা:–

(১) ذاتی [সত্তাগত] (২) عطائی [অন্য প্রদত্ত]

عطائی আবার দুই প্রকার। যথা:–

(১) محیط [ব্যাপক] (২) غیر محیط [সীমিত]

محیط আবার দুই প্রকার। যথা:–

(১) محیط [সর্বব্যাপী] (২) محیط خاص [সীমিত ব্যাপী]

এই সর্বমোট চারটি স্তর। নিম্নে ছকাকারে প্রকার চতুষ্টয় দেখানো হল।

উপরোক্ত স্তর চতুষ্টয়ের মধ্য থেকে তিনটির হুকুম প্রায় সর্বসম্মত। মতানৈক্য শুধু ১টি তথা ৪তুর্থটির মাঝে। আর এ মতানৈক্যটাই ইল্‌মে গায়েব-এর ইখতিলাফ হিসাবে খ্যাত।

স্তর চতুষ্টয়ের হুকুম

১ম প্রকার

علم غیب ذاتی অর্থাৎ, যে গায়েব-এর জ্ঞানটা (ذاتی) তথা সত্তাগত অর্থাৎ, যার মাঝে অন্যের কোন হস্তক্ষেপ নেই। এ প্রকার ইল্‌মে গায়েবের ব্যাপারে সকলেই একমত, যে, এটা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য খাস (خاص)। কেউ যদি কোন রসূলের জন্য কিংবা কোন ওলির জন্যে সামান্যতম এরূপ সত্তাগত জ্ঞান সাব্যস্ত করে, তাহলে সে সর্বসম্মতিক্রমে মুশরিক ও কাফের হয়ে যাবে।[১]

২য় প্রকার

علم غائب عطائی غیر محیط অর্থাৎ, যে গায়েবের জ্ঞানটা অন্য কোন সত্তা কর্তৃক প্রদত্ত (عطائی) এবং সেটা غیر محیط তথা সীমিত। অর্থাৎ, সামগ্রিক জ্ঞান নয় বরং বিশেষ বিশেষ জ্ঞান। এ প্রকার ইল্‌মে গায়েব গায়রুল্লাহ্‌র জন্য প্রমাণিত। কেননা, আল্লাহ তাআলা আম্বিয়ায়ে কেরামকে ওহী ও ইল্‌হামের মাধ্যমে কিছু বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন।

১. সার সংক্ষেপ بریلوی فتنہ کا نیا روپ صفحہ/۷۵-۷۶ مصنف عارف سنبلی استاد ندوۃ العلماء لکنو بحوالہ خالص الاعتقاد مصنف احمد رضاخان ص ۲۲

সেমতে ওহী এবং ইল্হামের মাধ্যমে যে সকল গায়েব-এর বিষয় সম্পর্কে তাঁরা অবগত হয়েছেন। তা ছাড়া দুনিয়ার সকল বিষয়ে পুংখানুপুংখ জ্ঞান তাঁদের নেই।

৩য় প্রকার

علم غائب عطائی محیط عام অর্থাৎ, যে গায়েবের জ্ঞানটা অন্য কোন সত্তা কর্তৃক প্রদত্ত (عطائی) এবং সেটা محیط عام তথা সর্বব্যাপী। অর্থাৎ, আদি অন্তের সমস্ত বিষয়ের মৌলিক (کلی) জ্ঞান। এ প্রকার ইল্মে গায়েবের ব্যাপারে সকলের সর্বসম্মত বিশ্বাস হল এ প্রকারটিও আল্লাহ্র জন্য খাস। সুতরাং যদি কেউ এ ধারণা পোষণ করে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সার্বিক বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত, আল্লাহ তাআলার ইল্ম আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইল্মের মাঝে শুধু ذاتی আর عطائی-এর পার্থক্য, তাহলে এই ধারণা পোষণকারীও মুশরিক ও কাফের হয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) উল্লেখ করেন,

من اعتقد تسوية علم الله ورسوله يُكَفَّرُ إحماعا كما لا يخفى. (الموضوعات الكبرى صـ ١١٩)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইল্মের মাঝে সমতার বিশ্বাস রাখে, তাকে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের বলা হবে; যা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়।

৪র্থ প্রকার

علم غائب عطائی محیط خاص অর্থাৎ, যে গায়েবের জ্ঞানটা অন্য কোন সত্তা কর্তৃক প্রদত্ত (عطائی) এবং সেটা আদি অন্তের অর্থাৎ, পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে নিয়ে জান্নাত জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের সীমিত ব্যাপী (محیط خاص) জ্ঞান। এ প্রকার ইল্মে গায়েবের হুকুমের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা-বিশ্বাসমতে এ প্রকারটিও আল্লাহ্র জন্য খাস একান্ত। কিন্তু রেজাখানী সহ বেদআতীদের আকীদা-বিশ্বাস হল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এই প্রকার ইল্মের অধিকারী।[১]

খান সাহেব বেরেলভী বলেন,

حضرور علیه الصلوة والسلام کو تمام کان وما یکون الی نوم القیامة کا علم تا اور ابتداؤ آفرینش عالم س لیکر جنت ونار ك داخله تك کا کوئی ذ ره حضور علیه الصلو ة السلام ك علم س باهر نهیں (ابناء المصطفی صـ ٤ ملخصا)

১. বিদআতীগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য ইল্মে গায়েব প্রমাণিত করার এত প্রচেষ্টা কেন করেছেন, তার পশ্চাতে মীলাদে কেয়াম করার বিষয়টার স্বপক্ষে দলীল দাঁড় করানোর চিন্তা-চেতনা কাজ করছে। সেটা এভাবে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হলে তিনি তা জানেন যেহেতু তিনি ইল্মে গায়েবের অধিকারী, তাই তিনি জানতে পেরে মজলিসে উপস্থিত হন। আর তাঁর উপস্থিতি হেতু কেয়াম করতে হবে।

অর্থাৎ, যা কিছু হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে- সেই সবকিছুর জ্ঞান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছিল। পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে জান্নাত জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত কোন ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্রস্য বিষয়ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জানা থেকে বাইরে নয়।

নবী করীম (সা.)-এর গায়েব জানা সম্পর্কে সারকথা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গায়েব জানা সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা-বিশ্বাস হল– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর শান মত আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সিফাত সম্পর্কে, অতীত ও ভবিষ্যৎ-তর অসংখ্য ঘটনার মধ্যে বরযখ, কবরের অবস্থা, হাশরের ময়দানের চিত্র, জান্নাত, জাহান্নামের পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে এমন জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে যা কোন নবী কিংবা কোন নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাকেও দেয়া হয়নি। যার আন্দাজ একমাত্র আল্লাহ তাআলাই করতে পারেন। তবে সেটা আল্লাহ তাআলার "সর্ব বিষয়ের সামগ্রিক জ্ঞান"-এর সামনে কিছুই নয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে বিদআতী ও রেজাখানীদের আকীদা-বিশ্বাস হল যা কিছু হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে- সেই সবকিছুর জ্ঞান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছিল। পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে জান্নাত জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত কোন ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্রস্য বিষয়ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জ্ঞান বহির্ভূত নয়। তাদের বক্তব্য হল– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদি অন্তের সবকিছুর (ما كان وما يكون)-এর জ্ঞান ছিল। আহমদ রেজাখান রচিত الدولة المكية بالمادة الغيبية গ্রন্থে এবং আহমদ ইয়ার খান রচিত جاء الحق গ্রন্থে স্পষ্টত এ দাবী করা হয়েছে। অতএব যদিও তারা বলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সীমিত ব্যাপী জ্ঞান (علم محیط خاص) ছিল, কিন্তু যখন বলে আদি অন্ত সবকিছুর জ্ঞান ছিল তখন সেটা আর সীমিত ব্যাপী জ্ঞানের দাবী থাকে না বরং সেটা হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহর ন্যায় সর্বব্যাপী জ্ঞান থাকার দাবী।

আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দলীল

কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে "গায়েব-এর জ্ঞান" (علم الغيب) বিষয়কে আল্লাহর বিশেষ সিফাত বা বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সমস্ত মাখলূক থেকে এমনকি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও "গায়েব-এর জ্ঞান"কে নিবারিত (نفی)করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল।

(١) ﴿قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি বলে দাও যত মাখলুক আসমান এবং যমিনে রয়েছে কেউ গায়েব জানে না। এক মাত্র আল্লাহ ছাড়া। আর (এ কারণেই) তারা জানে না তারা কবে পুনরুত্থিত হবে। (সূরা নাম্‌ল: ৬৫)

(২) ﴿قُلْ لَّا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَ لَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لَا اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ﴾

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি বলে দাও, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর (সমস্ত মাকদুরাতের) ভাণ্ডার রয়েছে। আর না একথা বলি যে, আমি গায়েব জানি। আর না আমি তোমাদেরকে বলি আমি ফেরেশতা। (সূরা: ৬-আন্‌আম: ৫০)

(৩) ﴿قُلْ لَّا اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَ مَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ﴾

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার ভাল-মন্দের উপরও আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। (সূরা: ৭-আ'রাফ: ১৮৮)

(৪) ﴿وَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ﴾

অর্থাৎ, তাঁরই নিকট রয়েছে গায়েবের কুঞ্জি, তিনি ব্যতীত কেউ তা জানে না। (সূরা: ৬-আন্‌আম: ৫৯)

(৫) ﴿يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ اِلَّا هُوَ ؕ إلى قوله– قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

অর্থাৎ, তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কেয়ামত কখন ঘটবে? তুমি বলে দাও, এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাসময়ে তার প্রকাশ ঘটাবেন। ... তুমি বলে দাও, এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই আছে। (সূরা: ৭-আ'রাফ: ১৮৭)

এসব আয়াত এবং বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীছে জিব্রীলে যে এসেছে-

ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.

(অর্থাৎ, এ বিষয়ে যাকে জিজ্ঞেস করা হয় সে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশী জানে না।)– এসব দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, কেয়ামতের সুনির্দিষ্ট সময় ও তৎসংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিষয়াদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও গোপন রয়েছে। সুতরাং দুনিয়া সৃষ্টির শুরু থেকে জান্নাত জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত সকল বিষয়ের পুংখানু-পুংখ জ্ঞান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছিল– এ ধারণা ঠিক নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য কেয়ামত পর্যন্ত সবকিছুর সামগ্রিক জ্ঞান প্রমাণিত করা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আলেমুল গায়েব বা গায়েব জান্তা মনে করা পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং হাদীছের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

বিদআতীদের দলীল ও তা খণ্ডন

১ম দলীল

"জাআল হক্ব" (جاء الحق) নামক গ্রন্থে আহমদ ইয়ার খান সাহেব তাদের দাবীর স্বপক্ষে দলীল দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন,

﴿مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার এই শান না যে, তিনি তোমাদের সর্বসাধারণকে গায়েবের ইলম/জ্ঞান দান করবেন। হ্যাঁ আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলগণ থেকে যাকে চান তাকে মনোনীত করেন। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ১৭৯)

উক্ত আয়াতের অধীনে তাফসীরে বাইযাভী ও তাফসীরে খাজেনের ব্যাখ্যা উল্লেখ করত খান সাহেব বলেন, "এতে বুঝা যায় আল্লাহ তাআলার খাস ইল্‌মে গায়েব পয়গম্বরের সামনে প্রকাশিত ও উদ্ভাসিত হয়। কতক মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন যে, "কতক ইল্‌মে গায়েব" (بعض غيب) এ দ্বারা উদ্দেশ্য হল- আল্লাহ তাআলার ইল্‌মের মোকাবেলায় কতক। আর كل ما كان وما يكون (দুনিয়ার শুরু থেকে জান্নাত জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত) সমস্ত জ্ঞানও আল্লাহ্‌র ইল্‌মের মোকাবেলায় কতকই বটে।"[১]

খণ্ডন

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলা ওহী এবং ইল্‌হামের মাধ্যমে আম্বিয়ায়ে কেরামকে গায়েবের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত করেন। কিন্তু এর দ্বারা কোন নবীকে কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান প্রদান করা প্রমাণিত হয় না। আর তাফসীরের কিতাবে উল্লেখিত 'بعض غيب'-এর যাহিরী বা সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা হল কতক جزئيات-এর জ্ঞান, আল্লাহ্‌র ইল্‌মের মোকাবেলায় بعض (কতক) নয়। বিনা কারণে যাহিরী অর্থ ত্যাগ করা তাফসীর ও ব্যাখ্যার সহীহ নীতি নয়।

২য় দলীল

﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۙ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ে কাউকে অবগত করেন না, তবে রসূলদের মাঝে যাদের পছন্দ করেন। (সূরা: ৭২-জিন: ২৬-২৭)

আহমদ ইয়ার খান সাহেব উক্ত আয়াতের অধীনে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থের ব্যাখ্যা (যদিও তা তাদের দাবীর বিপরীত) উল্লেখ করত বলেন, "এ থেকে বুঝা যায় আল্লাহ তাআলার খাস ইলমে গায়েব এমনকি কেয়ামতের ইল্‌মও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া হয়েছে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জ্ঞান থেকে বাকি রইল কী?"[২]

---

১. جاء الحق صـ ٤٨ مبین بک ڈپواردو بازار جامع مسجد دیہلی

২. جاء الحق صـ ٥٦ مبین بک ڈپواردو بازار جامع مسجد دیہلی

খণ্ডন

এ আয়াতের পূর্বাংশে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿قُلْ اِنْ اَدْرِیْۤ اَقَرِیْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ یَجْعَلُ لَه رَبِّیْۤ اَمَدًا.﴾

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, আমি জানি না তোমাদের সঙ্গে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অতি নিকটে না আমার প্রতিপালক তার জন্য দীর্ঘ সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। (সূরা: ৭২-জিন: ২৫)

এ আয়াতে 'ما توعدون' এর অর্থ (مصداق) 'আযাব' কিংবা 'কেয়ামত'। এতদুভয়ের যেটাই মুরাদ নেয়া হোক না কেন, সেটা ماكان وما يكون-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সর্বাবস্থায় ما كان وما يكون -এর কিছু বিষয় এমন রয়ে গেছে যার ইল্‌ম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছিল না।

৩য় দলীল

তারা নিম্নোক্ত হাদীছের মাধ্যমেও দলীল দেয়ার চেষ্টা করেছেন। হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন,

قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذالك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه و نسيه من نسيه. الحديث. (رواه البخاري و مسلم و أبو داود)

অর্থাৎ, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে খুতবা দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর খুতবার মাঝে কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে এমন কোনো বিষয় বলতে ছাড়েননি। যে স্মরণ রেখেছে সে স্মরণ রেখেছে, আর যে ভুলে গেছে সে ভুলে গেছে। (বোখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ)

খণ্ডন

বিদআতীরা এরূপ বিভিন্ন হাদীছের মাধ্যমে দলীল দেয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সে হাদীছগুলো তাদের মূলনীতি অনুসারেই দলীল হতে পারে না। মূলনীতি হল আহমদ ইয়ার খান সাহেব লিখেছেন–

جب علم غیب کا منکر اپنے دعوے پر دلیل قائم کرے تو چار باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے (۱) وہ آیت قطعی الدلالۃ ہو جس کے معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہوں، اور (۲) حدیث ہو تو متواتر ہو. الخ۔ (جاء الحق صـ ٤٠)

অর্থাৎ, ইল্‌মে গায়েব অস্বীকারকারী নিজের দাবীর স্বপক্ষে দলীল দিতে চাইলে তাকে ৪টি বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে। যথা:– (১) সেটা এমন আয়াত হতে হবে যার অর্থ হবে দ্ব্যর্থহীন অর্থাৎ, তাতে একাধিক অর্থের অবকাশ থাকতে পারবে না। (২) দলীলটি হাদীছ হলে সেটা 'মুতাওয়াতির' (متواتر) হতে হবে। ... ইত্যাদি।

অথচ তাদের পেশকৃত হাদীছ একটিও 'মুতাওয়াতির' (متواتر) নয়। এ তো গেল الزامی উত্তর। তাহ্‌ক্বীক্বী উত্তর হচ্ছে– তাদের পেশকৃত হাদীছগুলোর কতকের উদ্দেশ্য হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেয়ামত পর্যন্ত যত বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে তা এবং বিভিন্ন ফিতনা ও কেয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামকে যা শুনিয়েছেন। বিদআতীগণ এগুলোকেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গায়েব জানার প্রমাণ দাঁড় করেছেন। অথচ এটা সব ধরনের বিষয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বক্তব্য ছিল না। বিশেষ এক ধরনের বিষয়ে ছিল। আমাদের এ বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায় আবূ দাউদ শরীফ-এর নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা। ইমাম আবূ দাউদ পূর্বোক্ত হাদীছ বয়ান করার পরপরই নিম্নোক্ত হাদীছটি বয়ান করেছেন। পূর্বোক্ত হাদীছের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত হুযাইফা (রা.)ই বলেছেন যে,

والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا. والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاث مأة فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. (رواه أبو داود في أول كتاب الفتن)

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানি না আমার সাথীরা ভুলে গেছেন নাকি ভুলের ভান করেছেন। আল্লাহ্‌র কসম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেয়ামত পর্যন্ত কোন ফিতনা সৃষ্টিকারীর কথা বলতে ছাড়েননি। যাদের চেলা চামুণ্ডার সংখ্যা হবে তিনশত বা ততোধিক। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে তার নাম, তার পিতার নাম, তার গোত্রের নাম পর্যন্ত বলেছেন। (আবূ দাউদ)

সুতরাং বুঝা গেল- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবায় যা বলেছেন সেসব ছিল ফিতনা ও কেয়ামতের আলামত সংক্রান্ত, দুনিয়ার সকল বিষয় নয়।

আর তাদের পেশকৃত কতক হাদীছের উদ্দেশ্য হল- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে গায়েবের বিষয়াবলীর মধ্য থেকে শুধু শরীআতের বিধি-বিধান ও দ্বীনের বিষয়াবলী, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানের সাথে সংগতিপূর্ণ। হাদীছের পূর্বাপর অবস্থা থেকে এমনটিই বুঝে আসে।

সুতরাং এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, علم ذاتی এবং علم محیط بالکل একমাত্র আল্লাহ তাআলারই একান্ত জ্ঞান। কোন রসূল কিংবা গায়রে রসূল তাতে শরীক নন এবং কোন نص -এর মাঝে মাখলূকের জন্য 'عالم الغيب'-এর ব্যবহার দেখা যায় না।

সর্বশেষে আর একটা বিষয় উল্লেখ করতে হয়। তাহল– মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেব তার "জাআল হক্ব" গ্রন্থে স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গায়েবের যে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তা দেয়া হয়েছিল মেরাজে। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, মেরাজ হয়েছিল হিজরতের পূর্বে। এখন উল্লেখ করার

বিষয় হল– মেরাজের রাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের কথামত গায়েবের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল মেনে নিলে কি একথা বলার অবকাশ বের হয়ে আসে না যে, তাহলে বীরে মাউনার ঘটনায় সত্তর জন সাহাবী নির্মমভাবে শহীদ হয়ে যাবেন– একথা জেনেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে প্রেরণ করেন। নাউযুবিল্লাহ কত নিষ্ঠুর ছিলেন তিনি! উহুদের যুদ্ধের বিষয়টাও সেরকম। হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি যখন অপবাদ আরোপের ঘটনা ঘটে, তখন তিনি ওহীর অপেক্ষায় ছিলেন কেন? তাহলে কি তিনি নাউযু বিল্লাহ জেনেও না জানার অভিনয় করেছিলেন? এভাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের বহু ঘটনার কোন সুস্থ্য ব্যাখ্যা চলবে না, যদি মেনে নেয়া হয় যে, তিনি আদি-অন্তের সব বিষয় জানতেন।

নবী (সা.)-এর হাজির-নাজির হওয়া প্রসঙ্গ

হাজির ও নাজির (حاضر و ناظر) শব্দ দুটো আরবী। হাজির (حاضر) অর্থ মওজুদ, বিদ্যমান বা উপস্থিত। আর নাজির (ناظر) অর্থ দ্রষ্টা। যখন এ শব্দ দুটোকে মিলিয়ে ব্যবহার করা হয়, তখন অর্থ হয় ঐ সত্তা, যার অস্তিত্ব বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ নয় বরং তাঁর অস্তিত্ব একই সময়ে গোটা দুনিয়াকে আবেষ্টিত করে রাখে এবং দুনিয়ার প্রত্যেক-টি জিনিসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবস্থা তার দৃষ্টির সামনে থাকে।

হাজির-নাজির সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে হাজির-নাজির কথাটি একমাত্র আল্লাহ তাআলার ব্যাপারেই প্রযোজ্য। হাজির-নাজির থাকা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই সিফাত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে হাজির-নাজিরের আকীদা পোষণ করা শরীআতগত (شرعا) ও যুক্তিগত (عقلا) উভয় দিক থেকে ভ্রান্ত।

হাজির-নাজির সম্বন্ধে বিদআতীদের আকীদা

বিদ'আতীদের আকীদা হল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বত্র হাজির-নাজির। তাদের এই বিশ্বাসের পশ্চাতে মীলাদে কেয়াম করার বিষয়টার স্বপক্ষে দলীল দাঁড় করানোর চিন্তা-চেতনা কাজ করছে। সেটি এভাবে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হলে তিনি তা জানেন, যেহেতু তিনি হাজির-নাজির বা সর্বত্র উপস্থিত। তাই তাঁর উপস্থিতি হেতু কেয়াম করতে হবে।

বিদআতীদের আকীদামতে শুধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই নন, বরং বুযুর্গানে দ্বীনও পৃথিবীর সবকিছুকে হাতের তালুর মত দেখতে পান। তারা দূরের ও কাছের আওয়াজ শুনতে পান। এবং মুহূর্তের মধ্যে গোটা বিশ্ব ভ্রমণ করেন এবং হাজার হাজার মাইল দূরের হাজতমান্দ ব্যক্তির হাজত পূর্ণ করেন।

খণ্ডন

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বত্র হাজির-নাজির এটা দ্বারা যদি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সর্বত্র শারীরিক হাজির-নাজির থাকা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটা যুক্তিগতভাবে (عقلا) অসম্ভব এবং সুস্পষ্ট ভ্রান্তি। কারণ, এ কথা সর্বজন- স্বীকৃত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওযা মুবারকে আরাম করছেন। এবং সমস্ত আশেকীনরা সেখানে গিয়ে হাজিরা দেন, যিয়ারাত করেন। বিশ্বের যে কোন স্থানে থেকে তাঁর প্রতি দুরূদ সালাম পাঠ করা হলে নিয়মিত ফেরেশতাগণ সে দুরূদ ও সালাম তাঁর কাছে পৌঁছে দেন। এ সম্বন্ধে "মীলাদে কেয়াম-এর হুকুম" শিরোনামে পূর্বে দলীল প্রমাণ সহ বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বত্র হাজির-নাজির এটা দ্বারা যদি তাঁর রূহানী হাজিরী উদ্দেশ্য হয়ে থাকে অর্থাৎ, এই বোঝানো হয়ে থাকে যে, দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র রূহের জন্য সর্বস্থানে বিচরণ করার অনুমতি রয়েছে, তাহলে বলা হবে, সর্বস্থানে বিচরণের অনুমতি থাকলেও বাস্তবেই সর্বস্থানে উপস্থিত থাকা জরূরী নয়। বরং তিনি যে সর্বত্র হাজির থাকেন না, তার প্রমাণ ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে যে, তিনি সর্বদা রওযা মুবারকে আরাম করছেন। অতএব এখন যদি কেউ অন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপস্থিতির কথা দাবী করে, তাহলে সেটা হবে একটা স্বতন্ত্র দাবী, এর স্বপক্ষে দলীল চাই। অথচ এর স্বপক্ষে কোনো দলীল নেই। সুতরাং দলীল-বিহীন এমন আকীদা পোষণ করা নাজায়েয।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দলীল

১ম দলীল

আল্লাহ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হযরত মূসা (আ.)- এর ঘটনা সম্পর্কে অবগত করার পর ইরশাদ করেন,

﴿وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَ مَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ.﴾

অর্থাৎ, তুমি (তূর পর্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না, যখন আমি মূসা (আ.)-এর কাছে হুকুম প্রেরণ করি। আর তুমি তার প্রত্যক্ষকারী (شاهد) ছিলে না। (সূরা: ২৮-কাসাস: ৪৪)

সুতরাং বুঝা গেল- হযরত মূসা (আ.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তূর পর্বতের পশ্চিম পার্শ্বে হাজিরও ছিলেন না নাজিরও ছিলেন না। তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বত্র হাজির-নাজির একথাটি সঠিক হয় কী করে?

২য় দলীল

সূরা তওবায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ وَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ.﴾

অর্থাৎ, তোমার আশপাশের পল্লীবাসী ও মাদীনাবাসীর মাঝে এমন কিছু মুনাফিক রয়েছে যারা মুনাফেকিতায় সিদ্ধ। তুমি তাদেরকে জান না। আমি তাদেরকে জানি। (সূরা তাওবা: ১০১)

দেখা গেল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার আশ-পাশের অনেক লোক সম্পর্কেও জানতেন না। তিনি সর্বত্র হাজির-নাজির থাকলে তো অবশ্যই সকলের সম্বন্ধে অবগত থাকতেন। তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বত্র হাজির-নাজির এ দর্শন সঠিক হয় কী করে?

বিদআতীদের দলীল ও তার খণ্ডন

১ম দলীল

আহমদ ইয়ার খান সাহেব তার দাবীর স্বপক্ষে দলীল দিতে গিয়ে লিখেন-

﴿يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِه وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا.﴾

অর্থাৎ, হে গায়েবের খবর প্রদানকারী! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে হাজির-নাজির, সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর পথে তার নির্দেশে আহবানকারী এবং দীপ্তমান সূর্য রূপে প্রেরণ করেছি। (সূরা: ৩৩-আহ্যাব: ৪৫-৪৬)

আহমদ ইয়ার খান সাহেব বলেছেন, شاهد এর অর্থ সাক্ষীও হতে পারে, আবার হাজির-নাজিরও হতে পারে। সাক্ষীকে শাহেদ (شاهد) বলার কারণ হল সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকে। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে شاهد বলা হয় এ কারণে যে, তিনি দুনিয়াতে গায়েব জগতের বিষয় দেখে সাক্ষ্য দেন। অন্যথায় অন্যান্য নবীগণও তো সাক্ষ্যদানকারী। তাহলে তফাৎ থাকল কোথায়? অথবা এ কারণে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেয়ামতের দিন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের পক্ষে চাক্ষুস সাক্ষ্য প্রদান করবেন। আর এ সাক্ষ্য দেখা ছাড়া দেয়া সম্ভব নয়। এমনিভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হওয়াও তাঁর হাজির- নাজির হওয়ার প্রমাণ। কেননা, অন্য নবীগণ একাজ করেছেন শুনে, আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাজ করেছেন দেখে। এ জন্যই তো স্বশরীরে মে'রাজ একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এরই হয়েছে। আবার "সিরাজাম মুনীরা" (سراجا منيرا) বলা হয় সূর্যকে। এটা পৃথিবীর সর্বস্থানে বিরাজমান, প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিদ্যমান। তদ্রূপ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সর্বস্থানে বিদ্যমান। সুতরাং এ আয়াতের প্রত্যেকটি বাক্য থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাজির-নাজির হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে।[১]

খণ্ডন

খান সাহেব এ সত্যটুকুও অবলোকন/অনুধাবন করেননি যে, সূর্য সর্বস্থানে বিদ্যমান নয় বরং যেখানে দিন সেখানে সূর্য বিদ্যমান আর যেখানে রাত সেখানে সূর্য অবিদ্যমান। সুতরাং এই উপমার মাধ্যমে খান সাহেবের দাবী প্রমাণিত না হয়ে সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সর্বত্র হাজির-নাজির না হওয়াই প্রমাণিত হয়। নবীগণ শুধু গায়েব সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেন- এর দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর সবকিছু জানা ও দেখা প্রমাণিত হয় না। বরং আল্লাহ তাআলার ওহী ও ইল্‌মের মাধ্যমে যতটুকু জানেন তাঁরা ততটুকুই অবগত থাকেন।

আর আহমদ ইয়ার খান সাহেব 'شاهد' -এর যে অর্থ বর্ণনা করেছেন তা ঠিক নয়। বরং 'شاهد' শব্দটি يشهد (س) شهد থেকে ইস্‌মে ফায়েল (اسم فاعل)-এর সীগা। এর অর্থ হল নিশ্চিত ও সঠিক সংবাদ প্রচারকারী। এর জন্য আলেমুল গায়েব হয়ে দেখে সাক্ষ্য দেয়া জরূরী নয়। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা কোনোভাবেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাজির-নাজির হওয়া প্রমাণ করা যায় না।

অনুরূপভাবে আহমদ ইয়ার খান সাহেব কুরআনে কারীমের যে আয়াত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাজির নাজিরের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন সেখানেই তিনি গলত ফাহ্‌মী বা ভুল বুঝার শিকার হয়েছেন। তিনি সূরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াত, সূরা নিছার ৪১ নং আয়াত ও সূরা তওবার ১২৮ নং দ্বারাও এমনভাবে প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করেছেন, যা সাধারণ বোধ সম্পন্ন ব্যক্তির নিকটও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

২য় দলীল

বিদআতীগণ হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাজির-নাজির হওয়ার পক্ষে আরও কিছু হাদীছ উল্লেখ করেন, যার দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাজির-নাজির হওয়া আদৌ প্রমাণিত হয় না।

এ ব্যাপারে শেখ সা'দী (রহ) গুলিস্তায় সুন্দর বলেছেন,

یکے پر سیدازاں گم کردۂ فرزند + کہ اے روشن گہر پیر خردمند
زمصرش بوئے پیراہن شمیدی + چرا اور چاہ کنعانش نہ دیدی
بگفت احوال ما بر جہان ست + دم پیدا ودیگردم نہان ست
گہے بر طارم اعلی نشینم + گہے بر پشت پائے خود نہ بینم

১. جاؤ الحق صـ ١٣٢

অর্থাৎ, কেউ হযরত ইয়াকূব (আ.)কে জিজ্ঞাসা করেছেন ব্যাপার কী? শত সহস্র মাইল দূর মিসর থেকে ইউসুফ (আ.)-এর জামার ঘ্রাণ পান, অথচ কেনানের নিকটে এক কূঁয়ায় ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা যখন তাকে নিক্ষেপ করল আপনি তা দেখতে পেলেন না।

উত্তরে ইয়াকূব (আ.) বলেছেন, আমাদের অবস্থা হল আকাশে চমকানো বিদ্যুতের ন্যায়, যা উদ্দীপ্ত হয়েই নিভে যায়। (অর্থাৎ, যখন আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীর ফয়জান হয় তখন আমরা দূর দূরান্তে দেখতে পাই। তবে এ অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না- অল্প সময় পর শেষ হয়ে যায়।) কখনো আমরা বহু উঁচু আসনে বসি, আবার কখনো নিজের পায়ের পিঠ পর্যন্ত দেখতে পাই না।

যে সমস্ত বিদআতীরা অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি বশত শুধু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই নন বরং বুযুর্গানে দ্বীন সম্বন্ধেও হাজির-নাজির থাকার আকীদা পোষণ করেন, তাদের ব্যাপারে ফতওয়া হল–

ফতওয়ায়ে বায্‌যাযিয়ায় বলা হয়েছে,

قال علماؤنا : من قال : أرواح المسائخ حاضرة تعلم يكفر. (بزازیہ برحاشیۂ عالمگیری ج/٦ ص ٣٢٦)

অর্থাৎ, আমাদের উলামায়ে কেরাম বলেন, যে সমস্ত ব্যক্তি এ কথা বলে যে, বুযুর্গানে দ্বীনের রূহ হাজির বা বিদ্যমান এবং সে সবকিছু জানে, এমন ব্যক্তিগণ কাফের।

নবী করীম (সা.)-এর নূর ও বাশার হওয়া প্রসঙ্গ

নূর (نور) শব্দের অর্থ হল আলো, জ্যোতি। নূর শব্দটি প্রকৃত অর্থে 'দৃশ্যমান' আলো আর রূপক অর্থে 'অদৃশ্যমান আলো' তথা হেদায়েত, জ্ঞান ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআন-হাদীছে উভয় অর্থে নূর শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। এ নূরদ্বয়ের মধ্য থেকে অদৃশ্য নূরই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের প্রধান উপায়। তাই তো ফেরেশতাগণ বাহ্যিক নূরের সৃষ্টি হওয়ার পাশা-পাশি অদৃশ্য নূরেরও অধিকারী ছিলেন। আর আদম (আ.) মাটির সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতাদের থেকে অনেক বেশি অদৃশ্য নূরের অধিকারী ছিলেন বিধায় তাঁর মর্যাদাও ফেরেশতাদের উর্ধ্বে। আর বাশার (بشر) বা ইনসান শব্দের অর্থ হল মানবজাতি, আদম সন্তান।

নবী করীম (সা.) সম্পর্কে আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা-বিশ্বাস

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্তাগত দিক থেকে বাশার বা মানুষ, তবে গুণাবলী ও কামালাতের দিক থেকে অদ্বিতীয় এবং নূর স্বরূপ। হযরত মাওঃ ইউসুফ লুধিয়ানভী সাহেব اختلاف امت اور صراط مستقیم (ইখতিলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু একজন মানুষই নন বরং সর্বোত্তম মানুষ, সমস্ত মানব জাতির সর্দার এবং আদম

(আ.) ও বনী আদমের জন্য মহান গৌরব। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. (رواه مسلم في كتاب الفضائل– باب تفضيل نبينا صلى الله عليه و سلم على جميع الخلائق)

অর্থাৎ, আমি কেয়ামত দিবসে আদম সন্তানদের সর্দার হব। সর্বপ্রথম আমার কবর খোলা হবে। আমিই সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং সর্বপ্রথম যার সুপারিশ কবূল হবে সে আমি। (মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমনিভাবে সত্তাগত দিক থেকে একজন মানুষ, তেমনিভাবে হেদায়েতের দৃষ্টিকোণ থেকে মানব জাতির জন্য নূরের সুউচ্চ স্তম্ভ। সেই স্তম্ভের আলোকরশ্মি থেকেই মানব জাতির জন্য সঠিক পথের সন্ধান লাভ হয়। যার কিরণমালা আজও দীপ্তিমান রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাশার তথা মানুষ হয়েও নূর তথা হেদায়েতের আলোকবর্তিকা। বস্তুত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ সমস্ত নবী মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত ও হাদীছ উল্লেখ করা হল–

﴿قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ.﴾

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি বলে দাও, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় এই মর্মে যে, তোমাদের মা'বূদই একমাত্র মা'বূদ।' (সূরা: ১৮-কাহ্‌ফ: ১১০)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا. وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى اِلَّا اَنْ قَالُوْۤا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا. قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا.﴾

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি বলে দাও আমার প্রতিপালক পূত-পবিত্র সত্তা। আমি তো একজন মানব, রসূল মাত্র। লোকদের নিকট হেদায়েত এসে যাওয়ার পর এ উক্তি তাদেরকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখে যে, আল্লাহ কি মানুষকে রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। ... । (সূরা: ১৭-বানী ইসরাঈল: ৯৪-৯৫)

অনুরূপ আরও বহু আয়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানুষ বলা হয়েছে। তবে সাথে সাথে তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, তিনি একজন মহান রসূল, তাঁর উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়।

হযরত উম্মে সালামা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

(١) عن أم سلمة رضـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال : إنما أنا بشر وإ نه يأتيني الخصم. إلي أخر الحديث. (متفق عليه، رواه البخاري ج/١ صـ ٣٣٢ أبواب المظالم والقصاص– باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلم، ورواه مسلم في كتاب الأقضية صـ ٨٤)

এ হাদীছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সম্পর্কে বলেছেন, "আমি তো একজন মানুষ মাত্র"। (বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য আরেক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

(٢) قال عبد الله (بن مسعود) : ... ولكن إنما إنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذ كروني. (رواه البخاري في كتاب الصلوة– باب التوجه نحو القبلة حيث كان ج/١ صـ ٥٨)

এ হাদীছেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নামাযের এক ঘটনা প্রসঙ্গে নিজের সম্পর্কে) বলেছেন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ; তোমাদের যেমন ভুল হয় আমারও তেমন ভুল হয়। সুতরাং আমি যখন কোন জিনিস ভুলে যাব, তখন তোমরা আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিবে। (বোখারী)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে প্রমাণিত হল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ- ফেরেশতা, জিন, কিংবা অন্য কোন মাখলুক নন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরীর নূরের তৈরি নয় বরং মানব জন্মের প্রাকৃতিক ধারা অনুসারেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সৃষ্টি হয়েছে। আর মানব সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ.﴾

অর্থাৎ, আর স্মরণ কর যখন প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেনঃ আমি মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করব। (সূরা: ৩৮-সাদ: ৭১)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا.﴾

অর্থাৎ, ঐ সত্তা, যিনি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর পানি দ্বারা, এরপর জমাট রক্ত দ্বারা, তার পর তোমাদেরকে শিশু রূপে বের করেন। এরপর তোমরা যৌবনে পদার্পন কর, তার পর বাধ্যর্কে উপনীত হও। (সূরা: ৪০-মু'মিন: ৬৭)

এ সব আয়াতে সামগ্রিকভাবে মানব সৃষ্টির ধারা বর্ণিত হয়েছে। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

عن واثلة الأسقع يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه الصلوة السلام، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. (رواه مسلم في أول كتاب الفضائل ج/٢ صـ ٢٤٥، ورواه الترمذي في أول ابواب المناقب وقال : هذا حديث صحيح. ج/٢ صـ ٢٠١. اللفظ لمسلم)

অর্থাৎ, হযরত ওয়াছিলা ইবনে আছক্বা' (রা.) বলেন যে, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর থেকে কিনানাকে মনোনীত করেছেন। আর কিনানা থেকে কোরাইশকে, কোরাইশ থেকে বনূ হাশিমকে আর বনূ হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন। (মুসলিম ও তিরমিযী)

আবূ জা'ফর বাকের (রহ.) থেকে বর্ণিত- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إنما خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم، ولم يصبني من سفاح أهل الجاهلية شيئ لم أخرج إلامن طهره. (رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى عن أبي جعفر الباقر مرسلا، وكذا رواه عبد الرزاق. قال ابن كثير في البداية والنهاية ج/٢ صفحـ/٢٠٩ : هذا مرسل جيد.)

অর্থাৎ. আমার জন্ম বিবাহের মাধ্যমে হয়েছে। কোন অবৈধ পন্থায় নয়। আদম (আ.) থেকে নিয়ে (আমার মাতা-পিতা পর্যন্ত সমস্ত স্তর বৈধ বিবাহ-বন্ধনের মাধ্যমেই চলে আসছে।) জাহিলিয়্যাতের কোন অবৈধ পদ্ধতি আমাকে স্পর্শ করেনি। পবিত্র ও বৈধ পদ্ধতিতেই আমার জন্ম হয়েছে। (তাবাকাতে ইবনে সা'আদ ও মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক)

পূর্বোক্ত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হল যে, মানব জন্মের প্রাকৃতিক ধারা অনুসারেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম হয়েছে। নূর থেকে নয়। এজন্যই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার সুপ্রসিদ্ধতম কিতাব 'শরহে আকাইদে নাসাফীতে' রসূল-এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে–

إنسان بعثه الله لتبليغ الرسالة والأحكام.

অর্থাৎ, রসূল ঐ ব্যক্তি (মানুষ) কে বলা হয় আল্লাহ তাআলা যাকে (বান্দা পর্যন্ত) স্বীয় বিধি-বিধান ও রিছালাত পৌছানোর জন্য প্রেরণ করেছেন।"

বিদআতীদের দলীল ও তার খণ্ডন

১. রেজাখানী উলামায়ে কেরামের আকীদা-বিশ্বাস যদিও এই যে, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ (বাশার)। যে এটাকে অস্বীকার করবে সে কাফের।' কিন্তু তারা কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত নূর (نور) শব্দের ব্যাখ্যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র সত্তা মুরাদ বলে

ব্যক্ত করে থাকেন। যার দ্বারা সাধারণ মানুষ এই বিভ্রান্তিতে পড়েন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূরের তৈরি, অর্থাৎ, তিনি মানুষ (বাশার) নন।[১]
আয়াতটি এই–

﴿قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَه سُبُلَ السَّلٰمِ.﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নূর (আলো) এবং স্পষ্ট কিতাব এসেছে। যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে শান্তির পথ দেখান, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। (সূরা: ৫-মায়িদা: ১৬)

খণ্ডন

এ আয়াতে নূর (نور) দ্বারা বোঝানো হয়েছে "কুরআনে কারীম"কে। আর 'كتاب مبين' - 'نور' থেকে عطف تفسيرى হয়েছে। এর প্রমাণ হল-

(এক) আয়াতের পশ্চাদবর্তী অংশে 'يهدى به الله' বাক্যে 'به' তে একবচনের সর্বনাম ضمير ব্যবহার করা হয়েছে। যদি 'نور' ও 'كتاب مبين' দ্বারা পৃথক পৃথক দুটো বিষয় উদ্দেশ্য হত তাহলে একবচনের সর্বনাম ব্যবহার করা সহীহ হত না।

(দুই) নিম্নোক্ত দুই আয়াতে যেমনিভাবে তাওরাত এবং ইঞ্জিলকে নূর (نور) বলা হয়েছে, তদ্রূপ আলোচ্য আয়াতেও "নূর" দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য হওয়াটাই যুক্তি সংগত এবং তা দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্তা উদ্দেশ্য নেয়া ভুল।

﴿اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ.﴾

অর্থাৎ, আমি নাযিল করেছি তাওরাত, যাতে রয়েছে হেদায়েত ও নূর। (সূরা: ৫-মায়িদা: ৪৪)

﴿وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّ نُوْرٌ.﴾

অর্থাৎ, আমি তাকে দান করেছি ইঞ্জীল, যাতে রয়েছে হেদায়েত ও নূর। (সূরা: ৫-মায়িদা: ৪৬)

২. আর একদল রয়েছেন যারা বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার নূরসমূহের একটি নূর। যিনি বাশারিয়্যাতের তথা মানবের আবরণে আবির্ভূত হয়েছেন। অর্থাৎ, তারা বলতে চান যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র প্রকাশ (ظهور) ছিলেন। আর অনেকে এ পর্যন্তও বলে যে, আহাদ (احد) তথা আল্লাহ আর আহ্মদ (احمد) তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাঝে শুধু 'ميم' -বর্ণের পার্থক্য। (নাউযুবিল্লাহ)।

১. এরূপ করার পশ্চাতে মীলাদে কেয়াম করার বিষয়টার স্বপক্ষে দলীল দাঁড় করানোর চিন্তা-চেতনা কাজ করছে। সেটা এভাবে যে, তাদের বর্ণনা মতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হলে তিনি তা জানেন। যেহেতু তিনি হাজির-নাজির বা সর্বত্র উপস্থিত। আর কোন রক্ত মাংসে গঠিত স্থূল দেহবিশিষ্ট্য মানুষের পক্ষে সর্বত্র হাজির-নাজির থাকা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সর্বত্র হাজির-নাজির থাকার বিষয়টার পক্ষে আনুকূল্য সৃষ্টির স্বার্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নূর বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে থাকেন।

খণ্ডন

এটা হুবহু ঐ আকীদা যা, খৃষ্টানরা ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে পোষণ করে থাকেন যে, তিনিই খোদা তবে তিনি মানুষের রূপে আগমন করেছেন। এ আকীদা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা সৃষ্টি আর সৃষ্টিকর্তা কখনো এক হতে পারে না। উম্মত কর্তৃক এ ধরনের বাড়াবাড়ির আশংকা ছিল বিধায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করে বলেছেন,

عن عمر رضـ قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لاتطروني كما إطرت النصارى عيسَى بن مريم، فإنما أنا عبده، ولكن قولوا : عبد الله ورسوله. (رواه البخاري في كتاب الأنبياء– باب قول الله عز و جل واذكر في الكتاب مريم إلخ جـ/٢ صـ ٤٩)

অর্থাৎ, হযরত ওমর (রা.) থেকে বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– আমার প্রশংসায় তোমরা এতটা বাড়াবাড়ি কর না, যেমনটা খৃষ্টানরা ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে করেছিল। (তারা ঈসা (আ.)কে খোদা এবং খোদার বেটা বানিয়ে দিয়েছিল।) আমি তো আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রসূল। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহ্র বান্দা এবং রসূলই বলবে। (বোখারী)

৩. বাতিলপন্থীরা তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে কয়েকটা জাল হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। যা লোক মুখে হাদীছ বলে প্রসিদ্ধ হলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো জাল হাদীছ। নিম্নে সেরূপ কয়েকটা প্রদত্ত হল।

(١) أول ما خلق الله نوري.

(১) আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।

(٢) عن جابر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول شيئ خلقه الله، قال : هو نور نبيك ياجابر.

(২) জাবের (রা.) বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বললেন, "হে জাবের! সেটা হল তোমার নবীর নূর"।

(٣) أنا من نور الله وكل شيئ من نوري.

(৩) আমি আল্লাহ তাআলার নূর থেকে (সৃষ্ট) আর সব কিছু আমার নূর থেকে (সৃষ্ট)

(٤) انا من نور الله وكل والمؤمنون مني.

(৪) আমি আল্লাহ তাআলার নূর থেকে আর মুমিনগণ আমার থেকে।

(٥) أنا من الله والمؤمنون مني.

(৫) আমি আল্লাহ তা'আলা থেকে আর মুমিনগণ আমার থেকে।

(৬) আর একটি হাদীছে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আ.)কে তাঁর বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, একটি

তারকা প্রতি ৭০ হাজার বছর পর পর উদিত হয়; আমি সেটিকে ৭০ হাজার বার উদিত হতে দেখেছি। এতে আপনি আমার বয়স আন্দায করে নিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সেটিই ছিল আমার নূর।

(৭) আর একটি হাদীছে বলা হয়েছে, হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির ১৪ হাজার বছর পূর্বে আমি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নূর আকারে বিদ্যমান ছিলাম।

খণ্ডন

বাতিলপন্থীদের দলীল হিসাবে প্রদত্ত এ হাদীছগুলোর ব্যাপারে সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ শায়খ আব্দুল্লাহ ইব্নে সিদ্দীক আল গুমারী (রহ.), শায়খ আহমদ ইব্নে আব্দুল কাদের শানকীতী, হাফেজ ইব্নে তাইমিয়া ও ইবনে কাছীরসহ অন্য অনেক হাদীছ বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন যে, এ সবগুলোই জাল, মিথ্যা ও বানোয়াট।[১]

৪. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূর ছিলেন-এ প্রসঙ্গে বিদআতীগণ ঐ রেওয়ায়েত দ্বারাও দলীল দিয়ে থাকেন, যাতে বলা হয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছায়া ছিল না।

খণ্ডন

এ সম্পর্কিত কোনো সহীহ রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না। জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) তাঁর "খাসায়েসে কুবরা" (خصائص كبرى) গ্রন্থে এ রেওয়ায়েতটি হাকিম তিরমীযী-র বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন। তবে নিম্নোক্ত কারণসমূহের ভিত্তিতে সে রেওয়ায়েতটি গ্রহণযোগ্য নয়–

(১) উক্ত রেওয়ায়েত বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন আব্দুর রহমান ইব্নে কায়ছ যা'ফরানী, যিনি গ্রহণযোগ্য রাবী নন। এমনকি তার সম্বন্ধে জাল হাদীছ রচনা করারও অভিযোগ রয়েছে। তার সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্যসমূহ লক্ষ্যণীয়–

١ . قال ابن حجر : متروك. (التقريب ج/١ صفحه/٥٨٨)

٢ . قال أبو زرعة : كذاب. (تاريخ بغداد ج/٨ صفحه/ ٢٧٧)

٣ . قال الإمام مسلم : ذاهب الحديث. (المصدر السابق)

(٤) قال أبو علي : كان يضع الحديث. (المصدر السابق)

(২) উক্ত রেওয়ায়েতটি মুরসাল (مرسل), যা মুহাদ্দিছীনে কেরামের অনেকের নিকট দলীলযোগ্য নয়। বিশেষতঃ এরূপ হাদীছ দিয়ে আকাইদের বিষয়ে দলীল দেয়া চলে না।

---

১. দ্রঃ নিম্নোক্ত কিতাবাদি–

(১) المرشد الحائر لبيان وضع حديث جابر. الغمري

(২) تنبيه الحذاق على بطلان ما شاء بين الإنام في حديث النور المنسول لمصنف عبد الرزاق

(৩) مجوعه فتاوى ابن تيميه ج/١٨، صفحه/٣٦٦-٣٦٧ প্রভৃতি কিতাব। বরাত- মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সাহেবের তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় প্রকাশিত "প্রচলিত জাল হাদীছ"।

(৩) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক রৌদ্রে এবং চাঁদের আলোতে চলার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। আর সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়া সাল্লাম-এর ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র বিষয়ও বর্ণনা করা। যদি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছায়া না পড়ার মত একটি অলৌকিক বিষয় ঘটত, তাহলে তা অসংখ্য সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হত। কিন্তু সেখানে মাত্র একটি রেওয়ায়েতে তা বর্ণিত হওয়া তাও একটি জয়ীফ রেওয়ায়েতে- এ বিষয়টি উপরোক্ত রেওয়ায়েতকে অগ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।

৫. বিদআতীগণ ঐ রেওয়ায়েত দ্বারাও দলীল দিয়ে থাকেন যাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নিজেকে নূর বানিয়ে দেয়ার দুআ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলতেন, اللهم اجعلني نورا.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে নূর বানিয়ে দাও।[১]

খণ্ডন

তিনি নিজেকে নূর বানিয়ে দেয়ার দুআ করতেন- এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি নূর ছিলেন না। আর বস্তুত এখানে নূর অর্থ হল হেদায়েতের নূর। তিনি নিজেকে নূর বানিয়ে দেয়ার দুআ করতেন তথা তাঁর হেদায়েতের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে দেয়ার দুআ করতেন। তাছাড়া আরও লক্ষ্যণীয় যে, এ দুআ তো উম্মতের লোকেরাও করে থাকে। তাহলে এই দুআকারী সকলেই নূরের তৈরি হয়ে যাবে?

নূর ও বাশার প্রসঙ্গে দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে রেজাখানীদের একটা মিথ্যা অভিযোগ ও তার খণ্ডন

রেজাখানী বা রেজভীগণ মাওঃ শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ ও আকাবিরে দেওবন্দের ব্যাপারে একটা মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে থাকেন যে, তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের মত মানুষ মনে করেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদা বড় ভাইয়ের মত বলে মনে করেন।

খণ্ডন

এটা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের যে আকীদা, দেওবন্দ ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এরও সেই আকীদা। (দ্রঃ عقائد علماء دیوبند و المهند على المفند)

স্বয়ং হযরত মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) 'تقویۃ الایمان' গ্রন্থের ৫৮ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

سب انبیاء اولیاء کے سر دار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور لوگوں نے انہیں کے بڑے بڑے معجزے دیکھے، انہیں سے سب اسرار کی باتیں سیکھیں اور سب بزرگوں کو انہیں کی پیروی سے بزرگی حاصل ہوئی۔

---

১. এ বাক্যটি (اللهم اجعلني نورا) বোখারী ও মুসলিম শরীফের একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েতের এক অংশ।

অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত আম্বিয়া এবং আউলিয়ায়ে কেরামের সর্দার ছিলেন। আর মানুষ তাঁর বড় বড় মু'যিজা দেখেছে, তাঁর থেকেই সমস্ত সুক্ষ্ম বিষয়াদি শিখেছে এবং সমস্ত বুযুর্গদের বুযুর্গী অর্জন হয়েছে তাঁরই অনুসরণ অনুকরণের মাধ্যমে।

ওরশ প্রসঙ্গ

ওরশ-এর অর্থ

ওরশ (عُرس)-এর আভিধানিক অর্থ বিবাহ, বাসর। পরিভাষায় ওরশ বলতে বোঝায় বৎসরান্তে কোন ওলী ও বুযুর্গের মাযারে সমবেত হয়ে ধুমধাম সহকারে ফাতেহাখানী, ঈসালে ছওয়াব, ভোজ ইত্যাদির আয়োজন করা।

ওরশ-এর হুকুম

ওরশ-এর ক্ষেত্রে দুটো বিষয় পালিত হয়ে থাকে। (এক) বৎসরান্তে নির্দিষ্ট দিনে কোন ওলী ও বুযুর্গের কবর যিয়ারতে সমবেত হওয়া এবং ঈসালে ছওয়াব করা অর্থাৎ, মৃত্যু-বার্ষিকী পালন করা।
(দুই) সংশ্লিষ্ট ওলী ও বুযুর্গের কবর দূরে হলে প্রয়োজনে সেই উদ্দেশ্যে সফর করা।

এখন ওরশের হুকুম বুঝতে হলে এই দুটো বিষয়ের হুকুম পৃথক পৃথকভাবে বুঝা আবশ্যক।

১ম বিষয়ের হুকুম

বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি সুধারণা রাখা এবং মহব্বত পোষণ করা, যথাযথভাবে তাঁদের পদাংক অনুসরণ-অনুকরণ করে চলা এবং তাঁদের মৃত্যুর পর নিয়মানুসারে ইছালে সাওয়াব করা, তাঁদের মর্যাদা বুলন্দির জন্য দুআ করা- এসবই প্রশংসনীয় কাজ এবং উত্তম আমল- সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তবে কবর যিয়ারাতের জন্য কোন দিনকে নির্দিষ্ট করে সকলেই সেদিনে সমবেত হওয়াকে শরীআত আদৌ সমর্থন করে না। বিশেষ করে বৎসরান্তে এক দিনকে নির্দিষ্ট করা যাকে পরিভাষায় ওরশ বলা হয়- শরীআতে এর কোনোই ভিত্তি নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لاتجعلوا قبري عيدا. (مشكوة عن النسائى)

অর্থাৎ, তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানিও না।

মুহাদ্দিছীনে কেরাম এর বিভিন্ন অর্থ ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, "**لاتجعلوا للزيارة اجتما عكم للعيد**" অর্থাৎ, তোমরা ঈদে সমবেত হওয়ার মত যিয়ারতের জন্য সমবেত হয়ো না। আর ওরশের মাঝে এমন সমাবেশই ঘটানো হয়ে থাকে- যা থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,

المراد الحث على كثرة زيارته ولايجعل كالعيد الذي لايأتي في العام إلا مرتين. (كذا في المرقات- ج.٣ صفحه/١٠)

অর্থাৎ, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল মানুষকে বেশি বেশি যিয়ারাতের উপর উদ্বুদ্ধ করা এবং এই যে, কবর যিয়ারতকে যেন ঈদের মত বানানো না হয়, যা বৎসরে দুইবার পালন করা হয়। বরং বেশি বেশি যেন যিয়ারাত করা হয়। আর ওরশও বৎসরে একবার উদযাপিত হয়। সুতরাং ওরশ করা হাদীছ পরিপন্থী। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়া সাল্লাম-এর কবরেই যখন ওরশ করা জায়েয নেই, তখন অন্য কারও কবরে তো এমনটা জায়েয হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) লিখেছেন–

لاتجعلوا زيارة قبري عيدا. أقول هذا إشارة إلى سد مدخل التحريف كما فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم وجعلوها عيدا وموسما بمنزلة الحج. (حجة الله البالغة [الأذكار وما يتعلق بها) ج/٢ ص ٧٧ طبع مصر)

অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বলেছেন, "তোমরা আমার কবর যিয়ারাতকে ঈদ বানিও না।" আমি বলব, এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যেন তাহ্রীফ (ধর্মে বিকৃতি সাধন)-এর পথ বন্ধ হয়ে যায়। কেননা, ইয়াহুদ নাসারারা তাদের আম্বিয়া (আ.)-এর কবরকে ঈদের মত এবং হজ্জের মত মওসূমী বানিয়ে নিয়েছে।

যেমনিভাবে হজ্জের জন্য বিশেষ সময়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তা আঞ্জাম দেয়া হয়, ঠিক তেমনিভাবে ইয়াহুদী নাসারারা তাদের নবীদের কবরের সাথেও এমন করে থাকে। আর নামকা ওয়াস্তে মুসলমানরা আম্বিয়ায়ে কেরামের পরিবর্তে আউলিয়া কেরামের কবরের সাথে বরং বানাওয়াটি কবরের সাথে এমনটা করে থাকে। যা দেখে ইয়াহুদী নাসারাগণও লজ্জিত হয়।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) আরও লিখেছেন–

ومن أعظم البدع ما اخترعوا في أمور القبور واتخذوها عيدا. (راه سنت از تفهيمات الهيه ج/٢ صـ٦٤)

অর্থাৎ, ঐ সকল বিষয়ও বড় বিদআতসমূহের অন্তর্ভুক্ত, কবরের ব্যাপারে মানুষ যা উদ্ভাবন করেছে এবং কবরকে তারা ঈদের মত মেলায় পরিণত করেছে।

হযরত শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) বলেন, কবর যিয়ারাতের জন্য দিন নির্দিষ্ট করা বিদআত। মূলত যিয়ারত করা জায়েয কিন্তু তার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা (যা উলামায়ে সালাফের মাঝে ছিল না) বিদ'আত।[১]

---

১. فتاوى عزيزى صـ ١٧٢

হযরত কাজী ছানাউল্লাহ হানাফী বলেন,

لايجوز ما يفعله الجهال بقبور الأولياء والشهداء من السجود الطواف حولها واتخاذ السرج المساجد عليها ومن الاجتماع بعد الحول كالا عياد ويسمونه عرسا. (تفسير مظهرى ج/٢ صـ ٦٥)

অর্থাৎ, অজ্ঞ, মূর্খরা আউলিয়া ও শুহাদাদের কবরের সাথে যা করে থাকে, এসব নাজায়েয। তথা কবরকে সাজদা করা, কবরের চতুর্পাশে তওয়াফ করা, বাতি জ্বালানো, তাদের দিকে ফিরে সাজদা করা এবং বৎসরান্তে ঈদের মত সেখানে সমবেত হওয়া যাকে তারা ওরশ বলে।

আর ارشاد الطالين এর ১২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন–[১]

قبور اولياء بلند كردن وگنبد برآن ساختن وعرس و امثال آں وچراغاں كردن همه بدعت است بعض ازاں حرام اسب وبعض مكر وه پيغمبر خدا بر شمع افروزاں نزدقبر و سجده كنندگاں را لعنت گفته۔

অর্থাৎ, আউলিয়ায়ে কেরামের কবরকে উঁচু করা, কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা, ওরশ করা, বাতি জ্বালানো- এ ধরনের আরও যা আছে সব বিদআত। কতক তো হারাম আর কতক মাকরূহ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের পাশে বাতি প্রজ্বলনকারী এবং সাজদাকারীদের উপর লা'নত করেছেন।

হযরত শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক (রহ.) লিখেছেন–

مقرر ساختن روزعرس جائز نيست۔ (راه سنت از مسائل اربعين صـ ٣٨)

অর্থাৎ, ওরশের দিন ধার্য করা জায়েয নেই।

২য় বিষয়ের হুকুম

পূর্বে বলা হয়েছে বুযুর্গানে দ্বীনের কবর যিয়ারত করা, মৃত্যুর পর নিয়মানুসারে তাঁদের উদ্দেশ্যে ঈছালে ছওয়াব করা, তাঁদের মর্যাদা বুলন্দির জন্য দুআ করা এসবই প্রশংসনীয় এবং উত্তম কাজ। সেমতে যদি কোন বুযুর্গের কবর ধারে কাছে হয়, তাহলে সেখানে উপস্থিত হয়ে দুআ করা ও শর্‌য়ী তরীকায় সালাম পৌঁছানো এসব জায়েয। তবে যদি কোন বুযুর্গের কবর অনেক দূরে হয়, তাহলে যিয়ারতের জন্য সেখানে সফর করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট বিতর্কিত বিষয়। যারা নিষেধের পক্ষে তারা নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।[২]

عن أبي هريرة رضـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : ومسجدِ الحرام و مسجدِ الرسول صلى الله عليه وسلم و مسجدِ الأقصى. (متفق

২. ازراه سنت

১. এ হাদীছ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৪৬৭।

عليه، رواه البخاري في باب فضل الصلوة في مسجد مكة المدينة، ورواه مسلم في باب لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وللفظ لمسلم)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মসজিদে হারাম, রসূলের মসজিদ (মসজিদে নববী) ও মসজিদে আকসা- এই তিন মসজিদের উদ্দেশ্য ব্যতীত সফর করা যাবে না। (বোখারী ও মুসলিম)

হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, আমার কাছে কবর, কোন আল্লাহ্‌র ওলীর এবাদতখানা এবং তূর পর্বত এ সবগুলোই উপরোক্ত হাদীছের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।[১]

তিনি আরো বলেন, কেউ যদি আজমীর শরীফে খাযা মুঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (রহ.)-এর কবরে কিংবা হযরত সালার মাসউদ গাজীর কবরে অথবা এ ধরনের অন্য কোন কবরে গিয়ে কোন প্রয়োজন পূরণের তলব করে, তাহলে সে হত্যা এবং যেনার চেয়ে মারাত্মক গোনাহ করল।[২]

হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নৌরী (রহ.) হযরত আনওয়ার শাহ কাশমীরী-র বরাত দিয়ে বলেছেন, আওলিয়ায়ে কেরামের কবর যিয়ারতের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সফরের পক্ষে স্বতন্ত্র দলীল চাই। উপরোক্ত হাদীছ যথেষ্ট নয়। যদিও ইমাম গাযালী (রহ.) বলেছেন, উপরোক্ত হাদীছে তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের অতিরিক্ত কোন ফযীলত না থাকায় তার উদ্দেশ্যে সফর করতে নিষেধ করেছেন তবে বিভিন্ন ওলীর সাথে বিভিন্ন জনের মুনাসাবাত থাকার কারণে তাদের কবর যিয়ারাতের দ্বারা ভিন্ন ফায়দা হতে পারে এ হিসাবে তার জন্য সফর করাতে কোন ক্ষতি না থাকা চাই।

আল্লামা শামী "মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা"-এর বরাতে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ পূর্বক তা দ্বারা কোন ওলীর কবর দূরে হলে তার জন্য সফর করা যেতে পারে বলে মত দিয়েছেন।

إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قبور الشهداء الشهداء يأُحْدٍ على رأس كل سنة.

(رد المختار ج/٣ مطلب في زيارة القبور)

অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক বৎসরের মাথায় ওহুদ প্রান্তরে শহীদগণের কবরের কাছে আসতেন।

তবে এই ইস্তিদলাল পূর্ণাঙ্গ নয়। কেননা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুহাদায়ে ওহুদের কবর যিয়ারতের জন্য মদীনা থেকে ওহুদের পাদদেশে গিয়েছিলেন। এটাকে কোন সফর বলা যায় না। মদীনা থেকে ওহুদ (মসজিদে নববী থেকে উত্তর দিকে) মাত্র তিন মাইলের পথ।

১. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্ ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২।

২. تفهيمات الهيه ج/ ٢ صـ ٤٥

ওরশ-এর পক্ষে দলীল ও তার খণ্ডন

মৌলভী আব্দুস সামী' সাহেব, মুফতী আহ্‌মদ ইয়ার খান সাহেব ও সুরেশ্বরীর পীর সাহেব প্রমুখ ওরশপন্থী অনেকেই উপরোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা ওরশ পালন তথা নির্দিষ্ট দিনে কবরের কাছে গমন ও ঈছালে ছওয়াব করার পক্ষে দলীল দেয়ার চেষ্টা করেছেন, যাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৎসরান্তে শুহাদায়ে ওহুদের কবরের পাশে যেতেন। অর্থাৎ, সেখানে যেয়ে সালাম বলতেন ও দুআ করতেন। তাদের এ দলীল ঠিক নয়। কেননা এ রেওয়ায়েতে বৎসরান্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গমনের কথা উল্লেখ আছে, তবে সেটি নির্দিষ্ট তারিখেই হত এমনটি হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট নয়। তদুপরি সেখানে ওরশের মত সমবেত হওয়া এবং কুরআন তেলাওয়াত ও ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদির কথা –প্রচলিত ওরশ বলতে যা বোঝায় তার– উল্লেখ নেই। উপরোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা শুধু এতটুকু বলা যেতে পারে যে, কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফর হতে পারে। যদিও এই ইস্তিদলাল পূর্ণাঙ্গ নয় কেননা, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুহাদায়ে ওহুদের কবর যিয়ারতের জন্য মদীনা থেকে ওহুদের পাদদেশে গিয়েছিলেন। এটাকে কোন সফর বলা যায় না। মদীনা থেকে ওহুদ (মসজিদে নববী থেকে উত্তর দিকে) মাত্র তিন মাইলের পথ।

মোটকথা- এমন কোন সহীহ্ আকলী (যুক্তিগ্রাহ্য) ও নকলী (কুরআন হাদীছে বর্ণিত) দলীল নেই যা ওরশের বৈধতার পক্ষে দলীল হতে পারে।

ওরশ-এর কথিত ফায়দা ও তার খণ্ডন

মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেব ওরশ পালন তথা নির্দিষ্ট দিনে সমবেত হওয়ার উপকারিতা সম্বন্ধে লিখেছেন– ওরশের সময় নির্দিষ্ট করা হলে মানুষের জমায়েত হওয়া সহজ হয়। তারা সমবেত হয়ে, কুরআন তেলাওয়াত, কালিমায়ে তাইয়্যিবা এবং দুরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে থাকে। এতে অনেক বরকত ও ছওয়াব অর্জিত হয়।[১]

মুফতী সাহেবের একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, শায়খ আলী মুত্তাকী হানাফী লিখেছেন–

الاجتماع لقراءة القرآن على الميت بالتخصيص في المقبرة أو المسجد أو البيت بدعة مذمومة. (رسالۂ رد بدعت)

অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির উপর কুরআন তেলাওয়াতের জন্য বিশেষ করে কবরস্থানে, মসজিদে এবং বাড়ীতে সমবেত হওয়া বিদআত।

সুতরাং সমবেত হওয়াটাই যখন বিদআত তখন কুরআন তেলাওয়াতের জন্য জমায়েত হওয়ার কোন প্রসঙ্গই টানার মত বিষয় নয়।

---

১. جاء الحق ص۳۰۹

কবরে বাতি জ্বালানো প্রসঙ্গে

কবরে কোন ধরনের প্রদীপ, মোমবাতি, কিংবা আলো জ্বালানোর কোনো ভিত্তি শরীআতে নেই। বরং শরীআত এগুলোকে অত্যন্ত কোপের দৃষ্টিতে দেখে। এগুলো নিষিদ্ধ। নিম্নে এ ব্যাপারে কয়েকটি দলীল প্রদান করা হল।

১ নং দলীল

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. (رواه أبو داود في كتاب الجنائز– باب في زيارة النساء القبور ج/٢ ص ٤٦١– وراه النسائي في كتاب الجنائز– التغليظ في اتخاذ السرج على القبور ج/١ ص٢٢٢)

অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যিয়ারাতকারিনী মহিলা, কবরকে সাজদার স্থান বানানেওয়ালা এবং কবরে বাতি প্রজ্জলনকারীর উপর লা'নত করেছেন। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)

উপরোক্ত হাদীছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলেম এবং জাহেলের কবরের মাঝে কোনো পার্থক্য করেননি বিধায় সব ধরনের কবরেই বাতি প্রজ্জ্বলিত করা লা'নতজনক বলে প্রমাণিত।

সুতরাং যে কাজের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত বা অভিসম্পাত করেছেন, সেকাজ কিছুতেই জায়েয কিংবা মুস্তাহাব হতে পারে না এবং তাতে কোনো ধরনের বরকত ও কল্যাণ থাকতে পারে না।

উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে বিদআতীদের একটা অপব্যাখ্যা ও তার উত্তর

বিদআতীগণ এ হাদীছের অপব্যাখ্যা দিয়ে বলেন[১], উক্ত হাদীছে যেহেতু 'على' (যার অর্থ উপরে) বর্ণটি এসেছে, তাই তার দ্বারা কবরের উপর বাতি জ্বালানো নাজায়েয প্রমাণিত হবে, কবরের আশ-পাশে বাতি জ্বালানো না-জায়েয প্রমাণিত হবে না।

এরূপ ব্যাখ্যা অজ্ঞতার পরিচায়ক। কেননা على বর্ণটি উপর ও আশ-পাশ উভয় অর্থই জ্ঞাপন করে থাকে। যেমন: কুরআনে কারীমে হযরত উযায়র (আ.)-এর একটি ঘটনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّ هِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا.

অর্থাৎ, তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের ওপর পড়েছিল। (সূরা বাকারাহ: ২৬৯)

এ আয়াতে উল্লেখিত عَلٰى قَرْيَةٍ –এর على বর্ণটি উপরের অর্থে আসেনি যে, উযায়র (আ.) বস্তিবাসীর ঘর-বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছেন। বরং অর্থ হল

বস্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছেন। অনুরূপ মে'রাজের হাদীছে এসেছে- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

فمررت على موسى. (متفق عليه)

অর্থাৎ, মূসা (আ.)-এর কাছ দিয়ে আমার যাত্রা হয়েছে। (বোখারী ও মুসলিম)

অনুরূপ কুরআনে এসেছে–

وَلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِه.

অর্থাৎ, তুমি তার (মুনাফিকের) কবরের পাশে দাঁড়াবে না। (সূরা তাওবা: ৮৪)

এসব স্থানে 'على' বর্ণটি আশ-পাশের অর্থে এসেছে। সুতরাং উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা কবরের উপর বাতি দেয়া যেমনি ঘৃণিত কাজ বলে প্রমাণিত হবে, তেমনি কবরের আশ-পাশে বাতি দেয়াও। বরং দ্বিতীয়টা মানুষের মাঝে বেশি প্রচলিত ছিল এবং এখনো আছে। তাই এটাই নিষেধাজ্ঞার মূল লক্ষ্যবস্তু হওয়ার কথা। অতএব এটাই বেশি ঘৃণিত বলে প্রমাণিত হবে।

২ নং দলীল

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) মৃত্যুকালে ওসিয়্যাত করে বলেছিলেন,

فإذا أنا متُّ فلا تصحبني نائحة ولا نار. (رواه مسلم في كتاب الإيمان– باب كون الإ سلام يهدم ما كان قبله وكذا الحج والهجرة ج/١ صـ ٧٦)

অর্থাৎ, আমি যখন মৃতুবরণ করব, তখন কোন মাতমকারিনী মহিলা এবং আগুন যেন আমার সঙ্গে না যায়। (মুসলিম)

হযরত আসমা বিন্‌তে আবি বকর (রা.)ও এই ওসিয়্যাত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

ولا تتبعوني بنار. (موطأ إمام مالك النهي أن تتبع الجنازة بنار ص ٧٨)

অর্থাৎ, তোমরা আমার সঙ্গে আগুন নিয়ে যাবে না। (মুয়াত্তা মালেক)

এভাবে সাহাবায়ে কেরাম মৃতুর সময় ওসিয়্যাত করে গেছেন যে, তাদের সাথে যেন আগুন নিয়ে যাওয়া না হয়। অথচ আজকাল ধুমধাম করে কবরে বাতি দেয়া হচ্ছে।

বাতি জ্বালানোর একটা কথিত ফায়দা ও তার জওয়াব

বলা হচ্ছে, এর মাধ্যমে বুযুর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু আমাদের জেনে রাখা দরকার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লা'নতকৃত কাজ করে এবং হাদীছের বিরুদ্ধাচরণ করে কোনো সম্মান প্রদর্শন হতে পারে না।

১. যেমন বলেছেন আহমদ ইয়ার খান "জাআল হক্ক" গ্রন্থে পৃ. ২৮৮।

কবরে বাতি জ্বালানো সর্বস্তরের উলামায়ে কেরামের নিকট নিষিদ্ধ

পূর্বে উল্লেখিত মুসলিম শরীফের হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহ.) লিখেছেন–

وأما اتباع الميت بالنار مكروه للحديث. ثم قيل : سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية. وقال ابن حبيب المالكي : كره تفاولا بالنار. (شرح النووي في هامش مسلم صفحـ/٧٦)

অর্থাৎ, মাইয়্যেতের সঙ্গে আগুন নিয়ে যাওয়া হাদীছের আলোকে মাকরূহ বা অপছন্দনীয়। আর মাকরূহ হওয়ার কারণ হল এটা জাহেলিয়্যাতের শি'আর বা প্রতীক। ইব্‌নে হাবীব মালেকী বলেন, বদফালী বা কুলক্ষণজনক হওয়ার দরুন (যেন তার মু'আমেলাও আগুনের সঙ্গে না হয়) এটা মাকরূহ।

হাফেজ ইবনুল কাইয়েম লিখেছেন–

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها. (زاد المعاد ج/١ صـ ١٨٩)

অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরকে সাজদার স্থান বানানো এবং তাতে বাতি জ্বালানোকে নিষেধ করেছেন। (যাদুল মাআদ)

ফতওয়ায়ে আলমগিরীতে আছে-

وإيقاد النار على القبور فمن رسوم الجاهلية والباطل والغرور. (عالمگيرى ج/١صـ ١٦٧)

অর্থাৎ, কবরে বাতি জ্বালানো জাহিলিয়্যাতের প্রথা/রুসূম, ভ্রান্তি এবং ধোঁকা।

এক হাদীছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বনিকৃষ্ট তিন ব্যক্তি। এর মধ্যে এক ব্যক্তি হল যে ইসলামের মাঝে জাহিলিয়্যাতের রুসূম তালাশ করে।[১]

মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেবও বিভিন্ন ফতোয়া গ্রন্থের উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন যে, কবরে বাতি জ্বালানো নিকৃষ্টতর বিদআত।[২]

হযরত শাহ রফিউদ্দীন (রহ.) লিখেছেন–

واماار تكاب محرمات ازروشن كردن چراغها وملبوس ساختن قهوروسر ود ا و نو اختن معازف بدعات شينعه اند وحضور چنيں مجالس ممنو ع است (فتاوي شاه رفيع الدين. صـ ١٤)

অর্থাৎ, হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া যেমন: কবরে বাতি জ্বালানো, কবরে পর্দা টানানো এবং গান-বাজনার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা নিকৃষ্টতর বিদআত এবং এ ধরনের আসরে অংশগ্রহণ করাও নিষেধ।

সুতরাং এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে বুঝা গেল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিয়ে অদ্যাবধি সমস্ত আহ্‌লে হক উলামায়ে কেরাম কবরে বাতি জ্বালানোকে লা'নতজনক, হারাম, মাকরূহ, বিদআত, নিকৃষ্টতর বিদআত বলে আখ্যা দিয়েছেন। অতএব কবরে বাতি জ্বালানোর মাঝে কোনো ধরনের কল্যাণ থাকতে পারে না।

১. رواه البخاري في كتاب الديات– باب من طلب دم امرئ بغير حق ج/١ صـ ٢٧
২. جاء الحق ج/١ صـ ٢٨٨

পঞ্চম অধ্যায়

(রাজনৈতিক মতবাদ বিষয়ক)

রাজতন্ত্র

(Monarchy [মনার্কি])

"রাজতন্ত্র" বলতে সাধারণত অবাধ ক্ষমতার অধিকারী বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত রাষ্ট্র বা উক্ত পন্থায় রাজ্য শাসন পদ্ধতিকে বোঝায়। নির্বাচিত বা বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী কোন একমাত্র লোক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেও তার শাসনকে রাজতন্ত্র বলা হয়।

আইনানুগ নিয়ম দ্বারা রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হলে তাকে "সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র" বলে। গণপ্রতিনিধিদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা চলে যাওয়ায় রাজা কেবল নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানে পরিণত হলে তাকে "নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র" বলে। গণপ্রতিনিধিদের নিকট বা অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা চলে গেলে প্রকৃতপক্ষে তা রাজতন্ত্র নয় বরং গণতন্ত্র বা "অভিজাততন্ত্র"। ইংল্যান্ডে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হতে হতে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজা (বা রাজপদে আসীনা রাণী) সেখানে জাতীয় একতার প্রতীক মাত্র; তিনি মন্ত্রিসভার বা পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে সব দলীল-পত্রই সই করতে বাধ্য। নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব ছাড়া রাজা (বা রাণী) হিসাবে তার কোনোই বাস্তব শাসন ক্ষমতা নেই।

সম্ভবত রাজতন্ত্রই পৃথিবীর প্রাচীনতম সরকার বা রাজ্য-শাসন পদ্ধতি। কোন না কোন কালে প্রায় সব দেশেই কমবেশ এটা ছিল। রাজা বিধিদত্ত ক্ষমতায় শাসন করেন- এই বিশ্বাসও প্রচলিত ছিল। জাতীয় রাষ্ট্রগুলো প্রথম শক্তিশালী রাজতন্ত্ররূপে গড়ে ওঠে। রোম সাম্রাজ্যে, মধ্যযুগে সর্বত্র, বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ফ্রান্সে এবং ১৯শ শতক পর্যন্ত রাশিয়া, তুরস্ক, প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া ও হাংগেরিতে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন রাজতন্ত্র ছিল। এখনও এশিয়া এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশে এরূপ পদ্ধতি টিকে আছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে রাজতন্ত্র সম্বন্ধে পর্যালোচনা

ইসলামে রাজ্যশাসন পদ্ধতি কি হবে তা নির্দিষ্ট। তা হল কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে রাজ্য পরিচালনা পদ্ধতি তথা ইসলামী খেলাফত পদ্ধতি। তবে সরকার প্রধান নির্বাচনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে বাহ্যত ইসলামে কয়েকটি পদ্ধতি পরিদৃষ্ট হয়। যথা:-

১. পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক পরবর্তী খলীফার মনোনয়ন। যেমনঃ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসাবে হযরত ওমর (রা.)কে মনোনীত করে যান। উম্মতের সর্বসম্মত মতে এটা জায়েয। তবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এটি করেছিলেন।

এ ক্ষেত্রে মনোনয়নকৃত পরবর্তী খলীফা যদি মনোনয়ন দানকারী খলীফার পুত্র হন, তাহলে প্রচলিত রাজতন্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী সেটা রাজতন্ত্র আখ্যায়িত হবে, কেননা সেটা বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রপ্রধান-শাসিত রাষ্ট্র হয়ে যায়। তবে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে ইসলামে তার অবকাশ রয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, এটা যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শক্রমে হতে হবে। যেমন হযরত মু'আবিয়া (রা.) তাঁর পুত্র ইয়াযীদকে পরামর্শক্রমে মনোনয়ন দিয়ে যান এবং সাহাবাগণ কর্তৃক এই মনোনয়নের বিরোধিতা করা হয়নি। এতে এ পদ্ধতির ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মৌন ইজমা (ঐক্যমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে যুবায়ের ও হযরত হুসাইন (রা.) ইয়াযীদের বিরোধিতা এ কারণে করেননি যে, ইয়াযীদ রাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা কখনও এ কথা বলেননি যে, ইয়াযীদের মনোনয়ন শুদ্ধ নয়। বরং তারা বিরোধিতা করেছেন অন্য কারণে। হযরত হুসাইন (রা.)কে কুফার লোকেরা খলীফা বানাতে চেয়েছিলেন এবং তিনি মনে করেছিলেন ইয়াযীদের তুলনায় তিনি খলীফা হওয়ার অধিক যোগ্য। এ দৃষ্টিভংগিতে তিনি কুফায় রওয়ানা দিয়েছিলেন। তারপর পথিমধ্যে তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। জিহাদের নিয়তও তাঁর ছিল না, নতুবা নারী ও শিশুদেরকে তিনি সঙ্গে নিতেন না। তদুপরি জিহাদের নিয়ত থাকলে মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় যেসব সাহাবী তাকে বাধা দিয়েছিলেন, তিনি তাঁদেরকে বলতে পারতেন যে, জিহাদে বাধা দেয়া অন্যায়; তোমরা কেন সে অন্যায় করছ? হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে যুবায়ের (রা.)ও ইয়াযীদের তুলনায় নিজেকে খেলাফতের অধিক যোগ্য বিবেচনায় ইয়াযীদের বিরোধিতা করেন। এই বিরোধিতার ক্ষেত্রে তিনিও এ কথা কখনও বলেননি যে, ইয়াযীদের মনোনয়ন অবৈধ, তাই তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

২. খলীফা তার পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য বিশেষ জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করে দিয়ে যেতে পারেন। যেমন হযরত ওমর (রা.) তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড গঠন করে দিয়ে যান।

৩. খলীফা তাঁর পরবর্তী খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের বিষয়টি জনগণের উপর ছেড়ে দিয়ে যাবেন। তার পর জনগণই তাদের খলীফা মনোনীত করবে। যেমন: হযরত

উছমান (রা.) তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের বিষয়টি পরবর্তীদের ওপর ছেড়ে দিয়ে যান।

উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতির সারকথা হল খলীফা মনোনয়ন করবে সাধারণ জনগণ অথবা জনপ্রতিনিধিগণ তথা যথাযথ কর্তৃত্বসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ (اہل حل وعقد)। যথাযথ কর্তৃত্বসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ (اہل حل وعقد) বলতে বোঝায় রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, সেনা কর্মকর্তা ও জাতীয় কর্তৃত্বসম্পন্ন নেতৃবৃন্দ। যথাযথ কর্তৃত্বসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শক্রমে কাউকে মনোনয়ন দেয়া হলে সেটা প্রচলিত গণতন্ত্র বিরোধী এবং রাজতন্ত্র বলে মনে হলেও ইসলামে সেটার অবকাশ রয়েছে। যেমন: হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর বেলায় করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, কেউ বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতা সুসংহত করে নিতে পারলে এবং কিছু লোক তার হাতে বাইআত হলে অর্থাৎ, তাকে খলীফা হিসাবে স্বীকার করে নিলে অন্যরা তাকে খলীফা হিসাবে স্বীকৃতি দিবেন। ইসলামের ইতিহাসে এরূপ দেখা যায় বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করার পর কিছু লোক তার হাতে বাইআত হলে অর্থাৎ, তাকে খলীফা হিসাবে স্বীকার করে নিলে অন্যরা তাকে খলীফা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তখনকার উলামা, ফুকাহা ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন তার খেলাফতকে অবৈধ ঘোষণা দেননি। প্রচলিত গণতন্ত্রবাদীদের কাছে এটা রাজতন্ত্রের বা সৈরতন্ত্রের কাছাকাছি বলে মনে হলেও এটাকে একেবারে অস্বীকৃত বলা যাবে না। তবে এটা খলীফা মনোনয়নের কোন বিধিবদ্ধ পদ্ধতি নয়, এটা শুধু ফিতনা থেকে রক্ষার একটা সাময়িক পদ্ধতি।[1]

নাৎসীবাদ

(Nazism/জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ)

"নাৎসীবাদ" বা Nazism বলতে বোঝানো হয় জার্মানির "ন্যাশন্যাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি" (জাতীয় সমাজতন্ত্রী শ্রমিক দল)-এর আদর্শকে। একে "জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ" (National Socialism/ন্যাশন্যাল সোশ্যালিজম)ও বলা হয়। নাৎসী (Nazi) কথাটি এই দলের নামের সংক্ষিপ্ত আকার (NSDAP) থেকে উৎপন্ন। জার্মান-একনায়ক নেতা এ্যাডলফ্ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫?)এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩৩-৪৫ খৃষ্টাব্দে এই মতবাদ হিটলারের একদলীয় একনায়কত্বাধীন শাসনের কর্মসূচী হয়। তার ক্ষমতা দখল করার পর একমাত্র নাৎসী দলই আইনসঙ্গত দল বলে স্বীকৃত হয়।

এ্যাডলফ হিটলারের জন্ম উত্তর অস্ট্রিয়ার ব্রাউনাউ-য়ে। তিনি ছিলেন জনৈক অস্ট্রীয় গুল্ক বিভাগীয় কর্মচারীর পুত্র। লেখাপড়া শিখেন মিউনিকে। ১৯০৭ এবং তারপর কয়েক বৎসর চরম দারিদ্রের মধ্যে কাটান। তার ইয়াহুদী বিরোধী মনোভাব

১. তথ্যসূত্র: মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড,
الأحكام السلطانية للماوردي, (خلافت راشده) تاريخ ملت ও অন্যান্য।

তখন বেড়ে উঠে। ১ম বিশ্বযুদ্ধে বাভেরীয় সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হন; করপোরাল পদে উন্নীত হন, সাহসিকতার জন্য আয়রন ক্রস লাভ করেন। যুদ্ধের পর তিনি এবং কতিপয় অসন্তুষ্ট ব্যক্তি মিউনিকে ন্যাশন্যাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি (NSDAP) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৮-৯ই নভেম্বর তথাকথিত "বিয়ার-হল পুচ" নামে পরিচিত বিদ্রোহের মাধ্যমে জোরপূর্বক বার্ভোয়ার ওপর আধিপত্য লাভের প্রয়াস পান। পাঁচ বৎসরের জন্য লানৎস্বেক দুর্গে কারাবাসের দণ্ডপ্রাপ্ত হন, সেখানেই তিনি নাৎসীবাদের বাইবেল-"মাইন কাম্‌পফ" (আমার সংগ্রাম) বইখানি লিখেন। ১৩ মাস পর তিনি মুক্তি পান। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী মন্দা হিটলারের পার্টির (NSDAP) বিস্ময়কর বিকাশে সাহায্য করে।

জাতীয়তাবাদ, ইয়াহুদী-বিরোধী আন্দোলন এবং আরও কয়েকটা পুঁজিবাদ-বিরোধী মতের সমাহার থাকার ফলে নাৎসিবাদ জনমনকে আকর্ষণ করে। জার্মান সামাজিক গণতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্য ধনিক শ্রেণীর লোকেরাও নাৎসীবাদের সমর্থন করে। হিটলারের গ্রন্থ "মাইন কাম্‌ফপ" ও অংশত আলফ্রেট্ রোযেন্‌বের্ক্-এর ভুয়া দর্শনের উপর ভিত্তি করে এবং গোবিনো ও চেমবারলিনের জাতিভেদ মতবাদের সূত্রের উপর এই নাৎসীবাদ-মতবাদ গড়ে ওঠে। ইতালীয় ফ্যাসিবাদ ও নীচা (Nietzsche)-এর অতিমানব সম্পর্কিত মতবাদও এতে ইন্ধন যোগায়।

নাৎসীবাদের প্রধান নীতিগুলো ছিল নিম্নরূপ

১. একজন অভ্রান্ত নেতার পরিচালনায় নর্ডিক বা আর্য "প্রভু" জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ;
২. তৃতীয় রাইশ (Third Reich) নামে প্যান জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপন এবং ইয়াহুদী ও কমিউনিষ্টদের মত জার্মানির "পরম শত্রুদিগকে" বিলোপ সাধন।
৩."জনগণের ইচ্ছা", "শক্তিই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে" এবং "জার্মানির নিয়তি" প্রভৃতি কথাগুলো সর্বদা আওড়ানো হত।
৪. অভ্যন্তরীণ দমননীতি ও পরদেশ আক্রমণ নাৎসীদের দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত বলে গণ্য হত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর নাৎসীবাদের দ্বারা লক্ষ লক্ষ নরনারী হত্যার অভূতপূর্ব নৃশংসতা প্রকাশ পায়।[1]

ইসলামের দৃষ্টিতে নাৎসীবাদ সম্বন্ধে পর্যালোচনা

ইসলামের দৃষ্টিতে কোন জাতির পার্থিব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য অপর কোন জাতির উপর চড়াও হওয়া এবং যুদ্ধের ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া নিছক জাতিগত বিদ্বেষ নিয়ে অপর কোন জাতিকে নিধনে অবতীর্ণ হওয়ার কোনো বৈধতা নেই। কোন দলীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দমননীতি চালানোরও কোনো অবকাশ নেই। "জনগণের ইচ্ছা"-র নামে স্বেচ্ছাচারিতা চালানো কোনো অবস্থাতেই স্বীকৃতি পেতে পারে না। আর "শক্তিই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে" ন্যায়নীতির কোনো বালাই থাকবে

১. তথ্যসূত্র: মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড।

না- এমন নীতি গোঁয়ার্তুমি বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। আর কোন জাতির নিয়তি তার নিজের হাতে, -যেমন: "জার্মানির নিয়তি" কথাটা দ্বারা বোঝানো হয়েছে- এ কথাটা সন্দেহাতীতভাবেই কুফ্‌রী কথা।

সাম্রাজ্যবাদ
(imperialism)

"সাম্রাজ্যবাদ" (imperialism) বলতে সাধারণভাবে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির উপর শাসনক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করাকে বোঝায়।

ইতিহাসের সূচনা থেকে মিসর, মেসোপটেমিয়া, আসিরীয়া এবং পারসিক সাম্রাজ্য বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন রোমক এবং বাইযেন্টাইন সাম্রাজ্যে এবং পরে উসমানীয় তুর্কী সাম্রাজ্যের আমলে সাম্রাজ্যবাদ চরম আকার ধারণ করে। পাশ্চাত্যে আধুনিক জাতীয় ভাবধারা দ্বারা প্রণোদিত রাষ্ট্রসমূহ গড়ে উঠার ও নব নব দেশ আবিষ্কারের যুগ থেকে সাম্রাজবাদের অভ্যুদয় ঘটে। উপনিবেশ কায়েম করে বলপূর্বক ইউরোপীয় নেতৃত্ব কায়েম করা হয় এবং স্থানীয় অধিবাসীদের উপর কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। হিটলারের নাৎসীবাদে এরূপ কল্পিত জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চিন্তা পরিলক্ষিত হয়। জার্মান জাতির কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল তাদের লক্ষ্য। স্পেন ও পর্তুগাল "বাণিজ্যিক" সাম্রাজ্য এবং ব্রিটিশ ও ফরাসীরা "ঔপনিবেশিক" সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির মূল কারণ ছিল বাণিজ্যবাদ। যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়, এটা ছিল "সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত লক্ষ্য বিশিষ্ট" (manifest desiny) রাজ্য-বিস্তার। পরে স্পেন-মার্কিন যুদ্ধের ফলে মার্কিন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চিন্তাধারা প্রবল হয়; কিন্তু ফ্যাসিবাদী জার্মানী ও জাপান চরম সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র ফিলিফাইনকে স্বাধীনতা দিতে থাকে, ল্যাটিন আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কর্মসূচী অবলম্বন করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শিথিল হয়ে কমনওয়েলথ অব নেশনস গঠিত হতে থাকে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেকাংশে স্বাধীনতার দাবিসূচক আন্দোলন-সমূহ তীব্র হতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে সাম্রাজ্যবাদও অবসানের পর্যায়ে উপনীত হয়। ফরাসী অধিকৃত দেশসমূহের পূনর্গঠন, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন (বিভি-ন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত), বার্মা, মালয়েশিয়া এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য বহু প্রাক্তন উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের স্বাধীনতা অর্জন ২য় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদ অবসানের ইতিহাসকে স্মরণীয় করে রেখেছে। কমিউনিস্টদের অভিমত পাশ্চাত্য জাতিগুলো এখনও সাম্রাজ্যবাদী, কারণ তারা এখন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা লাভবান হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে পর্যালোচনা

ইসলাম বৈষয়িক স্বার্থে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির ওপর শাসনক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারকে অনুমোদন দেয় না। ইসলাম মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত প্রদান করে। এই দাওয়াতে সাড়া দিলে ইসলাম কারও দেশ দখল, কারও উপর প্রভুত্ব কায়েমকরণ ও কারও উপর কোনোরূপ বৈষয়িক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে যায় না। তবে ইসলামের আহবানে সাড়া না দিলে ইসলাম জিহাদের বিধান প্রদান করেছে এবং বিজিত অমুসলিম জনপদের লোকগণ ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের উপর জিয্‌য়া ধার্য করার বিধান রেখেছে। এর উদ্দেশ্য হল যেন সত্য ও সঠিক ধর্ম ইসলামের ঝাণ্ডার মাথা উঁচু হয়ে থাকে এবং সঠিক ধর্ম ইসলাম প্রচারিত ও পালিত হওয়ার পথে কোনোরূপ বাধা অবশিষ্ট না থাকে।

গণতন্ত্র
(democracy)

"গণতন্ত্র" শব্দটি গ্রীক শব্দ- democracy (ডিমক্র্যাসি)-এর অনুবাদ। পরিভাষায় গণতন্ত্র/democracy বলা হয় জনসাধারণের প্রতিনিধি দ্বারা সাম্যের নীতি অনুসারে রাষ্ট্রশাসন করা। গণতান্ত্রিক সরকার বলা হয় কোন শ্রেণী, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক শাসনের পরিবর্তে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত সরকারকে।

খৃষ্টপূর্ব ৫ম ও ৪র্থ শতকে গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলোতে সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের উন্মেষ ঘটে। রোমান প্রজাতন্ত্রে জন-প্রতিনিধিত্ব নীতির উদ্ভব হয়। শাসিত ও শাসকের মধ্যে চুক্তি বিদ্যমান থাকার নীতি মধ্যযুগে উদ্ভূত। পিউরিট্যান বিপ্লব, মার্কিন স্বাধীনতা বিপ্লব, ও ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে আধুনিক গণতন্ত্রের প্রসার ঘটে। জন লক, জে. জে. রূশো ও টমাস জেফারসন গণতন্ত্রবাদের প্রভাবশালী তাত্ত্বিক ছিলেন। প্রথমে রাজনৈ-তিক ও পরে আইন সম্পর্কীয় সমান অধিকারের দাবি উত্থাপনের ফলে গণতন্ত্র বর্ধিত হয়। পরবর্তীকালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের দাবিও গণতন্ত্র সম্প্রসারণের সহায়ক হয়। প্রতিযোগিতাশীল রাজনৈতিক দলসমূহের অস্তিত্বের উপর আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কারণ প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণ কর্তৃক প্রতিনি-ধি নির্ধারণের জন্য নির্বাচন আবশ্যক, আর নির্বাচনের জন্য প্রতিযোগিতাশীল রাজনৈ-তিক দলসমূহের অস্তিত্ব আবশ্যক। গণতান্ত্রিকগণ মনে করেন- একমাত্র রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মাধ্যমেই জনগণের সুযোগ-সুবিধার সাম্য রক্ষা সম্ভব। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিকদের অভিমত হল অর্থনৈতিক গণতন্ত্রই একমাত্র ভিত্তি, যার উপর সত্যিকা-র রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সৌধ নির্মান করা যেতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র সম্বন্ধে পর্যালোচনা

* প্রচলিত গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পদ্ধতি মাত্র একটাই। আর তা হল সাধারণ নির্বাচন। পক্ষান্তরে ইসলামী খেলাফত পদ্ধতিতে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের পদ্ধতি বহুবিধ, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

* প্রচলিত গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের ছোট-বড়, যোগ্য-অযোগ্য, বুদ্ধিমান-নির্বোধ নির্বিশেষে সকলের রায় বা মতামত (ভোট) সমানভাবে মূল্যায়িত হয়ে থাকে। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদা ও আদর্শ যুগের কর্মপন্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইসলাম মতামত গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথ কর্তৃত্বসম্পন্ন যোগ্য কর্তৃপক্ষ (ارباب حل وعقد)-এর মতামতের মূল্যায়ন করে থাকে। ঢালাওভাবে সকলের মত গ্রহণ ও সকলের মতামতের সমান মূল্যায়ন দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কুরআনের একটি আয়াতে এদিকে ইংগিত পাওয়া যায়। আয়াতটি এই–

﴿وَ اِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ.﴾

অর্থাৎ, যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। (সূরা: ৬-আন্আম: ১১৬)

* প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মানা হয়। জনগণকে আইনের উৎস মানা ঈমান-পরিপন্থী। কেননা, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে আল্লাহ্কেই সর্বময় ক্ষমতার উৎস স্বীকার করা হয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿قُلْ مَنْ بِيَدِه مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ.﴾

অর্থাৎ, তুমি বল সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব (সর্বময় ক্ষমতা) কার হাতে? (সূরা: ২৩-মু'মিনূন: ৮৮)

﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ.﴾

অর্থাৎ, তুমি বল, হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ২৬)

* প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণকেই সকল ক্ষমতার উৎস এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আইন বা বিধানের অথরিটি বলে স্বীকার করা হয়। অথচ বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র। তাই প্রচলিত গণতন্ত্র-এর ধারণা ঈমান-আকীদার পরিপন্থী। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ.﴾

অর্থাৎ, কর্তৃত্ব তো আল্লাহ্রই। (সূরা: ৬-আনআম: ৫৭)

﴿وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা কাফের। (সূরা: ৫-মায়িদা: ৪৪)

﴿اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَ قَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِه.﴾

অর্থাৎ, তুমি তাদেরকে দেখনি যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা

তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তাদেরকে তা প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সূরা: ৪-নিসা: ৬০)

* গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি তন্ত্রমন্ত্রকে মুক্তির পথ মনে করা এবং একথা বলা যে, ইসলাম সেকেলে মতবাদ, এর দ্বারা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এই যুগে উন্নতি অগ্রগতি সম্ভব নয়- এটা কুফ্রী।[১]

ইসলামী গণতন্ত্র

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নেই। একমাত্র জনগণ কর্তৃকই নির্বাচিত হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বরং যথাযথ কর্তৃত্বসম্পন্ন জনপ্রতিনিধি দ্বারাও সরকার প্রধান নির্বাচিত হতে পারে। এর বিপরীত প্রচলিত গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে একমাত্র পদ্ধতি হল জনগণ কর্তৃকই নির্বাচিত হওয়া। অতএব প্রচলিত গণতন্ত্র এবং ইসলামের মধ্যে এই একটা বিরাট মৌলিক ব্যবধান রয়েছে। তদুপরি প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মানা হয় এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আইনের অথরিটি মনে করা হয়। আর পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, জনগণকে আইনের উৎস মানা ঈমান-পরিপন্থী। কেননা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে আল্লাহ্কেই সর্বময় ক্ষমতার উৎস স্বীকার করা হয়। আর জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আইন বা বিধানের অথরিটি বলে স্বীকার করা ঈমান-আকীদা বিরোধী। তাই প্রচলিত গণতন্ত্র-এর ধারণা কোনোভাবেই ইসলামে স্বীকৃত নয়। অতএব "ইসলামী গণতন্ত্র" বলে কোন কথা ইসলামে নেই। "গণতন্ত্র" একটা ঈমান-আকীদা ও ইসলামী নীতিমালা বিরোধী ধ্যান-ধারণা সমৃদ্ধ পরিভাষা। এ পরিভাষার সঙ্গে ইসলাম শব্দটি যোগ করলেই তা ইসলামে স্বীকৃত বলে গণ্য হতে পারে না। আর ঈমান-আকীদা ও ইসলামী নীতিমালা বিরোধী ধ্যান-ধারণায় সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে এটাকে কিছু ব্যাখ্যা সাপেক্ষেও ইসলামী পরিভাষা হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক নয়।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
(Secularism)

আভিধানিক অর্থ

Secularism "সেকিউলারিজম" একটি ল্যাটিন শব্দ। Saecularis থেকে উদ্ভূত। তার অর্থ বৈষয়িক, অস্থায়ী এবং প্রাচীন। গীর্জার কোন পাদ্রী যদি বৈরাগ্যবাদী জীবন পরিহার করে বৈষয়িক জীবন যাপনের অনুমতি লাভ করে, তাহলে তাকে "সেকিউলার" বলা হয়। বাংলায় এর অনুবাদ করা হয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অথবা বৈষয়িকতাবাদ কিংবা ধর্মহীনতাবাদ।

---

১. মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, আহকামে যিন্দেগী ও الأحكام السلطانية للماوردي প্রভৃতি থেকে গৃহীত।

আভিধানিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা (ধর্ম+নিরপেক্ষতা=ধর্মনিরপেক্ষতা)-এর অর্থ দাঁড়ায় 'নিরপেক্ষতা' অর্থ স্বতন্ত্র, স্বাধীন, পক্ষপাতশূন্য ইত্যাদি। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র, ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা ধর্মের পক্ষপাতশূন্যতা।

এখানে উল্লেখিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বা ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তি-স্বাধীনতা-র অর্থ যদি হয় কাউকে কোন ধর্ম গ্রহণ করার জন্য বাধ্য না করা, তাহলে ইসলামের সাথে এ অর্থের কোন সংঘাত নেই। কারণ, ইসলাম জোরপূর্বক কাউকে ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রকে সে অক্ষুন্ন রেখেছে এবং ইসলামে কোন পক্ষপাতিত্বও নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদেরই তাদের নিজস্ব ধর্ম-কর্ম পালন করার অধিকার রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার প্রত্যেকের সমান। এ অর্থে ইসলামে ধর্মীয় পক্ষপাতশূন্যতা বিদ্যমান।

পারিভাষিক অর্থ

পরিভাষায় ধর্মনিরপেক্ষতা বা Secularism অর্থ ধর্মের প্রভাব থেকে রাজ্য, নীতি, শিক্ষা ইত্যাদিকে মুক্ত রাখা।[১] যারা এই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা, ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম-কর্ম করার বিরুদ্ধে তাদের কোনো আপত্তি নেই। তারা সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। ধর্মকে তারা নিতান্ত ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া ব্যাপার-স্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে ধর্মকে নির্বাসিত করাই তাদের লক্ষ্য। এক শ্রেণীর প্রগতিশীলরা এটাকে আধুনিক মতাদর্শের মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

"সেকিউলারিজম"-এর উৎপত্তি ইউরোপে। উনবিংশ শতকে একজন ইংরেজ চিন্তাবিদ "সেকিউলারিজম"কে একটা বিশ্বজনীন আন্দোলনে রূপ দেয়ার চেষ্টা চালান। এরা নিজেদেরকে সেকিউলারিষ্ট, বৈষয়িকতাবাদী-ধর্মবিমুক্ত চিন্তাবিদ পরিচয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। এদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিলেন জি. জে. হলিউক (মৃত. ১৮৫৪ খ্রী.)। এই হলিউকই ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে "সেকিউলারিজম" পরিভাষাটা রচনা করেন। হলিউক এই আন্দোলনকে নাস্তিকতাবাদের উত্তম বিকল্প হিসাবে অভিহিত করেন। সেকিউলারিজমকে প্রতিষ্ঠিতকরণ প্রচেষ্টায় হলিউকের সহকর্মীদের মধ্যে চার্লস সাউথ ওয়েস, থমাস কুপার, থমাস পিটার্সন ও উইলিয়াম বিল্টন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।[২]

ইউরোপে পাদ্রীদের মনগড়া মতামতের সঙ্গে যখন গবেষক ও বৈজ্ঞানিকদের গবেষণালব্ধ মতামতের দ্বন্দ্ব দেখা দিল এবং তারই ভিত্তিতে পাদ্রীদের উৎখাত করার

১. ইংরেজীতে বলা হয়, the doctrine that state, morality, education, etc. should be separated from religion.

২. মাওলানা আব্দুর রহীম রচিত "পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি" পুস্তক থেকে গৃহীত।

জন্য 'গীর্জা বনাম রাষ্ট্রের লড়াই' নামক দু'শ বৎসরব্যাপী ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পরিচালিত হল, তখন সংস্কারবাদীরা একটা আপোষ রক্ষার জন্য মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে প্রস্তাব দিল যে, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকুক আর সমাজের ও পার্থিব জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব রাষ্ট্রের ওপর ন্যাস্ত থাকুক। এখান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' মতবাদের যাত্রা শুরু হয়। এরপর থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে খৃষ্টান ধর্মযাজক ও পাদ্রীদের প্রভাব নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন ধর্মীয় প্রবনতা থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে।

ঐতিহাসিকভাবে সেকিউলারিজম সব সময় নাস্তিকতাবাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নেতা ব্রেডলেফ-এর মত ছিল ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস প্রতিহত করাই সেকিউলারিজম এর কর্তব্য। তিনি মনে করতেন ধর্মের এইসব কুসংস্কারমূলক ধারণা-বিশ্বাস যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিতে প্রকাশিত হতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত বস্তুগত উন্নতি লাভ করা সম্ভব হবে না।

ধর্মনিরপেক্ষতা-র পারিভাষিক অর্থ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আচরিত অর্থে ধর্ম নিরপেক্ষতা একটা কুফ্রী মতবাদ। কারণ, ধর্মের ব্যাপকতায় রাজনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছু আওতাভুক্ত। ইসলাম জীবনের সবক্ষেত্র এবং সবকিছুর জন্য আদর্শ। এমন কিছু নেই, যার আদর্শ ইসলামে অনুপস্থিত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى﴾

অর্থাৎ, আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এই কিতাব যা সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা ও হেদায়েত। (সূরা: ১৬-নাহ্ল: ৮৯)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ﴾

অর্থাৎ, আমি এই কিতাবে কোনো কিছু বর্ণনা করতে ছেড়ে দেইনি। (সূরা: ৬-আনআম: ৩৮)

কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদে ইসলামের এই ব্যাপকতাকে অস্বীকার বা অপছন্দ করা হয়। আর ইসলামের কোন অংশকে অস্বীকার বা অপছন্দ করা কুফ্রী। ইসলামী আকীদা- বিশ্বাসকে কেউ যদি কুসংস্কারমূলক ধারণা-বিশ্বাস বলে আখ্যায়িত করে, তাহলে তার ঈমান থাকে না।

খৃষ্টান ধর্মযাজকদের মতবাদে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মত কোন সুষ্ঠু আদর্শ বর্তমান ছিল না। ফলে তাদের সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলন হয়তোবা যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য শাশ্বত আদর্শ রেখেছে এবং তা স্বয়ং সর্বজান্তা সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত আদর্শ। তাই ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো যৌক্তিকতা বা কোনো অবকাশ নেই।

জাতীয়তাবাদ
(nationalism)

জাতীয়তাবাদ কথাটি ইংরেজি nationalism (ন্যাশনালিযম্)-এর অনুবাদ। হধঃরড়হ অর্থ জাতি। আরবীতে "কওম" (قوم) অর্থ জাতি। আর "কওমিয়্যাত" (قوميت) অর্থ জাতীয়তা।

এই কওম ও কওমিয়্যাত তথা জাতি ও জাতীয়তা-এর কোন একক ও দ্ব্যর্থহীন বা সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। অভিধানে তাই "জাতি" অর্থ লেখা হয় ধর্ম, জন্মভূমি, রাষ্ট্র, আদিমবংশ, ব্যবসা প্রভৃতির ভিত্তিতে বিভক্ত শ্রেণী বিশেষ। কোন কোন অভিধানে "জাতীয়তা" বা হধঃরড়হধষরংস-এর অর্থ করা হয়েছে স্বদেশানুরাগ বা দেশাত্মবোধ। এটা একটা মোটামুটি অর্থ, নতুবা আমাদের দেশেও জাতীয়তা নির্ধারিত হয় কি ভৌগলিক সীমারেখার ভিত্তিতে না ভাষার ভিত্তিতে অর্থাৎ, বাংলাদেশী জাতীয়তা না বাঙালী জাতীয়তা তা নিয়ে এখনও মতবিরোধ বিরাজমান। অথচ উভয় মতাবলম্বীই স্বদেশানুরাগ বা দেশাত্মবোধ-এর প্রবক্তা, এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। কেউ কেউ "জাতীয়তা"-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে- জাতীয় মঙ্গলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক এবং সামাজিক মতবাদ। কিন্তু এ সংজ্ঞায় উল্লেখিত "জাতীয় মঙ্গল" কথাটির মধ্যে "জাতীয়" কথাটার কী অর্থ তা-ই তো অস্পষ্ট রয়ে গেল। সংজ্ঞার মধ্যে এটা স্পষ্ট করাই তো মূল প্রতিপাদ্য ছিল। তদুপরি এতে জাতীয়তার ভিত্তি কী (ধর্ম, না ভাষা, না ভৌগলিক সীমারেখা, না সাংস্কৃতিক ঐক্য, না অন্য কিছু) তারও কোন দ্ব্যর্থহীন সমাধান বের হয়ে আসেনি।

প্রাচীন আরবদের নিকট কওমিয়্যাত বা জাতীয়তার ভিত্তি ছিল রক্ত-সম্পর্ক ও বংশীয় পরিচয়ের ঐক্য। যাদের রক্ত সম্পর্ক ও বংশ-পরিচয় এক, তারা এক কওম এবং তাদের এই স্বতন্ত্র পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য কওমিয়্যাত বলে অভিহিত হত। এ অর্থে কওম বা জাতি হল একই পূর্ব পুরুষ থেকে উদ্ভূত জনগোষ্ঠি বা গোত্র। কুরআনে কারীমে "কওম" শব্দটি এ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত নূহ, হূদ, সালেহ প্রমুখ নবীদের দাওয়াত প্রসঙ্গে তাঁরা তাদের আদর্শ অমান্যকারীদেরকে ياقومى অর্থাৎ, হে আমার জাতি! বলে আহবান করতেন বলে উল্লেখিত হয়েছে। তারা নবীদের আদর্শিক ঐক্যে একীভূত জাতি ছিল না বরং তারা ছিল রক্ত সম্পর্ক ও বংশ পরিচয়গত ঐক্যে একীভূত জাতি।

নিম্নোক্ত আয়াতেও উপরোক্ত অর্থেই "কওম" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে-

﴿يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللهِ وَ اٰمِنُوْا بِه يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ.﴾

অর্থাৎ, (রসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর নিকট ইসলাম গ্রহণকারী জিনগণ তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে গিয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিল,) হে আমাদের জাতি, তোমরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আহবানকারীর আহবানে সাড়া দাও

এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। তাহলে তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। (সূরাঃ ৪৬-আহ্কাফঃ ৩১)

আবার আদর্শিক ঐক্যে একীভূত জাতি অর্থেও কুরআন-হাদীছে "কওম" বা জাতি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন হাদীছে এসেছে-

أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحيوة الدنيا. (الصحيح البخاري)

অর্থাৎ, তারা (কাফেরগণ) এমন জাতি যাদের ভাল কাজের বদলা তাদেরকে পার্থিব জীবনেই দিয়ে দেয়া হয়েছে। (বোখারী)

অন্য এক হাদীছে এসেছে-

من تشبه بقوم فهو منهم. (قال العجلوني : رواه أحمد وأبو داود الطبراني في الكبير عن ابن عمر رفعه. وفي سنده ضعف كما في اللآلي والمقاصد، لكن قال العراقي : سنده صحيح، وله شاهد عند البزار عن حذيفة وأبي هريرة. كذا في كشف الخفاء ومزيل الإلباس)

অর্থাৎ, হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। (মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ ও তাবারানী)

কুরআনে কারীমে জাতি কথাটার আরও এক রকম প্রয়োগ দেখা যায়। হযরত লূত (আ.) মূলত ছিলেন ইরাকের অধিবাসী। তাঁর জ্ঞাতি-গোষ্ঠি ছিল ইরাকে। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন সাদূম[১] এলাকার অধিবাসীদের নিকট। সেখানে তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠির কেউ ছিল না। তার নিকট বালকের আকৃতিতে ফেরেশতারা আগমন করলে সে এলাকার লোকেরা অসদুদ্দেশ্যে তাদের নিকট আসে। তখন হযরত লূত (আ.) তাদেরকে বলেছিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা প্রয়োজনে আমার কন্যাদেরকে বিবাহ কর, তবুও আমার মেহমানদেরকে তোমরা অপমানিত কর না। আয়াতটি এই-

﴿قَالَ يٰقَوْمِ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَ لَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ.﴾

অর্থাৎ, হে আমার জাতি, এই আমার কন্যাগণ রয়েছে, তারা তোমাদের জন্য (নিয়মানুসারে) অধিক পবিত্র (হতে পারে)। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর আমাকে তোমরা আমার মেহমানদের বিষয়ে অপমানিত কর না। (সূরা: ১১-হূদ: ৭৮)

স্পষ্টতই তিনি তাদেরকে আদর্শিক ঐক্য বা রক্ত সম্পর্ক ও বংশ পরিচয়গত ঐক্যের ভিত্তিতে নিজের জাতি বলে আখ্যায়িত করেননি। বরং বলা যায় আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক সীমারেখা ভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতেই তিনি তাদেরকে নিজের জাতি বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

কুরআন-হাদীছে জাতি ও জাতীয়তার এরূপ বহুরূপী প্রয়োগ থাকার কারণে দ্ব্যর্থহীনভাবে এটা বলা যায় না যে, জাতীয়তার ভিত্তি হল ধর্ম। আবার এটাও বলা যায় না যে, জাতীয়তার ভিত্তি বংশ, বর্ণ, বা ভৌগোলিক সীমারেখা বা অন্য কিছু। হযরত

১. মৃত সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল।

মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) ও হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) বলতেন, জাতীয়তার ভিত্তি ধর্ম নয়, অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকেও মুসলমান তার জাতি বলে অখ্যায়িত করতে পারে।[১]

মূলত ইসলাম 'জাতি' বা 'জাতীয়তা'-কে কোন দ্ব্যর্থহীন অর্থবোধক পরিভাষা হিসাবে গ্রহণ করেনি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন জনগোষ্ঠি বিভিন্ন এ্যাঙ্গেলে এ দুটোকে পরিভাষায় রূপ দিয়েছে এবং জাতীয়তার ভিত্তি কী সে বিষয়ে নিজ নিজ স্বার্থ বা অবস্থা ভিত্তিক মতামত প্রদান করেছে। বিংশ শতাব্দির প্রথম কয়েক দশক উছমানী খিলাফতের বিরুদ্ধে আরব দেশসমূহের জাগরণ ও আরব জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলনের অর্থে আরব জাতীয়তাবাদ কথাটার ব্যবহার শুরু হয়। তারপর আরবদের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ও সামাজিক বিপ্লবের উপায় হিসাবে তারা আরব জাতীয়তাবাদ (القومية العربية) শব্দের ব্যাপক ব্যবহার শুরু করে। তখন থেকে আরব জাহানের চিন্তাবিদগণ আরব জাতীয়তাবাদকে একটা দৃঢ় মতবাদের রূপ দিতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। ১৯৩৬ সালে ফিলিস্তীনে আরব মুসলিম ও ইয়াহুদীদের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষে মধ্যপ্রাচ্যে আরব জাতীয়তাবাদ নব শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বর্তমানকালে আরব জাতীয়তাবাদের প্রধান উদগাতা হল বাথ (ইধঃয) পার্টি। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে এ পার্টি গঠিত হয়। কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদের তাৎপর্য, গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য কি তা আজও অস্পষ্টতার ধুম্রজালে আচ্ছন্ন রয়ে গেছে। এভাবে বিভিন্ন সময় উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায়, তুরস্কে, ইরান ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অর্থে জাতীয়তাবাদ কথাটার ব্যবহার করা হয়।[২] ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের প্রশ্নকে মুখ্য বিবেচনায় সব ধর্মের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য উলামায়ে কেরামের অনেকে মুসলিম হিন্দু ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধর্মাবলম্বী এক জাতি-এরূপ এক জাতিতত্ত্বের ধারণা পেশ করেন। আবার মুসলিম স্বাতন্ত্র ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রয়েজন-বোধকে উদ্বুদ্ধ করার চেতনায় অনেকে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার দর্শন পেশ করেন। তারা হিন্দু মুসলিম দুই জাতি-এরূপ দ্বিজাতিতত্ত্ব-এর ধারণা পেশ করেন। এর পাশাপাশি পাশ্চাত্য বরাবরই রাজনৈতিক ও কৃষ্টি-কালচার ভিত্তিক এক জাতীয়তার দর্শন পেশ করে আসছে।

কেউ কেউ ন্যাশনালিযম্ বা জাতীয়তাবাদ কথাটিকে জাতীয় মঙ্গল ও উন্নতির জন্য উৎসাহব্যঞ্জক বিবেচনা করে এর পক্ষ নিয়ে থাকেন। তাদের ধারণায় এর বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতার মধ্যে রয়েছে স্বদেশ প্রেম, রাজনৈতিক এবং কৃষ্টিগত মুল্যবোধ ও জাতীয় লক্ষ্যের উপর বিশ্বাস। তারা বলেনঃ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জাতীয়তাবাদ কথাটার দ্বারা সুফল পাওয়া যায়। তারা মনে করেন এটা জাতিকে

---

১. علماء حق مولنا سید محمد میاں، قومیت اور اسلام. مولنا حسین احمد مدنی

২. দেখুন- ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ট খণ্ড, "কওমিয়্যাঃ" শিরোনাম

শক্তিশালী করে তোলে। আবার কেউ কেউ জাতীয়তাবাদ কথাটাকে অপছন্দ করেন এ কারণে যে, এর দ্বারা এক ধরনের উগ্রতাবোধ জাগ্রত হয়, যা অবাঞ্ছিত পরিণতি ডেকে আনে। ১৯শ শতকে বিভিন্ন দেশে উদ্ভব হওয়া উগ্র জাতীয়তাবোধের ফলে বহু দেশের অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অনেক সংঘর্ষ সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টা অস্বীকার করা যায় না। হিটলার মুসোলিনী যে উগ্র জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করেছিল, তার ক্ষতি জগতবাসী স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ করেছে। এ কারণে তারা জাতীয়তাবাদকে পৃথিবীতে বিভেদসৃষ্টিকারী শক্তি বলে মনে করেন।

সারকথা- জাতি বা জাতীয়তা কোন ইসলামী পরিভাষা নয়। এ পরিভাষা কোন দ্ব্যর্থহীন অর্থবোধকও নয়। এটা অস্পষ্টতার ধুম্রজালে আচ্ছন্ন। তাই এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা বা এটাকে ভিত্তি করে কোন দর্শন ও আন্দোলন দাঁড় না করানোই শ্রেয়।

* * * * *

ষষ্ঠ অধ্যায়
(অর্থনৈতিক মতবাদ বিষয়ক)

*** প্রাচীন অর্থনৈতিক মতবাদসমূহ**

সামন্ততন্ত্র ও জায়গীর প্রথা

"সামন্ততন্ত্র" একটা সামাজিক ভূমি-ব্যবস্থা। "সামন্ত" শব্দের অর্থ প্রজা, মোড়ল, প্রধান, অধিনায়ক ইত্যাদি। মোড়ল ও প্রধান গোছের জনগণ (অর্থাৎ, সর্বোচ্চ সামন্তগণ) কর্তৃক সরাসরি রাজার নিকট থেকে ভূ-সম্পত্তি লাভ এবং তাদের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের প্রজাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প ভূমি বণ্টনের যে ব্যবস্থা, তাকেই বলা হয় "সামন্ততন্ত্র"। শারলামেন-এর সাম্রাজ্যের অবসানের পর থেকে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বকাল পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক ব্যবস্থা ছিল এই সামন্ততন্ত্র।

এই প্রথায় সমস্ত ভূ-সম্পত্তির মালিক থাকত রাজা। রাজা তার অধীন বিভিন্ন সামন্ত জমিদারদের মধ্যে সেই জমি বণ্টন করে দিতেন। জমিদাররা সেই জমি তাদের অধীনস্থ নিম্ন ভূ-স্বামীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে বণ্টন করে দিতেন। সাধারণত অনির্দিষ্টকালের জন্য এভাবে ভূমি বণ্টন করা হত। এভাবে সর্বশেষে কৃষকদের মধ্যে সেই জমি বিতরিত হত। কৃষক ও মজুরগণ সেই জমি আবাদ করত। তারা জমি চাষ করত তবে জমিতে তাদের কোনো অধিকার থাকত না। তারা চাষের মালিক ছিল কিন্তু গ্রাসের মালিক নয়। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে তারা ফসল উৎপন্ন করত, কিন্তু সে ফসলের অতি সামান্যই তারা ভোগ করতে পারত। তাই কৃষকদের

কষ্টের অবধি ছিল না। এই প্রথায় স্বেচ্ছাতন্ত্রের অত্যাচারে প্রজাকুল অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। সর্বসাধারণের অভাব-অভিযোগের নিবৃত্তি হত না। কালক্রমে এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দেয়। রুশো ও ভলটেয়ার প্রমুখ ফরাসী মনীষী এই স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা শুরু করেন। তাদের লেখার মাধ্যমে নিপীড়িত মানুষের মনে বিপুল প্রেরণার সঞ্চার হয়। ফলে ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়। এতে স্বৈরতন্ত্র ও জমিদারী প্রথার জুলুম কিছুটা প্রশমিত হয় কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না।

দেশের অনিশ্চিত অবস্থায় সামন্তপ্রভু (লর্ড)দের সশস্ত্র যোদ্ধার প্রয়োজন হত। এই প্রয়োজন থেকেই জায়গীর প্রথার প্রবর্তন ঘটে। সামন্তপ্রভু (লর্ড)গণ সশস্ত্র যোদ্ধার প্রয়োজনে সামরিক চাকরির বিনিময়ে সৈন্য, সেনাপতি প্রমুখকে ভূমি দান করত। এরূপ ভূমিপ্রাপ্তগণ জায়গীরদার বলে পরিচিত। জায়গীরদাররা বেতনের পরিবর্তে জায়গীরের আয় ভোগ করত এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে যুদ্ধকালে সামন্তপ্রভু তথা সরকারকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকত। জায়গীরদারের মৃত্যুর পর তা সরকারের হাতে ফিরে যেত। সরকারও সুযোগ পেলে জায়গীর খাস করে নিত। এভাবে জায়গীর পুনঃ পুনঃ হস্তান্তরিত হত। মধ্যযুগে মুসলিম জগত ও ইউরোপের সর্বত্র এই জায়গীর প্রথা প্রচলিত ছিল।

রোমান সাম্রাজ্য ক্রমশ ধ্বংস হওয়া এবং আকস্মিক জার্মান-হামলা ও সেই সঙ্গে তাদের উপনিবেশ স্থাপনের ফলেই সম্ভবত সামন্ততন্ত্র ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। প্রথমে ফ্রান্স থেকে স্পেন, তারপর ইতালি এবং পরে জার্মানি ও পূর্ব ইউরোপে এই সমাজ ব্যবস্থা প্রসার লাভ করে। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ফ্রান্সে, ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত জার্মানি ও জাপানে এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ায় সামন্ততন্ত্র কায়েম ছিল। মোগল শাসনক্ষমতা হ্রাস ও ব্রিটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনায় অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যেই ভারতীয় উপমহাদেশে ক্রমশ এক ধরনের সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পর সামন্তরাজতন্ত্র ও জমিদারী প্রথা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে এই উপমহাদেশ থেকেও সামন্তপ্রথার শেষ চিহ্ন অবলুপ্ত হয়ে যায়।[১]

ইসলামের দৃষ্টিতে সামন্ততন্ত্র সম্বন্ধে পর্যালোচনা

ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকৃতি দেয়। আবার কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পত্তিতে অন্য কেউ জোরপূর্বক দখল স্থাপন করতে পারে না। অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সকল ভূমির অধিকার রাজার উপরে ন্যাস্ত থাকার বিষয়টা স্বীকৃত নয়। রাজা কর্তৃক জোর দখল পূর্বক সকলের ভূমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হলে তা জুলুম বলে বিবেচিত হবে।

১. তথ্যসূত্র: মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, ইসলাম ও কমিউনিজম, কবি গোলাম মোস্তফা প্রভৃতি।

*** আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদসমূহ**

পুঁজিবাদ
(Capitalism)

পুঁজিবাদের সংজ্ঞা

"পুঁজিবাদ" (Capitalism) বলতে বোঝায় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা, মুনাফ-ার উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদন এবং ব্যাংক ঋণের ভিত্তিতে পরিচালিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা। (বাংলা বিশ্বকোষ)

পুঁজিবাদ সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

প্রায় শিল্প বিপ্লবের আগ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক ব্যবস্থা ছিল সামন্ততন্ত্র। এই প্রথায় সমস্ত ভূ-সম্পত্তির মালিক থাকত রাজা। রাজা তার অধীন বিভিন্ন সামন্ত জমিদারদের মধ্যে সেই জমি বণ্টন করে দিত। জমিদাররা সেই জমি তাদের অধীনস্থ নিম্ন ভূ-স্বামীদের মধ্যে বিলি করত। এভাবে সর্বশেষে কৃষকদের মধ্যে সে জমি বিতরিত হত। কৃষক ও মজুররা সে জমি আবাদ করত। তারা জমি চাষ করত তবে জমিতে তাদের কোনো অধিকার থাকত না। তারা চাষের মালিক ছিল কিন্তু গ্রাসের মালিক নয়। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে তারা ফসল উৎপন্ন করত, কিন্তু সে ফসলের অতি সামান্যই তারা ভোগ করতে পারত। কালক্রমে এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দিল। সে আন্দোলনের ফল স্বরূপ ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হল। এতে স্বৈরতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র তথা জমিদারী প্রথার জুলুম কিছুটা প্রশমিত হল কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না।

এদিকে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দিতে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে বহু কল-কারখানা ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয়। বহু শিল্পকেন্দ্র ও ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে ওঠে। এতদিন যে সমস্ত জিনিস হাতে তৈরি হত এখন তা মেশিনে তৈরি হতে শুরু করল। জমিদার ও পুঁজিপতিগণ এতে সুবিধা দেখে এতেই তাদের মূলধন বিনিয়োগ করতে শুরু করল। তারা বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করে কল-কারখানা গড়ে তুলল। সেসব কল-কারখানায় শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দিল। গরীব লোকেরা যারা এতদিন কুঠির শিল্প বা ছোট খাট গৃহ শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত, তাদের শিল্পগুলো যান্ত্রিক কলকারখানার দ্রুত উৎপাদনের সম্মুখে মার খেয়ে গেল। তারা বড় ধরনের ব্যবসা করার মত পুঁজি না থাকায় অসহায় হয়ে পড়ল। রাষ্ট্রীয় যানবাহনাদির সহায়তায় সমস্ত বাণিজ্য পথগুলোও পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে এসে গেল। এতে করে যারা বাণিজ্য-পণ্য বহন করে জীবিকা নির্বাহ করত তারাও বেকার হয়ে পড়ল। ফলে অভাবের তাড়নায় এই সব লোকেরা পুঁজিপতিদের সে সব কল-কারখানায় কাজ করতে শুরু করল। কিন্তু এখানেও কল-কারখানার মালিকরা অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে শ্রমিকদেরকে নামমাত্র পারিশ্রমিক দিয়ে নিজেরা প্রচুর লাভ করতে থাকল। অল্প

সংখ্যক লোক বড়লোক হতে থাকল আর লক্ষ লক্ষ লোক দীনদরিদ্রই রয়ে গেল। ধন-বৈষম্য ক্রমেই তীব্রতর হতে লাগল। এভাবেই সামন্তবাদের পরে পুঁজিবাদের সৃষ্টি হল এবং আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুঁজিবাদ গুরুত্ব লাভ করল।

পুঁজিবাদের ক্ষতিকর দিকসমূহ

১. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতির অবাধ স্বাধীনতা থাকে- সে যথেচ্ছা মূল্য নির্ধারণ করতে পারে এবং যথেচ্ছা মুনাফা লুটে নিতে পারে। ফলে সাধারণ মানুষ তাদের কাছে জিম্মী হয়ে যায় এবং তারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতির অবাধ স্বাধীনতা থাকার ফলে সে আত্মসর্বস্য হয়ে ওঠে এবং শ্রমিকদের অসহায়ত্বের সুযোগ বহাল রাখার জন্য টাকার জোরে নানান ফন্দি- ফিকির করে সাধারণ মানুষকে পুঁজিহীন ও নিঃস্ব করে রাখতে পারে। পুঁজিবাদের প্রবক্তা ম্যানডেভিল বলেন,

"গরীবদের থেকে কাজ নেয়ার একটাই মাত্র পথ, আর তা হল এদেরকে দরিদ্র থাকতে দাও। এদেরকে পরনির্ভরশীল করে তোল। এদের প্রয়োজন খুব অল্প করেই পূরণ করা দরকার। আপন প্রয়োজন পূরণে এদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলা চরম বোকামি।"[১]

৩. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতির অবাধ মুনাফা লুটে নেয়ার সুযোগ থাকার ফলে সে এতখানি অর্থগৃধ্ন হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদেরকেও সে সহ্য করতে পারে না। বরং যন্ত্র দ্বারা শ্রমিকের প্রয়োজন পূরণ করতে চায়। যাতে মজুরির ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, সাথে সাথে শ্রমিকদের দাবী দাওয়া ইত্যাদির ঝামেলা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। পুঁজিবাদের সমর্থক ইরিকলিস বলেন,

"আমাদের বড় কথা হল পণ্য উৎপাদনে কী করে মানুষের শ্রম কম লাগানো যায় আর পক্ষান্তরে এমন লোকের সংখ্যা কী করে বাড়ানো যায় যারা আমাদের পণ্য ক্রয় করবে। এ-ই আমাদের মূল কথা, এ-ই আমাদের প্রথম ও শেষ কথা।[২]

৪. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থগৃধ্ন হয়ে যাওয়ার ফলে মানুষ এতটা নিষ্ঠুর হয়ে যায় যে, চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি হয়ে গেলে সে অধিক মুনাফা লাভের আশায় কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করার জন্য সম্পদ বিনষ্ট করে দিতেও দ্বিধা করে না। যাতে মুনাফা লাভের হার হ্রাস পেতে না পারে। একবার ব্রাজিলে ফলন বেশি হওয়ায় মুনাফা ঘটে যাওয়ার আশংকায় পুঁজিপতিরা পরামর্শ করে পেট্রোল দিয়ে সমস্ত শষ্যক্ষেত্র পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল। এতে প্রায় দু লাখ পাউন্ড তেল ব্যয় হয়েছিল। এমনিভাবে বেশ কয়েক বৎসর তারা তা করেছিল।[৩]

---

১. ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, বরাত- اشترا کیت اور نظام اسلام. مظہر الدین صدیقی.

২. প্রাগুক্ত, বরাত- Money and morals.

৩. প্রাগুক্ত, বরাত- Inside Latin America.

৫. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা এতটা স্বার্থপর ও লোভী হয়ে ওঠে যে, তারা নারী এমনকি শিশুদেরকে দিয়েও মানবেতর পরিশ্রম করিয়ে নিতে দ্বিধাবোধ করে না। সম্প্রতি শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজন এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ঘৃণ্য মানসিকতা থেকে সৃষ্ট জটিলতার কারণেই দেখা দিয়েছে।

৬. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ধনী আরও ধনী হতে থাকে, গরীব আরও গরীব ও নিঃস্ব হতে থাকে। এভাবে ধন-বৈষম্য ক্রমেই তীব্রতর হতে থাকে। ধনী-গরীবের ভেদাভেদ বাড়তে থাকে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটই তার জ্বলন্ত সাক্ষী।

তবে উল্লেখ্য যে, পুঁজিবাদের উপরোক্ত ক্ষতিসমূহের প্রতিবিধান কল্পে বিশ্বের বহু দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিউনিষ্টদের চিৎকারে পুঁজিবাদীদের নীতিতে কিছুটা হলেও পরিবর্তন আসতে শুরু করে। ইদানিং নানান সমাজ সংস্কারমূলক কাজ এবং সমষ্টিগত অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পুঁজিবাদের অবাধ শোষণের পথ বাধাগ্রস্থ হয়েছে। যেমন: প্রায় সর্বত্রই এখন শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বোনাস দান, শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ও কার্যকাল হ্রাস করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ছুটিসহ অন্যান্য আরও অনেক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এর ফলে পুঁজিবাদের দোষ-ত্রুটি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে এতকিছু সংস্কারের পরও শ্রমিকদের যেসব সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, ইসলাম বহু পূর্বে তার চেয়েও অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধার বিধান প্রবর্তন করেছে।

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ
(Socialism & Communism)

সোশ্যালিজম ও কমিউনিজম-এর সংজ্ঞা

"সোশ্যালিজম" (Socialism) তথা "সমাজতন্ত্র" বা "সমাজবাদ" বলতে বোঝায় সমাজে সকলের অধিকার সমান হওয়ার মতবাদ। কেউ কেউ "সোশ্যালিজম" তথা "সমাজতন্ত্র"-এর পরিচয় এভাবে দিয়েছেন যে, সমাজভুক্ত সকল ব্যক্তির হীতার্থে ভূমি ও কল-কারখানা প্রভৃতি উৎপাদনের সহায়ক সমস্ত কিছুই রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত- এই মতবাদ। আর "কমিউনিজম" (Communism) তথা "সাম্যবাদ" হল সোশ্যালিজম বা সমাজতন্ত্র-এর চরম রূপ।

সোশ্যালিজম ও কমিউনিজম-এর পার্থক্য

(এক) সোশ্যালিজম ও কমিউনিজম- উভয়েরই লক্ষ্য হল একটি স্বপ্নরাজ্য বা ইউটোপিয়া (Utopia) স্থাপন। অর্থাৎ, দেশের যাবতীয় ধন-সম্পত্তি থেকে ব্যক্তিগত অধিকার তুলে দিয়ে সমবায় করণ। এভাবে এমন একটি দেশ গড়ে উঠবে, যেখানে সকলের অধিকার সমান থাকবে। এটাকেই তারা বলে থাকে স্বপ্নরাজ্য বা ইউটোপিয়া (Utopia)।

তবে উভয়েরই লক্ষ্য এক হলেও এই লক্ষ্যে পৌঁছার উপায় ও পদ্ধতি উভয়ের নিকট ভিন্ন ভিন্ন। সোশ্যালিজম বা সমাজতন্ত্র চায় শান্ত উপায়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এই লক্ষ্যে পৌঁছতে, আর কমিউনিজম বা সাম্যবাদ চায় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই উদ্দেশ্য সাধন করতে। এ হিসাবে বলা যায়, কমিউনিজম হল সোশ্যালিজমে পৌঁছার মাধ্যম। আবার বলা যায়, কমিউনিজম হল সোশ্যালিজম-এর চরম রূপ।

(দুই) কমিউনিজম এমন একটি রাষ্ট্র বা সমাজ গড়ে তুলতে চায়, যেখানে কোন শাসক থাকবে না। নিজেরাই নিজেদের দেশের জন্য কাজ করবে এবং এভাবে দেশবাসীদের দ্বারা পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ বৃদ্ধি করে রাখা হবে, তারপর সেই সম্পদ থেকে প্রয়োজনমত যার যা খুশি তা সে নিয়ে নিতে পারবে। তাই এ অর্থে কমিউনিজম পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। পক্ষান্তরে সোশ্যালিজম বা সমাজতন্ত্র বলে, রাষ্ট্র থেকে সকলকেই দেয়া হবে, তবে যে যত চায়, তাকে ততই দেয়া হবে না বরং যে যেরূপ কাজ করবে, তাকে সেরূপ দেয়া হবে।

তবে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ তথা সোশ্যালিজম ও কমিউনিজম-এর মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্যসমূহ থাকলেও সমাজতন্ত্র (Socialism) ও সাম্যবাদ (Communism) শব্দ দুটো প্রায়শই সমার্থবোধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দেশে দেশে সমাজতন্ত্রী যেসব দল রয়েছে তারা মূলত বিপ্লবের মাধ্যমেই তাদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা। এ ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র কথাটাকে তারা সাম্যবাদ অর্থে ব্যবহার করছে।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

পূর্বে সামন্তপ্রথা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রথায় সমস্ত ভূ-সম্পত্তির মালিক থাকত রাজা। রাজা তার অধীন বিভিন্ন সামন্ত জমিদারদের মধ্যে সে জমি বণ্টন করে দিতেন। জমিদাররা সে জমি তাদের অধীনস্থ নিম্ন ভূ-স্বামীদের মধ্যে বিলি করত। এভাবে সর্বশেষে কৃষকদের মধ্যে সে জমি বিতরিত হত। কৃষক ও মজুররা সে জমি আবাদ করত। তারা জমি চাষ করত তবে জমিতে তাদের কোনো অধিকার থাকত না। তারা চাষের মালিক ছিল কিন্তু গ্রাসের মালিক নয়। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে তারা ফসল উৎপন্ন করত, কিন্তু সে ফসলের অতি সামান্যই তারা ভোগ করতে পারত। তাই কৃষকদের কষ্টের পরিসমাপ্তি ঘটল না।

এটা ছিল এক ধরনের জায়গীর প্রথা। এই প্রথায় স্বেচ্ছাতন্ত্রীদের অত্যাচারে প্রজাকুল অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। সর্বসাধারণের অভাব-অভিযোগের নিবৃত্তি হল না। কালক্রমে এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দিল। রুশো ও ভলটেয়ার প্রমুখ ফরাসী মনীষী এই স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা শুরু করেন। তাদের লেখার দ্বারা নিপীড়িত মানুষের মনে বিপুল প্রেরণার সঞ্চার হয়। ফলে ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়। এতে স্বৈরতন্ত্র ও জমিদারী প্রথার জুলুম কিছুটা প্রশমিত হল কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না।

এদিকে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দিতে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে বহু কলকারখানা ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয়। বহু শিল্পকেন্দ্র ও ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে ওঠে। এতদিন যে সমস্ত জিনিস হাতে তৈরি হত এখন তা মেশিনে তৈরি হতে শুরু করল। জমিদার ও পুঁজিপতিগণ এতে সুবিধা দেখে এতেই তাদের মূলধন বিনিয়োগ করতে শুরু করল। সেসব কল-কারখানায় শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দিল। গরীব লোকেরা অভাবের তাড়নায় সেসব কল কারখানায় কাজ করতে শুরু করল। কিন্তু এখানেও কল-কারখান-ার মালিকরা শ্রমিকদেরকে নামমাত্র পারিশ্রমিক দিয়ে নিজেরা প্রচুর লাভ করতে থাকল। এভাবে অল্প সংখ্যক লোক বড়লোক হতে থাকল আর লক্ষ লক্ষ লোক দীন-দরিদ্রই রয়ে গেল। ধন- বৈষম্য ক্রমেই তীব্রতর হতে লাগল। এভাবে সামন্তবাদের পরে পুঁজিবাদের সৃষ্টি হল।

আবার পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দি ধরে এই আন্দোলন চলতে থাকল। পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই তখন চিন্তাশীলদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়াল। এই চিন্তা থেকেই সৃষ্টি হল সমাজতন্ত্র বা সোশ্যালিজম। যে মতবাদে বলা হল যে, ধনী-গরীব কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, সকলে দেশের জন্য কাজ করবে আর প্রয়োজনমত সকলেই রাষ্ট্র থেকে সম্পদ নিতে পারবে। কোনো ব্যক্তি মালিকানা থাকবে না। প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী খেটে যাবে, আর তার বিনিময়ে রাষ্ট্র তার সকল অভাব-অভিযোগ ও সুখ-শান্তি বিধান করবে। এভাবে সমাজের ধন-বৈষম্য ও শ্রেণী-বৈষম্য দূরীভূত হবে। সমাজের ঐশী আলোক বঞ্চিত মেহনতী জনতার শ্রেণী (Proletariat/প্রোলেটারিয়েট) তখন এ মতবাদটাকে আশির্বাদ স্বরূপ মনে করল। তারা সমাজের ধনিক ও অভিজাত সম্প্রদায় তথা "বুর্জোয়া সম্প্রদায়"-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হল এবং তাদের সংগ্রামে এ মতবাদটা প্রতিষ্ঠা লাভ করল। সারকথা, পুঁজিবাদকে ধ্বংস করার জন্যই সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব হল।

সোশ্যালিজম ও কমিউনিজম-এর প্রতিষ্ঠাতা

সোশ্যালিজম তথা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিখ্যাত জার্মান মনীষী কার্ল মার্কস। তিনি ১৮১৮ সালে জার্মানির অন্তর্গত এঃৎবাবং নগরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি খ্যাতনামা জার্মান দার্শনিক হেগেলের শিষ্য ছিলেন। তবে পরবর্তীকালে তিনি হেগেল থেকে এক স্বতন্ত্র মতবাদ প্রচার করায় জার্মানীর তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে তার বিরোধ হওয়ায় তিনি জার্মান থেকে বিতাড়িত হন। তিনি ফ্রান্সে গমন করেন। পরে সেখান থেকেও বিতাড়িত হয়ে ইংল্যান্ড গমন করেন এবং এখানেই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মার্কস ফ্রান্সে অবস্থানকালীন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলস (Frederich Engels) তার সঙ্গে এসে যোগ দেন এবং মার্কসের মতবাদে অনুপ্রাণিত

হয়ে ওঠেন। তারা উভয়ে মিলে নিজেদের মতবাদ প্রচার করার জন্য গোপনে একটা পার্টি বা সেল গঠন করেন। এই পার্টি বা সেল-এর নাম দেন লীগ অব কমিউনিষ্ট। তারপর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তারা উভয়ে নিজেদের মতবাদের ব্যাখ্যা দিয়ে একটা ইশতেহ-ার[১] প্রচার করেন, যার নাম "মেনিফেষ্টো অব কমিউনিষ্ট পার্টি"। এখান থেকেই "কমি-উনিজম" ও "কমিউনিষ্ট" কথার প্রচলন হয়।

মার্কসই 'শ্রমিকদের বাইবেল' নামে খ্যাত "ডাস ক্যাপিটাল" (Das Kapital) রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি জড়বাদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের কারণ, কমিউনিজমের প্রয়োজন, বস্তুর মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা করেন। এ জন্য তার প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রকে "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" (Scientific Socialism)ও বলা হয়।

মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৮৮৯ সালে তার উদ্যোগে লন্ডনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে যোগদানকারী শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। একদল নরমপন্থী আর একদল উগ্রপন্থী। নরমপন্থীদের বক্তব্য ছিল শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ও প্রচারণা দ্বারা পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা এবং যে দেশে এটা প্রতিষ্ঠিত হবে সে দেশের মধ্যেই এটাকে সীমাবদ্ধ রাখা। আর উগ্রপন্থীদের বক্তব্য ছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র আসবে না বরং বিপ্লবের মাধ্যমে আনতে হবে এবং সারা পৃথিবীতে এই বিপ্লব ছড়িয়ে দিতে হবে।

১৯০৩ সালে রাশিয়ার বলশেভিক পার্টিতে মতভেদ দেখা দিলে দুইটি শাখার উদ্ভব হয়। একটি হল মেনশেভিক আর একটি বলশেভিক। মেনশেভিকেরা ছিল নরমপন্থী। আর বলশেভিকরা ছিল উগ্রপন্থী। লেনিন[২] ছিলেন উগ্রপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি মার্কসের অনেকগুলো মূলনীতি এড়িয়ে একটি কার্যোপযোগী ধারা বের করে তার ভিত্তিতে বলশেভিক দলকে চালিত করেন এবং পরে এর নাম পরিবর্তন করে কমিউনিষ্টপার্টি রাখেন। বিভিন্ন ছোটখাট বিদ্রোহ এবং অনেক ইতিহাসের মধ্য দিয়ে তিনি

১. এই ইশতেহারে ধনতন্ত্রের নানা কুফলের দিক তুলে ধরা হয় এবং শ্রমিকরা বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক কীভাবে শোষিত হচ্ছে তা তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, এই ধন-বৈষম্য দূরীকরণের জন্য শ্রমিক আন্দোলন বা শ্রমিক বিদ্রোহ অপরিহার্য। আর এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কমিউনিজমের নিয়ম-নীতি সম্বলিত দশটা উপায় তুলে ধরা হয় এবং সবশেষে বিপ্লবের মাধ্যমে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলে কমিউনিজমের প্রসিদ্ধ শ্লোগান- Working men of all countries, unite অর্থাৎ, "দুনিয়ার মজদুর এক হও" লিখে উপসংহার টানা হয়।

১. ভি. আই. লেনিন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার অন্তর্গত ঝরসনৎরংশ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন একজন স্কুল মাস্টার। শিক্ষা শেষ করে লেনিন আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন। এ সময়েই তিনি রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেন। গোপনে গোপনে তিনি শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন। পরে রাশিয়াতে বলশেভিক দল গঠন করেন। ১৯০৩ সালে বলশেভিক দলে বিরোধ দেখা দেয়ার পর তিনি মেনশেভিকে না গিয়ে বলশেভিক দলেরই নেতৃত্ব দিতে থাকেন।

কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রাশিয়ার জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এ সময়ে রুশ নেতা ট্রট্স্কী (Trotsky) তার সঙ্গে যোগ দেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১ মার্চ স্বৈরাচারী সরকার এক হুকুমনামা জারি করে ধর্মঘটি শ্রমিকদের কাজে ফিরে আসার আদেশ দিলে বিপ্লবের গতি আরও বেগবান হয়। ধর্মঘটিরা এই আদেশ মানতে অস্বীকার করে। এর ফলে সেনাবাহিনী জারের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। তারা তখন সৈন্য ও শ্রমিকদের মিলিতভাবে এক বৈপ্লবিক পরিষদ বা সোভিয়েট গঠন করে। তারপর ১৪ মার্চ প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জার সম্রাট নিকোলাস ক্ষমতাচ্যুত হয়। রাশিয়ার জারতন্ত্রের অবসান ঘটে। সামরিক সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম না হওয়ায় দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভি. আই. লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সংখ্যাগুরু বলশেভিক পার্টি সামরিক সরকারকে পদচ্যুত করে দেশের গদী দখল করে নেয়। এ হিসাবে লেনিনই কমিউনিজমের কার্যকরী প্রতিষ্ঠাতা। কমিউনিজমকে তাই অনেক সময় "লেনিনিজম" (Leninism) বলা হয়। এবং বলশেভিক দল কর্তৃক কার্যকরীভাবে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা লাভ করায় "বলশেভিজম" ও "কমিউনিজম"কে সমার্থবোধক আখ্যায়িত করা হয়। তবে কার্ল মার্কস হলেন কমিউনিজমের আদি প্রবর্তক। এ হিসাবে কমিউনিজমকে "মার্কস ইজম" (Marxism)ও বলা হয়।

লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রট্স্কী ও মার্শাল ষ্ট্যালিনের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। ষ্ট্যালিন রাশিয়াতেই কমিউনিজমকে সীমাবদ্ধ রাখতে চান, পক্ষান্তরে ট্রট্স্কী অন্যান্য দেশেও বিপ্লবের মাধ্যমে কমিউনিজমকে ছড়িয়ে দিতে চান। এ মতানৈক্য বিরোধ ও সংঘর্ষে রূপ নেয়। অবশেষে স্ট্যালিন বিজয়ী হন এবং ট্রট্স্কী ককেশাস প্রদেশে তার পর ফ্রান্সে নির্বাসিত হন এবং এক সময় গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন।

স্ট্যালিনের মাধ্যমে রাশিয়ার অগ্রগতি সাধিত হতে থাকে এবং লেনিনের কাল থেকে মার্কসের মূলনীতিতে যে পরিবর্তনের ধারা চালু হয় স্ট্যালিনের নেতৃত্বে তা আরও পুষ্টতা লাভ করে। স্ট্যালিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই কমিউনিজমকে বলা হয় "স্ট্যালিনবাদ"।

বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রের বিস্তার

রাশিয়াই ছিল তথাকথিত মেহনতী জনতার প্রথম স্বর্গরাজ্য একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যা ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সমাজতন্ত্রের প্রথম বিপ্লবী নায়ক ভি. আই. লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সংখ্যাগুরু বলশেভিক পার্টি কর্তৃক সামরিক সরকারকে পদচ্যুত করে দেশের গদী দখল করে নেয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, রুমানিয়া প্রভৃতি পূর্ব ইউরোপীয় দেশ এবং চীন ও কিউবাতে সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব কায়েম হয়।

কমিউনিজম দর্শনের সারকথা

১. কমিউনিজম বিশ্বাস করে যে, অর্থই হল জীবনযাত্রার মূল। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হলেই অন্য সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

২. কাউকেই অর্থের জন্য তথা খাওয়া-পরার জন্য ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না। বরং রাষ্ট্রই সকলের অর্থ তথা খাওয়া-পরার যোগান দিবে। সকলে কাজ করবে যোগ্যতা অনুসারে আর উপভোগ করবে প্রয়োজনমত।

৩. যেহেতু কাউকে খাওয়া-পরার জন্য ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না, তাই ব্যক্তি চিন্তারও প্রয়োজন নেই, তাই ব্যক্তি মালিকানারও বিলুপ্তি ঘটবে।

৪. যেহেতু ব্যক্তি মালিকানার বিলুপ্তি ঘটবে, তাই সম্পত্তির মালিক থাকবে রাষ্ট্র। ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তিকে তুলে দিয়ে সেগুলোকে সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে। আর যারা বিদেশী অথবা কমিউনিজমের বিরোধী তাদের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৫. যেহেতু ভূ-সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানার বিলুপ্তি ঘটবে, তাই ভূ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন তুলে দিতে হবে।

কমিউনিজম ও ইসলামের মধ্যে বিরোধ

১. কমিউনিজম নিছক জড়বাদী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কমুনিষ্টগণ ইন্দ্রীয়গাহ্য বস্তু ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে স্বীকার করেন না। তারা বলেন, যা ইন্দ্রীয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, তার কোন অস্তিত্ব নেই, তা অলীক। যদিও বা তার অস্তিত্ব থাকে তবে তা নিয়ে বিব্রত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এঞ্জেলস বলেন, "এই পৃথিবীতে পদার্থই মাত্র প্রকৃত।" এ কারণে কমিউনিজম আল্লাহ্র সঙ্গে কোন সম্পর্ককে স্বীকার করে না। নাস্তিকতাই মার্কসবাদ তথা কমিউনিজমের মূল প্রাণ। লেনিনের লিখিত জবষরমরড়হ গ্রন্থের গোড়াতেই বলা হয়েছে, "নাস্তিকতা মার্কসবাদের স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য অঙ্গ। নাস্তিকতা ছাড়া মার্কসবাদ কিছুতেই বুঝা যেতে পারে না।" কার্লমার্কস বলেছেন, "আমাদের কাছে এ জড়জগৎ ছাড়া আর কোনো সত্তা নেই।" তিনি আরও বলেছেন, "পৃথিবী বস্তুর নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত হয়– এজন্য কোনও সার্বজনীন সত্তা বা খোদার প্রয়োজন নেই।"

কমিউনিজম নাস্তিক্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার ফলে রাশিয়াতে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গোটা সাংস্কৃতিক কাঠামোকে নাস্তিক্যবাদী রূপে গড়ে তোলার প্রয়াস নেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকও নিয়োগ করা হয় নাস্তিক। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা ধ্বংস করে দেয়া হয়। প্রখ্যাত কমিউনিষ্ট আনাতোল লুনাকারস্কী বলেন, "কমিউনিষ্ট রাশিয়ার শিক্ষককে নাস্তিক হতেই হবে। এ সামাজিক ব্যবস্থায় ধর্মবিশ্বাসী শিক্ষকের কথা চিন্তাই করা যায় না। মোল্লাদেরকে পয়সা দেবার (পুরোহিত

তন্ত্র ধর্ম?) আর কেউ নেই।”[১] সোভিয়েত লেখকগণ স্পষ্টত স্বীকার করেছেন যে, অনেকগুলো মসজিদকে নাট্যশালা ও নৃত্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে।[২]

নাস্তিক্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার ফলে কমিউনিজম ধর্মবিরোধী। ষ্ট্যালিন-কনষ্টিটিউশনের ১২৪ ধারায় লিখিত আছে–[৩] “ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করায় বাধা নেই কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে প্রচার করায় বাধা আছে।” লেনিনের লিখিত Religion গ্রন্থে আছে–[৪] “মার্কসবাদী হতে হলে তাকে জড়বাদী হতেই হবে, অর্থাৎ, তাকে হতে হবে ধর্মের শত্রু।” চীনা কমিউনিষ্ট নেতা মাও সেতুংও বলেছেন, দার্শনিক ভাববাদ বা ধর্মের সাথে আমাদের কোন কারবার থাকতে পারে না।

সারকথা– এভাবে তারা কমিউনিজমকে নিছক জড়বাদী ভাবতত্ত্বে সীমাবদ্ধ করেছে যা সকল প্রকার আধ্যাত্মবাদকে অবৈজ্ঞানিক বলে উপহাস করে। আল্লাহ, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি কোনো কিছুকেই কমিউনিষ্টগণ বিশ্বাস করে না। তারা কোন ওহী এবং ঐশী ধর্মকে বিশ্বাস করে না। লেনিনের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে (মে, ১৯২৯) নাস্তিকতাকে রাজধর্ম হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয় এবং গীর্জার স্বাধীনতা নষ্ট করা এবং কোন রকম ধর্ম বিষয়ক প্রচারণা যেন কেউ চালাতে না পারে- তা তত্ত্বাবধান করার জন্য ইন্সপেক্টর বিভাগ খোলা হয়।[৫]

এর বিপরীত ইসলামে জড়বাদিতার কোনো স্থান নেই। ইসলামে আল্লাহ, ফেরেশতা, পরকাল ইত্যাদি আধ্যাত্মবাদী বিশ্বাসসমূহই ধর্মের মূল ভিত্তি। ধর্মবিরোধিতাকে ইসলাম চরম অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করে। ইসলাম কোন ধর্মের স্বাধীনতাকে খর্ব করে না। তাছাড়া জড়বাদ এখন বৈজ্ঞানিক জগতেও অচল। বহু বৈজ্ঞানিক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে নিশ্চয়ই একজন নিয়ন্তা রয়েছেন।

২. কমিউনিজমে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে কোন মত ও পথ গ্রহণ করতে পারে না।

এর বিপরীত ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম ব্যক্তিও স্বাধীনভাবে পূর্ণ মত ও পথ গ্রহণ করতে পারে। কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই ইরশাদ হয়েছে,

---

১. কমিউনিষ্ট শাসনে ইসলাম, ড. হাসান জামান বরাত- Anatole Lunacharsky, Pravda, March 25, 1929।

২. কমিউনিষ্ট শাসনে ইসলাম, ড. হাসান জামান বরাত- Yefremov and Gabarov: The Land of Soviets : Muslims in the Soviet Union, Mosciw, 1959, p 15.৷

৩. ইংরেজি কথাগুলো নিম্নরূপ: Anti-religious propaganda is free, Religious not free. (Soviet Strength, by Hewlett jahnson) ইসলাম ও কমিউনিজম, কবি গোলাম মোস্তফা।

৪. ইংরেজি কথাগুলো নিম্নরূপ: The Marxist must be a materialist, i.e. an enemy of Religion. p.21 - ইসলাম ও কমিউনিজম, কবি গোলাম মোস্তফা।

৫. ইসলাম ও কমিউনিজম, কবি গোলাম মোস্তফা।

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

অর্থাৎ, ধর্ম (গ্রহণ)-এর ব্যাপারে কোনো জবরদস্তী নেই। গোমরাহী থেকে হেদায়েত স্পষ্ট হয়ে গেছে। (সূরা: ২-বাকারা: ২৫৬)

৩. কমিউনিজম ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার মনে করে। অথচ ইসলাম ধর্ম শোষণের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার। ইসলাম চায় মানবতা ও সুবিচারমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে।

৪. কমিউনিজম চিন্তার স্বাধীনতাকে নষ্ট করেছে। কমিউনিজমে মানুষকে মূল্যায়ন করা হয়েছে একটা নিষ্ক্রীয় জীব হিসাবে– জড় এবং প্রয়োজনের শক্তির সম্মুখে যার ইচ্ছার কোনো মূল্য নেই। কার্লমার্কস বলেছেন, জড় অস্তিত্বের উৎপত্তির প্রণালী সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায়। এটা মানুষের চেতনাশক্তি নয়, যা তার অস্তিত্বের বোধ জন্মায়। কিন্তু বিপরীতক্রমে এটা তাদের সংঘবদ্ধ অবস্থান যা তাদের চেতনাবোধ জন্মায়।” এভাবে কমিউনিজম মানুষকে মূল্যায়ন করেছে একটা যন্ত্র বিশেষ হিসাবে। ফলে মানুষ নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় কিছুই করতে পারে না। সব সময়ই সে তার নিজের মনের ওপর একটা চাপ অনুভব করে। প্রশান্ত অবসর বা সহজ মনের আনন্দ সে কখনই পায় না। একটা কঠিন বন্ধনের অনুভূতি তার মনকে সব সময় পীড়া দেয়।

সারকথা– কমিউনিজমে ব্যক্তি চিন্তা-চেতনাকে স্থান দেয়া হয়নি। কমিউনিজমে মুক্ত বুদ্ধির কোন স্থান নেই। এ জন্যই কোন মার্কসবাদী রাষ্ট্রেই মার্কসবাদ বিরোধী কোন মত বা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বরদাশ্‌ত করা হয়নি।[১] এর বিপরীত ইসলামী বিধানে সকলকে যে কোন মত ও পথ গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যার ফলে মানুষ নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় সবকিছুই করতে পারে। কখনই সে তার নিজের মনের ওপর কোন অবাঞ্ছিত চাপ অনুভব করে না। কোন কঠিন বন্ধনের অনুভূতি তার মনকে কখনও পীড়া দেয় না। যার ফলে মানুষের কমনীয় সহজাত বৃত্তিগুলোর বিকাশ ঘটে। তার সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তার নব নব পথে আত্মপ্রকাশ করার স্বাভাবিক আকাংখাগুলো শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায় না। কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে বলা হয়েছে “হে বোধসম্পন্ন লোকেরা! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।” এরূপ বলে মানুষের ব্যক্তি চিন্তা-চেতনার স্বীকৃতি প্রদান ও তাকে ক্রিয়াশীল করে তোলার সুপ্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. কমিউনিজমে ব্যক্তি মালিকানাকে অস্বীকার করা হয়েছে। কমিউনিজম বলে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকলেই শোষণের সৃষ্টি হয়।

---

১. The World on the Brink of Abyss নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়- কমিউনিজমকে স্বীকার না করার অপরাধে অথবা কমিউনিজম-বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত থাকার কোনোরূপ সত্য বা অমূলক সন্দেহে বলশেভিকরা মোট ১৮,৬০,০০০ লোককে হত্যা করেছে। তন্মধ্যে ২৮ জন বিশপ, ১২০০ জন পাদ্রী, ৬০০০ শিক্ষক, ৮৮০০ জন ডাক্তার, ১৯২,০০০ জন শ্রমিক এবং ৮১৫,০০০ জন কৃষক। –ইসলাম ও কমিউনিজম, গোলাম মোস্তফা।

এর বিপরীত ইসলামে ব্যক্তি-মালিকানা স্বীকৃত। ব্যক্তি-মালিকানা স্বীকৃত না হলে কোনো উপার্জনে কারও আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় না, সকলেই তখন শুধু আইনের চোখকে বুঝ দেয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করে যায়, আর ফাঁক পেলেই ফাঁকি দেয়। এভাবে আন্তরিকতাহীন কর্ম অর্থনৈতিক উন্নতির গতিকে শ্লথ করে দেয়। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলো এই বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েই শ্রমিকদের থেকে কাজ নেয়ার জন্য তাদের উপর বন্দুকের নল উঁচু করে রাখতে বাধ্য হয়। ইসলামের মতে ব্যক্তির হাতে সম্পদ থাকলেই শোষণ হয় না, তার দ্বারা অন্য মানুষের উপকারও হয়। ইসলাম টাকা-পয়সা রোজগারের পথকে সৎ ও সঠিক করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং একজনের হাত থেকে অন্যের হাতে যেন অর্থ আবর্তিত হয় তার ব্যবস্থা করে; যাতে সাধারণ লোকদের অসুবিধা না হয়। যাকাত, সদকা, ফিতরা প্রভৃতির প্রবর্তন ধনীদের থেকে গরীবদের মাঝে অর্থ আবর্তিত হওয়ার কাজ করে থাকে। তাছাড়া নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার প্রতি ইসলাম উৎসাহ প্রদান করে এ ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপকতর করেছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ﴾

অর্থাৎ, তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে, তারা আল্লাহর রাস্তায় কী পরিমাণ ব্যয় করবে। তুমি বলে দাও, প্রয়োজনাতিরিক্ত সব কিছু।[১] (সূরা: ২-বাকারা: ২১৯)

৬. কমিউনিজমে কোনো রকম ধন-বৈষম্য তথা ধনী-গরীবের ব্যবধান থাকতে পারবে না বলা হয়েছে। কিন্তু এটা একটা অপ্রাকৃতিক দর্শন। আর কোন অপ্রাকৃতিক দর্শনকে গায়ের জোরে সাময়িক চাপিয়ে দেয়া গেলেও তা স্থায়িত্ব লাভ করে না। এ কারণেই কমিউনিজম সমগ্র পৃথিবী থেকে বিতাড়িত হয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়মকে লংঘন করে কোন ধর্ম, কোন সমাজ ও কোন রাষ্ট্র দাঁড়াতে পারে না।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ছোট-বড়, উপরস্থ-অধীনস্ত–এর তামতম্য না থাকলে কেউ কাউকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, কোন চেইন অব কমাণ্ড থাকে না। একটা অফিসের সকলেই কর্মকর্তা হয়ে গেলে কর্মচারী হবে কে? আর সকলেই এক মানের হয়ে গেলে কেউ কারও বশ্যতা স্বীকার করবে না, কেই কারও নির্দেশ মেনে চলবে না, তাহলে অফিস চলবে কী করে? সকল প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রের ব্যাপারেই এ কথাটি প্রযোজ্য। সকল কাজে শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার তথা সকল কার্য

১. সম্ভবত কম্যুনিজম প্রবর্তনকারীগণ এ আয়াত ও ইসলামের এ জাতীয় নীতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না; নতুবা কম্যুনিজম প্রবর্তনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। ভারতের প্রখ্যাত মনীষী মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী বলেন, "আমার রাশিয়া অবস্থান কালে লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। কথা প্রসঙ্গে তার কাছে কুরআনের উপরোক্ত আয়াতটি বিশ্লেষণ করি। তখন লেনিন অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আরো আগে যদি এই সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতাম, তাহলে আমাদের কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কোনো আবশ্যকতাই ছিল না। –ইসলামে শ্রমিকের অধিকার

সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার স্বার্থেই তারতম্য থাকা একটা অপরিহার্য বিষয়। জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে তারতম্য থাকার এই অপরিহার্যতার রহস্য বর্ণনা করে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا.﴾

অর্থাৎ, আমি পার্থিব জীবনে তাদের মধ্যে রিযিক বণ্টন করি এবং একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি, যাতে একে অপরকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে। (সূরা: ৪৩-যুখরুফ: ৩২)

৭. কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা কালে ব্যক্তি থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়। অথচ ইসলাম বলেছে, কারও সম্পদ তার ইচ্ছার বাইরে গ্রহণ করা বৈধ নয়। হাদীছে বলা হয়েছে,

لايحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه. (كذا في المشكوة عن شعب الإيمان للبيهقي المجتبى للدار قطني)

অর্থাৎ, কোন মুসলমানের আন্তরিক ইচ্ছা ব্যতীত তার সম্পদ হালাল নয়।

কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র জনগণ থেকে নেয় অথচ ইসলামী রাষ্ট্র জনগণকে প্রদান করে। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র জনগণ থেকে নিয়ে ভারসাম্যতা বিধান করতে চায়, আর ইসলামী রাষ্ট্র জনগণকে প্রদান করে ব্যালেন্স রক্ষা করার প্রয়াস নেয়।

৮. কমিউনিজমের সামাজিক দর্শনে সমাজের একটি অংশ হওয়া ব্যতীত একক ব্যক্তিত্বের কোনো মূল্য নেই। অথচ ইসলাম ব্যক্তির উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলাম ব্যক্তিকেই সমাজের মূল বুনিয়াদ হিসাবে মূল্যায়ন করেছে এবং ব্যক্তিকেই অভ্যন্তর থেকে সূচী ও সভ্য করে গড়ে তোলার নীতি অবলম্বন করেছে। যাতে ব্যক্তি সমাজের একজন সভ্যরূপে তার সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারে। এভাবে ইসলাম ব্যক্তিকে সমাজের একজন সচেতন সভ্যপদে উন্নীত করে এবং জাতির নৈতিক কার্যকলাপের একজন অভিভাবক রূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

৯. কমিউনিজম বিশ্বাস করে যে, অর্থনৈতিক উপাদানই বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ নিরূপন বা গঠনের মূল। অর্থই হল জীবন-যাত্রার মূল। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হলেই অন্য সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এভাবে কমিউনিজম শুধু পার্থিব সম্পদের কথাই ভাবে, শুধু অন্ন-বস্ত্রের সুখ-সুবিধার কথাই চিন্তা করে। অন্ন-বস্ত্রের চিন্তার বাইরে জীবনের কোন উচ্চতর লক্ষ্য নেই তাদের।

কিন্তু ইসলাম এরূপ মনে করে না যে, অর্থই জীবন-যাত্রার মূল এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হলেই অন্য সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ইসলামী দর্শনে ভাত- কাপড়ের কথা ভাবা ছাড়াও আরও অনেক কিছু ভাববার রয়েছে। মানুষ শুধু খেতে আসেনি, তার জীবনের লক্ষ্য অনেক উচ্চতর। ইসলাম শুধু পার্থিব সম্পদের কথাই ভাবে না, পরলোকের সম্পদও তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলাম আর্থিক

মূল্যমানের উপর জোর দেয়নি বরং ইসলাম অ-আর্থিক মূল্যমানের উপর; যেমন নৈতিক মূল্যমানের উপরই গুরুত্ব প্রদান করে। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, অ-আর্থিক মূল্যমানই জীবনের ভিত্তি রচনা করে এবং আল্লাহ তাআলা ও মানুষের মধ্যকার আধ্যাত্মিক বন্ধনই জীবনের নৈতিক মূল্যমানের উন্নতি বিধানের প্রকৃষ্ট উপায়।

সারকথা- কমিউনিজম চূড়ান্ত গুরুত্ব প্রদান করে অর্থনৈতিক শক্তি ও আর্থিক মূল্যমানের উপর, আর ইসলাম চূড়ান্ত গুরুত্ব প্রয়োগ করে আধ্যাত্মিক শক্তি ও নৈতিক মূল্যমানের উপর।

১০. কমিউনিজম নারী জাতিকেও নরের তুল্য শ্রম দিতে বাধ্য করে। কিন্তু ইসলাম নারী জাতিকে শ্রম দিতে বাধ্য করেনি বরং পুরুষদের উপর তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দিয়েছে। আর তাদেরকে আদর্শ সন্তান জন্মদান ও তাদের সুষ্ঠ লালন-পালনের সাথে সাথে গৃহের কর্মকাণ্ড পরিচালনার মহৎ দায়িত্বসমূহ পালনে নিয়োজিত করেছে। সারকথা- ইসলাম নারীকে শুধু শ্রমদাত্রী হিসাবে মূল্যায়ন করেনি, যা করেছে কমিউনিজম।

১১.কমিউনিজম পরিবার-প্রথা ধ্বংস করে দেয়। কমিউনিজম বলে, পরিবারে বাস করলে মানুষের মনে সাধারণ লোকের প্রতি কোনো সহানুভূতি জাগতে পারে না। এর বিপরীত ইসলাম পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে তোলার নীতি প্রবর্তন করে। ইসলামের মতে পরিবারে বাস করেই মানুষের মনে মানবিকতার উন্মেষ ঘটে।

বাস্তবতার আলোকে সমাজতন্ত্র

সমাজতন্ত্র মেহনতী জনতা ও বঞ্চিত শ্রেণীকে সুখ-শান্তির যে মোহনীয় স্বপ্ন দেখিয়েছিল, ধনী-গরীবের মধ্যকার ধন-বৈষম্য তুলে দেয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে, সংক্ষেপে তার একটি খতিয়ান তুলে ধরা হল।

সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য ছিল দুটো।

(এক) ধন-বৈষম্য তথা ধনী-গরীবের ভেদাভেদ তুলে দেয়া।

(দুই) পূঁজিবাদের উচ্ছেদ সাধন। কিন্তু বাস্তব হল এ দুটি ক্ষেত্রেই তারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। নিম্নে তার কিঞ্চিত বর্ণনা দেয়া হল।

১. ধন-বৈষম্য তথা ধনী-গরীবের ভেদাভেদ তুলে দেয়ার ক্ষেত্রে কমিউনিজমের ব্যর্থতা

সর্ব প্রথম ও সবচেয়ে আদর্শ কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র-রাশিয়ায় কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে ধন-বৈষম্য দূর হয়নি। বরং সেখানকার ডিক্টেটরী শাসন ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে এক ভয়াবহ আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছিল। যারা পূঁজিপতীদের মতই, এমনকি তাদের চেয়েও ভয়াবহভাবে সর্বহারাদের উপর অত্যাচার চালাত। তাদের জীবন যাত্রার মান শ্রমিকদের তুলনায় অনেক উচ্চ ছিল। বিখ্যাত সোশ্যালিষ্ট এম, ওয়াইন ইউয়ন ১৯৩৭ সালের মজুরী পার্থক্যের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

সাধারণ মজুর	১১০ হতে ৪০০ রুবল
মধ্যস্থানীয় অফিসার	৩০০ হতে ১,০০০ রুবল
বড় অফিসার	১,৫০০ হতে ১০,০০০ রুবল।

পরে ক্রুশ্চেভের আমলে সংশোধনী আনার পরও সেখানে ফ্যাক্টরী-ডিরেক্টর ও সাধারণ মজুরের মধ্যে বেতনের হারে পার্থক্য ছিল ১৪ : ১ অনুপাতে।[১]

আরও উল্লেখ্য যে, তখনকার সময়ে শ্রমিকরা সর্বোচ্চ যে ৪০০ রুবল বেতন পেত, তা দিয়ে কোনোক্রমেই তাদের মধ্যম ধরনেরও জীবন যাপন সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। নিম্নের বিবরণ থেকে তা স্পষ্ট হবে। তখনকার পাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রী জনাব আলতাফ হোসেন রাশিয়ায় সফর করে এসে লিখেছিলেন- মধ্যম ধরনের এক জোড়া জুতো পাঁচশ রুবল, সোয়া সের দুধ চার রুবল এবং এক ডজন ডিম চৌদ্দ রুবলে সেখানে পাওয়া যায়।

এভাবে দেখা যায় কমিউনিজম মজুরদের সমস্যা সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। তারা মজুরীর তারতম্য তুলে দিতে ব্যর্থ হয়। তাদের অর্থনৈতিক সাম্যের শ্লোগান ভেস্তে যায়।

২. পূঁজিবাদের উচ্ছেদ সাধনে কমিউনিজমের ব্যর্থতা

পূর্বের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হয়েছে যে, কমিউনিজম পূঁজিবাদের উচ্ছেদ সাধনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বরং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো পূঁজিবাদের দিকেই তাদের উল্টো রথ চালিয়ে নিয়ে গেছে। সাম্যবাদী লেখক লুই ফিশার রাশিয়া ভ্রমণ করে এসে বিবৃতি দিয়েছিলেন,

"ষ্ট্যালিন তো রুজভেল্টের মতই আয়াসে থাকেন, কিন্তু সেখানে মজুরদের অবস্থা পূঁজিবাদী আমেরিকার মজুরদের চেয়েও নিম্নমানের।"

১৯৬০ সনের ৫ মে সুপ্রীম সোভিয়েটে বক্তৃতা দানকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ তো ঘোষণা করে ফেললেন যে, অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য নয়। তিনি বললেন,

"আমরা মজুরির মধ্যে তারতম্য অবসানের বিরোধিতা করি। আমরা মজুরিতে সমতা এবং তাকে একই সমতলে আনার স্পষ্ট বিরোধী। আর এটাই লেনিনের শিক্ষা।[১]

---

১. তথ্যসূত্র: ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ

১. এক নজরে কমিউনিজম সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যসূত্র:
(১) ইসলাম ও কমিউনিজম, কবি গোলাম মোস্তফা,
(২) ইসলাম কমিউনিজম ও পূঁজিবাদ, মোহাম্মাদ কুতুব,
(৩) কমিউনিষ্ট শাসনে ইসলাম, ড. হাসান জামান,
(৪) ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ,
(৫) বাংলা বিশ্বকোষ, মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত,
(৬) বিবিধ।

সপ্তম অধ্যায়

(দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ বিষয়ক)

গ্রীক-দর্শন

(فلسفۂ یونانی)

"দর্শন"(فلسفہ) বলতে বোঝায় কল্পনার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী প্রজ্ঞাকে। প্রজ্ঞা যখন কল্পনার উপর প্রভাব বা আধিপত্য বিস্তার করে তখনই দর্শনের উদ্ভব হয়। স্বাধীন নিরপেক্ষভাবে প্রজ্ঞার কষ্টিপাথরে যাচাই করে বিজ্ঞের মত বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করাই হল দর্শনের কাজ। এখানে আমরা গ্রীক-দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। "গ্রীক দর্শন" (فلسفۂ یونانی) বলতে বোঝায় ইউরোপের প্রাচীন দেশ গ্রীস (یونان)কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা দর্শনকে।

প্রথমদিকে গ্রিকদর্শনে পদার্থ বিজ্ঞান, সৌরবিজ্ঞান, খোদাতত্ত্ব বিজ্ঞান, পরিবার-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি অনেক শাস্ত্রই অন্তর্ভুক্ত ছিল। একই সাথে সবগুলো বিষয়ই এতে আলোচিত হত। পরবর্তীতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জ্ঞানে বিস্তৃতি ঘটায় এক এক শাখা স্বতন্ত্র শাস্ত্রে রূপ নিয়েছে।

বস্তুজগতের মূলতত্ত্বের স্বরূপ কী– এ প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই গ্রিকদর্শনের শুরু। গ্রিক দর্শনের আগাগোড়া যে সমস্যা গুরুত্ব লাভ করেছে, তা হল এই সত্তা বিষয়ক সমস্যা। গ্রিক দর্শনে গ্রিকদের দ্বারা জগৎ ও বস্তুর উৎপত্তি কীভাবে তা বিশ্লেষণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা শুরু হয়। যদিও তাঁদের যুক্তি ও বিশ্লেষণে অসংগতি ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা খুবই স্পষ্ট, সাথে সাথে জগৎ সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত ইসলামী ধারণার সাথে সংঘর্ষ বিদ্যমান, তবু প্রাথমিকভাবে জীবন ও জগতকে জানার তাদের আগ্রহকে ঐতিহাসিক-ভাবে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এদের প্রাথমিক চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করেই আজকের বৈজ্ঞানিক দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে।

সমগ্র গ্রীক-দর্শনের যুগকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. আদি যুগ বা প্রাক-সক্রেটিস দর্শনের যুগ।
২. মধ্য যুগ বা সক্রেটিস দর্শনের যুগ ।
৩. শেষ যুগ বা এরিস্টটলের পরবর্তী দর্শনের যুগ ।

নিম্নে উপরোক্ত তিন যুগের প্রসিদ্ধ কয়েকজন দার্শনিক ও তাদের দর্শনের বিশেষ বিশেষ কিছু ধারা উল্লেখ করা হল।

১. আদি যুগের কয়েকজন দার্শনিক ও তাদের দর্শনের বিশেষ কিছু ধারা

খৃষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে ৪৩০ অব্দ পর্যন্ত যুগকে আদি যুগ বা প্রাক-সক্রেটিস দর্শনের যুগ বলা হয়। এই আদি যুগ বা প্রাক সক্রেটিস যুগের প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে রয়েছেন দার্শনিক থেলিস (Thales) এ্যানাক্সিমেন্ডার (Anaximender) ও এ্যানাক্সিমেনিস (Anaximenes)।

এই আদি যুগ বা প্রাক-সক্রেটিস যুগকে প্রাক সফিষ্ট ও সফিষ্ট এই দুই যুগে ভাগ করা হয়। সফিষ্টরা (سوفسطائیہ/Sophists) ছিল গ্রিসের একটি কুটতার্কিক সম্প্রদায়। এদের আবির্ভাব হওয়ার আগ পর্যন্ত হল প্রাক সফিষ্ট যুগ। জড় ও মানস-সত্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব শুধু জড় ও মানস-সত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না– এ বিরোধ প্রকৃতি ও মানব (Nature and Man)-এর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মানব এবং প্রকৃতির মধ্যে যদি এ বিপরীতধর্মী ভাব বিদ্যমান থাকে, তবে এই বিশ্ব-প্রকৃতিতে মানবের কি স্থান– এ প্রশ্ন নিয়েই যাত্রা শুরু হয় দর্শনের দ্বিতীয় পর্ব এবং গ্রিসের তার্কিক গোষ্ঠীই এর উদ্যোক্তা। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। গ্রিসের কুটতার্কিক বা সফিস্টরা মানুষের জ্ঞান ও আচরণের সমস্যার প্রতি মনোযোগী হয়ে একটা নতুন দর্শন চিন্তার সূচনা করেন। প্রখ্যাত সফিস্টদের মধ্যে রয়েছেন প্রোটাগোরাস, জর্জিয়াস, হিপ্পিয়াস, প্রোডিকাস প্রমুখ।

সফিস্টগণের মতে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব স্ব কার্যের মানদণ্ড। নিজ বিচার ব্যতিরেকে নৈতিকতার কোন সার্বজনীন মানদণ্ডকে তারা অস্বীকার করত। যেমন: প্রোটাগোরাস (Protagoras) ছিলেন একজন খ্যাতনামা সফিস্ট। তিনি বলতেন, মানুষ নিজেই সবকিছুর মাপকাঠি। ব্যক্তি অনুভূতি হচ্ছে জ্ঞান– এই ছিল প্রোটাগোরাসের মতবাদ। কিন্তু তার এই মতবাদ স্ববিরোধাত্মক। আমার নিকট যা সত্য তাই যদি জ্ঞান হয়, তাহলে যুক্তি অবতারণা করে বলা যায় যে, আমার নিকট এ-ই সত্য যে, প্রোটাগোরাসের মতবাদ মিথ্যা, তাহলে তিনি তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন।

এই সফিস্টগণ যে শুধু নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রেই কোন সার্বজনীন মানদণ্ডকে অস্বীকার করত তা নয়। এমনকি তারা জগতের কোন বস্তুর বাস্তব প্রকৃতি (حقيقة الشيئ) আছে বলেও অস্বীকার করত। তারা বলত, জগতের কোন বস্তুর বাস্তব প্রকৃতি (حقيقة الشيئ) আছে বলে আমাদের জানা নেই। এই শ্রেণীর দার্শনিক (সফিস্টস)দের মধ্যে আবার ৩টি উপদল ছিল। যথা:–

১. যারা জিদ ও হটকারিতা পূর্বক বস্তুর বাস্তব প্রকৃতি (حقيقة الشيئ)কেই অস্বীকার করত। তারা বলত, কোনো বস্তুর বাস্তব প্রকৃতি বলতে কিছু নেই, এগুলো সব কল্পনা। এদেরকে বলা হত হটকারী عنادية।

২. যারা বস্তুর বাস্তব প্রকৃতিকে সমূলে অস্বীকার না করলেও তারা বলত, বস্তুর প্রকৃতি কোন প্রতিষ্ঠিত বিষয় নয় বরং তা আমাদের বিশ্বাস-নির্ভর। অর্থাৎ, তারা মনে করত- প্রত্যেক বস্তু তাই, আমরা যেটাকে যা মনে করি। যেমন: বৃক্ষকে আমরা মানুষ মনে করলে সেটাই মানুষ ইত্যাদি। এদেরকে বলা হয়, আত্মবিশ্বাসবাদী/আত্মকল্পনাবাদী (عندية)।

৩. যারা বলত, কোন্‌টার বাস্তব প্রকৃতি কী তা আমরা নিশ্চিত জানি না। বরং সবকিছুর মধ্যে আমাদের সন্দেহ রয়েছে। এমনকি তারা বলত, আমাদের সন্দেহের ব্যাপারেও আমাদের নিশ্চিত জানা নেই, বরং সন্দেহের ব্যাপারেও আমরা সন্দিহান (شاك في أنه شاك)। এদেরকে বলা হত, সংশয়বাদী (لاادرية)। ইলিসের পির্হো ছিলেন একজন সুসংবদ্ধ সংশয়বাদী। সংশয়বাদী দার্শনিকগণ মনে করেন- মানুষের পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান লাভ মোটেই সম্ভব নয়। তাদের মতে মানব-জ্ঞান আপেক্ষিক ও বিশেষ। আর এমন আপেক্ষিক ও বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা জগৎ-সত্তা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। প্রখ্যাত সংশয়বাদী হিউম মনে করেন- যা প্রত্যক্ষের বিষয়, তাকেই শুধু আমরা জানতে পারি। আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রীয় বা সংবেদনেই সীমাবদ্ধ। মন ও ঈশ্বর ইন্দ্রীয়গাহ্য নয় বলে সংশয়বাদীগণ তাদের সম্পর্কে (মন ও ঈশ্বর সম্পর্কে) কোনো জ্ঞান লাভ সম্ভব নয় বলে মনে করেন।

আদিতে যে দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল, তা ছিল নিতান্তই স্থূল। প্রাচীন দার্শনিক থেলিস, এ্যানাক্সিমেন্ডার, এ্যানাক্সিমিনিস সকলেই প্রকৃতির স্থূলরূপের মধ্যে তার শাশ্বত মূল তত্ত্বের সন্ধান করেছিলেন।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক থেলিস (Thales), এ্যানাক্সিমেন্ডার (Anaximender) ও এন্যানাক্সিমিনিস (Anaximenes) এই তিন দার্শনিক বাহ্য জগতের মূল রহস্য সন্ধানে তিনটা মতবাদ প্রচার করেন। দৃষ্টিগ্রাহ্য পৃথিবীর মূল উপাদান কী? এ প্রশ্নের উত্তরে থেলিস বলেন, 'পানিই' হচ্ছে সমস্ত বস্তুর মূল উপাদান। এ্যানাক্সিমিনিসের মতে তা হচ্ছে 'বায়ু' এবং এ্যানাক্সিমেন্ডার বলেন যে, এর নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই– এ হচ্ছে অনন্ত, অনির্দিষ্ট নিরাকার বস্তু। তিনি একে 'সীমাহীন' বলে উল্লেখ করেন। শাশ্বত সত্য আবিষ্কারে তাদের এ প্রয়াস নিতান্তই জড়মূলক।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে লিউকিপাস ও তার শিষ্য ডিমোক্রিটাস ছিলেন পরমাণুবাদী। তাদের পরমাণু দর্শনও ছিল জড়বাদী দর্শন। পরমাণূবাদীদের মতে সবকিছুর মূল উপাদান হল পরমাণূ। এই পরমাণু বা অবিভাজ্য অণু (الجزء الذي لا يتجزى) থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি। পরমাণূ হচ্ছে মৌলিকভাবে নির্গুণ। তবে তারা বলত, পরমাণুর ওজন রয়েছে এবং অনবরত মহাশূন্যে ভারী পরমাণুগুলোর উপর থেকে নিচে দ্রুত পতিত হওয়ার কারণে গতি এবং আবর্তের সৃষ্টি হয়। এ আবর্তের মাধ্যমেই সদৃশ

পরমাণুগুলো সদৃশ পরমাণুগুলোর সঙ্গে একত্রে মিলিত হয়। আর এসব পরমাণুর সংযোগেই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে পরমাণু মতবাদে জড়বাদী মতবাদের ন্যায় খোদার সৃষ্টিকর্তা হওয়ার বিষয়টি অস্বীকৃত হয়ে পড়ে।

এর পরবর্তী দার্শনিক হচ্ছে পীথাগোরীয়ান সম্প্রদায়। পীথাগোরীয়ান সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত দার্শনিক পীথাগোরাস (فيثاغورس/Phythagoras)। তাঁর মতে 'সংখ্যা'ই (Number) হচ্ছে যাবতীয় দ্রব্যের ও বাহ্য জগতের সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্ব। স্থূলরূপে প্রকাশমান জড়কে জগতের মূলতত্ত্ব না বলে তারা সংখ্যাকে মূলতত্ত্ব বলে গ্রহণ করে। তবে চিন্তার দিক দিয়ে অগ্রগতি সাধিত হলেও পীথাগোরীয়ানগণ জড়কে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেননি।

পীথাগোরীয়ানগণের পর ইলিয়াটিক্‌স দার্শনিকগণের আবির্ভাব। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের অনুসরণ করেই ইলিয়াটিক্‌সগণ জীবন-সত্তা (Being)কে মূলাধার বলে মনে করেন। জগৎ শুধু গুণ বা পরিমাণগতই নয়; গুণ ও পরিমাণ এ দুটো নিয়েই জগতের সৃষ্টি। আইওনীয় দার্শনিকগণ আদি-সত্তাকে গুণগত ও পরিমাণগত বলেই মনে করেন। অর্থাৎ, তাঁদের মতে জড়ই হচ্ছে আদি সত্তা। জড়ের গুণ এবং পরিমাণ উভয়ই আছে। কিন্তু পীথাগোরীয়ানগণ বস্তুর গুণগত দিকটাকে বাদ দিয়ে শুধু পরিমাণ বা সংখ্যার দিকটার প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করেন। ইলিয়াটিকসগণ এসে আবার বস্তুর পরিমাণ বা সংখ্যার দিকটাকেও সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেন। কারণ ইলিয়াটিকসগণ 'বহু'কে (Multiplicity) অস্বীকার করেন এবং 'বহু'কে অস্বীকার করার অর্থই হল পরিমাণকে অস্বীকার করা। ইলিয়াটিক্‌সগণ গুণ ও পরিমাণ (Quality and Quatilty) উভয়কে বাদ দিয়ে এক অনন্ত, অবিভক্ত, অবিভাজ্য জীবন সত্তা (Being)-এর অস্তিত্বকে গ্রহণ করে নেয়। আইওনীয় থেকে ইলিয়াটিক্‌সদের ক্রম-উত্তরণ ইন্দ্রীয় থেকে অতিন্দ্রীয়ের চিন্তাধারারই একটা প্রবহমান গতি। এসত্ত্বেও, ইলিয়াটিক্‌সগণ জড় থেকে নিজেদেরকে বিমুক্ত করতে পারছেন না। ইন্দ্রীয় বা অনুভূতির জগৎকে 'দৃশ্যমান' বা 'মায়া' বলে অস্বীকার করলেও 'মায়ার' জটিল পাক থেকে তাঁরা উদ্ধার পাচ্ছে না। 'প্রকৃত' এবং 'অবভাস' (Real and Appearance) এই দ্বৈত-সত্তা ইলিয়াটিকসদেরকে অক্টোপাশের ন্যায় আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

২. মধ্যযুগের কয়েকজন দার্শনিক ও তাদের দর্শনের বিশেষ কিছু ধারা

খৃষ্টপূর্ব ৪২০ অব্দ থেকে ৩২০ অব্দ পর্যন্ত যুগকে মধ্যযুগ বা সক্রেটিস দর্শনের যুগ বলা হয়। এই মধ্যযুগ বা সক্রেটিস দর্শনের যুগের প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে রয়েছেন সক্রেটিস (سقراط/Socraties), প্লেটো (افلاطون/Plato) প্রমুখ।

সফিস্ট আন্দোলনের যুগেই সক্রেটিসের[১] আবির্ভাব। আপনাকে জান (Know thyself)-এই ছিল তার নীতি। প্রত্যয় (Concept) থেকে সমস্ত জ্ঞানের উদ্ভব হয়,

১. সক্রেটিসের জন্ম এথেন্সে। প্রথম জীবনে তিনি ভাস্কর্যবিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে দর্শনালোচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি জাতীয় দেব-দেবীকে অস্বীকার করে নিজস্ব দেবমত প্রতিষ্ঠা করেন। এথেন্সের যুবকদেরকে ভ্রষ্ট করার অভিযোগে তাকে কারারুদ্ধ করে বিষপানে তার মৃত্যু ঘটানো হয়।

সংবেদন থেকে নয়। প্রজ্ঞা[১] হল প্রত্যয়[২] বা সার্বিক ধারণার ধী-শক্তি (faculty)। সমস্ত জ্ঞানকে প্রত্যয়ের উপর ছেড়ে দিয়ে সক্রেটিস প্রজ্ঞাকেই জ্ঞানের মুখপত্র হিসাবে ধরে নেন। এখানেই সফিস্টস্ বা তার্কিক গোষ্টির সঙ্গে সক্রেটিসের মূল পার্থক্য। যেখানে তার্কিক গোষ্ঠী ইন্দ্রীয়ানুভূতি বা সংবেদনকে জ্ঞানের প্রধান উপায় হিসাবে ধরে নেন, সক্রেটিস সেখানে প্রজ্ঞা বা বোধ-কে (Understanding) জ্ঞানের প্রধান উৎস হিসাবে ধরে নেন। সক্রেটিসের মতে আবেগ, অনুভূতি দ্বারা নয় বরং সবকাজই প্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত হয়। তার মতে বিজ্ঞতা, পরিণামদর্শিতা, সদিচ্ছা, দয়া প্রভৃতি যাবতীয় পূণ্যের উৎপত্তি ঘটে জ্ঞান থেকে। জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যের ভেতরই লুকিয়ে থাকে অন্যসব পূণ্য। তার মতে জ্ঞান অর্থাৎ, পাণ্ডিত্য হল চরম পূণ্য যা অন্যসব পূণ্যকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। এটাকে সক্রেটিসের "জ্ঞান- মতবাদ" বলা হয়। আর একটা রয়েছে সক্রেটিসের নীতি-দর্শন। এই নীতি-দর্শনেও সক্রেটিস জ্ঞান ও ইচ্ছাকেই প্রধান নিয়ামক হিসাবে মূল্যায়ন করেছেন। তার মতে মানুষ যতই চিন্তা করবে এবং বুঝতে চাইবে, ততই সে কর্তব্য পালন করতে পারবে। মানুষের অনুভূতি ও সংবেদনের দিকটা-কে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র প্রজ্ঞাকে প্রাধান্য দেয়ায় তার নীতি-দর্শনও সমালোচনা থেকে মুক্তি পায়নি।

সক্রেটিসের সমালোচনা করতে গিয়ে এরিস্টটল বলেন যে, সক্রেটিস মানবাত্মার ভাবাবেগ, অনুভূতি এবং সংবেদনের দিকটাকে একেবারে অবহেলা করেছেন, কিংবা আদৌ এ দিকটা আলোচনা করতে ভুলে যান। সক্রেটিস ভুলে যান যে, সাধারণ মানুষের কাজগুলো প্রায়শই আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে পরিচালিত। এরিস্টটলের সমালোচনা সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় মানুষ একটা কাজকে অন্যায় জেনেও ইচ্ছাকৃতভাবে সেই অন্যায় কাজটা করে।

সক্রেটিসকে আস্তিক বলা যায়, তবে ইসলামের গ্রহণযোগ্য অর্থে আস্তিক নয়। কেননা তিনি যদিও মনে করতেন তার সব কর্মের মূলে এক বিরাট শক্তি ইন্ধন যোগাচ্ছেন, তবে তিনি এ শক্তিকে দৈত্য বা ডেমন্ (Demon) নামে অভিহিত করতেন। উল্লেখ্য- ইংরেজি Demon শব্দটি "দৈত্য" অর্থ ছাড়াও শয়তান, ভূত, প্রেত, নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর লোক ইত্যাদি নেতিবাচ্যতামূলক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অথচ ইসলাম যে খোদার রূপরেখা প্রদান করে তাঁর ক্ষেত্রে এরূপ ধারণা প্রযোজ্য নয়।

মধ্যযুগের দার্শনিকদের মধ্যে সক্রেটিসের পর প্লেটো[৩] বিখ্যাত দার্শনিক। গবেষকদের মতে প্লেটোই একটা সুস্পষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন দিয়ে যেতে পারেন।

১. প্রজ্ঞা হল সার্বিক ধারণার ধী-শক্তি। প্রজ্ঞা অবরোহ এবং আরোহ-এই দু' পদ্ধতিতে হতে পারে। দেখুন পরবর্তী পৃষ্ঠার টীকা নং ২।
২. প্রত্যয়, সার্বিক ধারণা ও সামান্য ধারণা সমার্থবোধক। দেখুন পরবর্তী পৃষ্ঠার টীকা নং ১।
৩. আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৪২৯-৭ অব্দে এক এথেনীয় পরিবারে প্লেটোর জন্ম এবং খৃষ্টপূর্ব ৩৪৭ অব্দে ৮২ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

সক্রেটিসের 'প্রত্যয়'-ই[১] প্লেটোর ধারণা। সক্রেটিসের প্রত্যয়-কে ভিত্তি করেই প্লেটো তাঁর সামান্যবাদ[২] (Theoty of Ideas) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সামান্যগণ অবিনশ্বর এবং সনাতন। জাগতিক বস্তুজাত তাদেরই নশ্বর প্রতিবন্ধ-এই ছিল তাঁর মত। এরিস্টটল (ارسطو/ارسطاطالیس/Aristotle) প্লেটোর সামান্যবাদ গ্রহণ করেন নি। তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন বিশেষের উপর। বিশেষকে (Particular) তিনি সত্য বলে গ্রহণ করে আরোহ পদ্ধতির[৩] মাধ্যমে সামান্যে (کلیہ/Universal) উপনীত হয়েছেন। এরিস্টটল প্লেটোর সামান্যবাদ গ্রহণ না করলেও তাঁর 'রূপ'[৪] ও প্লেটোর সামান্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। বিশেষের বাইরে রূপের অস্তিত্ব নেই, এই মাত্র প্রভেদ। প্লেটো ও এরিষ্টটল উভয়েই বস্তুর অভৌতিক সারভাগকে দর্শনের বিষয় বলে গণ্য করেছিলেন এবং বস্তুর বাহ্য প্রকাশ থেকে এই সার (Essence), রূপ উভয়েই

১. প্রত্যয়, সার্বিক ধারণা ও সামান্য ধারণা সমার্থবোধক। দেখুন পরবর্তী পৃষ্ঠার টীকা নং ১।
২. 'সামান্যবাদ' শব্দটি সামান্য থেকে উদ্ভূত। কোন শ্রেণী বা জাতিসকলের মধ্যে যে সাধারণ ও আবশ্যক গুণ বিদ্যমান থাকে, তাদের সমষ্টিকে সার্বিক বা সামান্য ধারণা বলে। সার্বিক ধারণা জাতি নামের মানসিক প্রতিরূপ। স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, সামান্য ধারণা জাতি বা শ্রেণীর বেলায় ব্যবহার- যোগ্য; ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের বেলায় নয়। 'মানুষ' ধারণাটি একটি সার্বিক বা সামান্য ধারণা। কারণ, সমগ্র মানুষ-শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ ও আবশ্যিক গুণ নিয়েই 'মানুষ' ধারণাটি গঠিত। এখানে মানুষ বলতে কোন ব্যক্তি মানুষকে না বুঝিয়ে সমস্ত মানুষ শ্রেণীকেই বুঝায়। –গ্রিকদর্শন : প্রজ্ঞা ও প্রসার
৩. "আরোহ" ও "অবরোহ" দু'টি বিশেষ পরিভাষা। বিশেষ কয়েকটি দৃষ্টান্ত বা ঘটনা (جزئیہ) কে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করে যখন আমরা একটা সমগ্র সার্বিক সিদ্ধান্ত (کلیہ)-তে উপনীত হই, তখন সেটাকে বলা হয় 'আরোহ' (استقرا)। আর এর বিপরীত অর্থাৎ, আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে উপনীত সমগ্র সার্বিক সিদ্ধান্ত (کلیہ) কে যখন কোনো ব্যক্তি বিশেষ (جزئیہ)-এর বেলায় প্রযোজ্য করি, তখন সেটা হয় অবরোহ (قیاس)। যেমন: ওমর, বকর, যায়েদ নামক কয়েক ব্যক্তির মৃত্যুকে পর্যবেক্ষণ করে যখন আমরা একটা সমগ্র সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, "সব মানুষই মরণশীল", তখন সেটা হয় আরোহ পদ্ধতি। আর "সব মানুষই মরণশীল"-এই সমগ্র সার্বিক ধারণা থেকে যখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, 'খালেদও মরণশীল', তখন সেটা হয় অবরোহ পদ্ধতি।
৪. 'রূপ' বা 'আকার' একটি পরিভাষা। এরিস্টটলের মতে বস্তুর প্রকৃতি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, তার মধ্যে দুটো দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে তার জড়ের দিক, অন্যটি তার রূপ বা আকারের দিক। এরিস্টটলের মতে 'আকার' (Form) হল দ্রব্য, বস্তুর মূলতত্ত্ব। এ আকার নিত্য বা অপরিবর্তনীয়। জগতের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে এ আকারের মূর্ত সম্পর্ক রয়েছে। জগতে যে কোন বস্তুর পরিবর্তন লক্ষ করলেই এ সত্য ধরা পড়ে। প্রথমত প্রতিটি বস্তুতে একটা কিছু পরিবর্তিত হচ্ছে এবং দ্বিতীয়ত এই একটা কিছু কোনো একটা কিছুতে পরিবর্তিত হচ্ছে। তাকেই এরিস্টটল নাম দিয়েছেন জড় (Matter) এবং যে অন্তর্নিহিত শক্তি এই একটা কিছুকে (জড়কে) নির্দিষ্ট কোনো পথে চালিত করছে, তার নাম হলো আকার (বা রূপ)। যেমন: বট-বীজ হচ্ছে বটবৃক্ষের জড়। বট-বীজের অন্তর্নিহিত শক্তি যা বট-বীজকে বটবৃক্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা হল বটবৃক্ষের আকার বা রূপ (ہیولی)।

দেহাধিষ্ঠিত চৈতন্যকে দেহ হতে ভিন্ন বলেছিলেন। উভয়ের মতেই মানুষের মধ্যে এবং প্রকৃতির মধ্যে উভয় এই বিশেষের মধ্যে আদর্শ প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকৃতির সৃষ্টিশক্তি উপাদানকে (Matter) স্বকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রূপের অধিষ্ঠানরূপে ব্যবহার করছে এবং তার মধ্যে রূপকে প্রকাশ করছে। মানুষের উচ্চতার প্রকৃতি, (তার প্রজ্ঞা) বিকাশ-প্রাপ্ত হয়ে নিম্নতর প্রকৃতিকে শাসন করতে চাচ্ছে। সক্রেটিসের পূর্বে গ্রীক-দর্শনে এরূপ কোন মতের অস্তিত্ব ছিল না।

এরিস্টটল প্লেটোর দর্শনকে তর্ক (Logic), ভৌতিক বিজ্ঞান (Physics) ও চরিত্রনীতি (Ethics)-এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। এ ছাড়াও রয়েছে প্লেটোর জ্ঞান-মতবাদ। প্লেটো প্রোটাগোরাস ও সফিস্টদের ব্যক্তি অনুভূতির জ্ঞান হওয়ার মতবাদকে অস্বীকার করতেন। প্লেটোর এই জ্ঞান-মতবাদের ওপর গড়ে ওঠে তার ভাববাদ[১]।

প্লেটো একত্ববাদী না বহুশ্বরবাদী– এ প্রসঙ্গে 'গ্রিকদর্শন : প্রজ্ঞা ও প্রসার' গ্রন্থের লেখক লিখেছেন– প্লেটো অনেকবার অনেক জায়গায় ভগবান শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কখনও একবচনে কখনও বহুবচনে। ভগবানকে একবচনে ও বহুবচনে ব্যবহার করার সুবিধে হল যে, প্লেটো এর মারফতে অতি সহজেই একেশ্বরবাদ থেকে বহুশ্বরবাদে চলে যেতে পারেন। বহু দেবত্ববাদ ব্যতিরেকেও তিনি জগতের এক পরম সৃষ্টিকর্তার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন।[২]

'বিবর্তনবাদ ও স্রষ্টাতত্ত্ব' গ্রন্থকার বলেন, প্লেটো খোদা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন। তার কিছু গ্রহণযোগ্য, কিন্তু কিছু মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি খোদাকে ভালোর (মঙ্গলের) ধারণা বলেছেন। আবার কখনও খোদাকে ভালোর ধারণার নিম্নবর্তী একটি সত্তা বলেছেন। আর খোদা একটি সম্পূর্ণ (Perfect) বিশ্ব সৃষ্টি করতে পারেন-নি, (কারণ তিনি নিজেই ভালোর নিম্নবর্তী একটি সত্তা) তিনি আবার বলেন যে, খোদার সঙ্গে সঙ্গে পদার্থও সময়কালীন। আর পদার্থ খোদার কর্মকে বাধা প্রদান করে। কখনও কখনও প্লেটো খোদাকে ভালোর ধারণার চেয়ে উন্নত মনে করেন।[৩]

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলাম প্রদত্ত খোদা-ধারণা অনুসারে খোদা কোনক্রমেই ভালোর নিম্নবর্তী সত্তা হতে পারেন না। যিনি সর্বগুণে গুণান্বিত, সর্বময় ক্ষমতা ও সর্বময় কল্যাণময়তার অধিকারী তিনি মঙ্গলের নিম্নবর্তী সত্তা হন কীভাবে? তদুপরি পদার্থ আর খোদা কখনও সমপর্যায়ের হতে পারে না। পদার্থ হল খোদার সৃষ্টি, আর স্রষ্টা ও সৃষ্টি কখনও সমপর্যায়ের হতে পারে না।

---

১. ভাববাদের সারকথা হল - জ্ঞেয় বস্তু মন বা চেতনার উপর নির্ভরশীল। মন বা চেতনাই পরম সত্য ও সত্তা। জাগতিক বস্তুগুলোর মন-নিরপেক্ষ কোন সত্তা নেই। মন ব্যতিরেকে বিষয় বা বস্তু ভাবাই যায় না। বাহ্য বস্তু সসীম বা অসীম মনের বিষয়বস্তুরূপে বিদ্যমান। এ মতবাদের নাম ভাববাদ। -গ্রিকদর্শন : প্রজ্ঞা ও প্রসার

২. পৃষ্ঠা নং ৮৯, লেখক: মোহাম্মাদ আবদুল হালিম, প্রকাশনায়: বাংলা একাডেমী, মুদ্রণ ২০০১।

৩. পৃষ্ঠা নং ২৫০।

এরিস্টটলের দর্শনের মূল বিষয় হল উপাদান ও রূপ। এ উপাদান ও রূপ নিয়ে এরিস্টটল সমগ্র জগতকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এরিস্টটলের মতে জগতে রূপ বর্জিত কোনো জড় নেই আবার জড় বিবর্জিত কোনো রূপ নেই। জড় ও রূপ অবিচ্ছিন্ন, একেকে ছেড়ে অপরের নিরপেক্ষ সত্তা কল্পনাহীন। জগতের সমস্ত বস্তুই রূপ ও জড়ের যৌগিক ফল। এরিস্টটলের রূপ স্বাধীন সত্তা নিয়ে বিরাজ করে না। খোদা/ঈশ্বর ভাবনার ক্ষেত্রেও এরিস্টটলের এই রূপ-ভাবনা কার্যকরী। তার মতে খোদা/ঈশ্বর হল চরম রূপ। যিনি সমস্ত গতি ও সৃষ্টির আদি কারণ।

আপাতদৃষ্টিতে এরিস্টটলের খোদা-দর্শন গ্রহণযোগ্য বলেই অনুভূত হয়। কেননা খোদা এমন এক সত্তা, যিনি সমস্ত জগতের মূল কারণ। কিন্তু এরিস্টটল খোদাকে চরম রূপ বলে আখ্যায়িত করেছেন, আর তার বর্ণিত "রূপ" স্বাধীন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত নয়। অথচ ইসলাম প্রদত্ত খোদা ধারণায় আল্লাহ্ তাঁর স্বাধীন সার্বভৌম সত্তা নিয়ে সদা সর্বদা প্রতিষ্ঠিত ও কায়েম।

৩. শেষ যুগের কয়েকজন দার্শনিক ও তাদের দর্শনের বিশেষ কিছু ধারা

গ্রীক-দর্শনের শেষ যুগ হল এরিস্টটল পরবর্তী দর্শন-যুগ। খৃস্টপূর্ব ৩২০ থেকে ৫২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই যুগ বিস্তৃত। এথেন্স, রোম, আলেকজান্দ্রিয়া এই দার্শনিকদের কেন্দ্রস্থল। এই শেষ যুগ বা এরিস্টটলের পরবর্তী দর্শনের যুগের প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে রয়েছেন জেনো (Zeno), এপিকিউরাস (Epicurus) প্রমুখ।

গ্রীক দর্শনের শেষ যুগে ধর্মীয় এবং নৈতিক এই দুই ধারা দর্শন-চিন্তায় আলোচিত হতে আরম্ভ করে। 'সততাই মানব-জীবনের পরমার্থ- এই নীতিতে জেনো (Zeno) স্টোয়িক (Stoic) দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। জেনো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক সম্প্রদায়কে স্টোয়িক[১] সম্প্রদায় বলা হত। জেনো ছিলেন বৈরাগ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তার মতে ঘটনা মাত্রই স্বভাব বা নিয়তির অধীন। আর স্বভাব বা নিয়তির মূলে অনন্ত প্রজ্ঞা। বিশ্বব্যাপী একমাত্র বিধি নিত্য বিরাজমান। সৃষ্টি মাত্রই এ বিধির অনুবর্তন করতে বাধ্য। এ বিধির বিধানে মানবের বুদ্ধি বিবেক নিয়ন্ত্রিত। এটাই ছিল জেনোর তত্ত্ব দর্শনের প্রকৃত কথা। এভাবে স্টোয়িক দর্শনে ইসলামের বিধিবদ্ধ খোদার ধারণা অস্বীকৃত হয়েছে। স্টোয়িকদের মতে জগৎ স্থিত প্রজ্ঞাবাদ খোদা/ঈশ্বরের প্রকাশ।

এপিকিউরাস (Epicurus) 'সুখ মানুষের একমাত্র কাম্য' বলে এপিকিউরীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। এপিকিউরীয় দার্শনিকবৃন্দ জড়বাদী (Materialistic) এবং যান্ত্রিকবাদী ছিলেন। ইন্দ্রীয়-প্রত্যক্ষ এপিকিউরাসের জ্ঞানতত্ত্বের মূল ভিত্তি ছিল। তার মতে ইন্দ্রীয় প্রত্যক্ষণই যথার্থ জ্ঞানের উৎস। আমরা যা দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, স্বাদ

---

১. স্টোয়িক (Stoic) শব্দটি থেকে উৎপন্ন। তার অর্থ অলিন্দ। এথেন্সে জেনোর চিত্র শোভিত অলিন্দে তার শিষ্যগণ দর্শন শেখার জন্য আগমন করত বিধায় এরূপ নামকরণ হয়েছে। তার শিষ্যদেরকে 'স্টোয়ার দার্শনিক' বলা হত। তাদের দর্শন 'স্টোয়িক দর্শন' নামে অভিহিত।

ভোগ করি তাই বাস্তব ও সত্য। এপিকিউরীয়গণ কোন বিমূর্ত গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাদের এ দর্শন থেকেই তারা প্রচলিত খোদায়ী বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেন। এপিকিউরাসের মতে খোদা/ঈশ্বর মানুষের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। মানুষের উপর তাদের কোন আধিপত্যও নেই। তিনি খোদা/ঈশ্বরে বিশ্বাসকে কুসংস্কার মনে করতেন।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্লেটোনিকবাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গ্রিক দর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটে।[১]

বিবর্তনবাদ

জগতের উৎপত্তি কীভাবে হল- এ সম্পর্কিত প্রশ্নের সমাধানে প্রধানত দুই ধরনের মতবাদ পরিলক্ষিত হয়, সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবর্তনবাদ। যারা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী, তাঁদের বিশ্বাস হল সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে জগতের সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণে জগৎ ধাপে ধাপে এগিয়ে চলছে, পরিবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে বিবর্তনবাদে বিশ্বাসীরা মনে করে জগৎ এরূপ কোন অতিপ্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নয় বরং বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে, বিবর্তনের মাধ্যমেই এগিয়ে চলছে। তাদের ধারণায় বিবর্তন হচ্ছে একটি সুশৃংখল পরিবর্তন। ধাপে ধাপে সেটা অগ্রসর হচ্ছে এবং ক্রমশ অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিবর্তনবাদের শ্রেণী বিভাগ

১. উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনবাদ।
২. উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ।
৩. সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ।
৪. যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ।

এর মধ্যে যান্ত্রিক বিবর্তনবাদটি সমকালীন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বিশেষ স্থান দখল করে আছে। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ অনুসারে বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করে- জগতের বিবর্তনের মূলে কোন প্রকার উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনার স্থান নেই; বরং জড়, গতি ও শক্তির অন্ধ আলিঙ্গনে জগত প্রতিনিয়ত এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হচ্ছে। আর এই পরিবর্তন কোন বিশৃংখল পরিবর্তন নয়, বরং একটি সুশৃংখল প্রক্রিয়া। এটাকে

১. এক নজরে গ্রীক-দর্শন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের সূত্র:
(১) বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ও মোহাম্মাদ আবদুল হালিম কর্তৃক রচিত "গ্রিকদর্শন : প্রজ্ঞা ও প্রসার"
(২) তারকচন্দ্র কর্তৃক রচিত "পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস"
(৩) তাফতাযানী রচিত شرح عقائد
(৪) মুহাম্মাদ সিদ্দিক রচিত বিবর্তনবাদ ও স্রষ্টাতত্ত্ব, প্রকাশনায় মদীনা পাবলিকেশান্স, প্রভৃতি।

যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়। বিবর্তন প্রক্রিয়ার এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যা জড়জগৎ ও প্রাণী জগত উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রথম ক্ষেত্রের যান্ত্রিক বিবর্তনকে জড়জগৎ সম্পর্কিত বিবর্তনবাদ এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রের বিবর্তনবাদকে প্রাণীজগৎ সম্পর্কিত বিবর্তনবাদ বলা হয়। জড়জগৎ সম্পর্কিত বিবর্তনবাদের প্রবক্তা হল বৃটিশ দার্শনিক হারবাট স্পেন্সার। আর প্রাণীজগৎ সম্পর্কিত বিবর্তনবাদের প্রবক্তা হল চার্লস ডারউইন। সাধারণ ভাবে বিবর্তনবাদ বলতে ডারউইনের বিবর্তনবাদকেই বোঝা হয়ে থাকে।

হারবাট স্পেন্সারের জড়জগত সম্পর্কিত বিবর্তনবাদ

এই বিবর্তনবাদের প্রবক্তা হল দার্শনিক হারবাট স্পেন্সার। তিনি ১৮২০ সালে বৃটেনের ডার্বিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে তার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ First Principles (প্রথম মূলনীতি) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি জড়জগৎ সম্পর্কিত বিবর্তনবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন। স্পেন্সারের জড়জগৎ সম্পর্কিত এই যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ "নিহারিকা প্রকল্প" (Nebular hypothesis) নামে পরিচিত। তার মতে গোটা মহাবিশ্ব জড় উপাদান দ্বারা গঠিত হয়েছে। জগতের আদি উপাদানগুলো নিহারিকার মত উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ আকারে মহাশূন্যে ভাসমান ছিল। সেই জড় উপাদানগুলো ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তাদেরকে একত্রে মেঘের মত দেখাত। মেঘের মত ভাসমান সেই নিহারিকার মধ্যে যে জড় উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাদের মধ্যে ছিল গতি ও শক্তি। এই গতি ও শক্তির প্রভাবে তারা ছিল ঘূর্ণায়মান। এ সকল জড় উপাদান নিহারিকার কেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তিত হত, আবার নিজে নিজেও ঘুরত। ক্রমশ ঘুরতে ঘুরতে জড় উপাদানগুলো নিহারিকার কেন্দ্রের দিকে আসতে লাগল এবং এক পর্যায়ে নিহারিকার কেন্দ্রে তা ঘনীভূত হতে লাগল। নিহারিকার যত কাছাকাছি তারা আসল, তাদের গতিবেগ তত দ্রুত হতে থাকল। এক সময় তারা নিহারিকার কেন্দ্র থেকে হঠাৎ করে ছিটকে দূরে পড়ে গেল। তবে কেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণের প্রভাবে কেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকল। এরা হল গ্রহ। আবার গ্রহের নিজস্ব আবর্তনের কারণে তা থেকেও কোন কোন অংশ দূরে নিক্ষিপ্ত হল এবং তা ঐ গ্রহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকল। এভাবে সৃষ্টি হল উপগ্রহ। মূল নিহারিকার কেন্দ্রে যে অংশ বিদ্যমান ছিল তা হল সূর্য। এভাবে স্পেন্সার দেখাতে চান গোটা সূর্য এবং এর মধ্যে সকল বস্তু নির্ভয় এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জড় থেকে বিবর্তিত হয়েছে। এটাকেই বলা হয়ে থাকে জড়জগৎ সম্পর্কিত যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ।

হারবাট স্পেন্সারের জড়জগৎ সম্পর্কিত যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের বিশেষ ত্রুটিসমূহ

১. তিনি নিহারিকা সাদৃশ্য জড়িয় অবস্থাকে জগতের আদি উপাদান বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই আদি উপাদানগুলো কোত্থেকে আসল বা পূর্বে এগুলো কোন অবস্থায় ছিল এর ব্যাখ্যা তার মতবাদে পাওয়া যায় না। তাই এক্ষেত্রে তার মতবাদ অজানা বা অজ্ঞেয়বাদের স্বীকার।

২. স্পেন্সারের মতে গতি ও শক্তির মাধ্যমে জগতের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ আদি নিহারিকা থেকে আলাদা হয়েছিল। তাদের মধ্যে গতি ও শক্তির কারণ কী, গতি ও শক্তি কোত্থেকে এল– এসব প্রশ্নের উত্তর তার মতবাদ দিতে পারেনি।

৩. স্পেন্সার জড়জগতের জাগতিক প্রক্রিয়ার ধারাভাষ্য পেশ করেছেন বটে, কিন্তু তিনি তার স্বপক্ষে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতামূলক বা গণিতিক প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেননি। এ সবের প্রেক্ষিতে স্পেন্সার সম্পর্কে হেনরী বার্গসোঁ মন্তব্য করেন যে, স্পেন্সার যেন জোড়াতালিই দিয়েছেন মাত্র, কিন্তু কোনো কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারেননি।[১]

ডারউইনের প্রাণীজগৎ সম্পর্কিত বিবর্তনবাদ

এ মতবাদটিকে বলা হয় ডারউইনের প্রাণী জগৎ সম্পর্কিত বিবর্তনবাদ বা জৈবিক বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution)। এই মতবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইন ছিলেন একজন বৃটিশ দার্শনিক। তিনি একজন জীববিজ্ঞানী ছিলেন। ১৮০৯ সালে বৃটেনে তার জন্ম হয়। জীববিজ্ঞান শেখার পর তিনি বিভিন্ন উদ্ভিদ ও পশু-পাখি সম্পর্কে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেন এবং এগুলোর ওপর গবেষণা করে জীবজগতের উৎপত্তি, বিকাশ ও অস্তিত্বের ব্যাপারে এক ধরনের অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তার গবেষণাপ্রসূত এই অভিনব সিদ্ধান্তই হল প্রাণীজগত সম্পর্কিত বিবর্তনবাদ বা জৈবিক বিবর্তনবাদ। ১৮৫৯ সালে Origin of Specis (প্রজাতির উৎপত্তি) নামক গ্রন্থে প্রাথমিকভাবে তিনি তার গবেষণার ফল প্রকাশ করেন। এর এক যুগ পর ১৮৭১ সালে Decent of Men (মানুষের আগমন) নামক অপর একটি গ্রন্থের মাধ্যমে তার এ মতবাদকে আরও প্রসারিত করেন।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের সারকথা

১. ডারউইনের মতে আমরা বর্তমানে যে সকল বৈচিত্রময় প্রাণীকূল লক্ষ করছি তাদের উৎপত্তি কোন এক বিশেষ সময় হয়নি, বরং একটা দীর্ঘ সময় ধরে পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের মাধ্যমে জীবকূল এ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

২. এমনকি মানুষও এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফসল। ডারউইন মনে করেন- মানুষের আবির্ভাব হয়েছে নিম্ন শ্রেণীর জীব থেকে ধীরে ধীরে এক দীর্ঘক্রমিক বিবর্তনের মাধ্যমে। তার মতে নিম্ন শ্রেণীর জীব উন্নতি লাভ করে এক পর্যায়ে বানরের সীমারেখায় উপনীত হয় অতঃপর তা তাদের আকার পরিবর্তন করে মানুষে পরিণত হয়।

৩. এই বিবর্তনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ধারা বা পর্যায় অতিবাহিত হয়েছে; তবে গোটা প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে প্রাকৃতিক, কোন অতি প্রাকৃতিক হস্তক্ষেপ এখানে নেই। কোন উদ্দেশ্যবাদিতার অবকাশ এখানে নেই, বরং বিষয়টি আগাগোড়া যান্ত্রিক।

---

১. "সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা" গ্রন্থ, লেখক ঢাকা তেজগাঁও কলেজের প্রভাষক মোঃ শওকত হোসেন- অবলম্বনে লিখিত।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের বৈশিষ্ট্য

ডারউইন তার জীবজগৎ সম্পর্কিত যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ তত্ত্বে জীবের আবির্ভাব, অগ্রগতি ও বিনাশ সাধনের ক্ষেত্রে কিছু পর্যায় বা ধাপের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলোকে তার বিবর্তনবাদের বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। তার বিবর্তনবাদ বোঝার জন্য এ বৈশিষ্ট্যসমূহ বুঝা আবশ্যক।

১. আত্ম বিভাজনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি

ডারউইনের মতে জগৎ সংসারে প্রাথমিকভাবে এক ধরনের জীবনের উৎপত্তি ঘটে। এ ছিল এক ধরনের এককোষী জীব। তবে এমন হতে পারে এটা ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন। এই আদিম এক বা একাধিক কোষ নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করে দুই কোষ সৃষ্টি হয় এবং দুই কোষ আবার বিভক্ত হয়ে আরও দুটি করে জীবকোষ সৃষ্টি হয়। এভাবে ক্রমশ জগৎ সংসারে বহু কোষের আবির্ভাব ঘটে। এবং এসব জীবকোষগুলো থেকে বংশবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে ডারউইন "আত্মবিভাজনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি" (Multiplication by cell division) বলে চিহ্নিত করেছেন।

২. আকস্মিক পরিবর্তন

ডারউইনের মতে প্রতিটি জীবকোষই পরিবর্তনশীল। তারা বিভাজন প্রক্রিয়ার পর যে অবস্থায় পরিণত হয় সে অবস্থায় থাকে না। আর জীবকোষগুলো দেখতে সরল হলেও মূলত বেশ জটিল প্রকৃতির। কখনও কখনও এই জটিল প্রকৃতির জীবকোষের মধ্যে দেখা দেয় আকস্মিক পরিবর্তন (Fortuinous of charce variation)। এই পরিবর্তন জীবদেহেও পরিবর্তনের সূচনা করে। এভাবে জীবকোষগুলো ক্রমশ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জীবদেহে বিবর্তিত হতে থাকে। জীবকোষের মধ্যে তখন বিভিন্ন রকমের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়ে উঠতে থাকে। তবে এই যে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা কিন্তু কোন উদ্দেশ্যমূলকভাবে গড়ে ওঠে না। বলা হয়েছে যে, এই প্রক্রিয়াটি একটি আকস্মিক পরিবর্তন। তাই হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আকস্মিকভাবেই গড়ে ওঠে এবং এগুলো উদ্ভবের পরে এগুলোর এক একটির কার্য নির্ধারিত হয়। ডারউইনের মতে চোখের সৃষ্টির পরই তা দেখার কাজে নিযুক্ত হয়, কানের সৃষ্টির পরই তা শ্রবণ করার কাজে নিযুক্ত হয়। এভাবে প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আকস্মিকভাবে সৃষ্টির পর প্রয়োজন দেখা দেয়ায় নিজ নিজ কাজে তারা নিযুক্ত হয়। তিনি বলেন, এরূপ যে পরিবর্তন জীবদেহের অনুকূল হয় সে জীবগুলো টিকে থাকে, আর যা জীবদেহের প্রতিকূল হয় তার প্রজাতি লোপ পেতে থাকে।

৩. বংশানুক্রমে অর্জিত পরিবর্তন সঞ্জাত বৈশিষ্ট্যের সংক্রমণ

আকস্মিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবদেহ যে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী লাভ করে থাকে তা বংশানুক্রমিকভাবে সংক্রমিত হয়। বংশানুক্রমিকভাবে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের এই সংক্রমণকে বলা হয় Transmission of acquired characters by heredity। এই সংক্রমণের দ্বারা পরিবর্তনের মাত্রা বিভিন্ন মাত্রায় হতে পারে।

তাই সংশ্লিষ্ট জীবের পূর্বপুরুষের মধ্যে দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী যেমন ছিল সংক্রমণের দ্বারা ঠিক তেমনটিই থাকবে তা নয়। তবে এই সংক্রমণ সবক্ষেত্রে সুবিধাজনক হয় না। কোন কোন জীবের মধ্যে সেটা খাপ খায় আবার কোন কোনটার মধ্যে সেটা খাপ খায় না। খাপ খেলে সে প্রজাতিটি বেঁচে থাকে, আর খাপ না খেলে সে প্রজাতিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৪. অস্তিত্বের লড়াই

পৃথিবীতে প্রজাতির সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। কিন্তু প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পৃথিবীর খাদ্যদ্রব্যের সংখ্যা সে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তাই প্রকৃতিতে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। আর প্রতিটি প্রজাতিকে বেঁচে থাকতে হলে খাবার সংগ্রহ করতে হয়। ডারউইন মনে করেন- তাই সীমিত খাবারের জন্য প্রাণীকূলের মধ্যে বেধে যায় তুমুল প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতা এত তীব্র হয় যে, তা দ্বন্দ্বের আকারে প্রকাশ পায়। ডারউইন এই দ্বন্দ্বের নাম দিয়েছেন জীবন সংগ্রাম বা অস্তিত্বের সংগ্রাম (Struggle for existence)।

৫. যোগ্যতরের বাঁচার অধিকার

প্রাণীকূলের জীবন মানেই সংগ্রাম। তবে জীবন সংগ্রামে সব প্রজাতিই জয়ী হয় না, কিছু কিছু প্রজাতি হেরে যায়। যারা জয়লাভ করে তারা টিকে থাকে, আর যারা হেরে যায় তারা ধ্বংস হয়। জগৎ সংসারে তাই একমাত্র যোগ্যতমদেরই রয়েছে বাঁচার অধিকার।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের ত্রুটিসমূহ

"সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা" গ্রন্থকার বলেন, "ডারউইনের মতবাদের যে সকল বিশেষ বিশেষ ত্রুটি উল্লেখ করার মত তা হল−

১. ডারউইন তার বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রথমেই এক কোষী জীবের কথা স্বীকার করেন। তার মতে সেই এক কোষ ভেঙ্গে বহুকোষের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু এই কোষ কীভাবে সৃষ্টি হল এর যথার্থ কোন ব্যাখ্যা ডারউইনের মতবাদে পাওয়া যায় না।

২. ডারউইন তাঁর বিবর্তন প্রক্রিয়ার সূচক আদি কোষের উৎপত্তির ক্ষেত্রে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সম্ভবত ঈশ্বর একে সৃষ্টি করে থাকতে পারেন। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে তার মতবাদের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেয়ার দরকার কী ছিল? ঈশ্বর যদি আদি কোষ সৃষ্টি করতে পারেন, তবে সে ক্ষেত্রে তাঁর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু ডারউইন তাঁর বিবর্তনবাদকে উদ্দেশ্যহীন এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই তাঁর মতবাদ স্ববিরোধিতায় পর্যবসিত হয়েছে।

৩. ডারউইন জীবকোষের যে আকস্মিক পরিবর্তনের কথা বলেছেন, তা কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক ব্যাখ্যা হতে পারে না। কেননা কোন কিছুকে আকস্মিক বলা মানেই হল সে বিষয়টিকে যুক্তি দ্বারা প্রমাণের প্রচেষ্টা না করে তাকে সরাসরি এড়িয়ে

যাওয়া। তাছাড়া বিজ্ঞান কখনও আকস্মিকতায় বিশ্বাস করে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ আবশ্যক।

৪. ডারউইনের মতবাদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি যেন কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান না করে হয় শুধু প্রকল্প প্রণয়ন করেছেন অথবা কোন প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন, তা না হলে তিনি বিবর্তনের পুরো ব্যাপারগুলো দেখেছেন। এটা এজন্য বলা চলে, কেননা ডারউইনের আলোচনার ভঙ্গিমা দেখে মনে হয়েছে তিনি যেন সবকিছুকে প্রমাণের অপেক্ষাধীন রাখতে চান না। তাছাড়া অপর্যাপ্ত প্রমাণের উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও ডারউইনকে আমরা বেশ নিশ্চিত ভঙ্গিতে তাঁর মতবাদ ব্যক্ত করতে দেখি।

৫. ডারউইন তাঁর জৈবিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বংশানুক্রমিকভাবে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের সংক্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ তত্ত্ব বর্তমান জীববিজ্ঞানে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে জীববিজ্ঞানী ভাইসম্যান প্রমাণ করেছেন যে, সর্ব প্রকার অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশ পরম্পরায় সংক্রমিত হয় না, কেবলমাত্র জননকোষের বৈশিষ্ট্যগুলোই বংশানুক্রমে সংক্রমিত হতে পারে।

৬. সমকালীন বিজ্ঞানের 'প্রজনন-তত্ত্ব' থেকে আমরা জানি যে, প্রাণীর ডি, এন, এ এবং আর, এন, এ মিলে নতুন সন্তানের জন্ম হয় এবং সন্তানের মধ্যে পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকার ক্ষেত্রেও সর্বদা একই রকম হয় না। এছাড়া মানুষের জীব কোষের গঠন, ডি, এন, এ ও আর, এন, এ-এর বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের পর প্রমাণ হয় যে, অন্য কোন প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষ প্রজাতির সৃষ্টি হয়নি।

৭. বর্তমান প্রাণীবিজ্ঞানে ক্লোনিং একটি অবিস্মরণীয় উৎকর্ষ। বৃটিশ বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম ভেড়ার উপর এই ক্লোনিং প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে 'ডলি' নামের একটি নতুন ভেড়া তৈরি করেছেন। যাহোক, আমরা জানি, ক্লোনিং হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যাতে করে কোন প্রাণী দেহের কোন কোষ সংগ্রহ করে তা থেকে অন্য একটি প্রাণী তৈরি করা হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ক্লোনিং-এর দ্বারা এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণী তৈরি হয় না, একই প্রাণী তৈরি হয়। ঠিক যে প্রজাতির কোষ সংগ্রহ করা হয়, সেই প্রজাতিই হুবহু জন্মলাভ করে। কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও এ ক্ষেত্রে সংঘঠিত হয় না। তাই এর থেকে মোটামুটিভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণী যেমন বানর থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়নি।

৮. ডারউইন তাঁর বিবর্তনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাণী প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেছেন তার সবগুলোকে সঠিকভাবে সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। যেমন: তিনি বলেছেন, জীবকূল সর্বদা অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত্তে পরস্পরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত থাকে। তারা নির্মমভাবে একে অন্যকে প্রতিহত করে বিজয়ী হয়ে বেঁচে থাকে এবং পরাজিতদের জগৎ থেকে বিতাড়িত করে। ডারউইনের এ বক্তব্য অবাঞ্ছিত। কেননা, প্রাণীকূলের মধ্যে কেবল দ্বন্দ্ব-সংঘাতই নয় পরস্পর সহানুভূতি,

সহযোগিতা ও আদান প্রদান মূলক বৈশিষ্ট্যও আমরা লক্ষ করি। এমনকি এ গুণাবলী কেবল মানুষের ক্ষেত্রেই নয় বরং অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ করি।"[১]

সবশেষে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ডারউইনের মতবাদ সম্বন্ধে চূড়ান্ত কথা হল– ডারউইনের মতবাদে ধর্মীয় বিশ্বাসকে চরমভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। তার মতবাদে আল্লাহ কর্তৃক জগৎ সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসকে অস্বীকার করায় তারমতবাদটা একটা সন্দেহাতীত কুফ্‌রী মতবাদে পরিণত হয়েছে। জগতের সবকিছুই আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টিকৃত– এ বিষয়ে উল্লেখিত বহু সংখ্যক আয়াতের মধ্যে একটি আয়াত হল–

﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ.﴾

অর্থাৎ, তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। (সূরা: ১৩-রা'দ: ১৬)

আর সবকিছু আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত– এ বিষয়ের বহু কুরআনী আয়াতের মধ্যে একটি আয়াত হল–

﴿وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ.﴾

অর্থাৎ, তিনি তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন যা কিছু রয়েছে আকাশসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে পৃথিবীতে। সবকিছুই তাঁর থেকে। (সূরা: ৪৫-জাছিয়া: ১৩)

মানুষ যে বিবর্তনের মাধ্যমে নয় বরং সরাসরি আল্লাহ হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকে মনুষ্য জাতির বিস্তৃতি ঘটেছে সে সম্পর্কে সূরা নেছা-র শুরুতে স্পষ্টত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। সুতরাং বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানুষ সৃষ্টির আকীদা কুরআনের স্পষ্ট ভাষ্য বিরোধী হওয়ায় তা সন্দেহাতীতভাবেই একটা কুফ্‌রী মতবাদ।

পরিশেষে আর একটি কথা বলতে হয়। 'বিবর্তনবাদ ও স্রষ্টাতত্ত্ব' গ্রন্থকার বলেন, "সাধারণ জ্ঞানী মানুষেরা ধারণা করেন যে, ডারউইনের বিবর্তনবাদ বলতে চায় যে, মানুষ এপ্ অর্থাৎ, বানর জাতীয় জন্তু থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে এসেছে, মানুষকে সরাসরি পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, মানুষ সৃষ্ট নয়, বিবর্তনের ফল। তাই স্রষ্টা নেই।

মানুষ যদি সৃষ্ট না হয়, বিবর্তনের ফলাফল হয়, তাহলে কীভাবে বলা যাবে যে, স্রষ্টা নেই? সরাসরি সৃষ্ট ও বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট, সর্বপ্রকারের সৃষ্টিই তো সার্বভৌম স্রষ্টার পক্ষে সম্ভব।[২]

ফ্রয়েড ইজম/যৌনবাদ

সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund freud) ছিলেন একজন মনোচিকিৎসক। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার মুরাভিয়া জেলার ফ্রেইলবার্গ নামক ক্ষুদ্র জনবসতির এক মধ্যবিত্ত ইয়াহুদী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বংশগতভাবে তিনি ইয়াহুদী হলেও আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাসী ছিলেন। তার জীবনীকার ড. জোন্স লিখেছেন, তিনি ছিলেন এমন নাস্তিক যে, কোনদিনই আল্লাহ-বিশ্বাসী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।[৩]

১. সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা, মোঃ শওকত হোসেন, পৃষ্ঠা নং ১৫৬-১৫৮।
২. বিবর্তনবাদ ও স্রষ্টাতত্ত্ব, মুহাম্মাদ সিদ্দিক, মদীনা পাবলিকেশান্স, পৃষ্ঠা নং ২৭।
৩. পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি, বরাত- The life and works of Sigmund freud.

চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করলে ডাক্তার ফ্রয়েডের হিস্ট্রিয়া রোগীর প্রতি বেশি আগ্রহ ও কৌতুহল সৃষ্টি হয়। এসব রোগীর চিকিৎসা পদ্ধতিতে কৃত্রিম উপায়ে সম্মোহন পদ্ধতিতে (Hypnotism/হিপনোটিজম) রোগীর মধ্যে মোহনিদ্রার সঞ্চার ঘটানো হত। রোগীকে একথা বিশ্বাস করানো হত যে, সে সুস্থ ও নিরোগ হচ্ছে, তার রোগ ক্রমশ দূর হয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে ফ্রয়েডের মনে প্রশ্ন জাগল যে, সন্মোহনের সাহায্যে চিকিৎসকের চিন্তাধারা যদি রোগীর রোগ নিরাময় করতে সক্ষম হয়, তাহলে রোগকে রোগীর বিশ্লিষ্ট জটিল চিন্তার উৎপাদন মনে করা যাবে না কেন? ফ্রয়েড তখন মনের প্রকৃত স্বরূপ কি তা নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন এবং এক অভিনব মনস্তত্ত্বের জন্ম দিলেন। ফ্রয়েডের এই মনস্তত্বই জ্ঞানীজনদের নিকট ফ্রয়েডের কাম সর্বস্ববাদ বা ফ্রয়েডের যৌনবাদ বলে সু-পরিচিত। একমাত্র কাম-প্রবৃত্তির দ্বারা ফ্রয়েড মানুষের সবরকম আচরণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন বলে তার মতবাদকে "সর্বকামবাদ" এবং তাঁকে সর্বকামবাদী (Pansexualist) মনোবিজ্ঞানী বলা হয়।

ফ্রয়েডের যৌনবাদের বিশেষ কয়েকটি মূলকথা[১]

নিম্নে ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ তথা কামসর্বস্ববাদের বিশেষ ৫টা মূলকথা ও তার খণ্ডন পেশ করা হল।

১. ফ্রয়েডের মতে কাম-প্রবৃত্তি বা যৌনানুভূতি মানুষের সব চিন্তা-ভাবনা এবং কার্যকলাপের নিয়ামক। তার মতে মানুষের সব আচরণ মূলত কামজ। মানুষ আদি কাম দ্বারা পরিচালিত। সেই আদি কাম-প্রবৃত্তি[২] থেকেই তার সবরকম আচরণ উদ্ভুত। কামকে চরিতার্থ করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

খণ্ডন

মানুষের সব আচরণ কাম-প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভুত– ফ্রয়েডের এই মতবাদ গ্রহণযোগ নয়। কারণ:

(এক) মানুষ সামাজিক জীব। তার আচরণে সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবও অনস্বীকার্য। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও চরিত্রবিজ্ঞানে মানুষের স্বভাব-চরিত্র ও আচরণে পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা, এমনকি বংশগতিরও প্রভাব রয়েছে বলে

১. ফ্রয়েডের মূল কথাগুলোর সিংহভাগ গ্রহণ করা হয়েছে "মন ও মনোবিজ্ঞান" গ্রন্থের "ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে কাম" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে। লেখক: ড. আব্দুল খালেক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আর বিজ্ঞানীদের উক্তির উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে মাওলানা আব্দুর রহীম কর্তৃক রচিত "পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি" নামক পুস্তক থেকে।
২. ফ্রয়েড কাম-প্রবৃত্তি বলতে শুধুমাত্র যৌনাকাংখা বা প্রজনন প্রেষণা বোঝাননি। কাম-প্রবৃত্তিকে তিনি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, যৌনাকাংখা, সন্তান-বাৎসল্য প্রভৃতিকেও তিনি কাম-প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে।[1] অতএব সব আচরণ কাম-প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফ্রয়েডীয় দর্শন একদেশদর্শীতা ও অপূর্ণতার দোষ থেকে কোনোক্রমেই অব্যাহতি পেতে পারে না।

(দুই) সব আচরণ ও শক্তিগুলো যদি মূলত কামজ হয়ে থাকে এবং আদি কাম থেকে তা উদ্ভূত হয়ে থাকে, তাহলে অবদমন শক্তি ও অবদমনমূলক আচরণগুলোর উৎপত্তিও হবে আদি কাম থেকে। আর তা হলেই বলতে হবে পাপ থেকে পাপ দমনের শক্তি জন্মলাভ করেছে। এটা স্পষ্টত বৈপরিত্য বৈকি?

(তিন) ফ্রয়েড স্নেহ, প্রীতি, সন্তান-বাৎসল্য প্রভৃতিকেও কাম-প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ স্নেহ, সন্তান-বাৎসল্য ইত্যাদি এবং কাম-প্রবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য থাকার বিষয়টি একজন গেঁয়ো মূর্খও অনুধাবন করতে পারে। এভাবে সব ধরনের চেতনাকে কাম আখ্যায়িত করার পশ্চাতে অবাধ যৌনাচারিতার পক্ষে মানসিকতা গঠন ব্যতীত অন্য কোন সদুদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না।

২. ফ্রয়েড-এর মতে মানুষের অবাধ যৌনাচারিতার পক্ষে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের বাধাই দৈহিক ও মানসিক বিকার ঘটার কারণ। মানুষের যৌন জীবনের যথাযথ বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু বিকাশের উপরই তার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভরশীল। তিনি বলেন, "নিম্নতর প্রাণীদের পক্ষে যৌনবৃত্তি চরিতার্থ করায় তেমন কোন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নেই। কিন্তু সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য মানুষকে বহুকাল পর্যন্ত যৌনাবেগ সংবরণ বা অবদমন করে রাখতে হয়। যৌনকামনা ও প্রতিবন্ধকতার দ্বন্দ্বে মানুষের মন উদ্বেগ ও অশান্তিতে ভরা থাকে। ফ্রয়েডের মতে এই চাপাচাপির কারণেই মানুষের নানান রকম দৈহিক ও মানসিক বিকার ঘটে থাকে। যেমন: নিউরোসিস, হিস্ট্রিয়া প্রভৃতি মানসিক রোগ এ থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

খণ্ডন

অবাধ যৌনাচারিতার পক্ষে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের বাধা মানুষের দৈহিক ও মানসিক বিকার ঘটার কারণ হওয়া সম্পর্কিত ফ্রয়েড সাহেব কথিত দর্শন বাস্তবসম্মত নয় এবং তা নেতিবাচক যৌন উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী। কেননা:

(এক) ফ্রয়েডের কথা মেনে নিলে সব ধর্মপ্রাণ মানুষেরই ফ্রয়েড সাহেব কথিত নানা রকম দৈহিক ও মানসিক রোগে আক্রান্ত থাকার কথা। কারণ, ধর্মীয় অনুশাসনের বাধা অবশ্যই তাদের ক্ষেত্রে রয়েছে। অথচ তেমন তো দেখা যায় না। আর যারা ধর্মপ্রাণ নয় তাদের ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনের বাধা না থাকলেও যেহেতু কমবেশ সামাজিক অনুশাসনের বাধা তো অবশ্যই রয়েছে; কাজেই কারুরই ফ্রয়েড সাহেব কথিত নানান রকম দৈহিক ও মানসিক রোগ থেকে মুক্ত থাকার কথা নয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের জ্বলন্ত বাস্তবতা কি এ বিষয়ে ফ্রয়েড সাহেবকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করছে না?

১. ইসলামী চরিত্র-বিজ্ঞানেও মানুষের স্বভাব-চরিত্র ও আচরণে পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা ও বংশগতির প্রভাব স্বীকৃত। এ সম্পর্কে দলীল-প্রমাণসহ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আমার রচিত "ইসলামী মনোবিজ্ঞান" গ্রন্থ।

(দুই) ফ্রয়েড সাহেব নিম্নতর প্রাণীদের পক্ষে যৌনবৃত্তি চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে তেমন কোন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা না থাকার উদাহরণ তুলে ধরে কি আশরাফুল মাখলূকাত মানব সমাজকেও নিম্নতর প্রাণীর মত মা, মেয়ে, বোন, ভাগ্নি, খালা, ফুফু, নানী, দাদীর মধ্যে পার্থক্যহীন যৌনবৃত্তি চরিতার্থ করার মত জংলী যৌন পরিবেশ গড়ে তোলার সবক দিতে চান? তার উপরোক্ত দর্শন থেকে তো তেমনই উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে!

৩. ফ্রয়েড-এর মতে মানুষের মানসিক গঠন ও বিকাশের ভিত্তি হল শৈশবকালীন যৌনবোধ। তিনি ব্যক্তির প্রাথমিক জীবনের মানস-যৌন (Psycho-sexual) বিকাশকে ব্যক্তিত্বের কাঠামো হিসাবে ধরেছেন। পরবর্তী পর্যায়ের বৃদ্ধি ও বিকাশ হচ্ছে এই মূল কাঠামোর সম্প্রসারণ। ফ্রয়েড ব্যক্তির মানস-যৌন বিকাশের কতগুলো স্তর বিন্যাস করেছেন। যথা:

(এক) মুখকাম স্তর (Oral erotic stage)

এই মুখকাম-স্তরে শিশুর সুখকর অনুভূতি ও যৌন-তৃপ্তি মুখে কেন্দ্রীভূত থাকে। স্তন পানে শিশু সুখ অনুভব করে। সুখকর অনুভূতি ব্যাহত হলে বা অতৃপ্ত থাকলে শিশু আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। স্তন-বৃন্ত কামড়ে দিয়ে মায়ের প্রতি হিংসা ও নৈরাশ্য প্রকাশ করে। শিশুর এই আক্রমণাত্মক মনোভাব তার জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে ধর্ষকামে (ঝধফরংস) রূপান্তরিত হতে পারে। ধর্ষকামীরা প্রেমাস্পদকে নিপীড়িত করে যৌন সুখ লাভ করতে চেষ্টা করে।

খণ্ডন: ফ্রয়েড সাহেব কথিত এই দর্শন অবাস্তবসম্মত ও বিকৃত। কেননা–

(এক) বাস্তবে আমরা দেখতে পাই স্তন পানে শিশুর সুখকর অনুভূতি ব্যাহত না হলেও বা অতৃপ্ত না থাকলেও অনেক সময় শিশু মায়ের স্তন-বৃন্তে কামড় দিয়ে থাকে। সন্তানকে দুগ্ধ দানকারিনী যে কোন জননীর কাছে জিজ্ঞাসা করলেই এর সত্যতা যাচাই করা যাবে।

(দুই) মুখের রসনা তৃপ্তিকে যৌনতৃপ্তি আখ্যা দেয়া বিকৃত ধারণা বৈ কি? মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করলেও কি ফ্রয়েড সাহেবের যৌনতৃপ্তি লাভ হত?

(দুই) পায়ুকাম-স্তর (anal erotic stage)

এই পায়ুকাম স্তরে সুখকর অনুভূতি পায়ু বা মলদ্বারে কেন্দ্রীভূত থাকে। মল ত্যাগে শিশু দৈহিক স্বস্তি অনুভব করে। মলত্যাগের ব্যাপারে মায়ের কঠোর ও দমনমূলক আচরণে মনের দিক থেকে শিশু একঘেয়ে, বেয়াড়া বা উচ্ছৃংখল হয়ে উঠতে পারে।

খণ্ডন

ফ্রয়েড সাহেব মলত্যাগের মাধ্যমে দৈহিক স্বস্তি লাভের মত বিষয়কে কোন্ হিসাবে যৌন-বিকাশের স্তর নির্ধারণ করলেন তা বোধগম্য নয়। পাগলের মত আবোল-তাবল বক্তব্য ছাড়া আর কিছু বলে বোধ হয় এটাকে আখ্যা দেয়া যাবে না। কিংবা বলতে হবে সবকিছুকে কাম আখ্যায়িত করার পশ্চাতে অবাধ যৌনাচারিতার পক্ষে মানসিকতা গঠনই তার উদ্দেশ্য ছিল।

(তিন) লিংগ-স্তর (phallic stage)

এই লিংগ-স্তরে শিশু তার যৌনাঙ্গ সম্বন্ধে সজাগ এবং আত্মকামী (autoerotic) হয়। সে তার নিজের দেহকে ভালবাসে। এই আত্মকামিতাকে ফ্রয়েড বলেছেন আত্মপ্রেম (Nareissism)। এই স্তরে কাম প্রবৃত্তি দুইভাবে প্রকাশ পায়। প্রথমটি হল- পুরুষ শিশুর মাতার প্রতি যৌনাকর্ষণ অনুভব করা এবং পিতাকে ঈর্ষা করা। এটাকে ফ্রয়েড বলেছেন ইডিপাস কমপ্লেক্স (edipus complex)। দ্বিতীয়টি হল- মেয়ে শিশুর পিতার প্রতি যৌনাকর্ষণ অনুভব করা এবং মাতাকে ঘৃণা করা। ফ্রয়েড এর নাম দিয়েছেন ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স (Electra complx)।

খণ্ডন

ফ্রয়েড সাহেব কথিত এই দর্শনও অবাস্তবসম্মত, বিকৃত এবং অবৈজ্ঞানিক। কেননা–

(এক) এই স্তরে শিশু তার দেহকে ভালবাসে কথাটা কি বাস্তবসম্মত? তাহলে সব শিশুই তার দেহের ব্যাপারে যত্নবান হত। কিন্তু বাস্তবে কি তা দেখা যায়? এমনিভাবে সব পুরুষ শিশু মায়ের প্রতি আকর্ষণ আর পিতার প্রতি বিকর্ষণ তথা ঈর্ষা, পক্ষান্তরে সব মেয়ে শিশু পিতার প্রতি আকর্ষণ ও মায়ের প্রতি বিকর্ষণ তথা ঘৃণা অনুভব করে– এ কথাটাও বাস্তবসম্মত নয়। সন্তান ধারিনী মাতা-পিতার মধ্যে জরিপ চালিয়ে যে কেউ এর সত্যতা যাচাই করতে পারেন।

(দুই) মাতা-পিতার প্রতি শিশুর আকর্ষণ যদি যৌনাকর্ষণ হয়ে থাকবে, তাহলে পুরুষ শিশুর বয়ঃপ্রাপ্তির পর অন্যান্য নারীদের তুলনায় মায়ের সঙ্গেই তার যৌনকুকর্মে বেশি আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত হওয়ার কথা। তদ্রূপ কন্যা শিশুর বেলায়ও বয়ঃপ্রাপ্তির পর পিতার সঙ্গে তার যৌনকুকর্মে বেশি আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় তার বিপরীত। বাস্তব হল দু'একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা ব্যতীত মার্জিত স্বভাবের কোনো মানুষের মধ্যে মাতা-পিতার সঙ্গে যৌনকর্মের চাহিদাই জাগ্রত হয় না। ফ্রয়েডের জনৈক অনুসারী ড. রামোস ফ্রয়েডের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও লিখেছেন, "মা-সন্তানের পারস্পরিক আন্তরিক ও একনিষ্ঠ সম্পর্ককে যৌন স্পৃহার আবেগ নামে অভিহিত করা –জেনে শুনেই করা হোক কিংবা অজ্ঞাতসারে– সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এবং ইচ্ছামূলক ব্যাপার।" প্রখ্যাত আমেরিকান মনস্তত্ববিদ অধ্যাপক যোসেফ জ্যেস্ট্রো তার সমালোচনা গ্রন্থ Freud : his Dream and sex Theories -তে লিখেছেন, "জীববিজ্ঞান, শরীরবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের কোথাও এই অস্বাভাবিক সম্পর্কের এক বিন্দু বৈধতা আমি খুঁজে পাই না।"

(তিন) বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে এ কথা ভুল প্রমাণিত। কেননা যৌনবৃত্তির উদ্দীপনা যৌবন প্রাপ্তির পূর্বে কখনই সৃষ্টি হয় না। জীববিদ্যার যেকোনো ছাত্র জানে যে, বিভিন্ন আবেগ বা বৃত্তি বিভিন্ন স্নায়ুতন্ত্রীর আলাদা আলাদা রাসায়নিক পদার্থ থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে। এবং অন্য কোন বৃত্তি বা আবেগ উদ্দীপক স্নায়ুতন্ত্রী যৌনবৃত্তিকে উদ্দীপিত করতে পারে না। অন্য সকল প্রকার আবেগ সংশ্লিষ্ট মাংসগ্রন্থী

ও স্নায়ুতন্ত্রী শিশুর জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যৌনস্পৃহা সংশ্লিষ্ট মাংসগ্রন্থী ও স্নায়ুতন্ত্রী শিশুর জন্মকালে অসম্পূর্ণ থাকে, ফলে তা তখন কাজের উপযোগী হয় না। অতএব যৌবনপ্রাপ্তির পূর্বে কোন শিশু যৌন-আবেগ প্রকাশের যোগ্যই হয় না।

(চার) ফ্রয়েডের 'শিশুর যৌনস্পৃহা' সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করার জন্য মনস্তাত্বিকগণ বহু সংখ্যক অল্প বয়স্ক বালক ও বালিকাদের দীর্ঘ দিন পর্যন্ত অধ্যয়ন অধীন রেখে সাক্ষ্য প্রমাণ সহকারে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে, 'শিশুর যৌনস্পৃহা' ভিত্তিহীন কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। ঈডিপাস কমপ্লেস একটা মনগড়া কল্পকাহিনী মাত্র।

(চার) জনন-স্তর (gental stage)

এই জনন-স্তর মানস-যৌন বিকাশের সর্বশেষ স্তর, যৌবন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই স্তর শুরু হয় এবং প্রজনন-ক্রিয়ার দ্বারা যৌনবৃত্তি চরিতার্থের ফলে এর পরিণতি ঘটে।

এই চারটি স্তরের প্রথম তিনটি শৈশব জীবনের প্রথম পাঁচ বছর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এরপর কিছুকাল যৌনবোধ সুপ্তাবস্থায় থাকে। বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জনন-স্তর দেখা দেয়। ফ্রয়েডের মতে ব্যক্তির মানসযৌন বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুখকর ও বিরক্তিকর অনুভূতি, পিতা-মাতার অনুকূল ও প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া, মানসিক দুশ্চিন্তা, ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত তার ব্যক্তিত্বের ধারা নির্ধারণ করে।

৪. ফ্রয়েডের মতে তিনটি সত্তার সমন্বয়ে ব্যক্তিত্বের কাঠামো গঠিত। এগুলো হচ্ছে–আদিসত্তা, অহম ও অধিসত্তা।

(এক) আদিসত্তা বা ইগো (ego)

আদিসত্তা ব্যক্তিত্বের প্রাথমিক সত্তা। এটি জন্মগত। এর উপর ভিত্তি করেই অহম এবং অধিসত্তার উন্মেষ ঘটে। সহজাত প্রবৃত্তি এবং বংশগতির সূত্রে প্রাপ্ত সকল মানসিক প্রক্রিয়াই আদিসত্তার অন্তর্ভুক্ত। আদিসত্তা ব্যক্তির সকল মানসিক শক্তির আধার। এই সত্তাটি ব্যক্তির শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, বাহ্যিক জগতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আদিসত্তা সুখনীতির দ্বারা পরিচালিত। অর্থাৎ, সব সময় আনন্দ পেতে চায়। আদিসত্তার আনন্দ লাভের প্রক্রিয়া হচ্ছে অন্ধভাবে জৈবিক প্রেষণা চরিতার্থ করা। ব্যক্তির আদিসত্তা আনন্দ লাভের ব্যাপারে ন্যায়-অন্যায় বা নৈতিকতার ধার ধারে না।

খণ্ডন: ফ্রয়েডের এই বক্তব্য অবৈজ্ঞানিক এবং ইসলামী দর্শন পরিপন্থী। কেননা-

(এক) ফ্রয়েড ব্যক্তিত্বের কাঠামো তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন, এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তিনি পেশ করে যেতে পারেননি।

(দুই) তিনি একদিকে বলেছেন, সহজাত প্রবৃত্তি এবং বংশগতির সূত্রে প্রাপ্ত সকল মানসিক প্রক্রিয়াই আদিসত্তার অন্তর্ভুক্ত, আবার বলেছেন, ব্যক্তির আদিসত্তা আনন্দ লাভের ব্যাপারে ন্যায়-অন্যায় বা নৈতিকতার ধার ধারে না। তার এই দুটো কথার মধ্যে বৈপরিত্য রয়েছে। কেননা, সহজাত প্রবৃত্তি এবং বংশগতির সূত্রে প্রাপ্ত সকল

মানসিক প্রক্রিয়াই ন্যায়-অন্যায় বা নৈতিকতার ধার ধারে না– এমন নয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞান[১] ও চরিত্র বিজ্ঞানে এখন স্বীকৃত যে, বংশগতির সূত্রেও মানুষের অনেক ভাল চরিত্র অর্জিত হয়ে থাকে।

(তিন) ফ্রয়েড যে বলেছেন, ব্যক্তির আদিসত্তা আনন্দ লাভের ব্যাপারে ন্যায়-অন্যায় বা নৈতিকতার ধার ধারে না। এ কথাটা হাদীছে বর্ণিত তথ্যেরও পরিপন্থী। হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী প্রত্যেকটি নবজাত শিশু নির্মল ও স্বচ্ছ মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর তার মধ্যে মাতা-পিতার শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকতার ফলে নেতিবাচক মনোবৃত্তি জাগ্রত হতে থাকে। ইরশাদ হয়েছে,

ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. (متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الجنائز ورواه مسلم في كتاب القدر. واللفظ للبخاري)

অর্থাৎ, প্রত্যেক সন্তান ফিতরতে সালীমার উপর জন্মগহণ করে, তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহূদী বানায় বা নাসারা (খৃষ্টান) বানায় কিংবা মাজূসী (অগ্নিপূজক) বানায়। যেমন: একটা অবলা প্রাণী একটা সুস্থ বাচ্চা জন্ম দেয়, তারপর তোমরা সেই বাচ্চাদের মধ্যে নাক-কান কর্তিত কোন শাবক দেখতে পাও কি? (বোখারী ও মুসলিম)

(দুই) অহম বা ঈদ (id)

ব্যক্তিত্বের দ্বিতীয় সত্তা হচ্ছে অহম্। বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি সাধন করে আদি সত্তার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করাই অহমের কাজ। আদিসত্তা এবং অহমের ভিতর মূল পার্থক্য এই যে, আদিসত্তা শুধু মানুষের ব্যক্তিগত জগৎ নিয়েই সন্তুষ্ট। পক্ষান্তরে বাস্তব জগতের সাথে অহমের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। তাছাড়া আদিসত্তা পরিচালিত হয় সুখনীতির দ্বারা। অন্যদিকে অহম্ পরিচালিত হয় বাস্তবধর্মী নীতির দ্বারা। বাস্তবধর্মী নীতির উদ্দেশ্য হল সঠিক বস্তু এবং প্রক্রিয়ার দ্বারা অস্বস্তি দূর করা এবং স্বস্তি বা সুখ লাভ করা। অহমকে ব্যক্তির কার্যনির্বাহী কর্ণধার বলা যেতে পারে। কারণ, ব্যক্তির কোন্ সহজাত প্রবৃত্তি কীভাবে পরিতৃপ্তি হবে তা অহম নির্ধারণ করে থাকে। অহম এমনভাবে আদিসত্তা, অধিসত্তা এবং বাহ্যিক জগতের ঘটনাবলীর ভিতর সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে, যাতে এই সত্তাগুলোর চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি না হয়। অহমের সকল শক্তির উৎস আদিসত্তা এবং এর কামনা-বাসনা পূরণের জন্যই অহমের উদ্ভব ঘটেছে। ফ্রয়েডের মতে আদিসত্তাকে বাদ দিয়ে অহমের কোন অস্তিত্ব নেই এবং অহম্ কখনও আদিসত্তা থেকে স্বাধীন হতে পারে না।

১. এ সম্পর্কে জানার জন্য আমার রচিত "ইসলামী মনোবিজ্ঞান" দ্রষ্টব্য।

খণ্ডন: ফ্রয়েডের এই বক্তব্য তার মূল বক্তব্যের সাথে বৈপরিত্যে ভরা ও অবৈজ্ঞানিক। কেননা-

(এক) তিনি এখানে বলছেন, অহমের কাজ হল বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি সাধন করে আদি সত্তার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা। অথচ তিনি পূর্বে তার মূল বক্তব্যে সব ধরনের চিন্তা-চেতনাকে কামজ বলে আখ্যায়িত করে এসেছেন। তাহলে প্রশ্ন হল অহমের চিন্তা-চেতনাগুলো বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি সাধন করবে কীভাবে? সেটিওতো কামজ। আর কামজ চিন্তা-চেতনা কোন সমঝোতা বোঝে না। যদি বলেন, অহম সঙ্গতি সাধন করতে বোঝে, তাহলে প্রশ্ন দেখা দিবে আদিসত্তা কেন তা বুঝবে না? এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করার বৈজ্ঞানিক কোনো প্রমাণ তিনি পেশ করে যেতে পারেননি।

(দুই) ফ্রয়েডের বক্তব্য অনুযায়ী ব্যক্তিত্বের অহম স্তর অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিবেক সম্পন্ন, যার ফলে সেটি বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি সাধন করে চলতে সক্ষম এবং সবগুলো চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে এড়িয়ে সুচারুরূপে কাজ সম্পাদন করে যেতে সক্ষম। তাহলে ফ্রয়েড সাহেবের বক্তব্য থেকেই এ কথা বলা যাবে যে, অহম তার বিবেকের তাড়নায়ই ব্যক্তিকে সবরকম অশ্লীল কাজকর্ম থেকে বিরত রাখে এবং ব্যক্তির ধর্মীয় চাওয়া-পাওয়ার মধ্যকার সংঘাত তথা ধর্মীয় বিধি-বিধানের সাথেও দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে পর্যন্ত এড়িয়ে চলে। এমন বলা হলে নিশ্চিতভাবেই ফ্রয়েড সাহেবের অবাধ যৌন স্বাধীনতা প্রমাণের প্রয়াস ভেস্তে যাবে।

(তিন) অধিসত্তা বা সুপার ইগো (super-ego)

ব্যক্তিত্বের তৃতীয় বা শেষ সত্তা হল অধিসত্তা। ফ্রয়েডের মতে অধিসত্তা হচ্ছে ব্যক্তির চিরাচরিত মূল্যবোধ এবং সামাজিক আদর্শের অভ্যন্তরীণ প্রতিভূ। তিনি একে ব্যক্তির বিবেক বা নৈতিকতার ধারক-বাহকরূপে অভিহিত করেছেন। পারিবারিক আদর্শ এবং সামাজিক মূল্যবোধের আত্মীকরণের ফলেই ব্যক্তির ভিতরে অধিসত্তার উদ্ভব হয়। অধিসত্তা চায় পরিপূর্ণতা। আনন্দের প্রতি এর কোনো মোহ নেই। অধিসত্তার প্রধান প্রধান কাজ হল–

(১) ন্যায়-অন্যায়ের ভিতর পার্থক্য নির্ণয় করা এবং সামাজিক আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা।
(২) আদিসত্তার কাম এবং আক্রমণাত্মক প্রেষণাকে অবদমন করা।
(৩) অহমকে আদর্শ ধর্ম লক্ষ্যবস্তু নির্ণয়ে প্রভাবিত করা। এবং
(৪) পরিপূর্ণতা অর্জনে ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা। ফ্রয়েডের মতে আদিসত্তা, অহম এবং অধিসত্তা একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়, এরা পরস্পর নির্ভরশীল। তবে সাধারণভাবে, আদিসত্তাকে ব্যক্তিত্বের জৈবিক সত্তা, অহমকে মানসিক সত্তা এবং অধিসত্তাকে সামাজিক সত্তা বলা যেতে পারে। এই তিনটি সত্তার সুষম সমন্বয়েই সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে।

খণ্ডন

ফ্রয়েডের এই বক্তব্য তার মূল বক্তব্যের সাথে চরমভাবে সাংঘর্ষিক। কেননা তিনি এখানে বলছেন, অধিসত্তা ব্যক্তির চিরাচরিত মূল্যবোধ এবং সামাজিক আদর্শের অভ্যন্তরীণ প্রতিভূ। অধিসত্তা ব্যক্তির বিবেক বা নৈতিকতার ধারক-বাহক। অধিসত্তা পারিবারিক আদর্শ এবং সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষা করে। আনন্দের প্রতি অধিসত্তার কোনো মোহ নেই। অধিসত্তার প্রধান প্রধান কাজ হল ন্যায়-অন্যায়ের ভিতর পার্থক্য নির্ণয় করা এবং সামাজিক আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা; আদিসত্তার কাম এবং আক্রমণাত্মক প্রেষণাকে অবদমন করা; অহমকে আদর্শ ধর্ম লক্ষ্যবস্তু নির্ণয়ে প্রভাবিত করা ইত্যাদি। অথচ তিনি পূর্বে তার মূল বক্তব্যে সব ধরনের চিন্তা-চেতনাকে কামজ বলে আখ্যায়িত করে এসেছেন। আর কামজ চিন্তা-চেতনা কোন মূল্যবোধ, আদর্শ ও নীতি নৈতিকতার ধার ধারে না।

যদি বলা হয়, ফ্রয়েড সাহেব কথিত "কাম বা যৌন" কথাটি ব্যাপক; যার মধ্যে সব ধরনের চিন্তা-চেতনা অন্তর্ভুক্ত। অতএব এখানকার বক্তব্য তার মূল কথার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তাহলে বলতে হবে, তিনি সব ধরনের চিন্তা-চেতনাকে কাম বা যৌন আখ্যা দিয়েছিলেন যে উদ্দেশ্যে অর্থাৎ, অবাধ যৌনাচারিতার অনুকূলে মানসিকতা সৃষ্টির প্রয়াসে এখানকার বক্তব্য তার সে উদ্দেশ্যকে নিশ্চিতই নস্যাৎ করে দিয়েছে।

৫. ফ্রয়েডের মতে মানুষের সব কার্যকলাপ অচেতন মনের অবদমিত কামনার দ্বারা পরিচালিত। এর ব্যাখ্যা বোঝাতে যেয়ে তিনি কাল্পনিকভাবে মানব মনের তিনটি স্তর নির্ধারণ করেছেন।

(এক) চেতন। (Conscious)

(দুই) অনবচেতন/প্রাকচেতন। (pri conscious)

(তিন) অবচেতন/অচেতন। (Un conscious)

মানুষের যেসব কামনা-বাসনা বা মনোবৃত্তি সমাজে অবৈধ বা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়, সেগুলো শাস্তির ভয়ে অবদমিত হয়ে অচেতন মনে আশ্রয় গ্রহণ করে। অবদমিত কামনাই অবচেতন মনের উপাদান। অবচেতন মনে অবস্থিত অবদমিত কামনাগুলোর ছদ্ম বা বিকৃত প্রকাশই দৈনন্দিন জীবনের ভুল-ভ্রান্তি, স্বপ্ন এবং মানসিক বিকাশের নানা রকম লক্ষণরূপে দেখা দেয়।

কিন্তু অবদমিত কামনাগুলো মনের নির্জ্ঞান বা অবচেতন স্তরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে না। কারণ কামনার স্বভাবই হচ্ছে সক্রিয়তা। সবসময় এগুলো চেতন মনে আত্মপ্রকাশ করে চরিতার্থতার সুযোগ খোঁজে। জাগরণে অবদমিত কামনার এই উদ্দেশ্য সফল হয় না। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় অধিসত্তা আচ্ছন্ন এবং শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং তার শাসন শিথিল হয়ে যায়। যেসব কামনা-বাসনা সমাজ-অনুমোদিত পথে স্বাভাবিকভাবে চরিতার্থ হতে পারে না, এই সুযোগে তারা আত্মগোপন করে ছদ্মবেশে

চেতন মনে প্রকাশিত হয়। ফ্রয়েডের মতে অতৃপ্ত ও অবদমিত কামনার চেতন মনে এ ধরনের বিকৃত প্রকাশই হচ্ছে স্বপ্নের মূল কারণ।[১]

স্বপ্ন ছাড়াও, মানব-জীবনের উচ্চতর আদর্শ বা মূল্যবোধ (যেমন, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি)-এর মাধ্যমে অবচেতন মনের অবদমিত কামনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির অবদমিত কামনাগুলো বিবিধ মানসিক রোগের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু মানসিকভাবে মোটামুটি স্থূল লোকের অবদমিত কামনাগুলো প্রধানত তিনটি পন্থায় চেতন মনে আত্মপ্রকাশ করে। যথা:–

(১) উদ্‌গতি (sublimation)

এক্ষেত্রে অবদমিত কামনা তার স্বাভাবিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে কোন সৃজনশীল কাজে রূপান্তরিত হয়। যেমন: ব্যর্থ প্রেমিকের প্রেমের কবিতা রচনা। উদ্‌গতির ফলেই সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, জনকল্যাণ, দেশপ্রেম, সৌন্দর্যপ্রীতি, ধর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি উচ্চতর আদর্শগুলোর বিকাশ ঘটে। কোন সেবাব্রতী নার্সের সেবানিষ্ঠার কারণ হয়ত তার বাল্য- বৈধব্য বা সন্তানহীনতা। তার অবদমিত মাতৃত্বই হয়ত তাকে সেবাব্রতী করেছে। সেবার মাধ্যমে সে তার অবদমিত কামনার পরিপূর্তি লাভ করতে চায়।

(২) অভিক্রান্তি (displacement)

এক্ষেত্রে অবদমিত কামনা কোন কল্যাণের পথে পরিচালিত না হয়ে বিশেষ খেয়াল বা আসক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন, কোন বালিকার মা হওয়ার বাসনা অবদমিত হয়ে পুতুল খেলায় অভিক্রান্ত হতে পারে, অথবা কোন নিঃসন্তান মহিলার অবদমিত মাতৃত্ব বিড়াল, কুকুর বা পাখী পোষার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারে।

(৩) প্রতিক্রিয়া গঠন (reaction formation)

এক্ষেত্রে অবদমিত ইচ্ছা বিপরীতরূপ ধারণ করে। যেমন, লঘু, পাপে গুরুদন্ড পেয়ে কোন সৎলোক অসৎ হয়ে যেতে পারে। বিনম্রস্বভাবের কোন লোক প্রিয়জনের নিকট থেকে আঘাত পেয়ে প্রতিহিংসা পরায়ন ও নৃসংশ হয়ে উঠতে পারে।

---

১. এখানে ফ্রয়েড যে স্বপ্ন দর্শন পেশ করেছেন তার সারকথা হল– স্বপ্ন হচ্ছে অতৃপ্ত ও অবদমিত কামনার প্রতিফলন। বা বলা যায় স্বপ্ন হল উচ্ছৃংখল চিন্তার ফসল। কিন্তু এ কথাও চির সত্য ও স্বীকৃত যে, স্বপ্নের মাধ্যমে বহু লোক চিন্তা গবেষণার অনেক সূত্র লাভ করেছেন, স্বপ্নের ঘোরে বহু লোক উচ্চমানের কবিতা ও সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, স্বপ্নের মাধ্যমে ভবিষ্যতের অনেক বিষয়ে তথ্য লাভ করেছেন, অনেক গায়েবী জ্ঞানের উদঘাটন করেছেন। তাই স্বপ্ন শুধু অতৃপ্ত ও অবদমিত কামনার ফল নয়, স্বপ্ন শুধু উচ্ছৃংখল চিন্তার ফসল নয়। বরং স্বপ্ন একটি ব্যাপক বিষয়, যার রয়েছে বহুবিধ কারণ। স্বপ্নের নিগুঢ় রহস্য আজও সম্যকভাবে উদঘাটন হয়নি। ইসলাম বলেছে, স্বপ্ন ব্যক্তিঘটিত হতে পারে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হতে পারে, আবার হতে পারে শয়তানের পক্ষ থেকেও। ইসলামের এই স্বপ্ন দর্শন অনেক ব্যাপক। এটাকে মেনে নিলে সব ধরনের স্বপ্নকেই এই তিন শ্রেণীর কোন না কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

খণ্ডন: মানব মনের এই তিনটি স্তর নির্ধারণ ও এসম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সারকথা হল ফ্রয়েড সাহেবের মতে মানুষের সব কার্যকলাপ অচেতন মনের অবদমিত কামনার দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু ফ্রয়েডের এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা-

(এক) মানুষের সজ্ঞান কামনা-বাসনার দ্বারা তার কার্যকলাপ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। এটা এমন সুস্পষ্ট বাস্তবতা যার কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। আমরা শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেই তো পৃথিবীর লক্ষ কোটি কার্যকলাপ আয়ত্ব করি এবং আমাদের মন অবলিলায় তা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

(দুই) ফ্রয়েড সাহেবের কথা মেনে নিলে পৃথিবী থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিতে হয়। কেননা, শিক্ষা দ্বারা যদি মানুষের কার্যকলাপ পরিচালিত না হবে বরং অচেতন মনের অবদমিত কামনার দ্বারা পরিচালিত হবে, তাহলে শিক্ষার প্রয়োজন কী?[১]

(তিন) উল্লেখ্য, অবচেতন মন ফ্রয়েডীয় মতাদর্শের ভিত্তিগত প্রকল্প। ফ্রয়েডের গোটা আন্দোলনই চলেছে এর উপর ভিত্তি করে। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত আমেরিকান মনস্তত্ববিদ অধ্যাপক যোসেফ জ্যেস্ট্রো তার সমালোচনা গ্রন্থ ঋৎবঁফ : যরং উৎবধস ধহফ ংবী এঃযবড়ৎরবং -এ লিখেছেন, "আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হয়েছি যে, ফ্রয়েডের 'অবচেতন' একটা ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী মাত্র।"

* * * * *

১. শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিলেই ফ্রয়েড সাহেবের মিশন সহজে বাস্তবায়িত হবে। তখন মানুষ শিক্ষা-দীক্ষাহীন অবলা প্রাণীর মত যথেচ্ছা যৌনগমন করতে আর কোনো দ্বিধা করবে না।

অষ্টম অধ্যায়
(ভ্রান্ত ধর্ম ও তার গ্রন্থসমূহ)

ইয়াহুদী ধর্ম
(اليهودية/judaism)

"ইয়াহুদী" বলতে বোঝায় হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মতকে। আর তাদের ধর্মমতকে বলা হয় "ইয়াহুদী ধর্ম"। কেউ কেউ "ইয়াহুদী ধর্ম"-এর সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন- "ইয়াহুদী ধর্ম" ঐ আসমানী ধর্মকে বলা হয় যা হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক বনী ইসরাঈলের হেদায়েতের জন্য আনিত হয়েছিল।

"ইয়াহুদ" (يهود) কথাটি আভিধানিকভাবে هاد يهود هودا থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা, তাওবা করা, বিনীত হওয়া ইত্যাদি। হযরত মূসা (আ.)-এর إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ اي رجعنا وتضرعنا (অর্থাৎ, আমরা তোমার দিকে ফিরে এসেছি। -সূরা আ'রাফ: ১৫৬) উক্তিকে ইয়াহুদ নামকরণের উৎস বলা হয়।

ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থের নাম "তাওরাত" (توراة)। তাওরাত বর্তমান বাইবেল এর একটি অংশ। এটা বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Ttestament) বলে পরিচিত। তবে সমগ্র পূরাতন নিয়ম তাওরাত নয়। কেননা পুরাতন নিয়মে তাওরাত ব্যতীত "আম্বিয়ায়ে কেরাম-এর সহীফাসমূহ" (Prophets) এবং "পবিত্র সহীফাসমূহ" (Hagiographa অথবা কেবল Writings) নামের সহীফাসমূহও অন্তর্ভুক্ত। যেগুলো পুরাতন নিয়ম তথা ইয়াহূদীদের পবিত্র গ্রন্থের অপরিহার্য অংশ, তবে তাওরাত নয়।

ইয়াহুদীদের কয়েকটা ধর্মমত

১. শরীআত মাত্র একটি। আর তা হযরত মূসা (আ.) থেকে শুরু হয়ে তার দ্বারাই সমাপ্তি লাভ করেছে। তার পূর্বে কোনো শরীআত ছিল না। আর তারপরেও কোনো শরীআত আসবে না। হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্বে যেসব সহীফা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শরীআত ছিল না বরং তা ছিল কিছু বিবেক সঞ্জাত নিয়ম-নীতি (حدود عقليه) ও কল্যাণজনক বিধি- বিধান (احكام مصلحيه)।

২. হযরত মূসা (আ.)-এর শরীআত রহিত (منسوخ) হবে না। ইয়াহুদীগণ শরয়ী বিধান রহিত হওয়া (نسخ)কে যুক্তিসংগত মনে করেন না।

৩. ইয়াহুদীদের রাব্বানী (الربانيون) নামক দল তাক্দীরকে অস্বীকার করেন, যেমন মুসলমানদের মধ্যে কাদরিয়া/মুতিযালাগণ তা অস্বীকার করেন। আর তাদের কুর্‌রা (القرائون) নামক দল মনে করেন মানুষ তাক্দীরের সামনে সম্পূর্ণ অসহায়, যেমন মুসলমানদের মধ্যকার জাব্‌রিয়া ফির্‌কা মনে করে থাকেন।

৪. ইয়াহুদীগণ দুনিয়াতে পুনঃআগমন (عقيدة الرجعة)-এ বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ, কারও মৃত্যুর পর পুনরায় তার দুনিয়াতে ফিরে আসাকে তারা সম্ভব মনে করেন। তারা হযরত উযায়র (আ.)-এর ঘটনা থেকে এ বিষয়ে দলীল দিয়ে থাকেন।[১]

৫. তারা হযরত হারূন (আ.) সম্পর্কে এই ধারণা রাখেন যে, তীহ্ প্রান্তরে হযরত মূসা (আ.) তাঁকে তাওরাতের ফলক দ্বারা আঘাত করলে তাঁর মৃত্যু হয়। তাদের ধারণায় হযরত মূসা (আ.) এটা করেছিলেন তার প্রতি হিংসাবশত। কারণ, হারূনের প্রতি বনী ইসরাঈলের আকর্ষণ বেশি দেখে তাঁর প্রতি মূসা (আ.) হিংসান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। তবে হারূন (আ.)-এর মৃত্যুর ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলেন, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, অচিরেই তিনি ফিরে আসবেন। আর কেউ কেউ মনে করেন তিনি আত্মগোপন করেছেন, অচিরেই ফিরে আসবেন।

৬. ইয়াহুদীগণ মানুষের সাথে আল্লাহ্ তাআলার সাদৃশ্য বিধান করে থাকেন। তারা বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন আসমান-জমিন সৃষ্টি থেকে ফারেগ হন, তখন আরশের উপর চিৎ হয়ে এক পায়ের উপর আর এক পা তুলে শয়ন করেন। ইয়াহুদী-দের একদলের মতে আল্লাহ তাআলা যে ছয় দিনে আসমান-জমিন সৃষ্টি করেন, এই ছয় দিন হল ছয় হাজার বৎসর। কেননা আল্লাহ তাআলার কাছে একদিন মানুষের গণনার এক হাজার বৎসরের সমান।

ইয়াহুদীদের দল-উপদল

ইয়াহুদীদের একাত্তরটা দল। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হল চারটা দল। অবশিষ্ট দলগুলো এদেরই শাখা-প্রশাখা। উক্ত চারটা দল হল–

১. এটা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে আল্লাহ তাআলা সক্ষম তা বোঝানোর জন্য বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা ছিল। এর দ্বারা কোন শাশ্বত নীতি প্রমাণিত করা ভুল।

১. ইনানিয়্যাহ (العنانية)

তারা ইনান ইব্‌নে দাঊদ-এর অনুসারী। তারা শনিবারের ব্যাপারে অন্যান্য ইয়াহুদীদের সাথে বিরোধ করত। তারা পাখি, হরিণ ও টিডিড খেতে নিষেধ করত। তারা জানোয়ারের ঘাড়ের পিছন দিকে জবাই করত। তারা হযরত ঈসা (আ.)কে উপদেশ ও নসীহতের ক্ষেত্রে মান্য করত, তবে তাঁর নবুওয়াতকে স্বীকার করত না।

২. ঈসাবিয়্যাহ (العيسوية)

তারা আবূ ঈসা ইসহাক ইবনে ইয়া'কূব ইসফাহানী-র অনুসারী। মতান্তরে তাদের নেতার নাম উফীদ উলূহীম। তিনি খলীফা মানসূরের যুগের লোক। ইয়াহুদীদের মধ্যে তার প্রচুর অনুসারী ছিল। আবূ ঈসা মনে করতেন- তিনি নবী এবং প্রতিক্ষিত মাসীহের দূত। তিনি দাবী করতেন, আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাকে পাপী ও জালেম সম্রাটদের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি হযরত ঈসা (আ.)কে বনী আদমের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে দাবী করতেন। তিনি সব ধরনের প্রাণী জবাই করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি দশ ওয়াক্ত নামায ওয়াজিব করেন। তিনি আরও বহু বিষয়ে ইয়াহুদীদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন।

৩. মুকারাবাহ ও ইউযআনিয়্যাহ (المقاربة اليوذعانية)

তারা হামাদান-এর অধিবাসী ইউযআন (يوذعان) মতান্তরে ইয়াহুযা (يهوذا)-এর অনুসারী। তিনি সাধারণ ইয়াহুদীদের ব্যাখ্যা থেকে স্বতন্ত্র সব ব্যাখ্যা দিতেন। তাক্দী-রের প্রবক্তা ছিলেন। মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্‌র সাদৃশ্য থাকার বিষয়েও তিনি সাধারণ ইয়াহুদীদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। মুকারাবাদের একটি দল বলত, মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্‌র কথোপকথন অসম্ভব। হযরত মূসা (আ.) তূর পাহাড়ে যার সঙ্গে কথা বলেছিলেন তিনি খোদা নন বরং একজন ফেরেশতা, যে ফেরেশতার মধ্যস্থতায় আল্লাহ তাআলা নবীদের সঙ্গে কথা বলে থাকেন।

মুশকানিয়্যাহ (الموشكانية)

মুশকানিয়্যাহ দলটা মূলত পূর্বোক্ত দলেরই একটা শাখা। তারা মুশকান নামক জনৈক ব্যক্তির অনুসারী। এই মুশকান ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েয মনে করতেন। এই মুশকানিয়্যাহ দলের কিছু লোক হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সা.)কে ইয়াহুদী ব্যতীত অন্যান্য আরবদের নবী বলে স্বীকার করতেন।

৪. সামিরাহ (السامرة)

তারা বায়তুল মুকাদ্দাস ও মিসরের অধীনস্থ কিছু গ্রামে বাস করত। এই সামিরা-হদের মধ্যে উল্‌ফান (الألفان) নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, যিনি নবুওয়াতের দাবী করেন এবং বলেন তিনিই সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে মূসা (আ.) সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। সামিরাহদের দুটো উপদল ছিল। (এক) দোস্তানিয়া, (দুই) কোস্তানিয়া।

দোস্তানিয়া দলটা পরকালের ছওয়াব বা শাস্তিকে অস্বীকার করত। তারা বলত, শাস্তি বা পুরস্কার যা হওয়ার তা দুনিয়ার বিষয়।[১]

ইয়াহুদীদের ধর্মীয় গ্রন্থ: তাওরাত

এ সম্পর্কে অত্র গ্রন্থের ১ম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন ১১১–১১৮ পৃষ্ঠা।

খৃষ্টীয় ধর্ম
(Chrisianity)

যিশু খৃষ্ট (عیسیٰ ؑ)-এর শিক্ষার উপর নির্ভরশীল ধর্মকে বলা হয় খৃষ্টীয় ধর্ম। এই ধর্ম ও তার মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়সমূহ "খৃষ্টীয় সমাজ" নামে পরিচিত। ইন্‌সাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকায় খৃষ্টধর্মের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে–

"যে ধর্ম নাসিরার বাসিন্দা ঈসা মাসীহের সংগে তার মৌলিক সম্পর্ক রয়েছে বলে এবং তাঁকে (ঈসা মসীহকে) আল্লাহ্‌র মনোনীত বলে মানে।"[২]

খৃষ্টানদের দল-উপদল

খৃষ্টীয় সমাজ বহু দল-উপদলে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রধানত দুটো দল প্রসিদ্ধ। যথা:–

(এক) "ঐতিহ্যবাহী" খৃষ্টীয় সমাজ

"ঐতিহ্যবাহী" খৃষ্টীয় সমাজ বলতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মসমাজ ও নিষ্ঠাবান প্রাচ্য চার্চ (অর্থোডক্স্ ইস্টার্ন চার্চ) প্রভৃতিকে বোঝানো হয়। যারা আদিকালের ধর্মমত, আচার ও অনুষ্ঠানসমূহকে রীতিমতভাবে সম্প্রসারিত ও উন্নত করে অনুসরণ করেন বলে দাবি করে। তারা আদিকালের খৃষ্টীয় রীতিনীতির উপর রয়েছেন বলে তাদেরকে "ঐতিহ্যবাহী" খৃষ্টীয় সমাজ বলা হয়।

(দুই) "সংস্কারকৃত" খৃষ্টীয় সমাজ

"সংস্কারকৃত" খৃষ্টীয় সমাজ "প্রটেস্টান্ট" (Protestant) নামে খ্যাত। তারা দাবি করে যে, তারা খৃষ্টীয় ধর্মের যাবতীয় মিথ্যা সংযোজন ও উদ্ভাবন বাদ দিয়ে আদি খৃষ্টীয় মতবাদ ও ধ্যান-ধারণাসমূহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা ধর্মের মধ্যে সংস্কারের দাবী করে বলে তাদেরকে "সংস্কারকৃত (Reformed) খৃষ্টীয় সমাজ" বলা হয়।

উপরোক্ত ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় ছাড়াও খৃষ্টানদের মধ্যে অসংখ্য ফিরকা বা দল-উপদল রয়েছে। যেমন:– মুলকানিয়া, নাস্তুরিয়া, ইয়া'কূবিয়া, ইউযানিয়া, মুরকুলিয়া প্রভৃতি।[৩]

---

১. الملل والنحل للشهر ستاني ও اعظمی مذہب یہود. بحر العلوم مولنا نعمت اللہ صاحب গ্রন্থদ্বয় থেকে গৃহীত।
২. ইন্‌সাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৯।
৩. كتاب الخطط للعلامة تقي الدين القريزي

খৃষ্টানদের আদিকালের অভ্যন্তরীণ পার্থক্যগুলো কেন্দ্রীভূত ছিল খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের অন্তর্ভুক্ত অপরাপর সত্তাদ্বয়ের সম্পর্কে খৃষ্টের প্রকৃতি সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কের উপর। এ সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কাউনসিল (পরিষদ) আহূত হত; গৃহীত উত্তরগুলো নিষ্ঠাবান (Orthodox)দের অভিমত এবং পরিত্যক্ত উত্তরগুলো ধর্মমত বিরোধী (Heretical) বলে বিবেচিত হত।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এশিয়া মাইনর ও উত্তর আফ্রিকাতে খৃষ্টধর্মই প্রধান ধর্ম ছিল। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর এসব অঞ্চল থেকে খৃষ্টধর্ম গুটিয়ে ক্রমান্বয়ে ইউরোপ ও পাশ্চাত্য অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়।

আধুনিক খৃষ্টধর্মের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় দলের মধ্যে মতবিরোধ, মতানৈক্যের সম্মিলন প্রচেষ্টা এবং রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে স্থায়ী ও যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সংগ্রাম।[১]

খৃষ্টধর্মের বিশেষ কয়েকটা দর্শন

১. ত্রিত্ববাদ (عقیدۂ تثلیث)

খৃষ্টবাদের প্রধান আকীদা তথা সবচেয়ে বহুল আলোচিত ও সর্বাধিক বিতর্কিত দর্শন হল ত্রিত্ববাদ দর্শন।[২] "ত্রিত্ববাদ" অর্থ হল তিন খোদার সমষ্টিকে খোদা বলার মতবাদ। খৃষ্টধর্মের মতবাদ অনুযায়ী পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা (রূহুল কুদ্স) এই তিনটি সত্তা (اقنوم/Person)-এর সমষ্টি হল খোদা (God)। মতান্তরে এই তিনটি সত্তা হল পিতা, পুত্র ও কুমারী মরিয়ম। তারা 'পিতা' বলতে আল্লাহ, 'পুত্র' বলতে আল্লাহ্‌র কালামগুণ যা হযরত ঈসা (আ.)-এর আকৃতিতে আগমন করেছিল এবং 'পবিত্রাত্মা' বলতে এক দলের মতে হযরম মরিয়ম আরেক দলের মতে জিব্রাঈল (আ.)কে বুঝিয়ে থাকেন।

আলফ্রেড এ গার্ভের দেয়া খৃষ্টধর্মের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– এটি একটি ধর্ম যা নৈতিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক একেশ্বরবাদিতা এবং প্রায়শ্চিত্তের প্রতি ঈমান রাখে ...। এখানে বোঝানো হয়েছে খৃষ্টধর্ম একেশ্বরবাদিতা বা তাওহীদে বিশ্বাসী। তিন খোদার আকীদা সেই একেশ্বরবাদিতার পরিপন্থী হয়ে যায়, তাই খৃষ্টানজগত বলে থাকে, তিনে মিলে এক এবং একে তিন। এভাবে তারা ত্রিত্ববাদের মধ্যে তাওহীদ বা একেশ্বরবাদ রক্ষা হয় বলে দেখানোর চেষ্টা করেন। এটাকে তারা নাম দিয়েছেন "ত্রিত্বের একত্ব" (توحید فی التثلیث)। ইন্‌সাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে,

"পিতা গড্, পুত্র গড্, রুহুল কুদ্সও গড্ কিন্তু তারা মিলিতভাবে তিন খোদা বা তিন গড্ নন বরং একই গড্। কেননা খৃষ্টধর্মের ভাবধারা অনুসারে আমরা এই তিন সত্তার প্রত্যেককেই গড্ মেনে নিতে যেমন বাধ্য, তেমনি রোমান ক্যাথলিক

---

১. মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড।
২. ত্রিত্ববাদকে ইংরেজিতে বলা হয় "ট্রিনিটেরিয়ান ডকট্রিন" (Trinitarian Doctrine)।

ধর্ম এই তিনজনকে তিন জন খোদা এবং গড্ মানতেও আমাদেরকে কঠিনভাবে নিষেধ করছে।[১]

এই তিন সত্তার স্বতন্ত্রভাবে মর্যাদা কী? এবং সমষ্টির সাথে তাদের সম্পর্ক কী? এ বিষয়টা নিয়ে খৃষ্টানজগতে মতভেদের অন্ত নেই। কেউ কেউ বলেন, এই তিনের সমষ্টি খোদার যে মর্যাদা, স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকেরও সেই মর্যাদা। সমষ্টি যেমন খোদা, তেমনি তিন জনের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে এক এক জন খোদা। কেউ কেউ বলেন, এই তিন জনের প্রত্যেকেই খোদা হলেও স্বতন্ত্রভাবে তাদের মর্যাদা সমষ্টির তুলনায় কম। কিছুটা ব্যাপক অর্থেই এদেরকে খোদা বলা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, স্বতন্ত্রভাবে এই তিন জন খোদাই নন বরং তাদের সমষ্টি হল খোদা। "তিনের এক এবং একের তিন" হওয়ার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা না দিতে পেরে এবং কোনো উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে কোন কোন খৃষ্টান ব্যাখ্যাকার মুখ বাঁচানোর একটা ফন্দী বের করে বলেছেন, "ত্রিত্ববাদ" মানব জ্ঞানের অগম্য (متشابهات) পর্যায়ের একটা বিষয়। রোমান ক্যাথলিক চার্চের অধিকাংশ পণ্ডিত বলেছেন, "তিনের এক এবং একের তিন হওয়া এমন একটি গোপনীয় সত্য যা বুঝবার সাধ্য আমাদের নেই।" কিন্তু এমন বললে যে কেউ ধর্মের নামে যে কোন অযৌক্তিক বিষয় উদ্ভাবন করে সেটাকে চালিয়ে দেয়ার একটা মোক্ষম অস্ত্র হাতে পেয়ে যাবে, তা বোধ হয় তারা ঠাহর করতে পারেননি। কিংবা পারলেও কোনো উপায়ান্তর না থাকায় বুঝে শুনেই তারা এমন বেখাপ্পা বস্তু গলাধকরণ করেছেন। আর প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় যেকোনো ব্যাখ্যা দিতে যাওয়া নিরাপদ নয় দেখে নিরবতাকেই নিজেদের নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করেছে।

সারকথা– এরূপ অসংখ্য ব্যাখ্যা হেতু ত্রিত্ববাদ অদ্যাবধি ধাঁধাই হয়ে রয়েছে। তাই খৃষ্টানদের এবিউনী সম্প্রদায় শুরুতেই আত্মসমর্পন করে বলেছেন, "যাই বলুন না কেন "হযরত মাসীহ (আ.)কে খোদা মেনে নিয়ে কিছুতেই আমরা তাওহীদ রক্ষা করতে পারব না।" পল ও লুসিয়ান প্রমুখ অনেকেই স্পষ্টত বলে দিয়েছেন, হযরত মাসীহকে খোদা মানাই ভুল। তিনি শুধুমাত্র একজন মানুষ বৈ কিছু নন।[২] পল ও লুসিয়ানের অনুকরণে চতুর্থ শতাব্দির বিখ্যাত পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ আরিউস সমসাময়িক চার্চের বিরুদ্ধে বিরাট সংগ্রাম আরম্ভ করেন এবং সমগ্র খৃষ্টান জগতকে কাঁপিয়ে তোলেন।[৩]

---

১. খৃষ্টধর্ম ও বাইবেল, মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের সাহেব, ভারত। বরাত –ইন্‌সাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা, খ. ২২, পৃ. ৪৭৯।

২. খৃষ্টধর্ম ও বাইবেল, মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের সাহেব, ভারত। বরাত -ইন্‌সাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা, খ. ১৭, পৃ. ৩৯৮।

৩. খৃষ্টানদের এই ত্রিত্ববাদ কতটা অযৌক্তিক এবং তাদের অন্যান্য আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক, তা সামান্য চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তদুপরি এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য দেখুন মাওলানা আবু তাহের (মদনী নগর, কলিকাতা) কর্তৃক রচিত "খৃষ্টধর্ম ও বাইবেল"।

২. অবতার হওয়ার আকীদা (عقيدۂ حلول/incarnation)

পূর্বের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, হযরত ঈসা মাসীহ (আ.) সম্পর্কে খৃষ্টানদের আকীদা-বিশ্বাস এই ছিল যে, তিনি খোদার পুত্র ছিলেন। এই "পুত্র" কথার ব্যাখ্যায় তারা বলেন যে, পুত্র হল আল্লাহ্‌র কালাম বা বাণী–গুণ (অর্থাৎ, পুত্রের সত্তা) যা মানব কল্যাণের জন্য হযরত ঈসা মাসীহের মানবীয় সত্তায় অবতারিত হয়েছিল। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন এই খোদায়ী সত্তা তাঁর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ছিল। ইয়াহুদী কর্তৃক তাঁকে শূলবিদ্ধ করার পর তার দেহ থেকে এই খোদায়ী সত্তা পৃথক হয়ে যায়। সারকথা– খোদার কালাম গুণ (صفت کلام) শরীরী রূপ ধারণ করে ঈসা মাসীহের রূপ নিয়ে আগমন করেছিল। "স্টাডিজ ইন খ্রিস্টিয়ান ডকট্রিন্‌স" গ্রন্থে বলা হয়েছে, যে সত্তা খোদা ছিল, তিনিই খোদায়ীর গুণ পরিত্যাগ ব্যতিরেকে মানুষ হয়ে যান। অর্থাৎ, তিনি আমাদের মত অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে নেন, যা স্থান ও কালের গণ্ডিতে গণ্ডিবদ্ধ। তারপর একটা কাল পর্যন্ত আমাদের মধ্যে অবস্থান করেন।[১]

৩. প্রায়শ্চিত্তের আকীদা (عقيدۂ کفاره/Atonement)

খৃষ্টবাদের দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ আকীদা হল প্রায়শ্চিত্তের আকীদা (Atonement/ অ্যাটোন্‌মেন্ট)। খৃষ্টানদের ধারণামতে যিশু খৃষ্ট শূলে বিদ্ধ হয়ে খৃষ্টজগতের সকলের ঐই পাপ মোচনের ব্যবস্থা করে গেছেন যা আদম (আ.)-এর ভুলের কারণে তার প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যে প্রবেশ করেছিল।[২] এভাবে জগতকে রেহাই দেয়াই পৃথিবীতে যিশু খৃষ্টের আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এটাই হল তাদের ভাষায় প্রায়শ্চিত্ত বা কাফ্‌ফারা (পাপমোচন)। এই প্রায়শ্চিত্ত তথা কাফ্‌ফারার আকীদা-বিশ্বাস খৃষ্টধর্মের একটা মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস। এমনকি খৃষ্টধর্মের সংজ্ঞার মধ্যে এই বিশ্বাসের কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। আলফ্রেড এ গার্ভে বলেন,

"খৃষ্টধর্মের সংজ্ঞা এভাবেও দেয়া যায় যে, খৃষ্টধর্মই হল এমন একটি ধর্ম, যা নৈতিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক একেশ্বরবাদিতা ও কাফ্‌ফারার প্রতি ঈমান রাখে, যে ধর্মে ঈসা মাসীহের ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শ দ্বারা আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্ককে পাকা-পোক্ত করে দেয়া হয়েছে।[৩]

৪. ক্রুশারোহণের আকীদা (عقيدۂ مصلوبيت/Crucifixion)

প্রায়শ্চিত্তের আকীদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, খৃষ্টানদের ধারণামতে যিশু খৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।[৪] এটাকে বলা হয় ক্রুশারোহণের আকীদা বা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে

---

১. بائبل سے قرآن تک تقی عثمانی

২. প্রাগুক্ত

৩. খৃষ্টধর্ম ও বাইবেল, মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের সাহেব, ভারত। বরাত- ইন্‌সাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজনস এণ্ড এথিক্‌স, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১৮।

৪. এখানে একথা স্মর্তব্য যে, খৃষ্টানদের অধিকাংশ দলের মতে ফাঁসী যাকে দেয়া হয়েছিল তিনি পুত্রের সত্তা (اقنوم ابن) নন, যিনি খৃষ্টানদের নিকট খোদা। বরং ফাঁসী যাকে দেয়া হয়েছিল তিনি ছিলেন পুত্র সত্তা (اقنوم ابن)-এর মানবীয় প্রকাশ (نسانی مظہر) অর্থাৎ, মাসীহ; যিনি মানবীয় দিক থেকে খোদা নন। -প্রাগুক্ত

মৃত্যুবরণ করার আকীদা (Crucifixion/ক্রুসিফিকসন)। খৃষ্টানদের বিশ্বাসমতে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে ঈসা মাসীহ মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁকে যথারীতি কবর দেয়া হয়। তার তিনদিন পর তিনি পুনরায় জীবিত হন এবং হওয়ারীদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দান করত আকাশে আরোহণ করেন।

৫. ক্রুশকে সম্মানের রীতি

ক্রুশারোহণের আকীদা থেকেই খৃষ্টান জগতের নিকট ক্রুশচিহ্ন (✞) বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। তবে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দি পর্যন্ত এই ক্রুশচিহ্নের সামাজিক কোনো গুরুত্ব ছিল না। সম্রাট কন্‌স্ট্যান্টিন সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, ৩১২ খৃষ্টাব্দে তিনি তার এক প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন (সম্ভবত স্বপ্নে) আকাশে একটি ক্রুশের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন। তার পর ৩২৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তার মাতা সেন্ট হেলেনা এক স্থানে একটি ক্রুশ পান, যার সম্পর্কে লোকদের ধারণা– এটিই সেই ক্রুশ (খৃষ্টানদের ধারণামতে) যার উপর ঈসা মাসীহকে শূলে দেয়া হয়েছিল। এরপর থেকে ক্রুশ খৃষ্টান জগতের কাছে খৃষ্টধর্মের প্রতীক (Symbol) হিসাবে মর্যাদা লাভ করে এবং তারা উঠতে বসতে সর্বত্র এটি ব্যবহার করতে শুরু করে। এই ঘটনার স্মরণে প্রতি বৎসর ৩ মে খৃষ্টানগণ অনুষ্ঠান করে থাকেন।[১]

৬. পুনর্জীবনের আকীদা (Resurrection)

পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, খৃষ্টানদের বিশ্বাসমতে হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার তিন দিন পর পুনরায় জীবিত হয়ে দুনিয়ায় আগমন করেন। এটা হল খৃষ্টানদের পুনর্জীবনের আকীদা (Resurrection/রেজারেক্‌শন)।

ক্যাথলিক খৃষ্টানদের আরও কিছু আকীদা-বিশ্বাস

১. আশায়ে রব্বানী (عشاء ربانی)

"আশায়ে রব্বানী" বা ঈশ্বরভোজ[২] খৃষ্টানদের একটা প্রসিদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। আজও ক্যাথলিকগণ অত্যন্ত বিশ্বাসের সাথে এই অনুষ্ঠানকে আঁকড়ে ধরে আছেন।

মি. জাষ্টিন মার্টিয়ারের বর্ণনামতে আশায়ে রব্বানী অনুষ্ঠান নিম্নরূপ– প্রতি রবিবারে গীর্জায় একটি সমাবেশ হয়। প্রারম্ভে কিছু দুআ, কিছু গান, অতঃপর উপস্থিতবৃন্দের একে অন্যকে চুম্বনপর্ব ও মুবারকবাদের পর রুটি এবং শরাব আনীত হয়। সভাপতি তা গ্রহণ করত পিতা, পুত্র এবং রুহুল কুদ্‌স (পবিত্রাত্মা)-এর নামে দুআ প্রার্থনা করেন। উপস্থিতদের সকলেই তার সঙ্গে আমীন আমীন বলেন। অতঃপর গীর্জার সেবায়েতগণ ঐ রুটি এবং শরাব উপস্থিতদের মধ্যে বিতরণ করেন। রুটি এবং শরাব বিতরণের সংগে সংগেই রুটি হযরত ঈসা (আ.)-এর দেহে এবং শরাব

১. بائبل سے قرآن تک تقی عثمانی

২. এই "আশায়ে রব্বানী" বা ঈশ্বরভোজ-কে ইংরেজিতে বলা হয় "Lords supper", "Euchirist", "Saered Meal", "Holy cormunion" প্রভৃতি।

ঈসা (আ.)-এর রক্তে পরিণত হয়ে যায়। উপস্থিতগণ ঐ রুটি এবং শরাব পানাহার করেন। (অর্থাৎ, প্রকারান্তরে তারা যেন যিশু খৃষ্টের রক্ত মাংস পানাহার করেন।) এভাবে পানাহার করে তারা প্রায়শ্চিত্ত আকীদার পূণ্য-স্মৃতি রোমন্থন করেন।[১]

২. ক্যাথলিকদের পোপবাদ

পোপদের সম্পর্কে ক্যাথলিকদের আকীদা-বিশ্বাস নিম্নরূপ–

(এক) পোপের প্রতি ঈমান না আনলে নাজাত বা মুক্তি পাওয়া যায় না। ঈমান আনলেই মুক্তি, তা তিনি যত দুশ্চরিত্র এবং জঘন্য প্রকৃতির হন না কেন।

(দুই) ক্যাথলিকদের আকীদা হল– পোপ হাওয়ারীদের নেতা জনাব পিটার্সের নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত এবং পিটার্সের যাবতীয় অধিকারের অধিকারী। এমনকি পিটার্সের যে সমস্ত মর্যাদা তথা তিনি হযরত মাসীহ (আ.)-এর মেষপালের রাখাল, (যোহন) গীর্জার মূলস্তম্ভ, তার হাতে আসমানের রাজ্যের সকল কুঞ্জিকা এবং চাবিকাঠি (মথি) রয়েছে, প্রত্যেক পোপেরও সেই সমস্ত মর্যাদা এবং ক্ষমতা রয়েছে।[২]

(তিন) পোপ পাপ ও ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে পাক-পবিত্র।

(চার) শুধু রোমের পাদ্রীই গ্রাণ্ড পোপ হতে পারেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কেউ গ্রাণ্ড পোপ হতে পারে না।

(পাঁচ) পোপ পবিত্রতা অর্জনকারীদের নিকট থেকে নজরানা বা ভেট গ্রহণ করে বিনিময়ে তাদেরকে ক্ষমাপত্র দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ, টাকার বিনিময়ে পোপ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন। জন টিট্‌জেল নামক পাদ্রী ১৫১৭ সালে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, "কেউ যদি তার মায়ের সঙ্গেও ব্যভিচার করে এবং পোপের মার্জনা বাক্সে কিছু অর্থ রেখে দেয়, তাহলে তার দুনিয়া আখেরাত ইহকাল পরকালের পাপ মার্জনা করে দেয়ার অধিকার পোপের রয়েছে। আর বলা বাহুল্য যে, পোপ যদি মার্জনা করে দেন, তবে আল্লাহ্‌কেও তা মেনে নিতে হবে।"[৩]

(ছয়) গ্রাণ্ড পোপ যে পর্যন্ত ক্ষমা না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত 'সিদ্দীকীন' সাধুদের আত্মা জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে থাকবে। এ আকীদায় বোঝানো হয়েছে যে, মৃতদের মার্জনা পোপদের হাতে। এ মর্মে দশম পোপ লিও ডকুমেন্টারী টিকেট চালু করেন। যা তিনি বা তার প্রতিনিধিরা পূর্বাপর সমস্ত পাপের মার্জনা-প্রার্থীদের নিকট বিক্রয় করে থাকেন। ইন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় এই টিকেটের ভাষা ও বর্ণনার বিশদ বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

১. খৃষ্টধর্ম ও বাইবেল, মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের সাহেব, ভারত। বরাত -The Christian Religion, p. 149, V. 3.

২. খৃষ্টধর্ম ও বাইবেল

৩. খৃষ্টধর্ম ও বাইবেল, বরাত– Short History of the Chirch.

(সাত) বৈধকে অবৈধ এবং অবৈধকে বৈধ করার অধিকার পোপের রয়েছে।[১] ইন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে, হারামকে হালাল বা জায়েয করার অধিকার প্রাপ্ত পোপের রয়েছে।

(আট) পোপ, বিশপ এবং ডিকন-দের[২] পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ। তাদেরকে চিরকুমার থাকতে হবে।[৩]

বি: দ্র: এতক্ষণ খৃষ্টানদের আকীদা-বিশ্বাস সম্বন্ধে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, তা তাদের ধর্ম সম্পর্কিত কিতাবী বর্ণনা। এ বর্ণনা মোতাবেক তারা আস্তিক বলে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বাস্তবে খৃষ্টজগতের অনেকেই বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী। সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ে বিবর্তনবাদে বিশ্বাস, অর্থনৈতিক বিষয়ে পুঁজিবাদে বিশ্বাস এবং সমাজ-সামাজিকতায় ফ্রয়েডের অবাধ যৌনাচারিতার নীতি– এর উপরেই গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্য সভ্যতা।

খৃষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ: ইঞ্জীল

ইঞ্জীল সম্পর্কে এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন ১১৮ পৃষ্ঠা।

বৌদ্ধধর্ম
(Budhism)

গৌতম বুদ্ধের বাণী ও উপদেশের উপর ভিত্তি করে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে নীতি, বিধান ও মতবাদ গড়ে উঠেছে তাই "বৌদ্ধদর্শন" বা "বৌদ্ধধর্ম"। বুদ্ধের উপদেশ, বাণী ও চিন্তা-ধারণাই বৌদ্ধদর্শনের উৎস ও ভিত্তি। এ কারণেই এ দর্শন বা ধর্মকে "বৌদ্ধ"-এর প্রতি সম্পৃক্ত করে বলা হয় "বৌদ্ধদর্শন" বা "বৌদ্ধধর্ম"।

প্রথমে গৌতম বুদ্ধের উপদেশাবলী মুখে মুখেই প্রচারিত হয়। এরপর সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম নামে তিনটি গুচ্ছতে সংকলিত হয়ে ত্রিপিটক নাম ধারণ করে। এই ত্রিপিটকই বৌদ্ধধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ। ভারতের সম্রাট অশোকের রাজত্ব কালে (খ্রি. পূ. ৩য় শতকে) বৌদ্ধধর্ম চরম উন্নতি লাভ করে। পরবর্তীকালে ভারতে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলেও অন্যান্য স্থানে তা টিকে থাকে। বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড,

১. খৃষ্টধর্ম ও বাইবেল বরাত– ব্রিটানিকা, ১৮ খণ্ড, ২২২ পৃষ্ঠা।

২. পোপ, বিশপ পাদ্রী, ডিকন প্রভৃতি খৃষ্টানদের বিভিন্ন স্তরের ধর্মপুরুষ বা ধর্মযাজকের নাম।

৩. এ প্রসঙ্গে সেন্ট বার্ণার্ড তার লিখিত গীতি-বিতান গ্রন্থে লিখেছেন– "তারা চার্চ বিবাহের পবিত্র প্রথাকে নির্বাসন দিয়েছেন। যে সহবাস সর্বপ্রকার নোংরামী এবং অপবিত্রতা থেকে পাক-পবিত্র ছিল, এরা তাকেও বিসর্জন দিয়েছে; তৎপরিবর্তে ছেলেদের, মা বোনদের সঙ্গে ব্যভিচার দ্বারা নিজেদের শয়ন-শয্যাকে নাপাক করেছে, অপবিত্র করেছে, সর্বপ্রকার নোংরামিতে ভরে দিয়েছে।" ১৫০০ খৃষ্টাব্দের বিশপ জন সাটস বার্গ বলেন, "আমি অল্পসংখ্যক পাদ্রীই দেখেছি যারা স্ত্রীলোকদের সংগে অত্যধিক পরিমাণে ব্যভিচারে অভ্যস্ত নন। পাদ্রী স্ত্রীলোকদের ধর্মালয় বেশ্যালয় এবং ব্যভিচারের আড্ডাখানায় পরিণত হয়ে রয়েছে।

নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে এখনও প্রচুর সংখ্যক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে তারা সংখ্যায় প্রধানতম।

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক হলেন গৌতম বুদ্ধ। তিনি জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন। পিতা শুদ্ধোদন শাক্য বংশের প্রধান বা রাজা ছিলেন। উত্তর প্রদেশের বস্তিজেলার পিপরাওয়ার মতান্তরে নেপালের তিলৌরা কোটে শাক্য-রাজধানী কপিলাবস্তু অবস্থিত ছিল। শুদ্ধোদন-পত্নী মায়াদেবীর পিত্রালয়ে যাওয়ার সময় কপিলাবস্তুর নিকটবর্তী লুম্বিনী উদ্যানের শালবৃক্ষ মূলে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৩ সালে সিদ্ধার্থের/ গৌতমের জন্ম হয়। পরে বুদ্ধত্ব লাভের পর তার নামের সঙ্গে বুদ্ধ কথাটা যোগ হয়। গৌতম রাজকীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হলেও বাল্যকাল থেকে সিদ্ধার্থ বা গৌতম চিন্তাশীল ও বৈরাগ্য ভাবাপন্ন ছিলেন। সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য গোপা বা যশোধরা নাম্নী স্বগোত্রীয় এক অনুপম সুন্দরী নারীর সঙ্গে তার বিয়ে দেয়া হয়। এর কিছু দিনের মধ্যে তার একজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। গৌতম বুদ্ধ তার নাম রাখেন রাহুল।

গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ প্রসঙ্গ

খৃষ্টপূর্ব ৫৯৪ অব্দের এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা তীথির গভীর রাতে উনত্রিশ বৎসর বয়সে গৌতম চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করে সত্যান্বেষণে বের হন। প্রথমে তিনি বৈশালী নগরীতে গিয়ে তিথীক, জটিল, মুণ্ড, নির্গন্থ প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হন। তৎকালীন সুবিখ্যাত মুনি ও ঋষি আরাড় কালাম ও রুদ্রকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি মুক্তির পথ সন্ধান করেন। কিন্তু কারও নিকট থেকে দুঃখের রহস্য উদঘাটন তথা মুক্তির সন্ধান না পেয়ে শ্রাবস্তী হয়ে তিনি রাজগৃহে উপস্থিত হন। সেখানে মগধরাজ বিম্বিসারের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। পরে তিনি গয়ার নিকটে কঠোর কৃচ্ছসাধনে প্রবৃত্ত হন। পাঁচজন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে নির্জন জঙ্গলে কঠোর সংযম পূর্বক দীর্ঘ ছয় বৎসর তপস্যা চালান। কিন্তু তাতে নিষ্ফল হন। তখন গৌতম সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে মধ্যম পন্থায় সাধনার উদ্দেশ্যে গয়ার নিকটবর্তী উরবিল্ব নামক গ্রামে চলে আসেন। তার এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দরুন তার পাঁচ সহযোগী সন্যাসী তাকে ত্যাগ করেন। তিনি গয়ার নৈরাঞ্জনা নদী-তীরে অশ্বত্থবৃক্ষ তলে পুনরায় ধ্যানমগ্ন হন এবং সত্য সন্ধান পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধ্যান মগ্ন থাকার দৃঢ় সংকল্প করেন। অবশেষে প্রায় পঞ্চাশ দিন পর শ্রেষ্ঠী কন্যা সুজাতা পায়সান্ন দিয়ে তাকে সেবা করেন। ৩৫ বৎসর বয়সে (৫৮৮ খ্রি. পূ.) বৈশাখী পূর্ণিমা তিথির শেষ রাতে তিনি বোধি বা চরম জ্ঞান লাভ করেন। এভাবে আনন্দময় নির্বাণের অধিকারী হয়ে এবং বুদ্ধত্ব সম্যক জ্ঞান লাভ করে তিনি জগতবাসীর কাছে বুদ্ধ নামে খ্যাত হন।

বুদ্ধের ধর্ম প্রচার ও "পরিনির্বাণ" লাভ প্রসঙ্গ

বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ তার সাধনালব্ধ জ্ঞান মানুষের কাছে প্রচার করতে থাকেন। ভিক্ষাপাত্র হাতে নগ্ন পদে ও পদব্রজে বুদ্ধ দীর্ঘ ৪৫ বৎসর ভারতের গ্রামে গ্রামে ও জনপদে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভ্রমণ করে স্বীয় ধর্ম প্রচার করেন। এরপর ৮০ বৎসর বয়সে খৃষ্টপূর্ব ৫৪৩ সালে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কুশী নগরে মল্লদের শালবনে (বৌদ্ধদের মতে) গৌতম বুদ্ধ মহা পরিনির্বাণ লাভ করেন।

বৌদ্ধদের দুটো শাখা প্রসঙ্গ

বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের পর একশত বিশ বৎসরের মধ্যে তারা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কালের বিবর্তনে এই একাধিক সম্প্রদায় দুটো মূল শাখায় গিয়ে মিলিত হয়। এই দুটো মূল শাখা হল–

১. হীনবানবাদ বা থেরবাদ।

২. মহাযানবাদ।

হীনবান বা থেরবাদ প্রসার লাভ করেছে ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে। আর মহাযানের বিকাশ ঘটেছে নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে। ভৌগোলিক দিক থেকে অনেকে মহাযানকে উত্তরমুখী বৌদ্ধধর্ম (Northern Buddism) এবং থেরবাদকে দক্ষিণমুখী বৌদ্ধধর্ম (Southern Buddism) বলেন। এদের মাঝে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মকে মনে করা হয় বিশুদ্ধতর ও মৌলিক। আর মহাযান বৌদ্ধধর্মকে মনে করা হয় আংশিকভাবে মৌলিক আর আংশিকভাবে সংযোজিত। থেরবাদীদের ধর্ম-সাহিত্য রচিত হয়েছে পালি ভাষায়, আর মহাযানীদের ধর্ম-সাহিত্য রচিত হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়।

বুদ্ধ দর্শনের সারকথা: ৪টা মহাসত্য ও দ্বাদশ নিদান প্রসঙ্গ

গৌতম বুদ্ধ মানব জীবন নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে এ উপলব্ধি করেছিলেন যে, জগত 'সব্বং দুঃখময়' অর্থাৎ, জগত দুঃখময়। আর এ দুঃখ আট প্রকার। যথা:– জন্ম, ব্যাধি, বার্ধক্য, মরণ, অপ্রিয় সংগ, প্রিয়বিরহ, ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি, ও পঞ্চ স্কন্দ[১] জাত দুঃখ।

গৌতম দুঃখের প্রভাব থেকে মুক্তি খুঁজতে গিয়ে বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং সে অবস্থায় জগতের মূল সত্য তার নিকট চার আর্য বা সত্য রূপে উদ্ভাসিত হয়েছিল। বুদ্ধের সেই চারটি মহাসত্য হল–

(ক) রূপ: চারি মহাভূত পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি।

(খ) বেদনা: ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বস্তু বা এদের সংস্পর্শে এসে যে সুখ-দুঃখ বা অসুখ-অদুঃখ অনুভব করা হয়।

১. রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই হল পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ।

(গ) সংজ্ঞা: বেদনা বা ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বস্তুর অনুভূতির পর মনে যে প্রাথমিক ধারণা বা জ্ঞান জন্মে।

(ঘ) সংস্কার: রূপ, বেদনা ও সংজ্ঞা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তির যে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কের উপর রেখাপাত করে ও যা ভবিষ্যত জ্ঞানের সহায়ক হয় বা যা দ্বারা কোন কিছু জানা যায়। এই প্রক্রিয়ার সমষ্টিই হচ্ছে সংস্কার।

(ঙ) বিজ্ঞান: চেতনা বা মনকে বিজ্ঞান বলে। এই পঞ্চস্কন্ধ যখন তৃষ্ণার বিষয় হয়ে ব্যক্তির সান্নিধ্যে আগমন করে, তখন এদেরকে উপাদানস্কন্ধ বলা হয়। উপাদানস্কন্ধকে বুদ্ধ দুঃখময় বলেছেন। তিনি বলেছেন,

১. অস্তিত্বই দুঃখের কারণ।
২. দুঃখের মূলে রয়েছে বাসনা।
৩. বাসনার নিবৃত্তিতেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়।
৪. এবং মহান 'অষ্টনীতি' (অষ্টপন্থা) অনুসরণেই বাসনা নিবৃত্তির উপায় নিহিত।

তথ্য বিচারে চার আর্য বা সত্য হচ্ছে বুদ্ধের সমগ্র ধর্ম ও দর্শনের সারকথা। আর বুদ্ধের ধর্ম ও চার আর্য সত্য- এই উভয়ের সারকথা হচ্ছে কার্যকারণ নীতি বা শৃংখলা। বুদ্ধের ১ম ও দ্বিতীয় সত্যটি স্বাভাবিক কার্যকারণ নিয়ম হতে নিঃসৃত। যে স্বাভাবিক কার্যকারণ নিয়মকে বুদ্ধ 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' বলেছেন। বৌদ্ধধর্মে কার্যকারণ শৃংখলে ১২টি কারণ আছে। তাই একে দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্র[১] বলে।

কারণ থেকে কার্যের দিকে অগ্রসর হলে দ্বাদশ নিদানের সংক্ষিপ্ত রূপ দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

১. অবিদ্যা (ভ্রান্ত ধারণা) দুঃখের মূল কারণ। আর অবিদ্যা থেকে-
২. সংস্কার (গত জীবনের পূর্বাভিজ্ঞতার ছাপ), সংস্কার থেকে-
৩. বিজ্ঞান (চেতনা), চেতনা থেকে-
৪. নাম-রূপ (দেহমন সংগঠন বা মন ও দৃশ্যমান শরীরী পদার্থ), নাম-রূপ থেকে
৫. ষড়ায়তন (ছয় জ্ঞানেন্দ্রীয় অর্থাৎ, পঞ্চ ইন্দ্রীয় ও মন), ষড়ায়তন থেকে
৬. স্পর্শ (জ্ঞেয়ের সংগে জ্ঞাতৃরূপী মনের সংযোগ), স্পর্শ থেকে
৭. বেদনা (অনুভূতি) বা ইন্দ্রীয় অভিজ্ঞতা, বেদনা থেকে
৮. তৃষ্ণা (আসক্তি বা ভোগ স্পৃহা), তৃষ্ণা থেকে
৯. উপাদান (জাগতিক বস্তুর সংযোগতা), উপাদান থেকে
১০. ভব (জন্মের তীব্র বাসনা), ভব থেকে
১১. জাতি (সংসারে জন্মগ্রহণ) এবং জাতি থেকে
১২. জরামরণ (জন্মের পরিণতি) স্বরূপ দুঃখের উৎপত্তি।

১. এই কার্যকারণ পরম্পরার সংযোগে যেন একটি চক্র নির্মিত হয়েছে। যা মানুষকে জন্ম হতে জন্মান্তরে ঘুরায়। তাই এর নাম 'ভবচক্র'।

এই দ্বাদশ নিদানকে সংক্ষেপে লোভ, দ্বেষ ও মোহ রূপেও চিহ্নিত করা হয়। দুঃখের নিবৃত্তির ব্যাপারে বলা হয়, জাগতিক প্রত্যেক ঘটনার ন্যায় দুঃখেরও কারণ আছে, সেই কারণগুলোকে যদি সমূলে উৎপাটন করা হয় তাহলেই দুঃখের অবসান ঘটে।

বুদ্ধ বর্ণিত বাসনা নিবৃত্তির অষ্ট পন্থা ও 'নির্বাণ' প্রসঙ্গ

বুদ্ধ বর্ণিত বাসনা নিবৃত্তির অষ্টপন্থা নিম্নরূপ:

(১) সৎ দৃষ্টি[১]
(২) সৎ সংকল্প।[২]
(৩) সৎ বাক্য।[৩]
(৪) সৎ কর্ম,[৪]
(৫) সৎ জীবিকা।[৫]
(৬) সৎ প্রচেষ্টা।[৬]
(৭) সৎ স্মৃতি বা সৎ চিন্তা।[৭]
(৮) সৎ সমাধি বা সৎ সাধনা।[৮]

সৎ সমাধির মাধ্যমে সাধকগণ চরম মুক্তি বা 'নির্বাণ' লাভ করতে পারেন। বুদ্ধের মতে ধর্মপ্রাণ মানুষের পরম লক্ষ্য হল অস্তিত্ব থেকে মুক্তি বা 'নির্বাণ' লাভ। বুদ্ধের এই নির্বাণ-তত্ত্ব সন্ন্যাসীগণ কর্তৃক দ্রুত জনসমাজে প্রচারিত হতে থাকে।

বৌদ্ধধর্মের চরম ও পরম লক্ষ্য হল 'নির্বাণ'। 'নির্বাণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিভে যাওয়া, প্রবাহের 'নিবৃত্তি ঘটা' বা তৃষ্ণার নিবৃত্তি। নির্বাণ বিষয়টা অবোধ্য ও জটিল। কেউ কেউ নির্বাণ বলতে জীবনের নিঃশেষ বা বিনাশকে বুঝেছেন। বৌদ্ধদের মতে এটা ঠিক নয়। কারণ বুদ্ধ জীবিতাবস্থায় নির্বাণ লাভ করেছিলেন।

১. চারটি আর্য বা সত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান হল সৎদৃষ্টি। বুদ্ধের মতে অবিদ্যা বা অজ্ঞানই দুঃখের মূল কারণ।
২. সৎ দৃষ্টির দ্বারা শুধু মহাসত্যগুলোর যথার্থ উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করার জন্য মনের তীব্র দৃঢ়তা একান্ত প্রয়োজন। একেই সৎ সংকল্প বলা হয়।
৩. দুঃখ জয়ের জন্য বাকসংযম অত্যাবশ্যক। মিথ্যা কথা, চুকলি, কুটকথা, অসারকথা ইত্যাদি বর্জন করাই বাক সংযমের লক্ষণ।
৪. মানুষের আচরণ হবে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ ও সত ভিত্তিক, তাই মুক্তিকামীকে প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ ইত্যাদি পরিহার করতে হবে।
৫ সৎজীবিকা: সদুপায়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করাই হল সৎ জীবিকা। অস্ত্র, প্রাণী, মাংস, নেশা ও বিষ- এই পঞ্চ বাণিজ্য পরিহার করতে হবে।
৬. সৎপ্রচেষ্টা: মনে দৃঢ়মূল কুচিন্তার বিনাশ সাধন, নতুন ভাবে মনে কুচিন্তার উৎপত্তি নিবারণ, মনে সৎ চিন্তা আনয়ন এবং সৎ চিন্তাকে মনে সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টাকে 'সৎ প্রচেষ্টা' বলে।
৭. সৎস্মৃতি: দৈহিক ও মানসিক সকল অবস্থা সম্পূর্ণে পর্যবেক্ষণ বা স্মরণই সৎ স্মৃতি।
৮. সৎসমাধি: চিত্তের একাগ্রতাকে 'সমাধি' বলা হয়। সৎসমাধি দ্বারা মনের বিক্ষেপ ও চাঞ্চল্য দূর করা যায়।

মূলত পুনর্জন্মের নিরোধ হওয়া, তৃষ্ণা, ক্ষয়, রাগ, দ্বেষ ও মোহ এবং সর্ব প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভই 'নির্বাণ'। "নির্বাণ" চিত্তের এমন এক অবস্থা, যা সর্ব উপাধি বর্জিত ও সর্ব সংস্কার মুক্ত। বৌদ্ধরা কয়েকটি উপমা দ্বারা নির্বাণ সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। যথা:-

নির্বাণ জলে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত। পদ্ম জলে উৎপন্ন ও বর্ধিত হলেও জলের কোনো স্পর্শ যেমন পদ্মের গায়ে লাগে না, সেরূপ যাবতীয় জাগতিক দুঃখ-বেদনা নির্বাণকেও স্পর্শ করতে পারে না।

শীতল জল উত্তাপ নিবারণ করে, কোন কোন ক্ষেত্রে এটা নির্বাণের অনুরূপ। কারণ নির্বাণ লোভ, দ্বেষ ও মোহরূপ অগ্নীর উত্তাপ নিবারণ করে মানুষের পরম শান্তি আনয়ন করে।

নির্বাণ সমুদ্রের মত বিশাল ও বিস্তৃত। সমুদ্রে যেমন বহু প্রাণী বাস করে, তেমনি নির্বাণও তৃষ্ণামুক্ত বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আবাসস্থল।

তাদের সারকথা হল- বৌদ্ধদের কাছে দুনিয়ার জীবনটাই সবকিছু, এ দুনিয়ার বাইরে জান্নাত ও জাহান্নাম বলতে কিছু নেই। তাই যে ভাল কাজ করবে, সে দুনিয়ার পুনর্জন্ম গ্রহণ থেকে মুক্তি পাবে এবং নির্বাণ লাভ করবে। আর অসৎ কাজ করলে এ দুনিয়ায় পুনর্জন্ম গ্রহণের মাধ্যমে দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত হবে।

বৌদ্ধ ধর্মের কতিপয় আকীদা-বিশ্বাস

১. বৌদ্ধধর্মে নাস্তিক্যবাদ

মার্কস ও এঙ্গেলসের মত বুদ্ধ সর্বতভাবে একজন বস্তুবাদী ছিলেন। তার প্রচারিত ধর্মে ইশ্বর নেই, আত্মা নেই, পরলোক নেই। আছে শুধু অবিরাম প্রবাহ, পরিবর্তন ও রূপান্তর। সমগ্র বিশ্ব চলছে এক নিয়মের অধীনে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের নামই ধর্ম। এ জগতে সৃষ্টি প্রবাহ অনন্ত গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে- এর আদিও নেই, অন্তও নেই। এ অনন্ত সৃষ্টি প্রবাহ আপনা আপনি প্রবাহিত হয়ে চলছে। এর প্রবর্তন বা পরিচালনা করার জন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা বা ইশ্বরের প্রয়োজন হয় না।

২. বৌদ্ধধর্মে কোন প্রার্থনা নেই

বৌদ্ধদের ধারণা- প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কেউ মুক্তি পেতে পারে না। বৌদ্ধধর্মে মুক্তির জন্য ইশ্বর বা অতি জাগতিক শক্তির ভূমিকা নেই। বৌদ্ধধর্মমতে মানুষের মুক্তিদাতা মানুষ নিজেই এবং মানুষই মানুষের ভাগ্য-বিধাতা। তাই তার কোনো ইবাদত বা প্রার্থনার প্রয়োজন নেই।

৩. বৌদ্ধধর্মে প্রতীত্যসমুৎপাদ

"প্রতীত্য" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'এটাকে পেয়ে' আর "সমুৎপাদ" শব্দের অর্থ হল উৎপত্তি। সুতরাং প্রতীত্যসমুৎপাদের সহজ অর্থ হল কোন বস্তু বা ঘটনা পূর্ববর্তী বস্তু বা ঘটনা থেকে সমুৎপন্ন। অর্থাৎ, প্রত্যেক কার্যেরই এক পূর্ববর্তী কারণ

আছে। এই কার্যকারণ নিয়মকেই বুদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ বলেছেন। সুতরাং মানুষের বর্তমান জীবনের কারণ হল তার অতীতের কৃতকর্ম এবং বর্তমানের পরিণতি হল ভবিষ্যত। মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে এবং কর্মফল অনুযায়ী বার বার জন্মগ্রহণ করতে হবে। তবে বাসনাহীন, আসক্তিহীন ও মোহমুক্ত কর্মের মাধ্যমে নির্বাণপ্রাপ্ত হলে তাকে আর কর্মফলাধীন হতে হবে না। বুদ্ধের আবিষ্কৃত চারটি আর্যসত্য ও অপরাপর দার্শনিক মতবাদসমূহ এ তত্ত্বের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। তাই প্রতীত্যসমুৎপাদ মতবাদের উপর বুদ্ধ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং একে ধর্ম নামে অভিহিত করেছেন।

৪. বৌদ্ধধর্মের অনিত্যবাদ

বৌদ্ধধর্মের মূল সূত্র হল- অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম। বৌদ্ধধর্মমতে পৃথিবীতে কোন জিনিসই নিত্য, শাশ্বত ও চিরন্তন নয়। তথা জগতে শাশ্বত সত্তা বলে কিছুই নেই। আছে শুধু উৎপাদ্যমান ও পরিবর্তমান।

৫. বৌদ্ধধর্মের অনাত্মাবাদ

প্রায় সব ধর্মাবলম্বীরা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হলেও বুদ্ধ মানুষের মধ্যে শাশ্বত ও চিরন্তন আত্মার অস্বীকার করেন। বুদ্ধের মতে এ জগতের সবকিছুই যখন ক্ষণিক ও অনিত্য, তখন কোন স্থায়ী ও শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সুতরাং জগতের যৌগিক ও মৌলিক সবকিছুই আত্মাহীন। মূলতঃ বুদ্ধের অনিত্যবাদ দর্শন থেকেই অনাত্মাবাদ সৃষ্টি হয়েছে।

৬. বৌদ্ধধর্মের পুনর্জন্মবাদ

মানুষ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান- এই পাঁচ উৎপাদনের সমন্বয় মাত্র। এই পাঁচ উৎপাদনের ভিতর ও বাইরে অথবা উভয় অন্তরবর্তী স্থানের কোথাও আত্মা নামে কোন অজড়, অমর, অক্ষয় কোন বস্তু নেই। বৌদ্ধধর্ম মতে আত্মা বলে কিছু নেই, তাই নাম রূপই পুন পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। বৌদ্ধরা পুনর্জন্মের স্বপক্ষে প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেন, ধম্মপদ গ্রন্থে এক পিতা-মাতার গল্প আছে, যারা একদিন গৌতমবুদ্ধকে দেখে স্বীয় পুত্র বলে সম্বোধন করেছিলেন। বুদ্ধ তাদের চিনতে পেরে বলেছিলেন, অতীতে বহু জন্মে তারা তার পিতা-মাতা ছিলেন। বৌদ্ধরা পুনর্জন্মের স্বপক্ষে এরূপ উদ্ভট প্রমাণ পেশ করে থাকেন। মূলত পুনর্জন্মবাদ বৌদ্ধদের প্রতীত্যস-মুৎপাদ দর্শনের অনিবার্য ফল। (পূর্বে কার্যকারণ নীতি আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।)

৭. বৌদ্ধধর্মের বিশ্বতত্ত্ব

বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই। বরং প্রত্যেক কার্যেরই কারণ আছে, কিন্তু চূড়ান্ত কারণ (Final cause) বলে কিছু নেই। তাই তাদের মতে চূড়ান্ত কারণ রূপে ঈশ্বরের অস্তীত্ব স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই। অনুরূপ বৌদ্ধধর্মমতে নৈতিক

অগ্রগতির জন্যও ঈশ্বরের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই। বৌদ্ধরা বলেন, ঈশ্বর যদি সকল কিছুর কারণ হন, তিনি যদি সর্বশক্তিমান হন এবং তাঁর ইচ্ছায় যদি সবকিছু হয়, তাহলে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে না। তাদের মতে 'জগৎ একদা ছিল না এবং একদা থাকবে না' এটা বিজ্ঞ ব্যক্তির মতবাদ নয়। বরং তাদের মতে জগৎ হল অনাদি ও অসৃষ্ট। তাই সংসার কার্যকারণ প্রবাহ মাত্র। বৌদ্ধদের মতে মানুষ নিজেই তার নিজের স্রষ্টা, তার কর্মই তার সৃষ্টিকর্তা। তাই অপরাধমূলক কাজের ক্ষমা করবার কেউ নেই। মৃত্যুর পর মানুষের ভাল-মন্দের তালিকা দেখে পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করার জন্য স্বর্গে বা অন্য কোথাও ঈশ্বর বসে নেই। (نعوذ بالله) তারা বলে, "অজ্ঞাত ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা অর্থহীন প্রলাপের মত।"

বুদ্ধের বিশ্বতত্ত্বের মাঝে মূলত দুই শ্রেণীর সত্তার স্বীকার করা হয়।

(১) যে সকল বিষয়ের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, একে বলা হয় জ্ঞেয়।

(২) আরেক শ্রেণীর সত্তা হল যারা এদের উপলব্ধি করে। তাকে বলা হয় জ্ঞাতা।

বুদ্ধের মতে আত্মারূপে স্থায়ী বস্তু নেই। আর বুদ্ধের মতে আত্মারূপে স্থায়ী পদার্থ যেমন নেই, অন্য দিকে জ্ঞেয়রূপ কোনো স্থায়ী বস্তু নেই। যা আছে তা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধে গ্রথিত কতকগুলো মানসিক অনুভূতি। সুতরাং বিশ্ব হল কতকগুলো জ্ঞান, অনুভূতি ও চিন্তার পরস্পর গ্রথিত মালার মত বা চৈতন্যের প্রবাহ মাত্র। বুদ্ধ বলেন,

"ব্যক্তি জীবনের ন্যায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং জগৎচক্রেরও উদয় লয় আছে। পৃথিবীও একদিন ধ্বংস হবে। পূর্ববর্তী পৃথিবীরও তা হয়ে আসছিল এবং পুনর্বার তা হবে। তবে যেভাবেই জগৎ ও প্রাণীর সৃষ্টি হোক না কেন তা সবই কার্যকারণ নিয়মের শৃংখলে গ্রথিত। সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রাণ প্রবাহের মূলে প্রতীত্যসমুৎপাদের দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্রের কারণে প্রাণীর জন্ম পুনর্জন্ম হয়ে আসছে।"

৮. বৌদ্ধধর্মের বোধিসত্ত্ব ও পারমিতা

বুদ্ধপূর্ববর্তী সত্ত্বকে বলা হয় "বোধিসত্ত্ব"। এটাকে এভাবে বলা যায়, বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যত্নবান সত্ত্বকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়।

আর "পারমিতা" শব্দের অর্থ হল পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়া। গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব জন্মে যে সমস্ত সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন তাকে পারমিতা বলা হয়। পারমিত-াসমূহের পূর্ণতা ব্যতীত কেউ বুদ্ধ হতে পারে না।

বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক অবস্থায় দশ প্রকার পারমিতা পাওয়া যায়। পালি বুদ্ধবংশে ১০ প্রকার এবং চরিয়াপিটকে ৭ প্রকার পারমিতার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু মহাযান গ্রন্থাদিতে ৬ প্রকার পারমিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দুই প্রকার পারমিতা বিভাগকে নিম্নে পাশাপাশি উল্লেখ করা গেল।

পারমিতা

বুদ্ধবংশে	পালিতে	মহাযানগ্রন্থে
১. দান	১. দান	১. দান[১]
২. শীল	২. শীল	২.শীল[২]
৩. নৈষ্কম্য[৩]	৩. নেক্‌খখ্‌ম	
৪. সত্য[৪]	৪. সূচ	৩. ক্ষান্তি[৫]
৫. ক্ষান্তি	৫. খন্তি	
৬. বীর্য	৬. বিরিয়	৪. বীর্য[৬]
৭. অধিষ্ঠান[৭]	৭. অধিট্‌ঠান	
৮. মৈত্রী[৮]	৮. মেত্তা	৫. ধ্যান[৯]
৯. উপক্ষো[১০]	৯. উপেক্‌খা	
১০. প্রজ্ঞা	১০. প্রঞ্‌ঞা	৬. প্রজ্ঞা[১১]

বৌদ্ধ পূর্ণিমা প্রসঙ্গ

"বৌদ্ধ পূর্ণিমা" বলা হয় বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের আলোচনা এবং প্রতিপালনের জন্য প্রচেষ্টা ও সৎ সংকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যে ঋতুচক্রের বিভিন্ন সময়ে পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত আনন্দমেলা বা কল্যাণ সম্মেলনকে। পাক ভারতীয় ভিক্ষুদের গ্রন্থে প্রথম বৌদ্ধ পূর্ণিমার উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ভাদ্র পূর্ণিমা (মধুপূর্ণিমা) আশ্বিনী পূর্ণিমা (প্রচারণা পূর্ণিমা), কার্তিকী পূর্ণিমা এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমা– এরূপ নয়টি পূর্ণিমা বৌদ্ধ পূর্ণিমা নামে অভিহিত।[১২]

---

১. সকল প্রাণীর মঙ্গলের জন্য নিজের সর্বস্ব এমন কি শরীরের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ বা সমস্ত শরীর নিঃস্বার্থভাবে দান করা এবং দানের ফল পরিত্যাগ করাই দান পারমিতা।

২. শীল পারমিতা হল কায় ও বাককর্মের সম্পূর্ণ সংযম করা।

৩. ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করত সংসারের ভোগবিলাসের প্রতি অনাশক্ত থাকা।

৪. জন্ম-জন্মান্তরে সদা সত্য কথা বলা এবং যা বলা হয় তা কার্যে পরিণত করা।

৫. ক্ষ্যান্তির অর্থ হল ক্ষমা। অক্ষমা, দ্বেষ ও প্রতিঘ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা।

৬. কুশল কর্মে উৎসাহী হওয়া আর কুৎসিত কর্মে অনাসক্তি হওয়াই হল বীর্য। ক্ষমাশীল হয়ে বীর্যের আচরণ করা উচিত, কারণ বীর্যের উপরই বোধি নির্ভর করে।

৭. অধিষ্ঠান অর্থ হল দৃঢ় সংকল্প তথা শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও সংকল্পচ্যুত না হওয়া।

৮. সমস্ত প্রাণীর অপরিসীম সুখ-শান্তি কামনা করাই মৈত্রী।

৯. একালম্বন তথা সম্মকরূপে চিত্ত অচৈতসিক ধর্মসমূহের কোন প্রকার বিক্ষেপ ব্যতীত স্থির হওয়া।

১০. লোভ ও দ্বেষ বর্জিত নিরপেক্ষ দর্শন।

১১. কুশল চিত্ত সম্প্রযুক্ত বিদর্শন জ্ঞানকে বৌদ্ধমতে প্রজ্ঞা বলা হয়। প্রজ্ঞার অনুকুলবর্তী হলেই দান সহ অন্য পাঁচ পারমিতা সম্যক সম্বোধি প্রাপ্তিতে সমর্থ হয়।।

১২. বুদ্ধধর্ম সংক্রান্ত সিংহভাগ তথ্য জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া কর্তৃক রচিত ও বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত "বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা" নামক গ্রন্থ থেকে এবং কিছু তথ্য মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ থেকে গৃহীত।

যেন্ বৌদ্ধধর্ম
(Zen Budhism)

বিশেষভাবে জাপানে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের একটি অন্যতম শাখা হল যেন্ বৌদ্ধধর্ম। ভারতবর্ষে ধ্যানশাখা নামে এর প্রবর্তন হয়। পরে চান (Ch'an) ধর্মমত নামে এটা চীনদেশে প্রচলিত হয়। ১৪শ শতাব্দীতে জাপানে এটা "যেন্" (Zen) নাম গ্রহণ করে। জাপানী ভাষায় "যেন" সংস্কৃত ভাষার "ধ্যান" কথারই পরিবর্তিত আকার।

বৌদ্ধধর্মের এই শাখা তার অন্যান্য শাখা থেকে মূলত ভিন্ন। যেন্ অনুসারীরা মনে করে পরম সত্য পাওয়া যায় আত্ম-জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বুদ্ধ-অন্তরে জাগরণের (জাপানী বশিন bushin) ফলে; এটা প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে সুপ্ত থাকে। এই বুদ্ধ-অন্তর জাগরণের উদ্দেশ্যে যেন্ অনুসারীরা বিশেষ ধরনের ধ্যান (যেন্) অভ্যাস করেন।

যেন্ অনুসারীদের তিনটি শাখা
(এক) রিনযাই (Rinzai),
(দুই) সোতো (soto),
(তিন) ওবাকু (obaku)।

যেন্ মতবাদ জাপানের যোদ্ধ সম্প্রদায় সামুরাইদের মধ্যে প্রিয় হয়ে ওঠে। যেন্ সম্প্রদায় দৈহিক ও মানসিক শাসন-শৃংখলার পক্ষপাতী। সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত ও গভীর চিন্তায় সক্ষম বলেই সম্ভবত সামুরাই নেতৃবর্গ এই মতবাদকে নিজেদের সুশিক্ষার সহায়ক বলে গ্রহণ করেন। বর্তমান সময়েও জাপানী সৈন্য বিভাগের কর্মচারিগণ তাদের ছুটির কতকাংশ যেন্ মঠে অধ্যয়নে কাটান।[১]

বৌদ্ধদের ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটক

বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থের নাম "ত্রিপিটক"। তিনটি "পিটক"-এর সমন্বয়ে গঠিত বলে একে ত্রিপিটক বলা হয়। এই তিনটি পিটকের নাম বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম। বিনয় পিটকে বুদ্ধের আজ্ঞাদেশনা, সূত্র পিটকে ব্যবহার-দেশনা এবং অভিধর্ম পিটকে পরমার্থ দেশনা অন্তর্ভুক্ত। শীল বিষয়ক শিক্ষার প্রাধ্যান্য থাকায় বিনয় পিটক অধিশীল শিক্ষা; চিত্ত (ধ্যান-সমাধি) বিষয়ক শিক্ষার প্রাধান্য থাকায় সূত্রপিটক অধিচিত্ত শিক্ষা এবং প্রজ্ঞা বিষয়ক শিক্ষার প্রাধান্য থাকায় অভিধর্ম পিটক অধিপ্রজ্ঞতা শিক্ষা নামেও পরিচিত।

ত্রিপিটকের ভাষা "পালি"। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের[২] পর প্রথম সঙ্গীতিকাল থেকে এর সংকলন শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতিতে পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে। তবে তৃতীয় সঙ্গীতির পর চতুর্থ সঙ্গীতির পূর্ববর্তী মাঝামাঝি সময়ে অর্হৎগণ

---

১. তথ্যসূত্র: মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড।

২. তাদের পরিভাষায় সংসার ত্যাগীগণ অহংজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে সুদীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করলে নির্বাণ তথা জন্ম থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য! "বৌদ্ধধর্ম" শীর্ষক আলোচনা।

প্রথম তালপত্রে লিপিবদ্ধ করেন। তারা ১ম ও ২ম সঙ্গীতিতে শুধু ধর্ম ও বিনয় নামে সঙ্গীতি কাজ সমাধা করেন এবং তৃতীয় সঙ্গীতিতে বিনয় সূত্র ও অভিধর্ম নামে পৃথক নামকরণে ত্রিপিটক নাম করা হয়। অতঃপর ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান প্রধান স্থানে ত্রিপিটক রক্ষা করা হয়। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের অভ্যুত্থানের সময় সমস্ত ত্রিপিটক ধ্বংস করা হয়।

তদন্ত স্থবির মহেন্দ্রই প্রথম সিংহলে লিপিবদ্ধ ত্রিপিটক নিয়ে যান। সেখান থেকে বার্মা (মিয়ানমার), শ্যাম (ভিয়েতনাম), ও ক্যামবোডিয়ায় তা প্রেরিত হয় এবং অদ্যাব-ধি সুরক্ষিত আছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, অপভ্রংশ, পৈশাচী, খরোষ্ঠি, ও তৈলঙ্গী ভাষায়ও লিপিবদ্ধের উল্লেখ দেখা যায়। তাছাড়া বর্তমানে সিংহলী, বর্মী, শ্যামী, ক্যামবোডীয়, নেপালী, তিব্বতী, ভিয়েতনামী, মঙ্গোলীয়, কোরীয়, জাপানী, ও চীনা ভাষায় ত্রিপিটকের অর্থকথা ও টীকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বলে জানা যায়।[১]

জৈনধর্ম
(Jainism)

"জৈনধর্ম" ভারতের একটি ধর্ম। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্মের প্রায় সমসাময়িক কালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আকারে এই ধর্মের উদ্ভব হয়। কথিত আছে, ২৪ জন তীর্থঙ্কর বা মহাপুরুষ এই ধর্ম প্রবর্তন করেন। সর্বশেষ তীর্থঙ্করের নাম বর্ধমান। পরে তিনি মহাবীর এবং জিন (জয়ী) নামে পরিচিতি লাভ করেন।[২] তার এই জিন নাম থেকেই জৈন নামের উৎপত্তি। প্রথম দিকে মহাবীর প্রচারিত এই জৈনধর্ম বিহার অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তিকালে ভারতের অত্যন্ত প্রত্যন্ত প্রদেশেও তার বিস্তৃতি ঘটে।

জৈনধর্মের কয়েকটা দর্শন ও নীতি

১. জড় পদার্থসহ বিশ্বের যাবতীয় বস্তু অবিনশ্বর।

২. আত্মা সর্ববস্তুতে বিরাজমান; গাছপালা, এমনকি পাথরেরও আত্মা আছে। আত্মা অবিনাশী এবং তা ঈশ্বরেরও সৃষ্টি নয়।

৩. বারবার জন্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও আত্মার সত্তা বা স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন থাকে।

২. তথ্যসূত্রঃ মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড।

৩. জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বর্ধমান ওরফে মহাবীর বা জিন ছিলেন বিদেহ (বর্তমানে বিহার) নিবাসী ক্ষত্রিয় বর্ণোদ্ভূত এক ব্যক্তি। ২৮ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করে বনে চলে যান ও সেখানে সন্ন্যাস জীবন বরণ করে ধ্যান মগ্ন থাকেন। ১২ বৎসর ধ্যান করার পর তার মনে এক নতুন ধর্মের নীতি দানা বেঁধে ওঠে। সেই নীতিমালাই হল জৈনধর্ম। মহাবীর ৮০ বৎসরেরও বেশি জীবিত ছিলেন।

৪. জৈনধর্ম পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করে। জৈনধর্ম অনুসারে ৯ বার জন্মগ্রহণের পর নির্বাণ বা জন্ম থেকে মুক্তি লাভ করা যায় এবং যতি বা সংসার ত্যাগীগণ অহংজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে ১২ বৎসর কঠোর সাধনা করলে নির্বাণ লাভ করতে পারেন।[১]

৫. জৈনধর্ম মতে 'অর্হন্ত'গণ[২] দেবতাদের চেয়ে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। কেননা 'অর্হন্ত'গণই অস্তিত্বের সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের দাসত্বনিগড় ভেঙ্গে সর্ববন্ধনমুক্ত হয়ে যায়। আর সর্ববন্ধনমুক্ত এই সত্তা সবকিছুর উর্ধ্বে। সবকিছু থেকে সে শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে দেবতাগণ অর্হন্তত্ব লাভে অসমর্থ। পূর্ণ মুক্তি পেতে হলে দেবতাদেরও মানুষের ঘরে, মানুষের জগতে পুনর্জন্ম লাভ করা দরকার।

৬. জৈনধর্ম মতে সৎ বিশ্বাস, সৎ জ্ঞান ও সৎ আচরণ এই ত্রিবিধ শিক্ষার (রত্ন) অনুসর-ণই সাধারণের মোক্ষ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

৭. অহিংসা তথা জীবন্ত প্রাণী হত্যা না করা জৈনধর্মের অপরিহার্য নীতি। জৈনসাধুরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পোকামাকড়ও যেন দৈবক্রমে পায়ে না মাড়িয়ে ফেলেন সে জন্যে অতিমাত্রায় সতর্ক থাকেন।

৮. উপরোক্ত অহিংসা নীতি সহ সত্যবাদিতা, সংযম, বৈরাগ্য প্রভৃতি ২৮টি আচরণবিধি জৈন সাধু সন্ন্যাসীদেরকে মেনে চলতে হয়। তবে জৈনধর্মের গৃহী অনুসারীদের জন্যে এ সব বিধি-নিষেধের কঠোরতার মাত্রা ও এদের সংখ্যা কম।

জৈনদের দুটো দল প্রসঙ্গ

জৈনদের মধ্যে তপস্যার পদ্ধতি নিয়ে অনৈক্যের কারণে তাদের মধ্যে দুটো দল হয়ে যায়। খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতকে, মতান্তরে খৃষ্টীয় ১ম শতকে এই বিভক্তি সংঘটিত হয়।

১. দিগম্বর জৈন: মহাবীরের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যারা (সর্বত্যাগী হয়ে) নগ্ন থাকত, তারা দিগম্বর (বস্ত্রহীন) নামে পরিচিত হয়। এরা রক্ষণশীল জৈন বলে পরিচিত।

২. শ্বেতাম্বর জৈন: তারা মহাবীরের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে শ্বেতবস্ত্র (অম্বর) পরিধান করে বলে তারা শ্বেতাম্বর নামে পরিচিত হয়। এরা অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল জৈন বলে পরিচিত দিগম্বর জৈন কর্তৃক সমালোচিত।

জৈনধর্ম পৃথিবীতে তেমন বিস্তার লাভ করেনি। ভারতীয় উপমহাদেশেই জৈনধর্ম সীমাবদ্ধ। এখনও ভারতে ছোট একটি দৃঢ়বদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে এর অস্তিত্ব টিকে আছে।[৩]

১. এ হিসাবে দেখা যায় বৌদ্ধ ও জৈন উভয় মতবাদই ব্রাহ্মণ্যবাদের কর্মবাদ (কর্মফলহেতু) এবং সংসারবাদ (অন্তহীন পুনর্জন্ম) দর্শনে বিশ্বাস করে। নির্বাণ তথা সংসার-চক্র থেকে মুক্তি উভয়েরই চরম লক্ষ্য।

২. 'অর্হন্ত' অর্থাৎ, যে জৈন সন্ন্যাসী পূর্ণ নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন।

৩. জৈনধর্ম সংক্রান্ত তথ্যাবলী মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় ও ৪র্থ খণ্ড এবং কো. আন্তোনভা, গ্রি. বোনগার্দ-লেভিন ও কতোভ্স্কি কর্তৃক রচিত এবং প্রগতি প্রকাশনী মস্কো থেকে প্রকাশিত "ভারত বর্ষের ইতিহাস" থেকে সংগৃহীত।

শিখধর্ম

"শিখ" ভারতীয় পাঞ্জাব প্রদেশের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বিশেষ। পাঞ্জাব এলাকাতেই প্রধানত শিখদের বসতি। তাদের জনসংখ্যা অর্ধ কোটির উপর।

শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গুরু হলেন নানক। গুরু নানকের জন্ম মৃত্যু সাল আনুমানিক ১৪৬৯–১৫৩৯। লাহোরের নিকট তালবন্দী (আধুনিক নানকানা সাহেব) গ্রামের এক হিন্দু পরিবারে তার জন্ম। পিতার নাম কালু, মাতার নাম ত্রিপতা। বাল্যকালে বৈদ্যনাথ পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত এবং কুতুবুদ্দীন মোল্লার কাছে ফার্সী শিক্ষা করেন। শ্রীচন্দ্র ও লক্ষ্মীদাস নামে তার দুই পুত্র ছিল। ২৭ বৎসর বয়সে তিনি গৃহ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন এবং নানা দেশে পর্যটন করেন। কথিত আছে তিনি মক্কায়ও গিয়েছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর নিজের ধর্মমত প্রচার করতে থাকেন। তিনি প্রধানত পারসিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দুদের পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেন। সৃষ্টিকর্তার একত্ব ও মানুষের ভ্রাতৃত্ব তার শিক্ষার মূলনীতি। একেশ্বরবাদকে তিনি সকল ধর্মের মূল ভিত্তি বলে প্রচার করেন। তিনি মানুষকে ধর্মাচরণ ও ধ্যানের দ্বারা ঈশ্বর লাভের উপদেশ দেন। তিনি হিন্দুদের পুরোহিত-তন্ত্র, মূর্তিপূজা, ও বর্ণাশ্রম প্রথা তথা জাতিপ্রথার বিরোধিতা করেন। মানুষের নৈতিক জীবন সংস্কার করাই নানকের উদ্দেশ্য ছিল বলা হয়।

শিখদের নবম নেতা গুরু গোবিন্দ শিখদের পাগড়ী পরিধান ও কখনও চুল না-কাটার প্রথা প্রবর্তন করেন। শিখ গুরু তেগ বাহাদুরের পুত্র ১০ম গুরু, গোবিন্দ (১৬৭৫–১৭০৮) শিখদিগকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সামরিক সম্প্রদায়রূপে সংগঠিত করেন।

শিখদের ধর্ম পুস্তকের নাম "গ্রন্থ সাহেব" এবং ধর্মস্থানের নাম "গুরুদ্বার"। শিখ ধর্মনেতাদের উপাধি হল "গুরু"। এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নানক এই উপাধি গ্রহণ করায় তার উত্তরাধিকারীগণ এই উপাধি গ্রহণ করেন। তাদের সামরিক শ্রেণীর প্রত্যেকে "সিংহ" পদবী গ্রহণ করেন। শিখদের ১০ম গুরু, গোবিন্দ (১৬৭৫–১৭০৮) "দস্‌উঈঁ বাদশাহ কা গ্রন্থ" নামক অতিরিক্ত একটি ধর্মীয় গ্রন্থ সংকলন করেন।

শিখ নেতা হরকিষণের মৃত্যুর পর তেগ বাহাদুর গুরু হন। তিনি স্বাধীন শিখ রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন ও পাঞ্জাবে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালান। সম্রাট আওরংগযেব তাকে বন্দী অবস্থায় দরবারে আনেন ও রাজদ্রোহের অপরাধে প্রাণদণ্ড দেন। এখান থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শিখদের প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু হয় এবং বাহাদুর শাহের আমল পর্যন্ত তা চলতে থাকে। সিরহিন্দের ফৌজদার ওয়াযীর খানের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ, আহমদ শাহ আবদালীর
সঙ্গে তাদের যুদ্ধ, সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভীর সাথে তাদের যুদ্ধ প্রভৃতি তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বশেষ ১৮৫৭-এর আযাদী সংগ্রামে শিখগণ জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় ও বিপদ-ক্ষণে বিদেশী শক্তির সাহায্য করে।[১]

১. তথ্যসূত্র: মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম ও ৪র্থ খণ্ড।

হিন্দু ধর্ম
(Hinduism)

"হিন্দু ধর্ম" বলা হয় ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় আশ্রিত ধর্মকে। হিন্দুধর্ম প্রধাণত বহু ঈশ্বরবাদী পৌত্তলিক ধর্ম। ব্রাহ্মণগণ হলেন এই ধর্মের ধর্মগুরু। তারা দেবতার উৎসর্গ, পূজা, ইত্যাদিতে পৌরোহিত্য করেন ও নিজেদেরকে নৈতিক চরিত্রের আদর্শ বলে দাবি করেন। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে তারা বৈদিক ধর্মের পরিবর্তে জটিল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদির প্রবর্তন করেন।

হিন্দুধর্ম বহু প্রাচীন ধর্ম। বহু বিবর্তনের ভিতর দিয়ে এ ধর্ম এ পর্যন্ত এসেছে। তবে ভারতের বাইরে এই ধর্ম কখনও উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসার লাভ করেনি।

ইসলাম ধর্মের তাওহীদ তথা একেশ্বরবাদ ও সৌভ্রাতৃত্বের সংস্পর্শে এসে এবং পরবর্তী কালে পাশ্চাত্যের প্রভাবে হিন্দু ধর্মের বহুমুখী সংস্কার সাধিত হয়েছে। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব মতবাদ, রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উদার ধর্মমত হিন্দুধর্ম সংস্কারের নজির। এই ধর্মের সংস্কারের আরও নজীর হল সতীদাহ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছে ও বর্ণপ্রথা শিথিল হয়েছে। তবুও এখনও হিন্দুধর্ম প্রধানতঃ বহু ঈশ্বরবাদী পৌত্তলিক ধর্ম।

হিন্দুদের বিশেষ কয়েকজন দেবদেবীর পরিচয়

হিন্দুদের দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের স্থান অতি উচ্চ। এঁদের মধ্যে ব্রহ্মা সৃজনকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা ও মহাদেব সংহার কর্তারূপে সাধারণত কীর্তিত হয়ে থাকেন। এই তিন জন হলেন হিন্দুদের প্রধান দেবতা। নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া গেল।

ব্রহ্মা

ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা। তিনি চতুরানন তথা চার মুখ বিশিষ্ট। হিন্দুধর্ম গ্রন্থের বর্ণনা মতে বিশ্ব সৃষ্টি তত্ত্ব নিম্নরূপ–

মহাপ্রলয়ের শেষে এই জগৎ যখন অন্ধকারময় ছিল, তখন বিরাট মহাপুরুষ পরমব্রহ্ম নিজের তেজে সেই অন্ধকার দূর করে জলের সৃষ্টি করেন। সেই জলে সৃষ্টির বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। তখন ঐ বীজ সুবর্ণময় অণ্ডে পরিণত হয়। অণ্ড মধ্যে ঐ বিরাট মহাপুরুষ স্বয়ং ব্রহ্মা হয়ে অবস্থান করতে থাকেন। তারপর অণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত হলে এক ভাগ আকাশে ও অন্য ভাগ ভূমণ্ডলে পরিণত হয়। এরপর ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ, নারদ– এই দশ জন প্রজাপতিকে মন হতে উৎপন্ন করেন। এই সকল প্রজাপতি[১] হতে সকল প্রাণীর উদ্ভব হয়।

১. হিন্দুধর্ম গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী প্রজাপতির পরিচয় নিম্নরূপ:
জীবসমূহের স্রষ্টা, জন্মদাতা ও পূর্ব পুরুষ। বেদে ইন্দ্র, সাবিত্রী, সোম, হিরণ্যগর্ভ ও অন্যান্য দেবতাকে প্রজাপতি বলা হয়। মনুসংহিতায় ব্রহ্মাকেই এই উপাধি দেওয়া হয়েছে। (পরবর্তি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বিদ্যাদেবী ময়ূরাসনা সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী। দেবসেনা ও দৈত্যসেনা তার দুই কন্যা।

ব্রহ্মা চতুর্ভুজ, চতুরানন ও রক্তবর্ণ। প্রথমে তাঁর পাঁচটি মস্তক ছিল; কিন্তু একদা শিবের প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য উচ্চারণ করায় শিবের তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে ব্রহ্মার একটি মস্তক দগ্ধ হয়। সেই হতে ব্রহ্মা চতুর্মুখ। ব্রহ্মার বাহন হংস। বেদে ব্রহ্মার নাম পাওয়া যায় না, সেখানে সৃষ্টিকর্তাকে হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি বলা হয়েছে।

বিষ্ণু

বিষ্ণু হলেন পালনকর্তা। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে আদিতির গর্ভে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য, দেবতাদের সাহায্য করবার জন্য ও দানবদলের জন্য ইনি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণে এঁর দশ অবতারের কথা লিখিত আছে। যথাঃ- মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। তিন যুগে ইনি বহু দৈত্য-দানবকে বধ করেছেন; যেমন- মধু, ধেনুক, পুতনা যমলার্জুন, কালনেমি, হয়গ্রীব, শটক, অরিষ্ট, কৈটভ, কংশ, কেশী, শাল্ব, বাণ, কালীয়, নরক, বলি, শিশুপাল প্রভৃতি। এঁর চার হস্ত-এক হস্তে পাঞ্চজন্য শংখ, দ্বিতীয় হস্তে সুদর্শন চক্র, তৃতীয় হস্তে কৌমোদকী গদা এবং চতুর্থ হস্তে পদ্ম। এঁর ধনুকের নাম শার্ঙ্গ ও অসির নাম নন্দক। এঁর বক্ষে কৌস্তুভ মণি বিলম্বিত এবং শ্রীবৎস নামে এক অদ্ভুত চিহ্ন অঙ্কিত। এঁর মণিবন্ধে স্যমন্তক মণি বর্তমান। বিষ্ণু ঋক্বেদের অনেক সুক্তে স্তুত হয়েছেন। কোন কোন স্থানে ইনি আদিত্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে বর্ণিত হয়েছেন, কোথাও বা তিনি সূর্যরশ্মির সঙ্গে ব্যাপ্ত বলে বর্ণিত হয়েছেন। ইনি সপ্তকিরণের সঙ্গে ভূ-পরিক্রম করেন। ইনি রক্ষক, ধর্ম ধারণ করেন। ইনি ইন্দ্রের সখা। ইনি ত্রিপদে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন।

আর্যদের তিন প্রধান দেবতার মধ্যে বিষ্ণু অন্যতম। তিনি সদ্গুণের আধার। সৃষ্টি জগতের পালনভার তাঁর উপর অর্পিত। তিনি পরমাত্মা, পুরুষ, অব্যয়, ঈশ্বর, অনাময়, বিশ্বব্যাপী ও প্রভু। প্রলয় সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় নারায়ণরূপে মনুষ্যদেহধারী হয়ে তিনি শেষনাগের উপর শায়িত আছেন। তাঁর নাভি-উদ্ভূত পদ্ম থেকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। জগৎ সৃষ্টিকালে মধু ও কৈটভ নামক দুই দানবকে হত্যা করে তাদের মেদ থেকে তিনি মেদিনী সৃষ্টি করেন।

মহাভারত ও পুরাণে বিষ্ণু প্রজাপতি ও শ্রেষ্ঠ দেবতা। প্রজাপতি হিসাবে তাঁর তিনটি অবস্থার উল্লেখ আছে। প্রথমে সক্রিয় সৃষ্টিকর্তারূপে ব্রহ্মা, যিনি নিদ্রিত বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে উত্থিত হয়েছেন; দ্বিতীয় বিষ্ণু স্বয়ং রক্ষক হিসাবে অবতার, যথা: শ্রীকৃষ্ণ; তৃতীয় শিব বা রুদ্র, বিষ্ণুর কপাল-উদ্ভূত ধ্বংসের দেবতা।

(পূর্ববর্তি পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা)
কারণ, তিনিই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এবং পৃথিবীর রক্ষক। ব্রহ্মার পুত্র বলে এবং দশ জন ঋষির সৃষ্টিকর্তা বলে স্বয়ম্ভুর মনুকেও প্রজাপতি বলা হয়। এই ঋষিরা ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং এই মানসপুত্র থেকেই মানবের সৃষ্টি। সেই জন্য এই দশ জন ঋষিকেই সর্বত্র প্রজাপতি বলা হয়েছে।

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, দক্ষ, ভৃগু ও নারদ-এই দশ জন সপ্তর্ষিই প্রজাপতি।

ব্রহ্মা শংখ, পদ্ম ও মুদগরধারী। তার দুই স্ত্রী- লক্ষ্মী ও সরস্বতী। লক্ষী হলেন ঐশ্বর্যদেবী আর সরস্বতী হলেন বিদ্যাদেবী।

মহাদেব

মহাদেব হলেন ধ্বংসের দেবতা। সংহারকর্তা বলে তিনি অধিক পরিচিত। তাকে শিবও বলা হয়। 'রুদ্র' নামেও নানা স্থানে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদে রুদ্রের বর্ণনায় দেখা যায়- তিনি ভয়াবহ হিংস্র পশুর ন্যায় ধ্বংসকারী। তিনি বৃষভ ও আকাশের লোহিত বরাহ, তিনি বিদ্বান্, জ্ঞানী এবং মর্ত্যের দেবগণের কর্মের স্রষ্টা ও সাক্ষী। তিনি সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা, গন্ধর্ব এবং প্রমথগণ পরিবেষ্টিত হয়ে হিমালয়ে তপস্যা করেন। কৈলাস তার আবাসভূমি। স্বয়ং যোগী, কিন্তু কুবের তার ধনরক্ষক। মহাযোগীর বেশে তিনি দিগম্বর ধুর্জটি। তাঁর দেহ ভস্মাবৃত ও জটাজুটধার। সংহার শক্তি প্রবল হলে তিনি শ্মশানে সর্পজড়িত মস্তকে, গলদেশে কঙ্কাল মাল্য ভূষিত হয়ে অনুচরের সঙ্গে ভ্রমণ করেন। উত্তেজক দ্রব্য পানের পর তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নৃত্য রত হন। এই নৃত্যের নাম 'তাণ্ডব'। অন্য মতে, বিশ্বধ্বংসের সময় তার নৃত্যকে তাণ্ডব নৃত্য বলা হয়। গজাসুর ও কালাসুর নিধন করেও মহাদেব তাণ্ডব নৃত্যে রত হয়েছিলেন। তিনি নৃত্যকলারও উদ্ভাবক বলে তাঁর নাম 'নটরাজ'।

ধ্যানমগ্ন মহাদেবের বর্ণনা এইরূপ- তিনি তিন নয়ন[১] বিশিষ্ট, তাঁর উপর অর্ধচন্দ্র, মাথায় জটা, পরিধানে রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণসার মৃগচর্ম, গলদেশে সর্পের উপবীত, হস্তে নানাবিধ অস্ত্র। বাহন নন্দী সর্বদা তাঁর সহচর। তাঁর হস্তে সর্বদা ডমরু ও দুর্জনের শাস্তির জন্য মুদগর। পার্বতীর সাথে বিবাহের জন্য মদন যখন তাঁকে প্রলুব্ধ করে তপস্যা ভঙ্গের চেষ্টা করেছিলেন, তখন মহাদেবের তৃতীয় নেত্রাগ্নিতে তিনি ভস্ম হন। প্রলয়কালে তাঁর এই তৃতীয় নেত্রাগ্নিতে পৃথিবী ধ্বংস হয় বলে কথিত আছে। কথিত আছে, ইনি মহর্ষি অত্রির কাছে যোগ শিক্ষা করেন। বিষ্ণুর সহায়তায় ইনি জলন্ধরকে বধ করেন। ইনি পরম ভক্ত অসুর বাণকে রক্ষা করতে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু পরাস্ত হওয়ায় বাণকে রক্ষা করতে অসমর্থ হন। সমুদ্র মন্থনের সময় সমুদ্র থেকে ভয়ঙ্কর বিষ উত্থিত হওয়ায় ভীত দেব ও অসুরগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়। ব্রহ্মা অনন্যোপায় হয়ে মহাদেবের স্তব করেন। স্তবে তুষ্ট হলে জগতের হিতার্থে ব্রহ্মা মহাদেবকে এই বিষ পান করতে বলেন। মহাদেব সম্মত হয়ে বিষ পান করে তাঁর কণ্ঠে তা ধারণ করেন। বিষের তেজে কণ্ঠ নীল বর্ণ হয়ে যায়; কিন্তু পৃথিবী ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়।

---

১. মহাদেব প্রথমে দুই নয়ন বিশিষ্ট ছিলেন। তার তৃতীয় নেত্র উদ্ভবের একটা কারণ এরূপ উল্লেখিত আছে যে, পার্বতী একবার পরিহাসচ্ছলে মহাদেবের দুই নেত্র হস্ত দ্বারা আবৃত করেন। এতে সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আবৃত হয় এবং আলোকবিহীন পৃথিবীর সমস্ত মানব বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়। তখন পৃথিবীর লোকদের রক্ষা করার জন্য তিনি ললাটে তৃতীয় নেত্র উদ্ভব করেন। এই নেত্রের তীব্র জ্যোতিতে হিমালয় দগ্ধ হয়ে যায়; পরে পার্বতীর প্রীতির জন্য তিনি হিমালয়কে আবার পূর্বের ন্যায় রমণীয় করেন।

এই জন্যই তাঁর আর এক নাম নীলকণ্ঠ। অতি সহজ তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ইপ্সিত বর প্রদান করেন বলে তার অন্য নাম আশুতোষ। এ ছাড়াও মহাদেব ধূম্ররূপী বলে দুর্জটি, পশুদের অধিপতি ও পালনকর্তা বলে ইনি পশুপতি।

ত্রিপুর ধ্বংসের সময় শিব দেবতাদের অর্ধতেজ গ্রহণ করেন। এর ফলে তার বল অন্য সকল দেবতাদের অপেক্ষা অধিক হয় এবং তিনি মহাদেব নামে খ্যাত হন। মহাদেবের প্রধান অস্ত্র ত্রিশূল, তাই তিনি ত্রিশূলধারী। তাঁর ধনুকের নাম পিনাক। তাঁর বিশ্বধ্বংসী অস্ত্র পাশুপত, যা তিনি অর্জুনকে দান করেছিলেন। প্রলয়কালে তিনি বিষাণ ও ডমরু বাজিয়ে ধ্বংসকার্যে নিযুক্ত হন। ইনি ত্রিপুরাসুর বিনাশকারী বলে 'ত্রিপুরারি'।

দুর্গা ও রক্ত পিপাসিনী

মহাদেব বা শিবের মোট তিন স্ত্রী– সতী, পার্বতী ও গঙ্গা। পার্বতী জগন্মাতা বলে পরিচিত। পার্বতীর বিভিন্ন রূপ: সুষমাময়ী নারীরূপে উমা, ভয়ঙ্কারী মূর্তিতে দশভূজা, মুণ্ডমালিনী মুর্তিতে কালী। শিবের পুত্র কার্তিকেয়। তিনি রণদেবতা। তার আর এক পুত্র গণেশ। গণেশের খর্বাকৃতি দেহ, তিনটা চোখ, চারখানা হাত এবং হাতির মত শুড় বিশিষ্ট মাথা।[১] লক্ষী ও সরস্বতী তার কন্যা।

সতী হলেন প্রজাপতি দক্ষের কন্যা। ভৃগু-যজ্ঞে মহাদেব শ্বশুর দক্ষকে প্রণাম করেননি বলে ক্রুদ্ধ দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করেন। সতী অনিমন্ত্রিতা হয়েও এই যজ্ঞে উপস্থিত হন। সেখানে সতীকে দেখে দক্ষ শিবনিন্দা করায় সতী যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করেন। এই সংবাদ পেয়ে মহাদেব সেখানে এসে ক্রোধে জটা ছিন্ন করলে শিবজট থেকে বীরভদ্রের উদ্ভব হয়। আর তাঁর নিশ্বাস-বায়ু থেকে কোটি কোটি বৃতপরিবৃতা মহাকালীর আবির্ভাব হল। বীরভদ্র দক্ষালয়ে গিয়ে দক্ষযজ্ঞ নাশ করে দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। দক্ষের স্ত্রী প্রসূতির স্তবে তুষ্ট হয়ে মহাদেব দক্ষকে পুনর্জীবিত করেন। কিন্তু শিবনিন্দার পাপে তার মুণ্ডে ছাগমুণ্ড যোগ করে দেন। সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে শিব যখন নৃত্য করছিলেন, তখন সুদর্শনচক্র দ্বারা বিষ্ণু ঐ দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলেন ৫২ খণ্ডে।

১. গণেশের হস্তিমুখ হওয়ার কাহিনী নিম্নরূপ: গণেশ হলেন শিব (মহাদেব) ও পার্বতীর পুত্র। মহাদেবের স্ত্রী পার্বতীর বিবাহের বহু বছর পরও কোনো সন্তান হচ্ছিল না। এজন্য পার্বতী বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে পুণ্যক ব্রত অনুষ্ঠান করেন। বিষ্ণু প্রীত হয়ে পার্বতীকে পুত্রলাভের বর দেন। যথাসময়ে পার্বতীর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নাম তার গণেশ। দেবতারা স্বর্গ, মর্ত, পাতাল ইত্যাদি সকল স্থান থেকে নবজাত শিশুকে দেখার জন্য উপস্থিত হন। অন্যান্য দেবতার সঙ্গে শনি দেবতাও উপস্থিত হন। শনি দেবতা হলেন এমন যে, তিনি যার দিকে দৃষ্টি দেন তারই বিনাশ হয়। এখানেও তাই হল। তিনি যখন এই সদ্যজাত পুত্র গণেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন তৎক্ষনাত নবজাতকের মুণ্ডু দেহচ্যুত হয়ে গেল। এই সংবাদ বিষ্ণুর কাছে যাওয়া মাত্র তিনি এর ব্যবস্থা করতে এগিয়ে এলেন। তিনি পথিমধ্যে একটি নিদ্রিত হস্তি দেখে তার মস্তক কেটে নিয়ে আসলেন এবং গণেশের গলার সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। আর গণেশ যাতে এ জন্য সকলের কাছে অনাদৃত না হন, সেজন্য দেবতারা নিয়ম করে দিলেন যে, প্রথমে গণেশের পূজা না হলে তার কেউই কোনো পূজা গ্রহণ করবেন না। তাই প্রত্যেক দেবকার্যে ও পিতৃকার্যেও প্রথমে গণেশ পূজিত হন।

বিভক্ত সতীদেহ যে যে স্থানে পতিত হয়েছিল, সেই সেই স্থানে ৫২টি পীঠস্থান বা পরম তীর্থস্থানে পরিণত হয়। এরপর সতী হিমালয়-পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। এদিকে তারকাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতারা জানতে পারেন যে, মহাদেবের ঔরসে যে পুত্র জন্মাবে সেই পুত্রই তারকাকে বধ করবে। সেই জন্য পার্বতী ও মহাদেবের মিলন করতে এসে মদন মহাদেবের কৌপে ভস্মীভূত হন। তারপর পার্বতী ও মহাদেবের মিলন হলে মদন পুনর্জীবন লাভ করেন। পার্বতীর পুত্র কার্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করে তারকাসুরকে বধ করেন।

হিন্দুধর্মের বিশেষ কয়েকটা আকীদা-বিশ্বাস

১. বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস হিন্দুধর্মের প্রধান একটা বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিস থেকে শুরু করে গরু ও সর্পকে পর্যন্ত দেবতা গণ্য করা হয়। তাদের দেবতাদের সংখ্যা হল ৩৩ কোটি।

২. হিন্দু ধর্মের ধারণামতে ঈশ্বর মানবের মধ্যে অবতারিত হয়ে থাকেন। মৎস, কূর্ম, বরাহ, ইত্যাদিকে বিষ্ণুর অবতার বলা হয়। তাদের মধ্যে বিষ্ণুর আবির্ভাব কল্পনা করা হয়; বিষ্ণুর সর্বশেষ অবতার রাম ও কৃষ্ণ। রামের স্ত্রী সীতা লক্ষীর অবতার।

৩. হিন্দুগণ পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করেন।

৪. ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য হিন্দুধর্মের একটা বৈশিষ্ট্য।

৫. যোগ সাধনা হিন্দুধর্মের আর একটা বৈশিষ্ট্য। যোগ অভ্যাসকারী যোগিগণ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ ও নানা প্রকার দৈহিক কসরত অভ্যাস করেন।

৬. বর্ণভেদ হিন্দুধর্মের আর একটা বৈশিষ্ট্য। হিন্দুদের ধর্মমতে হিন্দুগণ চার শ্রেণীর। যথা:– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। এর মধ্যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কারও ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করার অধিকার নেই।

৭. হিন্দু ধর্মে গরু ও সর্পকে দেবতা গণ্য করা হয়। এ জন্য তারা আইন করে গো-রক্ষা পারকল্পনা কর্যকর করার উদ্যোগ নেন। এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে গো-মাংসভোজী অহিন্দুদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী বিরোধের প্রচুর নজির রয়েছে।

৮. পাপমোচনের জন্য তীর্থযাত্রা ও গঙ্গাস্নানাদি হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৯. অসংখ্য দেবদেবীর পূজা হিন্দুধর্মের আর একটা বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতি পূজা থেকে শুরু করে জীব-জন্তু এমনকি পাথরের[১] পর্যন্ত তারা পূজা করে থাকেন। এমনকি লিঙ্গের

১. হিন্দুগণ সন্ধ্যা তর্পনাদি ছাড়া প্রত্যহ 'শালগ্রাম' শিলারূপী গোল পাথরের পূজা করে থাকেন। এই পূঁজা প্রবর্তনের ইতিহাস নিম্নরূপ– ভগবান বিষ্ণু একবার শংখচুড়ের স্ত্রী তুলশীর সঙ্গে ব্যভিচার করেন। ফলে তুলশীর অভিশাপে ভগবান বিষ্ণু গোলাকার পাথরে পরিণত হয়ে যান। শালগ্রাম নামক স্থানে এই ঘটনা ঘটেছিল বলে ঐ পাথরের নাম হয়েছে 'শালগ্রাম শীলা।' বিষ্ণু পাথরে পরিণত হওয়ার পরে দেবতাদের ভয়ে তুলশী দেবী গাছ হয়ে ঐ শীলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। পরে দেবতাগণ সবই জানতে পারেন এবং ঘোষণা করেন যে, প্রত্যহ পূঁজার সময় এই পর্যন্ত পূজা শীলার বুকে এবং পৃষ্ঠে তুলশী পাতা সংযুক্ত করতে হবে। অন্যথায় ভগবান বিষ্ণুর পূজা সিদ্ধ হবে না। (স্কন্দ পুরাণ, নাগর খণ্ডম, ৪৪৪১ পৃঃ ১-১৬ শ্লোক)

পর্যন্ত পূজা করা হয়।[১] তাদের পূজার প্রকার ও ধরন উল্লেখ করে শেষ করার নয়। তবে নিম্নে তাদের বিশেষ কয়েকটা পূজার কিছু ফিরিস্তী দেয়া গেল।

হিন্দুদের পূজার ফিরিস্তী

হিন্দুগণ তাদের প্রসিদ্ধ দুর্গা ও কালি পূজা ছাড়াও ধান্যাদির জন্যে লক্ষ্মী পূজা, বিদ্যার জন্যে সরস্বতী পূজা, পুত্রলাভের জন্যে ষষ্ঠী পূজা, বৃষ্টির জন্যে ইন্দ্র বা বরুণের পূজা, স্বাস্থ্যের জন্যে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পূজা, শত্রুনাশের জন্যে কার্তিক-এর পূজা, সিদ্ধিলাভের জণ্যে গনেশ প্রভৃতির পূজা করে থাকেন। এছাড়া সাপের ভয়ে মনসাপূজা, বজ্র-বিদ্যুতের ভয়ে ইন্দ্রের পূজা, যক্ষ্মার ভয়ে রক্ষাকালীর পূজা, নৌকাডুবির ভয়ে গঙ্গাপূজা, জ্বরের ভয়ে জ্বরাসুরের পূজা, কলেরা ও বসন্তের ভয়ে শীতলাপূজা, পাঁচড়া, চুলকানীর ভয়ে ইটে কুমারের পূজা, অমঙ্গলের ভয়ে শনিপূজা প্রভৃতি অসংখ্য ভয়ের দেবতা সৃষ্টি করে তাদের পূজা করে থাকেন।

হিন্দুধর্মের বর্ণনামতে তাদের দেবদেবীদের বিভিন্ন বাহন রয়েছে। যেমন:– লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, সরস্বতীর রাজহাঁস, গণেশের ইঁদুর, দুর্গার সিংহ, মনসার সর্প, কার্তিকের ময়ূর, শ্রীকৃষ্ণের গরুড় পাখী, মহাদেবের ষাঁড় বা বৃষ, যমরাজের কুকুর, ইন্দ্রের ঐরাবত, গঙ্গার মকর, ব্রহ্মার পাঁতিহাঁস, বিশ্বকর্মার ঢেকী, শীতলার গাধা ইত্যাদি। আর যেহেতু যানবাহন ছাড়া দেব-দেবীদের আগমন-নির্গমন সম্ভব নয়, অতএব তাঁদের পূজায় বসে যানবাহনরূপী পেঁচা, ইঁদুর, কুকুর, সাপ, গাধা, বলদ, রাজ হাঁস, পাতিহাঁস, প্রভৃতির পূজাও করতে হয়। ভক্ত গৃহে দেবদেবীদের আগমনকে সুনিশ্চিত এবং ত্বরান্বিত করার স্বার্থে এসব ইতর জীব-জন্তুর পূজা না করে তাদের কোন উপায়ও নেই।

১. হিন্দুগণ সন্ধ্যা তর্পনাদি ছাড়া প্রত্যহ শিব লিঙ্গের পূজা করে থাকেন। এই শিব লিঙ্গের পূজাপ্রবর্তনের কাহিনী নিম্নরূপ: ঋষী পত্নীদের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঋষীগণ অভিশাপ দিয়েছেন বলেই মহাদেবের লিঙ্গপাত হয়েছিল (দেবী ভাগবত, নবম স্কন্দ, ৫৯৮ পৃষ্ঠা)। এখান থেকেই শিব লিঙ্গ পূজার প্রবর্তন হয়।

এই শিব লিঙ্গের পূজাঁর সময় নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করতে হয়–

ঐং প্রমত্তং শক্তি সংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভং
কামবাণান্বিত দেবং সংসার দহণক্ষমং
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম ॥

অর্থাৎ, লিঙ্গটি প্রমত্ত, শক্তি সংযুক্ত এবং বাণ নামে আখ্যাত (বাণলিঙ্গ) ও মহাপ্রভা সমন্বিত। এ দেব কামপরায়ণ, সংসার দহনে সক্ষম, শৃঙ্গারাদি রসে উল্লসিত এবং বাণ নামে আখ্যাত পরমেশ্বর।

তাছাড়া বাণলিঙ্গ (উভয় লিঙ্গের যুক্ত অবস্থা) পূজার কাহিনী নিম্নরূপ: এক সময় ভগবান মহাদেব যখন তার পত্নী পার্বতীর সঙ্গে মিলিত হন, তখন মহাদেবের প্রমত্ত যৌন উত্তেজনার ফলে পার্বতী মরণাপন্ন হন এবং প্রাণ রক্ষার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে থাকেন। এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সুদর্শন চক্রের দ্বারা উভয় লিঙ্গকে কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করত পার্বতীর প্রাণ রক্ষা করেন এবং দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা লিঙ্গের সেই অবস্থা ও স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য প্রবর্তন হয় এই বাণলিঙ্গ পূজার।

আর পূজার সময় তাদের বিভিন্ন দেবদেবী যেসব খাদ্য-খাবার ভালবাসেন সেগুলে-াও সামনে উপস্থিত রাখতে হয়। উল্লেখ্য, তাদের বর্ণনামতে তাদের বিভিন্ন দেবদেবী বিভিন্ন রকম খাদ্য-খাবার ভালবাসেন। যেমন: মহাদেব গাজা-ভাং ভালবাসেন, ভাং-এর শরবত ভালবাসেন। ত্রিনাথ, শ্রীকৃষ্ণ ননী মাখনের লোভী। সত্য নারায়ণের লোভ ময়দা গোলা সিন্নীর প্রতি। শনিঠাকুর কলা খেতে ভালবাসেন। ভদ্রকালী ভালবাসেন পায়েস-পরমান্ন। নারায়ণ নাড়ু খাওয়ার অভিলাষী। মা মনসা দুধের পিয়াসী। ইত্যাদি।

হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ-বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ

হিন্দুদের কোন নির্দিষ্ট ঐশিগ্রন্থ নেই; তবে বেদ, পুরাণ ও গীতা-য় বিস্তৃত ধর্মীয় আলোচনা আছে বলে এগুলোকেই তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ বলা হয়। এছাড়া উপনিষদকেও তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়। তবে উপনিষদ কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়; এটা বেদের শিরোভাগ। বিষ্ণুর সর্বশেষ অবতার হলেন রাম। রামের স্ত্রী সীতা হলেন লক্ষ্মীর অবতার। এই রাম-সীতার কাহিনী সম্বলিত রামায়ণও হিন্দুদের নিকট ধর্মগ্রন্থ স্বরূপ মূল্যায়িত হয়ে থাকে। তবে সাধারণভাবে বলা হয় তাদের ধর্মগ্রন্থ তিনখানা। যথা:– বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ। নিম্নে বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ সম্বন্ধে পৃথক পৃথকভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হল।

বেদ

বেদব্যাস সংকলিত বেদ ৪ খানি। অর্থাৎ, বেদ চার ভাগে বিভক্ত। একে চতুর্বেদ বলা হয়। যথা:– ঋক্‌বেদ, সামবেদ, যজুঃর্বেদ ও অথর্ববেদ।

ক. ঋক্‌বেদ

ঋক্‌বেদ চারটি বেদের মধ্যে প্রাচীনতম বেদ; এটিকে জগতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গণ্য করা হয়। সূর্য, অগ্নি, উষা, বরুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থের উদ্দেশ্যে রচিত প্রার্থনা-বাণীসমূহের যেগুলো গদ্য-ছন্দে রচিত, প্রধানত সেগুলো এই বেদে স্থান পেয়েছে। গদ্য-ছন্দে রচিত বাক্যকে 'ঋক' বলা হয় বলে এই বেদের নাম দেয়া হয়েছে 'ঋক্‌বেদ'। প্রাচীন যুগে গুরুশিষ্য পরম্পরায় শ্রুত হয়ে এটা প্রচারিত হত বলে একে 'শ্রুতি'ও বলা হয়।

ঋক্‌বেদে ১০,৫৮০ ঋক্ আছে; কিন্তু বর্তমানে ১৬৩ ঋক্ লোপ পেয়েছে। ঋক্‌বেদের মন্ত্রগুলি অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ, উষা, অশ্বিনীদ্বয়, পৃথিবী, মরুৎ, মরু, রুদ্র, যম ও সোম প্রভৃতিদের স্তব-স্তুতিতে পরিপূর্ণ। এ সকল স্তব-স্তুতি ও মন্ত্রদ্বারা আর্যরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করে অভীষ্ট প্রার্থনা করতেন।

খ. সামবেদ

'সাম' অর্থ গান। যে মন্ত্রবাক্য গান করা যায় তাকে "সাম" বলা হয়। ঋক্ মন্ত্র সুর দিয়ে গাওয়া হলে তা সামে পরিণত হয়। সাধারণতঃ যেসব ঋক বা মন্ত্র সুর সহযে-

াগে পাঠ করা হয় সেগুলো এ বেদে সন্নিবেশিত হয়েছে বলে এর নাম হয়েছে 'সামবেদ'। যজ্ঞ সম্পাদনে কোন কোন ঋক্ কেবল উচ্চারিত না হয়ে গীতও হত। এই গেয় ঋক্গুলোই সামবেদ।

গ. যজুর্বেদ

শত শাখাযুক্ত বেদ। এতে যজ্ঞানুষ্ঠানের মন্ত্রসমূহ ও নিয়ম পালনের বিষয় আছে। "যজুন" অর্থ পূজার্চনা, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি। অতএব যজন-যাজনাদি সম্পর্কীয় মন্ত্রগুলোকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে বলে এ বেদের নাম দেয়া হয়েছে 'যজুর্বেদ'।

ঘ. অথর্ববেদ

"থর্ব" অর্থ সচল; আর "অথর্ব" অর্থ অচল। পৃথিবীর সর্বত্র অচল-অবিচল এবং হ্রাসবৃদ্ধিহীন অবস্থায় বিরাজমান পরমাত্মার অস্তিত্ব ও পরিচয়সূচক মন্ত্রসমূহ এই বেদে রয়েছে বলে এর নাম 'অথর্ববেদ' রাখা হয়েছে। এই বেদ ব্রহ্মার উত্তর দিকের, মতান্তরে পূর্ব দিকের মুখ হতে প্রকাশ হয়েছিল বলে প্রবাদ আছে। অনেকে এই বেদকে বেদ বলে গণ্য করেন না। মনুসংহিতায় ও অমরকোষে ঋক্, সাম ও যজু, এই তিন বেদের উল্লেখ আছে। কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে অথর্ববেদ চতুর্থ বেদ বলে উল্লেখিত আছে।

উপবেদ

বেদের চেয়ে এর স্থান নিচে। শ্রুতির সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। এই বেদ সাধারণতঃ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। সকল বেদেরই উপবেদ আছে। ঋক বেদের উপবেদ আয়ুর্বেদ, যজুর্বেদের ধনুর্বেদ, সামবেদের গন্ধর্ববেদ এবং অথর্ববেদের স্থাপত্যবেদ।

উপনিষদ

উপনিষদ বেদের শিরোভাগ। এ জন্য এর নাম বেদান্ত। উপনিষদ বিভিন্ন ঋষি কর্তৃক কথিত হয়েছে। এদের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে ১২ খানি প্রাচীন ও প্রামাণ্য বলে গণ্য। এদের মধ্যেও পরস্পর মতভেদ আছে। প্রধান ১২ খানি উপনিষদের নাম– ১. ঐতরেয়, ২. কৌশীতকী; সামবেদীয়, ৩. ছান্দোগ্য, ৪. কেন; কৃষ্ণ যজুর্বেদীয়, ৫. তৈত্তিরীয়, ৬. কঠ, ৭. শ্বেতাশ্বতর; শুক্ যজুর্বেদীয়, ৮. বৃহদারণ্যক, ৯. ঈশ, ১০. প্রশ্ন, ১১. মুণ্ডক ও ১২. মাণ্ডুক্য। অবশিষ্ট সবই অথর্ববেদীয়।

উপনিষদ আধুনিক হিন্দুদর্শনের মুলসুত্র। এতে পরমাত্মা বা পরম পুরুষের কথা বলা হয়েছে। পরমাত্মা সম্বন্ধে উপনিষদের বর্ননা হল ইহলোকের বন্ধন মায়া, মায়ামুক্তি বা মোহমুক্তির পর মানবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হবে।

পুরাণ

"পুরাণ" হল অতি প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, সমাজ ও ধর্ম ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা। সাধাণতঃ পুরাণ অর্থে বুঝায় ব্যাসাদি মুনি প্রণীত শাস্ত্র।

পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত- মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। মহাপুরাণের সংখ্যা ১৮। যথা-

১। ব্রহ্মপুরাণ ঃ সর্বপ্রথম এই পুরাণ রচিত হয়েছিল বলে একে 'আদি পুরাণ' বলা হয়। এই পুরাণের প্রথমাংশে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, দেবতা ও অসুরগণের জন্ম এবং সূর্য ও চন্দ্রবংশের বিবরণ আছে। এর পরেই বিশ্বের বর্ণনা এবং দ্বীপ, বর্ষ, স্বর্গ, নরক ও পাতালাদির বিবরণ আছে। পরে শ্রীকৃষ্ণের জীবন চরিত আছে। শেষ ভাগে যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা আছে।

২। পদ্মপুরাণ: যখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বর্ণপদ্মরূপে বিরাজিত ছিল, তৎকালজাত ঘটনাবলীর বিবরণ এই পুরাণে লিখিত আছে বলে এর নাম পদ্মপুরাণ। এই পুরাণের শ্লোক সংখ্যা ৫৫,৪৪৪। এই পুরাণ পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। যথা:– সৃষ্টিখণ্ড, ভূমিখণ্ড, স্বর্গখণ্ড, পাতালখণ্ড ও উত্তরখণ্ড।

৩। বিষ্ণুপুরাণ: পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ পূর্ণভাবে এই পুরাণে দেখা যায়। এই পুরাণ ছয় ভাগে বিভক্ত। যথা:– (১) বিষ্ণু ও লক্ষীর উৎপত্তি, ধ্রুবচরিত, প্রহলাদচরিত ইত্যাদি আখ্যান; (২) পৃথিবী, সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র; (৩) ব্যাস কর্তৃক বেদ বিভাগ, শাখা বিভাগ, আশ্রমধর্ম ইত্যাদি; (৪) সূর্য ও চন্দ্রবংশ এবং অন্যান্য রাজবংশের বর্ণনা; (৫) কৃষ্ণচরিত, বৃন্দাবনলীলা ইত্যাদি; (৬) বিষ্ণুভক্তি, যোগ ও মুক্তির কথা।

৪। বায়ুপুরাণ: এই পুরাণ চার অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ব্রহ্মাণ্ড ও জীবের সৃষ্টি; দ্বিতীয় অংশে কল্পাদি, ঋষি-বংশাবলি, ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনা, মন্বন্তর ও শৈব আখ্যানাদি; তৃতীয় অংশে জীবজন্তু এবং চন্দ্র ও সূর্যবংশের বিবরণ; চতুর্থ ভাগে যোগশাস্ত্র, যোগী ও শিবের মাহ্ম্য।

৫। ভাগবতপুরাণ: এই পুরাণকে শ্রীমদ্ভাগবত বলা হয়। সৃষ্টিতত্ত্ব, মায়াবাদ ইত্যাদির বর্ণনা, ব্রহ্মার সৃষ্টি, বিষ্ণুর বরাহাবতার, কপিলাবতার বেণ-রাজচরিত, ধ্রুবচরিত পৃথু ও ভারত উপাখ্যান, প্রহলাদচরিত, চন্দ্র ও সূর্য বংশের বিবরণ, শ্রীকৃষ্ণচরিত, মথুরা ও বৃন্দাবনলীলা, যদুবংশ ধ্বংস, শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু এবং শেষে ভবিষ্যত রাজাদের বিবরণ আছে।

৬। নারদীয় পুরাণ: বৃহৎকল্পে যে সকল কর্তব্য পালন করা হয়েছিল তার বর্ণনা নারদ এই পুরাণে বিবৃত করেছেন। এই পুরাণে বিষ্ণুস্তুতি, বৈষ্ণবআখ্যান, হরিভক্তি, বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষবআচরণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে।

৭। মার্কণ্ডেয় পুরাণ: এর শ্লোক সংখ্যা ৯,০০০। নানা রকম উপাখ্যানে এই পুরাণ পরিপুর্ণ। এই পুরাণে মার্কণ্ডেয় মুনি ধর্মাধর্মাভিজ্ঞ পক্ষিগণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে জৈমিনীর প্রশ্নসমূহের সম্পূর্ণ উত্তর দিয়ে তাঁর সন্দেহ দূর করেছিলেন। ব্যাসশিষ্য জৈমিনী মার্কাণ্ডেয়কে বাসুদেবের প্রকৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে মহর্ষি তাঁকে বিন্ধ্যাপর্বতবাসী শকুনপক্ষীর নিকট যেতে বলেন। জৈমিনী সেখানে গিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করে যে উত্তর পান, তাই নিয়ে মার্কণ্ডেয় পুরাণের আরম্ভ। এতে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কলহ, চণ্ডী, দুর্গাকথা, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাবস্থা কখন ইত্যাদি এবং হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান,

মদালসার উপাখ্যান, রুদ্রাদি সৃষ্টি, রামচন্দ্রের উপাখ্যান, কুশের বংশ নিরূপণ, পুরূরবার উপাখ্যান, যোগধর্ম প্রভৃতি আছে।

৮। অগ্নিপুরাণ: এই পুরাণে অগ্নি কর্তৃক বশিষ্ট মুনিকে ঈশানকল্প বৃত্তান্ত উপদেশচ্ছলে কথিত হয়েছিল। ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানই এই পুরাণের উদ্দেশ্য। প্রধানত শিব-মাহাত্ম্য প্রচার করা এর উদ্দেশ্য হলেও এতে বিবিধ বিষয়ের প্রশ্ন পূর্বক অবতারের কথা ব্যাখ্যাত হয়েছে। বিষ্ণুপূজাদি নিয়ম, শালগ্রামলক্ষণ ও পূজা, তীর্থ মাহাত্ম্য, শ্রাদ্ধবিধি, প্রায়শ্চিত্তবিধি, গায়ত্রীর অর্থ, ধনুর্বিদ্যা ও ব্যবহারবিধি, শব্দানুশাসন, নরকবর্ণন, ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ও এই পুরাণের অংশীভূত।

৯। ভবিষ্যপুরাণ: এই পুরাণে সৃষ্টি প্রক্রিয়া, চুতবর্ণের সংস্কার, আশ্রমধর্ম ইত্যাদি কথিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ ও তার পুত্র শাম্ব, বশিষ্ঠ, নারদ ও ব্যাসের কথোপকথন এবং সূর্যের মাহাত্মের বর্ণনা আছে।

১০। ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণ: এই পুরাণ সাবর্ণি কর্তৃক নারদকে বর্ণিত হয়েছিল। এতে কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য কথা আছে। এই পুরাণ চার খণ্ডে বিভক্ত। যথা:– ব্রহ্মা, প্রকৃতি, গণেশ ও কৃষ্ণখণ্ড। অন্যান্য দেবতার চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও স্তুতিই বেশি আছে। প্রসঙ্গক্রমে সাবিত্রী সত্যবান, সুরভী, স্বাহা, স্বধা, সুরথ, পরশুরাম ইত্যাদির উপাখ্যান আছে।

১১। লিঙ্গপুরাণ: এই পুরাণে মহেশ্বর অগ্নিলিঙ্গ মধ্য থেকে অগ্নি কল্পান্তকালে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ক কথা ব্যক্ত করেছেন। এই পুরাণে ১১, ০০০ শ্লোক আছে এটা দুই ভাগে বিভক্ত। লিঙ্গোৎপত্তি, লিঙ্গ-পূজা, দধীচির উপাখ্যান, যুগধর্মনির্ণয়, লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা, শিবব্রত, প্রায়শ্চিত্ত, কাশীবর্ণন, বরাহচরিত, নৃসিংহচরিত, শিবের সহস্র নাম, দক্ষযজ্ঞ-বিনাশ, মদনভস্ম পার্বতীর সহিত শিবের বিবাহ, বিনায়ক উপাখ্যান, শিবের নৃত্য, উপমন্যুউপাখ্যান, অম্বরীষ উপাখ্যান, শিব-মাহাত্ম্য, সূর্য-পূজাবিধি, শিব-পূজাবিধি, দান প্রকরণ, শ্রাদ্ধপ্রকরণ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত বিষয়।

১২। বরাহপুরাণ: এই পুরাণ মানকল্প প্রসঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মাহাত্ম বর্ণিত হয়েছে। তাই এর নাম বরাহপুরাণ। এতে ২৪,০০০ শ্লোক আছে। এই পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত এবং এটা বিষ্ণু-মাহাত্ম ব্যাখ্যানসূচক। পূর্বভাগে রভ্যচরিত, শ্রাদ্ধবিধি, গৌরীর উৎপত্তি, ব্রতনির্ণয়, মহিষাসুরবধার্থ ত্রিশক্তি হতে দেবীর উৎপত্তি ও মাহাত্ম, বিধির প্রকার, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত, কর্ম-বিপাক এবং উত্তরভাগে পুলস্তা-কুরুরাজ সংবাদ, সর্বতীর্থ মাহাত্ম্য, বহুবিধ ধর্মক্ষণ প্রভৃতি কীর্তিত হয়েছে।

১৩। স্কন্দপুরাণ: এই পুরাণে ষড়ানন (স্কন্দ) তৎপুরুষকল্পের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। পার্বতী ষড়ানন কার্তিকেয়র নিকট, কার্তিকেয় নন্দীয় নিকট এবং নন্দী অত্রিকুমারকে এটা কীর্তন করেন। স্কন্দ তৎপুরুষকল্প প্রসঙ্গে নানান চরিত ও উপাখ্যান এবং মহেশ্বর নির্দিষ্ট ধর্ম প্রকাশ করেন। এই পুরাণের শ্লোকসংখ্যা ৮১,৮০০। এটা মনেশ্বরণণ্ড, বৈষ্ণবখণ্ড, ব্রহ্মখণ্ড, কাশীখণ্ড, নাগরখণ্ড এবং প্রভাসখণ্ড নামক ৭ খণ্ডে

বিভক্ত। এই খণ্ডগুলোর মধ্যে কাশীখণ্ডই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। এতে কাশী-মাহাত্ম বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১৪। বামনপুরাণ: এই পুরাণে ১৪,৪৪৪ শ্লোক আছে। এতে বিষ্ণুর বামনমূর্তিতে বলিকে ছলনা, দান মাহাত্ম, দেব-দানবযুদ্ধ, মহিষাসুর-বধ, দক্ষযজ্ঞ, মদনভস্ম, শিব ও উমার বিবাহ, কুমারের জন্ম এবং বহু তীর্থের বর্ণনা আছে। তীর্থ-মাহাত্ম বর্ণনাই এই পুরানের উদ্দেশ্য।

১৫। কর্মপুরাণ: এই পুরাণে বিষ্ণু কমরূপে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষসমূহের মাহত্ম্য পৃথক পৃথক ভাগে কীর্তন করেন। এই পুরাণের মধ্যে ভৃগুবংশচরিত, কালপরিমাণ, পার্বতীর সহস্রনাম, ব্যাসগীতা, ঈশ্বরগীতা, তীর্থ-মাহাত্ম, বর্ণাচার প্রভৃতি ও জাতিসংকরের বিষয়ে বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়।

১৬। মৎস্যপুরাণ: এই পুরাণের প্রধান বিষয় বিষ্ণু মৎস্যাবতারে মনুকে বর্ণনা করেছেন। এতে মনুর সঙ্গে মীনরূপী বিষ্ণুর কথোপকথন, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, রাজবংশ বর্ণনা, নর্ধদা-মাহাত্ম, ধর্ম, নীতি, মন্দির ও প্রতিমা নির্মাণাদির কথা আছে।

১৭। গরুড়পুরাণ: এই পুরাণে বিষ্ণু কর্তৃক গরুড়কল্পে গরুড়ের বিনতাগর্ভে উৎপত্তি সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা আছে। গরুড়পুরাণও দুই খণ্ডে বিভক্ত– পূর্বখণ্ড ও উত্তরখণ্ড। পূর্বখণ্ডের মধ্যে বিষ্ণুর সহস্র নাম, বিবিধ পূজাবিধি, দীক্ষাবিধি, আয়ুর্বেদ, প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রভৃতি এবং উত্তরখণ্ডে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, যমপুরীর বিষয় শ্রদ্ধাবিধি, প্রেতত্বের কারণ, মৃত্যুর পূর্বাপর বিষয় প্রভৃতি সম্বন্ধে কথিত আছে।

১৮। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ: এই পুরাণ চার পদে বিভক্ত। যথা:– প্রক্রিয়াপাদ, অনুষঙ্গপাদ, উপাদ্ঘাত ও উপসংহারপাদ। এতে সৃষ্টি, কল্প, যুগভেদ, মন্বন্তর, রাজবংশ, বর্ষ, ভারতবর্ষ ও দ্বীপাদি বর্ণিত হয়েছে।

উপরোক্ত পুরাণগুলো ব্যতীত অন্যান্য উপপুরাণের সংখ্যা ১৮। সেগুলোর নাম- সনৎকুমার, নর-সিংহ, নারদীয়, শিব, দুর্বাসা, কপিল, মানব, ঔবনস, বরুণ, কালিকা, শাম্ব, নন্দী, সৌর, পরাশর, আদিত্য, মহেশ্বর, ভাগবত ও বশিষ্ঠ।[১]

১. হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু ধর্মমত সম্পর্কিত তথ্যসমূহের সূত্র:
(১) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত 'দেবীভাগবতম', নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা
(২) অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত 'কাশিদাসী মহাভারত'
(৩) অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত 'কৃত্তিবাসী রামায়ন'
(৪) শ্রীশিব চক্রবর্তী কর্তৃক রচিত এবং নিউ লাইট ও মহেশ লাইব্রেরী কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত 'দেবদেবীর পরিচয় ও বাহন রহস্য'
(৫) সুবীর সরকার রচিত 'পৌরাণিক অভিধান'
(৬) মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত 'বিশ্বকোষ'
(৭) কো. আন্তোনভা, গ্রি. বোনগার্দ-লেভিন ও কতোভস্কি কর্তৃক রচিত এবং প্রগতি প্রকাশনী মস্কো থেকে প্রকাশিত 'ভারত বর্ষের ইতিহাস'
(৮) আবুল হোসেন ভট্টাচার্য রচিত 'আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ।

উপজাতিদের ধর্মকর্ম ও রীতি-নীতি

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু উপজাতি বাস করে। তন্মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ততম পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, লুসেই পাংখুয়া, বম, খ্যাং, চাক ও খুমি নামক উপজাতি বাস করে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে গারো, হাজং এবং সিলেট অঞ্চলে ঘাসি উপজাতি বাস করে। এদের ধর্ম, সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার ও জীবন যাত্রা সবকিছুই বৈচিত্রময়।

উপজাতিদের ধর্মকর্ম অত্যন্ত বিচিত্র। নিম্নে তাদের প্রত্যেকটির পরিচয় ও জীবন প্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বিষয় তুলে ধরা হল।

চাকমা উপজাতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান উপজাতি চাকমা। চাকমারা বাইরের লোকদের কাছে চাকমা হিসাবে পরিচিত হলেও নিজেদেরকে তারা চাঙমা (Changma) বলে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও এরা ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, মিকিরহিল ও অরুণাচলে বসবাস করে। নৃতাত্ত্বিকদের মতে চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। তাদের ভাষা বাংলা এবং অহমিয়ার মত হিন্দুআর্য (Indo-Aryan) শাখাভুক্ত, তবে চাকমাদের লেখার জন্য নিজেদের বর্ণমালা রয়েছে।

ধর্ম

চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের প্রায় গ্রামে ক্যাং (বৌদ্ধ মন্দির) রয়েছে। এরা তাদের ধর্মমতে খুব জাক-জমকপূর্ণভাবে "বৈশাখী পূর্ণিমা" পালন করে। চাকমাদের মাঝে বিভিন্ন পূজা ও উৎসব প্রচলিত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ভাত-দ্যা, হাল-পালনী, থান-মানা, ধর্মকাম ও বিঝু উৎসব ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জীবন চিত্র

চাকমারা গৃহকে 'ঘর' এবং গ্রামকে 'আদাম' বলে। সচারচর ছোট ছোট নদীর তীরে ছোট ছোট পাহাড়ের উপর খোলামেলা জায়গায় চাকমাদের গ্রামগুলো হয়ে থাকে।

এদের কোন শিশু জন্ম হলে তাকে মধু পান করায়, যাতে আগামীতে তার জীবন সর্বক্ষেত্রে মধুময় হয়ে উঠে। আর কোন লোকের মৃত্যু হলে তার মরদেহ শুভ্র কাপড়ে ঢেকে রাখা হয় এবং ঢোল বাজিয়ে এলাকার লোক জমায়েত করা হয়। অতঃপর আনুষ্ঠানিকতা সেরে মৃতদেহ চিতায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর মৃতের জ্যেষ্ঠ পুত্র বা রক্ত সম্পর্কের নিকটস্ত কোন আত্মীয় প্রথম তার চিতায় অগ্নি সংযোগ করে। পরে অন্যান্যরা চিতায় আগুন দেয়।

চাকমারা বর্তমানে পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত স্বগোষ্ঠীয় কাউকে বিয়ে করে না। আর বিয়েতে তাদের অনেক আনুষ্ঠানিকতা পোহাতে হয়।

চাকমা-সমাজে পিতা তার মেয়েদেরকে কিছু না দিয়ে গেলে পিতার মৃত্যুর পর মেয়েরা কোন সম্পত্তিই পায় না।

চাকমা ভাষায় গোত্র শব্দের প্রতিশব্দ হল গুথি। আর কয়েকটি গুথি মিলে হয় একটি গঝা (দল)। চাকমাদের ৩২টি গঝা (দল) রয়েছে। (বান্দরবনের অধুনালুপ্ত ত্রৈমাসিক পত্রিকা ঝরণা, ৩২ সংখ্যা, ১৯৬৭) চাকমা সমাজে প্রধান হলেন (১৯০০ খৃ. থেকে) রাজা, তারপর হেডম্যান (মৌজা প্রধান), তারপর কার্বারী (গ্রামের প্রধান)। এরা ছাড়াও বৌদ্ধ ভিক্ষু, চারণ কবি এবং ওঝারাও চাকমা সমাজে সম্মানের অধিকারী হিসাবে বিবেচিত হন।

মারমা উপজাতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি হল মারমা। বর্মি ম্রানমা অথবা 'ম্রাইমা' শব্দ থেকে মারমা শব্দটি বর্মি বংশক অর্থে উদ্ভূত হয়েছে। তাদের আদি নিবাস বার্মা এবং আরাকানে। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে বর্মি এবং আরাকানিয়াদের গভীর যোগসূত্র রয়েছে। এদের সমগোত্রীয় কিছু লোক কক্সাজার ও পটুয়াখালিতেও রয়েছে। তারা নিজেদেরকে 'রাখাইন' হিসেবে পরিচয় দেয়।

মারমারাও মোঙ্গলীয় জনগোষ্ঠীর লোক এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। মারমা সমাজে বহু রীতিনীতি পালিত হয়। নিম্নে দু' একটি তুলে ধরা হল।

মারমারা তাদের সন্তানের নামকরণ অত্যন্ত আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে করে। সন্তান যদি পরিবারের প্রথম সন্তান হয়, তাহলে পুত্র হোক বা কন্যা হোক তার নামের সঙ্গে 'উ' যুক্ত করে দেয়। আর যদি সন্তানটি পরিবারের সকলের ছোট হয়, তাহলে তার নামের সঙ্গে 'থুই' শব্দটি যুক্ত করে দেয়।

তারা নাচ-গান এবং আমোদ-প্রমোদ ভালবাসে। বিভিন্ন উৎসবে মারমা তরুণ তরুণীরা অংশ গ্রহণ করে। সেখানে দেখা সাক্ষাৎ এবং মন দেয়া নেয়ার পালা চলে। এরপর একদিন নিজের মনমত জীবন সঙ্গীকে বেছে নেয়।

মারমা সমাজের কোন লোক মারা গেলে তাকে গোসল দিয়ে কাপড় পরানোর পর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মৃতের আত্মার সদগতি কামনা করে মন্ত্র পাঠ করে। এরপর চাকমাদের মতই চিতায় নিয়ে পোড়ায়। অতঃপর ছাইগুলো মাটি চাপা দেয়।

ত্রিপুরা উপজাতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি হল ত্রিপুরারা। তাদের আদি নিবাস হল ভারতের পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে। ত্রিপুরার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়াও সিলেট, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড় অঞ্চলে বসবাস করে। ত্রিপুরারাও মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির লোক। উপজাতিদের মধ্যে এরাই একমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বী। অবশ্য তাদের নিজস্ব দেব-দেবীও রয়েছে। ত্রিপুরারা ৩৬ দলে বিভক্ত বলে প্রবাদ রয়েছে।

জীবনাচার

তাদের মাঝে কোন শিশু জন্ম নিলে তাকে উষ্ণজলে স্নান করানোর পর মুখে মধু দেয়া হয়। এরপর তার নামকরণের অনুষ্ঠানে ৫/৭টি প্রদীপ আনা হয় এবং প্রত্যেকটি

প্রদীপের বরাবর এক একটি নাম প্রস্তাব করা হয়। যে প্রদীপটি বেশিক্ষণ জ্বলে, সে প্রদীপের বরাবর নামটি রাখা হয়। বিবাহের ক্ষেত্রে বহু সময় ছেলে মেয়েরাই নিজেদের জীবন-সঙ্গী বেছে নেয়। কোন লোক মারা গেলে বহুবিধ আনুষ্ঠানিকতা সেরে চিতায় নিয়ে পোড়ানো হয়। মৃতদেহ পুড়ে গেলে ওঝা মৃতের খুলি থেকে সামান্য মগজ বের করে মৃতের পিছনে রেখে জলে ভাসিয়ে দেয়। আর কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধিতে কেউ মারা গেলে তাকে প্রথমে কবরস্ত করা হয়। পরে তার হাড়-গোড় মাটি থেকে তুলে আবার চিতায় পোড়ানো হয়।

তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি

পূর্বে তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে চাকমাদের একটি শাখা হিসাবে উল্লেখ করা হলেও বর্তমানে তঞ্চঙ্গাদেরকে একটি স্বতন্ত্র উপজাতি হিসাবে ধরা হয়। তঞ্চঙ্গ্যারা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার মানিক ছড়ি, রইস্যা বিল, বেতবুনিয়া, ওয়াগগা, কাপ্তাই, রাজস্থলী, রাইংখ্যা, বৈগা ইত্যাদি স্থানে এবং বান্দরবন পার্বত্য জেলার বান্দরবন সদর, বালাখাটা, সুয়ালাক, রোয়াং ছড়ি, নোয়াপতং, কুক্ষ্যাং, পাইন্দু অঞ্চলে বসবাস করে। তাদের ছয়টি বিশেষ দল রয়েছে। যথা:- মো, কর্বোয়া- ধন্যা, মংলা, মেলং, লাং। এরাও ধর্মের দিক থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

ম্রো উপজাতি

বান্দরবান জেলার থানচি, লামা, ও নাক্ষৎং ছড়ীতে ম্রোদের বেশ কয়েকটি গ্রাম রয়েছে। ম্রোরা পার্বত্য চট্রগাম ছাড়া বার্মার আকিয়াব জেলায়ও বসবাস করে। এরা নিজেদেরকে মারুসা বলে। এর অর্থ মানুষ।

ম্রোরা বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী, তবে খৃষ্টান মিশনারীদের কারণে তাদের কিছু কিছু লোক সাম্প্রতিক কালে খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের মাঝে এখনো বহু প্রকার জড়-উপাসনা দেখা যায়। তাদের বিশ্বাস থুবাই নামে একজন বিশ্ব-নিয়ন্তা রয়েছেন। তিনি একবার মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে একটি গরুকে দিয়ে ম্রোদের কাছে একটি ধর্মগ্রন্থ পাঠান। গরুটি ঐ ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আসার সময় পথিমধ্যে ক্ষুদার্থ হয়ে সেটি খেয়ে ফেলে এবং থুরাই ম্রোদের কাছে যে সমস্ত উপদেশ বাণী পাঠিয়ে ছিলেন সে সম্পর্কে মিথ্যা বলে। যার ফলে ম্রোদের খুব ক্ষতি হয়। তাই তারা আজও পূজা অনুষ্ঠানে গরুকে হত্যা করার পর গরুর জিহ্বাটি কেটে নেয়।

ম্রোদের ধর্মমতে কোন যুবতী যদি বিয়ের পূর্বে গর্ভবতী হয়ে পড়ে, তবে তাকে এবং তার প্রেমিককে দুটো শূকর জরিমানা করা হয়। যে গৃহস্তের বাড়ীতে যুবতী গর্ভবতী হয়, তাকে একটা শূকর দেয়া হয় এবং অন্যটা সবাই মিলে রান্না করে খায়। ম্রোদের বিশ্বাস ঐ গৃহস্থকে একটা শূকর না দিলে দিন দিন তার সম্পত্তি রসাতলে যাবে।

বম উপজাতি

বম উপজাতিয় লোকেরা পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে বান্দরবান জেলার রুমা খানাতে বসবাস করে। এককালে তারা জড় উপাসক ছিল। বর্তমানে তারা খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। যার ফলে তাদের সমাজ জীবন, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। অতীতে বমরা আরকান অঞ্চলে বসবাস করত। আরাকানিরা তাদেরকে 'লাংগিচ' বা 'লাংখে' বলে ডাকে। অতীতে বমরা নিজেদেরকে 'লাই' বা 'লাইমি' বলে পরিচয় দিত। এই শব্দগুলোর অর্থ হল মানুষ।

অতীতে বমদের বিশ্বাস ছিল মৃত্যুর পর লোকেরা মৃতের দেশে চলে যায়। সেখানে তারা নতুনভাবে জীবন লাভ করে এবং ইহলোকের অর্জিত সবকিছু সেখানে ফিরে পায়। তারা মৃতের পথ-যাত্রাকে সুগম করার জন্য মৃতকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানানোর সময় উর্ধ্বাকাশে তীর বা বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে সানু নামক এক শ্রেণীর অপদেবতাকে তাড়িয়ে দিত।

লুসেই ও পাংখুয়া উপজাতি

কুকি-চীন ভাষা-ভাষী দুর্ধর্ষ উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল লুসেইরা। এখানে স্বল্প সংখ্যক লুসেই পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর পূর্বাংশে রাঙ্গামাটি জেলার সাজেক এলাকায় বাস করে। ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ-ব্যবস্থা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে লুসেইদের সাথে পাংখুদের গভীর যোগাযোগ রয়েছে। উভয় উপজাতিই অতীতে লুসাই পাহাড় বা মিজোরামের দিক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে এসেছে। এ দুটো উপজাতির পুরুষেরা মাথায় লম্বা চুল রাখত এবং মাথার পিছন দিকে চুলগুলো ঝুঁটির আকারে বাঁধতো। তারা খৃষ্টান মিশনারিদের কাছে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করায় তাদের সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব রয়েছে। লুসেই মেয়েরা 'বাঁশনৃত্যে' খুব পটু। লুসেইরা তাদের সর্দারদেরকে 'লাল' বলে। অতীতে গ্রামের লোকেরা সকলে মিলে উপযুক্ত ব্যক্তিকে 'লাল' নির্বাচিত করত। লাল যুদ্ধের সময় এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে গ্রামবাসীদেরকে নেতৃত্ব দিতেন।

অতীতে কোন লালের মৃত্যু হলে লুসেইরা মৃতের সাথে কবরে অস্ত্র-শস্ত্রও মাটিচাপা দিত।

খ্যাং উপজাতি

খ্যাংরা একটি ক্ষুদ্র উপজাতি। তারা কাপ্তাইয়ের কাছে চন্দ্রঘোনার আশে পাশে এবং রাজস্থলী থানায় বাস করে। এখানে তাদের ৭/৮টি ছোট ছোট গ্রাম আছে। লোকসংখ্যাও কম, ১৯৮১ সালের আদম শুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী ১৫০১ জন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মধ্যে খ্যাংরা দেখতে বেশ সুন্দর। কথিত আছে- অতীতে প্রায় উপজাতীয় লোকেরা খ্যাংদের আক্রমণ করে তাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে যেত। এ কারণে তারা তাদের মেয়েদেরকে অসুন্দর করার জন্য মুখে নানান জাতীয়

উল্কি এঁকে দিত। বার্মায়ও খ্যাংদের বসবাস রয়েছে। সেখানে তারা নিজেদেরকে শো (Sho) বা শু (ঝযঁ) বলে। আরাকানি ও বর্মিরা তাদেরকে খ্যাংচিন বা টেনচিন বলে।

পূর্বে তাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। তবে সাম্প্রতিক তাদের অনেকেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

খুমি উপজাতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি ক্ষুদ্র উপজাতির নাম খুমি। পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে বান্দরবন জেলার রুমা ও খানচি থানাতে খুমিরা বাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্ধর্ষ উপজাতিয় লোকদের মধ্যে খুমিরাও অন্যতম। আরাকানের কোলাডাইন নদীর উপরাংশে এখনও খুমিদের বসবাস রয়েছে। আরাকানের খুমিরা নিজেদের মধ্যে কুমি হিসেবে পরিচিত। সেখানে তাদের দু'দল খুমি রয়েছে। একদল নিজেদেরকে কামি (Kami) বা কিমি (Kimi) বলে, অন্য দল তাদেরকে কুমি (Kumi) বলে। আরাকানিরা উপরোক্ত দুটি দলের একটিকে আওয়া কুমি (Awa Kumi) এবং অন্যটিকে অফ্যা কুমি (Aphya Kumi) বলে। উভয় দলই অতীতে কোলাডাইন নদীর তীরে বসবাস করত। খুমি পুরুষেরা মাথায় লম্বা চুল রাখে এবং মাথার পিছন দিকে ঝুঁটি আকারে বাঁধে। তারাও ম্রোদের মত নাচের আসরে গো হত্যা করে। তবে তারা গো হত্যা অনুষ্ঠানে দলবদ্ধ হয়ে নাচে না বরং একজন পুরুষ ও স্ত্রীলোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নাচে।

চাক উপজাতি

চাকরা পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে বান্দরবন জেলায় বাইশারি, নাক্ষাংছড়ী, আলিখ্যং প্রভৃতি মৌজাগুলোতে বাস করে। চাকরা নিজেদেরকে 'আসাক' বলে। আরাকানিয়া চাকদের 'সাক' বলে। আরাকানের আকিয়াব জেলায় চাকদের বেশ কিছু লোক 'সাক' নামে বসবাস করছে। বার্মায় কাড়ু (Kadu) এবং গানান (Ganan) নামে চাকদের সমগোত্রীয় চাকদের আরো দুটো উপজাতি রয়েছে। তারাও চাকদের মত নিজেদেরকে 'আসাক' বলে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকদের দুটো প্রধান গোত্র রয়েছে। যথা:– (১) আন্দো (২) এবং ঙারেক। চাকদের রীতি অনুযায়ী তাদের সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ, একজন আন্দো ছেলের জন্য আন্দো মেয়ে বিবাহ করা নিষেধ। বরং একজন আন্দো ছেলেকে বিয়ে করতে হবে একজন ঙারেক মেয়েকে। অনুরূপ ঙারেকদের ক্ষেত্রেও। এ নিয়মটি মৃত্যুর বেলাতেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ, আন্দো গোত্রের কোন লোক মারা গেলে তার মরদেহ রীতি অনুযায়ী সৎকার করার ভার পড়বে ঙারেক গোত্রে অবস্থানকারী তার ভাগ্নেদের উপর। মৃত লোকটি আন্দো গোত্রের মহিলা হলে দায়িত্ব পড়বে ঙারেক গোত্রে অবস্থানকরী তার ভাইপোদের উপর। অনুরূপ ঙারেক গোত্রের লোক মারা গেলে তার সৎকারের দায়িত্ব পড়বে আন্দো গোত্রীয়দের উপর। চাকরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধদের অনুষ্ঠানগুলো তারা শ্রদ্ধার সাথে পালন করে।

গারো উপজাতি

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় বসবাসকারী উপজাতিদের মধ্যে গারোরা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এরা এখন ময়মনসিংহ ছাড়াও টাঙ্গাইল ও সিলেট জেলাতে বসবাস করে। হালুয়াঘাট, শ্রীবর্দী, কমলাকান্দা, বিরিশিরি, বারহাট্টা, মধুপুরের গড় ইত্যাদি স্থানে গারোরা অধিক সংখ্যায় বসবাস করে। ভারতের মেঘালয়, কোচবিহার, ত্রিপুরা, আসাম ইত্যাদি রাজ্যেও গারোরা বাস করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে গারো এবং তাদের সমভাষী আসামের বোডো (Bodo) উপজাতির লোকেরা খৃষ্ট পূর্ব ৩০০ অব্দের দিকে তাদের আদি নিবাস চীনের ইয়াংসি-কিয়াং ও হোয়াং হো নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের উপরাংশ থেকে ভারতের উত্তর পূর্বাংশের আসাম রাজ্যে এসেছিল।

গারো সমাজে পেশা ও এলাকা ভিত্তিতে গঠিত ১৭টা দল-উপদল রয়েছে।

গারোরা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অধিকারী এবং মেয়েরাই সকল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে থাকে। গারোদের সামাজিক কাঠামো গ্রাম কেন্দ্রিক। গ্রামের প্রধানকে তারা 'নাকমা' বলে। পূর্বে গারোদের বিশ্বাস ছিল যে, তাতারা রাগুবা নামক একজন স্রষ্টা অন্যান্য দেবতাদের সহায়তায় এই মহা বিশ্ব ও প্রাণীজগতের সৃষ্টি করেছেন। তারা আত্মার অবিনাশিতা এবং পুনঃজন্মে বিশ্বাস করত। বর্তমানে তারা খৃষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। গারোদের শ্রেষ্ঠ উৎসবের নাম 'ওয়ানগালা'। বাংলা আশ্বিন মাসে তিন থেকে সাতদিন ধরে এই উৎসব উদযাপিত হয়।

"কোন গারো মৃত্যুবরণ করলে তার আত্মীয়-স্বজনের খবর নিতে গেলে রীতি অনুযায়ী তার জন্য কাপড় নিয়ে যেতে হয়। তারা রীতি অনুযায়ী মৃত দেহকে দাহ করে। আর দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা গেলে তাকে কবর দেয়। অতঃপর মৃত ব্যক্তির সদগতির জন্য নকালচিকা, মিবাংকালা, দেলাং সওয়া ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদি পালন করে।

খাসি উপজাতি

খাসিরা বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে বাস করে। ১৯৮২ সনে তাদের জন সংখ্যা বলা হয়েছে ১৩/১৪ হাজার। তবে খাসিদের মূল জনসংখ্যা বাস করে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে। সেখানে ১৯৬১ সনে ৪,৬২,১৫২ খাসি বাস করত। খাসিরা মঙ্গোলিয় জনগোষ্ঠির লোক। তাদের ভাষা বৃহত্তর অষ্ট্রিক পরিবারের মন-ক্ষেমর শাখার অন্তর্গত। সিলেটের সীমান্ত অঞ্চলে তারা পানের চাষ করে। আর মেঘালয়ের খাসিরা উন্নত মানের কমলার চাষ করে। পূর্বে তারা জড়ের উপাসনা করত। দেবতার উদ্দেশ্যে ছাগল, মোরগ ইত্যাদি বলি দিত। বর্তমানে তারা খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। পারিবারিক জীবনে খাসিরাও গারোদের মত মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অধিকারী। তাদের সমাজেও মেয়েরাই যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী হয়ে থাকে। তাদের মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদের নিয়ম হল- স্বামী তার স্ত্রীকে পাঁচটি কড়ি বা তাম্রমুদ্রা দেয়। স্ত্রী আরও পাঁচটি

কড়ি বা তাম্রমুদ্রাসহ তার স্বামীর হাতে দেয়। এগুলো স্বামী ছুড়ে ফেলে দেয়, এতে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

হাজং উপজাতি

বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় গারোদের পাশাপাশি হাজং উপজাতীয় লোকেরাও বাস করে। তাদের ভাষার সঙ্গে বাংলা ও অহমিয়া ভাষারও মিল দেখা যায়। তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কিছু হাজং ময়মনসিংহ ছাড়াও জামালপুর এবং সিলেট অঞ্চলে বসবাস করে। হাজংরা গারোদের পাশাপাশি বাস করলেও তারা গারোদের মত মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অধিবাসী নয়। বরং তাদের সমাজ ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক।[১]

রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম

"ব্রাহ্মধর্ম" বলতে বোঝায় রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মমতকে। রাজা রামমোহন রায় এই ধর্মমতের প্রবর্তক। তিনি ১৭৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে এক হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা রমাকান্ত বন্দোপাধ্যায়; মাতা তারিণী দেবী। তার পূর্ব পুরুষ নওয়াব সরকার থেকে "রায়" উপাধি পান।

তিনি গ্রামের মৌলভীর নিকট এবং পাটনা ও কাশীতে অধ্যয়ন করে আরবী, ফারসী, হিব্রু, উর্দু, হিন্দী, ও সংস্কৃতি ভাষা এবং গ্রীক-দর্শন আয়ত্ত করেন। পবিত্র কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হন এবং এ কারণে পিতা ও সমাজ কর্তৃক গৃহ থেকে বহিস্কৃত হন। তারপর চার বৎসর যাবত তিনি তিব্বতসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে কাটান। দেশে ফিরে প্রায় ১০ বৎসর (১৮১৫ পর্যন্ত) ঈষ্ট কোম্পানীতে (প্রধানত রংপুরে) দেওয়ান বা সেরেস্তাদারের চাকরি করেন। পরে পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করে স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বসবাস করেন।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় নিজ গৃহে এক উপাসনালয় ("আত্মীয়সভা" বা "ব্রহ্মসভা") স্থাপন করে ব্রাহ্মধর্মের সূচনা করেন। পরে চিৎপুর রোডে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্মিত হয়। "আত্মীয়সভা" নামের স্থলেই "ব্রাহ্মসমাজ" নামটা গৃহীত হয়। ১৮৩৯ সালের ৬ই অক্টোবর দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্বরঞ্জিনী' বা 'তত্ত্বোধিনী' সভার সঙ্গে যুক্ত করে এর নাম দেন ব্রাহ্মসমাজ।

রাজা রামমোহন রায় চিরাচরিত ও সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ফলে তাকে বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। এই সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম" বা একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করেন। তার প্রবর্তিত এই ধর্মানুসারী সমাজকে বলা হয় "ব্রাহ্মসমাজ"।[২]

১. উপজাতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সুগত চাকমা কর্তৃক রচিত এবং বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশের উপজাতি" নামক পুস্তক থেকে গৃহীত।

২. উল্লেখ্য যে, ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মণ এক কথা নয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যবাদ এক কথা নয়। ব্রাহ্মসমাজ হল রামমোহন রায় কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মানুসারী সমাজ। আর ব্রাহ্মণ হল হিন্দুদের পুরোহিত শ্রেণীর লোক। এই ব্রাহ্মণদের ধর্মমতকে বলা হয় ব্রাহ্মণ্যবাদ।

রাজা রামমোহন রায় হিন্দুধর্মের যেসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তার মধ্যে হিন্দুনারীর সহমরণ বা সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ বিষয়টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোঁড়াপন্থীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় তৎকালীন বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক-এর আদেশক্রমে নূতন আইন করে (১৮২৯) হিন্দুনারীর সহমরণ বা সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা হয়।

তিনি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারমূলক অনেকগুলো পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটার নাম হল- ব্রহ্মোপাসনা, বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, ঈশোপনিষদ, কেনোপনিষদ, ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, কঠোপনিষদ, মাণ্ডুক্যোপনিষদ, মুণ্ডকোপনিষদ, সংবাদ, কৌমুদী, গৌড়ীয় ব্যাকরণ। ১৮০৩ সালে তিনি ফারসী ভাষায় (আরবীতে ভূমিকাসহ) تحفة الموحدين (তুহফাতুল মুওয়াহ্‌হিদীন) নামক বইটি রচনা করেন। ১৮২০ সালে তিনি খ্রীষ্টধর্মের নৈতিক ও মানবহিতৈষী শিক্ষার বিষয়াবলী সংবলিত ইংরেজিতে এযব Precepts of Jesus নামক বইটি রচনা করেন। রক্ষণশীল হিন্দুদের অনেকে রামমোহনের লেখার প্রবল প্রতিবাদ করেন। সে সকলের উত্তরে তিনি ১৮১৭ সালে "ভট্টাচার্যের সহিত বিচার" বইটি লেখেন। হিন্দুধর্মের সংস্কার মানসে রচিত তার বইগুলো ১৮১৫ হতে ১৮১৯-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। আর রক্ষণশীল হিন্দুদের প্রতিবাদের উত্তরগুলো ১৮১৭ থেকে ১৮১৯-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়।

রামমোহনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সর্বধর্মের সমন্বয় করা। তার প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভার উদ্দেশ্য ছিল জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য একটি প্রার্থনা সভার সৃষ্টি করা এবং সকল ধর্মাবলম্বীদের এক সাধারণ মিলন-ভূমির প্রতিষ্ঠা করা। সর্বধর্ম সমন্বয় প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে তিনি হিন্দুদের পৌত্তলিকতা, বহুত্ববাদ, জড়পূজা, প্রকৃতিপূজা ইত্যাদির বিরোধিতা এবং খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদ ইত্যাদির বিরোধিতা সত্ত্বেও খৃষ্টান মিশনারী কর্তৃক হিন্দু ধর্মের সমালোচনার বিরেধিতা করেছেন আবার খৃষ্টধর্মের প্রশংসাও করেছেন। একদিকে তিনি ইসলাম ধর্মের নবুওয়াত, রেসালাতকে অস্বীকার করতেন আবার পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, সাকার পূজা প্রকৃতি-পূজা ইত্যাদির বিরুদ্ধে কুরআনের আদর্শে মুগ্ধতা প্রকাশ করে ইসলামের প্রতি আনুকূল্য প্রদানও করতেন। খৃষ্টান মিশনের সঙ্গেও ছিল তার সখ্যতা, আবার হিন্দুদের ব্যাপারেও ছিল এমন নীতি যে, পরবর্তী ব্রাহ্মরা বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ বারবার বোঝাতে চেয়েছেন যে, রামমোহন আদি হিন্দুধর্মই পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন।

রামমোহনের চিন্তাধারার বিশেষ কয়েকটা বিষয়

১. তিনি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করলেও মুতাযিলাদের ন্যায় আল্লাহ্‌র গুণাবলী অস্বীকার করতেন। রামমোহনের মতে ব্রহ্ম (খোদা/ঈশ্বর) নির্গুণ, নিরাকার, অনির্বচনীয় ও অনির্ণীত। তবে দেবেন্দ্রনাথ সগুণ ব্রহ্মে বিশ্বাস করতেন।

২. তিনি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু উপাসকদের জন্য দেবদেবী পূজা সমর্থন করতেন। তবে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে মূর্তি-পূজাকে অস্বীকার করেন।

৩. তিনি ওহী ও নবূওয়াতের প্রয়োজনকে অস্বীকার করতেন। তিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াতকেও অস্বীকার করতেন।

৪. তিনি ইসলাম, খৃষ্টধর্ম ইত্যাদি সব ধর্মেরই মু'জিযা তথা অলৌকিক বিষয়বস্তুকে অস্বীকার করতেন।

৫. তিনি ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্বন্ধে এই ধারণা রাখতেন যে, এগুলো ধর্মগুরুগণ কর্তৃক যুগ যুগ ধরে সৃষ্ট।

৬. পীর মাশায়েখ ও সূফী দরবেশদের কথায় বিশ্বাস করাকে অন্ধ অনুকরণ, কুসংস্কার, অতীতমুখিতা ও পৌত্তলিকতা বলে মনে করতেন।

৭. রামমোহনের কথা ছিল জ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হও, ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনকে আয়ত্ব কর, অতীতের সকল মোহ থেকে মুক্ত হয়ে সকল বন্ধনকে ডিঙিয়ে চল, জ্ঞান- বিজ্ঞান ও দর্শনের নানা সত্য আবিষ্কার করে নব নব সৃষ্টির ভিতর দিয়ে পূর্ণতার সন্ধান কর।

আল্লাহ্র গুণাবলীকে অস্বীকার, নবুওয়াত-রেসালাতকে অস্বীকার, ধর্মীয় বিধি-বিধানকে অস্বীকার ইত্যাদি কুফরী মতবাদ সত্ত্বেও আমাদের দেশের সাহিত্য সমাজের চিন্তাবিদ বলে খ্যাত সর্বজনাব কাজী আব্দুল ওদূদ, আবুল হোসেন, আবুল ফজল, আবদুল হক, আনোয়ারুল কাদির, কাজী মোতাহার হোসেন চৌধুরী প্রমুখ রামমোহনের আদর্শকে মুসলমান সমাজের নব জাগরণের জন্য অনুকরণযোগ্য বলে মনে করেছেন। এটা স্পষ্টত কুফরী মতবাদ অনুসরণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করা।

তিনি ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরের নিকটবর্তী স্টেপলটনহিল গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। ব্রিস্টলেই তাঁর মরদেহ সমাহিত হয়।[১]

রামকৃষ্ণের ধর্মমত-সার্বজনীন ধর্ম

রামকৃষ্ণ বা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-৮৬) একজন হিন্দু সাধক। হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, মাতা চন্দ্রমনি দেবী। দরিদ্র মাতা-পিতার দেওয়া নাম গদাধর। পুরোহিত বৃত্তির জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। রানী রাসমনি তাঁকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাদীর পুরোহিত নিযুক্ত করেন। আনুমানিক ১৮৫৫ সনে তিনি কালীর উপাসক হন। তাঁর দৃষ্টিতে কালীদেবী মানবজাতির স্নেহ-পরায়না মাতৃ-স্বরূপিনী।

১. রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের সূত্র: মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ ও বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশে দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান" নামক গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধ।

তিনি ১৮৬৬ সনে ইসলাম ধর্ম এবং ১৮৭৪ সনে খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন এবং অনতিবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, অধিকাংশ লোকের জন্য শাশ্বত ভগবানের সান্নিধ্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে সকল ধর্মই সমানভাবে নির্ভরযোগ্য, তবে খাঁটি মরমী সাধকদের ভগবৎ মিলনের জন্য (বিধিবদ্ধ) ধর্ম অনাবশ্যক। অনাসক্ত ও প্রশান্ত মনে ভগবদ্ধ্যানের দ্বারাই আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করা যায়- এই মতবাদকে খণ্ডন করে তিনি শিষ্যগণকে সক্রিয় পরোপকার ব্রতে প্রেরণা দান করেন।

রামকৃষ্ণ-গবেষকদের মতে রামকৃষ্ণের জীবন সাধনার একটা মূল লক্ষ্য ছিল সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন ধর্মমতের রূপরেখা নির্দেশ করা। অর্থাৎ, তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। রামকৃষ্ণ-গবেষকদের মতে এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি সব ধর্মের গভীরে প্রবেশ করে সব ধর্মের মৌলবাণীকে আত্মস্থ করেন। এর অংশ হিসাবে তিনি এক সময় ইসলাম ধর্মের দীক্ষা নিয়ে[১] যথারীতি ধর্মের অনুশীলন শুরু করেন। এক সময় তাকে খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে যিশুর ধ্যানে তন্ময় হতেও দেখা যায়। সনাতন হিন্দু ধর্মমত অনুযায়ী সাধনাও করেন। ভৈরবীকে গুরু রূপে গ্রহণ করে দীর্ঘদিন তন্ত্র সাধনাও করেন। বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী তোতাপুরীর সান্নিধ্যে থেকে অদ্বৈত সাধনাও করেন। বৈষ্ণব সাধনাও করেন।

রামকৃষ্ণ প্রবর্তিত সার্বজনীন ধর্মের মূল কথা হল- ভগবানের সান্নিধ্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে সকল ধর্মই সমান ভাবে নির্ভরযোগ্য। সব ধর্মের মূল লক্ষ্য অভিন্ন, তা হল সত্যের স্বরূপ অন্বেষা। পথের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র সত্ত্বেও গন্তব্যস্থল এক ও অভিন্ন। রামকৃষ্ণ বলেন, যেমন ছাদের উপর উঠতে হলে মই, বাঁশ, সিড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে উঠা যায়, তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই একটি উপায়। তার মতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ইসলাম যেকোনো একটি ধর্মকে বেছে নিয়েই সাধন-পথে অগ্রসর হলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়।[২]

১. তবে তিনি প্রকৃত মুসলমান হননি। এটা তার নিজস্ব বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেন, ঐ সময় আল্লাহ আল্লাহ জপ করতুম, মুসলমানদের মতো কাছা খুলে কাপড় পড়তুম, পাঁচবার নামাজ পড়তুম। ঐ ভাবে তিনদিন কেটে গেলে পর ঐ মতের সাধনফল সম্যক হস্তগত হয়েছিল। বাংলাদেশে দর্শন, বরাত - শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী অমৃতত্বানন্দ, পৃষ্ঠা ৫২।

২. কিন্তু সেই সাধনা কীভাবে করতে হবে তার বিশদ কোনো রূপরেখা তিনি নির্দেশ করে যেতে সক্ষম হননি। তদুপরি জীবনের আচার-আচরণ, ধর্মীয় রীতি-নীতির মধ্যে (বিশেষত যার বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বৈপরিত্যও বিদ্যমান রয়েছে) সমন্বয়ের উপায় কী হবে তারও কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা তিনি নির্দেশ করে যেতে পারেননি। স্বতন্ত্র জীবনাচরণ সম্বন্ধে দিক-নির্দেশনা তো নয়ই।

রামকৃষ্ণের বিখ্যাত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন এবং রামকৃষ্ণের সার্বজনীন ধর্মের বাণী দেশ-বিদেশে প্রচার করেন। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরেও "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার" নামক একটা প্রতিষ্ঠান এরূপ প্রচারে ব্রতী রয়েছে। আমাদের দেশে ঢাকা রাজধানিতেও রামকৃষ্ণ মিশন রয়েছে। রামকৃষ্ণভক্ত সাধুগণ সংযম, দারিদ্র্য ও পরহিতের মাধ্যমে রামকৃষ্ণের শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করেন।[১]

গ্রন্থ সমাপ্ত

১. রামকৃষ্ণের সার্বজনীন ধর্ম সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের সূত্র: মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ ও বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশে দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান" নামক গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধ।

চতুর্থ সংস্করণে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে তার কিছু বিবরণ

চতুর্থ সংস্করণে অনেক ধরনের ছোটখাট পরিবর্তন ও সংযোজন আনা হয়েছে। ভাষা, বানান ও লেখার পদ্ধতিগত কিছু পরিবর্তন, পরিমার্জনও করা হয়েছে, যার বিবরণ শুরুতে "চতুর্থ সংস্করণ প্রসঙ্গ" শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্য যেসব পরিবর্তন ও সংযোজন আনা হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযো-গ্য কয়েকটা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ও "আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান" এ কথার বর্ণনায় কিছু শব্দের পরিবর্তন, ব্যাখ্যা ও বরাত সংযোজিত হয়েছে।

ও "তিনি নিরাকার" কথাটির সঙ্গে যোগ করা হয়েছে, "তথা মাখলূকের ন্যায় আকার বিশিষ্ট নন।"

ও আল্লাহর সিফাত الشهيد -এর অর্থ ও ব্যাখ্যায় কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

ও ফেরেশতা সম্বন্ধে ঈমান" প্রসঙ্গে হযরত আযরাঈল (আ.)-এর ব্যাপারে লেখা ছিল- "সারা পৃথিবী একটি গ্লোবের মত তার সামনে অবস্থিত।" এটা পরিবর্তন করে এখন লেখা হয়েছে, "সারা পৃথিবী একটি গামলার মত (مثل الطست) তাঁর সামনে অবস্থিত,"। এ বক্তব্যের বরাতও উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে।

ও "নবী ও রসূল সম্বন্ধে ঈমান" শিরোনামের আলোচনায় কিছু শাব্দিক পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিছু কথা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

ও "আমলনামার প্রাপ্তি সত্য" শীর্ষক আলোচনা থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশের পর কেয়ামতের ময়দানে আমলনামা উড়িয়ে দেয়া হবে।- এ কথার মধ্য থেকে "সুপারিশের পর" কথাটুকু উপযুক্ত দলীল না পাওয়ায় বাদ দেয়া হয়েছে।

ও ইয়াজূজ মাজূজের পরিচয় এবং তারা বর্তমানে কোথায় কীভাবে আছে এ সম্বন্ধে টীকায় আরও কিছু তাহকীক সংযোজন করা হয়েছে।

ও হযরত ঈসা (আ.) কোথায় অবতরণ করবেন- এ সম্বন্ধে আরও কিছু কথা সংযোজন করা হয়েছে।

ও "কাউকে কাফের আখ্যায়িত করার নীতি" শীর্ষক আলোচনায় আরও কিছু কথা সংযোজন করা হয়েছে।

ও যারা মানুষের মধ্যে আল্লাহর হুলূল তথা অবতারিত হওয়ার আকীদা পোষণ করে, তাদেরকে হুলূলিয়া বলা হয়। তাদের তাকফীরের ব্যাপারে আরও কিছু কথা সংযোজন করা হয়েছে।